নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

সপ্তবিংশ খণ্ড—১৩১৬।

কলিকাতা,

২১০/৫ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও ২১০/৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

নব্যভারত।

সপ্তবিংশ খণ্ড।

১৩১৬

আমরা ও তাঁহারা।

নির্মেঘ আকাশে কি উজ্জ্বল কিরণছটাই খেলিতেছিল; মদিরা-বিভোর লোকের ন্যায়, ঐ জ্যোতি-বিভোর অলস প্রাণ নিভৃতে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল;—আবার স্নিগ্ধতায়, আবার জীমূত-গর্জ্জনে, আবার মায়ের আহ্বানে সে যে জাগিবে, সে আশা ছিল না। সেই সংসার-বিতৃষ্ণা আজ কোথায়?

আমরা মরিবার জন্যই প্রস্তুত হইতেছিলাম, সকল আশা যখন কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, বহুদিনের কঠোর সাধনার পরেও, যখন গোলামীতেই এদেশ ডুবিতেছিল, তখন, আমরা, নিরাশার তিমিরে আত্মসমর্পণ করিয়া. মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুত হইতেছিলাম। চতুর্দ্দিকে জাগিতেছিল, কেবল নিরাশা এবং কেবল নিরাশা। সাহিত্য-জগৎ হইতে যখন একে একে অক্ষয়কুমার, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, হেমচন্দ্র গেলেন, তখন জাগিল কেবল নিরাশা; ধর্ম্ম-জগৎ হইতে যখন কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, প্রতাপচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ গেলেন; তখন নিরাশা জাগিল; রাজনীতিক্ষেত্র হইতে যখন রামগোপাল, হরিশ্চন্দ্র ও কৃষ্ণদাস গেলেন, তখন জাগিল কেবল নিরাশা, আর নিরাশা! যখন বঙ্গ নিরাশার ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন শিবাদল ও পেচকের নৃত্য আরম্ভ হইল, আবেদন-নিবেদনের দিগ্বিজয়ী প্রতাপে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত হইল। তখন নিরাশায় এদেশের কবি গাহিলেন—

"তোমরা ব্রিটিশ জাতি, পবিত্র উৎসাহে মাতি
ধরার দাসত্বপ্রথা করিলে বারণ,
তোমাদেরই পদতলে, তোমাদেরই ছায়াতলে,
ভারত দাসত্বে আজ হলো নিমগন।"

এবং চতুর্দ্দিকে জাগিয়া উঠিল,—"আমরা নাই, আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই, কেবল তোমরা আছ, তোমরা যাহা করিতে হয়, কর।" আর্ত্তনাদ উঠিল—"আমাদের ঘরের দুয়ারে লোক না খাইযা মরিতেছে, ওগো তোমরা কি করিতেছ, রক্ষা কর, আমাদের গৃহ-কোণে ম্যালেরিয়ায় পুরস্ত্রী মৃতবৎ, ওগো কোথায় তোমরা, উদ্ধার কর।" এইরূপ কত নিবেদনের কাহিনীই কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল! হায়! এব্রাহিম লিঙ্কন, তুমি জীবিত থাকিলে, কি এরূপ ভারতকে দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিতে?

নির্লজ্জ বেল্লিকের দল তাঁহাদের হস্তে কর্ত্তব্যের ভার ন্যস্ত করিয়াই মহাঘুমে আত্মসমর্পণ করিল। তবুও "আমরা আছি" যাহারা বলে, তাহারা বেল্লিক হইতেও মহাবেল্লিক! যাহাদের কোন কর্ত্তব্য ছিল না, তাহারা কি জাগিয়াছিল? এ জগতে যাহার কোন কাজ নাই, সে কেন বাঁচিবে? অসম্ভব কথা,—তথন সব মহা সুষুপ্তিতে নিমগ্ন হইয়াছিল। চীৎকার, আন্দোলন, বিকটধ্বনি যাহা কিছু সুদীর্ঘকাল এদেশে শুনিয়াছ,সে সব বিকারের সম্মোহন-ধ্বনি। এই অবস্থায়,এদেশে,কি জানি কেন, বিধাতার কৃপা-কণিকা বর্ষিত হইল, অলক্ষ্মী-মন্থরা দুর্জ্জয় কর্জ্জন-কৈকিয়ীর কর্ণে কি মদিরা ঢালিয়া দিল,অমনিই সর্প গর্জ্জিয়া উঠিল, ঢাকাতে যষ্টি-ফণা ঘুরাইয়া কর্জ্জন যে বিষ ঢালিয়া আসিলেন,তাঁহাতে বিকারের রোগীর বিষ প্রয়োগ হইল;—সুপ্ত ব্যক্তি চক্ষু মেলিয়া চাহিল,---আরো কত কি করিল! সে সব কথা তোমরাও জান, তাঁহারাও জানেন, সুতরাং আর পুনঃ পুনঃ লিখিয়া প্রয়োজন নাই। তার পর—কত কুম্ভকর্ণ জাগিয়া প্রাণ দিল! তাহা দেখিয়া পৃথিবী আজ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে—ভারতে কি হইতেছে?

আমরা এ কথার কি উত্তর দিব? উত্তর দিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু লেখনী চলিতে চাহে না;—কেননা, আমাদের উত্তর কাহারও ভাল লাগিবে না। সম্মোহিত জাতির লোকের নিকট অপ্রিয় কথা ভাল লাগিবার নয়। গুরুজি গুপ্ত বিলাতে বড় চাকরী পাইলেন, অর্থাৎ পাকা গোলামীতে মজিলেন, আনন্দে এদেশ বিভোর; কিন্তু তিনি স্বদেশের কি উপকার করিয়াছেন, কেহ তাহা আজিও জানে না।—শিষ্যজি মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ কোমরে বাঁধিয়া দেশের সর্ব্বনাশ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন, এদেশ হাসিয়াই অস্থির! আর আজ—দুঃখের উপর দুঃখের মসীমান কাহিনীতে দেশ আচ্ছন্ন, তবু, সত্যপ্রসন্নের বড় গোলামীর পদপ্রাপ্তিতে এদেশে আনন্দের উপর আনন্দের কোলাহল চলিতেছে; লোকেরা হাসিবার আর অবসর পাইতেছে না! মহা গোলামীর মহা ইন্ধন! দেশ,সুতরাং, মহানন্দে আজ বিভোর!! জেলায় জেলায়, দেশে দেশে কত হাহাকার—কত নির্ব্বাসন, কত নির্য্যাতন, কত অপমৃত্যু—কিন্তু দেশ আজ আনন্দে বিভোর! রিপনের স্বায়ত্ত-শাসনের ইতিহাস কি ঘোষণা করিতেছে? লেজিস্‌লেটিব-সভাসমূহে দেশী সভ্যদের দ্বারা কি উন্নতির ইতিহাস লিখিত হইতেছে? মেটা বা গোখলের প্রতিভা কোথায় স্ফুরিত হইল—? কি কাজে লাগিল? সে সব কে না জানে, কিন্তু তবুও দেশ সম্মোহিত,—হাসিয়াই পাগল! সদলে, দিগ্বিজয়ী গ্লাডোষ্টোন, হোমরুল দিতে অক্ষম হইলেন, বহুবিরোধী সভ্যের মধ্যে একাকী সত্যপ্রসন্ন এদেশকে স্বর্গে তুলিতে সক্ষম হইবেন!! কি সম্মোহনের কুহক গো!! অধীনতার জালে আবদ্ধ নরনারী কি মোহে আচ্ছন্ন গো!! আজও আমরা চিনিলাম না, উঁহারা কি ধাতুর লোক। এই মোহাচ্ছন্নতার দিনে, আমাদের উত্তর তাঁহাদের বা তোমাদের কাহারও ভাল লাগিবার নয়।

তাঁহাদের কথা আমরা আর কি লিখিব? কতজনে ভয় দেখায়, ভাল করিয়া লিখিলে এদেহে আর প্রাণ থাকিবে না! কেন যে তাঁহারা চির ভীতকে আরো ভয় দেখান,তাহা জানি না। কিছুই লিখি না—তবু, ইনি, উনি, তিনি, সকলে ভয়েই অস্থির! ডেপুটীর দল, ম্যাজিষ্ট্রেটের দল,—গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্রের

দল—দিবারাত্রি কত ভয় দেখান! কেহ কেহ বলে, ব্যক্তিগত দোষের কথা নয়, ইতিহাসের কথা বলায় কোন দোষ নাই। ইতিহাস ত ঢাকা থাকে নাই; সে সব কথা অন্য দেশের লোকেরা বলিতে পারে, আমরা পারিব না কেন? অপিচ, কেহ কেহ বলে, আমরা পরাধীন, আমাদের সে সব কথা বলাও সাজে না। জোয়ানের অগ্নি-পরীক্ষার কথা, নেপোলিয়নের নির্ব্বাসনের কথা, ঘুষরক্ষণে ক্রুজির পতনের কথা,—মেহেদিব শবের অবমাননা প্রভৃতি দুষ্কৃতির কথা, অন্যেরা বলে, বলুক, কেহ কেহ বলে, আমরা বা তোমরা বলিলেই দোষের হয়। তাঁহারা খ্রীষ্টের উপাসক হইয়াও ধর্ম্ম রক্ষা করে না, "সে কথা অন্যেরা বলে বলুক", কেহ কেহ বলে, "তোমরা বলিও না। মহলার-রাওয়ের নির্ব্বাসনের কথা, বালক দলিপের ব্যাপ্টিস্মের কথা, রাণী ঝিন্দনের কথা,—অথবা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিচার-বিভ্রাটের কথা, অথবা, আরো শত শত কলঙ্কের কথা—ইতিহাসের কলঙ্কিত পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া লি-ওয়ার্ণরের পূজা কর, ও সব কালিমার কথা স্মরণ করিয়া বৃথা দণ্ডের বোঝা ভারি করিও না। ও সব যে বিদ্বেষ-বিষের কথা, তাহা কি তোমরা জান না? সুতরাং সিরাজের পতনের কাহিনীও ভুলিয়া যাও, এবং ক্লাইবের স্মৃতি-সিংহাসন মাথায় তুলিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ কর। এ যুগ, সে যুগ, এ শতাব্দী, সে শতাব্দী, সব দিনের সব কথা এক এক করিয়া ভুলিয়া যাও,—ভুলিয়া যাইয়া ঐ মুক্ত আকাশ তলে দাঁড়াইয়া ঐ মুক্ত বায়ুতে উড়াইয়া দেও,—"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি" এবং অন্তরে লিখিয়া রাখ—"দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।" প্রকৃত কথা এই, খাল কাটিয়া লোণা জল আনিয়া আমরা যত অনর্থের মূল ঘটাইয়াছি। মনে হয়, আমাদের সংস্পর্শে আসিয়াই তাঁহারা "নবাবী" শিখিয়াছেন, নচেৎ তাঁহাদের গুণের শেষ কোথায়? তাঁহারা শক্তিশালী, আমরা শক্তিহীন; তাঁহারা জয়ী, আমরা জিত; তাঁহারা কর্ম্মী, আমরা অলস; তাঁহারা একাত্মক, আমরা বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত,—ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন তুলনা চলে কি? তাঁহারা পরোপকারী, আমরা পরশ্রী-কাতর, তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণ, আমরা কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন; তাঁহারা শাসক, আমরা শাসিত, তাঁহারা রাজা, আমরা প্রজা,—তাঁহারা স্বাধীন, আমরা পরাধীন,—তাঁহারা স্বাবলম্বী, আমরা পরমুখাপেক্ষী,—কোন তুলনা চলে কি? তবু কেন যে তাঁহারা আমাদিগকে অবিশ্বাস করেন, তাহা আমরা বুঝি না। তাঁহারা কি না করিতে পারেন, এবং এই জগতে কি না করিয়াছেন! তাঁহারা, অন্যকে দমন করিবার সময়, আত্মকলহ, আত্ম-মত-বিরোধ যেরূপ ভুলিতে পারেন, এরূপ আর কেহ পারে কি? বিলাতের যত দল আছে,—অন্যকে শাসন করিবার সময় বা দেশের গৌরব রক্ষা করিবার সময়,—সব মিলিয়া একাকার হয়,—এক পায়ের উপর সকলে দাঁড়ায়, তাহা কে না জানে? রিপণ হইতে কটন, হিউম হইতে মর্লি—ডিস্রেলি হইতে গ্লাডোষ্টোন, অন্যকে দমন করিবার সময় সব মিলিয়া একাত্মক হন, তাহা জানে না কে? তাঁহাদের নীতিই এই—ছলে, বলে, কৌশলে তাঁহাদের প্রতাপ বা প্রভাব, সম্মান বা গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবেন! আর আমাদের নীতি—কেবল ঝগড়া, বিবাদ, কলহ করিয়া ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হওয়া। সুতরাং তুলনায়

কথা বলিও না। তাঁহারাও মানুষ, আমরাও মানুষ, একথা বলা আমাদের পক্ষে সাজে না। অশেষ গুণের সংস্পর্শে আসিয়াও আমরা মানুষ হইলাম না,—স্বজন ও স্বদেশ-বাৎসল্য শিখিলাম না,—বলিব কি "গুণ হয়ে কাল হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়।" দুঃখ এই, দেখিয়াও শিখিলাম না, এত দৃষ্টান্তের সংস্পর্শে আসিয়াও বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিলাম না। তাঁহারা যেরূপ আমাদের লোকের দ্বারা আমাদের অনিষ্ট করিতেছেন, এরূপ এজগতে আর কেহ কখনও করিতে পারিয়াছে কি? প্রতাপে, অর্থে, ছলে, ভালবাসায়, কৌশলে এই ভারতবর্ষকে কি সম্মোহনেই তাঁহারা ভুলাইয়া রাখিয়াছেন! এরূপ করিতে আর কেহ কখনও এ জগতে পারিয়াছে কি? আজও তাঁহারা কেমন ভুলাইতেছেন! আমাদের কত বড় বড় জ্ঞানী—বড় বড় কর্ম্মী—তাঁহাদের সম্মোহন-মন্ত্রে আজ গোলাম হইতেও গোলাম হইয়া স্বদেশের অনিষ্ট করিতেছে, একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তারপর বলিও,—তুলনা চলে কি না? তুলনা—এক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। তুলনা চলে কি,—মেষে আর শার্দ্দুলে, ধর্ম্মে আর অধর্ম্মে, পুণ্যে আর পাপে? ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, ঘোর বৈষম্যের রাজ্য তুলনার কথা মুখে আনিও না। আমরা মরিয়াছি ত, মরিয়াই যাই, আর কেন ভোজের বাজির কথা, শুধু বালকের ক্রীড়ার কথা বল? আমাদের পক্ষে মরণই শ্রেয়, নির্ব্বাসনই পুণ্য-পূত!

সত্যই বলিতেছি, যাহারা নিজের পায়ের উপর নিজেরা দাঁড়াইতে চায় না, তাহাদের পক্ষে মরণই ভাল। যে জাতির লোকে আপনার কাগজ বা কাজের প্রশংসা নিজে ছাপাইয়া অন্য সম্পাদকের দ্বারা ঘোষণা করে; বার-বিলাসিনীদিগের ন্যায়, চাকচিক্যে সাজাইয়া, চুটকি সাহিত্যের মোহিনী মায়ায় নরনারীকে ভুলাইয়া পয়সা সংগ্রহ করে এবং একই প্রবন্ধ একই সময়ে নানা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া লোককে প্রতারিত করে,—যে জাতির ধার্ম্মিকেরাও, ধর্ম্ম অন্যের রক্ষণীয় ও পালনীয়, এই কথা ঘোষণা করিয়া, বিপথে বিচরণ করিয়া আত্ম-তৃপ্তি লাভ করে; এবং শয়নে স্বপনে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে,—যে জাতির লোকেরা ধর্ম্ম না বুঝিয়াও ধর্ম্মের কথা বলিতে চায় এবং ধর্ম্ম-সঙ্গ করে, সে জাতির লোকদের পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়। এ দেশের জাগরণের অর্থ, পিপীলিকার পালক-উদ্গমের ন্যায়, মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস! হায়, মায়ের প্রসাদী নির্দ্দোষী অবোধ শিশুগণ, কেন এসব কথা বুঝিয়া সতর্ক হইল না? জুডাস ইস্কারিয়টগণ যে এদেশের ঘরে ঘরে বিচরণ করিতেছে, কেন তাহারা একথা বুঝিতে পারিল না? মহা প্রহেলিকা, মরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও পতঙ্গ অগ্নিতে প্রবেশ করিতে ছাড়ে না! এই সকল কথা বুঝিয়াই বুঝিবা, মহারাজা সূর্য্যকান্ত, অথবা মহারাজা রাধাকিশোর, অথবা রাজা মহিমারঞ্জন, অথবা রমাকান্ত, কাব্যবিশারদ, ব্রহ্মবান্ধব, আনন্দমোহন, উমেশচন্দ্র, অকালে কালের অন্তরালে মুখ লুকাইলেন! আর ব্রজেন্দ্র কিশোর?—আর পালিত, ঘোষ-যুগল, সরকার, দত্ত এবং চৌধুরী? তাঁহারা যে আজও এদেশের জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে খাটিতেছেন এবং অর্থ ঢালিতেছেন, সে কিসের জন্য, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বুঝিতে পারিতেছি না, তাঁহারা মানুষ, না দেবতা? বুঝিতে পারিতেছি না, তাঁহারা

সংসারী, না সন্ন্যাসী ;—দেহী, না অদেহী ? জীবিত লোকের প্রশংসা করা আমাদের নিয়ম-বিরুদ্ধ, কিন্তু—তাঁহারা মানুষ কিনা, অনেক সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া ভাবি। ভাবিয়া কূলকিনারা পাই না। তবুও তাঁহাদিগকে চিন্তা করি, তবুও তাঁহাদিগকে প্রাণে রাখিয়া প্রাণ জুড়াই ! তাঁহারা আঁধার ঘরের মাণিক, মহা অন্ধকারের ক্ষণ-বিদ্যুৎ, মহা বিকারের মহৌষধ। তাঁহারা তুলনা-রহিত বলিয়াই তাঁহাদের গুণ গাই।

যাউক, সে সব কথা। বলিতেছিলাম, উঁহারা এখন, এই দিনে, আমাদের সর্ব্ব কাজের বিরোধী ;—আমাদের কোন কাজই আর তাঁহাদের ভাল লাগে না। কেবল তাঁহাদের মনে অবিশ্বাস অধিকার করিয়া রহিয়াছে। জেতা ও জিতের এসম্বন্ধ বড় বিষম সম্বন্ধ ;—ইহাতে কাহারও মঙ্গল নাই। আমাদের ন্যাসনেল-বিদ্যালয় সমূহ তাঁহাদের চক্ষের শূল, আমাদের জাতীয় সভাসমিতি তাঁহাদের নয়নের কণ্টক, আমাদের "স্বদেশী-আন্দোলন", তাঁহাদের প্রাণ-সংহারক, আমাদের "বন্দেমাতরম্ মন্ত্র" তাঁহাদের নিদ্রা-নাশক ! তাঁহাদের ভাল লাগে কি ? আমরা লেখা পড়া শিখি, তাঁহাদের ভাল লাগে না, আমরা দুপয়সা উপার্জ্জন করি, তাঁহাদের সহ্য হয় না—আমরা দেশের সেবা করিয়া দেশকে জাগাই, তাঁহাদের ইচ্ছা নয়, আমরা বাঁচি, তাঁহারা মোটেই চায় না, আমরা মানুষ হই, তাঁহারা মোটেই পছন্দ করেন না ! জগদীশ চন্দ্র,প্রফুল্লচন্দ্র ও রাসবিহারী—কেন এজাতির লোক হইলেন, তাঁহারা নিয়ত চিন্তা করেন ? এজাতির গৌরব, তাঁহাদের আর মোটেই সহ্য হয় না। শুধু ইংলিসম্যান, পাওনিয়র কেন, বিলাতের বড় বড় কত শত শত সম্পাদক, দিন রাত্রি অকথ্য ভাষায় এদেশ সম্বন্ধে নানা অনৃত বাণী প্রচার করিতেছেন ! স্বার্থে ঘা পড়িলে এমনই হয়। তাঁহারা যদি সহিষ্ণু হইতেন, ভাল হইত ; কিন্তু তাঁহারা সাত সমুদ্র তের-নদী পার হইয়াছেন কি কেবল আমাদিগকে স্বর্গে তুলিতে ? আমাদের মহা দোষ,একথা আমরা বুঝিনা। তাঁহাদের স্বার্থ—আমাদের বিলোপ সাধনে তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা। জান না কি কর্জ্জন কি বলিয়া গিয়াছেন ? "তোমরা কাঠুরে ও ভিস্তি হইবে—আবার কি ?" সুতরাং আমরা খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া উঠিলে, অথবা সুশিক্ষিত হইলে, অথবা ধনী হইলে তাঁহাদের প্রাণে তাহা সহিবে কেন ? ব্যবসা বাণিজ্য—স্বাধীন বাণিজ্যের ছলনায়, অবাধ লুণ্ঠনের বলে সব তাঁহারা একচেটিয়া করিতে চাহেন। তাহার বিরুদ্ধে যদি কোন কথা বল, জানিয়া রাখ, তাহা তাঁহারা সহিবেন না। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেসনের কথা মনে নাই কি ? হায় নিরপরাধী কৃষ্ণকুমার, অশ্বিনীকুমার,—আজ বৎসরের প্রথম দিনে, তোমাদের জন্য অশ্রু ফেলিল এদেশের কয়জন লোক ? হায়, আজ দারুণ ভয়ে এই বঙ্গ নীরব, সকল আন্দোলন থামিয়া গিয়াছে, আজ পূতচরিত্র সত্যপ্রসন্নের গৌরবে এদেশ মহানন্দে বিভোর হইয়াছে ! এই একটী ঘটনায় সব দুঃখ যেন আজ লোকেরা ভুলিয়া গিয়াছে ! ছেলে ভুলানের কি যাদুকরী সম্মোহন-মন্ত্র তাঁহারা জানে গো !!

তাঁহারা এখন এইরূপেই লোকদিগকে ভুলাইতে চাহেন। এক হাতে কঠোর শাসন, অবাধ লুণ্ঠন, অন্য হাতে ছেলে ভুলাইবার জন্য মোমের পুতুলের নৃত্য। তাঁহারা

প্রকারান্তরে, আমাদিগকে নীরব করিতে, আমাদের দ্বারাই আমাদিগের শাসনের নির্ম্মম আইন রচনা করিবেন, সর্ব্ব প্রযত্নে সেই আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু আমরা মরণের ফাঁসে মাথা দিবার সময়ও সে কথা বুঝিলাম কই?

যা'ক বৃথা বকাবকিতে প্রয়োজন নাই। আমাদের এবং তাঁহাদের ভাল-মন্দ-জড়িত সম্বন্ধটা যদি আমরা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিতাম, তবেই আমরা ধন্য হইয়া যাইতাম। বড় বৃক্ষের নীচে ছোট বৃক্ষ বাড়ে না—বড় জাতির ধারে ক্ষুদ্র জাতির টিকিয়া থাকা বড় কঠিন। তাঁহাদের সংস্পর্শে আমাদের বিলোপই কি তবে বিধাতার নিয়ম? এই সকল কথা বুঝাইতে পারিলে কৃতার্থ হইতাম। জাতীয় ভাষা ভিন্ন জাতির হিতের কথা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে না। এইজন্য, অকিঞ্চিৎকর শক্তি লইয়া, বিগত ২৬ বৎসর, আমরা, একাদিক্রমে, জাতীয় ভাষায়, দ্বারে দ্বারে, জেতা-জিতের সম্বন্ধ এবং স্বাবলম্বনের কথা কীর্ত্তন করিয়া আসিলাম। কেহ সে সব কথা শুনিল না; যাহারা শুনিল, তাহারাও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গালাগালি দিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল;—উপেক্ষা, গালাগালি এবং নির্ম্মম ব্যবহার—শক্তিশেলের ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে অন্তরে বিদ্ধ হইল। অথবা যাহারা শুনিল, তাহারা আরো ভাল করিয়া পা চাটিতে আরম্ভ করিল। কাহার নিন্দা করিব, এবং কাহার প্রশংসা করিব? পক্ষে কে, এবং বিপক্ষে কে, তাহা জানি না। জানি, কেবল এই—শ্রান্তি এবং ক্লান্তিতে, দুঃখ এবং দারিদ্র্যে, এই বার্দ্ধক্যে জর্জ্জরিত হইয়া, ক্রন্দন বা হাহাকার করিলেও, এদেশে সহানুভূতি মিলিবার নয়। সোণার কৃষ্ণকুমার ও অশ্বিনীকুমার আজীবন দেশের জন্য খাটিয়াও তাহা পান নাই, আর কে পাইবে? সুতরাং এখন মরণের দ্বারে দাঁড়াইয়া, স্বদেশের কালিমার কথা স্মরণ, মনন ও ধ্যান করা ভিন্ন আমাদের আর গত্যন্তর নাই; আবার এখন সম্বল কেবল অশ্রু। তাই দিবারাত্রি কেবল অশ্রুপাত করিতেছি, এবং প্রার্থনা করিতেছি—দেশের মঙ্গল হউক। অসংখ্য লোক অনাহারে মরিতেছে, খাটিবার শক্তি নাই; অসংখ্য লোক দারুণ ব্যাধিতে প্রাণ দিতেছে, ঔষধ যোগাইবার অর্থ নাই; অসংখ্য বিধবার অশ্রুতে মেদিনী সিক্ত হইতেছে, উদ্ধারের সামর্থ্য নাই;—অসংখ্য লোক অশিক্ষার অন্ধকারে বিচরণ করিতেছে, উন্নত করার উপায় নাই। এই অবস্থায়, এই বার্দ্ধক্যে, এখন কেবল মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। স্বদেশের সেবা করিবার বড় সাধ ছিল, তাহাও আর আমাদের দ্বারা হইবে না, কেননা, শক্তি অতি সামান্য—বৃথা চেষ্টা এবং বৃথা খাটুনি! দীন দুঃখীদের মৃত্যুর দিনে, তোমরা কৃপা করিয়া এক এক বিন্দু অশ্রু ফেলিও, নববর্ষে তোমাদের চরণে কেবল ইহাই প্রার্থনা। এবং যিনি ত্রিকালজ্ঞ, তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা, দুঃখ-বিপদে, শয়নে স্বপনে তিনিই যেন আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য থাকেন এবং দেশের মঙ্গল কামনা লইয়াই যেন মরিতে পারি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ভাওয়ালে।

আমি পরবাসী।
ঘুরি আমি নানান্ দেশে, নানান্ কষ্টে নানান্ ক্লেশে,
মন বসেনা কোন খানে, পাগার মত ভাসি,
কিন্তু যখন আসি এখা ভুলি প্রাণের সকল বেথা,
দুদিন পরে ঘুরে ফিরে তাইতে আবার আসি,
আমি পরবাসী।

২

আমি পরবাসী,
দিক্‌দিগন্ত আছে ব্যাপি, উর্দ্ধে উঠছে আকাশ ছাপি,
হাজার হাজার গজার বনের সবুজ শোভা রাশি,
সিন্ধু যেন শ্যাম তরঙ্গে,খেল্‌ছে বনের অঙ্গে অঙ্গে,
শীত বসন্তে সমান ফোটে ফেন-পুষ্প হাসি,
আমি তাই দেখিতে আসি।

৩

আমি পরবাসী,
বনভরা সব যত টিলা, মাথায় আছে আকাশ মিলা,
মরকত মন্দিরের মত শোভা পরকাশি,
ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে পাখা,উড়্‌ছে মায়ের শ্বেত পতাকা,
বৈশাখ মাসে বকের শোভা দিক্‌দিগন্তে ভাসি,
আমি তাই দেখিতে আসি!

৪

আমি পরবাসী,
শশক হরিণ খেল্‌ছে বনে, সতত প্রফুল্ল মনে,
ভাই ভগিনীর মত আমি তাদের ভালবাসি,
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী, বাঘ ভালুকও একই দেশী,
তেজ বীর্য্য স্বাধীনতা অরণ্য-বিলাসী।
আমি তাই দেখিতে আসি।

আমি পরবাসী,
শুক্‌না বিলে শুক্‌না খালে, বন্-বরাহ পালে পালে,
খুঁজ্‌ছে শালুক পদ্মনালে সলিল-পিপাসী,
বৈশাখে চাতকের ডাকে, নবীন জলদ থম্‌কে থাকে,
বনবালা পূজ্‌ছে দিয়ে ভাটি-ফুলের রাশি!
আমি তাই দেখিতে আসি।

৬

আমি পরবাসী,
বনে বনে ডাক্‌ছে কত, দয়াল শ্যামা অবিরত,
মূর্ত্তিমতী রাগ রাগিণী—তারাও বনবাসী,
ব্যাঘ্র'রবে স্তব্ধ রবি, কি ভীম বন-ভৈরবী!
দাবাগ্নিতে জ্বল্‌ছে সাহস-দীপক অগ্নি রাশি,
আমি তাই দেখিতে আসি!

৭

আমি পরবাসী,
কেমন পুণ্য বনদেশ, মহিষ আছে, নাইক মেষ,
বন্য শূয়র ধন্য সেও নহে অবিশ্বাসী,
অতি তুচ্ছ কীট পতঙ্গ, তারাও নহে সত্য-ভঙ্গ,
কুকুর নয় যে পা চাটিতে গলায় পরে' ফাঁসি,
আমি তাই দেখিতে আসি!

৮

আমি পরবাসী,
কেমন আত্ম-নির্ভরতা, ধন্য বন্য সজীবতা!
স্বাধীন মূর্ত্তি স্বাধীন স্ফূর্ত্তি সবাই উল্লাসী,
তাদের বন তারাই ভোগে, জরা মৃত্যু শোকে রোগে,
তারাই রাজা তারাই প্রজা তারাই অধিবাসী,
আমি তাই দেখিতে আসি!

আমি পরবাসী,
মলে' তারা ব্যাধের হাতে, বন্দুক গুলি বর্ষাঘাতে,
দেয় না তবু স্বাধীনতা—কীর্ত্তি অবিনাশী,
কি মহান্ সে বন্যধর্ম্ম, বান-প্রস্থ মহাকর্ম্ম,
এর কাছে বা কোথায় লাগে গয়াগঙ্গা কাশী,
আমি তাই দেখিতে আসি!

১০

আমি পরবাসী,
ধন্য বন্য পশু পক্ষী, ধন্য বঙ্গ রাজলক্ষ্মী,
দর্শনে তার চিত্ত জুড়ায় মহাপাতক নাশি,
পর্শনে তার পুণ্য বায়ু, বৃদ্ধি করে পরমায়ু,
নির্ভয়ে ধমনী নাচে বুকের রক্ত রাশি,
আমি তাইতে হেথা আসি!

১১

আমি পরবাসী,
বর্ষাকালে বেলাই বিলে, শাপ্‌লা শালুক সুন্দী মিলে,
কমল বনে ফুটে উঠে কমলার সে হাসি,
ভারতী কি স্নেহের ভরে, বীণা রেখে কবির করে,
পদ্ম-সরে হয়ে আছেন পদ্মবনবাসী,
আমি তাই দেখিতে আসি!

১২

আমি পরবাসী,
চিলাই যখন দু'কূল ভরা, দুই তীরে তার ধান আর খরা,
নূতন সবুজ শাড়ী পরা কলহংসভাষী,
কবের অণু রেণু বা কার, অমল জলে ফুটছে তাহার,
কমল কুমুদ রূপে গন্ধে চিতা-ভস্ম-রাশি!
আমি তাই দেখিতে আসি!

১৩

আমি পরবাসী,
শরতে সে শশীর হাসে, শ্যামল বনভূমি ভাসে,
হেমন্তে সে হেমাঞ্চল লুটায় পাশাপাশি,
খেতে খেতে সোণা ঢালা, আনন্দে কৃষকের বালা,
হুলু দেয়, কাঁচি হাতে খেতে যায় শ্রী,
আমি তাই দেখিতে আসি!

১৪

আমি পরবাসী,
ওগো শ্যামা বনভূমি, বিপুলা বিশালা তুমি,
কবিতা কল্পনা মোর তোর চিরদাসী,
আমি বা বুঝিব কি মা, তোরও শ্যাম-মহিমা,
তথাপি সেবিব তোরে চির অভিলাষী,
আমি তাইতে হেথা আসি!

১৫

আমি পরবাসী,
দে কোলে একটুকু জা'গা, আমি অতি হতভাগা,
আমি যে সন্তান তোর উদাসী সন্ন্যাসী,
অণুতে রেণুতে মাখি, দে মা শ্যামাঞ্চলে ঢাকি,
জনমের মত মাগো মোচ্ছা অশ্রু রাশি,
আমি তাইতে হেথা আসি।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

রাজা মহিমারঞ্জন।

যাঁহারা ধর্ম্মে নিবিষ্ট-চিত্ত, চরিত্রে উজ্জ্বল, পরোপকারে সতত উদ্যমশীল, ক্রোধ-ঈর্ষ্যাদি-বিবর্জ্জিত,—এরূপ মহাপুরুষদিগের অভ্যুদয় এই পঙ্ক-মলিন মর্ত্ত্য-ভূমিতে সর্ব্বদা হয় না। ইহাঁরা বিধাতার আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ। কদাচিৎ কোন প্রদেশে এইরূপ মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, কিছুকালের জন্য আপনাদিগের উজ্জ্বল আলোকে প্রদেশ-বিশেষকে আলোকিত করিয়া, আবার কাল গর্ভে বিলীন হইয়া পড়েন। ইহাঁদের দ্বারা পৃথিবীর যে কল্যাণ হয়, তাহাই স্থায়ীভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। এবম্প্রকার পুরুষবর্গের অভ্যুদয় না হইলে, এ পৃথিবী বাসের যোগ্য হইতে পারিত না।

যে মহাত্মার নাম এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশকে সমলঙ্কৃত করিয়াছে, বঙ্গদেশে এখন কে আছেন, যিনি ইহাঁকে জানেন না? কত অনাথা দরিদ্র, কত অভাবগ্রস্ত গ্রন্থকার, কত 'সমাজ', কত সাধারণ-হিতকর কার্য্য-সমূহ ইহাঁর মুক্তহস্তভার কৃপালাভ করিয়াছে, গণনার দ্বারা তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। এই দীনের আশ্রয়, দরিদ্রের বন্ধু, উত্তর-বঙ্গের কল্পপাদপ, বিগত চৈত্র মাসে স্বদেশ-বিদেশকে শোকাকুলিত করিয়া, পর-লোকে প্রস্থান করিয়াছেন। বিগত চৈত্রে কাকিনায় অকস্মাৎ রক্তামাশয় রোগ কোথা হইতে আসিয়া উৎপতিত হইল। গৃহে গৃহে শিশু সকল এই রোগে আক্রান্ত হইতে লাগিল এবং আক্রান্ত শিশুমাত্রই ইহার কবলে কবলিত হইল! রাজা মহিমারঞ্জনও ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না!

অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, এই রাজারই সভা-পণ্ডিত, বর্ত্তমান কালের কালিদাস, মহাকবি শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার এই মর-ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কাকিনা-রাজের রাজমুকুটের উজ্জ্বল হীরক-খণ্ড তখনই খসিয়া পড়িয়াছিল। আজ সেই মহাকবির আশ্রয়-দাতা, সেই কবির সতত-সহবাস-প্রিয় রাজা মহিমারঞ্জনও খসিয়া পড়িলেন! উত্তর-বঙ্গ গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল! হায়! আর কি ইহাঁদের শূন্য স্থান পূরণ হইবে?

বঙ্গদেশের জমীদারবর্গের একটা অখ্যাতি আছে যে, ইহাঁরা নিতান্তই আত্ম-বিলাস-পরায়ণ। কিন্তু রাজা মহিমারঞ্জনকে এই অখ্যাতি স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইনি সাধারণ, সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাঁর বাস-ভবনের সামগ্রীগুলি, ইহাঁর নিত্য ব্যবহারের পরিচ্ছদ সকল, ইহাঁর আহার-বিহারের দ্রব্যনিচয় ইহাঁকে গৃহস্থাশ্রামস্থ সন্ন্যাসী বলিয়া ঘোষণা করিত। ইনি বিষয়-কর্ম্মের গুরু ঝঞ্ঝাট ও ঘোর-রোলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বস্তুনিবহে পরিবৃত থাকিয়াও, নির্লিপ্ত যোগীর ন্যায় থাকিতেন, ইহাঁর চিত্ত সে গুলিতে আবদ্ধ থাকিত না; ইনি নিয়ত পৃথিবীর উর্দ্ধদেশে আপন চিত্তটীকে নিবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছিলেন। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সংসারের কত বিপদ, কত ভীষণ ঝটিকা, ইহাঁর উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে,—অন্য হইলে ছট্‌ফট্‌ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইত,—কিন্তু এই মহাপুরুষের ধীরতার ক্ষতি কিছু-

তেই জন্মাইতে পারিত না। বঙ্গদেশের ধনীদিগের পক্ষে ইহা কম প্রশংসার বিষয় নহে। এরূপ আত্ম-সংযম এদেশে নিতান্ত সুলভ নহে। কিন্তু কিসের বলে ইঁহার এই বিস্ময়কর নির্লিপ্ততা অর্জ্জিত হইয়াছিল?

ইহার মূলে দুইটী কারণ বর্ত্তমান ছিল। এই দুইটী কারণ, ধনিবর্গের মধ্যে বর্ত্তমান কালে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একটী ইঁহার সুশিক্ষা, অপরটী ইঁহার ধর্ম্মপ্রবণতা।

ইনি যেরূপ সুশিক্ষিত ছিলেন, তাহা বঙ্গদেশে কে না অবগত আছেন? ইংরাজী বিদ্যায় এবং নানা বিভাগীয় তথ্যসমূহে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। সংস্কৃত-ভাষাও ইনি বুঝিতে পারিতেন। উদ্ভিদ্ শাস্ত্র (Botany), প্রাণীতত্ত্ব, চিকিৎসা ও শারীর-বিদ্যা, নানাদেশীয় ইতিহাস, ইংলণ্ডের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বস্তুনিচয়, ইঁহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। কে, ডি, ঘোষের ন্যায় সুবিজ্ঞ ডাক্তারও, চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে ইঁহার সহিত আলাপ করিতেন। প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ইংরেজ পণ্ডিতেরা ইঁহার অভিজ্ঞতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ইঁহার পাঠ্যাগার বিবিধ বিষয়ের গ্রন্থ-রাশিতে পরিপূর্ণ থাকিত। এবং ইনি নিয়ত একান্তে ঐ সকল গ্রন্থরাশির তত্ত্বনিচয়ের আলোচনায় নিমগ্ন থাকিয়া, অসামান্য বিদ্যা ও নানাবিষয়িনী অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এ প্রকার বিদ্যা দ্বারা যাঁহার চিত্ত মার্জ্জিত ছিল, তাঁহার আত্মসংযমের অভাব হইবে কেন? কিন্তু ইহা ছাড়াও, তাঁহার আর একটী বিশেষত্ব ছিল।

বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনায় ইনি জীবনের অধিক সময় ব্যয়িত করিতেন। উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি ইঁহার অতীব প্রিয় ছিল। প্রচলিত প্রামাণিক প্রত্যেক উপনিষদ্ হইতে যে কোন শ্লোক, যে কোন মন্ত্র, ইনি অনর্গল উচ্চারণ করিতে পারিতেন। প্রত্যেক মন্ত্রের অর্থ ইনি উত্তম জানিতেন। ইনি বাসভবনের সন্নিকটে, লতাগুল্ম-পরিবৃত, একটী নির্জ্জন, অত্যুন্নত কৃত্রিম ভূখণ্ড প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে, ইনি প্রত্যহ এই ভূখণ্ডে উপবেশন করিয়া, কলনাদিনী ধীর-প্রবাহিনী ত্রিস্রোতার তুঙ্গ ভূমির উপরে বিলম্বিত, অনন্ত নীল আকাশের দিকে চাহিয়া, পবিত্র ঔপনিষদিক শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিতেন এবং ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে সেই শ্লোকগুলির অর্থ ও তাৎপর্য্য আত্ম-হৃদয়ে অনুভব করিতেন। এরূপ ব্যক্তির আত্ম-সংযমের অভাব হইবে কেন? আমি সঙ্গে থাকিয়া দেখিয়াছি, একবার দার্জিলিঙ্গের হিমাচলের একটী নির্জ্জন, মহোচ্চ, গম্ভীর, আকাশচুম্বি শৃঙ্গ দেখিয়া, এই মহাপুরুষ, তখনই তথায় উপবেশন করিয়া, উপনিষদের কয়েকটী গম্ভীর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, সেই খানে মুদ্রিত নেত্রে ধ্যানমগ্ন হইলেন! সমৃদ্ধির কোলে এরূপ সন্ন্যাসী কয়জন মিলে?

যাঁহারা ইঁহার জীবিতকালে, কখনও ইঁহার আলাপ শুনিয়াছেন ও সহবাস-সুখ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না বলিয়া, আমাদের বিশ্বাস। হয় কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনায়, নয় বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে, ইঁহার বৈঠকখানা সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। সংসারের সহস্র জ্বালায় মুহ্যমান হইয়া ইঁহার নিকটে গেলে, ইনি উর্দ্ধতন রাজ্যের এমন মধুময়ী কথা উত্থাপন করিতেন যে, সেই অমৃতের স্রোতে তপ্ত-হৃদয় প্লাবিত হইয়া

যাইত। বাঙ্গালা দেশের কয়জন ধনীর আগারে, লোকে সংসারের ধন-জন ও আত্ম-গরিমাপ্রকাশক-কথার পরিবর্ত্তে, এরূপ ব্রহ্ম-কথা শুনিতে পাইয়া থাকেন? উত্তর-বঙ্গের উজ্জ্বল প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে!!

ইঁহার দানের কথা, পীড়িতের প্রতি করুণার কথা, আমরা কেমন করিয়া বলিব? মহিমারঞ্জনের সাহায্য স্পর্শ করে নাই, বঙ্গে এরূপ নিরাশ্রয় বিধবার গৃহ কয়টী আছে? ইদানীং নানা প্রকার ব্যয়বাহুল্যে দানের পরিমাণ কিছু সংক্ষিপ্ত হইলেও, কাকিনার ঘরের যেরূপ দান ছিল, বঙ্গের কয়টী জমিদারের ঘরে অদ্যাপি তদ্রূপ আছে? কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতই তাঁহার গৃহে বিমুখ হইতেন না। সুগ্রন্থকার মাত্রই তাঁহার সাহায্য লাভ করিতেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের বিলাত গমনের সাহায্য ইনিই করিয়াছিলেন। অগণিত ছাত্র তাঁহার কৃপায় শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছে। তাঁহার ধনে কত রোগী বাঁচিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইনি ভারতের ইতিহাসবিশ্রুত স্থানগুলি স্বয়ং পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছিলেন। স্থান-দর্শনজনিত অভিজ্ঞতার প্রতি তাঁহার এত শ্রদ্ধা ছিল যে,তিনি প্রতি বৎসর আপন কোষ হইতে সমগ্র ব্যয় দিয়া, আপনার আশ্রিত ও প্রজাবর্গকে দলে দলে, সুদূর দাক্ষিণাত্যে, গুজরাটে, বোম্বে, পঞ্জাবে পাঠাইয়া দিতেন এবং তাহারা ফিরিয়া আসিলে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল স্থানের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহা তাঁহার বাৎসরিক কৃত্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারই ব্যয়ে বিগত দিল্লিদরবারে, এই প্রবন্ধের লেখক, দিল্লিদরবার দেখিতে এবং আগ্রা, জয়পুর প্রভৃতি স্থান দর্শনে সমর্থ হইয়াছিল। ইহারই ফলস্বরূপ শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "দিল্লি-মহোৎসব-কাব্যম্", বিষয়-গৌরবে এত সমাদৃত হইতে পারিয়াছিল।

তাঁহার মহানুভবতা ও ঔদার্য্য আদর্শ-স্থানীয় ছিল। তাঁহার পরিজনবর্গ কেহই কোনদিন ইহাঁর ক্রোধ দেখিতে পায় নাই। ধনীরা প্রায়ই অসহিষ্ণু হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমাশীলতার তুলনা ছিল না। তাঁহার ন্যায় বাক্‌পটু ব্যক্তি বড় সুলভ নহে। যত গুরুতর জটিল বিষয়ই হউক্ না কেন, ইনি বহুক্ষণ ব্যাপিয়া সেই বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিতেন এবং লোকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ চাহিয়া থাকিত।

পিতৃভক্তি তাঁহার মত আমরা কম দেখিয়াছি। তিনি পিতার মত পিতা পাইয়াছিলেন। রাজা শম্ভুচন্দ্রের নামের সহিত কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তি অপরিচিত? শম্ভুচন্দ্রের কথা বলিতে বলিতে ইনি গদ্‌গদ হইয়া উঠিতেন। কোথায় কোন্ কালে, শম্ভুচন্দ্রের বৈদান্তিক শিক্ষাগুরু পরমহংস পরমানন্দ, সূক্ষ্মদেহের স্বরূপ সম্বন্ধে একখানি দীর্ঘপত্র সংস্কৃত ভাষায় শম্ভুচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন; সেই কীটদষ্ট পত্রখানি রাজা মহিমারঞ্জন অতিযত্নে প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত, পিতার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রক্ষা করিয়াছিলেন। গত মাঘ মাসে, সেই পত্রখানি, দেবনাগরে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবার জন্য, এই প্রবন্ধলেখক আদিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু হায়! সে পত্র অপরি-শোধিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে!

রাজা মহিমারঞ্জনের অভাবে বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহসা পূরণ হইবে বলিয়া আশা নাই।

এই মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটী পদ্য এস্থলে সংযোজিত হইল।:—

স্বরগে সুরেন্দ্র-ভবন ছাড়িয়া,
সুরেন্দ্র-দর্শিত-পথে,—
এসেছিলে এই মরত-ভবনে,
চড়িয়া পুষ্পক-রথে।
ভব-হিত-তরে, যেদিন হে নৃপ!
জনমিলে ভবে আসি,
কাঁদিল স্বরগে দেবতার কুল,
হাসিল মরত-বাসী ॥১॥
তুমি, বিবিধ-বিধানে, জীবের কল্যাণে,
সঁপিলে আপন প্রাণ,—
তুমি, কাতরে, আপন-হস্ত বাড়া'য়ে,
করিলে আশ্রয় দান।
করুণার স্রোতে ভাসাইলে ধরা।
বিপুল তোমার দান—
কত অনাথ দরিদ্রে, করিল রক্ষা,
বাঁচা'য়ে তাদের প্রাণ ॥২॥
মর্ম্ম-পীড়ায় হইয়া কাতর,
দগ্ধ-হৃদয় লইয়া,
নিত্য আসিত কত নর-নারী,
তোমার নিকটে ছুটিয়া।
মুহূর্ত্ত তোমার নিকটে বসিলে,
হেরিলে মূর্ত্তি তোমার,
দুঃখ-ক্লেশ, চিত্ত-দাহন—
থাকিত না কিছু আর ॥৩॥
তব, প্রতিভার তীব্র আলোক ছুটিয়া,
বঙ্গে করিল উজল;
তব, জ্ঞান-দীপ্ত ধর্ম্ম-কাহিনী,
ছুটিল চৌদিকে বিমল।
তুমি, ধ্যান-পূত চিত্তে নিয়ত,
ব্রহ্ম-অমৃত পানে—
নিত্য মগন থাকিতে হে নৃপ!
ব্রহ্মের জন্য [illegible] ॥৪॥
তুমি, আপনার ব্রত পর-উপকার—
করি ভবে উদ্‌যাপন,
সময়-অন্তে, কাঁদায়ে এ ভবে,
স্বর্গে করিলে আরোহণ!
তুমি নাই ভবে; ঐ দেখ চাহি,
নিবিড় তামস-রাশি—
ঢাকিয়া তপনে, ঢাকিয়া চন্দ্রমা,
ফেলিছে ধরারে গ্রাসি।
ঐ আর্ত্তনাদ, ঐ হাহারব,
দীনের চক্ষুর জল—
রোদন-ধ্বনির সহিত মিশিয়া,
প্লাবিতেছে ধরাতল ॥৫॥

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মানব সমাজ। (৪)

সমাজের প্রথম ও শেষ কথাই মানুষ এবং তাহার কর্ম্ম। মানুষ বলিতে সংখ্যা ও দেহ; এবং কর্ম্ম বলিতে দেহ ও মন;— এই কয়েকটী কথা সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।

সংখ্যা।—যে দেশে যে পরিমাণ লোক প্রতিপালিত হইতে পারে, তদপেক্ষা জন সংখ্যা কিছু অধিক থাকা উচিত। তাহা হইলে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা হয়; সুতরাং জনগণ শ্রমশীল, কৌশলী ও বুদ্ধি-বৃত্তিতে উন্নত হইয়া উঠে। দেশের প্রতি-পালনক্ষমতা অপেক্ষা জনসংখ্যা ন্যূন হইলে আহার্য্য বস্তু অপেক্ষাকৃত অনায়াসলভ্য হয়। তাহার ফলে জনগণ অলস এবং উদ্ভাবনী শক্তিহীন হইয়া উঠে। সুতরাং দেহ ও মন

উভয়ই কালক্রমে দুর্ব্বল হইয়া যায়। কিন্তু জনসংখ্যা ইচ্ছানুরূপ বৃদ্ধি করিবার উপায় কি? উপায় দুই প্রকার। এক প্রকার রুগ্ন, দুর্ব্বল, অল্পায়ু বংশজ ব্যক্তির অপত্যোৎপাদন না করা, অথবা যথাসম্ভব কম করা। দ্বিতীয় প্রকার, সুস্থ, সবল, এবং বহ্বপত্য দীর্ঘায়ু বংশজ ব্যক্তির অপত্যোৎপাদন করা। অপত্যের সংখ্যা এবং আয়ুঃ অনেক পরিমাণে বংশানুগত নিয়ম অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়। কোন বংশে অল্প সংখ্যক অপত্য হওয়াই নিয়ম, কোন বংশে অধিক সংখ্যক হইয়া থাকে। কোন বংশ অল্পায়ুঃ, কোন বংশ দীর্ঘায়ুঃ। কাহারও বংশ-পরম্পরাগত পীড়া আছে, কাহারও নাই। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক বিবাহ সংস্কার নিষ্পন্ন করা আবশ্যক। কিন্তু বিবাহক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া গেলে বিবেচনা করিবার স্থল থাকে না। এ নিমিত্ত সুস্থ সবল সচ্চরিত্রগণের পক্ষে, অর্থাৎ যাহাদিগের অপত্যোৎপাদন করা বিধেয়, তাহাদিগের পক্ষে, বিবাহক্ষেত্রের প্রসার অথবা বিস্তৃতি সাধন অত্যন্ত প্রয়োজন। যাহারা রুগ্ন, অবসন্ন, অর্থাৎ যাহাদিগের অপত্যোৎপাদন করা বিধেয় নহে, তাহারাও ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের পক্ষে বিবাহক্ষেত্রের প্রসার অপ্রসার সমান। তাহাদিগের ন্যায় সমভাবাপন্ন নরনারী যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া জীবন ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্বে বন্ধ্যত্ব (sterilization) সংঘটন করা উচিত। ইহাতে কোনই ক্লেশ নাই, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

জনসংখ্যা বিবেচনা করিতে আর এক কথা বিবেচ্য। বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর সংসর্গে অনেক সময় জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালী, মৈথিলী, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে অপত্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার আশা করা যায়। কিন্তু তাহারা কোন কোন অংশে উন্নত, এবং কোন কোন অংশে অনুন্নত। দেহ বিষয়েও কোন অংশে যোগ্য এবং কোন অংশে অযোগ্য হওয়া সম্ভব। কিন্তু একজাতীয়গণ মধ্যে, যথা রাঢ়ী, বারেন্দ্র মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, বিবাহ ক্ষেত্রের বিস্তৃতি হওয়ায়, অপত্য সংখ্যা এক দিকে যেমন বর্দ্ধিত, অপর দিকে অপত্যগণও পূর্ব্বাপেক্ষা সবল, সুস্থকায়, সুগঠিত হইতে পারে।

সংখ্যা সম্বন্ধে বলিতে গেলে জনগণের অবস্থার কথাও উল্লেখ করিতে হয়। দরিদ্র অবস্থার ব্যক্তিগণের অপত্য অধিক সংখ্যক হইয়া থাকে; এবং ধনিগণের অপত্য সংখ্যা অল্প। অবশ্য অতিরিক্ত মাত্রায় অর্থশালী হওয়া নানা প্রকারেই অমঙ্গলজনক। একথা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, সমাজের পক্ষেও তেমনই প্রকৃত। সমাজে ধনবিভাগ বেশী হইলে, কেহই অতিরিক্ত ধনবান হইতে পারে না। তাহা হইলে অপত্য সংখ্যাও আশানুরূপ হওয়া সম্ভব। বেশী দরিদ্রও নহে, এবং অতীব ধনবানও নহে, এইরূপ সমাজে জনসংখ্যা মোটের উপর উন্নত থাকিয়া যায়। তবে, কালক্রমে উহার হ্রাস বৃদ্ধি, উত্থান পতন অনিবার্য্য। সে দীর্ঘকালের কথায় এস্থলে আমাদিগের বেশী প্রয়োজন নাই।

বিবাহক্ষেত্রের বিস্তৃতির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। যাহাদিগের বিবাহ সামাজিক নিয়মের কঠোরতা বশতঃ নিষিদ্ধ অথবা দুঃসাধ্য, তাহাদিগেরও বিবাহ সুসাধ্য হওয়া

উচিত। ঐ সকল কঠোর নিয়ম বর্জ্জন করা উচিত। দৃষ্টান্ত স্থলে অতিরিক্ত পণ গ্রহণ এবং বিধবা বিবাহ নিষেধের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল সামাজিক দুরাচার জনসংখ্যা হ্রাস হওয়ার প্রবল কারণ। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই এ সকলের সংস্কার করা যায় না। ইহাদিগের মূল কারণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তৎপর তাহা প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত অন্যবিধ কারণের সমাবেশ করা প্রয়োজন। এতদ্দেশে সমাজ তত্ত্বের নিয়মানুসারে ঐ সকল দুরাচারের মূলানুসন্ধান করা হয় না, সুতরাং ফলও হয় না। যাহা হউক, জন সংখ্যার দিকে বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে সমাজ কোন মতেই পরিপুষ্ট থাকিতে পারে না। বহুবিধ পীড়া সমাজের জন সংখ্যা হ্রাস করিতেছে। তখন কি কর্ত্তব্য? বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ঐ সকল পীড়ার মূলানুসন্ধান করতঃ তাহার প্রতিবিধান করাই একমাত্র উপায়। তাহা না করিলে সমাজ উৎসন্ন হইবেই, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। কিন্তু কোন কোন সমাজে একটী অবৈতনিক মন্ত্রীত্ব পাইবার নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টা ও আগ্রহ দেখা যায়, এ সকলের দিকে তাহার শতাংশও দেখা যায় না। ইহারই নাম দেশবৎসলতা !!!

অকাল মৃত্যু ও জনসংখ্যা হ্রাস হইবার আর এক প্রধান কারণ, চিরাগত আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন। ইহাতে প্রাপ্তবয়স্কদিগের অপেক্ষা শিশুদিগের মৃত্যু অধিক হইয়া থাকে। শিশু-মরণাধিক্যের বহু কারণের মধ্যে বাল্যবিবাহও একটী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্দেশে বাল্য বিবাহিত নরনারীর প্রথম অথবা দ্বিতীয় সন্তান বোধ হয় অনেকেরই শিশুকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। শিশুগণই ভবিষ্যৎ বংশ। তাহাদিগের মৃত্যু সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ভবিষ্যৎ বংশ উৎসন্ন হইয়া যায়। এই সকল এবং আরও নানাবিধ বিষয় বিবেচনা করতঃ যাহাতে সমাজের জন সংখ্যা হ্রাস না হয়, তদ্রূপ ভাবে সামাজিক বিধি সকল প্রণীত ও প্রতিপালিত হওয়া উচিত। তাহা না হইলে সমাজ কখনও উন্নত হইতে পারে না; আর উন্নতি বন্ধ হইলেই অবনতির সূত্রপাত হয়, এ কথা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

দেহ।—দেহ সম্বন্ধে প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, দেহ গঠন প্রায় সম্পূর্ণ রূপে বংশানুক্রমের নিয়মাধীন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেহকে কিছু পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, কিন্তু এখন আর বংশানুগত বিধানের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইতে পারে না। কোন কালেই পারিয়াছে কিনা, তাহাও বিশেষ সন্দেহজনক। যাহা হউক, দেহ এখন প্রধানতঃ বংশানুগত। দেহের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও সবলতা যত্ন চেষ্টা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; কিন্তু সে অধিক নহে। তাহা হইলেও দেহের বল বিক্রম অকস্মাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেই পারে না, এ কথা বলিতেছি না। এখন আর ক্রম বিবর্ত্তনবাদের পূর্ব্ববৎ আদর নাই। অনেক উচ্চ শ্রেণীর জীববিজ্ঞানবিৎ* বিশ্বাস করেন যে, জীব অকস্মাৎ পূর্ব্ব পুরুষগণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক জ্ঞানে বিবর্ত্তিত হইতে পারে।† এ কথা সত্য

* Morgan, De Vries, Thomson etc. etc.

† The current belief assumes that species are slowly changed into new types. In contradistinction to this conception, theory of mutation assumes that new species and varieties are produced from existing forms by sudden leaps.

——Species and Varieties by Hugo De Vries P VIII.

হইলে দুর্ব্বল পিতামাতারও অকস্মাৎ অতিরিক্ত মাত্রায় সবল পুত্র কন্যা হওয়া অসম্ভব মনে করা যায় না। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত অধিক নহে। সচরাচর ও সাধারণতঃ বংশানুক্রমের নিয়মানুসারেই ফলাফল গণনা করিতে হয়। তাহা হইলে বংশদোষ অথবা বংশগুণ অপরিবর্ত্তিত থাকিলে অপত্যের দোষ গুণও অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যাইবে। অপত্য দুর্ব্বল, অবসন্ন হইতেছে; এরূপ স্থলে সবল ও উন্নত করিবার উপায় কি? উপায় দ্বিবিধ। প্রথম উপায় পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি—অর্থাৎ সুস্থ সবল বংশীয়গণের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন। এই নিয়ম বংশ পরম্পরায় প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ প্রথমতঃ যেরূপ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অবশেষে তাহা আর স্থির থাকে না। এতদপেক্ষা স্থায়ী সুফলপ্রদ উপায় এই:—যাঁহারা সুস্থ, তেজস্বী, পুষ্টদেহ, তাঁহারাই অপত্যোৎপাদন করিবেন; অন্যে করিবে না। একথাও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ হইলে বংশানুগত নিয়মানুসারে শুক্রশোণিতগত অবস্থার বিকাশ হইয়া স্থায়ী ফলের আশা করা যায়। কিন্তু এই উপায়ে যদি জনসংখ্যা হ্রাস হইবার উপক্রম হয়, তখন এই বিধির কাঠিন্য এবং অলঙ্ঘনীয়তা কিছু কমাইয়া দেওয়া উচিত। বিধি নিষেধ প্রণয়ন করিতে অবস্থানুসারে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। ফলতঃ বিবাহ বিধান ভিন্ন যখন অপত্যোৎপাদনের আর কোন বৈধ ও হিতকর উপায় নাই, তখন বিবাহ বিধি সকলের সংস্কারই একমাত্র ভরসা স্থল। যাহাতে সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ পুত্র কন্যা লাভ হয়, তদ্রূপ বিধান সকল রচিত ও পালিত হওয়াই চাই। নচেৎ সমাজ রক্ষা হইতেই পারে না।

আমি এইরূপ বলাতে কেহ যেন মনে করেন না যে, আমি সমাজকে একটা কলের মত নিয়মাধীনে চালাইতে চাই। মানব সমাজ (অথবা অন্য কোন সমাজই) কলের মত ইচ্ছানুরূপ পরিচালিত করা যায় না। সমাজ তত্ত্বের নিয়ম সকল দুর্লঙ্ঘ্য। কিন্তু যদি প্রযত্নের কিছুমাত্র ক্ষমতাও অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জীবতত্ত্বের ও সমাজ তত্ত্বের নিয়মানুসারে না চলিলে কোন সমাজই ধ্বংসের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। এতদ্দেশে বর্ত্তমান সময়ে যদি কেবল মাত্র বিবাহ বিধির সংস্কার উদ্দেশ্যে সমাজের অগ্রণিগণ মিলিত হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক নিয়ম সকল গঠিত করেন, এবং তাহা প্রতিপালন করেন, তাহা হইলেই সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করা হয়। এ কার্য্য যেমন দুরূহ, কর্ম্মীরও তেমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কেবল এই উপায়ে কর্ম্ম বিস্তৃতরূপে অনুষ্ঠিত হইবার আশা করা যায় না। ইহাতে ভাব বিস্তারের বিশেষ সহায়তা হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঞ্ছিত পথে সমাজকে পরিচালিত করিতে হইলে কতিপয় অগ্রণী ব্যক্তির, স্বীয় জীবনে, স্বীয় আচারে, তদ্রূপ পথ অনুসরণ করতঃ অপরকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এই দৃষ্টান্তই আদর্শ রূপে সমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যায়।

শ্রীশশধর রায়।

প্রেম ও প্রকৃতি।

প্রেম ও প্রকৃতি।—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম প্রণীত, সান্যাল প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য বার আনা। বাঙ্গালা কবিতার গতি এখন অন্য পথে হইয়াছে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র যে সুর আলাপ করিতেন, তাহা এখন আর শুনিতে পাওয়া যায় না। নূতন গায়কগণের আবির্ভাবের সঙ্গে নূতন সুর এক্ষণে আমাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু জানি না,প্রাচীনত্বের প্রতি আমাদিগের কেমন অনুরাগ, সেই পরিচিত সুর শুনিবা মাত্র আমাদিগের চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠে, উৎকর্ণ হইয়া আমরা আবার তাহা শুনিতে চাই। সেই জন্য আমরা নগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থখানিকে অনুরাগের সহিত পাঠ করিয়াছি। নগেন্দ্র বাবু আর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না,তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থখানি দেখিয়া মনে হয়, তিনি শিক্ষানবীশ নহেন; অভিজ্ঞের স্থান, অভিজ্ঞের সম্মান তাঁহার প্রাপ্তিযোগ্য।

প্রেম ও প্রকৃতি দশ সর্গে বিভক্ত কবিতা-গ্রন্থ। দুই একজন প্রতিষ্ঠাবান লেখক ভিন্ন এখন আর কাহারও কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যের বাজারে বিকায় না। এ সময় মুদ্রণ-সৌন্দর্য্যে এবং চিত্রমালায় বিভূষিত করিয়া নগেন্দ্র বাবু যে একখানি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অতিরিক্ত সাহসিকতার কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর কবিতানুরাগ এখনও একবারে যায় নাই, সুতরাং মনে হয়, প্রেম ও প্রকৃতির আদর হইবে।

প্রেম ও প্রকৃতির ভাষা অতি মধুর এবং আদর্শ অতি মহান। কি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনে, কি মানব চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণে, কি ভগবৎ প্রেমের উদ্দীপনায়,কবি সর্ব্বত্র তাঁহার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। একই ছন্দে আদ্যোপান্ত লিখিত হইয়াছে বলিয়া এবং একই ভাবের স্থানে স্থানে পুনরাবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া, গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠকের নিকট একটু নীরস বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার স্থানে স্থানে এরূপ পবিত্র ও গম্ভীর ভাবের সমবেশ আছে যে, পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। প্রেমই মানবাত্মার সর্ব্বস্ব, প্রেমই ভগবানকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়। কবির নিজের ভাষায় বলিতে হইলে "প্রেমই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম" এবং "প্রকৃতি প্রেমেই বিশ্বপ্রেম চিরসংস্থিত।" কবি উপাসকের ন্যায় প্রকৃতিকে আরাধনা করিয়াছেন। একদিকে হিমাচলের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গে ও পুরুষোত্তমের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ বেলাতটে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, এবং অপর দিকে, মালাবারের এলা লতা-স্নিগ্ধ তরুকুঞ্জের অন্তরালে,হরিদ্বারের কলকলনাদিনী ভাগীরথীর কূলে আসীন হইয়া তিনি তাঁহার প্রশান্ত মুখচ্ছবি দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন। প্রকৃতি তাঁহার নিকট মৃৎপ্রস্তরময়ী জড়শক্তি মাত্র নহেন, চিন্ময়ী দেবী। আর প্রকৃতির

অন্তরালে থাকিয়া যিনি তাঁহাকে রূপ-রস-গন্ধময়ী করিয়াছেন, সেই সঙ্গে কবি তাঁহারও সত্বা উপলব্ধি করিয়াছেন। সমালোচনায় কাব্যের মর্ম্ম প্রকাশিত করিবার আমাদিগের অভিপ্রায় নাই, পাঠক নিজেই তাহা অবগত হইবেন। কবির উদ্দেশ্য কি, তাঁহার লিখন প্রণালী কিরূপ, বুঝাইবার জন্য আমরা তাঁহার কাব্য হইতে দুই চারিটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া এই সমালোচনা শেষ করিব। কুমারিকা 'অন্তরীপে' নামক নবম সর্গের প্রারম্ভ এরূপ ;—

"ভারতের সীমা শেষ, কি বিচিত্র রম্যদেশ,
কি বিপুল বারিধির ভৈরব গর্জ্জন !
বিলোল নীলাম্বুরাশি সৈকত চুম্বিছে আসি,
কুমারিকা-অন্তরীপে বিমুগ্ধ নয়ন ॥"

মালাবারের বর্ণনা এইরূপ।—

"নারিকেল-কুঞ্জঘন বিকশিত ফুলবন,
সুন্দর শ্যামল কান্তি বনানী ছায়ায়,
জড়ায়ে পাদপদলে, লতিকা সোহাগে ঢলে
বিহগ কূজনে বসি কৌতুকে কুলায়।"

কিন্তু কবি কেবল প্রকৃতির বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ নহেন, তাঁহার প্রার্থনা এইরূপ—

"দেখাও প্রেমের ছবি হে বিশ্বের মহাকবি !
অমোঘ সাধন ফলে প্রেমের ঈশ্বর।
যে প্রেম-কণিকা পেয়ে রশ্মির রেখাটী ছেয়ে,
এই মর্ত্ত্যভূমি তব এতই সুন্দর ॥"

তাঁহার প্রেমের আদর্শ কিরূপ, তাঁহা নিম্নের কবিতায় ব্যক্ত হইবে ;—

"প্রেমিক প্রমিকা হও, দুঃখে রও সুখে রও,
প্রেমের সাধনা জেনো নিষ্কাম সাধনা ;
ত্যজ সুখ, ত্যজ আশা, ভাঙ্গ বাসনার বাসা,
মর-তৃষা নহে প্রেম—ভবের যাতনা ॥"

প্রেমের তৃপ্তি সম্বন্ধে ;—

"সে আশা ক'রনা ভবে, ভাগ্যে থাকে ভোগ হবে
নিবৃত্তিতে প্রবৃত্তির তৃষা কত দূর।
কঠোর সাধনা দুঃখে, আজন্ম ব্যথিত বুকে,
প্রেমের লুকান মূর্ত্তি মধুর মধুর !"

প্রকৃতির নিকট তাঁহার এই প্রার্থনা সফল হউক।

"প্রাণে ঢালিয়াছ সুধা মিটেছে আত্মার ক্ষুধা,
জনমের চির দুঃখ চির অবসান ;
জগতেও এই মত, ঢালি শান্তি অবিরত,
জুড়াও বিশ্বের দেবি, বিদগ্ধ পরাণ।"

কবি দীর্ঘজীবী হউন, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে এইরূপে প্রকৃতির আরাধনা করিতে থাকুন। তিনি এইরূপ কবিতা লিখিতে থাকুন। বাঙ্গালা ভাষার উপকার হইবে। "কাল নিরবধি পৃথ্বীও বিপুল।" যাঁহারা তাঁহার "সমান ধর্ম্মা", তাঁহারা তাঁহার কাব্যের সমাদর করিবেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

বাসন্তী-গীতা।

ভূমিকা।

বসন্ত প্রাণময়ের প্রেমনিশ্বাস। বিপুল বিশ্ববংশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে নিশ্বাস আপূরিত হইয়া ঐকতানে পরিস্ফুরিত। সেই ঐকতান সংগীতের তরলিত মর্ম্মোচ্ছ্বাস অশ্রু রূপে পরিণত। প্রেম, সঙ্গীত ও অশ্রুর অভি-

ব্যক্তি সৌন্দর্য্য। ফুল, জ্যোৎস্না, কলকণ্ঠ প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের বিকাশ মাত্র। চারুবিকশিত প্রেমবৈচিত্র্যের অশ্রুময়ী সংগীত-মাধুরী এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়ীভূত, এই জন্য ইহার নাম বাসন্তী-গীতা রাখা হইল।

আভাস।

অনন্ত প্রসারিত অন্ধকার,—অপার, অগাধ, অনালোক-বিচ্ছুরিত সূচিভেদ্য অন্ধকার। ভীমশূন্য ঘননিবিড় তমঃপুঞ্জের গম্ভীর সত্তায় পরিপূর্ণ। অসীম রহস্যাধার শাশ্বত নভোমণ্ডল ধ্যানস্তিমিত সৌম্যমূর্ত্তি তাপসবৎ নিস্পন্দ, নীরব। বিশ্বপ্রপঞ্চ মাতৃকুক্ষিস্থ ভ্রূণ শিশুর ন্যায় গাঢ় যোগনিদ্রাভিভূত;—অবিক্ষুব্ধ, প্রশান্ত;—নিশ্চল, নির্জ্জীব; কিন্তু বিকাশোন্মুখ, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, পূর্ণকলেবর—যেন ফুট ফুট হইয়াছে, অথচ ফুটিতেছে না।

অবতরণ।

দূরে—স্বপ্নময় দিগন্ত কোলে—প্রীতিমন্দাকিনীর কবিতাময় তীরভূমে—তিমির যবনিকা উদ্ঘাটিত করিয়া বিশ্বপ্রাণের প্রেমনিশ্বাস প্রবাহিত হইল। সেই শীতল, স্নিগ্ধ, পীযূষনিস্যন্দী নিশ্বাস-স্পর্শে নিদ্রিত বিশ্বের বিশাল দেহে সর্ব্বাঙ্গীন রোমাঞ্চ হইল। কবি কল্পনা-বিহারিণী প্রমদার শিরীষ-কোমল পদপল্লব-তাড়নে কাব্যকাননের অশোক বিকাশের ন্যায়, বৃন্দাবনবিলাসিনী চারুচঞ্চলা রূপসী রাই বিনোদিনীর তরল বিলোচন সম্পাতে নীলোৎপলবনবিলসনের ন্যায়, সেই নিশ্বাসের উদ্বোধনী শক্তি প্রভাবে নিমেষে অনন্ত আকাশের স্তরে স্তরে অসংখ্য হসিতচ্ছবি জ্যোতির্ম্ময় সৌরজগৎ ফুটিয়া উঠিল। মৃদুসঞ্চারী নবপবন-হিল্লোলে প্রকৃতির শ্যাম অঙ্গে তরঙ্গের পর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। পুষ্পবধূগণ হরিৎপল্লব-শোভিত লতাবিতানের অন্তরালে অপূর্ব্ব রূপমাধুরী প্রস্ফুটিত করিয়া প্রেমের বিপণী খুলিয়া দিল। আর সেই ফুল্ল-কুসুম-সুরভি-সম্পৃক্ত ধীর সমীরচুম্বিতা অস্ফুটকলনাদিনী স্রোতস্বিনীর ঐকতানে সুর মিশাইয়া বনবিহঙ্গিনী কলকণ্ঠে তান পূরিল।—পৃথিবী হইতে অগণিত প্রাণিবৃন্দের আনন্দ কোলাহল বিমান পথে উত্থিত হইয়া সেই ভূমা মহান্ সচ্চিদানন্দের বিজয় মহিমা উদ্ঘোষিত করিল। অন্তরীক্ষ সেই বিজয় ঘোষণার দুন্দুভিনাদে দিগদিগন্তর আলোড়িত ও প্রতিধ্বনিত হইল। ভূলোক, দ্যুলোক সমস্বরে প্রেমময় সর্ব্বেশ্বরের গৌরবানুকীর্ত্তন করিয়া গাত্রোত্থান করিল, এবং শূন্যবক্ষে নিয়ন্ত্রিত কক্ষে প্রধাবিত হইয়া তাঁহার আরতি, স্তুতিবন্দনা ও সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিতে প্রবৃত্ত হইল।—বসন্তের সুধাময় নিশ্বাস স্পর্শে চরাচর অমৃতের অধিকারী হইয়া নব জীবন লাভ করিল।

প্রেমস্ফুরণ।

বসন্তের আবির্ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের স্ফুরণ,—বসন্তের সঞ্জীবন হিল্লোলে বিশ্বমালঞ্চে অস্ফুট আভাসপূর্ণ তমোময় পূর্ব্বরাগের পর বিনোদ-মাধুরী-বিলসিত জ্যোতির্ম্ময় অনুরাগের সঞ্চার ও বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সম্মোহন বিকাশ,—এই জন্য বসন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, ইহার তিরোভাবে নিখিল ভুবনের প্রলয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রেমের পূর্ব্বসূচনা। প্রাণিজগতে স্বতঃপ্রণোদিত আত্মবিনিময় বা প্রেমের স্বাভাবিক অধিষ্ঠান, সেইজন্য বসন্তের আবির্ভাব প্রেমের অবতরণ,—প্রাণময় বসন্ত প্রেমের অগ্রদূত ও পুরোহিত, বিশ্বরঙ্গালয়ের অন্তরালবর্ত্তিনী প্রচ্ছন্ন প্রেমশক্তির দৃশ্যমান লীলাভিনেতা। মর্ত্ত্য বসন্তের লীলা কানন, কিন্তু বসন্ত অপার্থিব। যেমন পৃথিবী

জ্যোৎস্নার ক্রীড়াভূমি হইলেও জ্যোৎস্না পার্থিব পদার্থ বিশেষ নহে, চন্দ্রের জ্যোতি মাত্র, তেমনই, বসন্তও অপার্থিব,—পৃথিবী ইহার লীলাস্থলী মাত্র। যে দেশের ফুলগুলি চির-অম্লান,—ফুটে কিন্তু ঝরে না, যে দেশের চাঁদ চির-স্বপ্রকাশ,—উঠে কিন্তু মরে না, শুধু অন্তহীন, অবিমিশ্র, নিরবচ্ছিন্ন সুখ সৌন্দর্য্য খেলিয়া বেড়ায়, বসন্ত সেই জ্যোতির্ম্ময় দেশের অধিবাসী, মর্ত্ত্যে দিব্য সুষমার উৎস রূপে, প্রতিভাত। মর্ত্ত্য ও স্বর্গ—অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ—যে অচ্ছেদ্য প্রেমডোরে বাঁধা, মর্ত্ত্যে বসন্ত সেই প্রেমের স্ফূর্ত্তি। কাব্যজগতে কোকিলের সুর সেই প্রেমের পঞ্চম, শিশির সেই প্রেমের অশ্রু, মলয়ানিল সেই প্রেমের স্নিগ্ধ শ্বাস, নৈশ গগনে দিগন্তব্যাপি সঙ্গীত-ময় মাধুর্য্য সেই প্রেমের জীবন্ত ভাবলীলা। বসন্তে অন্তঃপ্রকৃতির প্রেমাভিসার। এই প্রেমাভিসারের উন্মাদিনী শক্তি প্রভাবে প্রেমিকপ্রাণ অধীর হইয়া অনন্ত অতৃপ্ত অগস্ত্য পিপাসার শান্তির জন্য অবলীলাক্রমে আত্ম' বিক্রয় করে। প্রেমব্যাকুলতা যখন অন্তর্মুখীন হইয়া সারসত্বাতে সম্মিলিত হইতে অশক্ত হয়, ভ্রান্ত প্রেমিক তখন আত্মার উপ-মিত ছায়াতে আসক্ত হইয়া পড়ে, সেই জন্যই Narcissus স্বচ্ছসলিল দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া প্রেমে মুগ্ধ হইয়া-ছিলেন। যখন আত্মার ছায়াও অন্তশ্চক্ষুর বিষয়ীভূত হইল না, তখনই Pygmalion হৃদয়-নিহিত সৌন্দর্য্য রাশি স্বহস্ত-নির্ম্মিত প্রতিমাতে প্রতিফলিত দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন।

বসন্তে বাহ্য প্রকৃতির বাসক সজ্জা। নিশীথে শুভ্রবসনা কৌমুদীর বিমল উৎসঙ্গে ঘুমন্ত জগৎ, আর সুপ্ত জগতের শ্যামবক্ষে ঘুমন্ত কৌমুদী—কেমন অভিন্নভাব, কি অলৌকিক নেশা! এমন মাখামাখি, এমন কোলাকুলি, এমন মেশামেশি, হৃদয়ে হৃদয়ে এমন গাঁথাগাঁথি, আত্মার এমন আত্মোৎসর্গ, স্বাতন্ত্র্যের এমন নির্ব্বাণ, একত্বের এমন আহুতি, এমন মদবিভোর, পবিত্র, স্বর্গীয় প্রেম কে কোথায় দেখিয়াছ? এ প্রেম বাসন্ত্য প্রেমের ছায়া বা উপছায়া মাত্র। ব্রজলীলায় বিশ্বরূপিনী রাধিকা সে প্রেমের মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি, গোকুল সে প্রেমের লীলাভূমি, বৃন্দাবন সে প্রেমের কেলিকুঞ্জ।

প্রেম ধর্ম্মবন্ধন বা যোগের আরম্ভ ও সোপান,—যোগে প্রেম অঙ্কুরিত ও ক্রমবিক-শিত, যোগেই প্রেম মুকুলিত, পল্লবিত ও মুঞ্জরিত, যোগেই প্রেম অনন্তদলে মাধবী-মাধুরীতে পূর্ণ কুসুমিত। যোগ ও প্রেম চিরন্তন একই গ্রামে সুর বাঁধা,—সেইজন্য বসন্ত যোগী, প্রকৃতির নিভৃত অন্তঃপুরে মনোজ্ঞ তপোবন সাজাইয়া সমাধিমগ্ন বসন্ত যোগানন্দরস উপভোগ করে। বিরহে এই প্রেমযোগ সম্যক্ স্ফুটিত, সেই জন্য বসন্তে, ব্রজবধূর প্রেমলীলায় বিরহ। এই প্রেম অপরাহ্নের ছায়ার ন্যায়,—সর্ব্বব্যাপক, বিশ্ব-গ্রাসী, অনন্তপ্রসারী। সার্ব্বভৌমকতা প্রেমের প্রাণ, সেইজন্য বসন্ত গৃহত্যাগী বাউল, বিশ্ববাসী উদাসীন, সন্ন্যাস ধর্ম্মের শিক্ষা-গুরু, বৈরাগ্য, উদারতা ও আত্মবিতরণের অবতার।

৪

সঙ্গীতোচ্ছ্বাস।

বসন্তের প্রেমলীলা-রহস্যে প্রাণ বিনিময় সংগীতসূত্রবাহী,—প্রেমিকপ্রাণের কথোপ-কথন ও উত্তরপ্রত্যুত্তর, প্রেমিক হৃদয়ের ধ্বনি প্রতিধ্বনি ও দেখাসাক্ষাৎ সংগীতেই সম্পন্ন হয়। সংগীত প্রেমিকপ্রাণের ঝঙ্কার,

প্রেমিক হৃদয়ের তাড়িত বার্ত্তাবহ ও Open Sesame, প্রেমচক্রের কেন্দ্রাভিকর্ষণীশক্তি। সেই জন্য প্রেমের প্রবাহে ও পরিণামে সংগীত। বসন্ত সঙ্গীতের আচার্য্য। সুকণ্ঠের কলকণ্ঠ সেই উদ্দাম, উদ্ভ্রান্ত, অবিরামগুঞ্জরি সঙ্গীতের অব্যক্ত প্রতিধ্বনি মাত্র। গিরিকন্দরবিহারিণী শৈবলিনী উর্ম্মিবক্ষে যে অস্ফুট শ্রুতিবিনোদন কলস্বনে সাগরসঙ্গমে বহিয়া যায়, উদাসী মলয়ানিল যে সুললিত গাথা গাহিয়া আকুল প্রাণে বনে বনে বিচরণ করে, শ্যামপত্রাবগুণ্ঠিতা কুসুমরূপসী যে মধুর নীরব সুরভিসম্ভারসিক্ত সঙ্গীতে কুঞ্জকানন প্লাবিত করে, বসন্ত সে সঙ্গীতের পূর্ব্বধ্বনি। প্রতিধ্বনি পূর্ব্বধ্বনির পরিচায়ক,—যেখানে প্রেম সেখানে সঙ্গীত। সঙ্গীত প্রেমের রূপান্তরিত নামান্তর মাত্র,—সেইজন্য বিশ্বপ্রেমরাজ্যে বসন্ত বিপুলবিশ্বফনোগ্রাফের সঙ্গীতসমষ্টি। এই প্রাণকাড়া সঙ্গীতে প্রাণীর প্রাণিত্ব বিলোপ হয়, চরাচর আত্মহারা হইয়া, নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া—সেই এক ভুবনভুলান, মোহন, জীবন্তসঙ্গীতে লয়প্রাপ্ত হয়। এই আত্মবিলোপ যখন হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন পাখী আর পাখী থাকে না, একটী চিত্তহারী ঝঙ্কার, একটী ভ্রমণশীল অশরীরী বাণী, অথবা একটী জীবন্ত অদৃশ্য প্রহেলিকা বলিয়া অনুভূত হয়, অসেচনক সুকুমার শিশুটীকে প্রেমলীলাম্বিত অস্ফুটকাকলি ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না, তরুলতা সঙ্গীতের এক একটী উন্মাদক সুরে পর্য্যবসিত হয়। এইখানেই বসন্তের পরিণাম, প্রাণের বিলয়, প্রেমের সমাধি।

অতীন্দ্রিয় খুলিয়া দেও। একবার পূর্ণেন্দুকিরীটিনী নক্ষত্রকুন্তলা মাধবীযামিনীর দিগন্ত প্রসারিণী ভুবন উজলা সৌন্দর্য্যছটার দিকে একটু অবহিতচিত্তে দৃষ্টিপাত কর। দেখ নীরব, নিস্তব্ধ, সুষুপ্ত গগনপটে সুধাংশু মদালসমন্থর গতিতে ছুটিয়া যাইতেছে, দিগ্‌-দিগন্ত প্লাবিত করিয়া জ্যোৎস্নার স্রোত বহিতেছে; সেই উচ্ছ্বসিত চন্দ্রকিরণের স্নিগ্ধ হিল্লোলে ব্রহ্মাণ্ডকে প্রেমোন্মাদে অস্থির করিয়া তুলিতেছে; সমীরণ মৃদু মধুর লহরী সঞ্চালন করিয়া বিশ্বপ্রেমকোলে একটুকু সোহাগ মিশাইতেছে;—কি যেন একটা সৌন্দর্য্যের কুহকমাখা ঐন্দ্রজালিক মায়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই নিঝুম নিশীথে সুদূর কাননবিবর আপূরিত করিয়া কি একটা অব্যক্তনাদী কলবিহঙ্গম-কণ্ঠবৎ মধুর, মনোমোহন, উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইল,—নিখিলপ্রকৃতি সেই জাগ্রত জীবন্ত সঙ্গীতে সাড়া দিল, জ্যোৎস্না বৃক্ষচ্ছায়ার সহিত জড়াজড়ি করিয়া নবশষ্পখচিত সেই কাননপ্রান্তের শ্যামশয্যায় ঘুমাইয়া পড়িল,—চতুর্দ্দিকে পাখীরা সমস্বরে উলুধ্বনি করিল, ফুলেরা বিচিত্র মাল্য রচনা করিয়া ফুটিয়া উঠিল,—আর পবন সেই বিকচবনপ্রসূনরাজির সুরভিভার ছড়াইয়া দিগঙ্গনা সহচারিণী নিশীথিনীর তারকাহীরকমণ্ডিত বেণীবিনাম্বিত চিকুরদামে পরিমল-পরিপ্লুত কুসুমরেণু মাখাইয়া দিল এবং রজতকৌমুদীপ্রফুল্ল প্রেমোৎফুল্ল ব্রহ্মাণ্ডের প্রীতিগাথায় সুর বাঁধিয়া সৌগন্ধমদিরায় বিভোর হইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ছুটিয়া গেল। এই কাননোত্থিত সুরকণ্ঠনিঃসৃত সংগীতে, এই মনোমোহন বাঁশীর স্বরে, প্রাণের নিভৃতনিরালে, ভাবপুঞ্জের লীলাভূমে, কেমন একটুকু ছায়ারূপী আবেশময় ভাবের মদিরা ঢালিয়া দিল, প্রাণ আর ঘরে থাকিতে চায় না, পাখা বাঁধিয়া উড়িয়া উড়িয়া আকাশের কোলে, পাখীর খোলে,

তটিনীর কলস্বনে, ঐ জোছনার প্রাণে মিশাইয়া যাইতে চায়। ঐ যে বাঁশীর লীলাময়ী স্বরলহরীর পেছনে কি'একটা তানলয়সংযুক্ত বাঙ্ময় সংগীতের মত অস্ফুট আধ আধ সুর উঠিতেছে, আকুলপ্রাণ দেহ ছাড়িয়া সেই মোহময় আবিলতাজড়িত সঙ্গীতসুরের পিছু পিছু ছুটিয়া দুরদিগন্তের পারে কোথায় কোন্ সৌন্দর্য্যরাজ্যের প্রান্তদেশে হারাইয়া যাইতে চায়। বুঝি ঐ মুরলার আবেশময় স্বরে—ঐ প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতের স্বপ্নময় ঘুমঘোরে,প্রকৃতিরূপিণী প্রেমময়ী রাধা কুলত্যাগিনী,গৃহত্যাগিনী হইয়াছিল! আজিকার এই উৎসবময় নিশীথে সৌন্দর্য্যের কাম্যকাননে, জড়ে জড়ে, চেতনে অচেতনে, ইন্দ্রিয়ে অতীন্দ্রিয়ে কি একটা মধুর সামগ্রীর আদান প্রদান চলিয়াছে। ঘোমটা খুলিয়া ফুলবনিতারা প্রাণ ভরিয়া বুকের মধু পিয়াইতেছে, গুঞ্জোন্মত্ত মধুকর সেই মঞ্জুকুঞ্জে গুণগুণিয়ে ফুলমধু লুটিয়া লইতেছে। বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই, অথচ নীরবে প্রেমালাপ চলিয়াছে,—প্রেমালাপ এই ভাবেই চলিয়া থাকে। প্রেমালাপ মুখে নয়, বুকে; ভাষায় নয়, ভাবে। একটুকু স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল হাসিতে, একটু স্নিগ্ধ, পবিত্র চাহনিতে, দুই এক ফোঁটা সরল, অকৃত্রিম অশ্রুপাতে হৃদয়ের কত রাশি রাশি কথা ফুটিয়া পড়িয়াছে, ভাষায় তা ফুটাইতে পারে নাই। প্রেমিকের চাতকতৃষাবিস্ফারিত নয়ন, চকোরীর চন্দ্রিকালোলুপ চক্ষু, আকুলবক্ষের কাতর আর্ত্তনাদে মুখরিত। মানুষের ভাষা তো নিরেট প্রতারক, অতি চতুর প্রবঞ্চক; মনের প্রকৃত ভাব গোপন করার, কেমিকেল প্রেমে—গিল্‌টির আবছায়ায়—লোক ভুলাইবার এমন সহজ সঙ্কেত আর নাই, আত্মপ্রবঞ্চনারও বুঝি আর এমন অপরূপ কৌশল নাই। মানুষের ভাষা প্রেমপথের বিষম পরিপন্থী। প্রেমালাপ এই ভাষায় চলে না, তাই মনের একটা স্বতন্ত্র, নীরববাগ্মিতাপূর্ণ ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে। এ ভাষা আত্মঘাতী বা পরহন্তারক নহে, ইহা মরণের ভাষা নহে, জাগরণের ভাষা,—নীরব, অথচ কথনশীল, প্রেমসমাচারঅঙ্কিত, উদ্বোধনী ভাষা। এই ভাষার বৈদ্যুতিক প্রভাবে বধিরতা দূর হয়, মানুষ Pythagorasএর ন্যায় জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সঞ্চরণে অতিজাগতিক সঙ্গীত শুনিতে পায়। যে ভাষায় অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটীর কথায় দু-রকমের সুর নাই, আজ এই মধুযামিনীতে সেই ভাষায় প্রেমালাপ চলিয়াছে। Orpheusএর বীণার ঝঙ্কারে যে মদিরাময়ী ভাষা শুনিয়া তরুলতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নাচিতে নাচিতে স্বস্থান হইতে বিচলিত হইত,—গোপেন্দ্রনন্দন ব্রজদুলালের বেণুধ্বনিতে যে ঐন্দ্রজালিক ভাষা শুনিয়া ধেনুবৎস গোষ্ঠে ফিরিয়া যাইত, লীলারসময় শ্যামচাঁদের সপ্তরন্ধ্র মোহন বংশীর বিনোদবাদনে যে কুহেলিকাময় ভাষা শুনিয়া উচ্ছলিত যমুনাবারি উজান বহিত,—Amphion এর বীণানিস্বনে যে চিত্তবিমোহিনী ভাষা শুনিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রস্তরশ্রেণী Troyএর প্রাচীর সংগঠিত করিয়াছিল,—রাখালশশী বনমালীর মুরলীবিলাসে যে উদ্বোধনী ভাষা শুনিয়া বৃন্দাবনে—রাসরসেশ্বরীর সেই মুকুলযৌবনের লীলাকাননে—এককালে ষড়ঋতু সমুপজাত হইত, আজ সেই অলৌকিক ভাষাহীন ভাষায় কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। এই নীরব ভাষা সংগীতের মুকুটমণি,—কথনশীল ভাববৈচিত্র্যের সম্মোহন স্ফুরণ,—প্রাণের আবিল তরঙ্গলীলার মর্ম্মস্পর্শী আকুল আর্ত্তনাদ! এই সঙ্গীত নিত্যরাবী, অবিধ্বংসি। তাই এখনে

স্বরমূর্চ্ছনা তারে যুগযুগান্ত-উচ্চারিত সামগানের অস্ফুটরাগিণী শুনিতে পাওয়া যায়, অতীতের কত বিষাদছায়ামণ্ডিত ক্ষীণপ্রতিধ্বনি আমাদের প্রাণের অন্তস্তল আলোড়িত করে, অদৃষ্টের পূর্ব্বাভাস ও লুপ্তস্মৃতির জাগরণ হৃদয়কন্দরে অনুভূত হয়,স্বপ্নে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, বিশ্ববিধানের স্বরবিকাশ নিগূঢ় প্রেমালাপে প্রতি আত্মায় আত্মায় উদ্বোধন-কার্য্য সম্পাদন করে। এই প্রেমপ্রসঙ্গে বা প্রাণবিনিময়ে ব্রহ্মাণ্ডটা একটা সৌন্দর্য্যের পণ্যবীথিকা, সঙ্গীত ইহার ভিত্তি ও গ্রন্থী,—অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অন্তরে অন্তরে স্রোত বাহিয়া চলিয়াছে। এই যে সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্ত প্রেমবিপণী ব্রহ্মাণ্ড, সঙ্গীত ইহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে একটা অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সঙ্গীতের মাধ্যাকর্ষণে ব্রহ্মাণ্ড ছিন্নবৃন্ত, ভ্রষ্টলক্ষ্য হয় না। সঙ্গীত সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া স্তরে স্তরে, পরতে পরতে,গুচ্ছে গুচ্ছে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। ইহা চিরন্তন, অবিকৃত ও মৃত্যুহীন। জলধির কল্লোলে কল্লোলে এখনও Saphoর শোকগাথা Phonograph-ধৃত সঙ্গীতবৎ শুনিতে পাওয়া যায়, বাঁকা শ্যামের বাঁশরীর গান এখনো আভীর পল্লীর হাওয়ায় মিশিয়া রহিয়াছে, ত্রিবেণীর ঘাটে অসংখ্য আর্ত্ত নরনারীর কত যুগযুগান্তরের আকুল আর্ত্তনাদ এখনো প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, জন্মদুঃখিনী জননীর সকরুণ বিলাপধ্বনি বুঝি আজিও অশোককাননের তরুশাখে বাঁধা রহিয়াছে, যমুনাপুলিন বুঝি এখনো মুরারিমোহনের কথা মনে করাইয়া দেয়, একটা মাথুর শুনিলে প্রাণ কি একটা অজানা পুলকে পুরিয়া শিহরিয়া উঠে,—অতীতে বর্ত্তমানে, মৃতে জীবিতে কেমন মধুর দেখা সাক্ষাৎ হয়। সঙ্গীত প্রাণের কি সুন্দর বাহন! সঙ্গীতে আরোহণ করিয়া প্রাণ কত পুণ্যতীর্থে বিচরণ করে, কত কুসুমসুবাসের আঘ্রাণ লয়, কত রমণীয় দৃশ্য, কত কমনীয় দ্রব্য সন্দর্শন করিয়া বিমল আনন্দ রস উপভোগ করে! হায়, কেন সহসা এই রুদ্ধবক্ষোনিহিত স্মৃতির সমাধি উদ্ঘাটিত হইল!—মনে পড়িল আমার পুরাকালের কুসুমজীবনের কথা। সেই মধুর জীবন-বসন্তে আমার একটী কোকিলবন্ধু ছিল, এই ক্ষুদ্র প্রাণটার যখনই উড়িবার ইচ্ছা হইত, তখনই তাহাকে তাহার সুললিত স্বরলহরী বিস্তার করিতে বলিতাম, আর আমার পিক-সখা ভাববিহ্বল হইয়া যাই সঙ্গীতে তান ধরিত, অমনি প্রাণবিহগিনী উন্মাদিনী হইয়া সেই সঙ্গীতে চড়িয়া জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিত এবং আকাশের মুক্তবায়ুতে উধাও হয়ে কোথায় কোন্ সুরপুরে যাইয়া অনন্ত সঙ্গীত-সিন্ধুতে ডুবিয়া হারাইয়া যাইত। সঙ্গীতের কি অপরিসীম শক্তি! বুঝি তাই ঋষিগণের নিকট দৈববাণী হইয়াছিল "গানাৎ পরতরং নহি।" এই সঙ্গীত-শ্রুতি রূপ দর্শনের পূর্ব্বগামী। বৈষ্ণব কবিগণের অমর পদাবলী শ্রবণ করিলে সমস্ত বৃন্দাবন দৃশ্যাবলী আসিয়া চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সঙ্গীত অতি সহজেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এই যে ফুল, এই যে জ্যোৎস্না, এই যে স্ফুট-নক্ষত্ররাজি আকাশমণ্ডল,—এ সকলই ঘনীভূত সঙ্গীত মাত্র। এই সঙ্গীতে ফুলবাস ও নক্ষত্র কিরণে স্বর্গে মর্ত্ত্যে কথাবার্ত্তা চলে,—এই সঙ্গীতে মেঘমালা আকাশ বাহিয়া কে জানে কোথায় ছুটিয়া যায়,—বুঝি নক্ষত্রেরা বাঁশী বাজাইয়া ডাকিয়া লইয়া যায়,—এ সঙ্গীত প্রেমের রাখীবন্ধন। কোকিলের ঝঙ্কার, ফুলের পাপড়ি, বসন্তের স্ফূর্ত্তি,

প্রাবৃটের সেই "মেঘদূত"—এ সঙ্গীতের এক একটী মোহন সুর। তাই কবি সেই গম্ভীর, পবিত্র দিনে,—যেদিন কালের করাল চুম্বনে দেহকুসুমিকা ঝড়িয়া পড়িবে,সেই মৃত্যুদিনে, ইহ পরকালের সন্ধিস্থলে একটী ফুল দেখিয়া মরিতে চাহেন, অথবা swan পাখীর ন্যায় সঙ্গীত-কণ্ঠে পরলোকস্থ হইতে ইচ্ছা করেন। প্রেমের পরিণতি এই সঙ্গীতসুরে। সেই জন্য Echo অশরীরী হইয়া এখনো আকুল প্রাণে প্রতিধ্বনি করিয়া বেড়ায়, নিরাশ প্রেমে Echoর দেহ শুকাইল বটে, কিন্তু সঙ্গীতাত্মক যে প্রাণ, তাহা এখনো বনে প্রান্তরে, অচলে গহনে,বাপীতটে, শৈবলিনীর সিকতাময় পুলিনে,—যেখানে সেখানে—তরুলতা কাঁপাইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যায়।

সঙ্গীতের বাড়ী স্বর্গে—মর্ত্ত্যে সেই সুরলোক হইতে অবতারিত। তাই এখানে দেবাদিদেব ত্রিলোচন তাহার প্রবর্ত্তক। ভোলা মহেশ্বর শিঙ্গা ফুকাইয়া শ্মশানে শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়ান,—কারণ শ্মশান আধ্যাত্মিকতার অন্তিম পীঠস্থান, পার্থিব জীবনের শেষ লীলাবাস, শোকদুঃখের সমাধিক্ষেত্র, ইহ পরকালের সেতুবন্ধ, স্বপ্নময় ভবিষ্য জীবনের তীরভূমি ;—শ্মশানে না গেলে মানুষ সঙ্গীতের মাধুর্য্য, সঙ্গীতের স্বর্গীয় ভাব ভাল করিয়া বুঝে না, সঙ্গীতকে স্থায়ীভাবে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারে না, চোখের সম্মুখ দিয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া কি জানি কোথায় লুকাইয়া পড়ে, প্রাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। এই অনন্ত জীবন ও অনন্ত মরণের রাজ্যে আমাদের জীবন-শ্মশানে প্রেমময়ের উথলিত আহ্বান-সঙ্গীত আমাদের জাগরণের জন্যই নিরন্তর নিনাদিত হইতেছে। এই সঙ্গীতই মহিম-পললগ্ন ঘণ্টারব। মৃত্যুর অর্থ আর কিছুই নহে,—পৃথিবীর লীলাখেলা এড়াইয়া সেই জ্যোতিঘন সঙ্গীতাত্মক প্রাণ বা প্রাণাত্মক সঙ্গীতে উদ্বুদ্ধ, পরিণত ও লীন হওয়া মাত্র। সসীমের অসীমে মিলন, সাকারের নিরাকারে অবসান, শরশয্যার বাসর শয্যায় সমাপ্তি, মৃন্ময়ের চিন্ময়ে পরিণতির নামই মৃত্যু। ইহা অমৃতেরই সোপান। ইহাই যোগীর যোগ, তাপসের তপোধন ও সমাধি,ভক্তের ভাগবত সিদ্ধি, কবি কল্পনার পরিণামকুঞ্জ, ধর্ম্ম ও দর্শনের চরম তীর্থ। ইহাতেই দ্বৈতবাদীর তত্ত্বমসি, ইহাতেই বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদীর সর্ব্বোচ্চ সাধনার সোঽহং।

৫

অশ্রুমাধুরী।

মিলনের এই মহাতত্ত্বে অশ্রুর সুরময়ী পূর্ণমূর্ত্তি নীরবগুণ্ঠিত। অশ্রুই পার্থিব প্রেম-সঙ্গীতের পূর্ণবিকাশ ও পর্য্যবসান। এই বিকাশে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিশদরূপে পরিস্ফুট হয়, কারণ অশ্রুসিক্ত প্রেমই সৌন্দর্য্যের পূর্ণনিলয়। মানুষ আবহমানকাল প্রেমের সেবক, সৌন্দর্য্যের উপাসক। যখন মোহনিদ্রা ভঙ্গে মানুষ জাগ্রত হয়, তাহার বাধির্য্য অপনীত ও অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়, তখন হৃদয়ের উন্মুক্তগবাক্ষে, প্রাচীবাতায়নে উষার রক্তিমচ্ছটার ন্যায়, সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল লাবণ্যচ্ছটা হৃদয়ের দিগ্‌বলয় বিভাসিত করে। অন্ধকার অন্তর্হিত হয়, এবং নৃত্যতী বাসন্তী বল্লরীর ন্যায় সৌন্দর্য্যের বিলাসনৃত্য প্রাণ-রঙ্গভূমিকে তরঙ্গায়িত করে। এই সৌন্দর্য্য-বিকাশে মৃণ্ময় হিরণ্ময় হয়, হিরণ্ময় জ্যোতির্ম্ময়ে পরিবর্ত্তিত হয়, আধিভৌতিক আধ্যাত্মিকে পরিণত হয়। মানবের অন্তরে বাহিরে যে সৌন্দর্য্য বিশ্বচরাচর উদরসাৎ করিয়া

বিরাজিত রহিয়াছে, যাহার বিবাহ বন্ধনে মানব জীবন ইন্দুকর-প্রফুল্ল-বিকচ-কুমুদ সুষমাময় হয়, সেই অপার অপরিসীম সৌন্দর্য্য মুকুরে করিনিকুরম্ব প্রতিবিম্ববৎ,নির্ম্মল অক্ষি-গোলকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ছায়াবৎ, একটী ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দুর স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত। নিশীথের ঘুমে ঢুলু ঢুলু জ্যোৎস্নালহরী, বসন্ত-বাত্যান্দোলিত কাননবল্লরীর চঞ্চল লাবণ্য, যূথিকাময়ী সন্ধ্যার ক্রোড়ে যৌবনের নাগর দোলায় মৃদু পবন হিল্লোলে ফুল্ল প্রসূনের মন্দদোলনি—সকলেরই পরিণাম ঐ অশ্রু। যেমন সংগীতের উৎস—কবিকুঞ্জের অমৃত-প্রস্রবণ—ভুবনবিজয়ী কুউরব, তেমনই সমগ্র সৌন্দর্য্য সমষ্টির নির্য্যাস বা ঘনসার, পূর্ণ অভিব্যক্তি ও এক কেন্দ্রস্থল—ঐ বিশ্বসৌন্দর্য্যের তিলোত্তমা অশ্রু। মানব হৃদয়ের দেবোত্তর ভূমিতে ইহার অধিবাস। মানব সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে মুগ্ধ হয় সত্য,কিন্তু ইহার সমষ্টি ভীমকান্তি অশ্রুবিন্দু তাহার প্রাণে বিভীষিকা উৎপাদন করে,—কারণ ইহার অসীম সৌন্দর্য্য স্থূল দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহে, ইহা অতীন্দ্রিয় গোচর। যখন মনের সহিত সুর বাঁধা হয়, তখনই ইহার স্বরূপ ভাসমান হইয়া ফুটিয়া উঠে। বৃন্তদুলাল রসফুল্ল কুসুমের স্নিগ্ধ লাবণ্য, প্রমদার স্নেহময় বিলোল কটাক্ষ, বালেন্দুবিচ্ছুরিত কুমুদিনীর শীত রশ্মি---এ সমস্তই অশ্রু সৌন্দর্য্যের নিকট পরাভূত। পরিমলবাহী প্রভাত পবনের কুসুম নিশ্বাসের জীবন্ত পরিণাম যেমন কবিতাময়ী প্রকৃতির শিশিরাশ্রুবিন্দু, তেমনই দ্রবীভূত প্রেম বা তরলিত সঙ্গীতোচ্ছ্বাসের পরিণাম সেই সৌন্দর্য্যের পূর্ণনিধান অশ্রুকণা। যদি কোথাও হৃদয় বিকাইয়া, হারাইয়া থাক, তবে দেখিয়াছ, একবিন্দু নির্ম্মল অশ্রু প্রভাবে হৃদয় প্রেম-সোপানের কত উচ্চে আরোহণ করিয়াছে। হায়, মানুষের প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি দৃষ্টিসম্পাতে কত অশ্রু নিদাঘসায়াহ্ন-সমীরবৎ হায় হায় করিয়া অনুক্ষণ আকাশে মিশাইয়া মরিয়া যাইতেছে, হৃদয়ের নিভৃত-কন্দরে শৈশব স্মৃতির ন্যায় কত মধুর স্মৃতি প্রতিনিয়ত কত অশ্রু ঝরাইতেছে, কেহ তাহা লক্ষ্য করে না!—নির্জ্জনে উদ্ভূত হয়, নির্জ্জনেই বিলয় পায়। কত সুকুমার শিশু সোহাগ ভরে ভাবাবেগ-পরিপ্লুত হইয়া আহ্লাদে গলিয়া অশ্রুরূপে উছলিয়া পড়িয়াছে, কত রূপসী স্ফুটনোন্মুখ যৌবন মালঞ্চের পুষ্প-বন্যার তরঙ্গাভিঘাতে অশ্রুতে পরিণত হইয়াছে, কত Eloisa যৌবনে যোগিনী হইয়া মূর্ত্তিমতী অশ্রু-কণিকা হইয়াছে, কে তাহার গণনা করে! যে অশ্রুর প্রভাবে এই কণ্টকাকীর্ণ সংসার নন্দন-কানন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, হৃদয়ের দগ্ধ মরুভূমে শত কুবলয় ফুটিয়া উঠে, যে অশ্রুর তিরোভাবে মানুষ দেবত্ব হারাইয়া দানব হয়, যে অশ্রুর বৈদ্যুতিক স্পর্শে সমগ্র হৃদয় আলোড়িত করিয়া সৌন্দর্য্য রাশি উথলিয়া উঠে, মানুষ কিনা সেই অশ্রু হইতে দূরে থাকিতে চায়! নিশীথের শান্ত জ্যোছনায় গভীর অরণ্যাণী ভেদ করিয়া যে সঙ্গীতস্রোত মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের দিকে ধাবিত হয়, যাহার পূতহিল্লোলে পুণ্যতীর্থের স্নাত তপস্বীদের ন্যায় অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান বৃক্ষরাজি শিশিরাশ্রু ঝরাইয়া দেয়, সেই সঙ্গীতেরও পরিণাম ঐ স্বচ্ছ নির্ম্মল অশ্রু,—ঐ জড়ীভূত বিশ্বোদর পুণ্যক্ষেত্রে, মুনি ঋষির তপোবন, যোগতাপসের নৈমিষারণ্য, স্বর্গের সোপান, মুক্তির পুষ্পরথ। সতীদেহস্কন্ধে মহেশ্বরের যে অশ্রুসিক্ত শোকোন্মত্ততা, ইহারই নাম

যাগ। এই অশ্রুতেই প্রেমযোগের বন্ধনী সাম্যের বীজমন্ত্র নিহিত। রুদ্রতেজে কুসুমিতা ব্রততী পুষ্পে পল্লবে শুকাইয়া যায়, স্নিগ্ধ শিশির সিঞ্চনে তাহার স্ফূর্ত্তি,—সেইরূপ হাসিতে পুষ্পিত হৃদয়োদ্যানের ফুলগুলিকে নিমীলিত করে, অশ্রু ইহার স্ফূর্ত্তি বিধায়ক। সংসারের সমস্ত আগুন নিবাইয়া অশ্রু শান্তির উৎসস্বরূপ মানবকে আশা ও আশ্বাস প্রদান করে,—তাই বুঝি ঋষি কল্পনায় বাড়বানলের স্থান সমুদ্র গর্ভে—অশ্রুসমষ্টির নির্ব্বাণকোলে—নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিচিত্র লীলাপূর্ণ জগতের পান্থশালায় অশ্রু ক্ষণস্থায়ী অতিথি, বিদ্যুল্লতার ন্যায় চমকে হৃদয়াকাশকে আলোকিত করিয়া নিমেষে অন্তর্হিত হয়, তাই অশ্রুর সহিত অনেক স্থলে মানবের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব। সান্ধ্য তারকা ও উষার ক্ষীণালোকের ন্যায় অশ্রুর ভিতরেও একটু শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ হাসি আছে, তাই মানুষ সন্ধ্যা ও উষাকে এত ভালবাসে। এ হাসিতে চাঞ্চল্য নাই, ইহা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। অশ্রু কবি,—শোকেই শ্লোকের উৎপত্তি। মানুষের নয়নাসার অশ্রুর সামান্য বাহ্য বিকাশ মাত্র; অন্তর্বিকাশে ফুল,পল্লব, লতাকুঞ্জ, শৈবলিনীর জল কল্লোল, নিদাঘের পত্রমর্ম্মর, এ সকলই ঘনীভূত অশ্রু। তাই Narcissusএর প্রণয় সংগীতের পরিণাম ফুল। শ্যামসুন্দরের বংশীধ্বনির পরিণাম অশ্রু না হইলে মানিনার মান ভাঙ্গিত কি? সাগরের উর্ম্মি সংঘাতে Sapho তাহার অশ্রুসিক্ত শোক সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল, এক একটী সমাধিস্তম্ভ আঁখিজলের পাষাণমূর্ত্তি ব্যতীত আর কি? ব্রহ্মাত্মজ ঈশা বিশ্বপিতার প্রেমনিশ্বসিতের ন্যায় প্রেরিত হইয়া অপূর্ব্ব সঙ্গীতলীলা করিয়া জগতের আলোগুম্ভ অশ্রুতে পরিণত হইলেন।

৬

পর্য্যবসান।

প্রেম চিরনবীনত্বপূর্ণ, তাই বসন্ত চির নবীন। প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য্য, যুবতীর বিলাসভঙ্গি, কিশোরের চিত্তচাঞ্চল্য, বয়ঃসন্ধির আবেশময় মদবিভোর ভাব,—বসন্তে এ সকলই আছে, অথচ বসন্ত চিরযুবক;—যৌবনে বসন্তের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি। প্রেম সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ, তাই যৌবন বড় সুন্দর। বসন্তে সেই সৌন্দর্য্যের চরম বিকাশ, কলকণ্ঠে সে বিকাশ সঙ্গীতরূপে নির্গত। ফুল সে সৌন্দর্য্য ক্ষুদ্র হৃদয়টী ভরিয়া পুরিয়া রাখে, সেইজন্য ফুল সুন্দর। সৌন্দর্য্যে কোমলতা আছে, কোমলতায় স্নিগ্ধতা আছে, তাই ফুলশয্যা এত মধুর, এত সুস্নিগ্ধ, সুকোমল, সুন্দর;—তাই বিবাহবাসরে ফুলশয্যা বিন্যাস। প্রেম,সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত, নবীনত্ব আর প্রাণ—এ সকলই কাব্যের উপাদান, সেইজন্য বসন্ত কাব্য। শুধু কাব্য নহে, একটা আত্মন্তরহিত মহাকাব্য। এ কাব্যের নিকট মানুষের মহাকাব্য অতি অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ। যে অনন্ত প্রেম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত সংগীত লইয়া বসন্ত, পৃথিবীর বড় বড় মনীষীগণ সেই গুলির আভাস মাত্র পাইয়া এক একটী অমর কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবী হইতে বসন্ত সম্ভোগ নির্ব্বাসিত কর, পৃথিবী সমস্ত হারাইয়া একেবারে কবিতাশূন্য, প্রাণশূন্য হইয়া পড়িবে। এ বড় বিষম মায়া, বড় দুর্ভেদ্য সমস্যা। প্রাণীর সত্তাবিন্দু যখন এই কুহেলিকাময় সমস্যার রহস্যসিন্ধুতে বিলীন হয়, তখনই নিত্যসান্নিধ্য ও অনন্ত মিলন। ইহা বিশ্বনিয়ন্তার আশাকুসুমাস্তীর্ণ চিরনবীনত্ব পূর্ণ বিধান। এই স্বপ্নময় প্রহেলিকার,—এই প্রহেলিকাময় স্বপ্নের—সম্যক্ রহস্যোদ্ঘাটনের নামই জীবন্মুক্তি। শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

স্বদেশ-প্রেম। (৩)

সামাজিক।

২য়—অঙ্ক।
স্থান দেবভবন।
কালরাত্রি।
উত্তমানন্দ স্বামী—বক্তা।

বক্তৃতা হইতেছে—*

আমাদের সমাজকে আত্মপীড়ন হইতে রক্ষা করা আবশ্যক। আমি ভরসা করি, অদ্য যাঁহারা এই "দেবভবনে" সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আত্ম-মর্য্যাদা-বিরুদ্ধ, ঘৃণিত "বণিক বিবাহ প্রণালী" বন্ধ করিয়া, হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত, যুক্তি-সম্মত, সর্ব্ব ধর্ম্ম-অনুমোদিত, সর্ব্ব সমাজের মঙ্গলজনক বিশুদ্ধ বিবাহপ্রণালী প্রচলিত করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। আমার বিশ্বাস, শুভ কার্য্য করিবার জন্য, সমাজের মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের জন্য, ভারতবর্ষে এক্ষণে একটী মাহেন্দ্র যোগ উপস্থিত হইয়াছে। সৎকার্য্য করিবার জন্য, হাজার হাজার লোক, সহস্র সহস্র যুবক, প্রস্তত হইয়া, দলপতির ও পথ নির্দ্দেশের জন্য, অপেক্ষা করিতেছেন। আমার বিশ্বাস,সহস্র সহস্র বিশুদ্ধচরিত্র যুবক বুঝিয়াছেন,সমাজের সংস্কার না হইলে, সমাজ নীচ বণিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইতে থাকিলে, কোন দিন দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে না। তবে তাঁহাদের পথে কুতর্কের কণ্টক আছে। সেই কণ্টক উন্মূলিত করা আবশ্যক। পাপের স্বভাব, সে যে লোককে কেবল প্রলুব্ধ করে, তাহা নহে, পাপ-বিচার-শক্তিকে নষ্ট করে। আমি হিন্দু, আমি সন্ন্যাসী, হিন্দু শাস্ত্রই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, বলুন আপনারা হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এই বিষয় বিচার করিতে চাহেন, না ইউরোপীয় যুক্তি অনুসারে এ বিষয় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন? (প্রথমে ইউরোপীয় যুক্তি অনুসারে আলোচনা করুন) আচ্ছা তাহাই করিতেছি। হাঁ, আপনাদের অনেকেরই মন, এক সম্প্রদায় ইউরোপীয় পণ্ডিতের কুতর্ক-কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। সেই কুহেলিকা কাটিয়া গেলে, সত্যের সূর্য্য আপনি প্রকাশিত হইবে। এমন কি, তখন হিন্দু শাস্ত্রের মত স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইবে।

বিচার তিন প্রকার হইতে পারে। তাহা এই—(১) কেবল যুক্তি আশ্রয় করিয়া বিচার করা। (২) কেবল শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বিচার করা। (৩) যুক্তি ও শাস্ত্র উভয়ই পর্য্যালোচনা করিয়া বিচার করা। আমি অদ্য আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে কেবল যুক্তি অবলম্বন করিয়া পথ বিচার করিব।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,পাপ আত্মপীড়ন। এক্ষণ দেখা যাউক, পাপ যদি আত্মপীড়নই হয়, তাহা হইলে কেন লোকে তাহা করে? অথবা কেমন করিয়া সমাজে পাপ প্রবেশ করে, এবং প্রবেশ করিলে পরে কেমন করিয়া সেই পাপ-প্রবাহ বহিতে থাকে? কোন ব্যক্তির মন যখন পাপ দখল করে, তখন সেই ব্যক্তির নীচ অঙ্গরূপ রিপু তাহার উচ্চ অঙ্গরূপ বিবেককে পীড়ন করে। তখন সেই ব্যক্তি তুচ্ছ ক্ষণিক সম্ভোগ বাসনার মোহে অনন্ত সুখকে পায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। সেরূপ অবস্থায়, হয় সেই ব্যক্তি, যে মন্দ কাজ করিতেছে, তাহা মোহে মুগ্ধ হইয়া একবারেই বুঝিতে পারে না, অথবা বুঝিতে পারিলেও প্রলোভনে পড়িয়া বিবেকের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে অসমর্থ। সমাজ সম্বন্ধেও কতক সেইরূপ। যখন সমাজে কোন পাপ প্রচলিত হয়, তখন একশ্রেণীর লোক ভ্রান্ত

* নব্যভারত ১৩১৫—পৌষ সংখ্যা ৪৯৫ পৃষ্ঠার পর।

হইয়া তাহা পাপ বলিয়া বুঝিতে পারে না, আর একশ্রেণীর লোক বুঝিয়াও, কার্য্যকালে বোধানুসারে চলিতে পারে না। মাতাল বুঝে সুরাপান ভাল নহে, কিন্তু মদ পাইলে ছাড়িতে পারে না।

প্রথমত, যাঁহারা "বণিক বিবাহ প্রণালী" যে পাপ বা সমাজের অনিষ্টজনক প্রথা, তাহা আদৌ স্বীকার করেন না, তাঁহাদের যুক্তি আলোচনা করা যাউক। তাঁহারা বলেন, পাত্রীপক্ষ, যখন যে পাত্রের ধন ইত্যাদি অধিক আছে, তাঁহাকেই কন্যা দিতে চাহেন, তখন পাত্রপক্ষ যে কন্যার পিতা অধিক টাকা দিতে পারেন, তাঁহাকে কেন বিবাহের জন্য মনোনীত করিবেন না? সঙ্গতিসম্পন্ন পাত্র যাঁহারা প্রার্থনা করেন, এমন কন্যাপক্ষগণ, প্রত্যেকে নিজের কন্যার ভাবী সুখের জন্য, যিনি যত অধিক টাকা দিতে পারেন, তাহা দিবার প্রস্তাব করেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দেন, তিনিই পাত্র লাভ করেন। ইহাতে অধর্ম্মই বা কোথা, সমাজের অনিষ্টই বা কোথা? উভয়পক্ষই প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে,স্বাধীনভাবে, দেখিয়া শুনিয়া, আত্মবল বুঝিয়া সুঝিয়া, চুক্তি করিতেছে। ইহাতে পাত্রপক্ষের দোষ কি? পাত্রীপক্ষ তাহার ধনবলের অতীত ধন দিতে যদি স্বীকার করেন, দোষ তাঁহার নিজের। কারণ পাত্রপক্ষত পাত্রীপক্ষের নিকট দস্যুর ন্যায় বলপূর্ব্বক টাকা কাড়িয়া লন না। পৃথিবীর সমুদয় কার্য্যই দুই পক্ষের স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন চুক্তি অনুসারে, প্রতিযোগিতা সহকারে, হইতেছে। বিবাহের পণ সম্বন্ধেও এখন তাহাই হইতেছে, তাহাতে দোষ কি?

এই যুক্তির মূলে মুক্ত প্রতিযোগিতা, যাহাকে আপনারা Free competition বলেন (একজন fair competition) আচ্ছা fair competition বলেন এবং স্বাধীন-চুক্তি অঙ্গীকার অর্থাৎ freedom of contract বলেন, তাহাই সমাজের নিয়ামক হওয়া উচিত, ইহা ধরিয়া লওয়া হইতেছে। এইটী যে ভ্রমমূলক, তাহা আমি দেখাইতেছি।

আমি স্পষ্ট করিয়া দেখাইব যে, সমাজে যেখানেই ব্যক্তিগত স্বার্থ, স্বাধীনচুক্তি, ব্যক্তিগত স্বার্থচালিত অসংযত প্রতিযোগিতার ফলে সমাজের অনিষ্ট হয়, সেখানেই সমাজের তাহা দমন করা উচিত এবং ইদানীং ইউরোপীয় সমাজ এই মহৎ তথ্য বুঝিয়া, সমাজের সমুদয় ক্ষেত্রেই—কি কৃষিকার্য্যে,কি বাণিজ্যে, কি কারবারে,সকল বিষয়েই অসংযত প্রতিযোগিতাকে নিয়মবদ্ধ করিতেছেন। সামাজিক প্রতিযোগিতা যখন সমুদয় সমাজের স্বার্থ লক্ষ্য না করিয়া, ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ সাধন করিবার চেষ্টা করে,তখন সেই প্রতিযোগিতা অসংযত। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা যখন নিজে সর্ব্বাঙ্গীন প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ইচ্ছা বা রিপুবিশেষ চরিতার্থ করে, তখন সেই প্রতিযোগিতা অসংযত। ইহা আমি পূর্ব্বে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি। আপনারা যদি চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রতিযোগিতা সংযত করিবার জন্য শাস্ত্রের বিধি, সমাজের প্রথা, আইন আদালতের ব্যবস্থা,—নানা প্রকার উপায় অবধারণ করা হইয়াছে।

কিন্তু ইউরোপে গত শতাব্দীতে অনেক পণ্ডিত ধনতত্ত্বে প্রতিযোগিতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তথাপি বিলাতের অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি অন্যায় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, নিজ নিজ স্বার্থ বিবেচনানুসারে অর্থ উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে মোটের উপর সমাজের অধিক মঙ্গল সাধিত হইবে। অর্থাৎ প্রতিযোগিতার ফলে সমাজের মঙ্গল হয়। আপনারা জানেন, ইংরাজিতে competition, fair competition, বিলাতের একপক্ষ ধন বিজ্ঞানের একটা বুলি। বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের মধ্যে competition, বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের মধ্যে competition; প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে বেতন লইয়া competition; বিবাহ বিপণিতে বর ও পাত্রী লইয়া competition,চতুর্দ্দিকে competition—বিলাতী জগৎ, বিলাতী সভ্যতা, competitionএ আচ্ছন্ন। তবে আর কি, ভাই, পাপ পুণ্যের বিচার ছাড়িয়া দেও,

আত্মমর্য্যাদারে কথা ছাড়িয়া দেও, মনুষ্যত্বের কথা ছাড়িয়া দেও। competitionএর জয় জয়কার কর। আমি বলিয়াছি,competition অন্যের স্বার্থ লক্ষ্য করে না ,—আপনারা বলিতে পারেন,আমি "Fair competition" প্রতিযোগিতা নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতেছি। তজ্জন্য ধনবিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ বর্ত্তমান অধ্যাপক নিকলসন (Nicholson) competition এর যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই বলি—

"On the positive side competition implies that every person tries to attain his own economic interests regardless of the interests of others. (আপনারা লক্ষ্য করিবেন regardless of the interests of others.") negatively it is implied that this self-interest is not attained by combination or by law or by custom.* দেখিলেন, প্রতিযোগিতা কিরূপ বস্তু। এই প্রতিযোগিতার গুণে, ইউরোপে, সমাজের লোকগুলা যেন ধনাগারে প্রবেশ করিবার জন্য, সকলে দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি করিতেছে। যে সবল বা ধূর্ত্ত, সে দুর্ব্বল বা নিরীহ ব্যক্তিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বা পদদলিত করিয়া, রত্নভাণ্ডারে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিযোগিতার সংগ্রামে, ভাই ভাইকে, ভাই ভগ্নীকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া, তাহার বুকের উপর দিয়া হাঁটিয়া,তাহার করুণ আর্ত্তনাদের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া, ধনাগারে প্রবেশ করা অধর্ম্ম বা অন্যায় বিবেচনা করেনা। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য প্রতিযোগিতা নীতি! স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায়, পরস্পর শত্রুতার নামই প্রতিযোগিতা। কিন্তু সুখের বিষয়,—অধুনা ইউরোপে প্রতিযোগিতার তামসী নিশার অবসান হইবে, সহবেদনামূলক সহযোগিতার উষা ধনতত্ত্ব-আকাশকে নূতন আশার কিরণে রঞ্জিত করিতেছে—শৃগাল শার্দ্দূলাদি হিংস্র পশুর ব্যবহারের পরিবর্ত্তে দেবতার ভাব আনয়ন করিয়া দিতেছে— ধনতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিতেছে, এবং অন্ধ স্বার্থমূলক প্রতিযোগিতাকে সংযমিত করিবার জন্য মনীষিগণ ব্যবস্থা করিতেছেন। ধনতত্ত্বের প্রত্যেক বিভাগে তাহা দেখিতে পাইবেন (উদাহরণ দিন)।

চতুর্দ্দিকেই উদাহরণ। প্রভু ও ভৃত্যের বা মজুরের কথা ধরুন। বিলাতে পূর্ব্বে ভৃত্য বা মজুরদিগের প্রতিযোগিতা ছিল। মজুরগণ এত অল্প বেতন পাইত যে, তাহাতে তাহাদের জীবন নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইত। কিন্তু তখন প্রতিযোগিতা ও স্বাধীন চুক্তিই সমাজের বুলি ছিল, তখন লোকে বলিত, এই রূপ অত্যল্প বেতন পাওয়াই নিয়ম। ধনতত্ত্বে ইহাকে "iron law of wages" বলে (N. 128) কিন্তু যেমন চক্ষু ফুটিতে লাগিল, তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া সমিতি করিতে লাগিল যে, নির্দ্দিষ্ট বেতনের কমে কোন শ্রমী কার্য্য করিবে না। এই দেখুন এখানে শ্রমীরা বুঝিল,প্রতিযোগিতা তাহাদের বেতন হ্রাসের মূল। তখন আর কেহ এমন কথা বলিল না যে, প্রভু ধনীগণ কোন শ্রমী দরিদ্রকে বলপূর্ব্বক অল্প মজুরিতে কাজ করাইত না। পূর্ব্বে প্রভু ও ভৃত্য, ধনী ও শ্রমী—স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে বেতন বা দৈনিক পারিশ্রমিক স্থির করিত—অর্থাৎ প্রতিযোগিতা অসংযত ছিল। প্রতিযোগিতা ধর্ম্মঘট দ্বারা যখন সংযত হইল, তখন মজুরির হার বাড়িল। ইহা দেখিয়া কোন কোন সভ্য দেশে আদালত হইতে মজুরি স্থির করিয়া দেওয়া হইতেছে।*

আবার, পূর্ব্বে কারবারের স্বাধীন চুক্তি ও প্রতিযোগিতা, বিলাতে কলকারখানায় মজুরদিগের জীবন ও অঙ্গ নিরাপদ রাখিতে পারে নাই। তখন অসংযত প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ বলিতেন যে, সকল কল কারখানায় মজুরদিগের জীবন ও অঙ্গাদি রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করা হইবে না, সেখানে মজুরগণ কাজ করিতে চাহিবে না। সুতরাং মজুরদিগকে পাইবার জন্য কল

* Elements of Political Economy, Nicholson, p 159.

* ইহাকে "Judicial wages" কহে।

কারখানার প্রভুরা আপনারাই সম্যক্ ব্যবস্থা করিবেন। আর যে কলকারখানায় জীবন ও অঙ্গাদির হানি হইতে পারে, সেখানে যদি মজুরগণ কাজ করিতে যায়, সে দোষ কল কারখানার প্রভুদিগের নহে, কারণ প্রভুরাত বলপূর্ব্বক কোন মজুরকে ধরিয়া কাজ করায় না। উভয়পক্ষের স্বাধীন চুক্তি অনুসারে (যেমন "বণিক্ বিবাহে" হইতেছে) কার্য্য হইয়া থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে সমাজের বা আইন-কর্ত্তাদের অন্যায় নাই। কিন্তু সভ্য জগতের সমাজহিতৈষী বিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ এই পাপ যুক্তির উপর নির্ভর করেন নাই। তাই, স্বাধীন চুক্তিকে সংযত করিবার জন্য নানা আইন হইয়াছে ও হইতেছে। * এক্ষণ কর্ম্মকর্ত্তারা আইন দ্বারা বাধ্য হওয়ায়, তাহারা মজুরদিগের জীবনাদি রক্ষা করিবার জন্য রেল ইত্যাদি সাবধানা ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে মজুরদিগের বিশেষ মঙ্গল হওয়ায় সমাজেরও মঙ্গল হইতেছে।

ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে কেবল মাত্র স্বাধীন চুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে কি ভীষণ কাণ্ড চলিতেছিল। যুক্ত প্রদেশে প্রস্তুত "টিনে" বদ্ধ করা মাংস বহুল পরিমাণে ইউরোপে বিক্রয় হয়। টিনে রক্ষিত মাংস-বিক্রেতাগণ এমন গলিত মাংস ব্যবহার করিত, যে মাংস হাত দিয়া মাংস-হ্রদে ফেলিবার সময় আপনাপনি খসিয়া পড়িত। কখন বা তাহাতে মৃত কুকুরাদি নিক্ষিপ্ত হইত। সর্ব্বাপেক্ষা লোমহর্ষণ ব্যাপার এই যে, এমন অভিযোগ হইয়াছিল যে, ঐ কারখানার একজন কুলি, দুর্ঘটনাবশতঃ কলের ঘূর্ণায়মান চক্রে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছিল। তাহারও মৃতদেহ নাকি ঐ খাদ্য-মাংস-হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এবং অন্যান্য গলিত মাংসের সহিত মিশ্রিত হইয়া খাদ্যরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। যাহা হউক, অনুসন্ধানে ও বিচারে সমুদয় কথা ঠিক প্রমাণ না হইলেও, 'এটা বেশ বুঝা গিয়াছিল, কেবলমাত্র ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতা ও স্বাধীন চুক্তির উপর নির্ভর করায় ক্রেতাগণ যাহা অত্যন্ত ঘৃণ্য অখাদ্য, তাহাও সুখাদ্য বলিয়া পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া খাইয়া, না জানিয়া নিজেদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছিল। এই জন্য তখন আইন করা হইল। তাহাতে স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া সমাজকে রক্ষা করা হইল। এই রূপে, যেখানে প্রতিযোগিতা ও অবাধ স্বাধীনচুক্তি সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর দেখা গিয়াছে, সেই অনিষ্ট নিবারণ করিবার জন্য প্রতিযোগিতা ও স্বাধীনচুক্তিকে শৃঙ্খলিত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে, আমেরিকার ন্যায় দূর দেশে না গিয়া কলিকাতাতেই বসিয়া আপনারা উদাহরণ পাইতে পারেন। ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টান্নের ভেজাল নিবারণ করিবার জন্য বিধি হইয়াছে, আপনারা জানেন। এখানে সমাজের মঙ্গল জন্য, ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বাধীন চুক্তিতে হস্তক্ষেপ করিয়া অসৎ বিক্রেতাগণকে সংযত করা হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে, প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সমাজের মঙ্গলের স্বাধীনচুক্তি সংযত করা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা দেখাইলাম।

এক্ষণে কৃষিকার্য্য আলোচনা করিব। এখানেও যেস্থলে স্বাধীনচুক্তি ও অসংযত প্রতিযোগিতাহেতু সমাজের অনিষ্ট হইতেছে, দেখা গিয়াছে, সেখানেই স্বাধীনচুক্তি ও অপ্রতিহত প্রতিযোগিতাকে বিধিবদ্ধ করিয়া সংযত করা হইয়াছে। আইন অপেক্ষা ধর্ম্ম শাস্ত্র আমার অধিক আলোচ্য বিষয়, আপনাদিগের মধ্যে যাহারা আইনজ্ঞ, বিষয়ীলোক আছেন, তাঁহারা আয়র্লণ্ড দেশের এবং দেশের "সরা খাজনা" বিষয় আমার অপেক্ষা ভাল অবগত আছেন। সুতরাং আমার তাহা বলা বাহুল্য। (বলুন বসুন) আয়র্লণ্ড দেশের কৃষক, দুর্ভাগ্য, কৃষকগণ—তাহাদের অবস্থা কি, তাহা জানেন না, এই অভিশপ্ত অসংযত প্রতিযোগিতায় তথাকথিত "স্বাধীনচুক্তি" অনুসারে খাজনা স্থির হওয়ায় কি ভীষণ দুর্দ্দশা হইয়াছিল ; বঙ্গদেশে

* নীচে ইংলণ্ড হইতে উদাহরণ দেওয়া হইতেছে :—
The first Employers' Liability Act was passed in 1880, other Acts followed.—The Workmen's Compensation Acts 1897 and 1900. The new Workmen's compensation Act 1900. D. M. Y. B. 27.

যাহাদের সামান্য জমীদারী আছে, তাঁহারাও জানেন যে, এক প্রকাণ্ড স্থানে কৃষকদিগের মধ্যে জমীদার বা তাহার কর্ম্মচারী জমী "ডাক-নীলামে" বিলি করেন। এই নীলামে যে প্রজা খাজনার নিরিখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ডাকে,তাহাকেই জমী আবাদ করিতে দেওয়া হয়। জমী প্রজার একমাত্র জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। জমী না পাইলে, সে না খাইয়া মরিবে। সুতরাং যখন ডাক আরম্ভ হয়, তখন প্রজারা প্রতিযোগিতার বশবর্ত্তী হইয়া বিঘা প্রতি ২৲, ৩৲, ৬৲, ৮৲ ১০৲ ১২৲ এইরূপ এত অধিক খাজনা দিতে অঙ্গীকার করে যে, জমীর ফসল হইতে তাহা দিতে হইলে, তাহাদিগের সুফলা বৎসরে খাওয়া বা এক বেলা খাওয়া চলে, আর অজন্মা বৎসরে এক বেলাও আহার সংগ্রহ হয় না। তখন দুর্ভিক্ষে মৃত্যু। তখন কৃষক নিরুৎসাহে জীবন্মৃত হইয়া থাকে। কখন বা দাঙ্গা, হাঙ্গাম, গৃহদাহ ও দস্যুবৃত্তি করে। আয়র্লণ্ডে এইরূপ হওয়ায় সেখানে অবশেষে আদালত হইতে খাজনা স্থির করিয়া দিবার আইন হয়। * বঙ্গদেশেও নিরিখ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় পাবনা জেলায় হাঙ্গাম হইয়াছিল। এবং বঙ্গীয় কৃষকদিগের অবস্থা ভাল করিবার জন্য সরকার বাহাদুর বাধ্য হইয়া, আয়র্লণ্ডের ন্যায় বঙ্গদেশেও, অসংযত প্রতিযোগিতাকে ও অবাধ স্বাধীন চুক্তিকে কি দমন করেন নাই? দমন করা কি উচিত হয় নাই?—আমি দেখাইলাম, কৃষিবিভাগে জমীদার ও কৃষকদিগের মধ্যে অবাধ স্বাধীন চুক্তিতে যেখানে অনিষ্ট হইয়াছে, সেখানে স্বাধীন চুক্তি প্রতিহত হইয়াছে।

এমন কি,জমী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কেবলমাত্র প্রতিযোগিতা এবং স্বাধীন চুক্তির উপর নির্ভর করিলে আর চলে না, এই বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডের পার্লিমেণ্ট একটা বিধি করিয়াছেন। তাহাতে, প্রতিযোগিতায় খাজনা বাড়াইবার জন্য, ইংরাজ জমীদারগণ জমী ফেলিয়া রাখিতে পারিবেন না; অর্থাৎ কেহ জমী চাহিলে তাহাকে ন্যায্য সর্ত্তে তাহা দিতে হইবে। *

আপনারা আরও উদাহরণ চাহেন কি? এক্ষণও কি আপনারা স্বীকার করিবেন না যে,যখনই প্রতিযোগিতা বা স্বাধীন চুক্তিতে সমাজের অনিষ্ট হইতেছে, প্রতিপন্ন হয়, তখন সমাজ সেই প্রতিযোগিতা,সেই স্বাধীন অঙ্গীকার প্রথাকে সঙ্কোচ করিতে পারে এবং সঙ্কোচ করা উচিত—এই অতি সহজ কথা কি এখনও আপনারা স্বীকার করেন না? (স্বীকার করি)

ভাল, তাহা হইলে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। "যে প্রতিযোগিতা বা স্বাধীন অঙ্গীকারে সমাজের কষ্ট হয়,তাহা সংযত করা উচিত; "বণিক বিবাহ প্রণালী"তে সমাজের বড় কষ্ট হইতেছে; সুতরাং বণিক বিবাহ প্রণালী সংযত করা উচিত। আর কিছু বলা আবশ্যক কি? (বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালীতে কি কষ্ট হইতেছে, সবিস্তারে বলুন)। আপনারা চোখের উপর যে কষ্ট দেখিতেছেন,তাহা যদি অনুভব না করেন বা স্বীকার না করেন, আমি ত তুচ্ছ জীব, স্বয়ং ভগবান আসিয়া আপনাদিগকে উপদেশ দিলেও কোন ফল হইবে না। ("কষ্ট স্বীকার করি", "খুব কষ্ট", "খুব কষ্ট") এক্ষণে রাজা এরূপ আইন করিতে পারেন না। তজ্জন্য যাহাতে"বণিক বিবাহ প্রণালী" বন্ধ হয়, আপনারা দলবদ্ধ হইয়া তাহার চেষ্টা করুন। হে ছাত্রবৃন্দ! হে অবিবাহিত যুবকগণ! হে সচ্চরিত্র কুমারগণ! সমাজকে বণিক বিবাহ প্রণালী রূপ গুরুতর পাপ হইতে, তোমরা রক্ষা কর। সামাজিক বিষয়ে এই বিবাহ প্রণালীর সংস্কার কার্য্যে তোমরাই রাজার স্থান অধিকার কর,—"বণিক বিবাহ প্রণালী" অনুসারে কখন বিবাহ করিবে না—যে বিবাহে টাকাকড়ির চুক্তি আছে,সে বিবাহ করিবে না—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রলুব্ধ পিতামাতাকে তোমরাই ধর্ম্মের পথে লইয়া আইস। জাতীয় বিনাশ পাপের অনিবার্য্য ফল। তাহা হইতে সমাজকে রক্ষা কর, যুক্তি ও

* ইহাকে judicial rents বলে।

* The Small Holdings and Allotments Act came into force on January 1, 1908.

বিবেককে সম্মান করিয়া, শাস্ত্রকে মানিয়া, স্বদেশ-প্রেমকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া, ভগবানকে স্মরণ করিয়া, প্রতিজ্ঞা কর "বণিক বিবাহ" করিবে না। (করতালি)

আমি বলিয়াছি, আমাদের দেশের রাজা বিদেশী। সামাজিক নিয়ম সম্বন্ধে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না; হস্তক্ষেপ করা ইচ্ছনীয়ও নহে। সুতরাং এবিষয় আপনারা নিজে প্রতীকার না করিলে কোন উপায় নাই। যখন আমাদের দেশ স্বাধীন ছিল, তখন এ বিষয় রাজার কিরূপ শাসন ছিল, তাহার একটী দৃষ্টান্ত বলি। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের জজ মাননীয় সঙ্করং নেয়ার, Social Conferenceয়ের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া তাঁহার বক্তৃতায়, এই উদাহরণটী উল্লেখ করিয়াছিলেন। "খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর একটী অনুশাসন লিপি পাওয়া গিয়াছে,তাহাতে লেখা আছে,যে ব্যক্তি স্বর্ণ (অর্থ) লইয়া কন্যার বা পাত্রের বিবাহ দিবে,সে ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবে।" (করতালি) কেবল করতালি দিলে হইবে না। ধর্ম্মকার্য্য আপনারা সম্পাদন করুন। এক্ষণে হে স্বদেশপ্রেমিক হরিভক্ত যুবা কুমারগণ! তোমাদের হরিভক্তি কার্য্যে দেখাও, তোমাদের ভগবদ্ভক্তি, পুণ্যানুষ্ঠানের জ্যোতিতে দেশে দীপ্তি পাউক। তোমাদের মধ্যে এই পুণ্য প্রতিজ্ঞাতে আবদ্ধ হইবার জন্য কে প্রস্তুত আছ? কতিপয় যুবক যুগপৎ দণ্ডায়মান হইয়া ("আমি" "আমি" "আমি"— "আমি")। যাঁহারা "বণিক বিবাহ" করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিতে অদ্য প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা অদ্য কেবল নাম লিখিয়া দিন। অদ্য তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা লওয়া হইবে না, এক মাস বেশ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া যদি তাঁহারা আবার এই প্রতিজ্ঞা করিতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা করান হইবে, এবং তাহার এক সপ্তাহ পরে তাহাদের অভিষেক হইবে (মহা করতালি-ধ্বনি)।

[সভাভঙ্গ]।

রমানাথ। বিজয়! আমাদের বাসায় যাবে?

বিজয়। একটু পরে যাব। এক্ষণ স্বামীজীর বাসায় যাব। (সকলের প্রস্থান)।

তৃতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

স্থান—রামধন বাবুর শয়ন কক্ষ—কাল—রাত্রি।

রামধন বাবু। শয্যায় শয়ন করিয়া আলবোলায় তামাক খাইতেছেন, তাহার স্ত্রী—মেজেতে কার্পেটের উপর আসীন।

স্ত্রী। কি বল?

রামধন বাবু।—কি বল্‌ব?

স্ত্রী। আমি বলি, বিজয়কে ডেকে পাঠাই।

রামধন। আমি কি বিজয়কে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিইছি?

স্ত্রী। তোমার কিছু দোষ নাই, দোষ আমার। তুমি আমাকে বলেছিলে যে, "বিজয় বকুলপুরের জমীদারের মেয়েটী বিয়ে না কর্লে আমি বিজয়ের মুখ দর্শন কর্ব্বো না। আমি সেই কথা না বুঝে, বিজয়কে বলেছিলাম। বিজয় সেটা উল্‌টা বুঝেছিল।

রামধন বাবু। হাঁ, আমি বলেছিলামইত। এখনও বল্‌ছি।

আমার ছেলে যদি আমার কথা না শোনে, আমি তার মুখদর্শন কর্ব্বো না। নিশ্চয়ই।

স্ত্রী। তুমি কি এমন মনে কর যে, তুমি বিজয়ের মুখদর্শন কর্ব্বে না, আর বিজয় বাড়ীতে থাক্‌বে? তুমি কি জান না, সে যেমন নম্র ও পিতৃভক্ত, তেমনি অভিমানী। সে খুব নম্র, সে তোমার আমার খুব বাধ্য—কিন্তু ভারি একরোকা, একটু মাত্র অপমান বোধ কর্লে, আমি দেখেছি, আমার বিজয়ের চোখ জ্বলিয়া উঠে—আবার স্নেহের সম্পর্ক যেখানে, ক্ষণকালেই চোখ জলে ভরে যায়। বিজয় যে তোমার পুত্র। তুমিও যেমন জীবনে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর নাই, সেও কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্ব্বে না। এক্ষণও সময় আছে, বিজয়কে তুমি ডাক্‌লেই বিজয় আস্‌বে।

রামধন। এত বড় আস্পর্দ্ধা!, আমি কিছু না বল্‌তে, বাড়ী হতে চলে গেল!

আমার প্রতি এত অবজ্ঞা? যত আদর দিচ্ছি, ততই বাড়ছে। আমি কখনই বিজয়কে ডেকে পাঠাব না, দেখবো কত দূর তার আস্পর্দ্ধা। (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

স্ত্রী। দেখবে দেখবে, তুমি কত সহ্য কর্ত্তে পার্বে? এ দুদিনেই তোমার মুখ কালী হয়ে গিয়েছে। বিজয় গিয়ে অবধি রাত্রিতে একটু ঘুমোতে পার্চ্চ না—আমি কি দেখতে পাই না, তুমি রাত্রিতে একবার বই নিয়ে বসো, আবার বারাণ্ডায় পাইচারি করে বেড়াও, এই রকমে এই কয় রাত্রি প্রভাত হয়ে যাচ্ছে—আমার নিজের কথা আমি কিছু বলতে চাহি না—আমি সব কষ্ট সহ্য কর্ত্তে পারি—আমি হিন্দুর মেয়ে—কষ্ট পেলে নীরবে সহ্য কর্ত্তে পারি—বুক ফাটিলেও নিজের জন্য কিছু বলবো না, তবে মার প্রাণ——জানত।

রামধন। তুমি তাকে ডাক, আমি কি বাধা দিচ্ছি?

স্ত্রী। তুমি না ডাকলে সে আসবে না।

রামধন। আমি ডাকবো না—আমি ডাকবো না।

স্ত্রী। নাথ! আমি মিনতি কর্চ্ছি। ছেলের বয়স অল্প, সে অবুঝ হতে পারে—তুমি বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান—তুমি জেদ করে বোসে থাকলে, এ সোণার সংসার ছারখার হোয়ে যাবে—একমাত্র ছেলে, আর অমন ছেলে, লোকে বলে রত্ন, অমন হয় না—সে যদি ঘরে থেকে উদাসীন হয়ে চলে গেল, তা'হলে আমাদের এ সংসারে আর কি সুখ, এ জীবনে আর কি আবশ্যক?

রামধন। তুমি যে বড়ই অধীর হ'য়ে উঠলে।

স্ত্রী। ঐ শুন নাথ, ঝুপ ঝুপ ক'রে বৃষ্টি এল। আমার সোণার বাছা হয়ত গাছতলায় ভিজে শীতে থর থর করে কাঁপছে (এই বলিয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন)।

রামধন। কেঁদো না। আমি তলে তলে খবর রাখছি। নীলমণি মিত্র তার সন্ধান পেয়েছে।

স্ত্রী। আঁ—সন্ধান পেয়েছে? কোথায় কোথায়?

রামধন। কাশীতে কোন সন্ন্যাসীর কাছে সে বেদান্ত পড়তে গিয়েছে।

স্ত্রী। না, নাথ, যখন সন্ন্যাসীর নিকট গিয়াছে, তখন সন্ন্যাসী হবে, নিশ্চয়ই মনে করেছে। (উঠিয়া স্বামীর পা ধরিয়া) নাথ, তোমার দাসীকে বাঁচাও—এই সুখের সংসারকে নিজে ইচ্ছা কোরে শ্মশান কোরে ফেলো না। তুমি নিজে না ডাক, বিজয়কে আমি ডাকি, তুমি অনুমতি দেও—চুপ কোরে থাকলে কেন? আমি তোমার পা ধরে অনুমতি চাচ্ছি।

রামধন বাবু। তোমার যা ভাল বোধ হয়, তাই কর।

২য় দৃশ্য।

স্থান বারাণসী। উত্তমানন্দ স্বামীর কুটীর।

উত্তমানন্দ স্বামী। আমি তোমাকে কলিকাতায়ই বলেছি, তোমাকে সন্ন্যাস-মন্ত্র দিব না। তবু, বৎস, কেন কাশীতে আমার আছে এসেছ? বাড়ী যাও।

বিজয়। কেন মন্ত্র দিবেন না, প্রভু!

উত্তমানন্দ স্বামী। তুমি কেন সন্ন্যাসী হতে চাও?

বিজয়। আমি একেবারে বিবাহ কর্ব্বো না। সন্ন্যাসী হোয়ে একেবারে চিরকৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ কর্ব্বো।

উত্তমানন্দ স্বামী। সন্ন্যাসী না হোয়েও ভীষ্মের মত সে ব্রত লওয়া যায়।

বিজয়। আমি আপনার নিকট বেদান্ত পড়বো।

উত্তমানন্দ স্বামী। ঘরেও বেদান্ত পড়া যায়।

বিজয়। না প্রভু! ঘরে থাকিতে আর আমার মন নাই। আমি সংসারের তুচ্ছ সুখ ত্যাগ করে, আপনার নিকট সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হব; বেদান্ত পড়বো। সাধনা করে সিদ্ধ হয়ে দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার কর্ব্বো—আর আপনার দাসানুদাস হয়ে, আপনারই প্রদর্শিত পথে চলবো। প্রভু! ঘরে আমার প্রাণটা কেবল কেঁদে উঠে। প্রতিদিন যখনই নানা ব্যঞ্জন, নবনীত, দুগ্ধ ক্ষীর দিয়ে অতি সূক্ষ্ম অত্যুত্তম অন্ন খাই, তখনই মনে হয়, হায় কত গরিব লোক দুই বেলায় এক মুঠা ভাতও পাচ্ছে

না; কত লোক না খেয়ে মর্ছে। তখন প্রাণ কেঁদে উঠে। তখন ভাবি, এর কি কোন উপায় নাই। এই কথা বুঝিবার জন্য পিতৃদেবের নিকট ধনতত্ত্ব পড়তাম। বৈশাখে যখন টানা পাখার তলে, বরফ দেওয়া জল খাই, তখন মনে হয়, কত গ্রামে জলকষ্টে মানুষ ও গরু শুখিয়ে মর্ছে। বাবার জমীদারী থেকে যখন খাজনার টাকা আসে, তখন মনে হয়,এই টাকা হয়ত দুঃখী কৃষকের বুকের রক্ত,তাহারা সর্ব্বস্ব হয়ত আমাদের দিয়ে সে সপরিবারে অন্নাভাবে কাঁদ্‌ছে। বাবা সে দিন বল্‌ছিলেন, বিজয়ের জন্য একটা পৃথক দোতালা বৈঠকখানা কোরে দিব। মার্বেল পাথর এসেছে, আমি দেখে ভাবলাম, আমাদের তালার উপর তালা হচ্ছে, মার্বেলের মেজে হচ্ছে—কিন্তু যাদের শ্রমের টাকাতে এসব হচ্ছে—তাদের কুঁড়ে ঘরের মটকায় খড় নাই। আমার বিয়েতে বাবা নাকি দশ হাজার টাকার নানা হীরা মুক্তার গহনা দিবেন—আমার স্ত্রীর গায়ে দশ হাজার টাকার গহনা, আর কৃষক-বধূ শতগ্রন্থি বস্ত্র—জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র পোরে লজ্জা নিবারণ কর্ত্তে পাচ্ছে না! আমাদের মধ্যে কারও একটু অসুখ করলেই বাবা আমাদের দেওঘরে নিয়ে যান। আর শত সহস্র গ্রাম ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত ও প্লেগে উৎসন্ন হোয়ে শ্মশান হয়ে যাচ্ছে। প্রভো, নিস্তব্ধ নিশীথে, যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন, আমি যেন দুঃখীদিগের ভয়ানক আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পাই —সে আর্ত্তনাদ আকাশ ভেদ কোরে উঠে—ভয়ানক দুঃখীগণের আর্ত্তনাদ—ভয়ানক, ভয়ানক—সেই ভয়ানক আর্ত্তনিনাদ শুনে আমার বুক দরাস দরাস্ করে। সেই গভীর যন্ত্রণাত্মক নির্ঘোষের মধ্যে যেন শুনিতে পাই, কে বল্‌ছে—"বিজয়, এক্ষণও তুমি শুয়ে, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে? শুন্‌তে পাচ্ছনা কি ঐ হাহাকার ক্রন্দন—ঐ গগনভেদী ক্রন্দন? বিজয়, এক্ষণও তুমি বিষয় ভোগে মগ্ন—উঠ, বিজয় বাহিরে এস,বিষয় ভোগ ছাড়—দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ কর।", প্রভো, আমি দেশেরই মঙ্গলের জন্য এ জীবন উৎসর্গ কর্ত্তে চাই—দয়া করে আমাকে সন্ন্যাস মন্ত্র দেন। বিষয় সুখে আমার মন নাই।

উত্তমানন্দ। অর্থাৎ তুমি বল্‌ছো বিষয় সুখে তোমার বৈরাগ্য হয়েছে। হাঁ, যদি তোমার বিষয় সুখে যথার্থই বৈরাগ্য হয়ে থাকে, তাহা হলে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কর্ত্তে পার। কারণ শ্রুতি বলেন—

যদহরেব বিরজেত তদহরেব প্রব্রজেৎ। অর্থাৎ অধিকারী পুরুষের যে দিনে সর্ব্ব বিষয়-সুখে বৈরাগ্য হইবে,সেই দিনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত প্রকৃত বৈরাগ্য হইতে পারে না। 'দণ্ড গ্রহণ মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ', অর্থাৎ দণ্ডাদি চিহ্ন লইবা মাত্র পুরুষ নারায়ণ রূপ হইয়া যায়। এই প্ররোচক বচন শুনিয়া কেহ কেহ সন্ন্যাসী হইতে চাহেন। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি বিনা কেবল মাত্র দণ্ডাদি গ্রহণে জ্ঞাননিষ্ঠা রূপ ফল পাওয়া যায় না; বরঞ্চ প্রত্যবায় প্রাপ্তি হয়।

বিজয়। প্রভো, তবে শ্রুতি কেন বলেন, কেবল ত্যাগেই মোক্ষলাভ হয়?

উত্তমানন্দ। হাঁ,শ্রুতি বলেন "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি ইতি ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্ত্বমানস্তঃ" অর্থাৎ "যাঁহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ লোক লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অগ্নিহোত্রাধিক কর্ম্ম দ্বারা, অথবা পুত্রাদি প্রজা দ্বারা অথবা সুবর্ণাদি ধন দ্বারা ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু কেবলমাত্র ত্যাগ দ্বারা সেই মোক্ষ রূপ অমৃত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন!"

বিজয়। আমিও ত সংসারের সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহি।

উত্তমানন্দ। বৎস, শ্রুতির এই বচন কেবল শুদ্ধচিত্তযুক্ত ব্যক্তির জন্য অভিপ্রেত হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যে চিত্তশুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সন্ন্যাস আদৌ সম্ভব নহে। এই কথা আমাদের দেশে অনেকে না বুঝিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাতে তাহাদের এবং দেশের অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে।

বিজয়। তবে এক্ষণ আমি কি কর্ব্বো?

উত্তমানন্দ। শাস্ত্র তাহার উত্তর অতি সংক্ষেপে দিয়াছেন—

"অসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্মসমাচর" অর্থাৎ তুমি ফলাশক্তি-শূন্য হইয়া, নিষ্কাম ভাবে কেবলমাত্র পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য সর্ব্বদা অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে বিহিত কার্য্য অনুষ্ঠান কর—"অসক্তোহ্যচরন্ কর্ম্ম, পরমাপ্নোতি পুরুষঃ" "যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন।" অতএব তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, সেখানে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিও। দেশের যে সকল দুঃখের কথা বলিলে, তাহার সাধ্যমত প্রতিকার কর। পিতা স্বর্গ, পিতা দেবতা, তিনি অন্যায় কোরে তাড়না কর্লে তাহা অক্ষুব্ধ ভাবে সহ্য কর্ব্বে। বৎস, যাও, গৃহে ফিরে যাও।

(নীলমণি বাবুর প্রবেশ)

নীলমণি। বিলক্ষণ! ঠাকুর, ছেলে মানুষটাকে ফুস্‌লে সন্ন্যাসী কর্বার চেষ্টা করছো বুঝি। ঠাকুর, তোমার এই কাজ?

উত্তমানন্দ: বৎস! বসো।

নীলমণি। বস্‌বো, খাবো—সেত আছেই (বসিয়া) কে আছেরে, একবার তামাক দিতে পারিস।

উঃ উঃ ঘুরে ঘুরে ঠাকুর হয়রাণ হইছি, (একটী শিষ্য পা ধোবার জল আনিয়া নীলমণি বাবুকে দিল, পা ধুইয়া বসিলেন—এমন সময়ে একজন তামাক আনিয়া দিল)

নীলমণি। (হুকা লইয়া তাহাতে এক টান দিয়া)বাঁচলুম। ঠাকুর,আপনি লোক ভাল, তা কি আমরা জানি না। তবে বিজয়! বাবা, তুমি কেন এমন কর্লে? চল, বাড়ী চল। ৫টার ট্রেনে। মাঠাকুরুণ কেঁদে কেঁদে মারা পলেন। বাবু এই কয় দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। এমন কোরে মা বাপকে কাঁদাতে আছে?

বিজয়। মা বাবা ভাল আছেন ত?

নীলমণি। কেবল প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছেন।

বিজয়। মনোরমা কেমন আছে?

নীলমণি। তোমার ভগ্নী কেবল ফুপিয়ে কান্‌ছে—আর বল্‌ছে "মা, দাদা কোথায় গেলেন।"

৩য় দৃশ্য।

স্থান—বৈঠকখানা।

কাল—প্রাতঃকাল।

(রামধনবাবু—চেয়ারে বসিয়া হাতে Bengalee বাহিরে রাস্তার দিকে তাকাইয়া)

এমন সময় একখানি ল্যাণ্ডো গাড়ী বারান্দায় লাগিল। তাহা হইতে নীলমণি ও বিজয় নামিয়া রামধন বাবুর সম্মুখে আসিলেন।)

বিজয় পিতার চরণ-ধূলি লইয়া করযোড়ে রামধন বাবুর সম্মুখে নত মস্তকে দাঁড়াইলেন। রামধন বাবুর চোখে এক ফোটা জল আসিল, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।

বিজয়। পিতঃ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

রামধন। (পুত্রের মস্তকে হাত দিয়া অস্ফুট স্বরে আশীর্ব্বাদ করিলেন) যাও তোমরা মা ও মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করগে। (বিজয়ের প্রস্থান)

নীলমণি। মহাশয় অনুমতি হয় ত আমিও এখন আসি।

রামধন। হাঁ খাওয়া দাওয়া করুন গে।

৪র্থ দৃশ্য।

স্থান—রামধন বাবুর লাইব্রেরী।

কাল—রাত্রি।

(রামধন বাবু ও বিজয় আসীন—সম্মুখে টেবিলের উপরে কতকগুলি পুস্তক।)

বিজয়। Tariff Reformএর কথাটা কি, আজ আমাকে ভাল কোরে বুঝিয়ে দেবেন কি?

রামধন। কথাটা কিছু জটিল।

বিজয়। তারই জন্য আপনার কাছে ওটা বুঝিয়ে নিতে চাচ্ছি।

রামধন। Tariff Reform, এ কথাটা ধর্ত্তে গেলে, সেই পুরাতন কথা—Free Trade বা Protection.

বিজয়। তবে Preferential Tariff এ কথাটা কতকটা নূতন নহে কি?

রামধন। কতকটা নূতন বটে, কিন্তু

Canadian Preferential Tariff প্রথমে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিজয়। Preferential Tariff টা কি ?

রামধন। ১৯০৬ খ্রীঃ Canadaতে যে ত্রিবিধ তারিফের ব্যবস্থা হইয়াছিল—তাকে সাধারণত Tripartite Tariff বলে, সেটা তোমাকে উদাহরণ স্থলে বল্লে তুমি অতি সহজে কথাটা বুঝতে পারবে। ক্যানেডার গবর্ণমেন্ট তিন শ্রেণীর শুল্কের ব্যবস্থা করেছিলো। (১) ইংলণ্ডের এবং তাহার উপনিবেশের মালের উপর সর্ব্বাপেক্ষা কম শুল্ক আদায় হইবে। (২) অন্যান্য দেশের মালের উপর সর্ব্বোচ্চ হারে শুল্ক আদায় হবে। (৩) কিন্তু যে সকল দেশ ক্যানেডার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ, এবং কম শুল্কে ক্যানেডার মাল তাদের দেশে বিক্রয় কর্ত্তে দেবে, তাহাদের মাল ক্যানেডাতে মধ্যম হার অনুসারে শুল্ক দিয়া বিক্রয় হতে পারে। ধর, ক্যানেডাতে ইংলণ্ডের কাপড়ের উপর যদি শত করা ৫ টাকা শুল্ক দিতে হয়, অন্যান্য দেশের, যাদের সঙ্গে ক্যানেডার সন্ধি হয় নাই—তাদের শত করা ১০ দশ টাকা দিতে হবে; আর মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী—অর্থাৎ যে সকল দেশ ক্যানেডার সহিত সন্ধিবদ্ধ, তাদের শত করা ৭ সাত টাকা শুল্ক দিতে হবে। বুঝলে ত সকলের অপেক্ষা England এবং তাহার Coloniesকে preference দেওয়া গেল; তার পর যে সকল দেশ সন্ধিসূত্রে ক্যানেডাকে duties সম্বন্ধে preference দেবে; তারপর Highest tariff অন্যান্য সমুদয় দেশের জন্য। আমি ইংরাজিতে সংক্ষেপে বলি—

In the Tripartite Tariff each of the three parts had a separate application. The Highest or General Tariff for the world at large. The lowest or British preferential tariff was for Britain and her Colonies only. The intermediate Tariff was for such foreign countries, as after negotiation, consentod to grant equivalent favours to Canada. বুঝলে ?

বিজয়। আজ্ঞে ?

রামধন। Australia ও Englandকে preference দিয়াছে।

বিজয়। ইংলণ্ডে Tariff Reform কিভাবে করিবার জন্য Chamberlain প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আন্দোলন কচ্ছেন ?

রামধন। (1) The taxation of foreign manufactured goods অর্থাৎ ইংলণ্ডে পুনর্ব্বার protection প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক। (2) Imperial preference based upon foreign agricultural produce.

বিজয়। এখানে preference কি রকমে কাহাকে দেওয়া হবে ?

রামধন। ইংলণ্ডের কলোনিগুলি, অন্য দেশের অপেক্ষা কম শুল্ক দিয়া, ইংলণ্ডে তাহাদের শস্যাদি বিক্রয় কর্ত্তে পার্ব্বে। অর্থাৎ Colony গুলিকে শুল্ক বিষয়ে ইংলণ্ড preference দিবেন। তা হলে Colonyতে ও England এ খুব সদ্ভাব হবে।

বিজয়। হাঁ, কথাটা মূলে হচ্ছে—Free trade অথবা protection।

চাকরের প্রবেশ

চাকর। আহার প্রস্তুত।

(উভয়ের প্রস্থান)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

সুলেখক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

জন্ম—বগুড়া, আগষ্ট, ১৮৫৪ খ্রীঃ।

মৃত্যু—কলিকাতা, ৩ই এপ্রেল, সোমবার, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ।

বয়স—৫৫ বৎসর মাত্র।

"The paper of which he was editor was uniformly characterised by outspoken sincerity, lofty principles and distinction of style in a degree that is rarely found in any country in the world." *Edward Baker.*

এ জগতে কে বড়, কে বা ছোট? বহুবার লিখিয়াছি, আপনাপন মহত্ত্বে ও বিশেষত্বে সকলেই বড় এবং আপনাপন দুষ্কৃতিতে সকলেই ক্ষুদ্র। এক সময়ে যে বড়, অন্য সময়ে সে ক্ষুদ্র; এক সময়ে যে ক্ষুদ্র, সে অন্য সময়ে বড়। এ গেল, সাধারণ নিয়ম। ইহা ভিন্ন জগতে বিশেষ নিয়ম আছে। কি কারণে হয়, তাহা জানি না, এ জগতে দেখি, এক এক সময় এমন এক এক লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহাদের সমতুল্য ব্যক্তি আর কোথাও পাওয়া যায় না। অথবা এমন এক একজন লোক দেখা যায়,—তাঁহাদের তিরোধানের পর কত যুগযুগান্তর চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু সেরূপ লোক আর পাওয়া যায় নাই। * সেরূপ লোক ফ্রান্সে হইলে নাম ধরেন নেপোলিয়ন, ইটালীতে ম্যাট্‌সিনি, ইংলণ্ডে কারলাইল, জার্ম্মেনীতে গেটে, এমেরিকাতে এমারসন্ ও এডিসন, ভারতবর্ষে কালিদাস, রুসিয়াতে টলস্টয়। অথবা—পালেসটাইনে খ্রীষ্ট, ভারতবর্ষে বুদ্ধ, আরবে মহম্মদ, চীনে কনফিউসস্। অথবা, আমাদের বঙ্গে শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ। জগৎ জাগিতেছে, জাগুক;—ইঁহাদের সমতুল্য লোক আর জগতে আসিবে না। কথার বলে, যেমনটী যায়, তেমনটী আর হয় না। মহাপুরুষদের জীবনে বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা।

এসিয়া পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান, কেন না, এসিয়াই সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের জন্মস্থান—খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ, কনফিউসস প্রভৃতি। এসিয়ার মধ্যে আবার ভারতবর্ষ বিধাতার বিশেষ চিহ্নিত স্থান। পৃথিবীর আর কোন্ দেশের নামে মহাসাগরের নাম হইয়াছে? কোন্ মহাদেশে হিমালয়ের ন্যায় পর্ব্বত, এবং গঙ্গা, সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় নদী আছে? আর কোন্ দেশে, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় লোক জন্মিয়াছে!! ভারতের মধ্যে আবার বঙ্গ বিধাতার বিশেষ চিহ্নিত স্থান। বঙ্গোপসাগরের নামে ভূগোলে যেমন বঙ্গ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের মিলন-স্থান বলিয়াও তেমনি বিখ্যাত হইয়াছে। আর কৃতীত্বে? এই বঙ্গে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, ভারতে আর কোথাও সেরূপ হয় নাই। শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, দেবেন্দ্রনাথ, প্রতাপচন্দ্র, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং আরো কত মহাত্মা যে দেশে

* "When nature removes a great man, people explore the horizon for a successor; but none comes, and none will. Emerson.

জন্মিয়াছিলেন, সে দেশ যেমন তেমন দেশ নয়। বঙ্গ—অনেক মহাপুরুষের পূত চরণ-ধূলিতে পবিত্র হইয়াছে। এরূপ বুঝি বা, আর কখনও হইবে না।

বঙ্গে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকেই, অল্প বা অধিক পরিমাণে দলের লোকের দ্বারাই সর্ব্বত্র পরিচিত ;—কেহ কেহ বা নিজ প্রশংসা নিজে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য পত্রিকায় ছাপাইয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ;—কেহ কেহ বা এমনই নির্লজ্জ যে, জীবিত কালেই নিজ জীবন-চরিত প্রকাশ করাইয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইতে অভিলাষী। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও ছিলেন যে, নিজের দোষ ত্রুটী স্মরণে সদা সঙ্কুচিত এবং ম্রিয়মান থাকিতেন, কেহ প্রশংসা করিলে লজ্জায় মরিয়া যাইতেন। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঋষি রামতনু এবং রাজনারায়ণই প্রধান। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে মহাত্মা নগেন্দ্রনাথ ঘোষ অন্যতর। আজ বঙ্গের মহাদুর্দ্দিন যে, এই মহাত্মা, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে, মর্ত্ত্যলীলা শেষ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি নিজের প্রশংসা নিজে করিতেন না, শুনিতে চাহিতেন না, —সদা সঙ্গোপনে, নিভৃতে থাকিতেই ভাল বাসিতেন। নগেন্দ্রনাথ অপার্থিব চরিত্র এবং অসাধারণ শক্তি লইয়া এই বঙ্গে অবতরণ করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, নগেন্দ্র নাথ দেশ-বৈরী ছিলেন। তাহা মিথ্যা কথা। শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ পূর্ব্বে, ভারতে জাতি গঠনের স্বপ্নে প্রমত্ত হইয়া, তিনিই প্রথম Indian Nation পত্রিকা চালাইতে আরম্ভ করেন। যেমন ছিলেন নবগোপাল, তেমন ছিলেন, নগেন্দ্রনাথ। জাতীয় নামে এরূপ গৌরব, তদানীন্তন কালে আর কে করিত ? এই এক স্থানেই তাঁহার গভীর স্বদেশানুরাগের পরিচয় রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, তিনি ইংরাজের প্রশংসা পাইবার জন্যই "স্বদেশী গ্রহণের" বিরুদ্ধে অনেক অযৌক্তিক কথা লিখিতেন। আমরা একথাও অস্বীকার করি। তিনি কি ইংরাজের প্রশংসা কখনও নিজ কাগজে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ? তিনি প্রশংসার কাঙ্গাল ছিলেন না। পরন্তু কেহ তাঁহার নিন্দা করিবে, ইহা ভাবিয়াও তিনি কখনও লেখনী সংযত করিতেন না। যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই লিখিতেন। অনন্য-সাধারণ স্বাধীনতার স্ফুরণ তাঁহার প্রতি কথায় হইত। ইংরাজের প্রশংসা-লোলুপ হইলে, যে মহাসমিতির নাম শুনিলে ইংরাজগণ ভ্রুকুঞ্চিত করে, সেই কঙ্গ্রেসের একাঙ্গ প্রভিনসিয়াল কনফারেন্সের সভাপতি হইতে তিনি সম্মত হইতেন না। তিনি স্বাধীন জীব, স্বাধীন ভাবেই চলিতেন, স্বাধীন ভাবেই লিখিতেন! তোমার প্রশংসা বা তাঁহার নিন্দার তিনি যদি কোন খোঁজ লইতেন, তবে তাঁহাকে আমরা মহাপুরুষ নামে আখ্যাত করিতাম না। গড্ডলিকা-প্রবাহের পথ ধরিয়া কেহ এজগতে বড় হইতে পারে নাই। স্বাধীন চিন্তা ভিন্ন কেহ কখনও কৃতী লেখক হইতে পারে নাই। প্রতিভার অন্যতর সহায় স্বাধীনতা। যেখানে প্রতিভা, সেই খানেই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা নাই, প্রতিভা আছে, আমরা কখনও শুনি নাই ; অপিচ, প্রতিভা আছে, স্বাধীনতা নাই, ইহাও সম্ভব নহে। ইংলণ্ডের ঋষি-প্রতিভা কেবল স্বাধীনতাকেই ফুটিয়াছিল, আমেরিকার ঋষি-প্রতিভা স্বাধীনতার পর্ণ-কুটীরেই ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। কার্লাইল

বা এমারসন, কেশবচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্র—এই স্বাধীনতা বলেই ফুটিয়া ফুটিয়া, জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। নগেন্দ্র নাথ স্বাধীনতার সেবক, এই স্বাধীনতার জন্য তাঁহাকে অনেকের নিকট নিন্দিত হইতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন ও লিখিতেন। যাহা লিখিতেন, তাহাতেই অনন্যসাধারণ স্বাধীনতার স্ফুরণ হইত—লোকেরা পড়িয়া অবাক্ হইত এবং বলাবলি করিত, নগেন্দ্র নাথের কি কলমের জোর এবং লেখা কি সুন্দর। নগেন্দ্র নাথের স্বাধীন লেখা,স্বাধীন চলাফেরা, স্বাধীন কথাবার্ত্তা—অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্ফুট নিদর্শন স্বরূপ এদেশে অক্ষয় হইয়া রহিল।

তাঁহার অসাধারণ স্বাধীনতার জীবন্ত দৃষ্টান্তের পরিচয়, নূতন মিউনিসিপাল আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময়,অন্যান্য কমিসনারদিগের সহিত মিলিয়া তিনিও যে গৌরবের পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,তাহাতে পাওয়া যায়। তিনি যদি ইংরাজের পাচাটা বা প্রশংসার জন্য লালায়িত হইতেন, তবে এই গৌরবের পদ পরিত্যাগ করিতেন না। কিম্বা করিলেও, পরে আবার, রাধাচরণের ন্যায়, পুনঃ ঐ পদ গ্রহণ করিতেন। এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ তাঁহার স্বাধীনতার উচ্চ দৃষ্টান্তের স্থল।

তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স ও এলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; কিন্তু কে না হয় ? তিনি বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন,তাহাই বা কে না হয় ? তিনি সুদীর্ঘকাল মেট্রপলিটান কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তাহাও কত কত লোকে হইয়া থাকে। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষক, কলিকাতার অনারারী ম্যাজেষ্ট্রেট ছিলেন। কত কত লোক ঐ সকল কাজ করিয়া থাকে। কত লোক কত পদ পাইয়া থাকে, আবার বিস্মৃতিতে ডুবিয়া যায়—কেহ নামও লয় না। আমরা ও সকল কোন গণনার বিষয়ই মনে করি না। নগেন্দ্র নাথের গণনার বিষয়—তাঁহার অনন্য-সাধারণ ইংরাজি লিখিবার ক্ষমতা। তিনি ইংরাজি লেখার যে ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অসাধারণ। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,এই বঙ্গে ইংরাজি লেখায় কি নগেন্দ্র নাথকে কেহ অতিক্রম করেন নাই ? কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন কি না, জানি না। ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺ লালবিহারী দে, ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি তাঁহার এক শ্রেণীর লোক হইতে পারেন, কিন্তু তিনি কাহারও পশ্চাতে ছিলেন না। সময়ে ২ নগেন্দ্রনাথের লেখা পড়িয়া মনে হইয়াছে—এরূপ লেখা বুঝি আর কোথাও পড়ি নাই, এরূপ বুঝি আর কাহাতেও সম্ভব হয় নাই। পুস্তক তাঁহার অধিক নাই, বড় দুখানি এবং ছোট ৪ খানি। * কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণদাস পাল ইংরাজি ভাষার এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। যত দিন ইংরাজি ভাষা থাকিবে,এ পুস্তকের অনাদর হইবে না। তাঁহার অন্য বড় পুস্তক মহারাজা নবকৃষ্ণ। ঐ পুস্তকে তাঁহার প্রতিভা, অর্থের খাতিরে কিছু পারম্লান হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরাজি লেখার অসাধারণ ক্ষমতা তাহারও পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্ফুরিত রহিয়াছে। পুস্তক অপেক্ষাও, তাঁহার সম্পাদিত নেশন পত্রিকাতেই, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পত্রিকা পরি-

* Kristo Das Pal—a study, and the Life of Maharaja Nova Kissen of the SovaBazar Raj family and of several brochures—the most notable being "Indian views of England," Moral Canker" "Contract of the East and West," "Liberal education in India, His last work "England's work in India" has just been completed, the final proofs having been passed by him on the Sunday preceding his death on Monday morning.

চালনের শিক্ষা তিনি ইংলণ্ডে লাভ করিয়াছিলেন। এরূপ যোগ্যতার সহিত তিনি, শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ কাল, নেশন পরিচালন করিয়াছেলেন যে, তাহার তুলনা এদেশে মিলে না। অমৃত-বাজার লিখিয়াছেন যে "পত্রিকা পরিচালনে তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।"* আমরা বুঝি না, অমৃত বাজার এই কথা কি অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই কথার মধ্যে কিছু পূতিগন্ধময় বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রিকা সম্পাদনে তিনি যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এদেশে তাহা তুলনা রহিত,—অন্য যে কোন দেশের যে কোন উৎকৃষ্ট পত্রিকার সহিত তাহা সমতুলিত হইতে পারে। সহানুভূতিহীন কণ্ঠকাকীর্ণ দেশে একাদিক্রমে ২৫ বৎসর কোন পত্রিকা চালান,সামান্য কথা নহে। এদেশে পত্রিকা-চালান পুষ্পশয্যা নহে, পদে পদে লাঞ্ছনা ও অভাবের তাড়নায় জর্জ্জরিত হইতে হয়। গভীর স্বদেশানুরাগ না থাকিলে কেহই এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। তিনি যে জীবনের অর্দ্ধসময় এই পবিত্র কাজে ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার গভীর স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, তাঁহার লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে। আমরা অনেক সময়ে তাঁহার "স্বদেশী-গ্রহণের"বিরুদ্ধ মন্তব্যের সহিত ঐক্য হইতে পারি নাই, কখন কখন সে সকলকে তদীয় জীবনের কলঙ্ক মনে করিয়াছি, পরন্তু কখন কখনও তাঁহার "স্বদেশীর" বিরুদ্ধ যুক্তিহীন লেখা পাঠ করিয়া অন্তরে বিশেষ যাতনা পাইয়াছি, কখনও কখনও সন্দেহ হইয়াছে, তবে কি তিনি স্বদেশের উন্নতিকামী নহেন? লুণ্ঠনে দেশ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তবু তিনি বুঝেন না, ইহা কিরূপ কথা? কত সময় ভাবিয়াছি, এত বড় লোকের লেখনী হইতে এ কি মত-ভ্রান্তি বাহির হইল! কিন্তু তবুও আজ মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত লেখনীতে অকপটচিত্তে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, মত-সংঘর্ষণ এ সংসারের ধূলি মাটীর জিনিস—তাহা ব্যক্তিত্ব-দূষিত, তাহা অসংযমের হলাহল। দেশের অধিকাংশ লোকের বিরুদ্ধে তাহার চলা স্বেচ্ছাচার-মূলক বলিয়াই উপেক্ষিত হইয়াছে। মানুষ অসম্পূর্ণ জীব, তাঁহাতে রাবিস বা ময়লা থাকা অসম্ভব নয়; তাহা থাকিলেই যে মনুষ্যের সমস্ত মহত্ব গেল, তাহা নয়। সে সকল পরিবর্জ্জন করিয়া, মানুষের প্রকৃত মহত্বের অনুসরণ করাই খাঁটী লোকের কর্ত্তব্য। যে রাবিস বা ময়লা তাঁহাতে ছিল, ব্যক্তির সহিত তাহা শ্মশানে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে;—এখন কেবল তাঁহার অমানুষী শক্তিই জাগিয়া উঠিতেছে;—আজ সকলে একবাক্যে কেবল তাহারই প্রশংসা করিতেছে। মত-রাহুতে তাঁহার প্রকৃত শক্তি-সূর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে নাই।

তাঁহার প্রকৃত শক্তি—শুধু তাঁহার লেখায় পরিস্ফুট হয় নাই;—উহাও বাহিরের জিনিস, হয় ত উহাও কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; হয় ত তাহাও কালে নিন্দিত হইবে; কিন্তু তাঁহার প্রকৃত মহত্ব—তাঁহার অনিন্দিত দেব-দুর্লভ পবিত্র চরিত্র। অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া তিনি সংসার-লীলা করিয়া গিয়াছেন—এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও কেহ তাঁহার চরিত্র-

* If he did not succeed as a journalist it was due not to any lack of ability on his part, but mainly to two causes.
Patrika—7th April, 1909.

স্খলন দেখে নাই।—তিনি সর্ব্বদা সংযত থাকিতেন, তাঁহার ভিতরের চিত্ত-সৌন্দর্য্য বাহিরে অতি অল্পই প্রকাশ হইত। প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণই এই যে, তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্ব-গভীরে; অতলেই গুপ্ত থাকে। নির্জ্জন বাস, নিভৃত সাধনের নিত্য সহায়। তিনি কোলাহলে, আন্দোলনে ঘুরিতে বড়ই ভয় পাইতেন। এদেশে প্রবাদ আছে "চুনাপুঁটী অল্প জলে ফর ফর করে, কিন্তু রোহিত কাত্‌লা গভীর জলে নীরবে বিচরণ করে।" আমরা ক্ষণবিদ্যুৎবৎ কতই চক্‌মক্ করি, কতই আস্ফালন করি, কতই লোক ভুলাইয়া বেড়াই, কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিকেরা গভীরে, অতলে, সদা সংসার-নিরপেক্ষ হইয়া, ডুবিয়া থাকেন। সেইরূপ ছিলেন, ঋষি রামতনু, ঋষি রাজনারায়ণ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সাধু অঘোরনাথ। নগেন্দ্রনাথ রাধাস্বামী সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিলেন, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের মতামত কি, আমরা তাহা জানি না। যাহাই হউক, যে সম্প্রদায় নগেন্দ্রনাথ ঘোষের চরিত্রের ন্যায় চরিত্র উৎপন্ন করিয়াছে, সে সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব অচিরে দেশে ব্যাপ্ত হইবে। তিনি চলিতে ফিরিতে, যাইতে বসিতে, হাটিতে শুইতে—সদা গাম্ভীর্য্যে ডুবিয়া থাকিতেন। বোধ হয়, তাঁহার চিত্ত সংসারের অতীত নিত্যানন্দ ধামে সদা প্রধাবিত ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব দিনও কাজ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, প্রুফ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু যখন সময় আসিল, নির্ব্বিকারচিত্তে, মহা যোগীর ন্যায়—নির্ব্বাণে আত্মসমর্পণ করিলেন। * নগেন্দ্রনাথের গভীর আধ্যাত্মিক জীবনের পরিস্ফুট চিত্র—তাঁহার যোগীজনোপযোগী মহা সমাধিতে প্রকটিত। ধন্য নগেন্দ্রনাথের অনিন্দিত,—দেবদুর্ল্লভ পূত চরিত্র।

তবে যাও, দেব, সেই নিত্যানন্দ ধামে, যেখানে যশ ও নিন্দার উত্তেজনা নাই,—সংসারের বিদ্বেষ-বিষের যন্ত্রণা নাই; অবিচারের কশাঘাত নাই,—এই মর্ত্ত্যভূমির যাহা কিছু তীব্র,—তাহার কিছুই নাই। তুমি অনিন্দিত যে পূত চরিত্র রাখিয়া গিয়াছ, আমরা হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়া, নিত্য তাহার অনুসরণ করি এবং পূজা করি,—আর তুমি—কারলাইল, এমারসন, শম্ভুচন্দ্র এবং প্রতাপচন্দ্রের সম-আসনে বসিয়া সেই মহেশ্বরের মহাধ্যানে নিমগ্ন হও, যাহার সমতুল্য পুরস্কার—ইহকাল ও পরকাল আর কোথাও নাই। তুমি কখনও সংসার-বিষে জর্জ্জরিত হও নাই—তোমাকে আর অধিক কি বলিব, তোমার নিকট এই একটী প্রার্থনা—তোমার অকপট স্বদেশ-ভক্তি ও স্বদেশ-সেবা এবং অনিন্দিত নির্ম্মল চরিত্র যেন এদেশে অনুসৃত হয়। তোমার অভাবে বঙ্গ আজ কাঁদিতেছে—তোমার স্থান আর পূর্ণ হইবে না, বলিতেছে, আশীর্ব্বাদ করিও, তোমার চরিত্রানুসরণ করিয়া এদেশে যেন তোমার ন্যায় শত শত লোকের অভ্যুদয় হয়। তবেই তোমার পরিশ্রম সার্থক হইবে এবং তোমার স্মৃতি অক্ষয় হইবে। বিধাতা তাহাই করুন।

* God's finger touched him and he slept. Indian Nation April 12, 1909.

হর্ষ-বিষাদ।

নূতন বৎসর, নূতন সচিব, নূতন রকমের আমাদের একটা আনন্দ। ইহা দেখিতে ভাল, শুনিতে ভাল, লোকের কাছে বলিতে ভাল, একটা গাল-ভরা সমাচার। পরন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ইহাতে কাহারও কোন লাভ হয় নাই, কাহারও পেট ভরে নাই, কাহারও কোন প্রকার দুঃখ ঘুচে নাই। ব্যাপারটা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

সিংহ মহাশয় নূতন ধরণের সিংহত্ব প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন; একরূপ আহ্লাদের বিষয়, সন্দেহ নাই যে, একজন ভারতীয় উপযুক্ত ব্যক্তি সম্রাট কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলেন, শ্বেতাঙ্গের একচেটিয়া রাজমন্ত্রীত্বে বরিত হইলেন। কিন্তু এই আশাতিরিক্ত পদোন্নতিতে তাঁহার লোকসান বৈ লাভ ত দেখি না, তিনি যাহা রোজগার করিতেছিলেন, হয় ত তাহার চারি আনা রকম তাঁহার এখনকার আয় হইল। সাধারণ লোকে বলে, "সকল কথা ফাঁকা, আসল কথা টাকা":—বাস্তবিক উপরে ভগবান নীচে টাকা, এই দুই আপনাপন ক্ষেত্রে সর্ব্বশক্তিমান, সেই টাকাই যখন এতটা কমিয়া গেল, তখন এই পদমর্য্যাদার সঙ্গে সিংহ মহাশয়ের ও তৎসঙ্গে আমাদের সমূহ ক্ষতি হইল বলিতেই হইবে। তারপর হাজার হইলেও চাকরী চাকরীই। এড্‌ভোকেট জেনেরলী চাকরী ছিল না, অন্যান্য মক্কেলের মত সরকার বাহাদুরের নিকট বার্ষিক একটা থোক টাকা পাইতেন মাত্র, উহাতে তাঁহাকে স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে হয় নাই। সিংহ মহাশয়কে আমরা যতদূর জানি, তিনি একজন অতি সুন্দর প্রকৃতির স্বাধীনচেতা জীব; এখন তাঁহাকে পরাধীন হইতে হইল, ইহা কম ক্ষোভের বিষয় নহে। চাকরীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটা পুরাতন কাহিনী মনে পড়িল;—অনেকেই জানেন, সুবিখ্যাত শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত সনাতন গোস্বামী গৌড়ের বাদশার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। একদা গভীর রজনীযোগে ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টির মধ্যে নরপতি তাঁহাকে তলব্ করেন, অগত্যা তিনি লোকলস্কর সহ রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাইতেছিলেন; পথের ধারে এক কুটীরস্থ মেথর তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল "বল্ দেখি এই অন্ধকার নিশিতে এই ভীষণ দুর্য্যোগে কে যাইতেছে?" মেথর্‌রাণী উত্তর করিল, "মানুষ কখন এমন সময় বাহির হইবে না, বোধ হয় কুকুর যাইতেছে।" ইহা শুনিয়া মেথর বলিল, "তোর ভুল হইয়াছে, কুকুরও কখন এরূপ অবস্থায় বাহির হইবে না, কোন প্রকার আশ্রয় গ্রহণ করত আরামে থাকিবে, এ নিশ্চয় চাকর, প্রভু ডাকিয়াছে, কাজেই বাধ্য হইয়া, এত কষ্টস্বীকার করিয়াও, তাঁহার নিকট যাইতেছে।" সনাতন সেইস্থানে একটু দাঁড়াইয়া মেথর-মেথরাণীর কথোপকথন শুনিলেন, মনে বড় ঘৃণা হইল, ভাবিলেন চাকরীর খাতিরে তিনি আজ কুকুরেরও অধম হইলেন। দৈবযোগে সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গৌড়নগরের সমীপে বিরাজিত ছিলেন; সনাতন তাঁহার চরণাশ্রয় করত:

সকল প্রকার দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। তদনন্তর কিছু দিন পরে সনাতন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশে গৌড়নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বাদ্‌শা স্বয়ং তাঁহার কুটীরে গিয়া বলেন, "সনাতন! শুনিয়াছি, তুমি একজন মহা বুজ্‌রুক হইয়াছ, আমাকে কিছু বুজরুকী দেখাও।" তিনি আসিতেছেন শুনিয়া সনাতন মুখ ফিরাইয়া বসেন, তদবস্থায় থাকিয়া গৌড়েশ্বরের কথার উত্তরে নির্ভীক চিত্তে বলিলেন, "কিছুদিন পূর্ব্বে যখন তোমার গোলামী করিতাম, কত কুর্ণিশ করিতে করিতে তোমার সিংহাসন্ সমক্ষে উপস্থিত হইতাম, আর আজ আমি সেই সনাতন তোমাকে উপেক্ষা করিয়া তোমার দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়া আছি, ইহা অপেক্ষা বড় বুজরুকী আর কি দেখিতে চাও?" ভূপতি স্তম্ভিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

তাই বলিতেছিলাম, চাকরী যত বড় বড় হউক না কেন, উহা হইতে গোলামীর কলঙ্ক কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। একারণ কবি গাইয়াছেন, "অসুখের শেষ চাকরী করা"। আমরা হীন, মহতের ভাবের ধার দিয়া যাইতে অক্ষম, আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ত এই বুঝি যে, নিতান্ত পেটের দায়ে এই দগ্ধোদর ভরিবার জন্য, দুর্ল্ভ মানব জনম পাইয়া লোক চাকরী করতঃ পরাধীনতা শৃঙ্খল গলায় পরিতে বাধ্য হয়। যাহার একমুষ্টি খাইবার, একখানা পরিবার সংস্থান আছে, তাহাতে যদি মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়া থাকে, সে কখনই শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহিবে না।

এর্চর্নিশ্রেণীতে যোগী আছে বা হইতে পারে, একথা শুনিলে অনেকে হয়ত আশ্চর্য্য বোধ করিবেন, কিন্তু বাস্তবিক একজন ছিলেন, আমরা জানি, তিনি এখন জীবিত কিনা বলিতে পারি না। প্রায় বার বৎসর হইল তিনি এক দিন আমাদিগকে বলেন যে, ব্যারিষ্টর এস্ পি, সিংহ যেরূপ উঠিতেছেন, কালে তাঁহার ব্যবসায়িক উন্নতির সীমা থাকিবেনা। কিন্তু একদিক হইলে আর একদিক হয় না, বিষয়ে বাড়িলে পরমার্থে কমিতে হয়। পার্থিব উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার কথা বিলক্ষণ ফলিয়াছে, পরমার্থ-তত্ত্ব আমরা বুঝি না, সুতরাং তদ্বিষয়ে কিছু বলিতেও পারি না। সিংহ মহাশয়ের বৈষয়িক উন্নতি লক্ষ্য করিয়া প্রধান বিচারপতি পেথেরাম সাহেবও উচ্চ আশা প্রকাশ করিতেন। সেই সিংহ মহাশয় আজ ব্যবসায়ে চরমোন্নতি লাভ করিয়াও, সমর্থ বয়সে, বিপুল ত্যাগস্বীকার করত পদমর্য্যাদার লোভে, তথা ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করিবার অভিপ্রায়ে, ইন্দ্রত্বপদে অভিষিক্ত হইয়া বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় যোজনা করিলেন।

এস্থলে আর একটা কথা আলোচনা করিলেও দোষের হয় না। অনেকের কাছে, সঙ্গে সঙ্গে সিংহ মহাশয়ের মুখেও, শুনা যাইতেছে যে, এই অভূতপূর্ব্ব দান ইংরাজরাজের স্বতঃপ্রবৃত্ত বদান্যতার ফল ভিন্ন আর কিছুই নয়; মহানুভব মর্লে-প্রমুখ লিবারেল সম্প্রদায় ভারতবাসীর প্রতি প্রীত হইয়া উদারচিত্তে এই উচ্চ সম্মান আমাদিগকে প্রদান করিলেন, ইহার আর কোন অন্যরূপ কারণ নাই। অবশ্য একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য যে, মুক্তহস্ততা ভিন্ন দানের প্রবৃত্তি আর কেহ হইতে পারে না, বদ্ধমুষ্টি ব্যক্তির নিকট এক কপর্দ্দকও আশা করা ঘোর বাতুলতা মাত্র,

পরন্তু কেহ কি বুক ঠুকিয়া বলিতে পারেন যে, সাম্রাজ্যময় ঘোর অশান্তির প্রাদুর্ভাব না হইলে এই প্ল্যানের জল্পনা রাজপুরুষদের মনে উদয় হইত ? তবে ভয়ের কথা যদি কেহ উল্লেখ করেন, তদ্বিরুদ্ধে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, বৃটিশ সিংহ মুণ্ডমালার দন্তবিকাশে ভীত হইবার লোক নহেন। ভারতবাসীকে কাহারও ভয় করিবার ত কোন কারণ দেখিতে পাই না, কঙ্কালসার শতকোটি জীব দশজন সবল শরীরীর নিকট কিছুই নয়, তখন ভয় কাহার বা কিসের ? তবে চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ খেঁকিকুকুর যদি অনবরত ঘেউ ঘেউ রবে চীৎকার করিতে থাকে, তজ্জন্য যে ঘোর অশান্তি উৎপন্ন হইবার কথা, অবশ্য তাহার ভয় আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। চীৎকারের মাত্রাটা আজকাল যে প্রকার বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এত বড় এক টুক্‌রা রুটি ফেলিয়া দেওয়া কিছু বেশী কথা নয়। কিন্তু ইহাতে যে কোলাহল প্রশমিত হইবে, এরূপ আশা ত দেখিতেছি না, কারণ এখনও অসংখ্য কণ্ঠ হইতে এই ধ্বনি শুনা যাইতেছে "ময় ভূঁখা হোঁ, ময় পিয়াসা হোঁ।" এই অগণ্য ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাতুর কুক্কুর জীবগুলিকে শান্ত করিতে গেলে যাহা যাহা চাই, তাহার ত কোনই আয়োজন দেখি না। জন কয়েক ভদ্রসন্তান বড় বড় চাকরী পাইলে ত কোটী কোটী কাঙ্গাল ভাইদের পেট ভরে না; যতদিন তাহাদের আর্ত্তনাদ বিধাতার সিংহাসন কাঁপাইতে থাকিবে, ততদিন রাজ্যে শান্তি আনয়ন করে কাহার সাধ্য ? তাই ভাবি সুচতুর অমাত্য মর্লে-মিণ্টো বাহাদুরদ্বয় যে মাদ্রাজী চা'ল চালিলেন, তাহাতে মন ভিজিবার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু চিড়া ত ভিজিবে না। ভারতের দীন দুঃখী প্রকৃতিবর্গের ক্লেশনিবারণের কি ব্যবস্থা হইতেছে ?

বহুকাল হইল প্রেমাবতার ধর্ম্মপ্রাণ কবীর একতন্ত্রী হস্তে লোকের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া গিয়াছেন :—

'দুঃখী পড়ে পাহাড়তর্ কোই না খবর লিন্।
সুখীকো যো কাঁট্‌গড়ে সবকোই হায় হায় কিন্।
অর্থাৎ
দুঃখী পড়ে পাহাড় তল কেহ খবর না লয়।
ধনীর পাশে ফুট্‌লে কাঁটা সবাই করে হায় হায় ॥

সাধারণতঃ জগতের এই নিয়ম বটে ; কিন্তু এখন ত অনেকে ইহা বুঝিয়াছেন যে, ব্যষ্টির সুখে প্রকৃত স্থায়ী সুখস্বচ্ছন্দতা একেবারে অসম্ভব, সমষ্টির কল্যাণ ব্যতীত সংসারে শান্তি পাওয়া যায় না। এই সত্যটী বুঝিতে পারিয়া আমাদের রাজজাতি তাঁহাদের দেশে দুঃখীর দুঃখমোচনের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন ; পরন্তু সেই বৃটিশ রাজপুরুষেরা আমাদের দেশে তদ্রূপ কোন চেষ্টায় চেষ্টাবান নহেন। ইহাই আমাদের বিলাপের কারণ।

ও সকল কথা এখন থাকুক, উপসংহারে আর একবার বলি যে, অত বড় মৃগেন্দ্রকে আমরা রাজদরবারে অতি সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, ইহাই আমাদের ক্ষোভের কারণ, উচিত মূল্য পাইলেও একটা কথা ছিল।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান। *

ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের চির বিরোধ ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। ধার্ম্মিক বৈজ্ঞানিককে সভয়ে নিরীক্ষণ করেন; বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম-প্রচারকের প্রতি বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের এই বিরোধ একান্তই অপরিহার্য্য কিনা, বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাই আলোচনার বিষয়।

অনেক সময়ে দেখা যায়, বিবাদের প্রকৃত কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও লোকে ভয়ঙ্কর বাক্য-সমরে প্রবৃত্ত হয়, পরে "আমিও ত তাহাই বলিতেছিলাম, আমিও ত তাহাই বলিতেছিলাম" বলিয়া বিপক্ষ ব্যক্তির কর মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রস্থান করে। উপস্থিত ক্ষেত্রেও বিবাদের কারণ এই জাতীয় কিনা, আমরা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব।

এ পৃথিবীতে লোকে ধর্ম্মের আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, এবং বিজ্ঞানের সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া বৈজ্ঞানিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; সুতরাং ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকা সত্বেও,ধার্ম্মিকের সহিত বৈজ্ঞানিকের ভয়ানক দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে পারে।

পাঁঠা খাওয়াটা ধর্ম্মের কার্য্য, কি মুর্গী খাওয়াটা প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ, বিজ্ঞান যতদিন ইহার মীমাংসায় ব্যস্ত থাকিবে, কিম্বা পৃথিবীর সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরাটাই বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সঙ্গত, কি সূর্য্যের পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরাটাই বিজ্ঞানানুমোদিত ধর্ম্ম, যত দিন ইহার বিচারে প্রবৃত্ত থাকিবে, ততদিন ধার্ম্মিকের সহিত বৈজ্ঞানিকের বন্ধুত্ব সংস্থাপনের আশা দুরাশা মাত্র। আমরা ধার্ম্মিক নহি, বৈজ্ঞানিক নহি; কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস, জাতি, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মনুষ্য হৃদয়ে চিরদিন বিরাজ করিতেছে ও করিবে; এবং প্রাকৃতিক নিয়মে একটা শৃঙ্খলা ও প্রকৃতির বিধানের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য অল্পাধিক পরিমাণে মূর্খের ও পণ্ডিতের হৃদয় চিরদিন আকর্ষণ করিয়াছে ও করিবে; তাই, সাহস করিয়া বলিতে পারি, যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি ধর্ম্মের প্রাণ হয়, আর প্রাকৃতিক ব্যাপারে নিয়ম ও শৃঙ্খলার আবিষ্কার যদি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মে ও বিজ্ঞানে প্রকৃত বিরোধ কোথাও নাই; পরন্তু ধর্ম্মই বিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং বিজ্ঞানই ধর্ম্মের ভিত্তি।

প্রভাত ও সন্ধ্যাগগনের তপন দেবের লোহিত মূর্ত্তি কত নয়নানন্দদায়ক; সুনীল আকাশের চন্দ্রের উদয় কত মনোহর; রজনীর অন্ধকারে যখন প্রকৃতি দেবীর স্বহস্তরচিত বর্ত্তিকাগুলি—সুদূর আকাশের সুবিন্যস্ত তারকা সমূহ, সহস্র হীরক খণ্ডের ন্যায় ঝক্‌মক্ জ্বলিতে থাকে, তখন কাহার না হৃদয় বিস্ময়-রসে আপ্লুত হয়? কিন্তু বিজ্ঞান সাহায্যে যখন আমরা জানিতে পারি যে, জগৎ-প্রকাশক তপনদেব শুধু একখানা তপ্ত থালা মাত্র নহেন, আয়তনে ইনি প্রায় ১৪ লক্ষ পৃথিবীর সমান, এবং ইহারই আকর্ষণে বদ্ধ হইয়া পৃথিবী এবং পৃথিবীর ন্যায়

* ২৭শে মার্চ, (শনিবার) গৌহাটি "ছাত্র সমাজে" পঠিত হয়।

আরও কয়েকটী বৃহদায়তনের পদার্থ ইহাকে বেষ্টন করিয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিতেছে, এবং ইহাদের পরস্পরের আকর্ষণে এমন সামঞ্জস্যের বিধান রহিয়াছে যে, কেহ কাহারও কক্ষ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হইতেছে না; যখন আমরা জানিতে পারি যে, অনন্ত আকাশের ঐ কোটী কোটী নক্ষত্র, জ্যোতিতে বিমল-কিরণ চন্দ্রদেব দ্বারা পরাজিত হইবার নহে, প্রকৃত পক্ষে ইহারা এক একটী প্রকাণ্ড সূর্য্য এবং ইহারা আমাদের নিকট হইতে এত দূরে অবস্থিত যে, সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে চলিয়াও আলোক ইহাদের কোন কোনটার নিকট হইতে এক মনুষ্যজীবনেও আমাদের এই পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারেনা। যখন এই বিশ্বের প্রকাণ্ডত্ব আমাদের প্রকৃতভাবে উপলব্ধি হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি, এ অনন্ত বিশ্বে পৃথিবী একটী সামান্য বালুকা কণামাত্র; আর, পৃথিবীবাসী আমরা, আমরা অণুর অণু, কীটাণুকীট, নগণ্য ক্ষুদ্র জীব। তখন আমাদের জ্ঞানগর্ব্ব ভাঙ্গিয়া যায়, তখন আমাদের মস্তক, আমাদের অজ্ঞাতসারে এই অপূর্ব্ব কৌশলময় বিশ্ববিধাতার চরণে আপনি প্রণত হইয়া পড়ে। যখন দূরবীক্ষণ সাহায্যে শক্তি সম্পন্ন হইয়া কোটী যোজন দূরস্থিত নক্ষত্রজগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস কার্য্য লক্ষ্য করি ও অনুবীক্ষণের সহায়তায় সূক্ষ্ম দৃষ্টি পাইয়া জলবিন্দু মধ্যবর্ত্তী সহস্র সহস্র কীটের ভীষণ জীবন-সংগ্রাম অবলোকন করি, তখন প্রকৃতির এই সৃষ্টি ও ধ্বংসকারিণী মূর্ত্তি আমাদের মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়, হর্ষ ও আশঙ্কা উৎপাদন করে। তখন মনে হয়, যিনি সত্যস্বরূপ, সত্যপথ অবলম্বনেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, আর বিজ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে না লইয়া সেই সত্য পথে প্রবেশ করিবার অধিকার কাহারও নাই।

কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি,—

(১) নিউটন তাঁহার গভীর নিয়মে বলিয়াছেন "ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া আছে।" যখনই দেখিবে, কোন একটী পদার্থ অপর একটী পদার্থের প্রতি বল প্রয়োগ করিতেছে (টানিতেছে বা ঠেলিতেছে) তখনই বুঝিবে, দ্বিতীয় পদার্থও প্রথমটীর প্রতি সমান বল প্রয়োগ করিতেছে। চুম্বক যখন লৌহকে আকর্ষণ করে, লৌহও চুম্বককে সমান পরিমাণে আকর্ষণ করে বা টানে। পৃথিবী যখন বৃষ্টি বিন্দুকে আকর্ষণ করে, বৃষ্টি-বিন্দুও পৃথিবীকে ঠিক সেই পরিমাণে আকর্ষণ করে। সূর্য্য পৃথিবীকে টানে, পৃথিবীও সূর্য্যকে সমান টানে। ঘোড়া যখন গাড়ীকে টানে, গাড়ীও ঘোড়াকে টানিয়া থাকে এবং সমান পরিমাণে টানে। ইহা জড় বিজ্ঞানের কথা; পরীক্ষা দ্বারা ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যেখানেই টান আছে, সেই খানেই উহার পাল্টা টান আছে; আকর্ষণ মাত্রেরই পাল্টা আকর্ষণ আছে। 'ক' 'খ'কে আকর্ষণ করিলে 'খ'য়েরও 'ক'কে আকর্ষণ করিতেই হইবে; আকর্ষণ উভয় পথ হইতে হইবে এবং সমান পরিমাণে হইবে। যেমন আকর্ষণ সম্বন্ধে, তেমনি বিকর্ষণ সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম; 'ক' যদি 'খ'কে ঠেলিয়া দেয়, তবে 'খ'ও "ক'কে ঠেলিয়া দিবে—সমান বলে ঠেলিয়া দিবে। দুইটী চুম্বকের উত্তর ধ্রুব কাছাকাছি রাখিলে দেখা যায়, উভয়েই উভয়কে ঠেলিয়া দেয়। 'ক' 'খ'কে ঠেলিয়া দিলে 'খ' ও 'ক'কে ঠেলিয়াই দিবে, টানিয়া আনিবে না; আবার 'ক' 'খ'কে টানিয়া

আনিলে 'খ' ও 'ক'কে টানিয়াই আনিবে, ঠেলিয়া দিবে না। ইহা জড় বিজ্ঞানের নীরস কথা। কিন্তু যিনি ভাবুক, তিনি কি ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়াই, ঐ পর্য্যন্ত জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন? না; ভাবুক বলিবেন, 'তবেই দেখ বৈজ্ঞানিক, তুমি টেনে ধর্‌লেই আমি টেনে ধরি, তুমি ঠেলে দিলেই আমাকে ঠেলে দিতে হয়; ভালবাসিলেই ভালবাসি, আর তুমি ঘৃণা করিলেই আমাকে ঘৃণা করিতে হয়। ভাই, আইস ভাই বৈজ্ঞানিক, তোমার গবেষণা, তোমার পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞানকেই ভিত্তি করিয়া আমরা জগতে প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করি, আইস জোর করিয়া আমরা সকলকে বলি "যদি ভালবাসা পাইতে চাহ, তবে ঘৃণা করিও না। যদি ঘৃণা কর, প্রতিদানে ঘৃণা পাইবে, ভালবাসা পাইবে না; আইস সকলকে বলি, অজ্ঞ নরের চক্ষু ফুটাইবার জন্য, জগতে প্রেমশিক্ষা দিবার জন্যই করুণাময় বিধাতা, এই বাহ্য-জগতে, এই জড়জগতে, জড়ে জড়ে মহাকর্ষণের সৃষ্টি করিয়াছেন। আইস, জ্ঞানান্ধ মানবকে বলি, যদি জড়ের অধম না হইতে চাহ, যদি জড়ের উপর তোমার আসন বলিয়া গর্ব্ব কর, তবে জানিও—

"এ বিশাল বিশ্ব ভালবাসাময়
প্রতি অণুহৃদে প্রেমের বাস।
বিনা প্রতিদান, বিনা বিনিময়,
প্রেম নাহি হয় কভু প্রকাশ।"

(২) বিজ্ঞান বলিতেছেন "জড় অবিনশ্বর, জড়ের ধ্বংস কল্পনাতেই আসে না।" বিজ্ঞানের এই গর্ব্বপূর্ণ উক্তি শুনিয়া, জড়ের এই প্রাধান্যের কথা শুনিয়া দার্শনিক ধার্ম্মিক কি আত্মার বিলোপ প্রাপ্তিভয়ে সশঙ্কিত হইয়া পড়িবেন?—ধার্ম্মিক বলিবেন "তবেই দেখ বৈজ্ঞানিক, যদি তুমি জড়েরই ধ্বংস কল্পনা করিতে পার না, তবে তুমি যাহার বলে গর্ব্ব কর, যাহাকে তুমি, প্রকৃতপক্ষে 'আমি' বল, যাহা তোমার আত্মা, তাহার ধ্বংস তুমি কি প্রকারে কল্পনা করিতে পার? তোমাকে বলিতেই হইবে, সময়ের অন্ত পর্য্যন্ত তোমার আত্মা কোন না কোন ভাবে বিরাজ করিবেই করিবে।

(৩) বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "শুধু জড় নহে, জড়জগতে শক্তিও অবিনশ্বর। যেমন জড় সৃষ্টি করা বা ধ্বংস করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, সেইরূপ, জড়ের শক্তিরও সৃষ্টি করা বা ধ্বংস করা চলে না। জড়ের শক্তি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিয়া থাকে। শক্তি কখনও আলোকরূপে, কখনও তাপরূপে, কখনও শব্দরূপে, কখনও তড়িৎপ্রবাহরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শক্তি এখন আলোকরূপে বিরাজিত; পরে আলোকের ধ্বংস হইয়া উহা তাপরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। তাপ অথবা আলোকের লোপ প্রাপ্তি ঘটিতে পারে, মূর্ত্তি বিশেষে শক্তির ধ্বংস হইতে পারে বটে, কিন্তু যে পরিমাণ শক্তি এক মূর্ত্তিতে লোপ প্রাপ্ত হইবে, ঠিক্ ঐ পরিমাণ শক্তি অন্য মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিবে। মোটের উপর, শক্তির বিনাশ নাই; সমগ্র জগতের শক্তির পরিমাণ আজিও যাহা আছে, কল্যও তাহাই ছিল, আবার কল্যও তাহাই থাকিবে, উহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। বৈজ্ঞানিকের এই কথা শুনিয়া ধার্ম্মিকের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল না কি? ধার্ম্মিক দেখিলেন, বৈজ্ঞানিক যাহা বলিতেছেন, সকলই তাঁহার মতের পোষকতা করিতেছে, দুর্ব্বোধ্য বিষয় সরল করিতেছে, তাঁহার স্বর্গে উঠিবার

সিঁড়ির আবর্জ্জনাসমূহ সাফ করিয়া ফেলিতেছে। তখন তিনি পরীক্ষা-লব্ধ সত্যের দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে জগৎ সমক্ষে বলিবেন "আর তবে ভাই, অলস, অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করিয়া ইহকালের উন্নতির পথে, পরকালের সুখের পথে কণ্টক রোপণ করিও না।" বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, জড়জগতের শক্তি অবিনশ্বর, জড়ের কার্য্যের ধ্বংস নাই, কোন না কোন মূর্ত্তিতে উহা বিরাজ করিবেই করিবে। যদি তুচ্ছ জড়ের শক্তিরই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে,তবে কি আমাদের মনের শক্তির, মানসিক কার্য্য সমূহের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই! না; তাহা কখনও হইতে পারে না; তোমার মনের প্রত্যেক কার্য্য, তোমার প্রত্যেক ভাব, প্রতি ইচ্ছা, তোমার সুভাব ও তোমার কুভাব, তোমার রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার, আত্মাভিমান ও তোমার পরোপকারবৃত্তি কোন না কোনরূপে জগতে চিরকাল বিরাজ করিবেই করিবে। শক্তির এক মূর্ত্তির লোপসাধন হইলেও অন্য মূর্ত্তিতে উহা ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। এখন, তোমার মনে ক্রোধের উদয় হইয়াছে; সময়ে ক্রোধের লোপ হইবে, কিন্তু অনুতাপাগ্নি তোমার হৃদয়ে তখন প্রজ্জ্বলিত হইবে। তাই বলিতেছি, সতর্ক হও, ভবিষ্যতের চিন্তা কর তোমার ভবিষ্যতের সহিত তোমার বর্ত্তমানের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তোমার বর্ত্তমান তোমার অতীতের দ্বারা নিয়মিত হইতেছে। তুমি যাহা কিছু কর, তোমার সমস্ত কার্য্য, কোন না কোন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে ও করিবে। তোমার কার্য্যের ফল তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে,কর্ম্মফল-ভোগ তোমার এড়াইবার যো নাই। আজ যে সামান্য পাপ-চিন্তা টুকু তোমার অন্তরে কালিমার রেখা অঙ্কিত করিতে না করিতে বিলীন হইয়া গেল, মনে রাখিও, উহা একেবারে মুছিয়া যায় নাই, জলন্ত অক্ষরে প্রকৃতির গাত্রে উহা চিরকালের জন্যে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। আজ যে সামান্য পরোপকারবৃত্তি তোমার মনে উদিত হইলেও তুমি উহার সফলতা সম্পাদনে অকৃতকার্য্য হওয়ায় তোমার অন্তঃকরণে ক্ষোভ উৎপন্ন করিল, মনে রাখিও, ঐ ক্ষোভেই উহার পরিসমাপ্তি নহে; ঐ পরোপকার বৃত্তি, ঐ ক্ষোভ, বিশ্বরচয়িতার বিশ্বগ্রন্থে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে; মনে রাখিও, পাপ কখনও শাস্তির হস্ত এড়াইবে না, পুণ্য কখনও অপুরস্কৃত থাকিবে না।

(৪) তাপ প্রয়োগ করিলে পদার্থ মাত্রই প্রসারিত হয়, উহার আয়তন বাড়িয়া যায়; আবার তাপ বাহির করিয়া লইলে উহা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ইহা বিজ্ঞানের কথা। এই নিয়মের কি ব্যতিক্রম নাই? কোন একটা পদার্থ সম্বন্ধেও কি এই নিয়মের অপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায় না? না, প্রকৃতির বিধান সার্ব্বভৌমিক; সর্ব্বত্র সমানভাবে বিরাজমান। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল,—না, ঐ নিয়ম সার্ব্বভৌমিক নহে—ইহারও ব্যতিক্রম আছে। জল, ঠাণ্ডা করিলে ক্রমে সঙ্কুচিত হয় বটে, কিন্তু উহার উষ্ণতা ৪ ডিক্রীর কম করিলে আর উহা সঙ্কুচিত হয় না; তৎপরে উহার আয়তন ক্রমে বাড়িতে থাকে। তবেইত, প্রকৃতির বিধানে অপূর্ণতা আসিয়া পড়িল, প্রাকৃতিক নিয়মে ক্রমভঙ্গ সম্ভব হইল। তাহা হউক, কিন্তু সে অপূর্ণতা, সে ক্রমভঙ্গ কি মধুর! এই ব্যতিক্রম, এই অপূর্ণতার সঙ্গে। সৃষ্ট জীবের জীবন মরণের কি মধুর সম্বন্ধ বিরাজ করি-

তেছে। নিয়মের এই ব্যভিচার আছে বলিয়াই মৎস্য প্রভৃতি জলচর জীব জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে—নতুবা, যদি ৪ ডিক্রীর নীচেও জল ক্রমাগত সঙ্কুচিত হইয়া উহার গুরুত্ব বাড়িতে থাকিত, তাহা হইলে শীতপ্রধান দেশে সেই জমাট গুরু বরফ জল অপেক্ষা ভারী হইয়া নদী, নালা, পুষ্করিণীর তলদেশ আশ্রয় করিত, এবং উপরিস্থিত জলরাশিও অনুরূপ ভাবে শীতল হইয়া বরফ সৃষ্টি করিতে করিতে সমুদয় জলরাশিকে কঠিন পদার্থে পরিণত করিত। কিন্তু মঙ্গলময় বিধাতা জীবের মঙ্গলের জন্য প্রাকৃতিক নিয়মের গতিরোধ করিয়াছেন,—তাই বরফ জল অপেক্ষা লঘু—তাই লঘু বরফ জলের উপর ভাসিয়া নিম্নের জলরাশিকে জলচর জীবের আবাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহাই বিধাতার করুণা। জীবের মঙ্গলের জন্য বিধাতা স্বকীয় বিধান খণ্ডন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু, জ্ঞানপথে অধিকতর অগ্রসর হইয়া আমরা যখন জানিতে পারি যে,মঙ্গলোদ্দেশ্যমূলক উপরিউক্ত ব্যতিক্রম প্রকৃতপক্ষে ব্যতিক্রম নহে—মঙ্গলোদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তিলমাত্রও নিয়মের অন্যথা করা হয় নাই, যখন বুঝিতে পারি যে, ৪ ডিক্রীর কম উষ্ণ জলেও ঐ নিয়ম একই ভাবে ক্রিয়া করিতেছে, কেবল অণু সমূহের এক প্রকার নূতন সমাবেশ হইয়া দানা বাঁধিবার ফলে বরফজল অপেক্ষা লঘু হইয়া পড়িয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিধাতার মঙ্গলোদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, তখন জ্ঞান ও ভক্তি, আনন্দ ও বিস্ময়, আশা ও তৃপ্তি যুগপৎ উদিত হইয়া আমাদের অন্তঃকরণ আমাদের অজ্ঞাতসারে বিধাতার করুণার ভিখারী হইয়া পড়ে।

ধার্ম্মিক বলি কাহাকে? যাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ়, ঈশ্বরে ভক্তি অচলা। এই বিশ্বাস ও এই ভক্তির মূল কোথায়?—তাঁহার মহিমা দর্শনে, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার উপলব্ধিতে। কে তাঁহার মহিমা কিয়ৎপরিমাণেও অনুভব করিতে পারে?—কে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অনন্তশক্তির যৎকিঞ্চিৎ আভাষ পাইতে পারে?—জ্ঞানী। তাই বলিতেছি, ধার্ম্মিক ও বৈজ্ঞানিক ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীব নহেন। যিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তিনি ধার্ম্মিক; যিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক, তিনি জ্ঞানী। বৈজ্ঞানিক বলেন, এই যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছ, ইহা সর্ব্বত্রই নিয়ম দ্বারা চালিত হইতেছে,—সে নিয়ম অখণ্ডনীয়, অপরিবর্ত্তনীয়,—মহান্। সে নিয়মে ব্যতিক্রম নাই, ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, দেশ, কাল, পাত্র বিচার নাই—সে নিয়ম সকল দেশে, সকল কালে, সমান ভাবে ক্রিয়া করিতেছে। ধার্ম্মিক বলেন "তথাস্তু; এই বিরাট বিশ্ব সর্ব্বত্রই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। সে নিয়ম সকল দেশে, সকল কালে, সমান ভাবে ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে; তাই আইস ভাই বৈজ্ঞানিক, সেই নিয়মের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই শৃঙ্খলার রচয়িতা, সেই অনন্ত উদারতা, অনন্ত করুণা, অনন্ত শক্তির আধার সেই বিরাট পুরুষের শরণাপন্ন হই। আইস, ভক্তিভরে, যুক্তকরে, আমাদের জরা-মরণসম্পন্ন এই ক্ষুদ্র জীবনের দুঃখ কষ্ট তাঁহাকে জানাই। বৃথা সে বৈজ্ঞানিকের বিদ্যার্জ্জনশ্রম, যিনি জগতে নিয়ম ও শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিয়া তাঁহার পশ্চাতে নিয়ন্তার মঙ্গলময় হস্ত কখনও অনুভব করিতে পারেন নাই। বৃথা সে ধার্ম্মিকের আত্মপরিতৃপ্তি, যিনি সমগ্র জীবন প্রেম ও ভক্তির বিমল প্রবাহে প্রবাহিত

হইয়া, সাগরভ্রমে পর্ব্বত-গহ্বরের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়াছেন। যদি তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে জানিতে চাহ, তবে তাঁহার স্বরূপ অনুসন্ধান কর—এই ব্রহ্মাণ্ডটা ছাড়িয়া দিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতির অনুসন্ধান করিও না। যদি প্রকৃত ধার্ম্মিক হও, তাহা হইলে প্রকৃতির বিধানে নয়ন আবৃত করিলে চলিবে না। যদি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হও, তাহা হইলে জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলায়, প্রেম ও করুণার অস্তিত্ব উপলব্ধি না করিয়া পারিবে না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ফরিদপুরের ধন্বন্তরি।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ফরিদপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা আসিয়া কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তখন ফরিদপুর কি এবং কোথায়, ইহা পশ্চিম-বঙ্গবাসী সহপাঠিগণের কৌতূহল উৎপাদন করিত। যখন আমরা বলিতাম, ফরিদপুর একটী জেলা, তাহার উত্তরে এক জন বলিয়াছিলেন—"কৈ এমন জেলার নাম ত কোন দিন শুনি নাই! ইহা বোধ হয় ম্যাপে পাওয়া যাইবে না।" সেই মানচিত্রে অস্তিত্ববিহীন নগণ্য ফরিদপুর আজ বঙ্গদেশে, এমন কি, সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সে কাহার জন্য? চারিটী উজ্জ্বল নক্ষত্র ভারতের এই গগনকোণে সমুদিত হইয়া সমগ্র দেশ আলোকিত করিয়াছে বলিয়া। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী এবং স্বর্গীয় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন কবিভূষণ, এই চারি মহাত্মা ফরিদপুরের সেই চারিটী উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইঁহারা নিজ নিজ কক্ষকেন্দ্রে এক একজন অসাধারণ পুরুষ। নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে দেশের অভ্যুদয় কল্পে ইঁহারা অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। প্রথমোক্ত মহাত্মার নাম হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের ইতিহাসে অনন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতব্যাপী প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। দেবীপ্রসন্নের নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। আর আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যে ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-নৈপুণ্যে কবিরাজ দ্বারকানাথ বিগত ত্রিশ বৎসর বিপুল কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই শেষোক্ত নক্ষত্রটী, আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, সম্প্রতি অস্তমিত হইয়াছেন।

আজ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আলোচনা ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার স্রোতে দেশ প্লাবিত। কলিকাতার গলিতে গলিতে এখন কবিরাজগণের সাইন্‌বোর্ড, গলিতে গলিতে কবিরাজী ঔষধের দোকান। এখন কবিরাজী চিকিৎসার প্রসার প্রতিপত্তি এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। অমুক চন্দ্র দাস বা সেন গুপ্ত, কাব্যকণ্ঠ বা কবিচূড়ামণি—(সম্ভবতঃ কবি ও কাব্যের সহিত আয়ুর্ব্বেদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ)—উপাধি গ্রহণ করিয়া কলিকাতার এক গলিতে বাসা করিয়া সাইন্‌বোর্ড টাঙ্গাইলেন এবং এক বিজ্ঞাপন বাহির করিলেন। সেই বিজ্ঞাপন-পুস্তিকার ললাটে লেখা "ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণামারোগ্যং মূল-

মুত্তমম্” এই শ্লোক—তাহার মধ্যে লেখা, “অন্যান্য সমস্ত কবিরাজ যে ঔষধ প্রস্তুত করেন, তাহা কৃত্রিম, কেবল আমার ঔষধই খাঁটি”—তাহার শেষে লেখা, “আমাদের প্রস্তুত—সুগন্ধ ক কুসুম-তৈল (কবিরাজ মহাশয়-দিগের কল্যাণে সব রকম কুসুম ফুরাইয়া গিয়াছে, এখন বাকী কেবল আকাশকুসুম !) সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ, তাহা ব্যবহার করিলে স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়, মূর্খ পণ্ডিত হয়,” ইত্যাদি। এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ার অল্পদিন পরেই দেখিবে, সেই কবিরাজ মহাশয় মফঃস্বল হইতে অর্ডার পাইতেছেন এবং কলিকাতায়ও তাঁহার পসার হইতেছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁহার ভিজিট ৪৲ টাকা হইবে, দশ বৎসরের মধ্যে তিনি ৮৲ টাকার কমে কোথায়ও পদার্পণ করিবেন না!

কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। তখন ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে কবিরাজ Quack (হাতুড়ে) বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার অপরাধ এই, যদিও ঔষধ ব্যবহারে রোগ সারে, তবু তিনি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাঁহার চিকিৎসা প্রণালীর ব্যাখ্যা (demonstrate) করিতে পারেন না। হাতের নাড়ী ধরিয়া কবিরাজ যে রোগ নির্ণয় করিতে পারেন, একথা তখন কেহ বিশ্বাস করিত না। এমন কি, এখনকার দিনেও এরূপ ইংরেজী শিক্ষিত লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা বলেন, রোগ নির্ণয় করা কবিরাজ-দিগের সাধ্যায়ত্ত নহে, তাঁহারা ডাক্তারদের নিকট শুনিয়া চিকিৎসা করেন। যে কয়জন মহাত্মার কার্য্যকৌশলে এবম্প্রকার সংস্কারপূর্ণ কলিকাতার শিক্ষিত-সমাজে আর্য্যজাতির প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা বদ্ধমূল হইয়াছে, আমাদের ফরিদপুরের দ্বারকানাথ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পূর্ব্বে এই আয়ু-র্ব্বেদ বিদ্যারূপ সুরতরঙ্গিণী কোন খ্যাতনামা গঙ্গাধরের শিরঃশোভা সম্পাদন করিতেন। আমাদের দ্বারকানাথই সেই সুরধুনীকে ভগীরথের ন্যায় নিম্নবঙ্গে প্রবাহিত করিয়া সমগ্র দেশবাসীর শোকতাপ হরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রভাবেই আজ সমগ্র দেশ সেই ভাগীরথীর মৃতসঞ্জীবনী সুধাধারায় প্লাবিত। এমন কি, এলোপ্যাথিক চিকিৎসার অন্ধ-পক্ষপাতী ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে “মহামহোপাধ্যায়” উপাধিতে ভূষিত করিয়া আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহা আমাদেরও বিশেষ গৌরবের কথা।

কিন্তু দ্বারকানাথ কেবল ভগীরথ নহেন, তিনি একজন ধন্বন্তরি। তিনি আমাদের ফরিদপুরের ধন্বন্তরি। ফরিদপুরবাসী জন-সাধারণের দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, একবার তাঁহাকে দেখাইলে সব রোগ সারিয়া যাইবে। তাই কঠিন রোগগ্রস্ত অর্থশালী রোগিগণ কলি-কাতায় আসিয়া তাঁহাকে দেখাইতেন, আর যাঁহারা অর্থহীন, তাঁহারা সেই ধন্বন্তরির দর্শ-নাভিলাষে পূজার অবকাশ পর্য্যন্ত পথপানে চাহিয়া থাকিতেন; এবং পূজার সময় তিনি বাড়ী আসিলে তাঁহাকে দেখাইয়া কৃতার্থ হইতেন। তাই, দুই একবার, পূজার সময়ে খান্দারপাড় গিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার ঘাটে অসংখ্য রোগীর নৌকা বাঁধা। তিনি দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া, হাসিমুখে উপস্থিত রোগীদিগকে দেখিয়া, যথাযোগ্য ব্যবস্থা ও ঔষধ প্রদান করিতেন। দুর্গোৎসব উপলক্ষে অনেক ধনশালী ব্যক্তি অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন, আমাদের ধন্বন্তরি

মহাশয় সেই সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ বিতরণও করিতেন।

অনেকের ধারণা, যাঁহারা ইংরেজীশিক্ষিত নহেন, তাঁহাদের তেমন কর্ত্তব্যবোধ (sense of duty) নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ভ্রান্ত, কবিরাজ দ্বারকানাথ তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তিনি একদিন কথায় কথায় আমাকে বলিয়াছিলেন—"দেখুন, আপনাদের বিশ্বাস, আমরা স্বাধীন, আর আপনারা গবর্ণমেণ্টের চাকুরি করেন বলিয়া পরাধীন। সেটা একেবারেই ভুল। আপনারা একজনের গোলাম, আমরা সাত জনের গোলাম। আপনারা আফিসের কয়েক ঘণ্টা কাজ করিয়াই খালাস পান, আর আমাদের দিন নাই, রাত্রি নাই, কেবলই রোগীর ভাবনা ভাবিতে হয়। কত লোকের জীবন মরণ আমাদের হাতে, ইহাতে আমরা সুখে নিদ্রা যাইব কি করিয়া?" বলা বাহুল্য; তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চিকিৎসকই এরূপ বলিতে পারেন। এমন ইংরেজীশিক্ষিত কৃতবিদ্য ডাক্তারও ত দেখিয়াছি, যাঁহার রোগীর সহিত সম্বন্ধ কেবল সাত মিনিটের জন্য। অর্থাৎ থার্ম্মামেটার লাগাইয়া বসিয়া থাকিতে পাঁচ মিনিট (তাহাও আবার এখন এক মিনিটের থার্ম্মামেটার হইয়াছে!)—রোগীর নাড়ীর স্পন্দন গণনা করিতে লাগে এক মিনিট—আর প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ লিখিতে লাগে এক মিনিট্। ডাক্তার সিঁড়ির উপর থাকিতে থাকিতেই হাত বাড়ান, রোগীর নাড়ী ধরিবার জন্য; আবার এই সাত মিনিটের পরই লম্ফ দিয়া উঠিয়া পশ্চাৎ না ফিরিয়া আর একবার হাত বাড়ান, ভিজিট গ্রহণের জন্য। ভিজিটের টাকা কয়টী পকেটস্থ করিয়াই অমনি গুড্‌ গড্‌ করিয়া প্রস্থান করেন। এই শ্রেণীর চিকিৎসকের অগাধ বিদ্যা থাকিতে পারে, যথেষ্ট হাতযশও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাঁদের উপর রোগীর বিশ্বাস থাকে কি? এরূপ হটকারী-চিকিৎসকের যে ভুল ভ্রান্তি হইতে পারে, তাহার বিচিত্র কি? কবিরাজ দ্বারকানাথ ধীরচিত্ত ছিলেন বলিয়াই সর্ব্বশ্রেণীর রোগীর বিশ্বাসভাজন হইয়া এতদূর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ কেবল একজন ধন্বন্তরি বলিয়া তাঁহার গৌরব নহে, তিনি একজন মনস্বী পুরুষ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়া, তিনি দারিদ্র্যের কষ্ট বুঝিতেন। এইজন্য দরিদ্রকে তিনি কখনও উপেক্ষা করিতেন না, তাঁহার নিকট একজন ধনবানের যে আদর, দরিদ্রেরও সেই আদর ছিল। সকলকেই হাসিমুখে যথাযোগ্য ব্যবস্থা দান করিতেন। বিশেষতঃ ফরিদপুর জেলার নাম করিলে, তাঁহার নিকট অতিদীন হীন ব্যক্তিও অশেষ সমাদর লাভ করিত। দেশের কথা উঠিলে তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিত। একজন পরিচিত দেশের লোক দেখিলে তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইতেন। তখন শত কাজ ফেলিয়া ফরিদপুরের কথা লইয়া মজিয়া যাইতেন। অধ্যয়নশীল ছাত্রবৃন্দের অধ্যাপনা, গৃহপূর্ণ রোগীর ব্যবস্থা-দান পরিত্যাগ করিয়া, কত দিন নিভৃতে বসিয়া এই প্রবন্ধলেখকের সহিত দেশের কথার আলোচনা করিয়াছেন।

তাঁহার প্রাধান্য লাভের আর একটী কারণ, তাঁহার সহৃদয়তা ও সামাজিকতা। তিনি সকল শ্রেণীর লোককে যথাযোগ্য আলাপ ব্যবহারে মুগ্ধ করিতে পারিতেন। এ বিষয়ে আমার নিজের যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহা অাত্মগরিমা প্রকাশের আশঙ্কা

সত্ত্বেও না বলিয়া পরিলাম না। কবিরাজ মহাশয় আমাকে বাল্যকাল হইতে বিশেষ রূপে জানিতেন এবং স্নেহ করিতেন। আমার চাকুরী হওয়ার চারি পাঁচ বৎসর পরে, উড়িষ্যা হইতে ছুটী লইয়া দেশে যাইবার সময় একদিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি প্রথম দর্শনে আমাকে চিনিতে পারেন নাই, কারণ অনেক দিনের পর দেখা এবং আমার চেহারারও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তাঁহার ছাত্র কুঞ্জলাল (ইনি এখন "ভিষগরত্ন" উপাধিতে পরিচিত) তখন তাঁহার কাণে কাণে কি বলিলেন, আর অমনি কবিরাজ মহাশয় হাসিতে হাসিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"একে ত সিংহ, তা'তে আবার ডেপুটী—ভয়ে আমার কথা সরিতেছিল না।" বলা বাহুল্য, উহাতে আমিই অধিক লজ্জিত হইলাম।

ইহার পর আর একদিন ঢাকায় দেখা। তিনি ঢাকার কোন বড় লোকের (বোধ হয় ভাওয়ালের রাজার) চিকিৎসার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহার বাসায় দেখা করিতে গিয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য। আমাকে দেখিয়া যে কত আনন্দিত হইলেন, তাহা বলা যায় না। পরে রেলওয়ে ষ্টেসনে আর একবার দেখা হইল। তাঁহার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বেশ, অর্থাৎ পায় চটীজুতা ও গায় একটী সামান্য চাদর দেখিয়া আমি যেন কি বলিলাম। তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—"দেখুন, এই চটীজুতা পায় দিয়া আমরা যাহা করিয়া গেলাম, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আর যত দিন বাঁচিব, এই চটীজুতাই পরিব।"

চুয়াডাঙ্গা থাকিবার সময় আমার স্ত্রীর শিরঃপীড়ার জন্য তাহাকে কলিকাতা লইয়া গিয়া কবিরাজ মহাশয়কে দেখাইলাম। আমি যেখানে উঠিয়াছিলাম, তিনি তাঁহার প্রধান ছাত্র হরিহর বাবুকে সঙ্গে করিয়া সেখানে আসিয়া আমার স্ত্রীকে দেখিলেন এবং যথোচিত ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। আমি ভিজিটের কথা সাহস করিয়া তাঁহার নিকট বলিতে না পারিয়া, হরিহর বাবুর হাতে ষোলটী টাকা দিতে উদ্যত হইলাম। কবিরাজ মহাশয় তাহা দেখিয়া বলিলেন—"সে কি? আপনার কাছে আমি ভিজিট লইব কেন?"

আমি বলিলাম—"লইবেন না কেন? আমার পাঠ্যাবস্থায় লইতে বলি নাই, এখন আমি ঈশ্বরেচ্ছায় চাকুরী করিয়া দু'টাকা রোজগার করিতেছি। এখন আপনাকে ভিজিট লইতে হইবে।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করি, আপনি চাকুরীতে উন্নতি লাভ করিয়া আরও অধিক উপার্জ্জন করেন। আমি আপনার কাছে ভিজিট লইতে পারিব না।"

গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিতে ভূষিত করিলে, আমি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন—"গবর্ণমেণ্ট আমাকে উপাধি দান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি আমার আত্মীয় বন্ধুগণের স্নেহ ও ভালবাসা অধিকতর গৌরবের বিষয় মনে করি।"

এইরূপ তাঁহার আদর্শ মনুষ্যোচিত গুণগ্রামের বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এরূপে একাধারে সর্ব্বগুণের সমাবেশ, অগাধ পাণ্ডিত্যে অসীম বিনয় ও নম্রতা, অতুল ঐশ্বর্য্যে নিরতিশয় সরলতা ও নিরভিমান, উচ্চ পদে আন্তরিক সহানুভূতি ও অমায়ি-

কর্ত্তা, কঠোর কর্ত্তব্যপালনে মধুরতা জগতে একান্ত দুর্লভ। সাধে কি তাঁহার আকস্মিক তিরোধানে আজ বঙ্গের নগরে নগরে হাহা-কার পড়িয়াছে! তাঁহার চরিত্রের পূর্ণজ্যোতিঃ দ্বারা তাঁহার জন্মভূমি এত দিন আলোকিত হইয়াছিল, এখন তাঁহার পুণ্য স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইবে। আমরা আশা করি, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ তাঁহার পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠাভাজন ও দেশে কল্যাণ-ভাজন হইবেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

কৃষি-ক্ষেত্র।

চের চের বুক লোহার ফলায়,
কর চূর্ণ চূর্ণ এই ছার কায়,
রাখ লুকাইয়া যতনে তাহায়
যে ধনে, মানব, পোষ জীবন;
হৃদয়-শোণিত বিতরি অপার,
করি দিব তারে শত গুণ তার,
তোমার জিনিস রহিবে তোমার,
নিয়ে যেও সুখে নিজ ভবন।

শিখি নাই দয়া গৌতমের স্থান,
করে নাই প্রেম ক্রাইষ্ট্ প্রদান,
পড়ি নাই গীতা, জানিনা কোরাণ,
করেনি দীক্ষিত মোরে নিমাই,
অপার্থিব ভাবে হৃদয় মাঝার
কে যেন শকতি করিয়া সঞ্চার,
শিখায়েছে মোরে এই ব্যবহার
এ ভাবে বিভোর আমি রে তাই।
কেন মোরে লয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি,
এত লাঠালাঠি, এত কাটাকাটি,
আপোষে আমায় কেন বাঁটাবাঁটি
না পার করিতে, হে সভ্য নর?
মোর বুকে পড়ে কত পদাঘাত,
করি না কখন তাহে নেত্রপাত,
সাধি নিজ কাজ শুধু দিন রাত,
কেন হিংসা, রাগে তুমি হে মর?

কুপোষ্য ভাবিয়া বুকের সন্তান
নাশ যবে মোর, নহি ম্রিয়মান,
প্রশান্ত অন্তরে করি স্তন দান
বাড়াই তাহারে রয়ে যে যায়,
পালনের অংশ কভু নাহি মাগি,
হইনা লাভের কোন দিন ভাগী,
দিও কিছু খেতে, পুরস্কার লাগি
কভু না আমার পরাণ ধায়।
পচা লতা পাতা আমার আহার,
যদি ইচ্ছা হয় দিও কিছু সার,
ঢেল কিছু জল উপরে আমার,
পিপাসায় গেলে ছাতিটা ফাটি।
দিও খেতে কিছু সরস গোবর,
পুকুরের কাদা রেখ থরে থর,
মাটী বলে যদি ইহাতে কাতর
হও, হবে তবে তুমিই মাটী।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

নববর্ষে।

হে নবীন, হে সুন্দর, এস তুমি আজি,
ললাটে আঁকিয়া দীপ্ত তরুণ তপন,
এ বৈশাখে পুণ্যমাসে নব রশ্মিপাতে,
জাগাও নবীন বীর্য্য নবীন জীবন।

অই হাসে ফুল্ল দিবা রৌদ্র ঝলমল,
ম্লানমুখে গেছে চলে অতীত বরষ,
নব আশা, নব ভাষা, নব প্রাণ লয়ে,
এসহে নবীন বর্ষ জীবন্ত হরষ।

যে দুঃখ, বিষাদ জ্বালা সহিয়াছি মোরা,
অতীতের সনে তার হ'ক তিরোধান,
সম্মুখে উন্নত গিরি লক্ষ্য' উচ্চতম,
নিম্নে গর্জ্জে মহাসিন্ধু শঙ্কিত পরাণ।

নব বলে বুক বেঁধে হও অগ্রসর,
কি ভয়? কেনরে ভীত কম্পিত অন্তর?
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

প্রেম-পূজা।

সারা জীবনের প্রেমে বাহিরি' জগতে,
করে নিল প্রেমময়, তোমারি সন্ধান,—
তটিনী নিঃসরি' যথা শৈল-শৃঙ্গ হ'তে,
খুঁজে লয় কোথা সিন্ধু প্রাণেশ মহান্!

হে দেব, আরাধ্য মম! হৃদয়-ভাণ্ডার
তোমারি চরণে আজি দিনু মুক্ত করে;
পুষ্প যথা আপনারি সম্পদ সম্ভার,
নগ্ন করি দেয় নিত্য ব্রহ্মাণ্ডের তরে।

আমার পৃথক সত্বা কিছু নাই আজ,
সারা প্রাণ নিঃশেষিয়া দিয়েছি তোমায়,
যেমতি সুন্দরী উষা তপনের মাঝ,
সানন্দে হারায়ে পলে ফেলে আপনায়!

ভক্তের এ প্রেম-পূজা হ'ল কি গৃহীত,
নাহি জানি ওগো প্রিয়, হে চির-বাঞ্ছিত!
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গোধূলির তারা।

অয়ি জ্যোতির্ম্ময় ফুল, ধরণীর আলো!
দিনান্তের ম্লানচ্ছায়ে—স্নিগ্ধ সকরুণ,
সুহাস লাবণ্যভরা আঁখি তব খোলো;
জাগাইয়া তোল বিশ্বে গোধূলি অরুণ।
না জানি ও দৃষ্টিমাঝে কত সুধা আছে;
পরাণে জাগায়ে দেয় আনন্দ উচ্ছ্বাস।
জীবনের দুঃখ দৈন্য সব যায় ঘুচে;
আপনি জাগিয়া উঠে প্রেমের হুতাশ।
কার প্রেমে মজি অয়ি সুচারুহাসিনি!
নীলিমার তলে আসি দেখা দাও নিতি।
শেফালি ধরণীলুটে, শিহরে অবনী;
শুনিয়া তোমার কণ্ঠে বিরহের গীতি।
চাহিয়া নিমেষহীন ধরণীর পানে;
কাহার সৌন্দর্য্য-সুধা করিতেছ পান।
কার ছবি বুকে করি বিকচ আননে;
মৌন-মুগ্ধ যোগী সম করিতেছ ধ্যান।
আপন আলোকে তুমি আচ্ছন্ন আপনা;
কাহার আঁধার প্রাণ চাহ দীপিবারে?
কার লাগি দীর্ঘকাল অক্লান্ত সাধনা;
প্রেমের অঞ্জলি রচি ডাকিছ কাহারে?
দেখ চাহি তব প্রেমে কবি আত্মহারা।
অয়ি সৌন্দর্য্যের রাণি, গোধূলির তারা!
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন।

যাত্রী।

বহিছে বহুক প্রবল ঝটিকা,
ডাকিছে ডাকুক বাণ!
যখন তরণী দিছি ভাসাইয়া,
দেখিব নিয়োজি প্রাণ!
যদিও পবন বহে প্রতিকূলে,
যদিও সলিল উঠে কূলে কূলে,
তবুও আমার আশার আলোক,
হইবে না নিরবাণ!
বহিছে বহুক প্রবল ঝটিকা,
ডাকিছে ডাকুক বাণ!

(২)

বহিছে বহুক প্রবল ঝটিকা,
ডাকিছে ডাকুক বাণ!
যখন তরণী দিছি ভাসাইয়া,
দেখিব নিয়োজি প্রাণ!
যদিও আমার ভাঙ্গা তরীখান,
পবনের বেগে বহিছে উজান,
তবুও রোধিতে পবনের গতি,
আমি সদা আগুয়ান;
বহিছে বহুক প্রবল ঝটিকা,
ডাকিছে ডাকুক বাণ!

(৩)

বহিছে বহুক প্রবল ঝটিকা,
ডাকিছে ডাকুক বাণ!
যখন তরণী দিছি ভাসাইয়া,
দেখিব নিয়োজি প্রাণ!
ধ্রুব, যথাকালে যতনের ফলে
যাইব তরিয়া সাগরের কূলে,
দুর্ব্বলের বল অনাথের নাথ
রয়েছেন ভগবান!
বহিছে বহুক প্রবল ঝটিকা
ডাকিছে ডাকুক বাণ!
শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

মণিপুর ও মিথি।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্ব্বোত্তর ও পশ্চিমোত্তর ব্রহ্মের প্রান্ত সীমায় মণিপুর। মিণপুর পর্ব্বতাবৃত প্রদেশ। বর্ত্তমান সমতল ভূমি পূর্ব্বে একটী সমুদ্রবৎ হ্রদে পরিণত ছিল। তাহারই বর্ত্তমান অংশ লাগটাক। (১) মহাভারতের সময়ে মিথিরা (২) পর্ব্বত বাসেই ছিল। তখন লাগটাক অধিকাংশ ভাগ গ্রাস করিয়াছিল। যে অংশ ভূভাগে পরিণত হইয়াছিল, সেই অংশের নাম খোগন(৩) বান্ধা। এই খোগন বান্ধাই অর্জ্জুন পরাভব-ক্ষেত্র।

অর্জ্জুন-চালিত অশ্বমেধের অশ্ব বভ্রুবাহন এই স্থানে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া, ইহার নাম খোগন-বান্ধা হইয়াছে। এই সেই স্থান, যেখানে সেই দিগ্বিজয়ী বীর স্বীয় পুত্র-হস্তে নিহত হন। ক্রমবিকাশে লাগটাক সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ইমফাল (৪) উপত্যকায় পরিণত হইলে, মিথিরা ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতবাস ত্যাগ করিয়া ইমফাল উপত্যকা ভূমে বাস আরম্ভ করিয়াছিল। এখন উপত্যকা-ভূমি মিথি পরিপূর্ণ। মিথিগণ মানবজাতির মঙ্গোলিয় শাখাভুক্ত মাইরং মোরাম প্রভৃতি সম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন। মিথিগণ ক্রমশঃ আর্য্য সংস্পর্শে আর্য্যজাতির নিকটতর হইয়াছে ও হইতেছে। তাহারা এখন তাহাদের পর্ব্বতবাসী আত্মীয়দিগের অনেক দূরবর্ত্তী হইয়াছে;—এখন আর সহজে সেই অসভ্য আত্মীয় শ্রেণীতে গণনা করা যায় না। বেশ ভূষা, আহার বিহার, চালচলন সকলই পরিবর্ত্তিত। কারুকার্য্য ও সূচিকার্য্য সুচারুরূপে শিখিয়াছে। মিথি রমণীরা অতি সুন্দর বস্ত্রাদি বয়ন করিতে পারে। মিথিদিগের বাহ্যিক পরিপাট্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গীত বাদ্যে সুদক্ষ হইয়াছে। এখন তাহারা বৈষ্ণব—সকলেই তিলক মালাধারী এবং পাণ্ডববংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। পূর্ব্বে মিথিদিগের লিখিত ভাষা ছিল—এখন নাই। এখন বঙ্গাক্ষরে তাহাদের কথিত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেকে বাঙ্গালা বেশ বলিতে ও লিখিতে পারে।

মিথিরাজ-বংশ-বৃক্ষ।

চিত্রভানু
|
দুহিতা—চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুন-সংযোগে
|
বভ্রুবাহন
|
সুপ্রবাহু
|
পাখাঙবা

অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদা-সংযোগে বভ্রুবাহন। বভ্রুবাহনের এক পুরুষ পরেই আবার অনার্য্য নাম পাখাঙবা—এই পাখাঙবা হইতে বৈষ্ণব না হওয়া পর্য্যন্ত অনার্য্যে অবনতি হইয়াছিল। কিন্তু যে অজ্ঞাত মহাপুরুষ দুরারোহ পর্ব্বতমালা ও কুকি প্রভৃতি অসভ্য জাতি পরিপূর্ণ ঢাং (৫) সকল উত্তীর্ণ হইয়া ইমফাল উপত্যকায় প্রবেশ পূর্ব্বক মিথিদিগকে গৌরবান্বিত পাণ্ডব বংশীয় বুঝাইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তিনিই ধন্য—তাঁহারই কৃপায় আজ আমরা অজয়ের তীরভূমির গীতগোবিন্দের গীত ইমফাল উপত্যকায়, এমন কি, নর্ত্তকী বালিকাদিগের মুখেও শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হই।

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ।

---

(১) লাগটাক—হ্রদের নাম।
(২) মিথি—মণিপুরবাসী।
(৩) খোগন—অশ (ঘোটক)।
(৪) ইমফাল—নদীর নাম।
(৫) ঢাং—গ্রাম, বস্তি।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১। The Past, Present and Future of the Refuge. আমরা আতুরাশ্রমের এই কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা না হইলেও, শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বিশ্বাস মহাশয় পবিত্র সেবা কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া যে আদর্শ দেখাইতেছেন, তাহার তুলনা নাই। বিধাতা এই আশ্রমকে আশীর্ব্বাদ করুন।

২। Report of the Calcutta Orphanage for the year 1908—বাগ্যবাগীশ বাঙ্গালী এখন কর্ম্মশীল হইতেছেন। এই অনাথাশ্রমের কার্য্যবিবরণ তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেবা-বীর শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, রক্ষাকর্ত্তা এবং পরিচালক। সুন্দর রূপে কার্য্য চলিতেছে। সদিচ্ছার সহায় যে ভগবান, এই আশ্রম তাহার সাক্ষী।

৩। আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা। ত্রৈমাসিক কায়স্থ পত্রিকা, দেব শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার বি-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমরা সাময়িক পত্রিকার সমালোচনা করি না;—এই পত্রিকা খানিকে সাময়িক পত্রিকা না বলিয়া জাতীয় ইতিহাস বা জাতীয় উন্নয়ন বলিলেই ভাল হয়। কায়স্থ জাতির উন্নয়নের জন্য যে সকল মহাপুরুষ চেষ্টা করিতেছেন, সম্পাদক কালীপ্রসন্ন তাহার অন্যতর। বার্দ্ধক্যে লোক নিরুৎসাহিত ও নিশ্চেষ্ট হয়, কিন্তু এই মহাত্মার জীবন তাহার জীবন্ত প্রতিবাদ। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যেন উৎসাহের অগ্নিকণা। এরূপ নিঃস্বার্থ জীবন বঙ্গভূমির গৌরব। কায়স্থ জাতির বিবাহের পণ-প্রথা এবং বিবাহ-সংস্কার কার্য্যে তদীয় প্রতিভা নিয়োজিত হইলে এদেশের প্রভূত উপকার হইবে। উপনয়ন ইত্যাদির প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সমাজ-সংস্কারে কায়স্থ প্রতিভা নিযুক্ত হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

৪। স্বদেশ-কুসুম। শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত, মূল্য ৵০ (ছেলে ভুলান ছড়া)। ছেলেদের উপযোগী করিয়া লিখিত। লেখকের কবিতা লিখিবার শক্তি অসাধারণ। পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে ঘরে ঘরে বালক বালিকাদের হাতে এই পুস্তক দিলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে।

৫। শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত গুপ্ত-কাশী বা শ্রীশ্রী৺বক্রেশ্বর মাহাত্ম্য। মূল শ্লোকসহ বঙ্গীয় ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদিত। মূল্য ১৲। ৪ খানি সুন্দর হাফটোন-ছবি-সম্বলিত। বীরভূম কড়িধা-নিবাসী শ্রীজটিল বিহারী চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নামেই পুস্তকের কথা অভিব্যক্ত। এই প্রাচীন পুঁথি খানা প্রকাশ করিয়া জটিল বাবু সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট এই পুস্তকের বিশেষ আদর হইবে, আশা করি।

৬। সীতা। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত, মূল্য ১৲। গ্রন্থকার অনুরোধ করিয়াছেন যে "তাঁহারা যেন এই নাটকখানিকে কাব্য কলা হিসাবে মাত্র দেখেন, ইতিহাস বা ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া বিচার করিতে না বসেন।" সে বিচার অনিবার্য্য, কেন না, রামায়ণের অবমাননা হইলে সকলের প্রাণে আঘাত লাগে। স্ত্রীজাতির প্রতি গ্রন্থকারের গভীর অনুরাগের পরিচয়ে আমরা অনন্দিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার রামচরিত্র কিছু খর্ব্ব হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। শূদ্রক রাজার শিরশ্ছেদ ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় ব্যবহারের ন্যায়বিগর্হিত অনুশাসনের প্রতিবাদ স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সমস্ত কথা আর একটু পরিস্ফুট হইলে ভাল হইত। আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের লেখার বিশেষ পক্ষপাতী বলিয়াই এই কয়েকটী অপ্রিয় কথার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, এই পুস্তক গুণ-শূন্য। অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। পড়িতে পড়িতে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। তদীয় লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।

৭। গীতা-ছায়া সমন্বিতা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেন গুপ্ত, মূল্য ১৲, পদ্যে অনুবাদিত গীতা। ভাষা প্রাঞ্জল এবং মধুর।

প্রকৃতির প্রতিশোধ।

একটী সংস্কৃত বচন আছে,—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠী ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্মজ্ঞানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

স্মৃতিতেও এই জাতীয় একটী শ্লোক আছে,—

বিপ্রাঃ শূদ্রসমাস্তাবদ্বিজ্ঞেয়াস্তু বিচক্ষণৈঃ।
যাবদ্বেদে ন জায়ন্তে দ্বিজা জ্ঞেয়াস্তু তৎপরম্॥
সাংখ্য, ১।৮।

মানুষ মাত্রই জন্মকালে শূদ্র থাকে, কিন্তু পরে সংস্কার বলে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। এই দ্বিজত্ব ব্রাহ্মণত্ব নহে। কেন না, যিনি সংস্কৃত, তিনিই দ্বিজ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এ তিনই সংস্কৃত, সুতরাং তাহারা তিন জনেই দ্বিজ। যাহার দ্বিজত্ব লাভ হইল না, সে শূদ্রই রহিয়া গেল। শূদ্রের সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—নচ সংস্কারমর্হতি। যে জন্মগত শূদ্রত্ব সংস্কারের দ্বারা পরিহার করিবার সুযোগ পাইল না, সে শূদ্রই রহিয়া গেল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এইরূপ শ্রেণী বিভাগে কোনও রূপ অস্বাভাবিকতা নাই। জন্মস্থান দ্বারাই মানুষের স্থান নির্দ্দেশ হইতেছে না। তাঁহার শিক্ষা ও সংস্কারের দ্বারা তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে। ইহাই স্বাভাবিক। মানুষ কি প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা জন্মকালে নির্ণীত হওয়া সুকঠিন। তাহা আবার শিক্ষা ও সঙ্গের দ্বারা নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সেই জন্য ব্যক্তি বিশেষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কি শূদ্র, তাহা তাহার সংস্কারের দ্বারা স্থিরীকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাই গীতানির্দ্দিষ্ট "গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" জাতি নির্দ্দেশ। উপরিধৃত শ্লোকে যে সংস্কারের দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্তি কেবল বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নহে, গুণ কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণেরও উচ্চ নীচ শ্রেণী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব ব্রহ্মজ্ঞান-সাপেক্ষ, তাহার পূর্ব্বেও কর্ম্ম আছে। সেটী বেদ পাঠ। বেদেই ব্রহ্মজ্ঞান রহিয়াছে, সুতরাং বেদ পাঠ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সোপান। অগ্রে বেদপাঠ দ্বারা বিপ্রত্ব লাভ করিতে হইবে, তার পর তাহার অর্থের ধারণার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ব হইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবী লাভ হইবে, তাহার পূর্ব্বে নহে। যাঁহারা পরবর্ত্তী কালে জাতি বস্তুটীকে জন্মগত করিয়া জাতিভেদের নিগড়ে সমাজদেহকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এমন সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহাতে মনে হয়, তাঁহাদের এরূপ ইচ্ছা ছিল না যে, জাতিভেদের জন্মগতত্বরূপ ফাঁস সমাজদেহের শ্বাস রোধ করিয়া তাহার বিনাশ সাধন করে। মনু স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥
মনু, ২।১৬৮।

ব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেই নিরাপদে ব্রাহ্মণত্বরূপ জমিদারী বজায় থাকিতেছে না। যদি বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হও, তবে তুমি একা নও, সপরিবারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ব্যবস্থার এক অর্দ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অপরার্দ্ধ গ্রহণ করাতেই যত বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। এক কবিরাজ যখন তাঁহার শিষ্যবর্গের কাছে তেলের গুণ বর্ণনা করিতেছিলেন, "ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলম্" তখন ভৃত্য মনে করিতেছিল, লোকেরা কি মূর্খ, তেলের যখন এত গুণ, তখন তাহারা ঘি খাইয়া কেন বেশী পয়সা খরচ করিয়া মরে। তাই বাড়ী যাইয়া সে স্বীয় পরিবারে ও প্রতিবাসীবর্গের মধ্যে স্বীয় বিদ্যা জাহির করিয়া দিল। কিন্তু কিছু দিন যাইতে না যাইতেই সকলে অজীর্ণ প্লীহা প্রভৃতি রোগে যখন শীর্ণ হইয়া পড়িল, তখন ভৃত্য বলিল, "কবিরাজ মহাশয়, আপনার উপদেশ পালন করিতে যাইয়া বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়াছি, এখন উপায়," এই বলিয়া আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। শুনিয়া তো কবিরাজ মহাশয়ের চক্ষুস্থির। তিনি

বলিলেন, "হা, মূর্খ! তুমি ব্যবস্থার অর্দ্ধাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া বিপদে পড়িয়াছ। "ঘৃতাদষ্ট গুণং তৈলম্," সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? কিন্তু "মর্দ্দনাৎ নতু ভক্ষণাৎ।" আমরাও "চাতুর্ব্বর্ণ্যংময়া সৃষ্টং" এই ব্যবস্থানুসারে সমাজ দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহা শত রোগে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, কেন না, আমরা ব্যবস্থার অপরার্দ্ধ একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। চতুর্বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া আমাদের দশাও কবিরাজ-ভৃত্যের দশা হইয়াছে। এখন ব্যবস্থাকারগণ আসিয়া যদি দেখেন, তবে তাহাদেরও চক্ষু স্থির হইবে, সন্দেহ নাই। বেদাধ্যয়ন তো দূরের কথা, যাহার ক অক্ষর গোমাংস, যাহার পেটে ডুবুরী নামাইয়া দিলে বর্ণমালার কণিকাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহাকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করা হয়, তাহারই গৃহে তিন টাকা মাহিয়ানায় যিনি ভৃত্য কর্ম্মে নিযুক্ত, তিনিও জন্মদোষে ভট্টাচার্য্য বা বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিবেদী বা চতুর্ব্বেদী। পঞ্চাশ পুরুষ পূর্ব্বে কোনও বংশে একটী মানুষের মত মানুষ জন্মিয়াছিলেন বলিয়া যেমন আরও একশত পুরুষ উপরে চলিয়া গেলে এক বনমানুষে যাইয়া ঠেকিয়া পড়া বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে, তেমনই আবার অভিব্যক্তিবাদের (Evolution এর) নিয়মানুসারেই পঞ্চাশ পুরুষ নিম্নগামী হইয়া এক গোষ্ঠি অমানুষে আসিয়া পৌছান আশ্চর্য্যের কথা নহে। বরং সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-সম্মত। বর্ত্তমান কালের বিবর্ত্তনবাদের (Evolution) একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার Kelly সাহেব বলিয়াছেন—Evolution has become unfortunately synonymous in the minds of many readers with that of development; and alas! evolution is often the diametrically opposite of development. Development includes the idea of improvement; evolution includes both the idea of improvement and that of degeneration. " "

(*Government or Human Evolution.*)

সুতরাং মনুষ্যত্ব লাভের প্রকৃত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া, কোন পুরুষে ঘি খাইয়াছিলাম, সেই জন্য আজ বসিয়া হাত শুঁকিলে কোনই লাভ দেখিতেছি না। বরং বৃথা অহঙ্কারে ক্রমে অধঃপতন হইতে, অধঃপতনের গর্ত্তেই পড়িয়া যাইতে হইবে।

উপনিষদে ব্রাহ্মণত্ব লাভের যে সুষ্ঠু পন্থার নির্দ্দেশ আছে, তাহাই বাস্তবিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। সত্যকাম জাবাল গুরু গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে গুরু তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। সত্যকাম বলিলেন—আমি আমার মাতাকে আমার গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মাতা বলিলেন, "বহ্ চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্নবেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি।" তখন গুরু অবাক্ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "নৈতদব্রাহ্মণঃ বিবক্তুমর্হতি।" তিনি নীচ জন্মা অস্পৃশ্য বলিয়া তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিলেন না, কিন্তু "ন সত্যাদগা" এই বলিয়া তাহাকে উপনয়ন প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিয়া দিলেন। যিনি এমন ভীষণ সত্য কথা বলিতে পারেন, তিনি যদি ব্রাহ্মণ না হন, তবে ব্রাহ্মণ কে? জানি না, এ যুগের কত ব্রাহ্মণ জাবালির কৌলীন্যে কুলীনত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত, যাঁহারা জাবালির ব্রাহ্মণত্ব দাবী করিয়াও তাঁহার সত্যকামত্বের অধিকারী নহেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব নিতান্ত ভিত্তিহীন। "নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি" ব্রাহ্মণত্ব লাভের, মনুষ্যত্বের গৌরবময় উচ্চাসন লাভের এই প্রশস্ত উদার পথ থাকিতে, জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের কৃত্রিম পথে চলিয়া ব্রহ্মণ্যদেব একেবারে পা ভাঙ্গিয়া খোঁড়া হইয়া বসিয়াছেন, আর অগ্রসর হইবার শক্তি নাই। ব্রাহ্মণত্ব দশ জনে অর্পণ করে, উহা দাবী করিতে হয় না। ব্রাহ্মণত্ব দাবী করিতে যে অহমিকার প্রকাশ পায়, তাহাতে ব্রহ্মণ্যদেব আপনাতেই আপনি সঙ্কুচিত হইয়া লুকায়িত হন—ব্যপৈতি তস্য ব্রহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ সগচ্ছতি। জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের এক দোষ যে উহা দাবী করিতে হয়। তাই বংশপরম্পরায় এই দাবী

দোষে ব্রহ্মণ্যদেব ক্ষাণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্ষুন্নমনে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন। এখন কেবল মাত্র "তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষে খোলস" ঐ পৈতাখানা কাঁধে ঝুলিতেছে; তাহাও আবার অধিকাংশ স্থলে Glasgow cotton। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। কিন্তু যাঁহারা ঐ সূত্রের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন হইয়াও ব্রাহ্মণত্বের আস্ফালন করিবেন, শাস্ত্র তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ কটূক্তি করিতে ছাড়েন নাই। এবার কেবল শূদ্র বলিয়াই নিষ্কৃতি দেন নাই, মনুষ্যত্বেরই নীচে নামাইয়া দিয়াছেন—

ব্রহ্মতত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ।
অত্রি, ৩৭২।

রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রাবণ বধের পর দেবতারা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সমবেত হইলে শ্রীরাম ইন্দ্রকে বলিলেন, আমি সীতা উদ্ধার করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া দেশে ফিরিতেছি, কিন্তু আমার জন্য যাহারা হত হইয়াছে, তাহাদের স্ত্রীপুত্র অনাথই রহিয়া গেল, ইহার কি কোনও বিহিত হইতে পারে না। তখন ইন্দ্রাদেশে মেঘগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অমৃতবর্ষণ করিলে বানরগণ পুনরুজ্জীবিত হইয়া "রাবণকে মার, ইন্দ্রজিৎকে ধর" বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল, তখন রামচন্দ্র প্রমাদ ভাবিয়া বলিলেন, ইন্দ্র, তুমি এ কি করিলে, আবার কি আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে? একই ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে করিতে যখন পাশাপাশি হত হইয়াছে, তখন অমৃতবর্ষণে বানরগণ জীবিত হইলে রাক্ষসগণও জীবিত হইবে নাকি?" ইন্দ্র বলিলেন, তাহার আর সম্ভাবনা নাই। রাক্ষসগণ মৃত্যুকালে "শ্রীরাম" ভাবিতে ভাবিতে মরিয়াছে সুতরাং তাহারা মুক্তি লাভ করিয়াছে, বানরেরা ভাবিয়াছে "রাবণ কুম্ভকর্ণ", সুতরাং তাহারা মুক্তি পাইবে কিসের জোরে? এ শূদ্র, ইহার জল গ্রহণ করিতে নাই, এ নীচ, উহার ছায়া স্পর্শ করিতে নাই, এ অন্ত্যজ, উহার গৃহে যাইতে নাই, এই শূদ্র-ভীতি, এই শূদ্র চিন্তাও জাতব্রাহ্মণকে শূদ্র করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। যে পরিমাণে ব্রাহ্মণত্ব জাতিগত হইয়াছে, সেই পরিমাণে দেশ অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। যে রামায়ণের আদিকাণ্ডে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভজাত সন্তান সিন্ধুমুনিকে * হত্যা করিয়া দশরথের ব্রহ্মহত্যা হইল, সেই রামায়ণেরই উত্তরাকাণ্ডের কবি রামচন্দ্রকে দিয়া শূদ্র তপস্বীর মস্তকচ্ছেদন করাইয়া লইয়াছেন। অধঃপতন আর কাহাকে বলে?

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "যো এতাম্বিদিত্বা স্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সঃ ব্রাহ্মণঃ।" কিন্তু সম্প্রতি এক দল লোকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহারা পৌত্তলিকতার সমর্থন করিতে যাইয়া বলিতে চান যে, ব্রহ্মকে জানা যায় না। ইহাতে পৌত্তলিকতা কতদূর রক্ষা পাইবে, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে ব্রাহ্মণত্বের শ্বাস রোধ হইল। কেন না, "ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।" সুতরাং ব্রহ্মকে যদি জানা না যায়, তবে ব্রাহ্মণ হইবারও আর আশা রহিল না। তারপর, ব্রাহ্মণত্বের পথে আরও কণ্টক আছে। শূদ্রত্ব হইতে ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছিতে হইলে বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। শূদ্রত্ব অর্থ দাসত্ব। যে সর্ব্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, সেই শূদ্র, দাস। এই শূদ্রত্ব হইতে উন্নয়নের পথে সর্ব্বপ্রথম স্বাধীনভাবে নিজের অন্ন সংস্থান। নিজের খাওয়া পরার জন্য অন্যের অনুগ্রহ না হইয়া সে জন্য নিজের যে চেষ্টা, তাহাই বৈশ্যত্বের প্রথম ধাপ। খাওয়া পরার সংস্থান হইলে পর আত্মরক্ষার চেষ্টা। ইহাই ক্ষত্রিয়ত্বে প্রবেশ, কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্ব কেবল আত্মরক্ষা নহে, অন্যের সাহায্যও বটে—"আর্ত্তত্রাণায়তেশস্ত্রং" বিপন্নের উদ্ধার ক্ষত্রিয় শব্দের ধাতুগত অর্থ—

ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ।
ক্ষত্রস্য শব্দ ভুবনেষু রূঢ়ঃ॥

কিন্তু এই খানেই শেষ নহে। যাহা ক্ষুদ্র আমির রক্ষার জন্য আরম্ভ হয়, তাহাই পার্শ্ববর্ত্তী দশজনের সেবায় লাগে, শেষে সমস্ত দেশে বিস্তৃত হইয়া সার্থকতা লাভ করে। ক্ষত্রিয়ের পরিণতি দেশ রক্ষায় আত্মদান, ইহার এক ধাপে উপরে উঠিয়া

* শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন শূদ্র জানপদাধিপ।

দেশ বিদেশ ভুলিয়া যখন সর্ব্বভূতে আত্ম প্রসার হয়, তখনই ব্রাহ্মণত্ব। কিন্তু শূদ্রত্ব হইতে ব্রাহ্মণত্বে পৌঁছিবার মধ্যস্থলে এই যে বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের সেতু, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। "কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্য-কর্ম্ম স্বভাবজম্"—বাণিজ্য তো পরহস্তগত, শিল্প বিনষ্ট। নষ্ট শিল্প দেশের কৃষি অন্ন সংস্থাপনে অসমর্থ। গরু তো খাইয়াই উজাড়। উহা শ্বেত ব্রাহ্মণের ভক্ষ্য, সুতরাং রক্ষার আর উপায় নাই। ক্ষত্রিয়ত্বের * কথা না বলাই ভাল। অন্যের সাহায্য তো দূরের কথা, একটা হিংস্র পশুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলেও ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করা ছাড়া আর উপায় নাই। অস্ত্র আইন ক্ষত্রিয়ত্ব হরণ করিয়াছে। সুতরাং শূদ্রত্ব ও ব্রাহ্মণত্বের মধ্যে যে সমুদ্র, তাহা আর পার হইবার উপায় নাই। তাই সমস্ত দেশ শূদ্রপূর্ণ হইয়াছে এবং সেই জন্যই আমরা সমস্ত ভারতবাসী শ্বেত ব্রাহ্মণগণের হস্তে শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের যে ব্যবহার শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট, তাহাই কড়ায় গণ্ডায় প্রাপ্ত হইতেছি। দুই চারিটী দৃষ্টান্ত দিলেই প্রকৃতির প্রতিশোধ কি, তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

দেশে উচ্চ শিক্ষার বেদ গান বন্ধ হইতেছে বলিয়া আমরা কতই না চীৎকার করিতেছি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তবে তার কর্ণে উত্তপ্ত দ্রব ধাতু ঢালিয়া দিবে, শূদ্র যদি বেদ উচ্চারণ করে, তবে তাহার জিভ্ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে।

বেদমুপশৃন্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্র প্রতিপূরণ
মুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদঃ।

গৌতম, ১২শ অধ্যায়।

আমাদের শ্বেত শাস্ত্রকারগণ কেবল শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছেন মাত্র, গত পাপের জন্য এখন পর্য্যন্তও কোন আইন জারী করেন নাই। করিলে আমরা নাচার। কেন না, শাস্ত্র যদি ফলে, তবে কাহার দোষ। শুনিলে তো তপ্ত দ্রব ধাতুর ব্যবস্থা, আর ধারণ করিয়া রাখিলে মৃত্যু দণ্ড। J. C. Bose, P. C. Roy, যাঁহারা বেদের ধারণা করিয়াছেন, এতদিন তাঁহাদের কি দশাই না হইত, যদি শ্বেত ব্রাহ্মণগণ আমাদেরই শাস্ত্র অনুশরণ করিতেন। ভারত মহাসাগরটা তপ্ত দ্রব ধাতুতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে সমস্ত দেশটা শুদ্ধ ফেলিয়া দিতে হইত। ইহাতেও শাস্ত্রকারগণের মনে তৃপ্তি হইল না। অবশেষে নরকের ভয় দেখাইয়া তবে ছাড়িলেন,—

বেদাক্ষর বিচারেণ শূদ্রস্য নরকং ধ্রুবম্।

পরাশর, ১৬৪

আমরা রেল গাড়ীর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসিতে যাইয়া শ্বেতদ্বিজগণ কর্তৃক অপমানিত হইয়া কাগজ পত্রে কতই না আন্দোলন করি। তবুও তো আমাদের প্রতি শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থা হয় না। শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসিবার স্পর্দ্ধা!

সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কোনির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ

মনু, ৮।২৮১

তপ্ত লৌহের দ্বারা শরীর দাগিয়া দেশান্তর করিয়া দাও বা পশ্চাদ্দেশ কাটিয়া দাও, অবশ্য যেন না মরে। আহা কি দয়া! যেন না মরে! এরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমরা যে কেবল দুটী ঘুষি ও একটি অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়াই মানে মানে (!!) বাঁচিয়া যাই, সে পরম সৌভাগ্যই মনে করিতে হইবে।

---

* বঙ্গদেশে এক দল ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহাদের মনের ভাব এই যে, তাঁহারা নিতান্তই ক্ষত্রিয়, তবে গায়ের জোরে অন্যেরা তাঁহাদিগকে শূদ্র করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং কলমের জোরে শূদ্রত্ব ঘুচাইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন করিতে হইবে। যাঁহারা একদিন স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া দাস আখ্যা গ্রহণ করতঃ শূদ্রত্ব বরণ করিয়াছিলেন; কেবল বরণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু লজ্জাশূন্য হইয়া সেই দাসত্বকেই কৌলীন্যরূপ স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি বানাইয়াছিলেন(selling the birth right fo a mess of pottage) তাহারা এখন অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইলে চলিবে কেন? বরং যিনি প্রকৃত ক্ষাত্রতেজ দেখাইয়া মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন—দত্ত কভু ভৃত্য নয় সঙ্গে এসেছে—তাহাকে তো সমাজে হীন করিয়াই রাখা হইয়াছে; যাহা কর্ম্মদোষে গিয়াছে, তাহা গুণকর্ম্ম বলে লাভ করিতে হইবে। নতুবা গলায় একটা দড়ী ঝুলাইলে ফল কি? ফল সময় বিশেষে দরকার হইলে কেবল কঞ্চীতেই চলিবে।

বছর বছর ৫০ কোটী টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যায়। ইহা ভাবিয়া আমরা একেবারে অস্থির হইয়াছি এবং সেজন্য দিগ্বিদিকে ঢোল বাজাইতেছি। কিন্তু শূদ্রের যে ধনে অধিকার নাই, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি। শূদ্র ধন সঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ যখন তখন কাড়িয়া লইতে পারেন। বিশেষতঃ তাহার ধন সঞ্চয়ে যে ব্রাহ্মণাদি জাতির বিঘ্নের সম্ভাবনা—যথা মনু ১০।১২৯—

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥

ইহা না মানিয়াও যদি শূদ্র ধন সঞ্চয় করে, তবে ব্রাহ্মণ মনে কোন দ্বিধা না করিয়া তখন তাহা কাড়িয়া লইতে পারিবে, তাহাতে তাহার কোনই দোষ হইবে না— মনু. ৮।৪১৭

বিস্রব্ধং ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্দ্রব্যোপাদানমাচরেৎ।
নহি তস্যাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্তৃহার্য্যধনো হি সঃ॥

শ্বেত ব্রাহ্মণও এই আইনই জারী করিয়াছেন। থ্যাকারে নামক একজন মান্দ্রাজের ব্যবস্থা সচীব মনুর পুনরুক্তিই করিয়া গিয়াছেন—"In India that haughty spirit, independence and deep thought which the possession of great wealth sometimes gives ought to be suppressed."

ইহারই নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ। মানব সভ্যতারূপ মহাচক্রের আবর্ত্তনের কোন্ নিয়মানুসারে, রাজনীতির কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনে, অর্থনীতি শাস্ত্রের কোন্ গুহ্য কারণে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের প্রতি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে একই ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, সে রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন সময়ান্তরের জন্য রাখিয়া দিলেও এ চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দেওয়া যায় না, আমরা যে অন্নাভাবে জীর্ণ, অর্থাভাবে শীর্ণ, পেটের দায়ে ভদ্র সন্তান যে ডাকাতিতে প্রবৃত্ত, তাহা কেবল আমাদের জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সমাজের এক অঙ্গকে হীন করিয়া রাখিলে সে হীনতা ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইবেই। প্রকৃতির প্রতিশোধ অনিবার্য্য।

সময়ে সময়ে কোন কোন উদার-হৃদয় ব্যবস্থাপক ভারতবাসী শূদ্রত্ব কিছু কমাইয়া তাহাদিগকে কিছু কিছু অধিকার দিবার প্রস্তাব করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে ভারতপ্রবাসী শ্বেতদ্বিজগণ স্বতঃ পরতঃ নানা প্রকার বাধা প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবাসীর দেশ শাসনের কোনই ক্ষমতা নাই। ইহারা অন্যের অধীনে থাকিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। আমরা ছাড়িয়া দিলে কি হইবে, আবার অন্যের অধীনতা গ্রহণ করিবে। সুতরাং ইহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া লাভ কি? ইহাদিগকে চিরদিনই আমাদের দাসত্ব করিতে হইবে। ইহাতে আমরা চটিয়া যাই, সন্দেহ নাই। কিন্তু চটিবার পূর্ব্বে আমাদের দেখা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে শাস্ত্রকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন। নতুবা অধর্ম্ম হইবে! আমাদের কিন্তু চটিবার কোনই কারণ নাই। অন্যের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছ, অবস্থার ফেরে সেই ব্যবহার তোমার নিজের প্রতি যখন প্রযুক্ত হইতেছে, তখন অনুশোচনা নিতান্তই বিফল। মনু বলেন,—

ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাত্তদপোহতি॥ মনু, ৮।৪১৪

প্রভু মুক্ত করিয়া দিলেও শূদ্রের দাসত্ব যায় না, কেন না, দাসত্ব উহার স্বাভাবিক। সুতরাং একজন মুক্ত করিয়া দিলে আর একজন তাহাকে ধরিয়া আনিয়া দাস্যেনিযুক্ত করিবে, তা ক্রয় করুক আর না করুক। যেহেতু,

শূদ্রং তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীতমেব বা। ৮।৪১৩

ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কর্ম্মফল হাতে হাতে। এদেশে সর্ব্বদাই এরূপ দেখা যায় যে, শ্বেত কৃষ্ণ দ্বন্দ্বে শ্বেত ব্রাহ্মণগণের কোনই দণ্ড হয় না। যে অপরাধে কৃষ্ণের প্রাণদণ্ড, তাহাতে শ্বেতের বড় জোর অর্থদণ্ড। শ্বেতাঙ্গের হাতে কৃষ্ণাঙ্গের প্রাণ নাশ হইলে, ভূরি প্রমাণ সত্ত্বেও তাহার প্রাণ দণ্ড হয় না। ইহাতে আমরা চীৎকারে গগন মেদিনী বিদীর্ণ করিয়া ফেলি। আমরা চীৎকার করি, কারণ আমরা ভুলিয়া যাই যে, শ্বেত কৃষ্ণের বিবাদে ইহাই চিরন্তন বিচার প্রণালী। মনু স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, ব্রাহ্মণ শত দোষে দোষী হইলেও কখনও তাহার প্রাণ-দণ্ড হইতে পারিবে না। দণ্ড তো দূরের

কথা, সে চিন্তাও রাজা মনে আনিবে না, "তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ।" যদি ব্রাহ্মণ দোষই করে, তবে বড় জোর তাকে দেশান্তর করিতে পার, কিন্তু তাহার সর্ব্বস্ব তাহার সঙ্গে দিয়া দিতে হইবে,—

ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্বপাপেষপি স্থিতম্।
রাষ্ট্রাদেনং বহিঃ কুর্য্যাৎ সমগ্রধনমক্ষতম্॥ মনু.৮।৩৮০

আগে বিধান করিয়া রাখিয়াছ, এখন চীৎকার করিলে কি হইবে?

যে অপরাধে ইংলণ্ডে একজন ভারতবাসীর জন্য কয়েক টাকার মুচুলিকা হয় * সেই অপরাধে এখানে তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি। কেন না, সেখানে শূদ্র ব্রাহ্মণের ভেদ নাই, সকলেই দ্বিজ। সেখানে শূদ্র থাকিতে পারে না, সে স্বাধীন দেশ, "দাসত্ব শৃঙ্খল ঘুঁচে যাঁর নামে।" কিন্তু ভারত শূদ্র দেশ—ব্রাহ্মণ-পদসেবিত শূদ্র দেশ—সুতরাং এখানে দ্বিজ শূদ্র সম্বন্ধীয় ভেদ আইন থাকিবেই। তাই শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত কাগজে এ দেশবাসীর গালাগালি থাকিলে তাহা ধর্ত্তব্যই নহে, বড় জোর একটী মৌখিক ধমক্। আর কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গদিগের নিন্দা করিলে নাকে কাণে তিন বিঘত খত দিলেও জাতিবিদ্বেষ উৎপন্ন করার জন্য কারাদণ্ড। কিন্তু তাহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে কটুবাক্য প্রয়োগ করে, তবে হয় "জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদম্, (১) না হয় একেবারে "শূদ্রস্তু বধমর্হতি।" (২) অথবা শূদ্রের যদি এতটা ধৃষ্টতা হয় যে, ব্রাহ্মণ কোন দোষ করিলে তাহা প্রদর্শন করিয়া উপদেশ দিতে যায়, তবে "তপ্তমাসেচয়েত্তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ। (৩) রাজা তার চোখে মুখে তেল গরম করিয়া ঢালিয়া দিবেন। ভাগ্যিস্ বর্ত্তমান যুগে এ আইন পূর্ণমাত্রায় জারি হয় নাই, নইলে কি আর রক্ষা থাক্‌তো। সম্প্রতি কিছু কিছু হচ্ছে বটে। ব্রাহ্মণের প্রতি বাচনিক অপরাধেই তো শূদ্রের এই শাস্তি। সুতরাং শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলে, তাহা হইলে তাহার যে কি দুর্দ্দশা হইতে পারে, তাহাতো সহজেই অনুমেয়। এ জন্য সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নয়। একজন গ্রীশ দেশীয় ব্যবস্থাপক দোষের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে করিতে চুরি পর্য্যন্ত উঠিয়াই প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। তার উপরে আর তিনি হা'লে পাণি পাইলেন না। সেই জন্য লোকে বলিত যে, তিনি রক্তের দ্বারা আইন রচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনু মহাশয়কে পারিবার যো নাই। তিনি আদেশ করিয়াছেন, তৃণখণ্ডের দ্বারাও যদি ব্রাহ্মণকে তাড়না কর, তবে ২১ জন্মে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে—

তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি সংরম্ভান্মতি পূর্ব্বকম্।
একাবংশতিমাজাতীঃ পাপযোনিষু জায়তে॥

আমরা এই ৩০ কোটী 'কালা আদ্‌মী' পরস্পরের সংসর্গে আসিতেছি, তাহাতে যে দুর্ঘটনা ঘটে না, তাহা নহে! কিন্তু তাহার মূল নির্ণয় করিতে কোনই কষ্ট হয় না। কিন্তু যেই কোন শ্বেতাঙ্গ অনুকম্পা পুরঃসর আমাদের ঘৃণিত কৃষ্ণাঙ্গে হস্তার্পণ করেন, অমনি শারীর বিজ্ঞানের কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া যে আমাদের বেয়াড়া প্লীহাটা হঠাৎ অযথা বর্দ্ধিত হইয়া ফাটিয়া যায়, তাহা কোনও দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বন্দুক সকল দেশেই ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ভারতবাসী শূদ্রের তাহাতে অধিকার নাই, ওটা তাহার হারাম। কিন্তু কোন দেশেই এরূপটা দেখা যায় না, যেমন এ দেশে। যখনই কোন শ্বেতব্রাহ্মণ বন্দুক হাতে লইলেন, অমনি বেহায়া গুলিটা অবাধ্য হইয়া দশ দিক্ দিগন্ত প্রসারিত থাকিতেও আর কোন দিকে না যাইয়া ঠিক যেখানে একটী কালশূদ্র বসিয়া হয়তো দিনান্তে এক পয়সার ছাতু খাইতেছিল, সোজা সেইখানে যাইয়া তাহার উদরের মধ্যে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিল এবং উহাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত জীবনভার হইতে মুক্তিপ্রদান করিল! আমরা এমনই ধৃষ্ট যে, এ জন্যও আবার রাজদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হই! অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই বেকসুর খালাস।

* ভট্টাচার্য্য-ওয়ার্ণার সংবাদ স্মর্ত্তব্য।
(১) মনু ৮।২৭০। (২) ঐ ৮।২৬৭। (৩) ঐ ৮।২৭২

কিন্তু মনু ছাড়িবার পাত্র নহেন। ব্রাহ্মণকেও শাস্তিভোগ করিতে হইবে। তবে, যদিও ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে শূদ্রের বাচনিক অপরাধেও তাহার প্রাণদণ্ড, ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রাণনাশ করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলিবে। আর সে প্রায়শ্চিত্তের ঘটাই বা কত! মনু মহাশয় কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কন না। তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, শূদ্রহত্যা আর কুকুর, বিড়াল হত্যার প্রায়শ্চিত্ত একই—

মার্জ্জারনকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডুকমেব চ।
খগোধোলূকাকাংশ্চ শূদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ। মনু, ১১।১৩২

অর্থাৎ

আমরা ইরাণ দেশের কাজী,
এসেছি একটা নূতন আইন প্রচার কর্ত্তে আজি।
পার্শী ঠেকিলে ইরাণ গায়,
তাহার মাথাটী বাঁচান হইবে দায়,
আর, ইরাণ লইলে পার্শীর মাথা,
তাহাতে হইতে হইবে রাজী॥ কেন না,
আমরা ইরাণ দেশের কাজী।

হাসির কথা নয়। ইহা শুধু হাসির গান বা কবির কল্পনার বৃথা বিজৃম্ভন নহে। উহা মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রের যথাযথ অনুবাদ। হায় রে কর্ম্মফল; জগতের ইতিহাসে আর কোনও জাতি জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এমন হাতে হাতে প্রকৃতির প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া পাইয়াছে কি না, তাহা জানিনা।

দেশে জাতীয় উন্নতির সাড়া পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আগে জাতীয় জীবন, পরে উন্নতি। শরীরের পক্ষে যেমন সকল অবয়বের একতার উপর শারীরিক জীবন স্থাপিত, জাতির পক্ষেও তেমনই তাহার সকল অংশের এক প্রাণতার উপর তাহার জীবনীশক্তির পরিচয়। এক অঙ্গকে বাধা দিয়া অন্য অঙ্গ কিছুতেই ইষ্টলাভ করিতে পারে না। জাতীয় সমপ্রাণতা ছাড়া জাতীয় একতা সম্ভব নয়। সমবেদনা, সমপ্রাণতা ছাড়া অসম্ভব। এক অঙ্গের ব্যথা যদি অন্য অঙ্গ অনুভব না করে, তবে জাতীয় জীবন কথাটা নিতান্তই অর্থশূন্য। সমপ্রাণতা ছাড়া যেমন জাতীয় জীবন হয় না, তেমনই আকাঙ্ক্ষার একতা ছাড়া ও অধিকারের সমতা ছাড়া সমপ্রাণতা জন্মিতেই পারে না। ইহাই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বন্ধনরজ্জু। এই বন্ধনরজ্জুর অভাবে আমাদের জাতীয় জীবন গড়িতেছে না। স্বদেশী আন্দোলন আমাদিগকে এ কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে যে, আমাদের জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গ একসুত্রে বাঁধা নহে। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা হইতেও পারে না। দেশে কোন পরিবর্ত্তন আসিবার উপক্রম হইলে সকলের যদি তাহাতে সমান পরিমাণ উপকার বা অপকারের সম্ভাবনা না থাকে, তবে সকলের তাহাতে সমান উৎসাহ হইতে পারে না। আমাদের দেশের উচ্চ শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যে নিম্নশ্রেণী সহানুভূতি দেখাইতে পারে না, তাহার কারণ এ নয় যে, নিম্নশ্রেণীর অনুভব শক্তি নাই। তাহারা দেখে যে, ইহাতে তাহাদের লাভ কি। তাহারা যে স্থানে জন্মিয়াছে, সে স্থান হইতে নড়িবার বা উঠিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাই তাহাদের নড়িবার বা উঠিবার কোনই উৎসাহ হয় না। সুবিখ্যাত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যখন সুইট্‌জারল্যাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এক দিন রেলষ্টেশন হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় তাঁহার ট্রাঙ্কবাহী মুটিয়া পশ্চাৎ হইতে ভারতের রাজনীতি বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া বলিল যে, তাহাদের ক্লবে সে দিন কথা হইতেছিল, ভারতবর্ষ এত বড় দেশ, তবে কেন ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের অধীন? চাটুর্য্যে মশায় স্তম্ভিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "তুমি মুটে, এ খবর তুমি কিরূপে পাইলে এবং ইহাতে তোমার লাভই বা কি?" তখন মুটে অতি গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিল, "মহাশয়, আজ আমি মুটে; কাল সাধারণতন্ত্রের সভাপতি হইবার পথে আমার কোন বাধা নাই।" সুইট্‌জারল্যাণ্ড এত ক্ষুদ্র দেশ—বঙ্গদেশের একটী ক্ষুদ্র জেলার সমান হইয়াও কিরূপে ইউরোপের বিরাট শক্তিসঙ্ঘের মধ্যেও আপনার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে, এইখানে তাহার মূল। সামান্য মুটের মনেও আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে, সে এক দিন দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারে। যাহার হৃদয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগে না, যাহার মনে উর্চ্চ ভাব আসিতে পারে না, তাহাকে কে মহত্ত্ব

প্রদান করিতে পারে? আকাঙ্ক্ষার একতা ও অধিকারের সমতা ব্যতীত আর কিছুতেই একপ্রাণতা আসিতে পারে না। আমার দেশ বলিতে দেশনায়ক ও সামান্য মুজুর যখন একই জিনিষ বুঝে, তখনই সমপ্রাণতা আসিয়াছে, বুঝিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। হিন্দুর পর পাঠান, পাঠানের পর মোগল, মোগলের পর মাহারাট্টা আসিয়াছে ও গিয়াছে, কিন্তু এই ভারতে এমন জনসঙ্ঘ আছে, যাহাদের কাছে উত্তরোত্তর অন্ন কষ্ট ছাড়া অন্য কোন পরিবর্ত্তনের খবরই পৌঁছায় নাই। খবরে তার স্বার্থ কি? সে যেখানে জন্মিয়াছে, সে স্থান হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার অধিকার তাহার নাই। কুভাবেই এমন স্বভাব হইয়া গিয়াছে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও হৃদয়ে জাগ্রত হয় না। এ দেশে যে Civic life গজাইতে পারে নাই, তাহার একটা প্রধান কারণ উই যে মানুষ পরিবারের বাহিরে আসিয়া আপনার স্থান খুঁজিয়া পায় না। সমাজে উচ্চ নীচের কৃত্রিম বেড়া এমন ঘন সন্নিবিষ্ট যে কোথায় আগ্রসর হইলে কাহার উপর অনধিকার প্রবেশ হইবে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাই মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া পরিবারের গণ্ডীর ভিতরেই আবদ্ধ রহিয়াছে। পরিবার বলিলে জিনিষটা যে কি, তাহা সকলেই বুঝি, দেশ বলিলে কি বুঝায়, সর্ব্ব সাধারণ সে বিষয়ে একমত নহে। দেশ বলিয়া জিনিষটার অস্তিত্বই অনেকের ধারণার অতীত। তাই যখন দেশের কাজে সর্ব্ব সাধারণের সহানুভূতির প্রয়োজন হইয়াছে, তখন সাড়া মিলিতেছে না। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। এত দিন যাহাদিগকে অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে, এখন তাহাদের নিকট হইতে উত্তর না পাইলে দোষ কাহার? সকল কৃত্রিম ভেদ বিনাশ করিয়া মানুষকে মনুষ্যত্বের উদার ভূমিতে দাঁড় করাইতে না পারিলে, সকলকে অধিকারের মমতা দিয়া আকাঙ্ক্ষার একতা জন্মাইতে না পারিলে জাতীয়তা দৃঢ় ভিত্তি পাইবে না। কৃত্রিম বাঁধ ভাঙ্গিয়া দাও, গুণ কর্ম্মানুসারে মানুষকে স্ব স্ব স্থান লাভ করিতে দাও, জাতি গঠন অতি সহজ হইবে। ২২ কোটীর মধ্যে যে জাতির ৬ কোটি অস্পৃশ্য পশুবৎ ব্যবহৃত, সে জাতির পদদ্বয় নিশ্চল পাষাণময়, তাহার উঠিবার আকাঙ্ক্ষা বিড়ম্বনা নয় কি? মহাত্মা ঈশা বলিয়াছেন, "যদি বেদীর কাছে আসিয়া মনে পড়ে তোমার ভাইএর সঙ্গে বিবাদ আছে, তবে নৈবেদ্য সেখানে রাখিয়া যাও, বিবাদ মিটাইয়া আইস, নতুবা তোমার উপহার গৃহীত হইবে না।" যতদিন মানুষকে মানুষ বলিয়াই গ্রহণ করিতে না পারিতেছি, মানুষ বলিয়াই মানুষের অধিকার নির্দ্দিষ্ট না হইতেছে, তত দিন ভ্রাতৃ বিরোধ ঘুচিতেছে না। তাই বুঝি এত আত্মোৎসর্গ, এত জীবনদান, এত প্রাণত্যাগ সকলই বৃথা হইয়া যাইতেছে, মা কিছুই গ্রহণ করিতেছেন না। আমাদের জাতীয় জীবন গুরুভাবে প্রপীড়িত। এ বোঝা না নামাইলে আর উঠিতে পারিতেছি না। বেলুন ছাড়িয়া দিলে, এক দম উপরে উঠিয়া যায়, তারপর থামে। কিছু বোঝা ফেলিয়া না দিলে আর উঠে না। আমাদেরও ঊর্দ্ধ গমন বুঝি থামিয়া গেল, তাই বোঝা পাংলা করিতে হইবে। আমার মনে হয়, এই জাতিভেদের বোঝা না নামাইতে পারিলে, আমরা আর উঠিতে পারিব না। সকলকেই ব্রাহ্মণত্বের অধিকার না দিলে ব্রাহ্মণত্ব সজীব থাকিতে পারে না। ভারতের কৃত্রিম জাতিবিভাগ ইহাই সপ্রমাণ করিয়াছে। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ। একচেটিয়া অধিকার (Monopoly) যেমন অর্থনীতি শাস্ত্রের বিরোধী, তেমনই সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মতও নহে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

রাজর্ষি রামমোহন।

"Great men can only spring from a great people, just as an oak, however high it may tower above every other tree in the forest, depends on the soil whence it derives its nourishment. The soil must be enriched by the countless decaying leaves.

—Joseph Mazzini

"মহাপুরুষদিগকে জন্ম দিবার জন্য জাতিকে উচ্চ হইতে হয় এবং ইঁহারা জন্মিয়াও জাতিকে উচ্চ করিয়া তোলেন। * * * ইঁহাদিগকে লইয়াই জাতির গৌরব। যেমন দূর হইতে হিমালয়ের ক্ষুদ্র পাদশৈল সকল ভাল করিয়া দেখা যায় না, কিন্তু চিরতুহিনাবৃত শৃঙ্গরাজি লক্ষিত হইতে থাকে এবং হিমালয়ের মহত্ব জ্ঞাপন করে, তেমনি, অপর জাতি সকল দূর হইতে এই সকল, অসাধারণ পুরুষের আলোকমণ্ডিত মস্তক দর্শন করিয়া জাতিগত মহত্ব অনুভব করিয়া থাকে!" শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

আমি যখন নির্জ্জনে রাজা রামমোহনের কথা একান্ত মনে চিন্তা করি, তখন আমার বক্ষঃস্থল যেন আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে। আমি যেন রাজর্ষি রামমোহন রায়ের পশ্চাতে আমাদিগের এই হতভাগ্য পতিত জাতির মহত্ব দেখিতে পাই। উপনিষদকার মহর্ষি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যেমন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"শৃনন্তু দেবাঃ অমৃতস্য পুত্রাঃ।" মহর্ষি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই, যেমন, দিব্যচক্ষে স্বতঃসিদ্ধান্তের মত দেখিতে পাইলেন, এই যে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত মানব, এই যে ক্ষুদ্র জীব, রোগ শোক জরা মৃত্যুর অধীন, ক্ষণভঙ্গুর দেহধারী ধূলিকণা হইতেও তুচ্ছ, এই সামান্য জীব, সেই দেবাদিদেব আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপের পুত্র, তেমনি কি, আমরা রাজর্ষি রামমোহনের পশ্চাতে আমাদের জাতীয় জীবনের মহত্ব, গৌরব ও মহিমা দেখিতে পাইতেছি না?

রাজা রামমোহন রায় একজন অসামান্য প্রতিভাশালী মহাপুরুষ ছিলেন। অবতারবাদীদিগের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি একজন অবতার ছিলেন।* আমি অবতারবাদ মানি না। অবতারবাদ মানাকে পাপ মনে করি। অবতারবাদের অর্থ, অনন্ত পুরুষ এতটা ছোট হইতে পারেন, আর মানুষ এত বড়, এত উন্নত হইতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ও অমৃতস্বরূপের পুত্র মানবের উভয়েরই অপমান করা হয়। ঈশ্বর ও মানব উভয়কেই ছোট করা হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, রাজা রামমোহন রায় অবতারবাদ মানিতেন না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপুরুষ কাহাকে বলে? মহাপুরুষত্বের লক্ষণ কি?

সব গুলি লক্ষণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিতে না পারিলেও, দুই চারিটী মোটা মোটা লক্ষণ বলিতে পারা যায়। যথা (১) জ্ঞানে গভীরতা, (২) প্রেমে বিশালতা, (৩) কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা, (৪) ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরশীলতা।

আমরা আজ এই চারিটী লক্ষণ দ্বারা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

জ্ঞানে গভীরতা।

রাজা রামমোহন রায় যে সংস্কৃত, আরবী,

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, বি-এল মহাশয় রাজার এক সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহাকে অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

পার্সি, উর্দ্দু, ল্যাটীন, ইংরাজি, গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন,তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালা ভাষার কথা আর কি বলিব, তিনি বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা গদ্য ছিল না, তিনি ইহার প্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল পত্র দলিলাদিতে গদ্য ব্যবহৃত হইত। অপর সকল বিষয়ে অধিকাংশ সময়েই পদ্য ব্যবহৃত হইত। তাহাও উচ্চ অঙ্গের পদ্য ছিল না। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালাকে ভাষায় পরিণত করেন। * বাঙ্গালাকে ভাষায় পরিণত করিতে গিয়া তাঁহাকে ব্যাকরণ পর্য্যন্ত লিখিতে হইয়াছিল।

সংসারে অনেকেই সুপণ্ডিত ছিলেন, এখনও আছেন। এখন এমন ভাষাজ্ঞ শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের ভাষাজ্ঞান ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। কিন্তু হায়! এমন গভীর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও অনেকের সঙ্কীর্ণতা "কূপমণ্ডুকত্ব" যায় নাই। রাজা রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্যের কথা বলিতে গিয়া ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন – "বলিতে কি,শঙ্করের পরে এমন মনস্বী পুরুষ আর এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।"

পরলোকগত Rev. Flecher Williams রামমোহন রায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে বলিয়াছিলেন "বর্ত্তমান শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়ের মতন এরূপ একজন মহাপুরুষ সমগ্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।"

"রাজা রামমোহন রায়ের পাণ্ডিত্যের ও উদারতার সীমা ছিল না। তিনি সমগ্র মানবজাতিকে এক পরিবার-ভুক্ত মনে করিতেন। তিনিই প্রকৃত পক্ষে "ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব" ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে লোকে হাজার মানবের ভ্রাতৃত্বের কথা প্রচার করুন না কেন, কিন্তু স্বার্থে বিন্দুমাত্র আঘাত পড়িলে তীক্ষ্ণ তরবারীর দ্বারা ভ্রাতার শিরচ্ছেদন করিতে কিঞ্চিন্মাত্র পরাঙ্মুখ হন না। রামমোহন রায়ের উদারতা দেশ কালের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তাঁহার নিকট হিন্দু মুসলমান,ইংরাজ ফরাসী, স্পেন পর্টুগাল, আসিয়া ইউরোপ কিছুই ছিল না। তিনি সকল জাতিকে সমানভাবে আপনার ভাবিতেন ও সম্মান করিতেন. * এবং তিনি সকল দেশের শাস্ত্রকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিই সমন্বয় দর্শনের (Comparative philosophy) প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি যখন যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন সেই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। † স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনও দিনই কোনও

---

* As by Wiclif in England and Luther in Germany, so also by Rammohan in Bengal the despised dialect of the common people was made the vehicle of the highest ideas and became thereby permanently elevated. —Collet's Life.

* তাঁহার সুবিশাল হৃদয়ে জাতি বিশেষের কোন বিশেষ দাওয়া ছিল বলিয়া বোধ হয় না—লেখকের "সমাজসংস্কারে রাজা রামমোহন রায়!"

† It was the characteristic of the Raja that in all his theological discussions with his opponents, he would always accept the authority of their particular scriptures first, as infallible, for argument's sake and then would fight out his own cause. Truly Mr. Adam wrote to Dr. Tuckerman "that he is both a Christian and a Hindu—a Christian with Christians and a Hindu with Hindus" and we would like to add a Mahommadan with Mahommedans.—Raja Rammohan Roy and Christianity.

শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে তর্ক বিচার পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তাহা পাঠ করিলে লজ্জিত হইতে হয়। অনেক সময় দুঃখ হয়। নিজের মতকে সমর্থন করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায়গণ কিরূপ-ভাবে শাস্ত্রের সরল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কদর্থ ও খণ্ডাংশ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তাহা পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবাবিবাহ প্রস্তাব" নামক পুস্তকখানা পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই মহাপুরুষদিগের মানসিক সততা (Intellectual honesty) বলিয়া কোনও জিনিষ নাই। রাজা রামমোহন রায় এ সব ক্ষুদ্রতা নীচতার উপরে উঠিয়াছিলেন। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, খ্রীষ্টীয়ানেরা তাঁহাকে খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমানেরা তাঁহাকে মৌলবী *, হিন্দুরা তাঁহাকে বৈদান্তিক হিন্দু বলিয়া মান্য করিতেন। † সংসারে এরূপ অতি কম লোকই দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের মৃত্যুর পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদিগকে আপন সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া দাবী করিয়াছেন। ‡ ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন "আমার মৃত্যুর পর খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান, হিন্দু, সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া আমাকে জ্ঞান করিবে, কিন্তু আমি কোনও সম্প্রদায়ের নহি" † তিনি কোনও উপধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁহার ধর্ম্ম উদার বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্ম। ‡ তাঁহার এই উদারতা ও সার্ব্ব-ভৌমিকত্বের কথা উল্লেখ করিয়া Miss Acland লিখিয়াছেন:—

Yes, far from Ganges consecrated wave,
Beneath our pallid groves and northern skies,
A stranger's hand hath laid thee in thy grave,
And strangers' tears have wept thy obsequies.
A stranger? No thy "caste" was human kind;
Thy home—wherever freedom's beacon shone;
And Englands' noblest hearts exulting shrined
The turb and offspring of a burning zone.
Pure generous mind! all that was just and true
All that was lovely holiest brighest best—
Kindled thy soul of eloquence anew,
And woke responsive chords in every breast.

প্রেমে বিশালতা।

একটী ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে:—

"এ ভবে না ধরে প্রেম উথলিয়া বায়রে
দশ দিক পূরে অবিরাম।"

রাজা রামমোহন রায়ের প্রেম ভারতে ধরে নাই, পৃথিবীতে উথলিয়া পড়িয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনিই প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্বের যথার্থ অর্থ বুঝিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার মহা-প্রাণে মানব আত্মার মহত্ত্বজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি মানব আত্মাকে সেই

---

* Many Moslem Divines regarded Raja Rammohan Roy as a moslem.—Amir Ali's Hand Book of Mohammedan Law.

† The Mohammedans would call him a Mohammedan, Hindus would call him a Vedantic Hindu, the Christians a Unitarian Christian.—Collet.

‡ The followers of every prevailing religion would reckon him after his death as one of their coreligionists.—Collet's Life and Letters of Raja Rammohan Roy.

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হিন্দু তাঁহাকে বেদান্তানুগামী ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রীষ্টীয়ানেরা খ্রীষ্টীয়ান এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীরা মুসলমান বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল।—শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।

† শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্র বাবুর জীবনচরিত।

‡ He really belonged to no sect. His religion was Universal Theism.—Collet's Life.

মহান পরমাত্মার অংশ বলিয়া ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নিকট মানবের ভ্রাতৃত্ব অতীব মূল্যবান ছিল। সেই জন্যই, তিনি, কি সামাজিক দাসত্ব, কি রাজনৈতিক অত্যাচার, কোনও প্রকার মানব আত্মার অপমানজনক ব্যবহার সহ্য করিতে পারিতেন না এবং অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। মানুষ যে মানুষকে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় ব্যবহার করিবে, তাহা তাঁহার নিকট একবারেই অসহনীয় ছিল। এই সকল কারণে পৃথিবীর যে কোনও জাতির মধ্যে যে কোনও বিভাগে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা হইত, রাজা রামমোহন রায় তাহাতে প্রাণমনের সহিত আপনাকে ঢালিয়া দিতেন।

আষ্ট্রিয়াবাসিগণ যখন ইটালীবাসিদিগকে অনেক চেষ্টার পর যুদ্ধে পরাস্ত করিল, সেই সংবাদ কলিকাতায় আসিবামাত্র রাজা রামমোহন রায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। বন্ধুদিগের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে পারিলেন না। স্পেনে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজা রামমোহন রায় আনন্দে অধীর হইয়া কলিকাতা টাউনহলে একটী বিরাট ভোজ দিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সময় তিনি অতি ব্যগ্রতার সহিত বিলাতী ডাকের প্রতীক্ষা করিতেন। যখন দেখিতেন, স্বাধীনতা-প্রয়াসিদিগের পরাজয় হইয়াছে, তখন দরদর ধারে তাঁহার দুকপোল দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত।

ইংলণ্ড যাত্রাকালে উত্তমাশা অন্তরীপে (Cape of Good Hope) তিনি জাহাজে পড়িয়া গিয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে,ফরাসিগণ আপন জাহাজে স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ ত্রিবর্ণ পতাকা উত্থিত করিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায় আনন্দে অধীর হইয়া ভগ্ন পদেই সেই ত্রিবর্ণ পতাকাকে অভিবাদন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। কাহারও নিষেধ মানিলেন না। ভগ্ন পদে অতি কষ্টে ফরাসী জাহাজে গিয়া সেই পতাকাকে অভিবাদন করিলেন এবং ফিরিয়া আসিবার সময় "জয় ফরাসীর জয়! জয় ফরাসীর জয়!!" বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন। কি স্বাধীনতা-প্রিয়তা! এক দিকে যেমন এই বিশ্ব-জনীন প্রেম, দেশ ও কালে অবিদ্ধ না থাকিয়া, সমগ্র মানব জাতিতে বিস্তৃত হইয়াছিল, তেমনি, অন্য দিকে, তাঁহার অসাধারণ স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশবৎসলতা বিদ্যমান ছিল। স্বজাতি ও স্বদেশের উন্নতির জন্য তিনি চির জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কষ্টে, দুঃখে, নির্য্যাতনে, স্বদেশীয়দিগের অকৃতজ্ঞতায় ও কৃতঘ্নতায় * তিনি কোনও দিন বিচলিত হন নাই। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তি হইতে নিরক্ষর নিরন্ন দরিদ্র প্রজাদিগের জন্য তিনি সমান ভাবে খাটিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, ইচ্ছা করিলে—তাঁহার মতন প্রতিভাশালী লোক—অনায়াসে ক্রোড়পতি হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি অর্থ, পদমর্য্যাদা পদে নিক্ষেপ করিয়া দরিদ্রতার মুকুট মাথায় লইয়া আনন্দে কঠোর স্বদেশ-সেবার ব্রত গ্রহণ করিলেন।

ইংলণ্ডে গিয়া ভারতীয় দরিদ্র প্রজা-

* "His life was seriously threatened by a gang of assassins." * * * "Fire arms, gunpowder and daggers were immediately procured and burken danzes employed to guard the premises * * * Whenever Rammohan went into town he took with him dagger and sword-stick and was accompanied by Mr. Martin, who carried sword stick and pistols and by other armed attendants—"Collet's Life and Letters of Raja Rammohan Roy.

বর্গের সত্ব ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া ইংরাজ জনসাধারণের নিকট বিতরণ করিতেন। † পার্লিয়ামেণ্টারি কমিটিতে (Parliamentary Committee) সাক্ষ্য প্রদান কালে অকাট্য যুক্তি সহকারে এদেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে উচ্চ পদ সকল প্রদান করিলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য যে অতি সুন্দর রূপে সুনির্ব্বাহিত হইবে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। যে শাসন ও বিচার বিভাগ লইয়া ইংলণ্ড ও ভারতে এত আন্দোলন চলিতেছে, তিনি সুদূরদর্শী ঋষির ন্যায় এই অপবিত্র সম্মিলনের বিরুদ্ধে ষট্‌সপ্ততি (৭৬) বৎসর পূর্ব্বে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। এদেশের ভাষা, আচার ব্যবহার, প্রথা, অভ্যাস, অনুষ্ঠান বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অদূরদর্শী অল্পবয়স্ক ইংরাজ যুবকদিগকে বিচারাসনে বসাইলে কিরূপ বিচারবিভ্রাট হইতে পারে, তাহা তিনি কমিটিকে, সাক্ষ্য প্রদান কালে, সুস্পষ্ট রূপে অবগত করাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে তিনি খ্রীষ্টীয়ানদিগের উপাসনালয়ে যাইতেন এবং তাঁহারা যখন একত্রে সম্মিলিত উপাসনা করিতেন, তখন রাজর্ষি রামমোহন রায় একান্তে বসিয়া কাঁদিতেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "আমার দেশের লোকের অবস্থা ভাবিয়া কাঁদিতেছি, তাহারা কত দিনে ভ্রম ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া উদার বিশ্বজনীন 'ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।"

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যে Reform Bill পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের স্বাধীনতা বিস্তার করিবার প্রস্তাব ছিল। রাজর্ষি রামমোহন একাগ্রচিত্তে ইহার ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। * তিনি আপনাকে ইহাতে এতদূর ঢালিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিলেন, যদি এই Bill বিধিবদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া স্বাধীনতার রঙ্গভূমি আমেরিকায় গিয়া বাস করিবেন। † কি স্বদেশ-প্রীতি, কি স্বজাতিবৎসলতা!

তাঁহার মানব আত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান অতীব উন্নত থাকাতে তিনি সকলকেই প্রাণের সহিত "ব্রাদার" বলিতেন। আজ কালের ফাঁপা ফোলা অন্তঃসার-শূন্য "ভাই"এর মতন তিনি "ব্রাদার" শব্দ ব্যবহার করিতেন না। "ব্রাদার" বলিবার সময় তাঁহার সমস্ত হৃদয়, সমগ্র প্রেম আসিয়া যেন মানুষকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিত।

মানব আত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান আত্ম মর্য্যাদার রূপান্তর মাত্র। তাঁহার অসাধারণ আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান ছিল। তিনি যখন কলেক্টরের

† দুঃখী কৃষিজীবিগণ! যে সময়ে তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপর্য্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াও নিজে স্বচ্ছন্দ মনে ও নিরশ্রু নয়নে অত্যপকৃষ্ট তণ্ডুলগ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময় তিনি ঐ দুঃসহ দুঃখ রাশি পরিহার করিয়া তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন ও তজ্জন্য * * * তোমাদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক রাজপুরুষের নিকট স্বহস্তে লিখিয়া বিশেষ কাতরতা প্রকাশ করেন।

—উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত।

* "I have been impatiently waiting in London to know the result of the Bill"—In a letter to Miss Kiddel.

† As I publicly avowed that in the event of the Reform Bill being defeated I would renounce my connection with this country, I refrained from writing to you or any other friends in Liverfool until I knew the result."—In a letter to Mr. William Rathbone. He was resolved on leaving England and transferring himself and his allegiance to the United States—Collet.

অধীনে সেরেস্তাদারের * কার্য্য গ্রহণ করেন, তখন তিনি কলেক্টরকে স্পষ্ট জানাইয়াছিলেন যে, যখন তিনি কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সম্মুখে যাইবেন, তখন তাঁহাকে বসিতে আসন দিতে হইবে এবং অপরাপর কর্ম্মচারীর ন্যায় তাঁহার প্রতি হুকুম জারি করা হইবে না। কলেক্টর স্বীকৃত হইলে তিনি কার্য্য গ্রহণ করেন। †

এক দিন জ্যৈষ্ঠ মাসের নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় হঠাৎ অপরাহ্নে তিনি তাঁহার বন্ধু আডাম সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। উত্তেজনায় তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আডাম সাহেবের মনে ভয় হইল। রাজর্ষি রামমোহন বলিলেন "তুমি যদি কিছু মনে না করত আমার পাক্‌ড়ীটা খুলিয়া ফেলি। এবং ত্বরায় জল আনিতে বলিলেন। জল খাইয়া একটুক সুস্থ হইয়া বলিলেন "আমার জীবনের সর্ব্ব প্রধান আঘাত ও সর্ব্ব প্রধান দুঃখ আজ পাইয়াছি। বিশপ Middleton আমাকে প্রলোভন দেখাইয়া খ্রীষ্টান করিতে চায়। ছি ছি, সে আমাকে এত ছোট লোক মনে করে!" ইহার পর তিনি বিশপ Middleton এর মুখ দর্শন করেন নাই।'

সতীদাহ লইয়া Lord William Bentinck রাজর্ষি রামমোহনের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য একজন পারিষদকে (Aides de-camp) তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। উদ্ধত-প্রকৃতি পারিষদ রাজার নিকট উপস্থিত বলিলেন "গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক আপনার সহিত দেখা হইলে সন্তুষ্ট হইবেন।" রাজা রামমোহন রায় উত্তর করিলেন "আমি এখন বৈষয়িক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র চর্চ্চা ও ধর্ম্মানুশীলনে নিযুক্ত রহিয়াছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক লাটসাহেবকে আমার সম্মান জানাইয়া বলিবেন যে, তাঁহার মতন প্রতাপান্বিত মহৎ ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইবার আমার ইচ্ছা নাই, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।' পারিষদ ফিরিয়া সকল কথা বলিলে পর সুচতুর মহাত্মা বেন্টিঙ্ক বলিলেন "পুনরায় তাঁহার নিকট গিয়া বলুন যে,মিষ্টার উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের সহিত আপনি একবার অনুগ্রহ করিয়া দেখা করিলে তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন।" রাজা রামমোহন রায় এ শিষ্টাচারের হাত এড়াইতে পারিলেন না। *

* তখন সেরেস্তাদারকে দেওয়ান বলিত। রাজা-রামমোহন রায়ের বন্ধুগণ তাঁহাকে সর্ব্বদা "দেওয়ানজী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

† তিনি এই মর্ম্মে একটা লেখাপড়া করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দেন, যখন তিনি কার্য্যের জন্য তাঁহার (কলেকটরের) সম্মুখে আসিবেন,তখন তাঁহাকে আসন দিতে হইবে এবং সামান্য আম্‌লাদিগের প্রতি যে প্রকারে হুকুমজারি করা হয়,তাঁহার প্রতি সে প্রকার করা হইবে না।—শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্র বাবুর জীবনী।

* * * under a written order or agreement signed by the latter (Mr. John Digby, Collector of Rungpore, that "Rammohan Roy should not be kept standing in his presence, or receive orders as a common amla from the huzoor."—Leonard's Brahmo Samaj.

* Lord William Bentinck * * * sent one of his aides-de-camp to him expressing his desire to see him. To this the Rajah replied "I have now given up all wordly avocations and am engaged in religious culture and in the investigation of truth. Kindly express my humble respects to the Governor General and inform him that I have no inclination to appear before his august presence and therefore I hope that he will kindly pardon me." * * * * * The Governor General answered "Go back and tell him again that Mr. William Bentinck will be highly obliged to him if he will kindly see him once."—Collet.

এক দিকে এই অসাধারণ আত্মসম্মানের জ্ঞান, অন্য দিকে আবার অসাধারণ আত্ম-বিলোপ। বাস্তুতঃ এই অসামঞ্জস্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়।

১৮২৩০ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট একটী শিক্ষা-সমিতি নিয়োগ করিয়া সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়া তাঁহা-দের হস্তে প্রাচ্য শিক্ষা বিস্তারের ভার অর্পণ করিলেন'। রাজা রামমোহন রায় স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রাচ্য শিক্ষা প্রচারে দেশের কি প্রকার অবস্থা হইবে ও প্রতীচ্য শিক্ষা বিস্তারের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট একখানি আবেদন প্রেরণ করেন।* শিক্ষা বিষয়ে এরূপ সুযুক্তিপূর্ণ মহামূল্য দলিল অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতীচ্য পক্ষের জয় হইলে কলিকাতা হিন্দু কলেজ স্থাপন করিবার জন্য একটী সমিতি নিয়োগ হয়। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট (Sir Hyde East) মিঃ হ্যারিংটন, মহাত্মা ডেভিড হেয়ার, গোপীনাথ দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, গঙ্গানারায়ণ দাস ও বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সেই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হন। গোঁড়া হিন্দুগণ রাজর্ষি রামমোহনের সেই সমিতিতে সভ্য হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি করিলেন। সত্য-প্রিয়, ন্যায়নিষ্ঠ, মহাত্মা হেয়ার ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, যাঁহার প্রসাদে ও প্রতিভা বলে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইতে চলিল, তাঁহাকেই তাহার কমিটি হইতে বাদ। তিনি অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন। হিন্দুরা বলিলেন, রামমোহন রায় সভ্য নিযুক্ত হইলে তাঁহারা কলেজের সহিত কোনও প্রকার সম্পর্ক রাখিবেন না। * রাজা রামমোহন রায় যখন এই সব কথা শুনিলেন, তখন তিনি বন্ধুবর হেয়ার সাহেবকে বলিলেন "ছি! ছি!! আপনি কি পাগল হইয়াছেন, আমার নাম না থাকিলে ক্ষতি কি? এতে যে আমার দেশের লোকের উপকার হইবে। আপনি কি মনে করেন, আমার নাম না থাকিলে আমি ইহার জন্য খাটিব না, কলেজের সহিত আমার সম্পর্ক থাকিলে যদি ইহার ক্ষতি হয়, আমি অনায়াসে সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিব।" † হেয়ার সাহেব রাজার মুখের দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া গেলেন। দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধন যাঁহার জীবনের ব্রত, তিনি কি সম্মানের প্রয়াসী! ‡

এই আত্ম-বিলোপের কথা ভাবিলে আর একজন মহাপুরুষের কথা মনে পড়ে। তিনি মহাত্মা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনেকেই তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিত পাঠ করিয়াছেন

---

* ইহার দ্বারা কেহ না মনে করেন যে, রাজর্ষি রামমোহন প্রাচ্যশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি কেবল আপেক্ষিক (comparative) উপকারের কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বেদান্তচর্চা প্রবর্তিত করিবার জন্য স্বয়ং বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন ও অধ্যাপনা প্রচলিত রাখিবার উদ্দেশ্যে এদেশীয় চতুষ্পাঠী সমুদায়ের অধ্যাপকগণের আনুকূল্য প্রার্থনা লিখিয়াছেন।—লেখক

* It was subsequently reported that Rammohan Roy would be connected with the college. The orthodox members one and all said that we will have nothing with the College." Pearychand Mitra's A biographical Sketch of David Hare.

† "If my connection with the proposed college should injure its interests, I would resign all connections. – Pearychand Mitra's A biographical sketch of David Hare.

‡ There was no difficulty in getting Rammohan Roy to renounce his connection as he valued the education of his countrymen more than the empty flourish of his name as a committee man.—Ibid.

এবং লক্ষ্য করিয়াছেন যে তাহাতে তাঁহার সুবৃহৎ জীবনের (৮৯ বৎসর জীবিত ছিলেন) কেবলমাত্র এক চত্বারিংশৎ বৎসরের (৪১ বৎসর) ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার কারণ কি? ইহার কি কোনও গূঢ় রহস্য নাই!! ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, "তাঁহার ৪১ বৎসর বয়সের সময় কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক প্রতিভাশালী কর্ম্মঠ ব্যক্তি আসিয়া পড়েন। পাছে আত্মজীবনী লিখিতে গেলে ইহাদের কার্য্যের নিন্দা অজ্ঞাতসা'র তাহাতে আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি আর অগ্রসর হন নাই, এইখানেই ক্ষান্ত দিলেন।" কি আশ্চর্য্য আত্মসম্মান জ্ঞান! কি আত্ম-বিলোপের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!!

এই আত্মসম্মানের ও আত্মবিলোপের অপূর্ব্ব সম্মিলন অভাবে অনেক মহাপুরুষ-দিগের অধঃপতন হইয়াছে। আত্মপ্রতিষ্ঠা অনেক সময় প্রেয়ঃ হইলেও কোনও কালে শ্রেয়ঃ নয়, একথা অনেকে ভুলিয়া যান।

কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা।

রাজর্ষি রামমোহন রায় যে কাজে হাত দিতেন, সে কাজ সুসম্পন্ন না করিয়া কিছুতেই ছাড়িতেন না। তিনি কিছুতে পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। যাহা একবার ধরিতেন, তাহা বজ্রমুষ্টিতেই ধরিতেন, তাহা হইতে কিছুতেই বিচলিত হইতেন না। প্রতিবন্ধক পাইলে তাঁহার প্রচ্ছন্নশক্তি যেন লাফাইয়া উঠিত।

তিব্বতে গিয়া লামাদিগের* সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম লইয়া নানা প্রকার তর্ক বিচার উপস্থিত করেন। তিব্বতবাসীগণ লামা-উপাধিধারী জীবিত মনুষ্যবিশেষকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। রামমোহন রায় এই ভয়ানক কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিলে তিব্বতবাসী পুরুষগণ তাঁহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রাণ-নাশের চেষ্টা করেন।* কোমলহৃদয়া, স্নেহ-প্রেমবিগলিতা তিব্বতীয় মহিলাদিগের সাহায্যে তিনি প্রাণরক্ষা করেন। সেই দিন হইতেই তিনি কোনও দিনই নারীজাতিকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের উন্নতির জন্য কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি বার্দ্ধক্যে, চিরজীবনই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, সহমরণ নিবারণ, বহু বিবাহ নিরোধন, বাল্যবিবাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বিবাহে পণগ্রহণ-নিবারণ, পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীদিগের অধিকার প্রভৃতি নারীজাতির হিতকর ও উন্নতসাধক সকল কাজেই তিনি তন্ময় হইয়া গিয়া-ছিলেন।

নারীজাতি সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপিত হইলে তিনি সম্ভ্রমের ও সম্মানের সহিত উল্লেখ করিতেন।

দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলন হওয়া উচিত বলিয়া তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। লর্ড আমহার্ষ্টকে আবেদন করিয়া, নিজে স্বয়ং নিজব্যয়ে পাশ্চাত্যশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গৃহে গৃহে গিয়া ছাত্রসংগ্রহ করিতে লাগিলেন।†

তিনি শ্রীরামপুরী পাদরী সাহেবদিগের

* বৌদ্ধ-পুরোহিত।

* He often incited the anger of the worshippers of the Lama by his rejection of their doctrine that this pretended deity —a living man was the creator aed preserver of the world.—Dr Lant carpenter.

† আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে ঐ স্কুলে দেন।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহযোগে ইংরাজি বাইবেল অনুবাদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কোন কোন শব্দের অনুবাদ লইয়া তাঁহাদের সহিত মতদ্বৈধ হয়। তিনি এক অর্থ করেন, পাদরী সাহেবেরা অন্য অর্থ করেন। তিনি পাদরীদিগের অনুবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া স্বয়ং মূল পুস্তক পাঠ করিলেন এবং অস্বাভাবিক ও অলৌকিক অংশ বাদ দিয়া খ্রীষ্টের উপদেশ সুখ শান্তির পথপ্রদর্শক (Precepts of Jesus—Giude to peace and Happiness)নাম দিয়া একখানি পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। ইহাতে পাদরী সাহেবদিগের সহিত তাঁহার তুমুল তর্কযুদ্ধ হয়। পাদরীগণ, কিছুতেই তাঁহাকে পরাজিত করিতে না পারিয়া, তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে তাঁহার পুস্তকাদি মুদ্রিত করিতে অস্বীকার করিলেন। রাজা রামমোহন রায় দমিবার পাত্র ছিলেন না, প্রতিকূলতা বশতঃ নিজ সংকল্পিত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, তিনি নবীন উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বয়ং মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া কম্পোজিটারকে কাজ শিখাইয়া নিজের গ্রন্থ ছাপাইয়া ছাড়িলেন।†

ঈশ্বরে নির্ভরশীলতা।

আমাদের দেশের একটী গ্রাম্য প্রবাদ আছেঃ—"ভবী ভুলিবার নয়।" রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মালোচনার কথা ভাবিলে ঠিক এই কথাই মনে পড়ে।

কি চাকুরীর সময়ে, কি বিষয় কার্য্যের মধ্যে, কি রঙ্গভূমিতে, কি নৃত্যাগারে, কি সুহৃদ্-গোষ্ঠীতে, যেখানেই তিনি গিয়াছেন, সেই খানেই লোকে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে যে, কিছুক্ষণ পরেই তিনি অন্যমনস্ক হইয়া এক কোণে কোন না কোনও বন্ধুর সহিত ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা উপস্থিত করিয়া তাহাতেই একবারেই মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। স্বীয় লক্ষ্য-সাধনে কি আবেশ! কি নেশা! সর্ব্বত্রই সকল সময়েই এক চিন্তা, এক প্রসঙ্গ, এক ধ্যান, এক জ্ঞান।

রাজর্ষি রামমোহন সকল প্রকার সংস্কারে অগ্রণী ছিলেন। আমরা এমন কোন হিতকর সংস্কারের কথা জানি না,যাহা তাঁহার সুবিশাল হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি সকল প্রকার সংস্কারের শীর্ষদেশে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছেন। * প্রকৃত কথা,তাঁহার ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, মানব প্রকৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই ধর্ম্ম মানব মনের আকাঙ্ক্ষা ও মানব জীবনের উদ্দেশ্যকে ওতপ্রোত ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে এবং ক্রমশঃ মানব প্রকৃতিকে উচ্চ হইতে উচ্চতর ঐশ্বর্য্যে আকর্ষণ করিতেছে। আমি "Raja Ram Mohan Roy and Christianity" নামক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, তাঁহার শিক্ষাসংস্কার, সামাজিক সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার, সকল সংস্কারের ভিতরে মনিহারের অন্তস্থ সূত্রের ন্যায় তাঁহার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাব বিদ্যমান ছিল।† এবং তাঁহার

† "It announces that while all the previous works of the author on the subject of christianity had been printed at the Baptist Mission Press, Calcutta,the acting proprietor had after the second Appeal appeared declined * * * * to print any other production of Rammohan on the same subject. Rammohan was therefore obliged to purchase his own type and rely on native superintendence·—Collet's Life.

* শ্রদ্ধাষ্পদ স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজার এক স্মৃতি-সভায় এইরূপ বলিয়াছিলেন।

† Any one who is least acquainted with the life and work of Raja Rammohan Roy cannot fail to understand that the

এই সুমহান্ উদার ধর্ম্মভাব তাঁহার সকল প্রকার সংস্কারকে অনুরঞ্জিত করিয়াছিল। এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মভাবকে মহাত্মা থিওডোর পার্কার (Theodore Parker) religious element আখ্যা দিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় এই উদার ধর্ম্ম ভাবকে মানব মাত্রেরই সাধারণ সত্ব বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য তিনি দেশ, কাল ও জাতিগত পার্থক্য সত্বেও জগতের জাতি সমূহের মধ্যে একটী প্রকৃতিগত একতা দেখিতে পাইতেন। এই উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব তাঁহাতে বিশ্বজনীন প্রেম উৎপন্ন করিয়াছিল। সেই জন্য তিনি সকল প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়াও সুদুষ্কর নরসেবা ব্রতে আপনার প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এই অসাধারণ মানব প্রেমই তাঁহাকে সংসার-বিমুখ সন্ন্যাসধর্ম্মে বীতরাগ করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ধর্ম্মকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াও "জগৎ মিথ্যা" বলিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন নাই। বরং তিনি সংসারকেই বিধাতার লীলাক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতেন। সংসারই ধর্ম্মসাধনের প্রধান ক্ষেত্র। প্রস্তর খণ্ড সকল যেমন ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া মসৃণ ও সগোল হইয়া শালগ্রামে পরিণত হয়, তেমনি, মানুষ সংসারের ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাতে পড়িয়া প্রকৃত মানুষ হইয়া দাঁড়ায়। পাপ প্রলোভনের মধ্যে বাস করিয়া যিনি নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ থাকিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বীর।

"বিকার হেতৌ বিক্রিয়ন্তে যেষাম্ ন
চেতাংসি তয়েব ধীরাঃ।"

যুদ্ধে শত্রুজয় করা অপেক্ষা আত্মজয় করাই প্রকৃত বীরত্ব। ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই।

ভক্তিভাজন পণ্ডিতপ্রবর শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন "সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, প্রচলিত ধর্ম্মের সাধকগণ,বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রচারকগণ আপনাদিগকে ধার্ম্মিক দেখাইবার জন্য কতই ব্যগ্র হন। গৈরিক ধারণ করিয়া, মালা কমণ্ডলু লইয়া গৃহ পরিবার ত্যাগ করিয়া, কতরূপে মানুষকে বলেন, তোমরা যেরূপ আমরা সেরূপ নই, তোমরা সংসারী আমরা বিরাগী, তোমরা ভোগী, আমরা যোগী, তোমরা আসক্ত আমরা ত্যাগী ইত্যাদি। রামমোহন রায়ের মতিগতি যেন ঠিক ইহার বিপরীত ছিল। তিনি উপদেশ লিখিয়া অপরকে দিয়া পড়াইতেন, গ্রন্থ লিখিয়া শিষ্যদিগের নামে ছাপাইতেন, একদিনও আচার্য্যের আসনে বসেন নাই। আহার ব্যবহার আলাপে সামান্য মানবের ন্যায় থাকিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহাতে ধর্ম্মের অস্বাভাবিকতা কিছুই ছিল না।" *

রাজা রামমোহন রায় যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে বঙ্গদেশে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান সভ্যতা বিশুদ্ধ ধর্ম্মবিহীন হইয়া ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। উদার বিদ্যাশিক্ষা, স্বাধীন চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক পরিচালন, এ সব কিছুই ছিল না। বঙ্গবাসীগণ, হিন্দুধর্ম্মের দুর্জ্জয় শাসনে ঘোর স্বার্থপর ব্রাহ্মণদিগের প্রবল প্রতাপে স্বাধীনতা বিসর্জ্জিত

root of his was religion. The social, political, literary reforms in whichever he took part were but the outcome of his deeply intense theistic passion.

লেখকের—Raja Rammohan Roy and Christianity"

° তিনি যে কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সকলেরই মূলভিত্তি ধর্ম্ম! নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক যে কোন সংস্কারের কথা বলুন না কেন,তাহাদের সকলেরই মূলতত্ব তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণতা।

—লেখকের "সমাজ-সংস্কারে রাজা রামমোহন রায়।"

* প্রবন্ধাবলী।

হওয়ায়, গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায়,লোকপরম্পরাগত রীতিনীতির ও দেশাচারের অনুস্মরণ করাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত। প্রাণপ্রতিম জীবন্ত শিশু সন্তানকে সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করা, জ্বলন্ত চিতা বক্ষে পতিবিয়োগকাতরা শোকোন্মত্তা, হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা মাতা ভগিনী দুহিতাকে দগ্ধ করা, পরম ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইত। তৎকালে মনুষ্যের পশুবৎ আচরণ সকল যেন মূর্ত্তিমান হইয়া বিকটবেশে সর্ব্বত্র বিচরণ করিত। দুর্গোৎসবের বলিদান, কালীপূজার পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য গীতাদি, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গণ্ডগোল, বুলবুল ও ঘুড়ীর খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই লইয়া সকলেই মহানন্দে কালযাপন করিত।* চতুর্দ্দিকে কেবল পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর ও তান্ত্রিকদিগের ঘৃণিত ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল যখন গাঢ় তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞানতা ও ভ্রমের গভীরতম কূপে বঙ্গবাসিদিগকে নিমগ্ন করিতেছিল, তখন রাজর্ষি রামমোহন রায় "একমেবাদ্বিতীয়মে"র স্বর্ণাক্ষরে লিখিত উজ্জ্বল পতাকা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অনন্ত স্বরূপ মহান্ প্রভু পরমেশ্বরের বিজয় নিশান উড্ডীন করা তাঁহার জীবনের এক মহা ব্রত ছিল। ষোড়শ বৎসর বয়সে তিনি যে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরব্রহ্মের জয় পতাকা হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, রোগে, শোকে, সুস্থতায়, কষ্টে, নির্যাতনে, দেশে বিদেশে, বাল্যে যৌবনে, বার্দ্ধক্যে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত একাগ্রচিত্তে তাহা বহন করিয়াছিলেন। "হায়! ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তাঁহার কত যত্ন করিতে হইয়াছিল, তাঁহার ধন গেল, সমুদয় বিষয় গেল, দিল্লির বাদসাহের বেতনভোগী পর্য্যন্ত হইয়া জীবন পোষণ করিতে হইয়াছে।"*

তিনি পৌত্তলিকতার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাল্যকালে তাঁহার পিতামহের প্রতিনিধি হইয়া রাজা রামমোহন রায়কে দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন। দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া রাজা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন "আমাকে পূজার নিমন্ত্রণ!" মহর্ষি শেষ বয়সেও বলিয়াছেন "সে স্বর আমি যেন এখনও শুনিতে পাইতেছি।"

দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমাকে বিবিধসাজে সাজাইয়া লোকে যখন বিসর্জ্জন করিতে যাইত, তাঁহার কোন বন্ধু তখন যদি বলিতেন, "দেওয়ানজী দেখুন দেখুন কেমন প্রতিমা সুন্দর সাজাইয়াছে" রাজর্ষি অমনি তখন বলিয়া উঠিতেন "Brother! Brother!! ours is universal religion" "ভাই, ভাই, আমাদের যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম।" একথা বলিতে বলিতে রাজার দুকপোল ভাসিয়া অবিরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর ভারতের পক্ষে এক শুভ দিন গিয়াছে। সেই দিন রাজা রাজমোহন রায়ের সহিত কথো—

* লেখকের তাঁহার পূজ্যপাদ স্বর্গীয় শতবর্ষীয় (১০০ বৎসর দশ মাস) পিতামহ-দেব-বর্ণিত "সেকালের কথা" শুনিতে শুনিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে লেখক বিদেশে (দেরাদুন) থাকায় সে সব কথা লিখিয়া রাখিতে পারেন নাই।

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পকথন করিবার জন্য বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।* ভারতের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক অবস্থা, ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং ভারতীয় দার্শনিক-দিগের মতামত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। প্রধান প্রধান সুপণ্ডিতগণ তাঁহার অসাধারণ তর্কশক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলেন। তিনি তিন ঘণ্টাকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া তর্কবিশারদ পণ্ডিতদিগের জটিল প্রশ্ন সকলের সদুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।† পণ্ডিতগণ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! ইহাই তাঁহার পার্থিব জীবনের শেষ কার্য্য, তাঁহার জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক! এই মহা দিনে ভারতের বিমুক্ত পূর্ণ শশধর রাহুগ্রস্ত হইলেন।‡ ক্রমশঃই তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তখনও তাঁহার মানসিক শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ১৯শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায় জ্বরাক্রান্ত হইলেন। ক্রমশঃই জ্বর বাড়িতে লাগিল, ক্রমে জ্বরবিকারে পরিণত হইল। কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর ২টা ২৫ মিনিটের সময় প্রদীপ্ত প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেল! স্বাধীনতার ঋত্বিক্ স্বাধীন দেশে প্রাণত্যাগ করিলেন। পৃথিবীর পঞ্চভূত পৃথিবীতে প্রত্যর্পণ করিয়া "ওম্" "ওম্" উচ্চারণ করিতে করিতে, সেই অমর আত্মা পবিত্র অমরধামে চলিয়া গেলেন।* ইংলণ্ড কাঁদিল। ভারত কাঁদিল। চিরতরে ভারতের অদৃষ্ট ভাঙ্গিল! হা ঈশ্বর! তোমার রহস্য, তোমার মঙ্গলময় বিধান কে বুঝিবে?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

* A large party was invited to meet the Rajah at Stapleton Grove on the 11 of September. —Mary Carpenter's "Last days of Rammohan Roy."

† In conversation at Stapleton Grove were men fully competent to judge of intellectual power and one and all admired and were delighted by the clearness, the closeness and the acuteness of his arguments, and the beautiful tone of his mind * * * the Rajah continued for three hours, standing the whole time, replying to all the enquiries and observations that were made by a number of gentlemen who surrounded him, on the moral and political state and prospects of India on the elucidation at great length of certain dogmas of the Indian philosophers."

—Dr. Lant Carpenter L.L.D.

‡ I percieved that he was much exhausted with the excitement and fatigue of the preceding evening—I bid.

* The Raja seemed to pass much of his waking time in prayer * * * * His utterance of sacred "Aum"—one of the last words he was heard to utter—Collet's Life.

জড়তত্ত্ব।*

পদার্থ কাহাকে বলে, জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যালয়ের বালকমাত্রেই উত্তর করিবে—"আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহাদিগকে পদার্থ কহে।" কিন্তু যে অন্ধ, তাহাকে পদার্থ কি বুঝাইতে হইলে আর ওরূপ বলিলে চলিবে না। একটা শব্দ উৎপন্ন করিয়া তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে, যাহা হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, উহা একটী পদার্থ। আবার যে অন্ধ ও বধির, তাহাকে পদার্থ কি বুঝাইতে হইলে, তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা তাহার স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উহা তাহাকে বুঝাইতে হইবে। এই কথার সারার্থ হইল এই যে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে আমরা যাহাদিগকে জানিতে পারি, অথবা ইন্দ্রিয়গণ আমাদের নিকট যাহাদের সংবাদ আনিয়া দেয়, তাহাদিগকে পদার্থ কহে। কিন্তু, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণের উপর নির্ভর করিয়া পদার্থের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা একান্ত নিরাপদ নহে। 'ছায়া ত'আমরা দেখিতে পাই, ছায়াটা তবে কি রকম পদার্থ? ঘটিটা, বাটিটা যে রকম পদার্থ, ছায়াটা কি সেই রকম পদার্থ? দর্পণের ভিতর যে আমার মুখের মতন একটা মুখ দেখা যায়, সেটা কি রকম পদার্থ? সে মুখে কখনও আমার এ মুখের (যে মুখ দিয়া এত কথা বলিতেছি, সেই মুখের) মতন পদার্থ হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে ত আমি আর একজন থাকি না, তাহা হইলে আমি যে বহু হইয়া পড়ি। শুধু কি এই গণ্ডগোল? ভূতের কথা ভাবিতে ভাবিতে সভয়ে মুখ তুলিয়া দেখি, সম্মুখে এক বিকটাকার প্রকাণ্ড শরীর অথচ সেটা কিন্তু কিছুই নহে। আলোক নাই, অথচ যেন দিব্য জ্যোৎস্না দেখিলাম; শব্দ নাই অথচ যেন দিব্য স্বর কর্ণে ধ্বনিত হইল, অনেক সময় এইরূপ ভুল হয়। ইন্দ্রিয়গণ পদার্থ-সমূহের সংবাদ আমাদিগকে আনিয়া দেয় বটে, কিন্তু অনেক সময়ে ভুল সংবাদও আনিয়া থাকে। কাজেই, 'পদার্থ' কাহাকে বলে, ইহা ঠিক করিবার জন্য আমাদের কেবল ইন্দ্রিয়গণকে বিশ্বাস করিলে চলিবে না; যাহাদিগকে পদার্থ বলি, তাহাদের কতকগুলি ধর্ম্ম জানা আবশ্যক; এমন কতকগুলি ধর্ম্ম জানা আবশ্যক, যাহা পদার্থ মাত্রেই বিদ্যমান আছে এবং পদার্থ ভিন্ন আর কিছুতে নাই। পণ্ডিতগণ দেখিলেন, কতক গুলি পদার্থের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, তাহাদের সকলেরই ভার আছে। তাঁহারা এই পদার্থ গুলির নাম দিলেন 'জড়পদার্থ'। অতএব পদার্থটা জড়পদার্থ কি না, ইহা জানিতে হইলে, আমাদিগকে ইহা দেখিলেই চলিবে যে, উহার ভার আছে কি না। যদি ভার না থাকে, তবে উহা জড়পদার্থ নহে।

ইহা এক রকম বোঝা গেল, কিন্তু তবু জ্ঞানের সীমানায় আসিতে পারিলাম কই? জড়পদার্থের ভার কেন আছে? কতকগুলি পদার্থের ভার আছে, আর কতকগুলির নাই কেন? যাহাদের ভার নাই, তাহারা কি রকম

* ১৩১৫ সালের ১৫ই চৈত্র গৌহাটি বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত হয়

পদার্থ? জড়পদার্থগুলিই বা এক একটা এক এক রকমের কেন? একটা আবার আর একটার সঙ্গে মিশে কেন? মিশিয়া আবার নূতন রকমের একটা উৎপন্ন হয় কেন? কতকগুলি পদার্থ শক্ত, কতকগুলি তরল কেন? এই যে বিভিন্ন রকমের জড়-পদার্থ দেখা যাইতেছে, ইহারা কি সকলেই ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের? অথবা, ইহাদের বংশানুক্রমিক সূচী সংগ্রহ করিতে পারিলে ইহাদের আদিপুরুষে একমাত্র উপাদানের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইবার সম্ভাবনা? এইরূপ এবং ইহাপেক্ষা বড় বড় প্রশ্ন মনে উদিত হইয়া আমাদের জ্ঞানগর্ব্ব চূর্ণিত করিয়া দেয়। যিনি জ্ঞানসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই ইহার অনন্তত্ব দর্শনে স্তম্ভিত হইয়াছেন। তাই জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ের অন্তস্তলে এই কথা ধ্বনিত হয় "আমি যাহা কিছু শিখিয়াছি, তাহা হইতে এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি কিছুই জানি না।" যিনি এই কথা বলিতে পারেন, তিনি কিছু শিখিয়াছেন, অন্যে নহে। জ্ঞানের সীমানা বহু দূরে, তথায় পৌঁছিতে মনুষ্যের ক্ষমতায় কুলায় কি না, তাহা জানি না। মূল কারণে পৌঁছিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, আমাদের ক্ষমতা জড়পদার্থের কতকগুলি ধর্ম্মের সহিত পরিচিত হওয়া মাত্র।

জড়ের এক প্রধান ধর্ম্ম এই যে, ইহার ভার আছে। সোণা, রূপা, ইট, কাঠ, পাথর, ইহারা জড়পদার্থ, কেননা ইহাদের ভার আছে। আলোক, তাপ, ছায়া, হিংসা, ক্রোধ, লোভ, ইহারা জড়পদার্থ নহে, কেন না ইহাদের ভার নাই।

জড়ের আর একটী ধর্ম্ম এই যে, জড় খানিকটা যায়গা জুড়িয়া অবস্থান করে। এই ধর্ম্মটা শুধু জড়েরই ধর্ম্ম, এরূপ বলা চলে না। (পণ্ডিতগণ, ঈথর অথবা আকাশ বলিয়া এক বিশ্বব্যাপী পদার্থের কল্পনা করেন; কিন্তু এই ঈথর অথবা আকাশকে তাঁহারা জড়-পদার্থ বলেন না।) যাহা হউক, জড়পদার্থের এই ধর্ম্ম আছে বলিয়াই একটা জড়পদার্থ যেখানে আছে, সেখানে আর একটা জড়পদার্থের থাকা অসম্ভব। যদি জড়ের এই ধর্ম্ম না থাকিত, যদি একটা জড় যেখানে আছে, আর একটাও সেইখানে থাকিতে পারিত, তাহা হইলে একটার ভিতর দাম একটা পুরিয়া, তাহার ভিতর আর একটা পুরিয়া, সমস্ত জড়জগৎ একটা জড়বিন্দুতে পরিণত করা সম্ভবপর ব্যাপার হইত। কিন্তু সেরূপ হওয়াটা বোধ হয়, যিনি এই জড়জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন (যদি কেহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন) এবং এরূপ সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

জড়ের আর একটী ধর্ম্ম—সঙ্কোচনশীলতা। এই ধর্ম্ম হইতে জড়সম্বন্ধে আমরা মস্ত একটা তথ্যে উপনীত হইতে পারি। চাপ দিলাম, ঠাণ্ডা করিলাম, আর পদার্থটা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তবেই জড়পদার্থ নীরেট নয়। যদি নীরেট হইত, তবে সঙ্কুচিত হইতে পারিত না; কারণ জড়ের একটা অংশ যেখানে আছে, সেইখানে আর একটা অংশত থাকিতে পারে না। কাজেই জ্ঞান হয়, জড়পদার্থ নীরেট নয়; জড়পদার্থ মাত্রেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আছে এবং এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে ফাঁক আছে। সেই অংশগুলি এত ক্ষুদ্র আর তাহাদের মধ্যে ফাঁক এত অল্প যে, সহজচক্ষে আর আমরা তাহা ধরিতে পারি না; কিন্তু চাপ দিলে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ-গুলি অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি হয় কাজেই

পদার্থটা সঙ্কুচিত হয়। এখন প্রশ্ন এই, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি কেমন? তাহাদের আকৃতি, প্রভৃতি কিরূপ? তাহাদের ধর্ম্ম কি? তাহারাও কি সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত হইতে পারে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে জড়ের আর একটা ধর্ম্ম আলোচনা করা যাউক।

জড়ের আর একটী ধর্ম্ম—বিভাজ্যতা। আমরা যে সমুদয় জড়পদার্থ লইয়া নাড়াচাড়া করি, তাহাদের সকলকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। এখন জিজ্ঞাস্য হইয়া পড়ে, এই ভাগ করাটা কতদূর পর্য্যন্ত চলিতে পারে? ভাগ করিতে করিতে কি এমন একটা ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যাইবে, যাহাকে আর ভাগ করা যাইবে না? অথবা সেরূপ অংশ কখনই পাওয়া যাইবে না? এই একটা মস্ত প্রশ্ন। ড্যাল্টন এই প্রশ্নের একরকম উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের ভাগ করিবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। পদার্থকে ভাগ করিতে করিতে এমন একটা ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া যাইবে,যাহাকে আমরা আর ভাগ করিতে পারি না। এই অতি ক্ষুদ্র অংশকে বলা যাইবে পরমাণু। যে উপায়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা কতকটা এইরূপ :—"মনে করা যাউক যে প্রতি পদার্থই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি এবং পরমাণুগুলিই হইতেছে উহার ক্ষুদ্রতম অংশ এবং ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন এক একটা নির্দ্দিষ্ট ওজন আছে। তাহা হইলে একটা পদার্থের ভিতর ৫টা, ৭টা, ১০টা পরমাণু থাকিতে পারে,কিন্তু সাড়ে পাঁচটা, পৌণে সাতটা বা সওয়া দশটা পরমাণু কোন পদার্থের ভিতর থাকিতে পারে না। যখন দুইটা পদার্থ মিশিয়া একটা নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে, তখন একটার কতকগুলি পরমাণু আর একটার নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক কতকগুলি পরমাণুর সহিত মিশিয়াই একটা নির্দ্দিষ্ট রকমের পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ মনে কর, একটা পদার্থ 'ক' এর একটা পরমাণু আর একটা পদার্থ 'খ' এর ১টা পরমাণুর সহিত মিশিয়া একটী নূতন পদার্থ 'ট' উৎপন্ন হইল। এই 'ক' এর ১টা পরমাণুও 'খ' এর ১টা পরমাণু যখনই ঐ ভাবে মিশিবে,তখন একই পদার্থ 'ট' পাওয়া যাইবে; 'ট' ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যাইবে না। যদি 'ক' 'খ' মিশাইয়া আরও নূতন নূতন পদার্থ 'ঠ' 'ড' 'ঢ' ইত্যাদি পাইতে হয়, তবে 'ক' এর ১টা পরমাণুর সহিত আর 'খ' এর ১টা পরমাণু মিশিলে চলিবে না; 'ক' এর ১টার সঙ্গে 'খ' এর ২টা, ৩টা, ৪টা, ৫টা পরমাণু মিশিলে তবে নূতন নূতন পদার্থ 'ঠ' 'ড' 'ঢ' 'ণ' ইত্যাদি পাওয়া যাইবে। এখন, 'খ' এর সকল পরমাণু গুলিরই ওজন সমান এবং প্রতি পরমাণুরই একটা নির্দ্দিষ্ট ওজন আছে। 'ক' এর একটা পরমাণুর সহিত 'খ' এর ১টা পরমাণু যোগে যে 'ট' পদার্থ হইল, ইহার যে ওজন হইবে, 'খ' এর ১টা না হইয়া ২টা পরমাণুযোগে যে 'ঠ' পদার্থ হইল,'ট' এর অপেক্ষা তার ওজন কতটুকু বেশী হইবে? না, 'খ'এর একটা পরমাণুর ওজন যাহা। আবার 'খ' এর ৩টা পরমাণুযোগে যে পদার্থ 'ড' হইল, 'ট' এর অপেক্ষা তাহার ওজন কতটুকু বেশী হইবে? না 'খ'এর ২টি পরমাণুর ওজন যাহা। অর্থাৎ এই বিভিন্ন পদার্থ 'ট' 'ঠ' 'ড' 'ঢ' ইত্যাদির ওজন এক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার ওজনে বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যদি পরমাণুবাদ সত্য বলিয়া ধরা যায়, তবে এই রকম একটা নিয়ম দেখা

যাইবে। পরীক্ষা দ্বারা এই নিয়মের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং এই পরমাণুবাদ সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

পরমাণু বিভক্ত হয় নাই বটে, কিন্তু পরমাণু একেবারে অবিভাজ্য,একথা বলিতে পারা যায় না। বিভাজ্যতা এই ধর্ম্মটা পরমাণুতেও আরোপ করা যায় কিনা, তাহা এখন পর্য্যন্ত ঠিক হয় নাই।*

এই পরমাণুবাদ স্বীকার করিলেই পরমাণু সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। পরমাণুগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদের আয়তন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা কি? তাহাদের পরস্পরের ভিতর মোটামুটি দূরত্ব কিরূপ? একঘন ইঞ্চি জায়গার ভিতর তাহাদের কতগুলি থাকে? পরমাণু গুলি কিরূপ অবস্থায় আছে?—ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, না একস্থানেই স্থির হইয়া আছে? না,একস্থানে থাকিয়াই হেলিতেছে, দুলিতেছে? না হেলিয়া, দুলিয়া, ঘুরিয়া, ফিরিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে? পরমাণুগুলি মোটের উপর ব্যাপারখানা কিরূপ? তাহাদের উৎপত্তি কোথা হইতে? না, তাহারা কখনও উৎপন্ন হয় নাই, চিরকাল হইতে তাহারা একই মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে? তাহাদের কি বিনাশ আছে? একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্তি কল্পনায় আসে না। তবে নষ্ট হইলে তাহারা কি অবস্থায় পরিণত হইবে? তাহাদের দশাটা কেমন হইবে? অথবা তাহাদের কখনও বিনাশ হইবে না, সময়ের অন্ত পর্য্যন্ত একই মূর্ত্তিতে তাহারা বিরাজ করিতে থাকিবে; এই সকল প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হয়। এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইলে অবশ্য আমাদের অন্ততঃ কতকটা জ্ঞানলাভ হইল, একথা বলা যাইতে পারে। দেখা যাউক, পণ্ডিতগণ কতদূর এই সমস্ত উত্তর দিতে পারিয়াছেন।

প্রথম, পরমাণুর আয়তন সম্বন্ধে :—

একটা ত্রিকোণ কাঁচ বা ঝাড়ের কলমের ভিতর দিয়া সূর্য্যের সাদা আলোক চলিয়া আসিলে উহা রঙ্গীন হইয়া পড়ে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সূর্য্য হইতে যে সাদা আলোক আইসে,ইহা বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। বৈজ্ঞানিকগণের মতে, চোখের বাহিরে আলোক আর কিছুই নহে,আকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি ঢেউ মাত্র। এই ঢেউগুলি অতি ক্ষুদ্র, এক ইঞ্চির ৪০ হাজার, ৫০ হাজার ভাগের একভাগ হইবে। এই ঢেউগুলি আসিয়া যখন আমাদের চোখে ধাক্কা দেয়, তখনই আমাদের আলোক-জ্ঞান হয়। ঢেউগুলি বিভিন্ন আকারের ছোট, বড়, মাঝারি ইত্যাদি। একটা নির্দ্দিষ্ট আকারের ঢেউ চোখে যে ধাক্কা দেয়,তাহাতে একটা নির্দ্দিষ্ট বর্ণের জ্ঞান হয়। এই অতি ক্ষুদ্র ঢেউগুলির মধ্যে যে আয়তনের একটু পার্থক্য, তাহা হইতেই বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি। সূর্য্যের আলোকে এই রকম অসংখ্য

---

* কিছুদিন পূর্ব্বে ক্রুক্‌স্‌, রণ্টজেন, টম্‌সন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ, কাঁচের পাত্র হইতে বায়ু নিষ্কাসিত করিয়া এবং উহার ভিতর তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ কাঁচের পাত্র হইতে এক প্রকার নূতন রকমের আলোক বহির্গত হয়, যাহাকে ইংরাজী ভাষায় cathode rays অথবা অবস্থাবিশেষে Rontgen rays বলে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তড়িৎ-ধর্ম্মাক্রান্ত, অত্যন্ত বেগবান্ অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জড়বিন্দুর গতি হইতেই ঐ আলোকের উৎপত্তি। এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জড়বিন্দু সকল পরমাণু নহে; পরীক্ষাদ্বারা উঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উহারা জড়পরমাণু অপেক্ষা অনেক ছোট, উহাদের প্রায় দেড় হাজারটী একত্র করিলে একটী উদ্‌জান পরমাণুর সমান হইবে।

ঢেউ আছে; ইহাদের সমবেত ধাক্কার ফলে সূর্য্যের আলোক আমাদিগের নিকট শাদা বলিয়া বোধ হয়। বাতাসের ভিতর দিয়া এই ছোট বড় ঢেউগুলি সমান বেগে অগ্রসর হয়। ঝাড়ের কলমের ভিতর সূর্য্যালোক প্রবেশ করিলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোকের বেগ একটু ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। ইহার ফল হয় এই যে, শাদা আলোকের ভিন্ন ভিন্ন রং ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বাঁকিয়া যায়, সুতরাং ফাঁক ফাঁক হইয়া পড়ে। তজ্জন্যই ঝাড়ের কলমের ভিতর দিয়া সূর্য্যালোক চলিয়া আসিবার পরে উহা আর আমরা শাদা দেখিনা, রঙ্গিন দেখি। ঝাড়ের কলমের অণুগুলির ভিতর দিয়া যখন শাদা আলোকের ছোট, বড় নানা আকারের ঢেউগুলি চলিয়া যায়, তখন তাহাদের বেগ বেশী কম হইয়া যায়। যদি আলোকের ঢেউগুলির তুলনায় ঝাড়ের কলমের অণুগুলি নিতান্তই ক্ষুদ্র হইত, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারিত না। এইরূপে অণুর আয়তন যদি আলোকের ঢেউয়ের আয়তনের ১০,০০০ ভাগের এক ভাগ ধরা যায়, তাহা হইলে একটা অণুর আয়তন হইল, এক ইঞ্চির ৪০ কোটি ভাগের এক ভাগ। অণুর আয়তন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাইবার জন্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে উহার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অধ্যাপক ম্যাক্স্‌ওয়েল্ বলিয়াছেন "এমন একটা জিনিষ ও,যার ছোট আর সহজ চক্ষে দেখা যায় না; অতটুকু জায়গার মধ্যে অম্লজান নামক বায়বীয় পদার্থেরও অন্ততঃ ৬০কোটি পরমাণু আছে।" ক্লিফোর্ড সাহেব বলিয়াছেন, "এখনকার খুব উন্নত ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একটা জিনিষকে ৬ হাজার হইতে ৮ হাজার গুণ বড় দেখায়; এরূপ অণুবীক্ষণ যন্ত্রও পদার্থের অণুগুলিকে দৃষ্টিগোচর করাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। যদি এইরূপ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা ফের আবার অতগুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারিত, তবে উহা জলের অণুগুলিকে দেখাইলেও দেখাইতে পারিত।" লর্ড কেল্‌ভিন্ বলিয়াছেন, "একটা ফুটবল যত বড়, ততবড় একটা জলের গোলক মনে কর। এখন এই জলের গোলকটা ফুলিতে ফুলিতে যদি ফুলিয়া আমাদের পৃথিবীর মতন এতবড়টা হইতে পারিত, তাহা হইলে জলের অণুগুলি দেখা যাইত। কত বড় দেখা যাইত? না,বন্দুকের গুলি অপেক্ষা কিছু বড় বড় এবং কামানের গোলার অপেক্ষা কিছু ছোট ছোট।"

তারপর প্রশ্ন—পদার্থের অণুগুলি কি স্থির হইয়া আছে, না তাহারা গতিবিশিষ্ট? এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মত এই যে, কোন পদার্থেরই অণুগুলি একেবারে নিশ্চল নহে। কতকগুলি পদার্থের অণুগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এক রকম নাই বলিলেই চলে এবং ইহারা অবিরত বেগে ছুটাছুটি করিতেছে—ইহারা বায়বীয় পদার্থ। এইরূপ ছুটাছুটি করিয়া ইহারা আধার পাত্রের চারিদিকে ধাক্কা দিতেছে; ইহা হইতেই বায়বীয় পদার্থের চাপ। উদ্‌জান্ বাষ্পের অণুর বেগ সেকেণ্ডে এক মাইলের বেশী। তরল পদার্থের অণুগুলিও ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, কিন্তু ইহাদের পরস্পরের ভিতর অল্প বিস্তর আকর্ষণ আছে। কঠিন পদার্থের অণুগুলি একস্থানে থাকিয়াই স্পন্দিত হইতেছে—তরল অথবা বায়বীয় পদার্থের অণুগুলির ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় না। তাই, একটা বালিপূর্ণ টবের গায়ে ছিদ্র করিয়া

দিলে বালি বাহির হইয়া যায় না, কিন্তু একটা জলপূর্ণ পাত্রের গায়ে ছিদ্র করিলে জল সবেগে বহির্গত হইয়া যায়।

তারপর জিজ্ঞাস্য এই—পরমাণুর কি বিনাশ আছে? পরমাণুর বিনাশ আছে কিনা, জিজ্ঞাস করাও যা, জড় পদার্থের বিনাশ আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করাও তাহাই; কারণ কতকগুলি পরমাণু লইয়াইত এক একটা জড় পদার্থ। পরমাণুর যদি ধ্বংস না থাকে, তবে জড়েরও নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে ল্যাবোয়াসিয়ে প্রমাণিত করিয়াছেন, জড়ের ধ্বংস নাই। পরে,জড়ের ন্যায় শক্তিও অবিনশ্বর, এই কথা পণ্ডিতগণ জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু, "না সতো বিদ্যতে ভাবো, না ভাবো-বিদ্যতে সতঃ" এই কথাটা বহুপূর্ব্ব হইতেই আমাদের শাস্ত্রে উক্ত আছে। যাহা একেবারে ধ্বংস হইতে পারে, তাহার প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বই নাই,আর যাহার প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব আছে, তাহা একেবারে ধ্বংস হইতে পারেনা, সে যেরূপ পদার্থই হউক না কেন, জড়েই হোক আর অজড়ই হোক। মোটের উপর 'কিছুনা'হইতে 'কিছু' উৎপন্ন হইতে পারেনা আর 'কিছু' কিছুনা'তে পরিণতও হইতে পারেনা। কিন্তু জড়ের রূপান্তরগ্রহণ সম্ভব কি? শক্তি অবিনশ্বর,কিন্তু শক্তি বহুরূপী,ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইতে পারে। এই যে, যে শক্তি ব্যয় করিয়া আমি সবলে টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিলাম,সে শক্তি একেবারে ধ্বংস হইলনা। আঘাত করাতে একটা শব্দ উৎপন্ন হইল, কতকটা তাপ উৎপন্ন হইল,ইহা আমারই শারীরিক শক্তির নূতন মূর্ত্তিতে বিকাশ মাত্র। আর আমি যে এত শক্তি-সম্পন্ন,আমার এ শক্তি আসিল কোথা হইতে? মহাবীর হইয়াই কি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম? না, আমরা আহার করি বলিয়াই এত শক্তি সম্পন্ন হইতে পারিয়াছি। খাদ্য জন্মায় কে? সূর্য্যদেব, তাহার তাপ ও আলোক দানে। সূর্য্যদেব ক্রমাগত এত তাপ ও আলোক দিতেছেন কি করিয়া? না, তিনি ক্রমাগত স্বীয় দেহ সঙ্কুচিত করিতেছেন; ইত্যাদি। শক্তি সম্বন্ধে একথা বুঝা গেল। তাপ নষ্ট করিয়া আমরা আলোক পাইতে পারি, আবার আলোকের শক্তি হইতে তাপ পাইতে পারি। হাতে হাতে ঘষিয়া তাপ উৎপন্ন করিতে পারি, আবার তাপের সাহায্যে ইঞ্জিন চালাইতে পারি। কিন্তু জড় সম্বন্ধে কি একথা খাটে? একটা জড় কি অন্যটায় পরিণত হওয়া সম্ভব? লৌহ কি তাম্রে পরিণত হওয়া সম্ভব! তাম্র কি স্বর্ণে পরিণত হওয়া সম্ভব? সম্ভব হইতে আপত্তি কি? * লৌহ স্বর্ণে পরিণত হইলে জড়ের রূপান্তর হইল মাত্র, একেবারে ধ্বংস ত হইল না। যদি এইরূপ হওয়া অসম্ভব হয়, তবে কেন অসম্ভব? লৌহের একটী পরমাণু যেমন, লৌহের আর একটী পরামাণুও তেমন। কিন্তু লৌহের পরমাণু ও স্বর্ণের পরমাণু এক রকম নয়। কতকগুলিতে সামঞ্জস্য ও কতকগুলিতে পার্থক্য দেখা যায় কেন? চির দিন হইতেই কি কতকগুলি এক রকম আর অপরগুলি অন্য অন্য রকম হইয়া আছে? কতকগুলি দেখিতেছি ঘট,কতকগুলি দেখিতেছি কলসী, কতকগুলি দেখিতেছি হাঁড়ী। যদি চির-দিন হইতে একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে,

* কিছু দিন হইল কুরী সাহেব ও তাঁহার পত্নী রেডিয়ম নামক একটী ধাতুর আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ রেডিয়ম্ ধাতুকে হিলিয়ম্ নামক অপর একটা ধাতুতে পরিণত হইতে দেখা গিয়াছে।

তবে সকলগুলিই ঘট, অথবা সকলগুলিই কলসী হইল না কেন? তবে কি একমাত্র মৃত্তিকা হইতেই এই ভিন্ন ভিন্ন পাত্রের উদ্ভব হইয়াছে? দেখা যাউক, এসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের কি মত—তাঁহাদের মতে পরমাণু জিনিষটা কি!

ডেমোক্রাইটাস্ বহুপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, পরমাণু জিনিষটা খুব শক্ত, তবে পরমাণুগুলির ভিতর ফাঁক ফাঁক আছে—তাই জল, বায়ু আর আমাদের নিকট শক্ত নয়। নিউটনের ধারণাও কতকটা ঐরূপ ছিল। শব্দ, বায়ুর ভিতর দিয়া কতবেগে অগ্রসর হয়, এইটা হিসাব করিতে যাইয়া তিনি দেখিলেন যে, শব্দের প্রকৃত বেগ যাহা, তাঁহার হিসাবের বেগ তাহাপেক্ষা কম হইয়া দাঁড়ায়। পরমাণুগুলি কঠিন, এই মত ধরিয়া তিনি উপরোক্ত পার্থক্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অণুগুলি শক্ত, উহাদের ভিতর দিয়া শব্দ যাইতে সময়েরই আবশ্যক হয় না; কাজেই শব্দের প্রকৃত বেগ তাঁহার হিসাবের বেগ হইতে বেশী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নিউটনের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। উপরোক্ত পার্থক্যের প্রকৃত কারণ লাপ্লাস্ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, পরমাণু একেবারে শক্তি হইতে পারে না। পরমাণুর অভ্যন্তরেও একরকম স্পন্দন চলিতেছে। বিভিন্ন গ্যাসের অণুগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় স্পন্দন হইয়া থাকে। তাই ভিন্ন ভিন্ন গ্যাস জ্বালাইয়া ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের আলোক পাওয়া যায়। লবন পোড়াইলে হলদে আলো পাওয়া যায় ইত্যাদি।

র‍্যাঙ্কিণ বলেন যে, মধ্যস্থ একটা বিন্দুর চারিদিকে একরকম স্থিতিস্থাপক বায়বীয় পদার্থ ঘিরিয়া আছে, ইহাই পরমাণু।

বস্কোভিচ্ জড়পরমাণুকে একেবারে উড়াইয়াই দিতে চাহেন। তিনি বলেন; পরমাণু আর কিছুই নয়, কেবল কতকগুলি বিন্দু মাত্র; এই বিন্দুগুলি জড় নহে। উহারা আকর্ষণ, বিকর্ষণ বলের কেন্দ্র মাত্র।

কিন্তু পরমাণু কি, এ সম্বন্ধে লর্ড কেল্‌বিন যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অন্যান্য মত অপেক্ষা আমাদের মনে বেশী লাগে। তাহা কতকটা এইরূপে বুঝান যাইতে পারে:—"সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া ঈথর অথবা আকাশ নামক পদার্থ বিদ্যমান; এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। শুধু কল্পনা নহে—এই ঘটিটা, বাটিটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যতদূর নিঃসন্দিগ্ধ, এই ঈথর অথবা আকাশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঠিক ততদূর অথবা তাহাপেক্ষা বেশী নিঃসন্দিগ্ধ। সমগ্র জগৎ জুড়িয়া এই আকাশ বিদ্যমান। আলোক, এই আকাশের একরকম ঢেউ মাত্র; তাপও এই আকাশেরই অপেক্ষাকৃত বড় বড় ঢেউ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাড়িৎ কি? না, এই আকাশেরই ক্রিয়াবিশেষ মাত্র, চুম্বক শক্তি এই আকাশেরই একপ্রকার ঘূর্ণী। এই সমস্ত বৃহৎকাণ্ডের মূলে এই এক আকাশ, পণ্ডিতগণ ক্রমে এই তথ্যে উপনীত হইয়াছে। আমরা যাহা জড়পদার্থ বলি, তাহার মূলেও এই এক আকাশই বর্ত্তমান, এরূপ বিবেচনা কেমন? কেল্‌বিনের মতে, জড়পরমাণু এই আকাশেরই আবর্ত্ত বিশেষ মাত্র। তবে জড় ও আকাশ একই পদার্থ? সে কেমন কথা? আমরা যে বলটা লইয়া খেলা করি, ছুড়িয়া ফেলি, একজনের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া, রক্ত পর্য্যন্ত বাহির করি, সেই বলটা আর আকাশটা কেমন করিয়া একরকমের পদার্থ হইল?

আকাশটা আছে না আছে, তাহাত আমরা অনুভবই করিতে পারি না। ইহার উত্তর এই যে, ঈথর অথবা আকাশ আমরা অনুভব করিব কি করিয়া? আমরা অনন্ত ঈথর সাগরে নিমজ্জিত। এ সাগরের পৃষ্ঠ নাই, তল নাই, উপর নাই, নীচ নাই। ডুবিতে ডুবিতে সাগর-নিম্নস্থিত মৃত্তিকাতেও পৌছিতে পারিব না, ভাসিতে ভাসিতে এই সাগর ছাড়িয়া বায়ুতেও উঠিতে পারিব না। কিন্তু, উপর নীচ না দেখিলে কি সাগরের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না? সমুদ্রের ভিতর মাছ থাকে, হাঙ্গর কুম্ভীর থাকে। এই সকল জন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠে ভাসিয়া উঠিয়া চক্ষু বিস্তার করিয়া সমুদ্রজলে নিরীক্ষণ না করিলে কি ইহারা বুঝিতে পারে না, জল আছে কিনা আছে? পারে বটে। ইহারা যখন সবেগে অগ্রসর হয়, সম্মুখের জলটা বাধা দেয়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের বিষয়, আকাশটা সে রকম কোন বাধাই দেয় না। আকাশের ভিতর ঘর্ষণের মত কোন ব্যাপার সংঘটিত হইবার যো নাই। এই আকাশের অস্তিত্ব আমরা অনুভবই করিতে পারি না। তবে আমরা কি অনুভব করিতে পারি? অনুভব করিতে পারি, ইহাতে যে আবর্ত্ত ওঠে, ইহাতে যে ঘূর্ণী উপস্থিত হয়। এই আবর্ত্তই আমাদের নিকট 'কিছু' বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তৎভিন্ন আর সকলেই আমাদের নিকট 'কিছুনা' বলিয়া বোধ হইবে। জড় পরমাণু এই রকম এক একটা আবর্ত্তবিশেষ। ঘর্ষণবিহীন ঈথরে আমরা ইচ্ছা করিলে আবর্ত্ত উৎপন্ন করিতে পারি না; আবর্ত্তগুলি আমাদের ইচ্ছানুসারে ভাঙ্গিয়াও ফেলিতে পারি না। তাই, জড় সৃষ্টি করা অথবা ধ্বংস করা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে নহে। তবে এই আবর্ত্তগুলি উৎপন্ন হইল কি করিয়া?

সে কথা এখন পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারেন না; জ্ঞানের সীমানা এইখানে।

আর এক কথা, ঈথর অথবা আকাশ নিতান্ত mobile; ইহার যে আবর্ত্তগুলি, তাহারা এত কঠিন হইল কি করিয়া? হাঁ, তাহা হইতে পারে। বায়ু কঠিন নয়, কিন্তু ঘূর্ণিবায়ুতে কাঠিন্যের বিশেষ আভাষ পাওয়া যায়। ইঞ্জিন হইতে যে বাস্পের এক একটা গোলাকার পদার্থ 'ঘুপ' করিয়া বাহির হয়, তাহা আকৃতিবিশিষ্ট এক একটা কঠিন পদা-পদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। একটা রবারের ব্যাগের ভিতর জল পূরিয়া, সবেগে ঘুরাইয়া দিলে এই জলটা কঠিন পদার্থের মত যেন হয়। অধ্যাপক টেট্ সাহেব একটা এক মুখ খোলা বাক্সের খোলামুখে একখানা পরদা লাগাইয়া ও বাক্সের অপর দিকে একটা ছিদ্র করিয়া দেখাইয়াছেন, যখনই পরদায় আঘাত করা যায়, তখনই ছিদ্রের ভিতর দিয়া বায়ুর অঙ্গুরীয়ের ন্যায় একটা গোলাকার পদার্থ সবেগে বহির্গত হইয়া আইসে। কিন্তু ঈথর ঘর্ষণবিহীন, বায়ুত সেরূপ নয়, কাজেই আকাশের আবর্ত্ত যে জড়পরমাণু, তাহা চিরকাল রহিয়া গেল, কিন্তু বায়ুর আবর্ত্ত সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়।

এই ব্যাপার দেখিতে অতি সুন্দর, টেট্ সাহেব দেখাইয়াছেন, লর্ড কেলবিন্ দেখিতেছেন এবং দেখিতে দেখিতেই তিনি তাঁহার পরমাণুতত্ত্বের ভিত্তি সংস্থাপিত করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার প্রত্যেকেই দেখিতে ও দেখাইতে পারেন। একটা বিস্কুটের বাক্সের খোলামুখে একখানা পুরুকাগজ আঁটিয়া বাঁধিয়া অপরদিকের

টিনের ঠিক মধ্যখানে পয়সার মতন একটা গোলাকৃতি ছিদ্র করুন। বায়ুর অঙ্গুরীয়ক গুলি চোখে দেখা যাইতে পারে, তজ্জন্য কিছু ন্যাকড়া পোড়াইয়া বাক্সের ভিতর রাখিয়া উহা ধূমপূর্ণ করুন। এখন, কাগজের উপর অঙ্গুলীদ্বারা আস্তে আস্তে আঘাত করিলে অঙ্গুরীয়াকৃতি এক একটা গোলাকার পদার্থ বাহির হইয়া অসংখ্য গোলাকার পদার্থে গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিবে। ১০ হাত তফাৎ হইতে প্রদীপের দিকে একটা বায়ুর অঙ্গুরীয়ক ছাড়িয়া দিলে প্রদীপ ধপ্ করিয়া নিভিয়া যাইবে, যেন কোন কঠিন পদার্থ আসিয়া প্রদীপের উপর পড়িল।

এই গেল আধুনিক পণ্ডিতগণের জড় পরমাণুতত্ত্ব। এখন একটা কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। একমাত্র পদার্থ হইতেই যে এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, পণ্ডিতগণ ক্রমে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। এই একমাত্র পদার্থ সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া বর্ত্তমান। এই একমাত্র পদার্থই সৎপদার্থ, এই একমাত্র পদার্থই বিদ্যমান; ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই, আর কিছু থাকিতেও পারে না। জগৎ ইহা হইতেই অভিব্যক্ত। এই একমাত্র পদার্থকে 'যা' 'তা' মনে না করিয়া ইহাকে একটা উচ্চতর আসন দিলে কেমন হয়? ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিতেছেন "জগতে একমাত্র পদার্থ ঈশ্বরই বর্ত্তমান; জড় ইহারই অভিব্যক্তি, ইহাতেই লিপ্ত।" স্বয়ং ভগবান আমাদিগকে বলিয়াছেন :—

"মত্তঃপরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব।"

ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী। ভগবান্ বলিয়াছেন "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।"

ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন "আকাশের আবর্ত্তগুলি আকাশের ভিতরই এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়ায়, তাহাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।" ভগবান বলিয়াছেন "আকাশস্থিত এই সর্ব্বগ মহানবায়ু যেরূপ সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে, অথচ আকাশের সহিত বায়ুর মিশ্রতা সম্পাদক কোন সম্বন্ধ নাই, সেইরূপই এতৎসমস্ত বিশ্ব আমাতে অবস্থিতি করিতেছে; অথচ আমার সহিত ইহার মিশ্রতা নাই।

"যথা কালস্থিতো নিত্যং বায়ুঃসর্ব্বত্রগো মহান্
তথা সর্ব্বানি ভূতানি মৎসংস্থানীত্যুপধারয়।"

ভগবান বলিয়াছেন, তাঁহা হইতেই এই জগতের উৎপত্তি, তিনিই এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। কিরূপে ধারণ করিয়া আছেন?—"ভূতভৃন্নচ ভূতস্থোমমাত্মা ভূতভাবনঃ।"

জড়জগতের উৎপত্তি আকাশ হইতে; যদি লয় হয়, তবে আকাশেই লয় হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।"
"অহং কৃৎস্নস্যজগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।"

প্রলয়ের কথা ভাবিয়া আমরা একান্ত অধীর হইয়া পড়ি। ভগবান আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন। কল্পক্ষয়ে ধ্বংস হইবে, কল্পারম্ভে আবার সৃষ্টি হইবে।

"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয়! প্রকৃতিং যান্তিমামিকাং
কল্পক্ষয়ে, পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং।"
"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ
ভূতগ্রাম মিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।"

তিনি আরও বলিয়াছেন, মূঢ়ব্যক্তিগণই তাঁহার বিশ্বরূপ কল্পনা করিতে পারে না, তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট মনে করিয়া অবজ্ঞা করে।

"অবজানন্তি মাংমূঢ়া মানুষীংতনুমাশ্রিতং
পরংভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং।"

ইউরোপীয় পণ্ডিত এক আকাশেই অনন্ত মূর্ত্তির বিকাশ দেখিতে পাইয়াছেন। শত শত গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্যাদি একমাত্র আকাশেরই অনন্তমূর্ত্তি। বহুপূর্ব্বে ভগবান আপনার অনন্তরূপ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন। অর্জ্জুন, ভগবানের সেই অনন্তরূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন সেই একমাত্র, আদি, অন্ত, মধ্যহীন ভগবানে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইয়া বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"অনেক বাহূদর বক্ত্র নেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতেহনন্তরূপং
নান্তং নমধ্যং নপুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ!"
"অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্য
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্য নেত্রং
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশ বক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং।"

বিস্মিত নেত্রে সেই অনন্তমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে অর্জ্জুন ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব! রূপং
প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস!

"হে অনন্তশক্তিসম্পন্ন! তোমার অনন্ত রূপ দেখিয়া আমি বিস্মিত, ভীত হইয়াছি। তুমি এই অনন্তমূর্ত্তি সম্বরণ করিয়া আমাকে তোমার সেই সৌম্যমূর্ত্তি দেখাও।"

অর্জ্জুন যাহা দেখিয়াছিলেন,যাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, আমরা কল্পনা-নেত্রে, ভীত, বিস্মিত, স্তম্ভিত চিত্তে তাহা দেখিতে দেখিতে তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া, সেই অনন্তসাগরে, চিরতরে, এই ক্ষুদ্র সাগরোর্ম্মি মিলাইতে পারিব কি?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

জীবন-সন্ধ্যায়।

সুনীল-সাগর-কূলে, স্তব্ধ নীলিমায়,
দেবীর নির্ম্মাল্য এক সৌরভ ছড়ায়;
প্রভাত-শোভন-ফুল্ল-নলিনীর দল—
প্রসূনে প্রণব গাঁথা—ভরা পরিমল;
কামিনী মুকুল মঞ্জু, মৃদুল, মেদুর,
আর্ত্তহৃদে ঢালে সুধা সান্ত্বনা মধুর;
প্রীতির প্রফুল্ল ছবি নক্ষত্র-কিরণ,
সোহাগ মিশায়ে রচে স্বপ্ন সম্মোহন!
অনিলে গুঞ্জরে মৃদু বীণার ঝঙ্কার,
কলকণ্ঠে উঠে গীত-মাধুরী-সম্ভার।
ললিতে কোমল মিশে, মধুরে শীতল,
উল্লাসে সাগর-বেলা করে টলমল!
একাকী মুদিত কবি সান্ধ্য নিরালায়,
নেহারে মদির দৃশ্য জীবন-সন্ধ্যায়।

২

আলোক নিবিল ধীরে, স্তব্ধ সমীরণ,
নীরব হইল কণ্ঠ, বীণার নিস্বন।
নিবিড় জলদজাল ঘেরিল অম্বর,
ডুবিল তিমির গর্ভে সৈকত সাগর।
বহিল প্রমত্ত বেগে ক্ষিপ্ত প্রভঞ্জন,
উত্তুঙ্গ-তরঙ্গ-বীথি করে আস্ফালন।

সহসা ভাঙ্গিল স্বপ্ন, কাঁপিল হৃদয়,
আতঙ্কে পূরিল প্রাণ, গর্জ্জিল প্রলয়।
কোথায় সান্ত্বনা প্রীতি, কোথা ফুলবাস?—
সম্মুখে যে ফেণায়িত ভীম অট্টহাস!
উত্তালে করাল মিশে, ক্রূরে ভয়ঙ্কর,
ত্রাসে সাগর-বেলা কাঁপে থরথর!
একাকী স্তম্ভিত কবি নির্জ্জন বেলায়,
নেহারে ভীষণ দৃশ্য জীবন-সন্ধ্যায়।

৩

অবশ শিথিল তনু; স্তব্ধ মন প্রাণ;—
নিমেষে উভয় দৃশ্য হ'ল অন্তর্দ্ধান;
প্রয়াণ করিল মায়া-মোহন ছলনা,
কুহক-স্তিমিত আত্মা লভিল চেতনা।
চারিদিতে হুঙ্কারিত প্রলয়ের ধ্বনি,
ভেসেছে ভাটার টানে জীবন-তরণী।
নয়ন মুদিছে ধীরে; সম্মুখে পাথার,
তরঙ্গ-সঙ্কুল পথ—অনন্ত-বিস্তার।
ফুটিল আঁধারে ক্ষীণ আশার আলোক।
ভাতিল ভবের পারে ভূমানন্দ-লোক।
আলোকে আনন্দ মিশে, উজ্জ্বলে নির্ম্মল,
নেহারে ভবিষ্য দৃশ্য পথিক বিহ্বল।
একাকী প্রবুদ্ধ কবি ভাসিল ভেলায়,
ত্যজি মর্ত্ত্য মায়া-পুরী জীবন-সন্ধ্যায়।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

বাণ ও শোণিতপুর।*

'বীর্য্যবান্' বাণ, 'চারুদর্শনা' ঊষা ও 'কামিনী-মনোমোহন' অনিরুদ্ধ, এই কয়টী চরিত্র অতি প্রাচীন যুগের গৌরব-স্মৃতির উদ্দীপক। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে:—"বাণ মহাত্মা বলিরাজার একশত পুত্রের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাহার সহস্র বাহু। তিনি তাণ্ডব সময়ে বাহুদ্বারা গিরিশের তুষ্টি সাধন করিতেন। ভগবান্ ভক্তবৎসল শরণ্য সর্ব্বভূতেশ্বর তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার পুররক্ষক হইতে যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। এই বাণ বীর্য্যগর্ব্ব সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়া একদা সূর্য্যবর্ণ কিরীট দ্বারা ভগবান গিরিশের পদাম্বুজ স্পর্শ পূর্ব্বক কহিলেন,—"হে মহাদেব! আপনি অপূর্ণকাল ব্যক্তিদিগের কামপূরক ও কল্পতরু; হে লোকগুরো! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আমাকে সহস্র বাহু দিয়াছেন, এই সকল আমার সাতিশয় ভাবের কারণ হয়। আমি আপনা ব্যতীত ত্রিলোকের মধ্যে আমার যোগ্য প্রতিযোদ্ধা দেখিতে পাই না। কণ্ডূতি নিবন্ধন ভারভূত বাহু সকল দ্বারা পর্ব্বত নিকর চূর্ণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দিক্‌হস্তীদিগের নিকট গমন করি, কিন্তু তাহারাও ভয় পাইয়া পলায়ন করে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে এই অমিততেজা বাণের বংশ পরিচয় এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে দান করেন। কশ্যপের ঔরসে দিতি-গর্ভে দৈত্যকুলের উৎপত্তি। আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু যমজ জন্ম গ্রহণ করেন।

হিরণ্যকশিপু
|
পুত্র প্রহ্লাদ
|
তৎপুত্র বিরোচন
|
তৎপুত্র বলি
|
বলির শতপুত্র—জ্যেষ্ঠ বাণ।

* গৌহাটি সাহিত্যানুশীলনী সভার তৃতীয় অধিবেশনে (বৈশাখ, ১৩১৬) পঠিত

যে দুর্দ্ধর্ষ কুলের দমন হেতু ভগবান্ বিষ্ণুকে ক্রমান্বয়ে বরাহ, নৃসিংহ ও বামন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, বীর্য্যবান্ বাণ সেই মহৎ কুলের উপযুক্ত বংশধর। ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যে সুপরিচিত "হরিহরের যুদ্ধ" দৈত্যকুলপতি বাণের দর্প-নাশের জন্যই সংঘটিত হইয়াছিল।

বাণরাজ-কন্যা 'চারুদর্শনা' উষা অনিন্দ্য-সুন্দরী। যৌবন সমাগমে তিনি দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র প্রদ্যুম্ননন্দন অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া তৎপ্রতি অনুরাগিণী হন। বাণরাজার প্রধান অমাত্য কুম্ভাণ্ডের তনয়া চিত্রলেখা উষার সহচরী ছিলেন। উষার মনোগত ভাব জ্ঞাত হইয়া তিনি তাঁহার প্রিয়জনের সহিত মিলন সংঘটনে যত্নবতী হন। উষা 'কামিনী মনোমোহন' অনিরুদ্ধের পরিচয় জ্ঞাত ছিলেন না। এইজন্য চিত্রলেখা দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য,বিদ্যা-ধর, যক্ষ ও মনুষ্যদিগের মধ্যে যত সুপুরুষ ছিলেন, সকলের অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া উষাকে দেখাইতে লাগিলেন। অনিরুদ্ধের চিত্রদর্শন করিয়া রাজপুত্রী লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন "এই তিনি।" অতঃপর মায়াবিনী চিত্রলেখা পর্য্যঙ্কোপরি সুষুপ্ত অনিরুদ্ধকে হরণ করিয়া উষার গৃহে আনয়ন করিলেন। অনি-রুদ্ধ গান্ধর্ব্ব বিধানে উষার পাণিগ্রহণ করিয়া উষার আবাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনিরুদ্ধ কেবল 'কামিনী-মনোমোহন' ছিলেন না। গান্ধর্ব্ব বিবাহের বৃত্তান্ত প্রকা-শিত হইলে পর দৈত্যকুলপতি বাণ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে অনিরুদ্ধকে ধৃত করিতে আগ-মন করিলেন। "সেই সমস্ত সৈন্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়-মান হইলে পর যেমন শূকর-যূথ-পতি কুক্কুর-দিগকে সংহার করে, বীর অনিরুদ্ধ, সেইরূপ, তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করি-লেন। হনন কার্য্য আরম্ভ হইলে পর সকলে ভগ্নশিরাঃ, ভগ্নোরু বা ভগ্ন-বাহু হইয়া ভবন হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বলবান্ বলিনন্দন কুপিত হইয়া আপন সৈন্যের সংহারকারী অনিরুদ্ধকে নাগপাশ দ্বারা বন্ধন করিলেন।"

নারদমুখে অনিরুদ্ধের বন্ধন ও যুদ্ধ-বিবরণ পাইয়া কৃষ্ণ-দৈবত বৃষ্ণিগণ বাণরাজ-ধানী শোণিতপুরে যাত্রা করিলেন। বাণ শঙ্করের পরম ভক্ত। তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ রুদ্র—পুত্র ও প্রমথগণ সঙ্গে লইয়া রামকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মহাযুদ্ধে মাহেশ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের সৃষ্টি ও উভয়ের তুমুল সংগ্রাম হইল। মাহেশ্বর জ্বরের পরাভবের পর শ্রীহরি বীর্য্যবান্ বাণের চারিটী ভিন্ন সমস্ত বাহুই ছেদন করিলেন এবং শঙ্করোপদেশে বাণ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন।

এইটী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রস্তাব। এতদ্ব্য-তীত বহু পুরাণ ও উপপুরাণে এই আখ্যা-য়িকাটী পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবদ্গুণ-বর্ণনার অক্ষয় উৎস স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াই যে এই উপাখ্যানটী সুপরি-চিত হইয়াছে, এমন নহে। বীর্য্যবান্ বাণা-সুরের দমন, হরি কর্ত্তৃক হরের পরাজয়, ও শ্রীকৃষ্ণের বংশ বিস্তার, এই কয়টী অনুপেক্ষ-ণীয় কারণের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলারসময় পুরাণেতিহাসে প্রায়ই এই বৃত্তান্ত পরিত্যক্ত হয় নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগ-বতে বাণ,উষা ও অনিরুদ্ধের যেরূপ চরিত্রোৎ-কর্ষ লক্ষিত হয়, অন্যত্র সেরূপ হয় নাই। এই

হেতু আমরা শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই গল্পাংশ আহরণ করিলাম। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই গল্পটী বহুল বিস্তৃত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে হর-পার্ব্বতী ও শ্রীকৃষ্ণের এত অধিক প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে যে, বাণ, উষা ও অনিরুদ্ধ তাঁহাদের হস্তের ক্রীড়নক স্বরূপই প্রতীত হন। শিব ও শিবানীর ক্রীড়া কৌতুক দৃষ্টে উষা লালসাবতী হওয়ায় শিবানী স্বপ্নযোগে উষাকে অনিরুদ্ধ দর্শন করাইতেছেন এবং অনিরুদ্ধের অদর্শনে ব্যথিতা উষা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে পর সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দৈত্যবর বাণ শঙ্করের পদতলে নিপতিত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া রোদন করিতেছেন। তদ্দর্শনে শঙ্কর, শঙ্করী, কার্ত্তিকেয় ও গণেশ্বর হাস্য করিতেছেন! গণনায়ক বাণের প্রবোধার্থ বলিতেছেন :—

স্বপ্নে কৃত্বা স্বয়ং দেবী মত্তং কৃত্বাস্মরাত্মজং।
অধুনা বাম পার্শ্বেচ শম্ভোস্তিষ্ঠতিমূকবৎ॥

অর্থাৎ আমার জননীই স্বপ্নে স্মরাত্মজকে উন্মত্ত করিয়াছেন, আর এখন পিতার বাম-পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, যেন কিছুই জানেন না!! এই পুরাণে উষা ও অনিরুদ্ধের সুদীর্ঘ রূপবর্ণনা সত্বেও তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় 'চারুদর্শনা' ও 'কামিনী মনোমোহন' বলিয়া প্রতীয়মান হন না। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ-রূপেই উল্লিখিত হইয়াছেন। যথা :—

সঙ্কর্ষণোবাসুদেব ইতি ভাগদ্বয়েনহ।
ভাগদ্বয়েন পূর্ণস্য ব্রহ্মণোঽর্দ্ধঃপ্রকথ্যতে॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ কলোভাগদ্বয়েনহ।

কালিকা পুরাণে শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রাধান্য নাই। কিন্তু এই গ্রন্থেও শোণিতপুরাধিপতি বাণের উল্লেখ আছে। তিনি এই পুরাণে রাজধর্ম্মবিৎ, মিত্র ও সদুপদেষ্টারূপে পরি-কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মহাভারতের অঙ্গীভূত হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণবংশপ্রদীপ অনিরুদ্ধের কাহিনীর অনুরোধে যে উষা এবং বাণরাজার ইতিবৃত্তও থাকিবে, ইহা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। ফলতঃ বিভিন্ন পুরাণেতিহাসে বর্ণিত, বিভিন্ন বর্ণে প্রতিফলিত বাণ, উষা ও অনিরুদ্ধের চরিত্র একত্র আলোচনা করিলে এক অতি সুদীর্ঘ ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণগুলির বিবিধ ভাষা গ্রন্থ গুলিতেও বাণ, উষা ও অনিরুদ্ধের প্রাধান্য কম নহে। এমন কি, এই উপাখ্যান অবলম্বনে সুদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ পর্য্যন্ত বিরচিত হইয়াছে।* তন্মধ্যে অতিপূর্ব্বে কামরূপ-নিবাসী পণ্ডিত চন্দ্রভারতি কৃত 'কুমর হরণ' ও আধুনিক কালে শ্রীহট্ট-নিবাসী কবিবর রামকুমার নন্দী প্রণীত 'উষোদ্বাহকাব্য' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বা পুরাণ-কথিত স্বল্প সংখ্যক উপাখ্যানই স্বতন্ত্র কাব্যাকারে পরিকীর্ত্তিত হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমেও এই বৃত্তান্তটী সাহিত্যে অন্যত্র বহুল উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে' এই দুইটী পদ দেখিতে পাওয়া যায় :—

"এইরূপে অনিরুদ্ধ উষা হরেছিল।
তাহারে বাঁধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল॥"

কবিকুলচূড়ামণি মধুসূদন দত্ত—

"দানবনন্দিনী উষা নমে তব পদে
যদুবর!"

এইরূপে, এক উষা পত্রিকা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অমর করস্পর্শে উষা-পত্রিকা সমাপ্ত হইলে উহা যে বীরাঙ্গনাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট স্থানলাভের যোগ্য হইত, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। উষার—

* "বাণ-পরাজয়" গীতাভিনয় দ্বারাও বঙ্গের সর্ব্বত্র বাণ-রাজার কাহিনী সুপরিচিত হইয়াছে।

চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা বহুল বর্ণিত হইয়া ঊষা ও অনিরুদ্ধ-ঘটিত বৃত্তান্তটী নানা রসের আধারস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ভাষার অভ্যন্তর দিয়া বিভিন্ন কালের রুচি, রীতি, নীতি, সভ্যতা ও সামাজিক প্রথাদির নির্দ্দেশ করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা এই প্রসঙ্গটী অবলম্বন করিলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পুঞ্জীকৃত উপাদান প্রাপ্ত হইবেন। পূর্ব্বকালে মন্ত্র তন্ত্র ও অমানুষী মায়ার জন্য কামরূপভূমি প্রসিদ্ধ ছিল। চিত্রলেখা কর্ত্তৃক মায়াবলে অনিরুদ্ধ হরণ বর্ণনার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া কামরূপ-নিবাসী চন্দ্রভারতি মায়াবিনী চিত্রলেখার নানা অদ্ভুত রূপ ধারণ বর্ণন করিয়াছেন। ভাদ্রমাসে, অর্দ্ধনিশীথে, চন্দ্রগ্রহণকালে আকাশে উড্ডীয়মান খঞ্জরীট পক্ষী একটী বাঁটিয়া তদ্দ্বারা বটিকা প্রস্তুতকরতঃ কপালে ফোঁটা দিয়া চিত্রলেখা কৃষ্ণ ভ্রমরী দেহ ধারণ করিয়াছিল ও দুর্গম দ্বারকায় প্রবেশ পূর্ব্বক পূর্ব্ব প্রস্তুত উপাদানে অনিরুদ্ধের কপালে একটী ফোঁটা দিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণভ্রমরে পরিণত করিয়াছিল। ভ্রমরী ভ্রমরকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া ঊষার গৃহে লইয়া আসিয়াছিল। ইহারই নাম "হরণলুকী" মায়া। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ভাষা-গ্রন্থপ্রণেতা কামরূপ-নিবাসী পণ্ডিত অনন্ত কন্দলিও এই 'হরণলুকী' মায়ার বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য ভাষাগ্রন্থে কোথাও এই বিষয়ের উল্লেখ নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ভাষা গ্রন্থ-রচয়িতা কালীকিশোর বিদ্যাভূষণ সম্ভবতঃ শাক্ত ছিলেন। তিনি হরি কর্ত্তৃক হরের পরাজয় নীরবে সহ্য করেন নাই। যাদবসৈন্য সহ শ্রীহরি যখন বিরূপাক্ষ-রক্ষিত বাণাসুরকে আক্রমণ করিলেন, তখন কবি অনিরুদ্ধের মুখে ভগবতীর এক সুদীর্ঘ স্তব নির্গত করাইয়া তাঁহার সহায়তায় ডাকিনী যোগিনীসহ মহাশক্তিকে প্রেরণ করিয়া দিলেন। অনিরুদ্ধের বিজয়লাভে হরিহরের উপর মহাশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল! দুঃখের বিষয়, ভাষা গ্রন্থগুলিতে ঊষার গৃহে অনিরুদ্ধের পঞ্চাশ ব্যঞ্জনসহ অন্ন ভোজন —অপহৃত অনিরুদ্ধের জন্য, পুত্রশোকাতুরা বঙ্গরমণীকুলের ন্যায়, যাদববধূদিগের বিলাপ—স্বপ্নান্তে অনিরুদ্ধের অদর্শনে ঊষার বিরহিনী কামিনীর ন্যায় খেদোক্তি প্রভৃতির অবতারণায় যেরূপ কাব্যরসের উপভোগ হয়, শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত বাণ, ঊষা ও অনিরুদ্ধ চরিত্রের মুণ্ডপাত দর্শন করিয়া তেমনি মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হয়। যে বীর্য্যবান বাণ ত্রিভুবনে তাঁহার প্রতিযোদ্ধা দেখিতে না পাইয়া—সূর্য্যবর্ণ কিরীটের দ্বারা গিরিশের পদাম্বুজ স্পর্শ পূর্ব্বক আসুরস্বভাবের পূর্ণতাহেতু তাঁহাকেই যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিল—হীনবীর্য্য বাঙ্গালী কালীকিশোরের হাতে পড়িয়া সেই তেজোগর্ব্বিত অসুরপ্রধান বাণ, স্বকুলের অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে কৈলাস শিখরাভিমুখে ধাবমান! যে ঊষা অনিরুদ্ধকে

বিবাহিতা যজ্ঞপত্নী সা চ পুণ্যবতীসতী।
নিশ্চলা সততং সাধ্বী রঙ্গিনী সঙ্গিনী সদা॥

বলিয়া বিবাহার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন; এবং যে অনিরুদ্ধ স্বপ্নযোগে চারুদর্শনা ঊষার প্রেমার্থিনী-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াও—

অহং কৃষ্ণস্য পৌত্রশ্চ কামদেবাত্মজঃ স্বয়ং।
কথং গৃহ্নামি তাং কান্তে তয়োরনুমতিং বিনা॥

বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, পণ্ডিত চন্দ্র ভারতির হস্তে পড়িয়া তাঁহারা এরূপ কামাতুর

ও কামাতুরায় স্থায় চিত্রিত হইয়াছেন যে, তাহার উল্লেখ করিতেও লজ্জাবোধ হয়। কবিবর রামকুমার নন্দীর 'উষোদ্বাহ কাব্য' আধুনিক রুচিসম্মত। কিন্তু তাঁহার উষা, শিক্ষিতা সুকন্যা, সুভার্য্যা পদবাচ্যা হইলেও তাঁহাকে ব্রতচারিণী, পার্ব্বতী-পূজানিরতা ও পরম নিষ্ঠাবতী হিন্দুকুমারীর ন্যায় না দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষোভ থাকিয়া যায়। আর মনে হয়, তাঁহার উষা সেই কালের সেই উষা নহে। এই সম্বন্ধে মহারাষ্ট্র-দেশ-প্রচলিত বথরে (গ্রাম্য কবিতায়) উষার চরিত্রোৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে। নিষ্ঠাবতী স্বধর্ম্ম-নিরতা রাজ্ঞী অহল্যাবাই বাণরাজনন্দিনী উষার ন্যায় ধর্ম্মশীলা বলিয়া একটী বথরে বর্ণিত হইয়াছেন। প্রাচীন কালে লিখিত উষার বৃত্তান্ত সমষ্টি হইতে উষা ইষ্টদেবী পার্ব্বতীর পূজন-শীলা কুমারী, প্রেমিকা যুবতী, সাধ্বী ভার্য্যা ও পতিকুল এবং পিতৃকুল, এই উভয়েরই উজ্জ্বল-কারিণী বলিয়া প্রতীতা হন। চিত্র-দর্শন দ্বারা উষার পতি নির্ব্বাচন সমগ্র পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে একটী অতুলনীয় ঘটনা। উষা একবার মাত্র ভাবী পতির দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই কামিনী-মনোমোহনরূপ চকিতের ন্যায় একবার মাত্র দেখিয়াই তাহার সুগভীর প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় প্রথিত হইয়া গিয়াছিল যে, সহস্র সুপুরুষ দেখিয়াও তাঁহার অণুমাত্র চিত্ত-বিকার জন্মে নাই। ইহা কি সতীর চূড়ান্ত লক্ষণ নহে? মহর্ষি বেদব্যাস, মহাভারতের প্রধান নায়িকা পঞ্চ পাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদী ও একদা মনে মনে কর্ণের প্রতি অভিলাষিণী হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উষার চরিত্রে সতী রমণীর যে আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে, বিষম পরীক্ষাক্ষেত্রেও তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল। এই বিশেষত্বটী সামান্য নহে।

অধুনা জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর জ্ঞানবিস্তার হেতু ভারতের পূর্ব্ব গৌরব কথার সমধিক আলোচনা হইতেছে। পুরাণেতিহাসে উল্লিখিত স্থানের নির্দ্দেশ ও ব্যক্তি-দিগের আবির্ভাব কাল প্রভৃতির নিরূপণ দ্বারা পূর্ব্ব ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টা হইতেছে। বাণরাজা এবং তাঁহার রাজধানী শোণিতপুর সম্বন্ধেও নানা আন্দোলন আলোচনা হইয়াছে।

আমরা নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক বিবরণীতে উষা ও অনিরুদ্ধ এবং বাণরাজধানী শোণিতপুরের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি।

১। সার উইলিয়ম হন্টর সংকলিত দরঙ্গ জিলার বিবরণী। ২। শ্রীযুক্ত বি, সি, এলেন আই-সি-এস্ মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়র। ৩। শ্রীযুক্ত ই, এ গেইট সি-আই-ই মহোদয় লিখিত আসামের ইতিহাস। এতদ্ব্যতীত এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণাল, ইণ্ডিয়ান রিভিউ প্রভৃতি পত্রে এতৎ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়াছে। কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম্-এ মহোদয় "Notes on the archeo logical remains of Tezpur" শীর্ষক যে সুলিখিত প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়া আসামের বিভিন্ন স্থানে প্রক্ষিপ্ত নানা কীর্ত্তিচিহ্নগুলি একত্র সংরক্ষণের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতেও এই বিষয়ের সমুচিত উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত যতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতীত হয় যে, বর্ত্তমান তেজপুরই বাণাসুর-শাসিত শোণিতপুর।

এই সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি সংগ্রহ করা যায়।

১। তেজপুরের যে স্থানে বর্ত্তমান কাছারী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে,—প্রবাদ ঐ স্থানেই উষার আবাসগৃহ ছিল।

২। তেজপুর হইতে প্রায় ৩॥ মাইল দূরবর্ত্তী দেউরী গ্রামের সন্নিকটে পরস্পর সংলগ্ন সাতটী পুষ্করিণীর চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; প্রবাদ, উষার স্নানার্থ ঐগুলি খোদিত হইয়াছিল।

৩। তেজপুর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী ঔ-গুড়ি নামক একটী পাহাড়ের শৃঙ্গে উষার তাঁতশালা ছিল, প্রবাদ অধুনা তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত আছে।

৪। তেজপুর হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে কশিপু নাম্নী একটী ক্ষুদ্র নদী আছে। কখন কখন তীর্থ-যাত্রিগণ উহার পঙ্কিল জলে স্নানার্থ আগমন করেন, প্রবাদ বাণরাজার বাহু ছেদিত হইলে পর রক্তস্রোত-প্রবাহে এই নদীর সৃষ্টি হইয়াছিল।

৫। তেজপুর হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী বরালীমারা গ্রামের সন্নিহিত একটী বৃহৎ অন্ধ পুষ্করিণী বাণরাজ মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের নামে পরিচিত।

৬। তেজপুর হইতে অনতিদূরে পর্ব্বতীয়া গ্রামের সন্নিহিত একটী বৃহৎ মাঠ বাণযুদ্ধের স্থল বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়।

৭। তেজপুর হইতে ১২০ মাইল দূরবর্ত্তী ভালুকপাম নামক স্থানে কতকগুলি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বাণরাজার আবাসস্থল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

৮। তেজপুরের উপকণ্ঠস্থ 'মহাভৈরব' নামক শিব উষারই প্রতিষ্ঠিত, কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকে।

৯। তেজপুরের সমীপবর্ত্তী ভৈরবী মন্দির সম্বন্ধেও এরূপ উক্ত হইয়া থাকে।

১০। কথিত আছে বাণ, তেজপুর হইতে ৩॥ মাইল দূরে ভমরাগুরির সন্নিকটে এক কাশী স্থাপনের প্রয়াস করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। কতিপয় শিক্ষিত লোক ব্যতীত অন্যের নিকট এই বিষয় কিছু জানা যায় না।

১১। ভমরাগুরির সন্নিকটে একটী ও ধেনুখনা পাহাড়ে একটী রুদ্রপদচিহ্ন আছে। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৫ মাইল। জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন বাণযুদ্ধে ভগবান রুদ্র এই দুই স্থানে দুই পদ রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

বাস্তবিক তেজপুর বাণরাজা ও তদীয় কন্যা উষা সম্বন্ধীয় প্রবাদে এরূপ পরিপূর্ণ যে, এ সমস্তই অলীক এরূপ মনে করা দুঃসাধ্য। এই সম্বন্ধে একটী গল্প বলা অ-প্রাসঙ্গিক হইবে না। তেজপুর-নিবাসী জনৈক বন্ধু বলেন, তাঁহার কোনও বাঙ্গালী বন্ধু একদা তেজপুর সহরময় হোলা অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রাভিমুখ নিম্নতল বক্রগতি ভূখণ্ড সকল দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করনে, ঐ গুলি কি প্রকারে হইল? বন্ধুবরকে উত্তর দানে অসমর্থ দেখিয়া তাঁহার বাঙ্গালী বন্ধুটী সহাস্যে বলিলেন, এই সামান্য কথাটী আপনি বলিতে পারিলেন না! বাণযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই গরুড়ে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন; যুদ্ধক্রীড়া আরম্ভ হইলে পর, পক্ষিরাজ গরুড় নিশ্চয়ই সুতীক্ষ্ণ নখরদ্বারা ক্ষিতিতল বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করেন, তদ্দ্বারাই এই সকল "হোলার" সৃষ্টি হইয়াছে। উষার আবাস গৃহ, স্নানের পুষ্করিণী এবং তাঁতশালা প্রভৃতি যেরূপ পরস্পর বহু ব্যবধানে প্রদর্শিত হয়, তদ্দ্বারা গরুড়ের নখরোৎপাতে হোলায় সৃষ্টির

ন্যায়, ইহায়াও কোনও কল্পনাপ্রিয় ব্যক্তির দ্বারা উষার নামের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যে, ঐগুলি উষা কর্ত্তৃক নিত্য ব্যবহৃত হইত, এরূপ কথিত হয় না, বরং বিভিন্ন সময়ে ঐগুলি বিভিন্ন কার্য্যোপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এইরূপই জনপ্রবাদ। বাণ-কর্ত্তৃক স্বীয় রাজধানী হইতে বহু দূরে কণ্যার আবাসবাটী নির্ম্মাণ, এইটীও পূর্ব্বকালীন রাজপদ্ধতির বিরোধী নহে।

দিনাজপুরের অন্তর্গত নিতপুরেও বাণ ও তদীয় কন্যা উষা সম্বন্ধে এবম্বিধ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহা অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বপ্রণীত "রাজা সীতারাম রায়" নামক গ্রন্থ মধ্যে লিখিয়াছেন "বিরূপাক্ষ শিবের উপাসক বীর্য্যবান বাণ দিনাজপুরে রাজত্ব করিতেন। তদীয় কুমারী উষা যদুবংশীয় অনিরুদ্ধের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া গোপনে তাঁহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে প্রবল যদুকুলের সহিত বাণের যে যুদ্ধ হয় এবং বিষ্ণু ও শিব-জ্বরের প্রাদুর্ভাবের পর যে সন্ধি হয়, তাহা বাণ ও বঙ্গের পক্ষে অশ্লাঘাজনক নহে।" অথচ এই অংশের টীকাতে তিনি উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন:— "অনেকে বলেন, দিনাজপুরের মধ্যে নিতপুরই —বাণের রাজধানী শোণিতপুর। আসামী ভাষায় তেজ অর্থ শোণিত। তেজপুরই শোণিতপুর। তেজপুরে উষার বাড়ী, বাণের পুকুর প্রভৃতি স্থান আছে। তেজপুরে অট্টালিকায় ভগ্নাবশেষ অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর আছে। দিনাজপুরের নিতপুরেও বিরূপাক্ষ শিব ও তেজপুরেও এক শিবমন্দির আছে। উষার বিবাহের ধরণটাও কিছু আসাম দেশীয়।" ইহাতে অনুমান হয়, আসামের তেজপুর হইতে দিনাজপুরের নিতপুর পর্য্যন্ত বাণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।"

দিনাজপুরের নিতপুরে বাণ ও উষা সম্বন্ধীয় লোকপ্রবাদ কতদূর প্রবল, তাহা আমরা স্বয়ং অনুসন্ধান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হই নাই। ঐতিহাসিক বিবরণীতে এই পর্য্যন্ত যতটুকু লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তদ্দ্বারা বিরূপাক্ষ শিবের অস্তিত্ব ভিন্ন দিনাজপুরের দাবী আর কোনও বিষয়েই সমধিক অগ্রগামী নহে। পুরাণে বাণকর্ত্তৃক 'বিরূপাক্ষ' শিবের পূজার বিষয় উল্লিখিত আছে, 'মহাভৈরব' শিবের অর্চ্চনার উল্লেখ নাই। কিন্তু "মহাভৈরব," "বিরূপাক্ষ" প্রভৃতি শিবের নামান্তর মাত্র, এরূপ মনে করাও অযৌক্তিক নহে। তেজপুর হইতে দিনাজপুর পর্য্যন্ত বাণের রাজ্য বিস্তৃত থাকা সম্ভবপর; কিন্তু বর্ত্তমান তেজপুর অঞ্চলই যে প্রতাপশালী বাণের রাজধানী শোণিতপুর ছিল, এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি হইতে পারে না।* এই অঞ্চলে স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে রাজা বাণ, কুমার অনিরুদ্ধ ও কুমারী উষা সম্বন্ধীয় প্রবাদ এরূপ বহু প্রচলিত যে, সাধারণ গৃহস্থেরাও স্ব স্ব কন্যাদিগকে উষার ন্যায় গুণবতী দেখিতে অভিলাষ করিয়া থাকে। এমন কি, নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য জাতি—আকাদিগের রাজগণও আপনাদিগকে বাণ বংশোদ্ভব বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করে। আকাদিগের এই দাবী

* তেজপুরের ডিপুটী কালেক্টর আসামের প্রত্নতত্ত্বপারদর্শী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বলেন যে, পূর্ব্বে তেজপুরের নাম "শোণিতপুর"ই ছিল। ইংরেজের আমলে কোনও ডেপুটী কমিশনার নামটীকে "আসামীয়" করিবার নিমিত্ত "শোণিতের" পরিবর্ত্তে 'তেজ' বসাইয়া বর্ত্তমান "তেজপুর" নাম দিয়াছেন!!

কত দূর সঙ্গত, তাহা এখনও অনুসন্ধান সাপেক্ষ। ইহাদের মধ্যে লিপিমালার প্রচলন নাই। সুতরাং এই সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সাফল্যের সম্ভাবনাও কম। আকারা অনার্য্য—কিন্তু দিতি-সুত বাণ অসুর পদবাচ্য হইলেও অনার্য্য নহেন। অসুর অর্থে সুর-বিরোধী মাত্র বুঝায়। সুতরাং আকাদিগের এই দাবী সুধীসমাজে গৃহীত হইবে কিনা, সংশয়ের বিষয়। তাহাদের বর্ত্তমান অসভ্যাবস্থাও তাহাদের এই দাবীর অনুকূল নহে। পুরাণ-বর্ণিত বাণ রাজবংশ যে ঈদৃশ অক্ষর-জ্ঞান-বর্জ্জিত শিল্পকলা-রহিত অসভ্যাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিতে কষ্ট কল্পনার প্রয়োজন। বরং তেজপুরবাসীদের মধ্যে বাণরাজ সম্বন্ধীয় কীর্ত্তি কাহিনী আবহমান কাল হইতে ঈদৃশ আগ্রহ সহকারে উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে যে, তদ্দ্বারা সন্নিহিত পার্ব্বত্য জাতি পর্য্যন্ত উদ্বোধিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা সহজ-সাধ্য।

আসাম প্রদেশ বর্ত্তমানে বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এক সময়ে যে এই প্রদেশটী সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরূঢ় জনমণ্ডলীতে পূর্ণ ছিল, আসামের সর্ব্বত্র তাহার নানা নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। এই প্রাচীন ভূমি বাণ ও উষার আবাস ভূমি ছিল, এ কথা স্মরণ হইলে যে পূর্ব্ব গৌরবের আদর্শ স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, তাহা ভারতের যে কোনও অংশের পূর্ব্ব গৌরব গাথার সহিত তুলনার অযোগ্য নহে।

শ্রীউমেশচন্দ্র দে।

জন্মভূমি।

(১)

এই মম জন্মভূমি! শ্যামা, বরাঙ্গনা
স্নিগ্ধরশ্মি উন্মেষিণী, সতত শোভনা,
তরুরাগে বিশোভিত স্নিগ্ধ চলদল
তমাল পনস নীপ বঞ্জুল নির্ম্মল
পাতিয়াছে বক্ষে যার, শান্ত স্নিগ্ধছায়া,
প্রগাঢ় প্রশক্তি ভরে শীতলিতে কায়া।

(২)

এই মম জন্মভূমি! সুবর্ণ সিচয়া,
লক্ষ্মীরূপে পদ্মনেত্রে বিচ্ছুরিত দয়া;
নিশ্বাসে প্রবাহে যার বসন্ত অনিল
বক্ষে বহে ক্ষীর ধারা—প্রসন্ন সলিল;
মুঞ্জরিত পিক কণ্ঠ—কুহরণ ছন্দ,
রেণুভরা পদ্মলোধ্র, কুন্দ, মল্লিগন্ধ;
স্নেহরস পরিপ্লুতা মমতা-রূপিনী
যার সান্দ্র বৎসলতা অতিভূ-গামিনী।

(৩)

সত্বগুণ বহে যার ধমনী ব্যাপিয়া,
সেই দেবী জাগে ওই প্রীতি বিথারিয়া,
বরিষ্ঠা, বরেণ্যা, স্নিগ্ধা, বেদপরায়ণা
মাধ্বিক বর্ষিণী মাতা পদ্ম আননা!
ধ্যান যার, হিমালয় মূরতি ধরিয়া,
দৃঢ়ভাবে স্বর্গস্পর্শী আছে দাঁড়াইয়া।

(৪)

এ দেবতা জগতের কল্যাণদায়িনী
সপত্নী সন্তান তরে দীপ্তি-বিধায়িনী,
তামসী, রাজসী পূজা রক্ত উৎক্ষেপণ,
দম্ভের উদ্ভ্রান্ত গাথা, বীরত্ব গর্জ্জন
মা আমার নাহি চান। মা চান কেবল,
শান্তি, প্রীতি, দয়া, শ্রদ্ধা, নহে পশুবল;
উচ্ছৃঙ্খল নীতিভ্রষ্ট, রিপু-পদানত
ক্লিষ্ট ক্ষিপ্ত সুপ্তচিত্তে করিতে জাগ্রত।

(৫)

মা আমার করুণার দেবী মূর্ত্তিমতী
আর্ত্তে দৈন্যে আধিগ্রস্তে করুরূপাসতী
শস্যপূর্ণ, নেত্ররম্য বিশাল প্রান্তর
স্বর্ণবীথি বক্ষে ধরি হাসে নিরন্তর ;
প্রীতিগর্ভা শৈবলিনী সৌম্য শৈলমালা
শষ্পাস্তীর্ণ তরুতল যেন শান্তি ঢালা
শ্যামল কান্তার-কান্তি, আস্বাদলম্বিত
কল কাকলিতে ভরা, পবন বেষ্টিত
সুনীল উল্লোচে জবাকুসুম শঙ্কাশ,
মহাদ্যুতি অরুণের অপূর্ব্ব বিকাশ ;
অমঞ্জীর-পদা-কস্র উষা রূপসীর
অতি মৃদু চলনের স্ফুরিত মদির
পান করি, পদ্মরাণী বিদ্যুৎ কম্পনে
হাসিয়া ডাকিয়া লয় নব জাগরণে।

(৬)

দ্বিরেফ গুঞ্জন কল কাকলির তান,
কাণের ভিতরে যেন সুধা করে দান।
সুধাংশুর অতি মৃদু অতি মৃদু কর
শ্রান্ত প্রাণে সুধাসিঞ্চি করে মনোহর।
অনিদ্র প্রবণা তারা আকাশে বসিয়া
কান্তিময়ী দেবতায় দেখে নিরখিয়া,
এমন চারুতা ভরা জননী আমার,
মমতা কম্পিত বক্ষে প্রীতির পাথার
স্ফুটপ্রভা সাত্বিকতা চির সঞ্জীবনী
ছড়াইছে শক্তি-স্রোত দিবস রজনী।

(৭)

স্থাপিয়া হৃদয় মাঝে বিতথ্য মালায়
কে উহারা, বিদ্যুজ্জিহ্ব পূজা তরে ধায়,
কে উহারা অসংযমী নির্ম্মল হৃদয়
তামসী পূজার ক্রিয়া করে অভিনয় ?
প্রচ্ছন্ন পিশুন যারা দেবী পূজা তরে
হোতৃ বেশে কেন ব'সে বেদীর উপরে ?
মায়েরে পূজিতে চাও, মুগ্ধ ভক্ত হয়ে
পরিহরি দ্বেষ, হিংসা, অর্ঘ্য হাতে ল'য়ে,
কাঙ্গালের বেশ ধরি, হও অগ্রসর,
ধর্ম্ম সূত্রে ভা'য়ে ভা'য়ে বাঁধ পরস্পর।

(৮)

মা আমার স্বার্থ পশু রুধির ঈপ্সিতা
ওই ভোগ্যে ওই কাম্যে হন পুলকিতা,
বিচারের তীক্ষ্ণ অসি নিজ হস্তে ধরি,
একাঘাতে স্বার্থপশু দুই খণ্ড করি,
মহোল্লাসে প্রিয়তম * উঠ গরজিয়া
শুচি হোমানল চিত্তে উঠিবে জ্বলিয়া।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

অদ্বৈতবাদ ও ঋগ্বেদের দেবতা। (৩)

আমরা এই প্রবন্ধের বিগত সংখ্যায় বেদান্তদর্শন হইতে দেবতাবর্গের সম্বন্ধে দুইটী সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলাম। শ্রুতিতে সূর্য্য, আকাশ (দ্যৌঃ), প্রাণ, অগ্নি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ব্রহ্ম সত্তাই লক্ষিত হইয়াছেন, ইহাই বেদান্তদর্শনের প্রথম সিদ্ধান্ত। কার্য্য-বর্গের স্বতন্ত্র, স্বাধীন কোন সত্তা নাই ; কারণের সত্তাতেই উহাদের সত্তা। সুতরাং যাঁহারা পরমার্থদর্শী তত্বজ্ঞ পুরুষ, তাঁহাদের চক্ষে সূর্য্য, আকাশ, অগ্নি প্রভৃতি কার্য্যবর্গ কোন স্বাধীন পদার্থ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে না। ঐ সকল পদার্থ দ্বারা তাঁহাদের চিত্তে, তন্মধ্যস্থ কারণ-সত্তাই অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। আমরা এই সিদ্ধান্তের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ।

দেখাইয়াছি যে, ঋগ্বেদে উল্লিখিত সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাও এক ব্রহ্মসত্তারই বিকাশ বা নাম ভেদ মাত্র; উহারা কোন স্বতন্ত্র, স্বাধীন জড় পদার্থ নহে। তারপর, বেদান্তের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, যখন শ্রুতির উল্লিখিত সূর্য্য, আকাশ, অগ্নি প্রভৃতিতে প্রচুররূপে "ব্রহ্মলিঙ্গ" বা ব্রহ্মেরই পরিচায়ক চিহ্ন রহিয়াছে, তখন ঐ শব্দগুলি কোন স্বাধীন জড় পদার্থকে বুঝাইতেছে না; উহাদের দ্বারা ব্রহ্মই লক্ষিত হইতেছেন। তখন আমরা দেখিব যে, বেদান্তের এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ঋগ্বেদের দেবতাবর্গের উপরে প্রযুক্ত হইতে পারে কি না? যদি হয়, তাহা হইলে বেদান্তমতানুসারে ঋগ্বেদের দেবতাগুলি দ্বারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মপদার্থই লক্ষিত হইবেন। এখন আমরা তাহাই দেখাইতে অগ্রসর হইব।

ঋগ্বেদে যতগুলি 'দেবতা' উল্লিখিত হইয়াছেন, প্রত্যেক দেবতা সম্বন্ধেই প্রচুর সূক্ত আছে। এই সকল সূক্ত হইতে যদৃচ্ছাক্রমে যেটা গ্রহণ করা যায়, তাহাতেই দেখা যায় যে, এই সূক্তে যে সকল বিশেষণ প্রদত্ত আছে, সেই বিশেষণগুলি কোন জড় পদার্থের উপরে প্রযুক্ত হইতে পারে না। বিশেষণগুলি ব্রহ্মেরই উচ্চভাব প্রকাশক। আমরা এই সংখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতা সম্বন্ধে কতকগুলি সূক্ত এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। এই সকল উদ্ধৃত সূক্তের নীচে সায়নাচার্য্যসম্মত ব্যাখ্যাও প্রদান করিতেছি। পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন যে, এই সকল সূক্তে যথেষ্ট পরিমাণ "ব্রহ্মলিঙ্গ" বা ব্রহ্মেরই পরিচায়ক চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। সুতরাং এই সকল দেবতা দ্বারা, দেবতাবর্গে অনুগত বা অনুস্যুত ব্রহ্মসত্তাই প্রতিপাদিত হইতেছেন।

(১) "সোম" দেবতার বর্ণনে এইরূপ সূক্ত আছে :—

> ত্বমিমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাঃ,
> ত্বমপো অজনয়স্ত্বংগাঃ।
> ত্বমাততন্থোর্ব্বন্তরীক্ষং,
> ত্বং জ্যোতিষা বিতমো ববর্থ॥"

হে সোম দেবতা! তোমা হইতেই এ বিশ্বের ওষধি সকল জন্মিয়াছে; তোমা হইতেই জল উৎপন্ন হইয়াছে এবং তুমিই মনুষ্যদেহে ইন্দ্রিয় শক্তি ও বাহ্যজগতে কিরণ সকলকে সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি এই সুবিশাল অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়া দিয়াছ, এবং তুমিই হে সোম! সূর্য্য জ্যোতি দ্বারা বিপুল অন্ধকাররাশিকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছ।

> "ত্বংহি বিশ্বতো মুখো বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
> অপ নঃ শোশুচদঘম্॥"

হে সোম! তুমি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছ। তুমি যে কেবল বিশ্বব্যাপ্ত তাহা নহে, তুমি এই বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া—বিশ্বাতীত রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ। আমাদিগের শারীরিক, বাচিক ও মানসিক পাপরাশিকে দূরীভূত কর।

> "তবেমাঃ প্রজাঃ দিব্যস্য রেতসঃ,
> ত্বংবিশ্বস্য ভুবনস্য রাজসি।
> অথেদং বিশ্বং পবমানতে বশে,
> ত্বমিন্দো প্রথমোধামধা অসি॥"

হে সোম! তোমাতে যে দিব্য বীজশক্তি আছে, সেই বীজশক্তি হইতেই প্রজা সকল উৎপন্ন হইয়াছে। তুমিই এই সমগ্র ভবনের সম্রাট্। এই বিশ্ব সর্ব্বতোভাবে তোমারি অধীন—তোমারই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এই বিশ্বের সমুদয় ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইতেছে। তুমিই এ বিশ্বের আদি আশ্রয়-দাতা।

পাঠক দেখিবেন, এগুলি "ব্রহ্ম-লিঙ্গ" কি না? এ সকল কথা কখনও জড় বস্তুতে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

(২) "বরুণ দেবতা" সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—

"বনেষু ব্যন্তরীক্ষং ততান,
বাজমর্ব্বৎসু পয়উস্রিয়াসু।
হৃৎসু ক্রতুং বরুণো অপ্সু অগ্নিং,
দিবি সূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ॥"

হে রাজা বরুণ! তুমিই এ বন-রাজির উর্দ্ধদেশে বিস্তৃত, বিপুল অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছ। দ্রুতগামী, বলবান্ অশ্ব সকলে তুমিই সামর্থ্য প্রদান করিয়াছ। তুমিই গাভী স্তনে ক্ষীর নিহিত করিয়াছ। মনুষ্য-হৃদয়ে বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্রিয়া-প্রবৃত্তি তুমিই অর্পণ করিয়াছ। আকাশে সূর্য্যকে এবং জল মধ্যে তেজঃ-শক্তিকে তুমিই স্থাপন করিয়াছ। পর্ব্বতে সোম তোমা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে।

প্রিয় পাঠক! উন্মাদ ব্যতীত, কে এই প্রকার বিশেষণ জড় বস্তুতে প্রয়োগ করিতে পারে? ইহা ব্যতীত ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্ন আর কি হইতে পারে? পাঠক, আরও শুনুন্ :—

"অবুধ্নে রাজা বরুণো বনস্য,
উর্দ্ধং স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ।
নীচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষাম্,
অস্মে অন্তর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ।"

অশেষ বলশালী রাজা বরুণ,—এই মূল-রহিত অসীম আকাশের উর্দ্ধদেশে,সর্ব্ব প্রকার তেজের সমষ্টি (স্তূপ) স্বরূপ সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন। সেই সূর্য্য হইতে বহির্গত হইয়া কিরণরাশি নিম্নদিকে অনবরত বিকীর্ণ হইতেছে। বাহিরে যাহা তেজঃশক্তিরূপে পরিচিত, তাহাই মানবদেহের অভ্যন্তরে জঠরাগ্নিরূপে, বুদ্ধিরূপে, প্রজ্ঞারূপে, নিয়ত পরিণত হইতেছে।

পাঠক, বাহিরে ও ভিতরে যে একই শক্তি ক্রিয়া করে, শক্তির এই একত্বের কথাও কি এই সূক্তে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয় নাই? এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত Herbert Spencer এর উক্তি শুনিবেন কি?—

"How a force existing as motion, heat or light, can become a mode of consciousness—how it is possible for aerial vibrations to generate the sensation we call sound,—these are mysteries which it is impossible to fathom."

ঋগ্বেদ কি অসভ্য কৃষকের গীতি?

"অব তে হেলো বরুণ নমোভিঃ,
অব যজ্ঞেভিরীম হে হবির্ভিঃ।
ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর প্রচেতা,
রাজন্ এণাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি॥"

হে রাজন্! হে বরুণ! আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ তোমার যে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি, তজ্জন্য নমস্কার দ্বারা, যজ্ঞদ্বারা, হবিঃদ্বারা, বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে বরুণ! তুমি সর্ব্বদা আমাদিগের অন্তরে বাস করিতেছ এবং আমাদের অন্তরে উদিত সমুদয় ভাবই পরিজ্ঞাত রহিয়াছ। হে সর্ব্বজ্ঞ! হে শক্তিমন্! আমাদের আচরিত পাপরাশিকে শিথিল করিয়া দাও।

"বেদ মাসঃ ধৃতব্রতঃ দ্বাদশ প্রজাবতঃ।
বেদ য উপজায়তে॥"

হে বরুণ! তুমিই জগতের যাবতীয় নিয়মের প্রভু। তোমারি নিয়মে এ জগৎ পরিচালিত হইতেছে। তুমিই মাস, বৎসর, ঋতু প্রভৃতি কাল ও কালের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবয়ব সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত আছ। যাহারা এই কাল-নিয়মে জন্মপরিগ্রহ করিতেছে, তাঁহাদের সকলের কথাই তুমি জ্ঞাত আছ।

পাঠক! এগুলি কি জড়ের উপরে প্রযুক্ত স্তুতি-গীতি? জড়পদার্থ কি কাহাকেও 'জানিতে' পারে?

(৩) "অগ্নিদেবতা" সম্বন্ধে কয়েকটী ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"অগ্নি রস্মি জন্মনা জাতবেদাঃ,
ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং মে আসন্।
অর্ক স্ত্রিধাতুঃ রজসো বিমানো,
জস্রো ঘর্ম্মোহবিরস্মি নাম॥"

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে আমরা তাহার তাৎপর্য্য উদ্ধৃত করিতেছি। এই ঋকে অগ্নি স্বয়ং নিজের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং ঋগ্বেদের অগ্নি কি পদার্থ, তাহা বুঝিতে হইলে, এই ঋকৃটী অতীব উপযোগী।

"এই বিশ্বের তাবৎ পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত। এক, "অন্নাদ;" অপর "অন্ন।" (আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় অন্নাদ=Force বা Motion এবং অন্ন=Matter)। অগ্নি আপনার পরিচয় দিতে গিয়া, জগতে যে তিনি 'অন্ন' ও 'অন্নাদ'—এই উভয় রূপেই অবস্থান করিতেছেন, তাহাই সুস্পষ্ট বলিয়া দিতেছেন। অগ্নি বলিতেছেন—

হে মর্ত্ত্যলোকবাসিগণ! আমাকে অগ্নি বলিয়া অবগত হও। আমার দুই রূপ। একরূপে আমি অন্নাদ,আবার অন্যরূপে আমি অন্ন। আমি অন্নাদ-রূপে, আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, ভূলোকে অগ্নি নামে, অন্তরীক্ষলোকে বায়ু নামে এবং দ্যুলোকে সূর্য্য নামে অবস্থান করিতেছি। অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য—আমারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র জানিবে। আমি জগতে প্রাদুর্ভূত হইবা মাত্র, সকল তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি। ঘৃত আমার অবভাসক। 'আমি ঘৃত-প্রক্ষেপে জ্বলিয়া উঠি। ঘৃত—অন্নেরই রূপান্তর। আমি অন্নের (Matter) আশ্রয়ে অভিব্যক্ত হইয়া প্রকাশিত হই। আমার আস্যে অমৃত বর্ত্তমান আছে। অর্থাৎ, আমিই অন্নাদ বা অন্নের ভোক্তা; সুতরাং আমি ভোক্তারূপে অবস্থিত রহিয়াছি। আমি প্রকাশ-স্বরূপ; আমার এই প্রকাশের কদাপি ক্ষয় হয় না। আমি জীবহৃদয়ে প্রাণরূপে অবস্থিত।"

প্রিয় পাঠক, ঋগ্বেদের অগ্নি কি জড়-পদার্থ মাত্র? এই মূল্যবান্ মন্ত্রটীতে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা কি জলন্ত বৈজ্ঞানিক সত্য নহে? ঋগ্বেদ কি আদিম অসভ্য-মানবের অসভ্যোচিত গ্রন্থ?

"অগ্নির্নেতা ভগ ইব ক্ষিতীনাং,
দৈবীনাংদেব ঋতপা ঋতাবা।
স বৃত্রহা সনয়ঃ বিশ্ববেদাঃ,
পর্ষৎ বিশ্বাতি দুরিতা গৃণন্তম্।"

পাঠক! এই মন্ত্রটীর বিশেষণগুলিও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখুন্ :—

সূর্য্য-কিরণ যেমন ক্ষিতিতলস্থ যাবতীয় পদার্থের অন্তর্যামী ও নিয়ামক, অগ্নিও ঠিক্ তদ্রূপ নিয়ামক। সূর্য্য, অগ্নিরই রূপান্তর মাত্র। এই অগ্নিই (সূর্য্যরূপে) গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতু সকলের প্রবর্ত্তক। ইনি "ঋতাবা"; অর্থাৎ ইঁহার নিয়ম অনুল্লঙ্ঘনীয়। ইনি কেবলমাত্র বাহ্যজগতের নিয়ন্তা নহেন; ইনি অন্তর্জগতেরও নিয়ন্তা,—ইনি পাপ-হন্তা। ইনি সনাতন, ইনি অক্ষয়, অব্যয়। ইনি বিশ্বের তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত আছেন। ইনি উপাসকের চিত্তবৃত্তির মলিনতা ও কলুষ রাশি অপনোদিত করুন্।

প্রিয় পাঠক, আমরা এস্থলে একটী

অবান্তর কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সুপ্রাচীন ঋগ্বেদ যে সূর্য্যকে ক্ষিতিতলস্থ যাবতীয় পদার্থের "নেতা" বা নিয়ামক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহারই ব্যাখ্যা স্বরূপ ইউরোপের বর্ত্তমানকালের গর্ব্বিত বিজ্ঞান কি বলিয়াছেন, তাহা দেখুন্ :—

'And while the decomposition effected by the plant is at the expense of certain forces emanating from the sun which are employed in overcoming the affinities of carbon and hydrogen for the oxygen united with them; the recomposition effected by animal is at the profit of these forces which are liberated during the combination.' (First Principles, page 210).

ঋগ্বেদে নাকি উন্নত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নাই? পাঠক ইহার বিচার করিবেন।

অগ্নি সম্বন্ধে আরো একটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিব :—

"স ইৎতন্তুং স বিজানাতি ওতুং,
স বক্তানি ঋতুথা বদাতি।
য ইং চিকেতৎ অমৃতস্যগোপা,
অবশ্চরন্ পরো অন্যেন পশ্যন্॥"

এই বিশ্ব-পট সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই বিশ্ব-পটের সূত্রের তত্ত্ব আমরা কেহই অবগত নহি। বস্ত্র দুই প্রকার সূত্রের সজ্জা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কতকগুলি সূত্র লম্বা দিকে এবং অপরগুলি প্রস্থের দিকে গ্রথিত করিলে, তবে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়। এই বিশ্ব-পটের কোন্ সূত্রগুলি লম্বাদিকের এবং কোন্ গুলিই বা প্রস্থ-দিকের, তাহা মর্ত্ত্যলোকের কেহই জানে না। এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব কেবল এক অগ্নিদেবই সম্যক্ অবগত আছেন। সূক্ষ্ম তন্মাত্র এবং স্থূল পঞ্চভূতই এই বিশ্ব-পটের সূত্রস্থানীয়। কি কৌশলে, সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূতযোগে, এই সুবিস্তৃত বিশাল বিশ্ব-পট বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা অগ্নিদেবতা সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। যখন কালপ্রভাবে বৈদিকতত্ত্ব ধ্বংস হইয়া যায়; তখন আবার, পুনঃ-সৃষ্টির প্রারম্ভে এই অগ্নিই, সেই বিলুপ্ত বৈদিকতত্ত্ব সকলের পুনর্ব্বিকাশ করিয়া থাকেন। অগ্নি সকলের জ্ঞাতা, ইনি সর্ব্বজ্ঞ। এবং ইনিই অমৃতকে রক্ষা করিতেছেন;—অর্থাৎ, অগ্নির মধ্যেই অবিনাশী ব্রহ্মসত্তা অনুগত রহিয়াছে। ইনি যেমন সূর্য্যরূপে বিশ্বের যাবৎ বস্তুর প্রকাশক, তেমনি ইনি এই বিশ্বের অতীত হইয়াও আপন মহিমায় নিত্য প্রকাশিত রহিয়াছেন।

প্রিয় পাঠক! এই অগ্নি কি কেবল ভৌতিক জড় অগ্নিমাত্র? এই বিশ্ব-বিভাসক, নিত্য, অমৃত, অগ্নিতেই বৈদিক ঋষিগণ ঘৃত-ধারা ঢালিয়া দিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। বেদান্তদর্শন যে "ব্রহ্ম-লিঙ্গের" কথা উত্থাপন করিয়াছেন, ঋগ্বেদের অগ্নির বিশেষণগুলি, আশ্চর্য্যরূপে, কেবল সেই ব্রহ্মবস্তুরই পরিচায়ক, ইহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি।

এখন আমরা "ইন্দ্রদেবতা" সম্বন্ধে দুই একটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াও, এই সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করিয়া লইব।

(৪) ইন্দ্রের পরিচয় এই প্রকার :—

ত্রিবিষ্টিধাতু প্রতিমানমোজসঃ,
তিস্রো ভূমীর্নৃপতে ত্রীণিরোচনা।
অতীদং বিশ্বং ভুবনং বিবক্ষিথ,
অশত্রুরিন্দ্র! জনুষা সনাদসি॥"

হে ইন্দ্র! তোমার শক্তির বীজভূত—অগ্নি বায়ু জল প্রভৃতি পঞ্চভূত, সমগ্র বিশ্ব উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্টরূপে ব্যাপিয়া আছে, এবং তুমি তোমার সামর্থ্যের অনুরূপ—ভূর্লোক, অন্তরীক্ষলোক ও দ্যুলোককে, অগ্নি,

বায়ু ও সূর্য্য, এই তিন জ্যোতি দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। এই প্রকারেই হে ইন্দ্র! তুমি এই বিশ্বকে বহন করিতেছ, কিন্তু এই বিশ্ব বহন করিয়াও, তদতিরিক্ত বিশ্বাতীত সামর্থ্য তোমার আছে। তুমি সনাতন, অবিনাশী কারণ-শক্তি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া, বিশ্বের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছ।

"প্রমাত্রাভিঃ রিরিচে রোচমানঃ,
প্রদেবেভির্বিশ্বতো অপ্রতীতঃ।
প্রমজ্মনা দিব ইন্দ্র! পৃথিব্যাঃ,
প্রউরোর্মহো অন্তরীক্ষাৎ ঋজীষী॥"

কোন মাত্রা বা পরিমাণ দ্বারা কদাপি পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। বিশ্বের কোন বস্তুই তোমার ইয়ত্তা বা পরিচ্ছেদ করিতে সমর্থ হয় না। তুমি সকল পরিচ্ছেদের অতিরিক্ত। দেবলোক বা মর্ত্ত্যলোকের কেহই তোমার সামর্থ্যেরও ইয়ত্তা করিতে পারে না। তুমি, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হইতে আত্মসামর্থ্যে নিয়ত অতিরিক্ত হইয়া, অবস্থান করিতেছ। 'তোমার সামর্থ্য ও বল এই পরিমাণ,'—কোন ব্যক্তিই এপ্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না।

"ধামন্তে বিশ্বং ভুবনমধিশ্রিতং,
অন্তঃসমুদ্রে হৃদ্যন্ত রায়ুষি।
অপামনীকে, সমিথে য আভৃতঃ,
তমশ্যাম মধুমন্তং ত ঊর্ম্মিম্॥"

হে অগ্নিদেবতা! এই নিখিল ভুবন তোমারই গৃহে বা আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছে। কোথায় কোথায় তোমার গৃহে অবস্থিত? তুমি সমুদ্রে বড়বাগ্নিরূপে এবং অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ বা সূর্য্যরূপে রহিয়াছ। প্রাণীবর্গের মধ্যে জঠরাগ্নিরূপে ও জীবহৃদয়ে আয়ুরূপে বা প্রাণশক্তিরূপে তুমি অবস্থান করিতেছ। 'বারিদবৃন্দ মধ্যে তুমিই বিদ্যুৎ-শক্তি। পরস্পর বিজিগীষু ব্যক্তিদিগের রণ-ভূমিতে তুমিই শৌর্য্য ও বিক্রম-বহ্নি রূপে প্রকাশিত হও। কল্যাণময়ী' তোমার উর্ম্মি বা প্রবাহ। হে অগ্নে! তোমার সেই মধুময় প্রবাহ আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপিয়া রাখুক।

প্রিয় পাঠক! আর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার বোধ হয় আবশ্যকতা নাই। এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা প্রচুর-রূপে ব্রহ্মের পরিচয় সূচক চিহ্ন বা বিশেষণ প্রাপ্ত হইতেছি। বেদান্তদর্শন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অগ্নি, আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতি কার্য্যবর্গে যখন "ব্রহ্মলিঙ্গ" আছে, তখন এই পদার্থ গুলি কোন জড়ীয় পদার্থ-বিশেষকে বুঝাইতে পারে না। এগুলির দ্বারা, এই সকলের মধ্যে অনুগত ব্রহ্ম-সত্তাই লক্ষিত হইতেছেন। আমরা ঋগ্বেদের অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতির বর্ণনাতেও সেই "ব্রহ্মলিঙ্গ" প্রচুর পাইতেছি। সুতরাং ঋগ্বেদের ইন্দ্র, সোমাদি শব্দ দ্বারা কোন জড়ীয় ভৌতিক পদার্থ বুঝিতে হইবে না; এ সকল ব্রহ্ম-সত্তাকেই লক্ষ্য করিতেছে।

আমরা দেবতা সম্বন্ধে বেদান্ত-দর্শনের দুইটী সিদ্ধান্তের আলোচনা করিলাম এবং বেদান্ত যে চক্ষে ও যে অভিপ্রায়ে দেবতা-দিগকে দেখিয়াছেন, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গকেও সেই চক্ষে ও সেই অভিপ্রায়েই দেখিতে হইবে। এদেশে, বৈদিকযুগ হইতে দার্শনিক সময় পর্য্যন্ত,যে ভাবে দেবতাবর্গের স্বরূপের ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, আমরা বৈদেশিক সিদ্ধান্ত কেন গ্রহণ করিব? কেনই বা দেবতাবর্গকে জড়ীয় বস্তু বলিয়া, সিদ্ধান্ত করিব?

যাহা হউক, আমরা ঋগ্বেদের দেবতা-

স্বরূপ-সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের দুইটী মাত্র সিদ্ধান্ত দেখাইলাম। অতঃপর আমরা অন্য প্রমাণগুলির যথাক্রমে উল্লেখ করিব। ক্রমশঃ

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

গীতায় অবতারবাদ।

(ক) অবতারবাদের ঐতিহাসিকতা।

গীতার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে গীতোক্ত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন-কর্ত্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব বুঝিতে হইলে অবতারবাদ সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হওয়া উচিত, কারণ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহাকে ঐরূপ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে কেন, তাহা অবতারবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব।

অবতারবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে উহার বিরুদ্ধে যে দুই একটী আপত্তি উত্থাপিত করা হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। প্রথম আপত্তি খ্রীষ্টধর্ম্মী-মিশনারিগণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, অবতারবাদ পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মে ছিল না। উহা বিদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে। অবতারের কথা একমাত্র খ্রীষ্টধর্ম্মেই আছে। হিন্দুরা অবতারবাদ খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে পাইয়াছেন। এক মাত্র যীশুখ্রীষ্টই অবতার ছিলেন, পৃথিবীতে পূর্ব্বে আর কেহই অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই।

অবতারবাদ যে অতি প্রাচীন বিষয়, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এবং যীশুখ্রীষ্ট যে কিরূপ অবতার ছিলেন, তাহা পশ্চাৎ আলোচিত হইবে। অবতারের কথা আমরা বেদে দেখিতে পাই। শতপথ-ব্রাহ্মণে মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহ অবতারের কথা আছে। মৎস্য অবতার সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী পাইয়া থাকি।

একদা বৈবস্বত মনু স্নানের জন্য জলাশয়ের নিকট যাইলে, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটী অতি ক্ষুদ্র মৎস্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তিনি সেই মৎস্যটীকে ধরিয়া একটী পাত্রে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু উহা এমত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, উহা আর ঐ পাত্রে ধরিল না। তিনি তখন সেই মৎস্যটীকে একটী বৃহৎ পাত্রে রাখিলেন, কিন্তু উহা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তখন তিনি উহা এক নদীতে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু যখন উহা এমত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে আর নদীতে ধরে না, তখন তিনি উহা সমুদ্রে রাখিতে বাধ্য হইলেন। ঐ মৎস্য সমুদ্রের অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, উহা তখন মনুকে অবগত করাইলেন যে, তিনি মৎস্য অবতার। শীঘ্রই জলপ্লাবনে প্রলয় ঘটিবে, এইজন্য তিনি মনুকে তাঁহার পৃষ্ঠোপরি আশ্রয়গ্রহণ করিতে বলিলেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে আমরা এইরূপ মৎস্য অবতারের কথা পাইয়া থাকি।

কূর্ম্ম অবতার সম্বন্ধে আমরা উক্ত ব্রাহ্মণে এইরূপ দেখিতে পাই। যথা,—"স যৎ কূর্ম্মনাম এতদ্ বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজৎ।"

বরাহ অবতার সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"আপোবা ইদমগ্রে সলিল আসীৎ ; তস্মিন্

প্রজাপতি স ইমাং অপশ্যৎ। তাং বরাহ ভূত্বা অবৎ।"

বামন অবতার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে,—"তে (দেবাঃ) যজ্ঞমেব বিষ্ণুং পুরস্কৃত্য ঈয়ুঃ। বামন হ বিষ্ণুরাস।"

অনেকে হয়তো জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কৃষ্ণ অবতারের কথা বেদে আছে কি না? ইহা উত্তরে বক্তব্য এই যে, বাসুদেব কৃষ্ণের কথা তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"নারায়ণায় বিদ্মহে, বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।"

বেদে আমরা অবতারের কথা পাইতেছি, সুতরাং অবতারবাদ যে চার পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্ব্বকার, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

অবতারের কথা ভারত সংহিতায় এবং পুরাণগুলিতে বিশেষভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভারত-সংহিতায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখিতে পাই। যথা,—

"যদা শ্রৌষং কশ্মলে নাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জ্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকং দর্শয়ানং শরীরে
তদানাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥"

পূর্ব্বে আমরা পুরাণের প্রাচীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বিষ্ণুপুরাণে অবতারের অনেক কথা আছে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে,—"যত্র যদুবংশে ভগবান্ অনাদি নিধনো বিষ্ণুরবতার। ভগবান্ অনাদিমধ্যো দেবকীগর্ভে সমবততার বাসুদেবঃ।" শ্রীমদ্ভাগবতেও উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" (১-৩-২৮)—অর্থাৎ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।

(খ) অবতার কাহাকে বলে?

অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, আমাদের প্রথমে দেখা উচিত যে, অবতারের বিশেষ অর্থ কি?—কাহাকে শাস্ত্র অবতার বলিয়াছেন এবং কাহাকেই বা বলেন নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এক হিসাবে আমরা সকলেই অবতার, কারণ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীতা) অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে—"হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্টিতম্" (গীতা, ১৩।১৭), "সর্ব্বস্যচাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" (গীতা, ১৫।১৫), "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" (গীতা) অর্থাৎ, ভগবান্ সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে বিরাজিত। অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীব কলয়া প্রবিষ্টো ভগবান্ ইতি॥
ভাগবত।

এখানে ভগবান্ কলারূপে জীবে প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই,—"প্রপূজ্য পুরুষংদেহে দেহিনং চাংশ রূপিনং।"—এখানে দেহিকে ভগবানের অংশরূপী বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য যে সমুদয় জীব যদি ভগবানের অংশ হয়, তাহা, হইলে আমরা তাহাদিগকে অবতার না বলিব কেন? কিন্তু শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কেবল মনুষ্য কেন, স্থাবর (mineral) এবং জঙ্গম (vegetable, animal ও men) যাহা কিছু আছে, সকলেই ভগবান আছেন, যথা,—

"যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভারতর্ষভ॥
(গীতা।১৩।২৬)

অর্থাৎ জগতে স্থাবর জঙ্গম যেকিছু বস্তু আছে, সে সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এই উভয়ের সংযোগজনিত জানিবে। ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন যে "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভরত।" (গীতা-১৩২) অর্থাৎ আমাকে সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। সুতরাং স্থাবর এবং জঙ্গমে যদি ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজ করেন, তাহা হইলে আমরা উহাদিগকেই বা অবতার না বলিব কেন?

এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, আমরা স্থাবর অথবা জঙ্গমের ভিতর কাহাকে অবতার বলিতে পারি না। হিন্দুশাস্ত্রে অবতারের বিশেষ অর্থ আছে।

তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য যে, ভগবানের যাহা বিভূতি, যাহা শ্রী অথবা যাহা তাঁহার তেজের অংশসম্ভূত, তাহাদিগকে আমরা অবতার বলিতে পারি কি না? কারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ সম্ভবম্॥"
(গীতা।১০।৪১)

অর্থাৎ যাহা বিভূতিসমন্বিত, শ্রীযুক্ত ও প্রভাব এবং বলাদি দ্বারা অতিশয়িত, তৎসমস্তই মদীয় তেজের অংশসম্ভূত জানিবে। যেমন আদিত্যদিগের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্মান্‌দিগের মধ্যে সূর্য্য, মরুতগণের মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে শশী, দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, রুদ্রদিগের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ ও রাক্ষসদিগের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধে অগ্নি এবং পর্ব্বতের ভিতর মেরুই, ত্যাদি,—যাহা ভগবানের বিভূতি বলিয়া গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাদিগকে আমরা অবতার বলিতে পারি কি না'? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, আমরা ইহাদিগকেও অবতার বলিতে পারি না।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তাহা হইলে যাঁহারা আদিষ্ট (inspired) হন, তাঁহাদিগকে আমরা অবতার বলিতে পারি কিনা? যেমন মোসেস, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ অথবা জোরাস্টার প্রভৃতি মহোদয়গণ, যাঁহাদিগকে ধর্ম্মবীর (prophets) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাঁহাদিগকে আমরা অবতার বলিতে পারি কিনা? কিম্বা গ্রীকরা যাঁহাদিগকে Divine Afflatus বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা অবতার বলিতে পারি কিনা? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, আমরা ইঁহাদিগকেও অবতার বলিতে পারি না।

তবে, যাঁহারা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদিগের অন্তর ব্রহ্মের আলোকে (Illumination) আলোকিত, যাঁহারা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, যাঁহাদিগকে শাস্ত্র ঋষি, মুনি প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কি আমরা অবতার বলিতে পারি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শাস্ত্র ইঁহাদিগকেও অবতার বলেন নাই।

শাস্ত্র যাঁহাদিগকে আবিষ্ট মহাপুরুষ বা ঈশ্বরের আবেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবতার বলিতে পারা যায় কিনা? ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে 'আবেশ' ও 'অবতারের' ভিতর কি পার্থক্য আছে। ঐশ্বরিক কার্য্যসমাধার হেতু সময়বিশেষের জন্য যাঁহার ভিতর দিয়া ভগবানের প্রকাশ হয়, তাঁহাদিগকে আবিষ্ট মহাপুরুষ বা সাধারণ কথায় আবেশ বলে। যেমন যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি। যীশুখ্রীষ্টের জীবনী পর্য্যালোচনা

করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি একজন ধার্ম্মিক মহাপুরুষ ছিলেন। সময় বিশেষের জন্য তাঁহাতে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই কথা বুঝাইবার জন্য রূপকে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি একদা নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ স্বর্গ হইতে জ্যোতিঃ আসিয়া তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইল। এ জ্যোতিঃ আর কিছুই নহে, ভগবানের তেজ তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি যীশুখ্রীষ্ট বলিয়া পরিচিত হন এবং জন-সমাজে এইরূপ প্রচার করেন যে, তিনি ও তাঁহার পরমপিতা পরমেশ্বর একই সত্তা; তাঁহাদিগের ভিতর কোন পার্থক্য নাই। তাঁহার দ্বারা ভগবানের কার্য্য সমাধা হইলে ভগবানের ঐশ্বরিক সত্তার তিরোভাব (withdrawal of Divine Essence) হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহাকে যখন ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে "Father! Hast Thou forsaken me?"—পিতঃ! আমাকে কি আপনি ত্যাগ করিলেন?—যখন তাঁহার ভিতর হইতে ঐশ্বরিক সত্তার তিরোভাব হইয়াছিল—যে ঐশ্বরিক সত্তার আবির্ভাবে তিনি নিজেকে এবং ভগবানকে এক বলিয়া অনুভূত করিয়াছিলেন, সেই সত্তার তিরোভাবে—তিনি নিজের ভিতর মহাশূন্য অনুভব করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে পিতঃ! আপনি কি আমাকে ত্যাগ করিলেন?

আবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা ইহা অবগত হইলাম যে, সকল সময়ে ঐরূপ আদিষ্ট মহাপুরুষে ঐশ্বরিক সত্তা বর্ত্তমান থাকে না। যথার্থ অবতারে ঐশ্বরিক সত্তা (Divine Essence) সকল সময়ে বর্ত্তমান, কিন্তু আবেশে ঐ সত্তার সঙ্কোচন (withdrawal) হইয়া থাকে। কিন্তু আবিষ্ট মহাপুরুষের স্থান যে অনেক উর্দ্ধে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আদিষ্ট মহাপুরুষ (Inspired Prophets) অপেক্ষা জীবন্মুক্ত ঋষি অথবা বুদ্ধের স্থান উচ্চ এবং জীবন্মুক্ত ঋষি অথবা বুদ্ধের অপেক্ষা আদিষ্ট পুরুষের স্থান উচ্চ।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা আরও অবগত হইলাম যে, ভগবানের অংশ-সম্ভূত জীবলোক অবতার নহেন, ভগবানের বিভূতি সকল অবতার নহেন, আদিষ্ট মহাপুরুষগণ অবতার নহেন, জীবন্মুক্ত, ঋষি অথবা বুদ্ধ অবতার নহেন এবং আবিষ্ট মহাপুরুষও অবতার নহেন। হিন্দুশাস্ত্রে অবতারের এক বিশেষ অর্থ আছে।

আমাদের মনে স্বতঃ এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে যে, তাহা হইলে অবতারের বিশেষ অর্থ কি? হিন্দুরা কাহাকে অবতার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন? এখন এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে।

অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে বৈষ্ণব গ্রন্থে যেরূপ আলোচনা করা হইয়াছে, এইরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অবতারের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা,—"অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণংহ্যবতারঃ" অর্থাৎ অপ্রপঞ্চ হইতে যিনি প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তাঁহাকে অবতার বলে। জীবগোস্বামীর মতে "প্রাকৃত বৈভবে অবতরণং খল্ববতারঃ"—অর্থাৎ অপ্রাকৃত হইতে প্রাকৃত বৈভবে যিনি আসিয়া থাকেন, তাঁহাকে অবতার বলে। অবতারের উক্ত অর্থ (definition) মনে রাখিলে অবতারবাদ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইবে।

এখন প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—প্রপঞ্চ ও

অপ্রপঞ্চ কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইবে। সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে আমরা অবগত হই যে ভগবান্ প্রথমে আদিতত্ত্ব* পরে অনুপাদক-তত্ত্ব † সৃজন করিয়াছিলেন; তৎপরে তিনি পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্টি করেন। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। আদি ও অনুপদকতত্ত্বের পরিবর্ত্তে অন্যান্য শাস্ত্রে মহৎ ও অহঙ্কার তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। পঞ্চভূত হইতে সত্যাদি সপ্তলোক এবং সপ্ত পাতাল বিরচিত হইয়াছে। সপ্তলোক ও সপ্তপাতাল লইয়া চতুর্দ্দশ ভুবন গঠিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্য নাম ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডকে প্রপঞ্চ বা প্রাকৃত বলা হয়। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে বৈকুণ্ঠ অবস্থিত এবং তৎপরে গোলক অবস্থিত। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে—

"পাতালাদ্ ব্রহ্মলোকান্তং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতম।
ততউর্দ্ধং চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডাদ্ বহিরেব সঃ।
ততউর্দ্ধং চ গোলকঃ * * * * ।"

(দেবীভাগবত, ৯—৮—১০)

এই দুইটী শ্লোক আদি ও অনুপাদক-তত্ত্বে রচিত। দেবীভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"জলবুদ্‌বুদবৎ সর্ব্বং বিশ্বসংঘমনিত্যকম্।
নিত্যৌ গোলকবৈকুণ্ঠৌ প্রোক্তৌ শশ্বদকৃত্রিমৌ॥

(দেবীভাগবত—৯—১২—১৬)

সকল বিশ্বসমষ্টি জলবুদ্‌বুদের মতন অনিত্য। গোলক ও বৈকুণ্ঠ অকৃত্রিম ও চিরস্থায়ী। প্রতি প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু গোলক ও বৈকুণ্ঠের নাশ হয় না। ব্রহ্মাণ্ডকে প্রাকৃত বলে এবং প্রপঞ্চ বলে। বৈকুণ্ঠ ও গোলককে অপ্রাকৃত ও অপ্রপঞ্চ বলে। উহাদের অপর নাম পরমব্যোম। সেই পরমব্যোম হইতে—পুরাণের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, বৈকুণ্ঠ ও গোলক হইতে—যিনি অবতীর্ণ হন, তাঁহাকে অবতার বলে।

কাহার অবতার ?

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে, কে অবতীর্ণ হন? কে অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে, অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বাহির হইতে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে, অবতরণ করিয়া থাকেন? যদি বলি যে ভগবান অবতরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের মনে এই সন্দেহ উত্থিত হইয়া থাকে যে, ভগবান কি তাহা হইলে বিশ্বাতিরিক্ত (Transcendent) মাত্র, তিনি কি বিশ্বানুগ (Immanent) নহেন্? এই স্থলেই আমার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য Pantheismএর ভিতর পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। পাশ্চাত্য মতে ভগবান্ বিশ্বানুগ (Immanent) মাত্র। কিন্তু হিন্দুদিগের মত ঐরূপ নহে, তাঁহারা যাঁহাকে ভগবান বলেন, তিনি বিশ্বানুগ (Immanent) বটে এবং প্রপঞ্চাতীতও (Transcendent) বটে। তিনি যে কেবল মাত্র এই ব্রহ্মাণ্ডে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন, তাহা নহে, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও রহিয়াছেন। পুরুষ সূক্তে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"—তাঁহার এক পাদে জগৎ অবস্থিত, এবং অপর তিনটী পাদ অমৃত স্বরূপ স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। তিনি সগুণ নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ, তাঁহার চারি পাদ। তন্মধ্যে একপাদ লইয়া সগুণ এবং অবশিষ্ট তিন পাদ নির্গুণ ভাবকে লক্ষ্য করিতেছে। উক্ত তিন পাদে তিনি প্রপঞ্চাতীত (Transcendent) এবং অন্য পাদে বিশ্বানুগ (Immanent)।

* দেবীভাগবত—৭।৩২।২২—২৮

† প্রণববাদ।

অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে কে অবতরণ করিয়া থাকেন,তাহা অবধারণ করিতে হইলে ভগবদ্‌-সত্তার যে সকল বিকাশ আছে, তাঁহাদের স্বরূপ নির্ণয় করা উচিত। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, শাস্ত্রে কেবল একটী মাত্র সত্তার কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহাকে বলা হইয়াছে—"একমেবাদ্বিতীয়ং।" তিনি সকল প্রকার ভেদ রহিত, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। বেদান্ত ও উপনিষদ তাঁহাকে ব্রহ্ম আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, এবং পুরাণ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার দুইটী বিভাগ (aspects) আছে, সগুণ ও নির্গুণ। নির্গুণ বিভাগ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলা হয়। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের দ্বারা জগৎ রচনা হয় না বলিয়া তাঁহার সগুণ ভাবের কল্পনা করা হইয়াছে। সগুণ ভাবে তিনি মায়ার আবরণে আবৃত। উপনিষদ তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, "মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" (শ্বেতাশ্বতর)—তিনি মায়ার অধীশ, তাঁহার নাম মহেশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দময়। তিনি সংবিতের মহা সমুদ্র। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত তাঁহার যত প্রকার বিকাশ আছে, তাঁহারা ঐ সমুদ্রের বুদ্ বুদ্ মাত্র। অবতারতত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই তত্ত্বটী বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। সেই সগুণ ব্রহ্মের তিনটী রূপ শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে। উক্ত তিনটী রূপ লক্ষ্য করিয়া শ্রীধর স্বামী সাত্বক-তন্ত্র হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা,—

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণিরূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
প্রথমং মহতঃস্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ড সংস্থিতম্॥
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"

ভগবানের পুরুষাখ্য তিনটী রূপ; প্রথম পুরুষ মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা; দ্বিতীয় পুরুষ অণ্ডের মধ্যে অবস্থিত; তৃতীয় পুরুষ সকলভূতের অন্তঃস্থিত।

এই এক এক প্রকার কল্পনা অনুসারে তাঁহাকে এক এক পুরুষ বলা হয়। প্রথম পুরুষ মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব উদ্ভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তির দ্বারা তত্ত্ব সকল স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পুরুষের শক্তির দ্বারা ঐ সকল তত্ত্ব পরস্পর মিলিত হইয়া বিভিন্ন দেহ ও বিভিন্ন প্রকার লোক রচিত হইয়াছিল। ঐ সকল তত্ত্ব দ্বারা এক বিরাট দেহ রচিত হইয়াছিল, উহার আকার অণ্ডের ন্যায়। ঐ অণ্ডের নাম ব্রহ্মাণ্ড। দ্বিতীয় পুরুষ ঐ সমগ্র অণ্ডকে অনুপ্রাণিত করিয়া উহার মধ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পুরাণের ভাষায় ইঁহাকে বিরাট ও হিরণ্ময় পুরুষ বলা হয়। ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"এষহ্যশেষ সত্ত্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ।
আদ্যাবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে।"
৩।৬।৮

অর্থাৎ এই বিরাট্ পুরুষই সকল জীবের আত্মা এবং পরমাত্মার অংশ। ইনি আদ্য অবতার। যাবতীয় ভূতগণ ইঁহাতেই প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় পুরুষ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের এবং সমগ্র জীবের আত্মা। যখন জীবসকল পৃথক পৃথক ভাবে প্রাদুর্ভূত হয়, তখনই তিনি তৃতীয় পুরুষ হইয়া প্রতি জীবের আত্মা বলিয়া পরিগণিত হন। এই জন্য উক্ত হইয়াছে যে, তৃতীয় পুরুষ "সর্ব্বভূতস্থ।"

বিরাট্ অবতারকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে,—"এতান্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং"—অর্থাৎ তিনি অন্যান্য অবতারের কার্য্যাবসানে প্রবেশ স্থান এবং তিনি

তাঁহাদিগের অব্যয় বীজ স্বরূপ। প্রথম পুরুষ এক হইলেও, বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ভেদে বিভিন্ন। তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলা হয়।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, সগুণ ব্রহ্মকে শাস্ত্রে মহেশ্বর আখ্যা প্রধান করা হইয়াছে। তিনিই প্রথম পুরুষ। তিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ তাবৎ সৃষ্ট পদার্থের ঈশ্বর। আমরা কেবল মাত্র একটী সৌর জগতের কথা অবগত আছি, তাহাকেই আমরা ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া জানি, কিন্তু শাস্ত্রে এইরূপ অসংখ্য সৌরজগৎ অথবা ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব দেখিতে পাই।

যোগবাশিষ্ঠে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"যথা তরঙ্গা জলধৌ তমেবা সৃষ্টয়ঃ পর।
উৎপত্যোপত্য লীয়ন্তে রজাংসীব মহানিলে॥"

অর্থাৎ সমুদ্রে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ সকল আছে, সেইরূপ সৃষ্টিও অসংখ্য প্রকার আছে। মহানিলে ধূলিকণা সমূহের ন্যায় উহাদের উৎপত্যাদি হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"অণ্ডানাস্তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ।
ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটি কোটি শতানি চ॥"
(২।৭।২৭)

অর্থাৎ প্রকৃতিতে এইরূপ সহস্র সহস্র এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া নন্থ সাবরণাঃ।" (১০।৮৭।৪১) অর্থাৎ আপনি অনন্ত, অতএব ব্রহ্মাদি লোকপালগণও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হন নাই; এমনকি, আপনি ও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। সপ্তাবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড-সমূহও আকাশে ধূলিকণার ন্যায় আপনাতে যুগপৎ ভ্রমণ করিতেছে। ভাগবতের অনত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে, "সৃজতোহণ্ডানি কোটিশঃ, (১০।১৬।৩৯), অর্থাৎ, ভগবান্ বলিতেছেন যে, "আমি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছি।"

এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য অনন্ত। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশ ভুবন আছে; কিন্তু আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, কোন ব্রহ্মাণ্ডে বিংশতি, কোন ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চাশৎ, কোন ব্রহ্মাণ্ডে সপ্ততি, কোন ব্রহ্মাণ্ডে শত, কোনও ব্রহ্মাণ্ডে সহস্র, কোন ব্রহ্মাণ্ডে অযুত এবং কোন ব্রহ্মাণ্ডে বা লক্ষ ভুবন আছে। সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডবর্গে ব্রহ্মাদি লোকপালগণ নানারূপে বিরাজমান আছেন। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রাদি লোকপালগণ এক এক কল্পজীবী, কিন্তু অপর কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে ইন্দ্রাদি দেবগণ শত মহাকল্পজীবী এবং ব্রহ্মাদি লোকপালগণ পরার্দ্ধ মহাকল্পজীব। সেই সেই ব্রহ্মেন্দ্রাদি লোকপালগণ 'চিরলোকপাল' বলিয়া খ্যাত আছেন।

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব পৌরাণিক আখ্যায়িকা শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণ একদা দ্বারকাধামে সুধর্ম্মা-সভায় বিরাজমান আছেন, এমন সময়ে দ্বারাধ্যক্ষ আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, 'প্রভো! আপনার পাদপদ্ম দর্শনে অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মা দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন।' 'কোন্ ব্রহ্মা দ্বারে আসিয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।' ভগবানের এই বাক্য শ্রবণ মাত্র দ্বারপাল দ্বারদেশে আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, 'সনকাদির পিতা

চতুরানন আসিয়াছেন।' 'আনয়ন কর' শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে, দ্বারপাল ব্রহ্মাকে সভায় উপস্থিত করিলেন। ব্রহ্মা দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ?' ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন 'দেব! আগমনের কারণ পশ্চাৎ নিবেদন করিব। কিন্তু নাথ! অস্য' আপনি যে বলিলেন 'কোন্ ব্রহ্মা,' অগ্রে তাহারই রহস্য জানিতে ইচ্ছা করি। যেহেতু আমি ভিন্ন অন্য ব্রহ্মা নাই।' অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া সমস্ত লোকপালগণকে স্মরণ করিলে, তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইতে লোকপালগণ দ্রুতবেগে দ্বারকায় সমাগত হইলেন। তন্মধ্যে অষ্টবক্ত্র, চতুঃষষ্টিবদন, শতমুখ, সহস্রানন, লক্ষবদন ও কোটিবদন, বিরিঞ্চিগণ, বিংশতি বদন, পঞ্চাশদানন, শতমুখ, সহস্র মুখ, লক্ষ বাহু এবং লক্ষ শিরা রুদ্রগণ; লক্ষ লোচন এবং নিযুত নয়ন ইন্দ্রগণ, আর বিবিধাকৃতি ও বিবিধ ভূষণ অন্যান্য লোকপালগণ, কৃষ্ণের অগ্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পাদপীঠে প্রণত হইলেন। তখন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া চতুরানন বিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।"*

লিঙ্গপুরাণে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যাঃ অসংখ্যাতা পিতামহাঃ
হরয়শ্চ অসংখ্যাতা একএব মহেশ্বরঃ॥"

অর্থাৎ রুদ্রাদি অসংখ্য আছেন, ব্রহ্মা অসংখ্য আছেন, হরও অসংখ্য আছেন, কিন্তু মহেশ্বর কেবল মাত্র একজন। সমুদয় সৃষ্টির অর্থাৎ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরের নাম মহেশ্বর, এক একটী ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরের নাম মহাবিষ্ণু এবং এক একটী পৃথিবীর (Globe) ঈশ্বরের নাম বিষ্ণু। বিষ্ণু এক একটী পৃথিবীর ঈশ্বর (Planetary Logos), মহাবিষ্ণু এক একটী ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর (Solar Logos) এবং মহেশ্বর সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর (Central Logos)। এই মহেশ্বরের অপর নাম সগুণ-ব্রহ্ম। সগুণ ব্রহ্মের বিভিন্ন বিভাব (aspects) অনুসারে মহেশ্বর, মহাবিষ্ণু এবং বিষ্ণু আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে। মহেশ্বর প্রথম পুরুষ, মহাবিষ্ণু দ্বিতীয় পুরুষ এবং পৃথিবীর বিষ্ণু তৃতীয় পুরুষ। পৃথিবীর বিষ্ণুর অপর নাম শ্বেতদ্বীপের নারায়ণ।

গুণানুসারে আবার দ্বিতীয় পুরুষকে (Solar Logos) তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র। যে বিভাবে তিনি সৃজন করেন, সেই বিভাবকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মা বলা হয়, যে বিভাবে তিনি পালন করেন, সেই বিভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু * বলা হয় এবং যে বিভাবে তিনি সংহার করেন, সেই বিভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে রুদ্র বলা হয়।

শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যখন ব্রহ্মাণ্ডেরই সংখ্যা হয় না, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা রুদ্রেরই বা কেমন করিয়া সংখ্যা হইবে?

"সংখ্যাচেদ্ রজসামস্তি বিশ্বানাং নকদাচন।
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে॥"
(দেবীভাগবতে —৯।৩।৭,৮)

অর্থাৎ ধূলিকণার সংখ্যা হয়তো, বিশ্বের সংখ্যা হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদিরেও সেই প্রকার সংখ্যা হয় না। প্রতি বিশ্বে এইরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি বর্তমান আছেন।

---

* শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীলঘুভাগবতামৃত হইতে উদ্ধৃত।

* ইনি পৃথিবীর বিষ্ণু বা শ্বেতদ্বীপের নারায়ণ নহেন।—লেখক।

অবতারতত্ত্ব বুঝিতে হইলে পৃথিবীর বিষ্ণু (Planetary Logos), মহাবিষ্ণুর (Solar Logos) এবং মহেশ্বরের (Central Logos) ভিতর কি সম্বন্ধ আছে, তাহা সম্যকরূপে অবধারণ করা উচিত। আমাদের এই পৃথিবী গ্রহের বিষ্ণুকে শাস্ত্রে শ্বেতদ্বীপের নারায়ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উত্তর মেরু বা North pole এর নাম শ্বেত দ্বীপ। এই শ্বেত-দ্বীপের নারায়ণের কথা মহাভারতে এবং রামায়ণে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের ভাষায় বলিতে হইলে আমরা ইঁহাকে প্রজাপতি * বলিব। প্রজাপতিই এই পৃথিবীর অধীশ্বর (Planetary Logos)। যখন অবতারের প্রয়োজন হয়, তখন দ্বিতীয় পুরুষ অর্থাৎ মহাবিষ্ণু (Solar Logos) স্বয়ং অথবা শ্বেত দ্বীপের নারায়ণের দ্বারা (through the Planetary Logos) অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

এইজন্য আমরা বৈষ্ণব গ্রন্থে অবতার সম্বন্ধে দুইটী কথা পাইয়া থাকি—'অংশেন' ও 'দ্বারেন'। অর্থাৎ কোন কোন অবতার ভগবানের অংশ, তাঁহারা মহাবিষ্ণু বা Solar Logos হইতে আসিয়া থাকেন এবং অন্যান্য অবতার অন্যের দ্বারা অর্থাৎ যেমন শ্বেতদ্বীপের নারায়ণের দ্বারা অবতীর্ণ হন। (ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দেব।

শোক ও সান্ত্বনা।

ভাওয়ালের মধ্যম রাজকুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় গত ৬ই বৈশাখ বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য জয়দেবপুর হইতে সস্ত্রীক দার্জিলিং গিয়াছিলেন। হঠাৎ রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া সেই বন্ধু বান্ধবহীন বিদেশে বিভুঁয়ে ২৫শে বৈশাখ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে এই

শোক।

১

কি হইল হায়!

কে কবে বিশ্বাস করে, বিনা মেঘে বাজ পড়ে,
ও ত শুধু লোকে বলে কথার কথায়!
প্রভাত যখন হাসে, তখন কি নিশি আসে?
দিনে দু'পহরে কবে রবি অস্ত যায়?
সাগর পর্ব্বতে ভরা, এ বিপুলা বসুন্ধরা,
বিনা ভূমিকম্পে কাঁপে কে দেখেছে তায়?
ও ত শুধু লোকে বলে কথার কথায়!

কি হইল হায়।

সত্যই পড়েছে আজ, ভাওয়ালের শিরে বাজ,
বিনা ঝড়ে বিনা মেঘে আকাশের গায়,
ডুবেছে সোণার ছবি, ভাওয়ালের নব রবি,
বিনা রাহু, বিনা নিশি, বিনা কোয়াসায়!
সত্যই কি অভিশাপে, আজ যে ভাওয়াল কাঁপে,
ভূমিকম্প বিনা এবে রসাতলে যায়!
এ কি শুধু লোকে বলে কথার কথায়?

এ নহে কথার কথা, হায়, হায়, হায়,
এই গেল রাজা রাণী, হৃদয়ে অশনি হানি,
এখনো কাতর প্রাণ শত বেদনায়,
এখনো তাদের তরে, ভাওয়াল কাঁদিয়া মরে,
এখনো চক্ষের জলে বুক ভেসে যায়!
তাদের কাহিনী যত, এখনো যে অবিরত,
কত বলে কত শোনে, তবু না ফুরায়,
আজিও ভুলেনি লোকে, করে হায়, হায়! ৪

---

* উপনিষদের প্রজাপতি এবং পুরাণের প্রজাপতির ভিতর পার্থক্য আছে। উপনিষদের প্রজাপতি বিরাট পুরুষ বা Solar Logos এবং পুরাণের প্রজাপতি Planetary Logos,

৫

দু'দিন যায়নি, লোকে'না ভুলিতে তাহা,
হায় কি শুনিরে আজ ফিরে পুনরায়,
তরুণ কোমল কাচা, সরল সোণার বাছা,
কুমার রমেন্দ্র নাকি নিয়াছে বিদায়!
কি যে সে মোহন রূপ, কি লাবণ্য অপরূপ,
সে যেন শোভিয়াছিল শত পূর্ণিমায়,
বিধাতা দিছিল খালি, করুণা মমতা ঢালি,
হৃদয়ের তলে তলে দ্রব সুধা তায়!
হায় সে সোণার শশী, ভাওয়াল করিয়ে মসী,
অকালে ডুবিল কই মহা তমসায়,
কুমার রমেন্দ্র নাকি নিয়াছে বিদায়!

৫

আজি অই রাজপুরী ঘোর অন্ধকার,
কাঁদিছে ভগিনী ভাই, ঘরে ঘরে—ঠাঁই ঠাঁই,
কাঁদিছে স্বজন যত দাস দাসী আর!
কাঁদে বৃদ্ধা রাজমাতা, হারে ভাগ্য হা বিধাতা,
এই কি নিয়তি আহা আছিল তাহার,
শুধু কাঁদিবার লাগি, বেঁচে আছে সে অভাগী,
জ্বালাবে তাহার বুকে কত চিন্তা আর?
হায় রে বিধবা নব, শতদল শোকে দ্রব,
নীরব চেতনা হীন মুক্তকেশ তার,
যেন শোকে এলোমেলো শৈবালে জড়ায়ে গেলো,
লুঠিছে জন্মের মত উঠিবেনা আর!
আজি অই রাজপুরী শোকে অন্ধকার!

৬

সমস্ত ভাওয়াল ভরা ঘোর হাহাকার,
কাঁদিছে ভাওয়াল বাসী, সদা অশ্রু জলে ভাসি,
শোকের সাগরে যেন দিয়াছে সাঁতার!
কিবা হাটে কিবা মাঠে, যে শুনেছে পথে ঘাটে,
আকাশ ভাঙ্গিয়া শিরে পড়িয়াছে তার,
রমণী আনিতে জল, শুনে হেন অমঙ্গল,
কাঁকের কলসী ভাঙ্গে খাইয়া আছাড়!
কাঁদে মাতা ছেলে কোলে, জননী সন্তান ভোলে!—
শত পুত্র-শোক যেন হইয়াছে তার,
কাঁদে যত কাণা খোঁড়া, সমস্ত ভাওয়াল যোড়া,
কাঁদে যত দীন দুখী দীন পরিবার!
অনাথ হইল তারা, গেল আজ অন্ন মারা,
কোথা যাবে অভাগারা কে দিবে আহার;
করুণ কাতর স্বরে, হাহাকার ঘরে ঘরে,
সমস্ত ভাওয়াল আজ শোকে অন্ধকার!
কাঁদে তরু লতা বন, হাহা করে সমীরণ,
শোকে শুষ্ক মেঘ নাহি বর্ষে বারিধার,
শোকে শুষ্ক হ'ল মাটী, বিদীর্ণ শতধা ফাটি,
বিধাতা, ভাওয়াল স'বে কত শোক আর?

৭

হে কুমার, হে রমেন্দ্র, হে ভাওয়াল-রাজ!
ছাড়ি প্রিয় পরিজন, অতুল ঐশ্বর্য্য ধন,
ছাড়ি রাজাসংহাসন ছাড় রাজ-কাজ,
ছাড়ি এই স্বর্ণভূমি, কোথায় গিয়াছ তুমি,
কোথা সে অজ্ঞাত দেশে রহিয়াছ আজ,
কোথা সে দুর্জ্জয়াশৃঙ্গ, হিমাদ্রির হিমশৃঙ্গ,
কোন্ সে কন্দর অন্ধ গিরি গুহা মাঝ,
কোথা সেই চিতা ভূমি রয়েছে একাকী তুমি,
কোন্ গিরি নদী তটে করিছ বিরাজ!
ফিরে না আসিলে দেশে, বল কিবা মনোক্লেশে,
কিবা তব ছিল দুঃখ কিবা ক্ষোভ লাজ,
বিরত বিলাস ভোগে, কি সাধনা মহা যোগে,
বাহিরিলা শাক্যসিংহ শাক্য যুবরাজ,
নির্জ্জনে সাধিতে কিহে, সে তপস্যা দরীগৃহে
ছাড়িলে সংসার, পরি সন্ন্যাসীর সাজ?
তবে, দেখো উদ্ধারের পথ, ভাওয়ালের ভবিষ্যৎ
ভাওয়াল কপিলবাস্তু শোকে ভাসে আজ!

৮

কিম্বা এতদিন পরে পড়িল কি মনে,
স্নেহ মমতার খনি, জননী বিলাসমণি,
আননে আনন্দে হাসি করুণা নয়নে;
স্নেহের জনক মুখ, স্নেহ পরিপূর্ণ বুক,
স্নেহের ক্ষীরোদসিন্ধু খেলে সমীরণে;
মনে কি পড়িল কহ, সে রাজর্ষি পিতামহ,
ভাওয়ালের চিরপ্রিয় কালী নারায়ণে?
যাইতে তাদের কাছে, হিমালয়ে পথ আছে,
যে পথে পাণ্ডব গেল অমর ভুবনে,
তুমিও সে পথে হায়, গেলে নাকি অমরায়,
গেলে সে মায়ের কোলে স্নেহ নিকেতনে;—
দেবতার প্রিয় দেশ ত্রিদিবে—নন্দনে?

যাও তবে দুটী কথা বলো গিয়ে যার,
বলো গিয়ে পিতামহে, কি পাপে ভাওয়াল দহে,
হতভাগ্য ভাওয়ালের কি হবে উপায়!
কত আর আছে বাকি, নাহি সীমা শেষ নাকি,
ভাওয়াল জ্বলিবে নাকি চির যাতনায়,
থাকিলে উপায় তার, করে যেন প্রতিকার,
কয়ো ভাওয়ালের কথা তাহাদের পায়,
কহিও সকল কথা, প্রজার পালন প্রথা,
যা দেখিয়া গেলে তাহা কয়ো সমুদায়!
আজিও তাদের তরে, ভাওয়াল কাঁদিয়া মরে,
আজিও ভাওয়ালবাসী করে হায়, হায়,
কয়ো এ সোণার দেশ রসাতলে যায়!

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পত্নী
শ্রীযুক্তা বিভাবতী দেবীর প্রতি

সান্ত্বনা।

১

জন্মিলে মরিতে হয়, অমর কেহই নয়,
অবনীর তাই মর্ত্ত্য নাম,
দুই দিন আগে পাছে, যার যে নিয়তি আছে,
লভে শেষে অনন্তে বিশ্রাম!
আত্মার বিনাশ নাই, দেহ শুধু হয় ছাই,
আত্মা চির অজর অমর,
পরম আত্মার সনে, মিশে জীব-আত্মাগণে,
[illegible] শান্তি মরণের পর!
অতি ক্ষুদ্র নদ নদী, সমুদ্রে মিশিল যদি,
নাহি থাকে ভিন্ন ভাব আর,
নাহি থাকে দ্বিধা দ্বিত্ব, অভেদ অনন্ত নিত্য,
সে হয় বিশাল পারাবার!
অয়ি দেবী বিভাবতি, তেমনি তোমার পতি,
মিশিয়াছে বিশ্বপতি সনে,
আজি হতে বিশ্বপতি, তোমার সে প্রিয় পতি,
ভাব তাঁরে জীবনে মরণে!
তুমি ত বিধবা নহ, কেন অমঙ্গল কহ,
কেন তুমি কর হাহাকার,
দেখ সে জগৎ পতি, তোমার সে প্রিয় পতি,
হৃদয়েতে করেন বিহার!
সে তোমারে ছাড়া নাই, সেত নহে ভিন্ন ঠাঁই,
কেন গো বিরহ ভাব মনে,
সে যে গো তোমার লাগি, আছে নিশি দিন জাগি
তোমার সে নিদ্রা জাগরণে!
চরণ-কমলে তাঁর, দেও প্রীতি-উপহার,
নারীর জীবন সাধ যত,
বিলাস বাসনা আশা, যত আছে ভালবাসা,
দেও তাঁরে প্রেমিকার মত!
দেহ আত্মা—প্রাণ মন, কর তাঁরে সমর্পণ,
নিষ্কাম সাধনা কর তাঁর,
পৃথিবী তোমার জন্য, হইবে কৃতার্থ ধন্য,
কোটিকুল হইতে উদ্ধার!

২

নহ তুমি পুত্রহীনা, অভাগা দুর্ভাগা দীনা,
কেন ভেবে শোকে ম্রিয়মাণ,
এই বিশ্ব এ সংসার, তোমারি মা পরিবার,
মোরা প্রজা তোমারি সন্তান!
লহ জননীর মত, জগজ্জননী ব্রত,
কর সদা পর উপকার,
যে থাকে বিপদগ্রস্ত, বাড়ায়ে দয়ার হস্ত,
কর তারে বিপদে উদ্ধার!
উজলি করুণা-বিভা, ভাওয়ালে নূতন দিবা—
কর মা নূতন দিনমান,
আমরা ভাওয়ালবাসী, নিত্য অশ্রুজলে ভাসি,
আমরা যে তোমারি সন্তান!

৩

পিতৃ হারা মাতৃহারা, অনাথ সন্তান যারা,
অর্থাভাবে শিক্ষায় বঞ্চিত,

তুমি মা করুণ-প্রাণে, তাহাদের অর্থ দানে,
বিদ্যায় কর মা বিভূষিত !
উজলি জ্ঞানের বিভা, ভোর কর নবদিবা,
অজ্ঞানতা কর অবসান,
আমরা ভাওয়ালবাসী, দুর্দ্দশা-সাগরে ভাসি,
আমরা যে তোমারি সন্তান !

৪

অন্নহীন বস্ত্রহীন, যাহারা দরিদ্র—দীন,
দুর্ভিক্ষে করিছে হাহাকার,
যাহারা আতুর অন্ধ, নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ,
সংসারে কেহই নাই যার,
তুমি মা দয়ার দানে, তাদেরে বাঁচাও প্রাণে,
অন্নপূর্ণা কর অন্ন দান,
উজলি স্নেহের বিভা, হাসাও নূতন দিবা—
ভাওয়ালে নূতন দিনমান।

৫

যেথানে মা অত্যাচারে, অবিচারে, ব্যভিচারে,
কাতরে কাঁদিছে প্রজাগণ,
শুনিবার কেহ নাই, বলিবার নাহি ঠাঁই,
রোধে ক্রোধে প্রাণের বেদন !
তুমি মা করুণ প্রাণে, সে কথা শুনিও কাণে,
পাপীরে করিও দণ্ড দান,
উজলি ন্যায়ের বিভা, ভাওয়ালে নূতন দিবা—
কর মা নূতন দিনমান !

৬

যাহারা মা শোকে রোগে, দারুণ যাতনা ভোগে,
জলফোটা দিতে নাই কেহ,
তাদের লইয়ে তত্ত্ব, দেওমা ঔষধ পথ্য,
মা হয়ে তাদেরে কর স্নেহ !
স্নেহ মমতার বিভা, উজলি স্বর্গের দিবা,
কর মা নূতন দিনমান,
আমরা ভাওয়ালবাসী, আবার আনন্দে হাসি,
আমরা হে তোমারি সন্তান !

৭

বাণিজ্যে নাহি মা মতি, কৃষি শিল্প অধোগতি,
দুর্দ্দশার নাহি সীমা শেষ,
উপায় কর মা এর, তোমার এ ভাওয়ালের,
তুমি লক্ষ্মী—তোমার এ দেশ !
উজলি ঐশ্বর্য্য-বিভা, হাসাও স্বর্ণ দিবা,
কর মা নূতন দিনমান,
আমরা ভাওয়ালবাসী, আবার আনন্দে হাসি,
আমরা যে তোমারি সন্তান !

৮

যে দেশে সাবিত্রী লীলা, দময়ন্তী জনমিলা,
জনমিলা সীতা অরুন্ধতী,
যাদের চরণ স্পর্শে, পবিত্র ভারতবর্ষে,
শত তীর্থে পুণ্য বসুমতী !
যে দেশে জন্মিলা মীরা, রাজপুত-রাজ-ইন্দিরা,
ব্রহ্মচর্য্য তপস্যার বেশে,
পতিপদে রাখি মতি, পতি রূপে বিশ্বপতি,
চির প্রেমে পূজিলা উদ্দেশে।
তুমিও তাদেরি মেয়ে, সে দেশে জনম পেয়ে,
তুমিও ত মহাপুণ্যবতী,
লহ মা তাদেরি মত, সে তপস্যা পুণ্যব্রত,
ভগবানে অনন্ত ভকতি !
যাবে দুঃখ যাবে শোক, পাবে সে বৈকুণ্ঠলোক,
চির সুখ চির শান্তি ধাম,
বিশ্বের মঙ্গলে আশা, ঢাল বিশ্বে ভালবাসা,
ভজ বিশ্বপতি হরিনাম !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বিবাহের উপদেশ।

২রা আষাঢ় বুধবার, ১৩১৬।

বাবা * *, মা * *, তোমরা আজ বিধাতাকে সাক্ষী করিয়া অতি গুরুতর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলে। বিধাতা তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহার কৃপায় তোমাদের জীবন যেন মধুময় হয়। তাঁহার কৃপাকে সম্বল করিয়া তোমরা নির্ভয়ে সংসারে পদ নিক্ষেপ কর। তোমাদের জীবনে তাঁহার কৃপার জয় হউক।

নীরবে কর্ত্তব্য পালনের জন্য বিধাতা সকলকেই ইঙ্গিত করিতেছেন। তিনি যেমন নীরবে জগতের সেবাভার বহন করিতেছেন, তাঁহার ইঙ্গিতও, তেমনি, নরনারীকে সেবাব্রত পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছে। মানুষের সৃষ্টি স্বার্থসাধনের জন্য নয়, পরার্থ এবং পরমার্থ সাধনের জন্য। পরার্থ এবং পরমার্থ সাধন, জীবনবৃক্ষের দুটী অমৃত ফল। আপনার ন্যায় ভাবিয়া যে পরের মঙ্গলসাধন করিতে পারে, সে-ই তাঁহার সুপুত্র ও সুকন্যা,—সে-ই পরমার্থ সাধনের অধিকারী। তিনি তোমাদিগের জন্য তাঁহার অমূল্য সৃষ্টির কত কি ব্যয় করিয়াছেন, আজ বিশেষ ভাবে চিন্তা কর, এবং তাঁহার অমূল্যদানের কি প্রতিদান করিবে, আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে, তাহার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হও। এ দেশের কত নরনারী স্বার্থ সাধনে তৎপর, একবার চিন্তা কর। এদেশের কত নরনারী স্বদেশকে ভুলিয়া রহিয়াছে—তাহা স্মরণ কর। এদেশের কত শত নরনারী কুশিক্ষা ও অধর্ম্মে নিমজ্জিত, একবার ধারণা কর। আজ যদি নবব্রত গ্রহণের জন্য তোমরা উদ্বুদ্ধ হইলে, তবে আমি আহ্বান করিতেছি, বিধাতার ইঙ্গিত আজ বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম কর,—তিনি বলিতেছেন, তোমরা দুয়ে মিলিয়া একাত্মক হইয়া কেবল জগতের সেবা করিবে,—পরকে আপনার করিয়া তাহাদের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হইবে।

উপদেশ অনেকে শুনে, কিন্তু দুদিন পরে অনেকেই ভুলিয়া যায়। ভুলিয়া গিয়া সাংসারিকতার পাপে নিমজ্জিত হয়। তোমাদের জীবনেও যদি তাহাই হয়, তবে বৃথা বিধাতার এই সুন্দর আয়োজন! তিনি তোমাদিগকে কেন মিলিত করিতেছেন, তাহা কি শয়নে স্বপনে নিয়ত চিন্তা করিবে না? তাঁহার নিগূঢ় উদ্দেশ্যের মর্ম্মভেদ করিতে তোমরা কি চেষ্টা করিবে না? আমি তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে চেষ্টা করিয়া ইহাই বুঝিয়াছি যে, তোমাদের মিলনের উদ্দেশ্য কেবল "রাজবাড়ী"র উন্নতি সাধন। পুণ্যশ্লোক ৺ ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পূত নাম আজ বিশেষ ভাবে মনে জাগিতেছে। তিনি একসময়ে রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানের উন্নতির জন্য ৩০টী অবৈত্তিক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সেই লুপ্ত-স্মৃতিকে জাগাইবার জন্য বিধাতার এই আয়োজন। তোমরা এ কথা বিশেষ ভাবে আজ হৃদয়ঙ্গম কর। যদি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিতে না পার, তোমাদের জীবন সাধারণ মানুষের ন্যায় হইবে, এবং সেই চির-বিশেষের বিশেষত্ব অন্ধকারে লুকা-

য়িত হইবে, তাঁহার সুপ্রসন্ন মুখ আর তোমরা দেখিতে পাইবে না। সুতরাং তোমরাও মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে।

এ দেশের সনাতন শাস্ত্র চিরদিন ঘোষণা করিয়াছে যে, ভক্তের অভ্যুদয় ভগবানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। ভক্ত কে?—একথার উত্তরে শাস্ত্র বলেন, যাহাকে দেখিলে ভগবানকে মনে হয়, তিনিই ভক্ত। ভগবান কোথায়? তিনি তাঁহার সৃষ্ট নর-নারী, জীব-জন্তুতে ওতপ্রোতভাবে বিমিশ্রিত, —অথবা অনন্তরূপিণী অনন্ত প্রকৃতিতে প্রস্ফুটিতা। সুতরাং প্রকৃত ভক্ত কে, এক-থার উত্তর এই, যে জীব ও শিবের একত্ব জ্ঞানে বিভোর হইয়া জীবের মঙ্গলের জন্য দেহপাত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যে এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ—তাহার মুখে কথাটী নাই, ফল-নিরপেক্ষ হইয়া,নীরবে,নিষ্কাম ভাবে,সে কেবল খাটিয়া খাটিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে অবি-রক্ত, সে অবিভক্ত, সে অবিচলিত, সে অহে-তুক কর্ম্ম সাধনায় বদ্ধপরিকর। তাহার চরিত্রের কোনপ্রকার বাহ্য প্রকাশ নাই, তাহার কৃতকর্ম্মের কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই—লোক-রঞ্জনের জন্য সে উৎফুল্ল নয়, সে প্রশং-সার তুরী ভেরীর নিনাদ শ্রবণের জন্য সংবাদ-পত্রের পানে তাকাইয়া থাকে না, অথবা নির্লজ্জের ন্যায় আপন প্রশংসা আপনি গাইয়া বেড়ায় না। সে আপনাতে আপনি গুপ্ত, অথবা অনন্ত জন-সঙ্ঘে লুপ্ত, অথবা সংসার-নিরঞ্জন-তটে দাঁড়াইয়া সে কেবল জীবের উদ্ধারের কল্যাণ-গীতা উচ্চারণ ও দুনয়নে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। তিনি খ্রীষ্টই হউন, বা বুদ্ধই হউন, চৈতন্যই হউন বা ম্যাট্সিনিই হউন, তিনি ডোরাই হউন বা জেনীই হউন, ১—চিরকাল নরনারী তাঁহাদের নাম ভক্তির সহিত স্মরণ না করিয়া পারিবে না। তাঁহারা মানবদেহে অমর ও অক্ষয় চিদাভাস—অথবা তাঁহারা মানবদেহে চিন্ময় দেবলীলা। সে সব কথা বলিতে আমার রসনা বচন ভোলে, জিহ্বা আড়ষ্ট হয়, নয়নে অশ্রু ঝরে। আমার বড় সাধ হয়,আমি এই মর্ত্তাধামে আবার সেই-রূপ ভক্তের অভ্যুদয় দেখি। কিন্তু কত কত স্থান খুঁজিয়া আসিলাম, সে দৃশ্য কোথাও দেখিলাম না। সে দৃশ্য চিরকাল আমার কল্পনাতেই রহিয়া গেল। আজি বার্দ্ধক্যের দ্বারে পৌঁছিয়াও, কিন্তু, সেই মনোমোহন দৃশ্য দেখিবার বাসনাকে একেবারে বর্জ্জন করিতে পারিতেছি না। * * আমার বড় সাধ হয়, তোমাতে আমি সেই দৃশ্য দেখি। যাহা-দের হৃদয়ের ঘরে অনেক বিদ্যা বুদ্ধি আছে, তাহারা বিদ্যাবুদ্ধির গৌরবে স্ফীত, সেখানে ভক্তি ঠাঁই পায় না। যাহাদের দেহে রূপ আছে, তাহারা রূপের অহঙ্কারে মজিয়া থাকে, এই ধরাকে অবহেলার চক্ষে দেখে, সেখানেও জীব বা শিবভক্তি স্থান পায় না। আর যাহাদের অনেক ঐশ্বর্য্য আছে, তাহারা আত্মহারা, তাহারা মানুষকে পশুর অপেক্ষাও হেয় মনে করে, সেখানে মানবের কল্যাণ-কামনা কিরূপে স্থান পাইবে? তাহা অসম্ভব। জানিও, প্রেয়ের রাজ্য ধ্বংস না না হইলে শ্রেয়ের রাজত্ব আরম্ভ হয় না। হায় অহঙ্কার, মানবঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা এই বিশাল বিশ্বকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে—এখন পরসেবা কুসংস্কারে পরিণত, ভক্তি এখন ভণ্ডামিতে পরিসমাপ্ত। এহেন দুর্দ্দিনেও আমি বড় আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি—* *, তোমার দ্বারা অসাধ্য সাধিত হইবে। কেননা, তোমার বাহ্যরূপ নাই, তোমার তেমন বিদ্যা-

বুদ্ধি নাই, তোমার ঐশ্বর্য্য নাই, বিলাসিতায় তোমার মন নাই,—গর্ব্বিত মানুষের প্রিয় যাহা,তাহা কিছুই নাই। বুঝিবা এইজন্ত, তোমার হৃদয়ে হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি কিছুই নাই—আছে কেবল প্রেমের প্রভাব। তোমার মনে কামনা ও বাসনার উত্তেজনা নাই, বিলাসিতার স্পৃহা নাই,—আছে—নীরব সাধনা।—ভাল খাইব, ভাল পরিব বলিয়া কখনও ত একটুও আবদার কর নাই। আত্মবর্জ্জনই তোমার স্বভাব—আমার পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া, বুঝিবা, কেবল এই প্রার্থনাই করিয়াছ,খাটিয়া খাটিয়াই যেন জীবন পাত হয়। খাটিয়াছও ত তুমি অনেক!! সেই খাটুনীর পুরস্কার—তোমাকে সীমা হইতে অসীমে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, ক্রমে ক্রমে "রাজবাড়ী"র কথা ভুলিয়া, রাজরাজেশ্বরের "বাড়ীর", কথা ভাবিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে তোমাকে "বড়কু" এবং "ছোটকুর" কথা ভুলিয়া—অগণ্য নরনারীর জন্ত খাটিবার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে;—তাই বিধাতার এই আয়োজন। তাই বলিতেছি, একবার প্রেমাঞ্জন চক্ষে লেপিয়া বিশ্ব-রাজবাড়ীর চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখ—কত "বড়কু", কত "ছোটকু" তোমার সেবা পাইবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। আজ ঐ নির্ম্মল আকাশের দিকে চাহিয়া দেখ, সাধ্বী নিতম্বিনী আজ তোমাকে জগতের দ্বারে বিক্রয় করিবার জন্ত দাঁড়াইয়া ইঙ্গিত করিতেছেন—আর আমরা তোমাকে কেবল সেবাভূষণে ভূষিতা করিয়া আজ সংসারের সেবার জন্ত উৎসর্গ করিতেছি। চাহিয়া দেখ—জগজ্জননী আজ তোমাকে, নিরাভরণা * *, তোমাকে অপূর্ব্ব সেবাধর্ম্মে ভূষিতা করিয়া দিতেছেন। আজ এবাড়ীর আর সকল শিক্ষা, সকল বিশেষত্ব পরিত্যাগ করিয়া জগজ্জননীর সেবাধর্ম্মে ভূষিতা হইয়া সংসারে পদনিক্ষেপ কর। দেখিও—মায়ের আদেশ কখনও ভুলিও না;—দেখিও কখনও নিজত্ব সাধনে মজিয়া মায়ের ইঙ্গিত ভুলিও না। মা জগজ্জননী তোমাকে আজ বিশেষভাবে আশীর্ব্বাদ করুন।

বাবা * *, তুমি আজ কি লইয়া ঘরে ফিরিতেছ,এতক্ষণ পর,বুঝিতেছ কি? রূপ নয়, বস্তা বুদ্ধি নয়, ঐশ্বর্য্য নয়—লইয়া চলিয়াছ এমন একখানি হৃদয়, যাহা ভরা আছে কেবল সেবা। সেবার রূপান্তরিত কথা কি তাহা জান কি? তাহাই ভক্তি। ভক্তিকে যখন ঘরে লইয়া যাইতেছ, তখন তোমাকে কি কঠোর সাধনা করিতে হইবে, তাহা বুঝিতেছ কি? অনেক সময় গেল—আর কোন[illegible] ধৈর্য্য থাকা সম্ভব নয়। এক কথায় কর্ত্তব্য বলিয়া দেই, শান্তিতে থাকিতে হইবে। তোমাকেও সেবাধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। এ ব্রত বড় কঠোর ব্রত—কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে, মা * *, তোমাকে সাহায্য করিলে তুমি এই ব্রতপালনে সক্ষম হইবে। আমার বিশ্বাস আছে, জগন্মাতা তোমাকে বিশেষ রূপ সাহায্য করিবেন। আমার শেষ কথা এই, —* *-কে আদর করিও, যত্ন করিও, হাত ধরিয়া লইয়া চলিও, তোমার জীবনে অসম্ভব সম্ভব হইবে। জগজ্জননী তোমাকেও আজ বিশেষভাবে আশীর্ব্বাদ করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রকৃতই স্বধর্ম্মরত, শাস্ত্রদর্শী, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয়ের রোগ মুক্তির চেষ্টার ফলে স্বর্গীয় গিরিজা প্রসন্নের হৃদয়ের একটা মহান ভাব পরিস্ফুরিত হইয়াছিল। উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের সংসর্গ লাভ করিয়া, তাহার ধর্ম্ম জীবনের সৎকথা শ্রবণ করিয়া, তাহার পূত চরিত্রের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকি। গিরিজা-প্রসন্ন সেই উন্নত হৃদয়ের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া কেবলমাত্র কবিরাজ মহাশয়ের পরিবারবর্গকেই সুখী করেন নাই, তিনি স্থির করিতে পারিয়াছিলেন, কবিরাজ মহাশয় তাহার দেশবাসীকে সুখী করার ও গৌর-বান্বিত করার উপযুক্ত পাত্র। তাই তিনি তাহার পীড়ার সময় সহোদর ভ্রাতাকে পাঠা-ইয়া তাহার দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন। গিরিজাপ্রসন্নের সেই অনুমানিক সিদ্ধান্ত কি তদ্দেশে সত্য বলিয়া অবধারিত হইতেছে না? কবিরাজ মহাশয় উপকৃত হওয়ায় গিরিজাপ্রসন্নের জন্মস্থান সিদ্ধাকাটী উপকৃত হইয়াছে। যিনি জন্ম-ভূমিকে উন্নত করিতে চাহেন, তিনি প্রকৃতই মহৎ লোকের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া থাকেন।

অধীনস্থ লোকের পদোন্নতির চেষ্টা।

লোকের উন্নতির পথ খুলিয়া দেওয়ার জন্যই বা তাহার কতদূর অকৃত্রিম যত্ন ছিল! তাঁহার বাটীস্থ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের নর-মাল-পরীক্ষোত্তীর্ণ ভূতপূর্ব্ব হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয় উপযুক্ত বেতন পাইতেন না। তাহার সাংসারিক অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয় ছিল, তাহাকে সেই সময় কতকগুলি যুবকের পড়ার খরচ ও গৃহব্যয় বহন করিতে হইত। গিরিজাপ্রসন্ন একদিন তাহার শিক্ষার পরিচয় ও অবস্থার অসচ্ছলতা বিদিত হইয়া কলিকাতা একটী চাকুরী স্থির করিয়া দিলেন। তাঁহার ষ্টেটের কয়েকজন কর্ম্মচারী কার্য্যে যেরূপ দক্ষ ছিল, তদ্রূপ অর্থোপায় করিতে পারিত না। গিরিজাপ্রসন্নও তখন তাহাদিগকে উপযুক্ত মাহিয়ানা দিয়া রাখিতে সমর্থ না হওয়ায়, অন্যত্র তাহাদিগের চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

উক্ত পণ্ডিত মহাশয় ও কর্ম্মচারী প্রভৃতির পদত্যাগে সিদ্ধকাটীর স্কুল ও গিরিজা প্রসন্নের ষ্টেট ক্ষতিগ্রস্ত হইল। গিরিজা-প্রসন্ন সে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহাদের পদোন্নতির উপায় স্থির করিয়া দিতে পশ্চাৎ-পদ হইলেন না! স্বকীয় স্বার্থ হানির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যিনি পরের উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দিয়া সুখী, তিনি কি যথার্থই উদার নহেন? আমাদের পুরাতন কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, গিরিজা বাবু কলিকাতায় বাস করার সময় তিনি একটী চাকুরীর জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। গিরিজা বাবু কিছু দিন পরে তাহার একটী চাকুরী স্থির করিয়া তাহাকে তথায় অবিলম্বে উপস্থিত হইবার জন্য পত্র লেখেন। সে পত্র খানি গিরিজা বাবুর ৩য় ভ্রাতার হস্তগত হয়। তখন তিনিই জমিদারী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন—

চন্দ্রকান্ত রায় চাকুরী পরিত্যাগ করিলে ষ্টেটের কার্য্য ভাল রূপে নির্ব্বাহিত হইবে না, তিনি সে পত্র খানি গোপন করেন। কিছু দিন পরে উক্ত চন্দ্রকান্ত রায় সেই পত্র খানি গিরিজা বাবুর ৩য় ভ্রাতার বাক্সের মধ্যে প্রাপ্ত হয়েন, তখন গিরিজা বাবুর ৩য় ভ্রাতা বলেন যে, "পত্র আমিই গোপন করিয়াছিলাম। আপনারা সকলে ক্রমশঃ চলিয়া গেলে ষ্টেটের কার্য্য চলিবে কিরূপে?" গিরিজা বাবু যোগ্য লোকের পুরস্কারের জন্য এইরূপই স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে জানিতেন, বৈষয়িক লোকের নিকট এইরূপ দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় না বোধ হইতে পারে, কিন্তু যিনি বিষয়ে নিস্পৃহ, নিঃস্বার্থপর, তিনি কি এইরূপ মহৎ অনুষ্ঠানে মোহিত না হইয়া থাকিতে পারেন?

গিরিজাপ্রসন্নের পাঠ্যজীবনের একটী স্বজাতির প্রতি বাৎসল্য-সূচক ঘটনার উল্লেখ করিয়াই এই স্থলে তৎ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

স্বশ্রেণীর লোকের প্রতি অনুরাগ।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খান্দারপাড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার রায়ের বাসস্থান। তিনি তাহার আত্মীয় হাইকোর্টের উকীল ৬ চন্দ্রকান্ত সেন এম্‌-এ, বি-এল মহাশয়ের ব্যয়ে কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারী পড়িতেন। কোন কারণ বশতঃ বসন্তকুমার আত্মীয়বর্গের কেহ তাহাকে একটা নীচতামূলক কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন! বসন্ত বাবু তাহার আত্মীয়ের অনুরোধ উপেক্ষা করায় তাহার আত্মীয় ক্রোধান্ধ হইয়া বিদ্যাভ্যাস খরচ বন্ধ করিয়াছেন। বসন্ত বাবু গিরিজাপ্রসন্নের এক সমাজের লোক। বসন্ত বাবু তাহার আত্মীয়ের হীন ব্যবহারে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া উহা গিরিজাপ্রসন্নের কর্ণগোচর করেন। এবং ঐ ব্যয় বন্ধ হওয়ায় তাহার যে চিরকালের জন্য পাঠ বন্ধ করিয়া জীবনের অনুসরণীয় পথভ্রষ্ট হইয়া ভবিষ্যতে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে, তদাশঙ্কায় বিলাপ করিতে থাকেন। গিরিজাপ্রসন্ন ঘটনাটী শ্রুত হইয়া বসন্ত বাবুকে বলিলেন "আপনার আত্মীয়দের অন্যায় অনুরোধে আমি আন্তরিক দুঃখ অনুভব করিতেছি, আপনার কোন শঙ্কা নাই। আমার এই বাসায় থাকিয়া আপনি বিদ্যার্জ্জন করুন, এজন্য আমি যদি বাড়ী হইতে অতিরিক্ত ব্যয় গ্রহণ নাও করিতে পারি, তাহা হইলেও আপনার কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না,—আমরা বিদ্যার্জ্জনের জন্য যে ব্যয় পাইয়া থাকি, তাহা দ্বারাই আপনার খরচ নির্ব্বাহ হইবে।

বসন্ত বাবু গিরিজাপ্রসন্নের এই মহৎ উক্তি শ্রবণ করিয়া ভগ্ন হৃদয়ে আশাতীত বল প্রাপ্ত হইলেন। এবং তাহার বাসায় অবস্থান করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতে লাগিলেন। বসন্ত বাবু কিছুকাল ঐ বাসায় বাসকরার পরই তাহার আত্মীয়গণ তাহার সঙ্গে আপোষ করিয়া মনোমালিন্য দূর করিয়া ফেলেন ও পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্যাভ্যাসের ব্যয় বহন করিতে সম্মত হওয়ায়, বসন্ত বাবু আর গিরিজাপ্রসন্নের বাসায় অবস্থান সঙ্গত বোধ না করিয়া, অন্যত্র থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। গিরিজাপ্রসন্ন পাঠ্যাবস্থায়ই পরোপকার করিতে গিয়া এইরূপ স্বার্থ বলিদানে কৃতসঙ্কল্প হইতেন! পরকে উন্নত দেখিয়া তিনি কি আনন্দ অনুভব করিতেন, তাহা আমরা

কল্পনাও করিতে পারি না, ইহাইত প্রকৃত মহত্ব!

বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়ভাগ।

সকল প্রকার সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র চাই, বরিশাল সাহিত্য সাধনার উপযুক্ত নহে, এই জন্য বোধ হয় গিরিজাপ্রসন্ন স্থিরীকৃত পথে অগ্রসর হইতে কিছু বাঁধা প্রাপ্ত হইতেছিলেন। কবিবর মিল্টন বলিয়াছেন, মন স্বর্গকেও নরকে পরিণত করিতে পারে, নরককেও স্বর্গের অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। বঙ্গসাহিত্যসেবী লোকাভাবে বরিশাল তখন গিরিজাপ্রসন্নের নিকট কিরূপ অপ্রীতিকর বোধ হইতে পারে, তাহা সাহিত্যসেবী মাত্রেরই অনুধাবনীয়। গিরিজাপ্রসন্নের তেজস্বী মন সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত হইল না। তিনি আদালতের কার্য্যে অযথা কালক্ষেপ না করিয়া অধ্যয়ন ও পুস্তক রচনায় বিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। এই সময় দেশপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত এম্-এ বি-এল মহাশয় ও পরলোকগত বরিশালের প্রধান উকীল প্যারীলাল রায় বি-এল ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ এম্-এ বি-এল্ মহোদয়গণের সঙ্গে গিরিজাপ্রসন্ন সুপরিচিত হয়েন। গিরিজাপ্রসন্ন বরিশালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল ৺ প্যারীলাল রায়কে ভক্তি করিতেন। প্যারী বাবুও তাঁহার অসাধারণ গুণে বিমোহিত হইয়া পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। গিরিজাপ্রসন্নের মৃত্যুপলক্ষে স্মরণার্থ সভায় প্যারী বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া যে দুঃখপূর্ণ শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শোকোচ্ছ্বাসে গিরিজাপ্রসন্নের প্রতি তাঁহার স্নেহ বিশেষরূপ প্রকটিত হইয়াছিল। সারদা বাবুর সঙ্গে গিরিজাপ্রসন্নের সৌহার্দ্দ ছিল। কলিকাতা বাস কালে গিরিজাপ্রসন্ন যেরূপ বহু শ্রেষ্ঠ ও শিক্ষিত লোকের সঙ্গে ভালবাসা স্থাপনের সুযোগ পাইয়াছিলেন, বরিশালে সেরূপ পান নাই, না পাওয়ার কারণও যথেষ্ট ছিল। সে সমস্তের বিস্তারিত উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

এই বরিশাল বাসকালেই বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। এই দ্বিতীয় ভাগে "দুর্গেশনন্দিনী" "কপালকুণ্ডলা" ও "মৃণালিনী" সমালোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে। তিনি দুর্গেশনন্দিনীর নারী চরিত্রের ৩টীর সঙ্গে স্বভাবের যে সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, তাহা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। গিরিজাপ্রসন্ন উহা কিরূপ সুন্দর শব্দ বিন্যাস পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সাধারণের গোচরার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"বিমলা—প্রখর বুদ্ধিজ্বালা-বিভাসিতা চিরানন্দময়ী রসিকাগৃহিণী, আশেষা স্নেহশালিনী, জ্ঞান গভীরা, প্রোজ্জ্বলময়ী অপূর্ব্বা-তরুণী, আর তিলোত্তমা ব্রীড়াবিনম্রা পরমরমণী নবীনা। একের সহিত প্রখর দিবাকর-কর-প্রোদ্ভাসিত, মধুর মলয় হিল্লোলান্দোলিত বাসন্তী অপরাহ্নের পূর্ব্বভাগ—অপরের সহিত মেঘ-বিনির্মুক্ত শারদীয় ফুল্লশশধর-শোভিত আলোকময়ী যামিনীর মধ্যভাগ—আর তিলোত্তমার সহিত ঈষৎ মেঘাচ্ছাদিত জ্যোৎস্না-পরিব্যাপ্ত মনোমোহিনী শর্ব্বরীর ঊষা সম্যক তুলনীয়া।"

গিরিজাপ্রসন্ন প্রকৃতির বিভিন্ন ভাবের সঙ্গে যে বিমলা, আয়েষা ও তিলোত্তমার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, উহা পাঠ করিয়া একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই বোধগম্য হইবে যে, গিরিজাপ্রসন্ন কেবল নরনারীর শ্রেষ্ঠ সমালোচক ছিলেন না, তিনি স্বভাব-সৌন্দর্য্যেরও একজন বিশিষ্ট

উপাসক ছিলেন। যাঁহারা প্রকৃতির উপাসনা করিতে জানেন না, তাঁহারা কখনই সমালোচনায় শ্রেষ্ঠত্ব ও কাব্যরচনায় পটুত্ব লাভ করিতে পারেন না।

পৌর স্ত্রী বিমলার চরিত্র যদি একবার চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ কেনা বলিবে যে, উহা সম্পূর্ণ আর্য্যভাবময়ী রমণী চরিত্রের আদর্শে গঠিত হয় নাই। কতলুখাঁর সঙ্গে বিমলার রসালাপ, তাহার সভায় বিমলার নৃত্যগীতি, তাহার প্রতি বিমলার বিলোল কটাক্ষ স্থাপন, তাহার মন হরণে বিমলার ঐকান্তিক যত্ন, আবার তাহার জীবন নাশেরই জন্য বিমলার দুর্জ্জয় সাহসিকতা প্রভৃতি কি অন্তঃপুরচারিনী হিন্দুর স্বভাব-বিরুদ্ধ ভাব নহে? ইহা কি বিমলা-চরিত্রের কলঙ্ক নহে? সূক্ষ্মদর্শী প্রবীণ সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন বিমলার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করিতে গিয়া যে সব সারতত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে আর আর বিমলার চরিত্রটী কলঙ্ক-স্পর্শ-ঘৃণ্য বোধ হইবে না। তিনি বলিয়াছেন :—

"প্রথমে বিমলার পূর্ব্ব পরিচয় স্মরণ করিতে হইবে। পূর্ব্ব পরিচয়ে বিমলাকে বড় একটা আমরা শাসন-সংরক্ষিতা দেখিতে পাইনা। বিমলা বাল্যকালে কতকটা স্বাধীন ভাবেই ছিলেন। এই স্বাধীনতার ফলে তাহার বুদ্ধি, সাহস, চতুরতা প্রভৃতি কতকগুলি বৃত্তির বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল। রসালাপের ক্ষমতা সকলের থাকে না। ইহা খানিকটা লোকের মৌলিক বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। বিমলারও এই মৌলিক ক্ষমতাটী স্বাধীনভাবে যথেচ্ছা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। যৌবনকালের কথা জানিনা,—প্রৌঢ় বয়সে বিমলা এই ক্ষমতাটী দ্বারা দুই একবার স্বার্থসাধন করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার ব্যবহারে আমরা বড় কুরুচি দেখিতে পাই, বিমলা তাহা দেখিতে পাইতেন না। তাহার কারণ অনেক। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, ইন্দ্রিয়ের উপর যাহাদের আধিপত্য জন্মিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণীশক্তি তাহাদের নিকট বড়ই আমোদের ও ক্রীড়ার জিনিষ। আমরা যৌবনে ইহাতে ভয় পাই, তাঁহারা ইহাতে সেরূপ ভয় পান না, বরং আবশ্যক হইলে তোমার আমার মত লোককে ভয় দেখাইয়া, ইঁহারা সেই শক্তির ক্ষমতা দেখিয়া আনন্দ লাভ করেন। এরূপ অবস্থায় যখন সে শক্তি দ্বারা অন্যকে অভিভূত করিতে পারিলে, কোন কর্ত্তব্য কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তখন তাহারা সে শক্তি প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হইবে কেন? বিমলা নিজরূপ বা রসিকতার ক্ষমতা জানিতেন, কিন্তু এ ক্ষমতা তাহার মনের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিত না। আবশ্যক মত তিনিই বরং উহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া ইহাদ্বারা কার্য্য করাইয়া লইতেন। এরূপ লোকের রুচিই বা কি? এই সব কার্য্যে বাহ্যিক ক্রিয়ার সহিত ইহাদের অন্তরের মিল থাকে না।" *

আবার দেখ সমালোচক-শ্রেষ্ঠ গিরিজাপ্রসন্ন আয়েষার পার্শ্বে তিলোত্তমাকে দেখিতে পাইয়া মহানন্দে বিভোর হইয়া কি বলিতেছেন :—

"নব প্রসূতি নবজাত কন্যা কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। পার্শ্বে তাহার আর একটী ক্ষুদ্র কন্যা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অগ্রজ কন্যাটী সেই নবজাত শিশুকে মাতার স্নেহভাগিনী দেখিয়া মনঃপীড়ায় বড়ই কাতরা হইতেছে, তাহার কেশ ধরিয়া দুই একবার সজোরে টানিতেও ভুলিতেছি না, সমস্নেহভগিনীর এই বিদ্বেষভাব পাঠক অবশ্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছ, প্রত্যক্ষ করিয়া ইহা নির্ম্মলা বালিকা-হৃদয়ে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিল, তাহাও স্থির করিয়াছ। কিছুদিন পরে আবার এই বালিকাদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, বড়টী কিছু বয়স্থা হইয়াছে, তাহার ঈষৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। ঐ দেখ সে-ই

* বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়ভাগ। পৃঃ ৮—৯।

কনিষ্ঠার প্রতি দ্বেষভাবপূর্ণ জ্যেষ্ঠাই আজি কনিষ্ঠাকে কি ভাবে দেখিতেছে। উভয়েই ক্ষুদ্র, কিন্তু জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিতেছে। এখন আর সে দ্বেষ নাই। এখন কনিষ্ঠা কান্দিলে জ্যেষ্ঠা তাহাকে মাতৃক্রোড়ে সহাস্যবদনে অর্পণ করে। এই জ্যেষ্ঠার ক্রোড়ে কনিষ্ঠা অপূর্ব্ব সুন্দর নয় কি ?"

এই উদাহরণটী বড়ই চিত্তহারী, বড়ই ভাবময়। আমরা ইহা যতই চিন্তা করি, ততই তিলোত্তমার প্রতি আয়েষার ভালবাসা আমাদিগকে মোহিত করে। সমালোচক ইহাদ্বারা দুইটী কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। ১মটী —আয়েষা মুখে নিষ্কাম প্রণয়ী বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন, বাস্তবিক তাঁহার প্রণয় নিষ্কাম নহে। প্রণয়ীর কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। তাহারা একান্ত সত্যপ্রিয় হইলেও এ সম্বন্ধে তাহারা দুই এক সময় ঘোর মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণীত হয়, ইহা প্রণয়েরই অদ্ভুত প্রতারণা।

২য়টী—তিলোত্তমার প্রতি আয়েষার প্রগাঢ় স্নেহ যেন দিন দিনই তিলোত্তমাকে আশ্রয়দান করিয়া সুশীতল করিতেছিল।

সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন চরিত্রবিশ্লেষণ কালে যে সব দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন, তাহা সমালোচ্য চরিত্রটীর সঙ্গে এতই সাদৃশ্য যে, দৃষ্টান্তগুলি স্মরণ করিয়া রাখিলেই চরিত্রটীর গূঢ়ভাব সহজেই হৃদয়স্থ করা যায়। এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রয়োগে তিনি বড়ই দক্ষ ছিলেন। এজন্য তাঁহার সমালোচনার শক্তিটাও অনন্যসাধারণ হইয়া উঠিয়াছিল। কি প্রকৃতির স্নেহময়ী দুহিতা কাপালিক-প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলার চরিত্র বিশ্লেষণকালে, কি দুঃখিনী পতিমিলন-বিরহিতা মনোরমার চরিত্র ব্যাখ্যাকালে তিনি এইরূপ সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া চরিত্রগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহারা গিরিজাপ্রসন্নের সমালোচনা পটুত্ব দেখিয়া মোহিত হইতে চাহেন, তাহারা "বঙ্কিমচন্দ্র" দ্বিতীয় ভাগ আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখুন। বঙ্কিমচন্দ্র তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই দ্বিতীয় ভাগেই উপন্যাসস্থিত চরিত্রগুলি, বিশেষতঃ নারীচরিত্রগুলির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির কি মনোমোহন সাদৃশ্য, তাহা বেশই দেখান হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ১ম ভাগ ও ৩য় ভাগ অন্যান্য কারণে এই ২য় ভাগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু এই ২য় ভাগের দৃষ্টান্তগুলি আমাদের নিকট অন্য দুই ভাগ অপেক্ষা অধিকতর স্পৃহনীয় বোধ হয়। আমরা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সে সব স্থান এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। সমালোচক সমাজের উচ্চ শিক্ষাদাতা। সাধারণের নিকট যে চিত্র অবোধ্য বা ঘৃণ্য, সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক সেই চরিত্র হইতেই সার রত্ন উদ্ধার করিয়া মানবের হৃদয়পটে প্রতিফলিত করিয়া দিয়া থাকেন। যে দিন সমালোচকের অভাব হইবে, সেই দিন কাব্যসৌন্দর্য্য উপভোগের পিপাসা বা ক্ষমতা বিলুপ্ত হইবে। সৌন্দর্য্য প্রেমময় ভগবানের অভিভাবক গুণ, যিনি সেই গুণ বা সৌন্দর্য্য বাহির করিয়া দিতে সমর্থ—তিনি ভগবৎরাজ্যে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করিতেও ক্ষমতাপন্ন। সমালোচকের গুণ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। গিরিজাপ্রসন্ন সেই সৌন্দর্য্য বাহির করিতে কত দূর দক্ষ ছিলেন, অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কলিকাতা রিভিউএর মন্তব্য দ্বারাই তাহা স্পষ্টীকৃত হইবে।

বঙ্কিম বাবুর পত্র।

সাদর সম্ভাষণম্,

আপনার পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি।

আপনি যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। কেবল এই কথা যে, আমার প্রণীত নরনারী চরিত্র-গুলি আপনাদিগের এতদূঢ় পরিশ্রমের যোগ্য কিনা সন্দেহ। তবে আপনি সুলেখক এবং উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই পাই-য়াছি। আপনার যত্নে আমার রচনা আশাতীত সফলতা লাভ করিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। আমার পুস্তক হইতে যেথানে যতদূর উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা করিবেন, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

পুস্তকের নাম যাহা নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তাহাতেও কোন আপত্তি হইতে পারে না।

আমি চন্দ্র বাবুর মতের অপেক্ষা না করিয়াই আপনার পত্রের উত্তর দিলাম, কেননা আপনার বিচারশক্তির পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছি।" শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

সাংখ্য-সূত্র।

ভূমিকা।

আজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য এবং অনিরুদ্ধ কৃত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সাংখ্য সূত্র অথবা ষড়াধ্যায়ী সাংখ্যপ্রবচনের অনুবাদ ও টীকা লিখিয়াছিলাম। নিজের পাঠের সুবিধা ও অর্থ বোধের জন্য সাংখ্য শাস্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই অনুবাদ করিয়া গিয়াছিলাম। সুতরাং ইহা অসম্পূর্ণ, এবং এ অবস্থায় ইহা প্রকাশের অনুপযুক্ত বলিয়া, বিশেষ সংশোধন না করিয়া ইহা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় ছিল না। বন্ধুবর দেবী প্রসন্ন বাবু ইহা দেখিয়া প্রকাশের অভিপ্রায় করায় এই অবস্থায়ই ইহা নব্যভারতে প্রকাশিত হইল।

সাংখ্য সূত্রের পূর্ব্বভাষ স্বরূপ প্রথমে বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্যভূমিকা ও পণ্ডিত দ্বারকা নাথ বিদ্যাভূষণ প্রকাশিত সাংখ্য দর্শনের ভূমিকা মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্যভূমিকায় বলিয়াছেন :—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" প্রভৃতি শ্রুতিতে, পরমপুরুষার্থ সাধক আত্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এই ত্রিবিধ উপায় বিহিত আছে। স্মৃতিতে আছে—

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যোমন্তব্যোশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা হি সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥

যোগ শাস্ত্রোক্ত উপায়ে এই মনন, ধ্যান বা নিদিধ্যাসন করিতে হয়। এইরূপে শ্রবণাদি-দ্বারা পুরুষার্থ সাধন—শ্রুতিতে উপদিষ্ট হই-য়াছে।

এই ষড়াধ্যায়ী রূপ বিবেক-শাস্ত্রের দ্বারা কপিলমূর্ত্তি ভগবান, সেই পুরুষার্থসাধনের হেতুভূত জ্ঞান বিষয়ে শ্রুতির অবিরোধী বিবিধ উপপত্তি উপদেশ করিয়াছেন।

তত্ত্বসমাসাখ্য যে সূত্র আছে, তাহার সহিত এই গ্রন্থের পুনরুক্তি নাই। তত্ত্বসমাসে যাহা সংক্ষেপে বর্ণিত, এই গ্রন্থে তাহাই বিস্তারিত হইয়াছে। এইজন্য যোগসূত্রের ন্যায়, এই গ্রন্থেরও সাংখ্যপ্রবচন আখ্যা উপযুক্ত। তবে যোগসূত্র ঈশ্বর নিরূপণ করিয়া ইহার ন্যূনতা পরিহার করিয়াছেন।

সাংখ্য শব্দের অর্থ কি?

সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিং চ প্রচক্ষতে।
তত্বানি চ চতুর্ব্বিংশং তেন সংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
ইতি ভারত।

সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক আত্মকথনই সংখ্যা। 'সম্যক্ খ্যায়তে' ইতি সংখ্যা।

সাংখ্য শাস্ত্র চতুর্ব্যূহাত্মক। যথা,—(১) হেয়, অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখ। (২) হান, অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি। (৩) হেয়-হেতু, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগজনিত অবিবেক। আর (৪) হানোপায়,—বিবেক খ্যাতি।

সাংখ্যদর্শনের সহিত অন্য দর্শনের অর্থাৎ ন্যায়, বৈশেষিক বা বেদান্ত দর্শনের বিশেষ বিরোধ নাই। (বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রথমে বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন দর্শন শাস্ত্র।)

অনিরুদ্ধও বলিয়াছেন, পরাবৈরাগ্য বুঝাইতে অতি কারুনিক মহামুনি কপিল জগৎ উদ্ধার জন্য এই মোক্ষ শাস্ত্র আরম্ভ করেন। সুতরাং অনিরুদ্ধের মতেও এই ষড়াধ্যায়ী সাংখ্য সূত্রই মূল সাংখ্য শাস্ত্র।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে সাংখ্যদর্শনের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"সাংখ্য শাস্ত্র কপিল প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোন্ সময়ে ইহার সৃষ্টি, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

রাজতরঙ্গিণীতে আছে, কাশ্মীরপতি গোনর্দ্দের সময়, অর্থাৎ কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা উৎপন্ন হন,—

"শতেষু ষট্ শকার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষানামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥

এক্ষণে কলির ৪৯৬৯ বৎসর অতীত। অতএব যুধিষ্ঠির ৪৩১৬ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন।

বরাহসংহিতা ও জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থে আছে যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল একশত বৎসর অন্তর এক এক নক্ষত্রে গমন করে। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে, সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল। তাহা ধরিয়া গণনায় বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কাল, ২৫২৬ যুধিষ্ঠিরাব্দ হয়।

পূর্ব হিসাবের সহিত এই হিসাবে ১০০ বৎসর বিরোধ হয় মাত্র। এই যুধিষ্ঠিরের সময় ব্যাসদেব ছিলেন। তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে—"সিদ্ধানাং কপিলো-মুনিঃ।" গীতায় সাংখ্যযোগ উল্লিখিত আছে। অতএব, কপিল ব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী।

বিষ্ণুপুরাণে আছে—

কপিলর্ষির্ভগবতঃ সর্ব্বভূতস্য বৈ দ্বিজ।
বিষ্ণোরংশোজগন্মোহনাশায়োর্ব্বীমুপাগত ॥

বিষ্ণুপুরাণের সৃষ্টি প্রকরণে আছেঃ—

"অব্যক্তকারণং যৎ তৎ প্রধানমৃষি সত্তমৈঃ।
প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মং নিত্যং সদসাত্মকং ॥
অক্ষরং নান্যদাধারমমেয়ং মজরং ধ্রুবং।
শব্দ স্পর্শ বিহীনং তৎ রূপাদিভিরসংহতং ॥
ত্রিগুণং তৎ জগৎযোনিঃ অনাদি প্রভবাপ্যয়ং।
তেনাগ্রে সর্ব্বমেবাসীৎ ব্যাপ্তং বৈ প্রলয়াদনু ॥"

ভাগবতে আছে,—

"পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতং।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যতত্ত্বগ্রাম বিনির্ণয়ং ॥"

(কালবিপ্লুতং = কালক্রমে বিনষ্ট। সেই বিনষ্ট সাংখ্যশাস্ত্র কপিল আসুরিকে বলিয়া-ছিলেন; অথবা যে সাংখ্য শাস্ত্র এক্ষণে কালক্রমে বিনষ্ট তাহা কপিল আসুরিতে বলিয়াছিলেন?)

মৎস্য পুরাণে আছে—

"সাংখ্যং সংখ্যাত্মকত্বাদ্ধি কপিলাদিভিরুচ্যতে।"

ভারতে আছে—

"সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চেব প্রকৃতিঞ্চ প্রবক্ষ্যতে।
তত্বানি চ চতুর্ব্বিংশং তেন সাংখ্যং প্রকীর্ত্তিতং ॥"

কালিদাস কুমারসম্ভবে বলিয়াছেন,'
"ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনীং।
তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ।"
মাঘেও সাংখ্যদর্শনের মতের উল্লেখ আছে।
"বিজয়স্তয়ি সেনায়াঃ সাক্ষিমাত্রেঽপদিশ্যতাং।
ফলভাজি সমীক্ষ্যোক্তে বুদ্ধের্ভোগইবাত্মনি।"
ফলতঃ ঋগ্বেদ যেমন বেদের প্রথম, সাংখ্যও তেমনি সকল দর্শনের প্রথম।"

সাংখ্য-প্রবচন।

প্রথম অধ্যায়,—বিষয় নিরূপণ।
"হেয় হানোতয়ো র্হেতু ইতিব্যূহা যথাক্রমম্।
চত্বারশাস্ত্র মুখ্যার্থা অধ্যায়েস্মিন্ প্রপঞ্চিতাঃ॥"

১। অর্থ ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ।

অর্থ—মঙ্গলাচরণ জন্য। ৫।১ সূত্র দ্রষ্টব্য। (অনিঃ)। অধিকার বুঝাইবার জন্য (বিঃ)।* অর্থাৎ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে পুরুষার্থ নিরূপিত হইয়াছে।

ত্রিবিধ দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ।

আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ,—শারীরিক, যথা, রোগাদি, ইহারা শরীরে প্রথম উৎপন্ন হয় বলিয়া শারীরিক। এবং (২) মানসিক, যথা, কাম, ক্রোধাদি; ইহারা কেবল মনেই উৎপন্ন হয়।

আধিভৌতিক দুঃখ—পশু, পক্ষী প্রভৃতি ভূতজনিত। ব্যাঘ্র চৌর্য্যাদি জনিত।

আধিদৈবিক দুঃখ—গ্রহভূতাদিজনিত, দাহ শীতাদিজনিত।

অত্যন্ত নিবৃত্তি—ভবিষ্যতে সর্ব্বজাতীয় দুঃখের নিবৃত্তি। নিঃশেষ রূপে স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব দুঃখের নিবৃত্তি। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ মধ্যে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ।

বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন,—প্রারব্ধ ভোগ করিতেই হইবে, তাহার নিবৃত্তি সম্ভব নহে। সুতরাং অনাগত সূক্ষ্ম দুঃখই হেয়। চিত্তে ভবিষ্যৎ দুঃখের যে উপাদান বা বীজ থাকে, তাহা নষ্ট হইলে দুঃখ নিবৃত্তি হয়। চিত্তে দুঃখ বীজ থাকে। চিত্ত নিরোধ করিতে হয়।

জীবন্মুক্তিতে প্রারব্ধ ব্যতীত অনাগত দুঃখের নিবৃত্তি হয়। বিদেহমুক্তিতে চিত্তের সহিত সর্ব্ব দুঃখ নাশ হয়।

সাংখ্য মতে, পুরুষে বস্তু বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্ব পতিত হয়, পুরুষ তাহা গ্রহণ করে। তবে বুদ্ধি যেমন বিষয়াকারে আকারিত হয়, পুরুষ সেরূপ হয় না। সুতরাং উপরাগ বা প্রতিবিম্ব রূপেই পুরুষের সুখ দুঃখ থাকে।

পুরুষের এই প্রতিবিম্বরূপে দুঃখাদি গ্রহণই ভোগ। এই গ্রহণ—সন্নিকটস্থ কুসুমের বর্ণ স্ফটিকের গ্রহণের ন্যায়। এই প্রতিবিম্বকে বৈদান্তিকেরা অধ্যাস বলেন। যথা,—

"তস্মিন্ চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তাবস্তু দৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তা প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥"

এই প্রতিবিম্বরূপ দুঃখ নিবৃত্তিই অত্যন্ত পুরুষার্থ। সুখ ভ্রান্তি মাত্র—সাক্ষাৎ পুরুষার্থ নহে।

২। দৃষ্ট উপায় দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় না। তাহাতে দুঃখ নিবৃত্ত হইলেও, আবার তাহার অনুবর্ত্তন হইতে দেখা যায়।

দৃষ্ট উপায়=লৌকিক উপায়। শরীরে রোগ ঔষধের দ্বারা উপস্থিত নিবৃত্তি হইলেও পরে আবার রোগ হইতে পারে। ধন দারিদ্র্য দুঃখ নিবৃত্তির এক উপায় হইলেও ধনক্ষয় হইয়া সে দুঃখ আসিতে পারে।

* এই অনুবাদে (বিঃ) অথবা (বিঃ ভিঃ) অর্থে—বিজ্ঞানভিক্ষু মতে, এবং (অনিঃ) অর্থে অনিরুদ্ধ মতে।

৩। তবে প্রাত্যাহিক ক্ষুধাদি প্রতীকার চেষ্টার ন্যায়, সেই প্রতীকার চেষ্টাতেও পুরুষার্থের প্রয়োজন আছে।

পুরুষ দুঃখের ক্ষণিক নিবৃত্তিও চাহে। লৌকিক উপায়ে সে পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। তাহাতে সাময়িক দুঃখ নিবৃত্তি হয় মাত্র। এইজন্য লোকের ধনাদি অর্জ্জনে প্রবৃত্তি। ইহা নিকৃষ্ট পুরুষার্থ।

৪। তাহাতে (সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব দেশে) দুঃখ নিবৃত্তি অসম্ভব, এবং তাহা সম্ভব হইলেও, তাহাতে অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি অসম্ভব। এ কারণ প্রমাণকুশল পণ্ডিতগণ তাহাকে হেয় মনে করেন।

পাতঞ্জল যোগ-সূত্রেও এই কথা আছে। যথা,—

"পরিণাম তাপসংস্কার দুঃখৈগুর্ণঃ-
বৃত্তি বিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ॥"

বিজ্ঞান ভিক্ষু "সত্ত্বাসম্ভবাৎ" পাঠ গ্রহণ করেন। তদনুসারে অর্থ হয় যে, লৌকিক ধনাদি দ্বারা সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব নহে। আর সেই ধনাদি অর্জ্জনেও পাপ হয়, এজন্য তাহার পরিণাম দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।

৫। আর এরূপ পুরুষার্থের উৎকর্ষতা থাকিলেও মোক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহাই শ্রুতি।

বৈদিক উপায় যজ্ঞাদি দ্বারা পুণ্যফলে স্বর্গসুখ লাভ হয়, ইহা শাস্ত্রে আছে বটে, যথা,—

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বপদাস্পদং॥

কিন্তু শ্রুতিতে আছে, "অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত ইতি।" অতএব শ্রুতি মতে মোক্ষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৬। বৈদিক উপায় ও দৃষ্ট উপায়,—উভয়ের মধ্যে বিশেষ নাই।

বৈদিক উপায়—যজ্ঞাদি। বেদে আছে "অপাম সোমমমৃতা অভূম"...ইত্যাদি। কিন্তু এ অমরত্বও অত্যন্ত মোক্ষ নহে।

কারিকায় আছে—

"দৃষ্টবদনুশ্রাবিক স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয় যুক্তঃ।"
(কারিকা ও তাহার ভাষ্য দৃষ্টব্য।)

"তস্মাদ্‌যাস্যাম্যহং তাত দৃষ্টেমং দুঃখ সন্নিধিং।
ত্রয়ীধর্ম্মমধর্ম্মাঢ্যং কিম্পাক ফল সন্নিভং॥
ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেহমৃতত্বমানশু"...ইতি শ্রুতি।

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"... ইতি শ্রুতি।

যজ্ঞ হেতু যে অমৃতত্ব, তাহা গৌণ। তাহা প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান মাত্র। বিষ্ণু-পুরাণে আছে—

"আভূত সংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।"

৭। যে স্বভাবতঃ বদ্ধ, তাহার মোক্ষ সাধনের উপদেশ বিধি হইতে পারে না।

আত্মা বা পুরুষ যদি স্বভাবতঃ বদ্ধ হইত, তবে তাহার মোক্ষ সাধনের উপদেশ বিহিত হইত না। বদ্ধ অর্থাৎ দুঃখযুক্ত।

দুঃখ স্বাভাবিক হইলে, তাহার অত্যন্ত নিবৃত্তি বা মোক্ষ, অসম্ভব হইত, ও শ্রুতিতে যে মোক্ষের উপদেশ আছে, তাহা নিরর্থক হইত। যেমন অগ্নির উষ্ণতা পরিহার করা যায় না, তেমনই কাহারও স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিহার করা যায় না।

"যস্যাত্মামলিনোঽস্বচ্ছো বিকারীস্যাৎ,
স্বভাবতঃ।"

ন হি তস্য ভবেন্মুক্তি জন্মান্তর শতৈরপি ॥"

যে পদার্থ বিদ্যমান থাকিতে যে ধর্ম্মের উৎপত্তি বিষয়ে, কারণান্তরের অপেক্ষা করে না, সেই ধর্ম্মই সেই পদার্থের স্বাভাবিক।

আত্মাতে চিত্তের প্রতিবিম্ব পড়ে। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক। রজঃগুণ হেতু চিত্তের দুঃখ স্বাভাবিক। তবে সুখাত্মক সত্ব গুণের দ্বারা যখন রজোগুণ অভিভূত হয়, তখন দুঃখের বিকাশ থাকে না। এইজন্য সর্ব্বদা দুঃখের উপলব্ধি হয় না।

দুঃখ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম—ইহা বৌদ্ধ মত। বৌদ্ধেরা চিত্তকেই আত্মা বলে। এক আত্মারই যখন বদ্ধ ও মোক্ষ অবস্থা অনুমিত,—তখন 'আত্মা-নাশে মোক্ষ'—ইহা বলা যায় না।

৮। যাহা স্বভাব, তাহা অনপায়ী (তাহা দূর করা যায় না)। তাহা দূর করিবার জন্য অনুষ্ঠান লক্ষিত হইতে পারে না, ও তাহা প্রামাণ্যও হয় না।

যাবৎ দ্রব্য থাকে, তাবৎ তাহার স্বভাবের অন্যথা হয় না।

অতএব আত্মা স্বভাবতঃ বদ্ধ হইলে, বেদে তাহার মুক্তির উপদেশ থাকিত না,—থাকিলে বেদ অপ্রামাণ্য হইত। এতএব আত্মা স্বভাবতঃ বদ্ধ নহে।

৯। যাহা করা অসম্ভব, তাহা করিবার উপদেশ বিহিত নহে। থাকিলেও তাহা গ্রাহ্য নহে।

আত্মা স্বাভাবিক বদ্ধ হইলে, মোক্ষ উপদেশ সম্বন্ধে আর বেদের প্রামাণ্য থাকে না।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে,—

১০। যদি বস্ত্রের শুক্লত্ব ও বীজের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করিবার উপদেশের ন্যায় এই উপদেশ হয়?

রঞ্জিত করিলে বস্ত্রের শুক্লত্ব নষ্ট হয়। ভর্জ্জিত বা দগ্ধ বীজের অঙ্কুর উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়। সুতরাং এস্থলে স্বাভাবিক ধর্ম্ম নষ্ট করিবার উপদেশ কিরূপে ব্যর্থ বলা যায়?

ইহার উত্তরে উক্ত হইয়াছে—

১১। এ উপদেশ শক্তির উদ্ভব—অনুদ্ভব সম্বন্ধে। যাহা অশক্য বা অসম্ভব,—তাহা সম্বন্ধে নহে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে বস্ত্রের শুক্লত্ব ধর্ম্ম বা বীজের উৎপাদিকা শক্তি অভিভূত হইয়া উদ্ভব অবস্থা হইতে অনুদ্ভব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আবার উপযুক্ত কারণ যোগে তাহার উদ্ভব হইতে পারে। উপযুক্তরূপে ধৌত করিয়া বস্ত্রের শুভ্রত্ব আবার আইসে। যোগীর সংকল্প বলে ভর্জ্জিত বীজের ও উৎপাদিকা শক্তি ফিরিয়া আসে। দুঃখ স্বাভাবিক হইলে, এইরূপে তাহার আবির্ভাব তিরোভাব হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না।

নৈমিত্তিক কামাদি যোগে আত্মা বদ্ধ নহে।

১২। আত্মা কালযোগে বদ্ধ হয় না—যাহা ব্যাপক ও নিত্য তাহা সকলের সহিত সর্ব্বদা সম্বদ্ধ থাকে।

আত্মা—নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী, এজন্য সর্ব্বকালের সহিত তাহার সম্বন্ধও নিত্য। (অনিঃ)

কাল—নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী,—এজন্য (মুক্ত ও বদ্ধ) সকল আত্মার সহিত কালের নিত্য সম্বন্ধ। (বিঃ ভিঃ)।

অতএব পুরুষের বন্ধন সম্বন্ধে, কাল নিমিত্ত-কারণ নহে।

১৩। এই কারণে আত্মা দেশ যোগেও বদ্ধ হয় না।

দেশও ব্যাপক। তাহার সহিতও মুক্ত বদ্ধ সকল আত্মার সম্বন্ধ। অতএব নৈমিত্তিক দেশযোগে আত্মার বন্ধন কারণ হইতে পারে না।

(এই সূত্র অনিরুদ্ধ গ্রহণ করেন নাই।)

১৪। সেইরূপ অবস্থা যোগেও আত্মার বন্ধন হয় না। কেন না অবস্থা দেহের ধর্ম্ম মাত্র।

অবস্থা—পরিণামী জড় দেহের ধর্ম্ম। তাহা পঞ্চভূতের সংঘাত দেহরূপ। তাহা সচেতন আত্মাকে বদ্ধ করিতে পারে না। আর একের ধর্ম্মে অন্যে বদ্ধ হইলে, মুক্ত পুরুষও বদ্ধ হইতে পারে।

১৫। তাহা হইলে, "অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ" অর্থাৎ পুরুষ অসঙ্গ,—এই শ্রুতির বাধা হয়।

এজন্য পুরুষের সহিত অবস্থার এবং কাল ও দেশের সঙ্গ স্বীকৃত হয় না।

১৬। কর্ম্মদ্বারাও আত্মা বদ্ধ হয় না। কেন না কর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম নহে। একের ধর্ম্মে অন্যের বন্ধন হয় না। আর তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।

অর্থাৎ তাহা হইলে মুক্ত বদ্ধ সকল পুরুষেরই বন্ধন হইতে পারে। আর আত্মা স্বকর্ম্মদ্বারা বদ্ধ, ইহা স্বীকার করিলে, মহা প্রলয় কালেও সে বন্ধন থাকিতে পারিত।

১৭। আর যদি একের ধর্ম্ম অন্যে যুক্ত হইত, তবে ভোগ-বৈচিত্র্য থাকিত না।

দুঃখ যোগ বিনা কেবল দুঃখ সাক্ষাৎকার যদি ভোগহেতু হইত, তবে, পুরুষ বিভু বলিয়া, সকল পুরুষের চিত্তগত দুঃখের সঙ্গী সকল পুরুষ হইত, ও সকল পুরুষ তাহা ভোগ করিত। এবং পুরুষভেদে ভোগেরও তারতম্য বা প্রভেদ হইত না। তাহা হইলে কেহ সুখী কেহ দুঃখী এরূপ ভেদ থাকিত না। একের সুখে সকলে সুখী হইত, একের দুঃখে সকলে দুঃখী হইত।

অতএব যে চিত্তের দুঃখ যে পুরুষে প্রতিবিম্বরূপে যোগ হয়, যে চিত্তের সহিত যে পুরুষের স্বস্বামিভাব থাকে, সেই পুরুষই সেই চিত্তের দুঃখ ভোগ করে।

১৮। প্রকৃতি নিবন্ধন এরূপ হয়, তাহাও বলা যায় না। কেন না প্রকৃতি পরাধীন।

প্রকৃতি আপনিই প্রবৃত্তিময়ী হইয়া পুরুষকে বদ্ধ করে, ইহাও বলা যায় না। কেন না তাহা হইলে মুক্ত বদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকল পুরুষকেই প্রকৃতি বদ্ধ করিতে পারিত।

সংযোগ বিশেষ হেতুই প্রকৃতি পুরুষকে বদ্ধ করিতে পারে। সে সংযোগ না থাকিলে পারে না। পরবর্ত্তী সূত্রে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

মানব সমাজ। (৫)

দেহের স্বাস্থ্য ও উপযোগীতা, দুই ই থাকা চাই। কেবল সুস্থ হইলে হইবে না, সমাজের আবশ্যকীয় কর্ম্মের উপযোগী হওয়া চাই। কর্ম্ম যদিও মন হইতেই আরম্ভ ও মন হইতেই নিষ্পন্ন হয়, দেহের বড় বেশী অপেক্ষা করে না * ; তথাপি দেহকে উপেক্ষা করা যায় না। কারণ দেহ সুস্থ না হইলে মন উন্নত ও পবিত্র হইবে † না, সুতরাং কর্ম্মও প্রতিহত হইবে। মনই কর্ম্মের সংকল্প করিবে, দেহ সেই কর্ম্মসাধনের সহায় হইবে। সামাজিক চতুর্বিধ কর্ম্মই ‡ হওয়া চাই, আর দেহ ঐ কর্ম্ম করিবার যোগ্য হওয়া আবশ্যক। দেহ বংশগত নিয়মের অধীন ; মনও অনেক অংশে তাহাই। কিন্তু বংশ যৌন সম্বন্ধের ফল। সুতরাং দেহ এবং মনকে কর্ম্মসাধনোপযোগী করিতে হইলে যথাযোগ্য বংশের নরনারীদিগকে বিবাহিত করিতে হয়। নতুবা যেমন তেমন করিয়া একটা দায় উদ্ধার করিলে সর্ব্বনাশেরই পথ পরিষ্কার হয় ভিন্ন আর কিছুই লাভ নাই।

এস্থলে এতদ্দেশীয়গণের দেহ বর্ত্তমান সময়ে সে এক বিশেষ পরিবর্ত্তনের অধীন হইতেছে, যাহা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। কিছুদিন হইল এতদ্দেশীয় ভদ্রাভদ্র সকল শ্রেণীতেই দেখা যাইতেছে যে, অনেকের মূত্রে চিনির ভাগ কিছু অধিক নির্গত হয় ; আর, কাহারও বা ফস্‌ফেট, অক্‌ঝ্যালেট্‌ কিছু বেশী পড়িতেছে। চিনি অধিক নির্গত হওয়ায় বহুমূত্র এবং ফস্‌ফেট আদি অধিক নির্গত হওয়ায় নানাবিধ শিরোরোগ উৎপন্ন হইতেছে। সম্ভবতঃ এ সকল ম্যালেরিয়ারই গৌণ পরিণাম অথবা অনাহার ও দুশ্চিন্তার ফল! যাহা হউক, এ সমুদয় বস্তু দেহের বিশেষ আবশ্যক ; উহারা অতিরিক্ত মাত্রায় পরিত্যক্ত হইলে দেহ নিশ্চয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। এ সকল প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা সমাজের মধ্য হইতেই হওয়া চাই। আমরা তাহার কি করিতেছি! কেবল বর্ষে বর্ষে ১১।১২ লক্ষ লোক মরিয়া যাইতেছি ; আর কোটী কোটী লোক আধমরা হইয়া কোঁকাইতেছি।

দেহের প্রতি সমাজের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ব্যক্তিগত ব্যায়াম, পরিবারগত উৎসব, জাতীয় ক্রীড়া ও অঙ্গচালন ব্যবস্থা— এ সকল অবশ্য থাকা চাই। এই সকল উপলক্ষে যেমন দেহ পুষ্ট, তেমনই মনও প্রফুল্ল হয়। মন প্রফুল্ল না হইলে দেহ সুস্থ থাকিতেই পারে না। দেহ দৃঢ়, নীরোগ, শ্রমসহিষ্ণু ও কষ্টসহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক। সমাজের সকলেরই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে ; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর জনগণের দেহে এইরূপ না হইলে সে সমাজ উন্নত হইতে পারে না। দেহ সুগঠিত, পুষ্ট ও কর্ম্মক্ষম করিতে, বিবাহ সম্প্রদান একটু বিবেচনা মত করিলেই

---

* The future struggles for supremacy will be contested between minds, and muscles will be at a discount!
Nature, 9 May, 1909, p 36.

† Purity of mind means health of body * * * purity and health truly go together. Annie Besant A study in consciousness p 435.

‡ (১) অধ্যয়ন অধ্যাপন (২) দেশরক্ষা (৩) কৃষি বাণিজ্য (৪) সেবা।

কালে অনেক ফললাভ করা যাইতে পারে। অনাহার ও পীড়ার কথা পৃথক। কিন্তু যে সমাজ দুর্ব্বল ও পতিত হইয়া গিয়াছে, সেই সমাজস্থ জনগণের পক্ষে সময় সময় সমভাবাপন্ন অন্য সমাজের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করা অত্যাবশ্যক, কারণ তাহাতে নবীন পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়া শুভফল উৎপন্ন হইবার আশা করা যায়।*

মন।

কিন্তু কি ব্যক্তিগত কি সামাজিক, উভয় দিক হইতে মনকেই সর্ব্বপ্রধান স্বীকার করিতে হয়। মন প্রস্তুত না হইলে কোন কর্ম্মই হয় না। সামাজিক মন কি? তাহা কেমন করিয়া গঠিত হয়?

শিক্ষা।

মন দেহের অনুগত। দেহ বংশানুক্রমের নিয়মানুসারে গঠিত হয়, সুতরাং মনও ঐ নিয়ম পালন করে। মনও অনেকাংশে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। কিন্তু এস্থলে কেবল ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার দেখিলে হইবে না। সমাজগত একটা উত্তরাধিকার আছে। সমাজের জ্ঞান বুদ্ধি ক্রমেই উন্নত হইতেছে; ভাব ক্রমেই পরিবর্ত্তিত ও বিশুদ্ধ হইতেছে। একপুরুষে যে সকল উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছে। পরবর্ত্তিগণ তৎপাঠে তাহার অধিকারী হইতেছে। আবার তাহাদিগের চিন্তা ও ভাব তৎপরিবর্ত্তিগণ প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপে সমাজমধ্যে একটা সামাজিক উত্তরাধিকারের সৃষ্টি হইতেছে। অধ্যাপক টম্‌সন্ ইহাকেই 'Social Heridity বলিয়াছেন'। ইহাই সমাজকে কালে জ্ঞানোন্নত করে। সমাজের চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মন ইহার প্রত্যেকটীর উপযোগী হওয়া চাই। এ চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম বলিতে যতর্ব্বিধ কর্ম্মীর নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ বলিতেছি না। তদ্রূপ বিভাগ থাকে থাকুক, কিন্তু একশ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নত অবনত হওয়ার বিধান থাকা আবশ্যক। এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। সে যাহা হউক, মন গঠিত করিবার উপায় শিক্ষা ও সংসর্গ। এই দুই উপায় সর্ব্বত্রই কৃতকার্য্য হয়, তাহা নহে; তবে বংশ পরম্পরাগত ভাব ও প্রবণতা, যাহা ব্যক্তির শরীরে প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা জাগাইয়া দিবার এই দুই উপায় ভিন্ন আর নাই। ইহাতে সুফল কুফল দুই-ই হইতে পারে। বরং অবাধে সর্ব্ব শ্রেণীকেই সমান শিক্ষা দিলে সুফল অপেক্ষা কুফলই অধিকতর সম্ভব।

সকলেই দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিক, কবি অথবা ঐতিহাসিক হইতে পারে না। কিন্তু শিক্ষা যদি মনকে সংযত, চরিত্রকে উন্নত করিতে পারে, তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সফল হইল। এমন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, কবি অথবা ঐতিহাসিক আছেন, যাহাদিগের চরিত্র দেখিলে মনে হয় যে, ইহারা অশিক্ষিত অপেক্ষাও অধম। প্রকৃতপক্ষেও ইহারা শিক্ষিত না হইলেই সৎপথে অধিক থাকিত, অন্ততঃ এতদূর কুপথে যাইত না। উচ্চ শিক্ষা সাধারণের জন্য নহে; চেষ্টা করিলেও সাধারণে তাহা পাইবে না; কেবল তাঁদের মধ্যে শিক্ষিত বদমায়েস সৃষ্টি হইয়া সমাজকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবে। এতদ্দেশে বর্ত্তমান বর্ষে ৫৮৯০টী বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু ২৫৮ জন মাত্র বি-এ এবং

* The establishment of a successful race or stock requires the alternation of periods of inbreeding in which characters are fixed and periods of out-breeding (exogamy) in which by the introduction of fresh blood, new varieties are produced. Heredity, p 537.

১২৫ জন মাত্র এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সর্ব্ব দেশেই এইরূপ। ইহার অর্থ কি? উচ্চ শিক্ষা সাধারণের জন্য নহে। কিন্তু তাহাতে সাধারণের অধিকার থাকা চাই। নচেৎ গুণবান, প্রতিভাশালী দুই একজন ব্যক্তির পথে কণ্টক আরোপণ করা হয়। উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান চর্চ্চা প্রধানতঃ অল্পেরই আয়ত্ব হইবে। কিন্তু যাঁহারা এই গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগের আহার্য্য সুলভ এবং জীবন নিরাপদ হয়, তৎপ্রতি একান্ত দৃষ্টিরাখা সমাজের অবশ্য-কর্ত্তব্য। উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানচর্চ্চা যেদিক হইতেই কর, ফল একই। সকল পথই শিক্ষার্থীকে শ্রীভগবানের পাদমূলে লইয়া উপস্থিত করিবে। জ্ঞান অর্থই ভগবদ্‌জ্ঞান। সকল আলোচনারই সেই একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল আলোচনা সে ভাবে করা সহজ নহে। ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতিও উন্নত বিজ্ঞান শাস্ত্র বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইহাদিগের আলোচনায় সামাজিক মানবের বিশেষতঃ পর-বশ সমাজের মন সময় সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট ও চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ হইতে পারে। তাহা হইলে আর জ্ঞানের সাধনা হইল না। গভীর প্রশান্ত মনে জ্ঞানের আলোচনা হওয়া আবশ্যক। তবে যখন বিবিধ কারণে কোন নির্দ্দিষ্ট সমাজের অস্তিত্বই শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে, তখন উন্নত জ্ঞানালোচনা সফল হইতে পারে কিনা, এমন কি, সামাজিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেই পারে কিনা, সে বিষয় বিশেষ সন্দেহ করিবার কারণ আছে। তখন হয়ত ক্ষোভোৎপাদক শাস্ত্র আলোচনাই প্রশস্ত হইতে পারে। কিন্তু এ সকল বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও একটী বিষয়ে কোনই মতভেদ থাকিতে পারে না যে, মানবের প্রধান শিক্ষার বিষয়ই মানব। একথা মনীষিগণ সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালেই প্রচার করিয়াছেন। অন্য সকল শিক্ষাই এই শিক্ষার সহায় মাত্র। কারণ আপনাকে না বুঝিলে মানবের বন্ধ-মুক্তির অন্য উপায়ই নাই। কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা নির্দ্দিষ্ট সমাজে সকলেই এই শিক্ষা, এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাই সমাজের কার্য্য পরিচালনা করিতে কর্ম্ম-প্রধান শিক্ষাই অধিকাংশের পক্ষে প্রশস্ত, ভাবময় শিক্ষা অল্পাংশের নিমিত্ত।

কর্ম্ম-প্রধান শিক্ষাও ভাবের উপর নির্ভর করে। কারণ ভাবই কর্ম্মের মূল। কর্ম্ম-প্রধান উন্নত শিক্ষা উচ্চ বিজ্ঞানের অনুগত। বিবিধ শিল্প, যাহা যন্ত্রাদি সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বিজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে। সমাজের আবশ্যকীয় পদার্থ সকল এবং সুখ-বিধায়ক * উপকরণ সকল প্রয়োজনানুরূপ নির্ম্মিত হওয়া চাই। যদি না হইতে পারে, তবে অন্যত্র হইতে পাইবার সুবিধা থাকা চাই। কিন্তু যে সমাজে শিল্প শিক্ষা কেবল নব-প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সে সমাজে অন্যত্র হইতে দ্রব্যজাত গ্রহণ করা স্বশিল্পের অহিতকর; সুতরাং শিল্প শিক্ষার প্রথম অবস্থায় সমাজ স্বশিল্প অনুসরণ করিবে। তৎপর স্বশিল্প যথাযোগ্য উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইলে যখন অন্যত্রাগত শিল্পের প্রতিযোগীতা সহ্য করিতে সক্ষম হইবে, তখন ঐ প্রতিযোগীতায় তাহার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ক্রমেই হ্রাস হইয়া যাইবে। যেরূপেই হউক, সমাজের আবশ্যকীয় শিল্পজ্ঞান সমাজ-

* বিলাসের কথা বলিতেছি না। কিন্তু বিলাসোপকরণ সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয় নহে।

মধ্যে থাকা চাই-ই। নচেৎ সর্ব্বদা বিপদা-শঙ্কা বর্ত্তমান থাকে। শিল্প শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, এতদুভয় দেশ ভেদে বিভিন্ন রূপে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। যে দেশের মাটী যে প্রকার, যে দেশে জল প্রাপ্তির সম্ভাবনা যেরূপ, তদনুসারে কৃষিকার্য্য না হইলে ফলদায়ক হয় না। কিন্তু এই কার্য্যেও বিশেষ ফল লাভ করিতে হইলে উচ্চ বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি উচ্চ বিজ্ঞান-বলে আমেরিকা দেশে ১০/ বিঘা জমি হইতে বার্ষিক ১২০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ উপার্জ্জন হইয়াছে। সে যাহা হউক, শিল্প ও কৃষি বর্ত্তমান যুগে আর বিজ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। হইলে সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু এক দিকে যেমন এ সকলের উন্নতি, অন্য দিকে তেমনই বাণিজ্য, এতদুভয় একত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। নচেৎ উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রেতা না থাকায় উহা অকর্ম্মণ্য ও ক্ষতিজনক হইবে। বাণিজ্যই কৃষি শিল্পের শ্বাস প্রশ্বাস; উহা না থাকিলে ইহারা সজীব থাকিতে পারে না, অথবা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। কিন্তু কিছুই অতিরিক্ত মাত্রায় ভাল নহে। বাণিজ্যও অতিরিক্ত মাত্রায় অনুশীলন করিলে সমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। ঐতিহাসিক জানেন, পুরাকালে কত সমাজ বাণিজ্যে অতীব উন্নত হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও ফিরিঙ্গি ও দিনামার এবং আরবীয়গণ বাণিজ্যে বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের এখন কিরূপ অধঃপতন হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। বাণিজ্যে অতিমাত্র ব্যাপৃত হইলে বংশ-হানি হয়। সুতরাং সমাজ টিকিতে পারে না। * যাহা হউক, বাণিজ্য ব্যতীতও সমাজের উন্নতির আশা নাই, অথবা অতি অল্প। সুতরাং কর্ম্ম-প্রধান শিক্ষা অধিকাংশের পক্ষেই প্রশস্ত শিক্ষা হওয়া উচিত। অল্পাংশ ভাবময়, জ্ঞানময় শিক্ষা লাভ করতঃ ঐ অধিকাংশকে পরিচালন করিবেন। তাহা হইলে কৃষি শিল্পের উন্নতিও যেমন হইবে, অভাবের নিত্য সহচর দুরাচার সকলও তেমনই নিবৃত্ত থাকিতে পারে। নিম্নজীব হইতে পরম্পরাগত দুর্বৃত্তি সকল, যাহা দেহে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা সাধারণ শিক্ষায় যতদূর ব্যক্ত হইয়া পড়ে, কৃষি শিল্পাদি শিক্ষায় ও শ্রমশীল কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে তাহা তাদৃশ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাই তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায়, অশিক্ষিত-গণ তত অধিক দুরাচারগ্রস্ত হইতে পারে না।

এস্থলে পুঁথিগত শিক্ষার বিষয়ে আর একটী কথা উল্লেখ না করিয়া নীরব থাকিতে পারি না। এই শ্রেণীর শিক্ষা সমাজকে অল্পাধিক পরিমাণে অনির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে বাধা দিয়া থাকে। অনির্দ্দিষ্ট, অর্থাৎ যাহার পরিণাম ফল সম্যক জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, অথবা সম্যকজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব, তদ্রূপ কার্য্যের অনুপযোগী করিয়া তুলে। ইহাতে সন্দেহ, দ্বৈধ এবং ইতস্ততঃ বাড়াইয়া দেয়। তথাকথিত বর্ণ-মালা-শিক্ষিত ব্যক্তি পরিণাম ভাবিতে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। সুতরাং উদ্যম, অধ্যবসায় ও সৎসাহস হ্রাস হইয়া যায়। ইহাতে আকস্মিক অনুষ্ঠানের সহিত, আকস্মিক বিপ্লব নিবৃত্ত হইতে পারে,

* "Hustle", "hustle" is the cry of commerce, and of commerce only * * * "Hustle," "hustle" may allow a company to declare a 20 percent dividend, and to rush up shares, but it steadily works for sterility and other forms of degeneracy.
Race culture, p 82.

কিন্তু "সমাজ সাহস ও উদ্যম হারাইয়া ক্রমে জড়ত্বের দিকে চলিয়া যায়। মহাত্মা লক্ বলিয়াছেন, "যিনি নিশ্চয় ফল না জানিয়া কোন কর্ম্মে অগ্রসর হইবেন না, তাঁহাকে নিষ্কর্ম্মা হইয়াই বসিয়া থাকিতে হইবে; অবশেষে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংসের মুখে পতিত হইতে হইবে।" এই শ্রেণীর লোক পতিত সমাজে যত অধিক থাকিবে, তাহার উন্নতির বিঘ্নও ততই অধিক, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। সমাজের একটা জীবনীশক্তি চাই; সমাজের শিক্ষাও তদুপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। শ্রীশশধর রায়।

প্রেমের-ধর্ম্ম।

আমাদের দেশের কুশিক্ষিত এবং সঙ্কীর্ণচিত্ত লোকেরা যেমন মনে করে যে, পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম্মের মত আর ধর্ম্ম নাই, গোঁড়া খ্রীষ্টানেরাও তেমনি যীশু-প্রচারিত ধর্ম্মকে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া দম্ভ করিয়া থাকে। মানুষের স্থিতি এবং রক্ষার মূলে যে সকল নিগূঢ় প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করিতেছে, যে নিয়মগুলিকে আমরা 'সত্য' আখ্যা দিয়াছি, সেগুলি বুঝিবার এবং ধরিবার ক্ষমতা যে জাতিবিশেষে বদ্ধ আছে, একথা অল্প দাম্ভিক ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না।

যে কথা পাদ্রীদিগের মুখে হাট বাজারের মোড়ে অনেকেই শুনিয়াছেন, এবং গম্ভীর ভাবে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, গ্রিয়ার্সন সাহেব সেই কথা বেশ সাহসে ভর করিয়া দু-একবার বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে উত্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রিয়ার্সন সাহেব যে বাঙ্গালা জানে না,তাহা আমরা "বন্দে মাতরম্" কথার ব্যাখ্যা হইতেই বুঝিয়া ফেলিয়াছি। তিনি সংস্কৃত ও পালি কিছুমাত্র জানেন না; তবে অপরের সংগ্রহ দেখিয়া তর্ক করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। সম্ভবতঃ তিনি হিন্দিভাষা জানেন; এবং ঐ ভাষায় লিখিত ভক্তমাল গ্রন্থ খানি পড়িয়াছেন। ভক্তমাল পড়িয়া গ্রিয়ার্সনের ধারণা হইয়াছে (না পড়িলেও হইত), যে যীশু-প্রচারিত Religion of loveএর অনুকরণে বৈষ্ণবেরা প্রেমের ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন। তিনি এ কথাও বলেন যে, যশোদার কৃষ্ণ মেরীর খ্রীষ্টের একটা চোরাই সংস্করণ। পণ্ডিতটীর সকল কথার বিচার করিতে গেলে পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। প্রেমের ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুচারিটী কথা লিখিব।

বিচারের সুবিধার জন্য না হয় কল্পনা করিয়া লওয়া যাক্, যে যীশু ইংরাজি Love কথাটা ব্যবহার করিয়া ঈশ্বর বা Godকে Love করিতে শিখাইয়াছিলেন। এটা কি ভারি রকমের একটা নূতন আবিষ্কৃত তথ্য? Love শব্দটা ঠিক্ কি অর্থে ব্যবহৃত, সেটা বুঝিয়া লওয়া যাক্, তাহার পর দেখিব যে, ঐ ধর্ম্ম যীশুর পূর্ব্বেও ছিল কিনা। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধের টান্, সেইটী দিয়া Love কথা ব্যক্ত আছে। অতি প্রাচীন ঋগ্বেদে যখন এই অনুভূতি এবং এই ধর্ম্ম পাই, তখন Loveএর ধর্ম্মটার জন্য বৈষ্ণবদিগকে পাদ্রীর শিষ্য করা দুঃসাধ্য।

ঋগ্বেদের একেবারে গোড়ার সূক্তটীর নবম ঋকেই আছে,—

সনঃ পিতেব সূনবে।
অগ্নে সুপায়নো ভব।
স চস্বা নঃ স্বস্তয়ে॥

একটু দোষযুক্ত হইলেও রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদটুকুই দিতেছি। কারণ তাঁহার অনুবাদ ইউরোপীয় অনুবাদের অনুবর্ত্তী :—

পুত্রের নিকট পিতা যেমন অনায়াসে অধিগম্য, হে অগ্নি, তুমি আমাদের নিকট সেইরূপ হও; মঙ্গলার্থ আমাদের নিকটে বাস কর।

তাহার পর—১ম মণ্ডলের ৩১ সূক্তের ১০ম ঋকে আছে,—

"ত্বং অগ্নে প্রমতিঃ ত্বং, পিতাসি নঃ ত্বং, বয়স্কৃৎ, তব জাময়ো বয়ং।"

ইহার অর্থ অতি সহজ। "তুমি আমাদের প্রতি প্রমতি বা প্রসন্ন (Kind কিন্তু loving নয়?); তুমি আমাদের পিতা (তবুও loving নয়?); তুমিই বয়স্কৃৎ (অর্থাৎ জীবন বাড়াইতেছ এবং রক্ষা করিতেছ); আমরা তোমার জাময়ঃ বা সন্ততি-বর্গ। জাময়ঃ অর্থে রমেশ বাবু 'বন্ধু' করিয়াছেন। আমার প্রতিপাদ্য কথায় সে অর্থে বাধা নাই; কিন্তু অনুবাদটী ভুল। স্ত্রীলিঙ্গে 'জামী' অর্থ দুহিতা; কিন্তু এখানে এটী পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত এবং পদটী বহুবচনের। বন্ধু অর্থ হয় না। এত কথায়ও প্রেম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না? আবার এই সূক্তেরই ১৪শ ও ১৬শ ঋকেও ঐ পিতা পুত্র সম্বন্ধের কথা।

তাহার পরেই ৩৮ সূক্তের প্রথম ঋকেই পাই :—"কদ্ধনূনং কধপ্রিয়ঃ পিতা পুত্রং ন হস্তয়োঃ, ইত্যাদি। পিতা যেমন পুত্রকে হাত দুখানি বাড়াইয়া ধরে, তেমনি করিয়া ধরিতে বলাতেও কি Love পাওয়া যায় না? তবে বাইবেলে আছে যে, সমগ্র প্রাণ দিয়া ভালবাসিবার কথা। তাহাও এই ঋগ্বেদেই পাই। ৬১ সূক্তের ২য় ঋকে "হৃদয় মন ও জ্ঞান দ্বারা" স্তুতি পাই; তবুও হইল না কি?

বাইবলের ধর্ম্মের Love কেবল পিতা পুত্র দিয়া বুঝান হইয়াছে বলিয়া এই দৃষ্টান্ত গুলি দিলাম। প্রেমের গভীরতা দেখাইবার জন্য সতী স্ত্রীর স্বামী লাভের আকাঙ্ক্ষা দিয়াও বর্ণনা আছে। এ দৃষ্টান্তও ৬২ সূক্তের একাদশ ঋকে অতি সুস্পষ্ট। Love কথাটা যে ইহাতে বাইবলের ভাবা অপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়া পড়িল।

পুরাণগুলিতে যাহা কিছু ভাল কথা আছে, তাহা না হয় পাদ্রীদের কাছে শিখিয়া লেখা; কিন্তু ঋগ্বেদ যে বড়ই প্রাচীন; তাহার উপায় কি? বৈষ্ণব ধর্ম্মে যদি যীশুর ধর্ম্ম, তবে যীশুর ধর্ম্মের মূলমন্ত্র 'পিতা পুত্র' সম্পর্ক নাই কেন? স্বামী-স্ত্রী, সখা এবং কোলের ছেলের প্রেম দিয়া প্রেম বুঝান হইল কেন? এইরূপ সম্পর্কে প্রেমের কথা বলা ত খ্রীষ্টধর্ম্মে বরং পাপ। অন্য দিকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে পিতা সম্পর্কে ভগবানকে ডাকা ঠিক পাপ না হইলেও, ঐ সম্পর্কের কথা একেবারেই যে পাওয়া যায় না।

যীশু যদি কিছু নূতন কথাই না বলিলেন, তবে ঈশ্বর কেন যে একজাত পুত্রকে সংসারে পাঠাইবেন, তাহার যুক্তি পাওয়া যায় না। সেই জন্য খ্রীষ্টানেরা সর্ব্বদাই বলেন যে, প্রেমের ধর্ম্মটা যীশুই ভবধামে নূতন বলিয়াছেন; আর কেহ বলে নাই। ধর্ম্ম লাভের

চেষ্টা অপেক্ষা নিজের নিজের দর্প জারি করাই লোকের বড় কাজ; তাই এই সকল সঙ্কীর্ণ কথা লইয়া সময় নষ্ট

উপনিষদ গুলিতে যে প্রেম এবং আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহার দৃষ্টান্ত দিবার কোন প্রয়োজন নাই। একমাত্র সুপ্রাচীন বেদের গোটা কতক দৃষ্টান্তেই প্রমাণিত হয় যে, প্রেমের ধর্ম্ম ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

জন্মান্তর, কর্ম্ম ও আত্মোন্নতি। (২)

"দেহে পঞ্চত্ব মাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥
ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃনাজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত।

দেহের পঞ্চত্ব হইলে দেহী (জীব) কর্ম্মানুগামী, সুতরাং অবশ হইয়া অন্য দেহকে অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ করে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলিতেছেন, চলিতে এবং দাঁড়াইতে লোকে এক পদেই চলে এবং দাঁড়ায়। চলিতে এক পদ অগ্রে বাড়াইয়া পশ্চাৎ অন্য পদ বাড়ায়। দাঁড়াইতে এক পদেই ভর থাকে, অন্য পদ কেবল উপলক্ষ মাত্র। জলৌকা এক গাছি তৃণ অগ্রে ধরিয়া পশ্চাৎ পূর্ব্বধৃত তৃণ ত্যাগ করে। জীব তেমনি আতিবাহিক দেহ ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব-দেহ ত্যাগ করে। সূক্ষ্ম দেহই আতিবাহিক-দেহ। সেই দেহই দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে, এইজন্যই তাহার নাম আতিবাহিক দেহ। এই দেহই প্রেত দেহ। মুক্তাত্মার আতিবাহিক দেহপ্রাপ্তি নাই। সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে এই দেহেরই স্বর্গ নরকাদি হয়। স্বর্গ নরক ভিত্তিশূন্য কথা নয়। পরে স্থানান্তরে ইহার আলোচনা করা যাইবে।

"স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং
মনোরথেনাভি নিবিষ্ট চেতনঃ
দৃষ্ট শ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্
প্রপদ্যতে তৎ কিমপিহ্যপস্মৃতিঃ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত।

মানুষ কোন দৃষ্ট শ্রুত বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তিত ও চিন্তন করিতে করিতে তাহাই আবার স্বপ্নেও দেখে।

স্বপ্নে কেহ রাজা হয়, ইন্দ্র হয়, আরও কত কি হয়। একবার কোন দৃষ্ট শ্রুত বিষয় ভুলিয়া গেলেও বহু দিন পর তাহাই আবার স্বপ্নেও দেখে। যেমন ধ্বনি নষ্ট হয় না, তেমনি দৃষ্ট শ্রুত বিষয়ও এককালে স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয় না। বহুকাল যাহা বিস্মৃতি গর্ভে বিলীন হইয়াছে, আবার তাহা স্মৃতি-পথবর্ত্তী হইতে পারে। দৃষ্ট শ্রুত বিষয় মনে মুদ্রিত হয়। মৃত্যু সময়ে কর্ম্ম বশতঃ জীবের যে যোনিতে জন্ম হইবে, সেই স্মৃতি উপস্থিত হয়। স্বপ্ন দৃষ্ট বিষয়ের ন্যায় সে সেই যোনির চিন্তা করে এবং মৃত্যুর পর সে সেই যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

"যতোযতো ধাবতি দৈব চোদিতং
মনো বিকারাত্মক মাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়া রচিতেষু দেহ্যসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহতেন জায়তে॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত।

বিকারাত্মক মন মায়ারচিত পঞ্চভূতের মধ্যে দৈবপ্রেরিত হইয়া যাহাতে যাহাতে ধাবিত হয়, দেহী তাহাকেই প্রাপ্ত হয় এবং তৎসহ জন্ম পরিগ্রহ করে। দেহী এইরূপে কর্ম্মগুণে তাহার পরজন্মের আয়োজন করিয়াই দেহ হইতে বহির্গত হয়।

কর্ম্ম অখণ্ডনীয় বটে, কিন্তু কর্ম্ম জড়, তাহার স্বাতন্ত্র্য সম্ভবেনা। যে নিজে অস্বতন্ত্র, সে অন্যের পারচালক ও নিয়ামক হইতে পারে না। কর্ম্ম কখনও কর্ত্তা নয়। করণ হইতে পারে। কর্ত্তাই কর্ম্ম-প্রয়োজক। শুভাশুভ কর্ম্মজনিত যে অদৃষ্ট, তাহার কর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বর। নতুবা কিরূপ কর্ম্মের কিরূপ ফল বিহিত হইবে, কর্ম্ম স্বয়ং তাহার নির্দ্ধারণ ও বিধানে অক্ষম।

"কর্ম্মাণি কর্ম্মভিঃ কুর্ব্বন্ সনিমিত্তানি দেহভৃৎ।
তত্তৎ কর্ম্মফলং গৃহ্নন্ ভ্রমতীহ সুখেতরং॥
শ্রীমদ্ভাগবত।

সেই দেহী (জীব) কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা বাসনা সহিত কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করত দুঃখাত্মক সেই সকল কর্ম্মফল ভোগ করিয়া এই সংসার-পথে ভ্রমণ করিতেছে।

"ইত্থং কর্ত্তগতী গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহাঃপুমান্।
আহূত সংপ্লবাৎ সর্গ প্রলয়াবশ্নুতেহবশঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত।

এইরূপে জীব বহু অমঙ্গল-বাহি-কর্ম্ম-গতিতে ভ্রমণ করত প্রলয় পর্য্যন্ত অবসন্ন হইয়া জন্ম মরণ প্রাপ্ত হয়।

কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধিই জীবের উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যোনিতে জন্ম লাভের নিয়ন্ত্রী, যেমন এঞ্জিন শক্তিতে গতি প্রাপ্ত হইয়া যন্ত্র সকল গতিশালী হয়, তেমনি কর্ম্মশক্তি হইতেই জীবের সদসদ্ যোনিলাভ। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, জড়ত্ব নিবন্ধন কর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য নাই। যেমন জল ও তাপ সমুৎপন্ন বাষ্পশক্তি এঞ্জিন শক্তির জননী, তেমনি ঐশীশক্তি কর্ম্মশক্তির। সুতরাং মৃত্যুকালে যাহাতে ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে মৃত্যু হইতে পারে, ঈদৃশ কর্ম্ম করিতে পারিলেই জীবের সদ্গতি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন—

"অন্তকালো মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরং।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মৃত্যু সময়ে যে আমাকে স্মরণ করিয়া মরিতে পারে, সে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া মরিতে পারি, ইহারই আয়োজন সমস্ত জীবন ভরিয়া করিতে হয়। নতুবা মৃত্যুকালে কিছুতেই সেরূপ বুদ্ধি হইবে না এবং মনেও ঈশ্বরের চিন্তার ভাব আসিবে না। একজন মৃত্যুকালে কেবল আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাহার পুত্র বলিল, বাবা, হরি হরি বলুন। মুমূর্ষু বলিল "অত কথা যে বলতে পারি না" বস্তুতঃ সাধনহীন লোকের মনেও ঐশ্বরিক ভাব আসিবে না, মুখেও ঈশ্বরের নাম আসিবে না। স্ত্রী, পুত্র, বিষয় বিভব ইত্যাদি ছাড়িয়া যে যাইতে হইতেছে, এই চিন্তাই তাহাকে ঘোর যাতনা দিতে থাকে। সে মায়াপাশ ছিঁড়িতে পারে না। সাংসারিক মায়া তাহার অন্তরে সহস্র বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা দিতে থাকে। মৃত্যুভয়ে সে অত্যন্ত কাতর হয়। কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধি তাহাকে ভবিষ্য জন্মের স্মৃতি আনিয়া দেয়।

কর্ম্মই জীবের জন্ম মরণের, উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যোনির, সুখ দুঃখের এবং সম্পূর্ণ না হউক অনেকাংশে সদসৎ প্রবৃত্তিরও বীজ। এই জন্যই এক পিতার পাঁচ পুত্র মধ্যে

স্বভাবগত বৈষম্য দৃষ্ট হয়। শিক্ষা ও সঙ্গ-গুণেও অনেক ইতর বিশেষ হয় বটে, কিন্তু প্রাক্‌জন্ম-লব্ধ কর্ম্ম-সংস্কারের প্রভুতাও ইহাতে কম নহে।

স্তন্যপায়ী জীবগণের সদ্যঃপ্রসূত সন্তান তাহার মাতৃস্তন খুঁজিয়া লয়; ইহা সকলেই সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে তাহার খাদ্য আছে এবং ঐ স্তন্যই তাহার খাদ্য, এ শিক্ষা সে কখন কিরূপে পাইল? মাতৃস্তন্য পানের ন্যায় সদ্যোজাত জীব-শিশুতে ঐরূপ অন্য কোন জ্ঞান দৃষ্টিগোচর হয় না। এ জ্ঞান তাহার সহজাত, তাহার সন্দেহই নাই। সুতরাং পূর্ব্ব সংস্কার ভিন্ন এ জ্ঞান শিক্ষালব্ধ হইতে পারে না। আহার, নিদ্রা, মল মূত্রত্যাগ প্রভৃতি দৈহিক কার্য্য-গুলিতে জ্ঞানের কার্য্য নাই, ইহা দেহ ধর্ম্মের ক্ষয়াকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন। কিন্তু মাতাকে চেনা ও মাতৃস্তনের পরিচয়ে শিশুর জ্ঞানের কার্য্য দেখিতে পাই, ইহা কি শিশুর পূর্ব্বজন্মের সংস্কার-জনিত জ্ঞান নয়? সকলেই জানেন, দর্শন শ্রবণাদি ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানেরও ঐ সময় সম্যক্‌ স্ফুরণ হয় না। মাতা ও মাতৃস্তন সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে সাহজিক পূর্ব্ব সংস্কারলব্ধ, তাহার সন্দেহ নাই।

অধিকক্ষণ প্রদীপালোক দর্শনের পর অন্ধকারে গেলে ক্ষণকাল চক্ষুতে পূর্ব্বদৃষ্ট আলোকের ভাবটী একরূপ অস্পষ্টভাবে বিদ্য-মান থাকে। তাহাতেই স্বাভাবিকী দৃষ্টি-শক্তি যেন কিছু ক্ষীণা হয়। দৃশ্য বস্তু একটু অস্পষ্টভাবে চক্ষুতে প্রতিভাত হইতে থাকে। কিছুকাল পর ঐ ভাবটী থাকে না, চক্ষুর প্রকৃত দৃষ্টিশক্তি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আলোক দর্শনান্তে অন্ধকারে গেলে যেমন আলো-আঁধারিয়া একটা অস্পষ্টজ্ঞানচক্ষুতে থাকে; তেমনি মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিলে মাতা ও মাতৃস্তন পরিচায়ক জ্ঞানটী একটু অস্পষ্টভাবেই প্রকাশমান হয়; ক্রমে জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্যান্য সংস্কার গুলিরও অভিব্যক্তি হইতে থাকে। কোন বালক চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করে না, কিন্তু সে স্বভাবতঃ চিত্র করিতে ভালবাসে এবং সহ-জাত সংস্কার-জনিত প্রসক্তি গুণে যে চিত্র কার্য্যে অচিরেই নৈপুণ্য লাভ করে। সুপ্র-সিদ্ধ চিত্রকর রাজা রবিবর্ম্মা ঐরূপ একজন স্বভাব-চিত্রকর। তাঁহার ঐরূপ চিত্রকার্য্যে প্রবৃত্তি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কৃতি!

সিরাজগঞ্জের তারকনাথ কবিরাজ মহা-শয়ের পঞ্চম বর্ষীয় শিশুপুত্র গানবাদ্যে যেরূপ অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা অতীব বিস্ময়কর। সংবাদপত্র পাঠেও এ বালকের আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিষয় অনেকে পাঠ করিয়া থাকিবেন। বালকটী পঞ্চমবর্ষ বয়সেই চৌতাল, ধামার, সুরফাক, তেওড়া প্রভৃতি ধ্রুপদাঙ্গীয় গান গাইতে ও বাজাইতে পারিত। পরী-ক্ষার জন্য কেহ তাল ভঙ্গ করিলে সে অমনি ধরিয়া দিত। কখনও বা হাসিয়া উঠিত, কখনও বা গায়ক, কখনও বা বাদককে থাপড়া দিত। বৈদ্যনাথে ঐ বালকের গান বাদ্য শুনিয়া দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বিস্ময়াভি-ভূত হইয়াছিলেন। তারক কবিরাজ মহাশয় নিজেও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি শিশুপুত্রের ব্যব-হারোপযোগী একটী ক্ষুদ্র মৃদঙ্গ (পাখোয়াজ) প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ বালকের গান বাজনা শুনিতে কৌতূহল পরবশ হইয়া কত লোকই যাইত। প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্যা ব্যতীত পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর এরূপ অলৌকিক শক্তি লাভ অসম্ভব। মনুষ্যমণ্ডলী মধ্যে এই-রূপ উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট-প্রবৃত্তি, বিদ্যা, জ্ঞান ও

কর্ম্মের শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে, যাহা তাহার জন্ম, বয়স ও সঙ্গলব্ধ নহে, পরন্তু প্রাগজন্ম-সাঞ্চত সংস্কার-লব্ধ।

প্রহ্লাদ ভগবদ্ভক্তির বীজ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে বাল-স্বভাব সুলভ ক্রীড়াসক্ত ছিলেন না। কৃষ্ণ-রূপ গ্রহগ্রস্ত থাকায় জগতের কোন বস্তুতেই তাঁহার প্রসক্তি ছিল না, সুতরাং সর্ব্বদাই উন্মনস্ক থাকিতেন। কখনও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া করতালি দিতে দিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেন, কখনও বা ভাবোন্মত্ততায় গড়াগড়ি দিতেন। কখনও কৃষ্ণ হে, গোবিন্দ হে বলিয়া চীৎকার করিতেন। কখনও এক দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকিতেন। দুই চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইয়া ক্ষুদ্র বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। ঠিক ভূতাবিষ্ট মনুষ্যের ন্যায় তিনি নিজভাব ব্যক্ত করিতেন।

"কৃষ্ণগ্রহগ্রহীতাত্মা ন বেদজগদীদৃশং"

শ্রীমদ্ভাগবত।

কৃষ্ণরূপ গ্রহগ্রস্ত হইয়া এই বিচিত্র অনুপম সৃষ্টি-চাতুর্য্য-বিশিষ্ট জড়জগতের কোন বস্তুতেই তাঁহার দৃষ্টি থাকিত না। তিনি অন্তর্জ্জগতেই বিচরণ করিতেন। শ্রীমদ্-ভাগবতে তাঁহার শৈশব-জীবন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বর্ণমালার প্রথমাক্ষর ক দেখিয়া তাঁহার প্রভু কৃষ্ণের নামের আদ্যক্ষর বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। শুকদেব গোস্বামী শৈশবকাল হইতেই অনাসক্ত। চৈতন্যপ্রভু কাঁদিলে হরিধ্বনি দিলেই হাসিতেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি শৈশবকাল হইতেই যুদ্ধ-ক্রীড়া ভালবাসিতেন। ব্যূহনির্ম্মাণ করিতেন, দুই পক্ষ হইয়া বরফখণ্ড লইয়া পরস্পর ক্রীড়া যুদ্ধ করিতেন। থিওডোর পার্কার ৪ বর্ষ বয়সে একটী কচ্ছপকে প্রহার করিতে গিয়া মনে মনে প্রশ্ন করিলেন "ইহাকে প্রহার করিব কেন? এ'ত জীব, ইহারও তো আমাদের ন্যায় দুঃখবোধ আছে।' চারিবর্ষের শিশুর এজ্ঞান কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষগণ সকলেই পূর্ব্বজন্মজাত সংস্কারবশতঃ যে সাহজিক জ্ঞান লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, বাল্যে তাহারই আভাস প্রকটিত হইয়াছে এবং যৌবনে তদনুরূপ কর্ম্মদ্বারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। সকলেই অদৃষ্টের অনুবর্ত্তী, পুরুষকার তাহার সাহায্যকারী। পুরুষকার-বিমুখ অদৃষ্টবাদী ভ্রান্ত। মহাভারতে ব্যাসদেব অদৃষ্ট হইতে পুরুষকারেরই প্রাধান্য বর্ণনা করিয়াছেন। পুরুষকারে দৈবও প্রসন্ন মন, সুতরাং পুরুষকার অদৃষ্টের উপরেও জয়লাভে সমর্থ। শ্রীমদ্-ভাগবত এ বিষয়ে প্রতীপ-পথগামী। তিনি অদৃষ্টের এত অনুগত যে, এককালীন অজাগর-বৃত্তি অবলম্বনে পরামর্শ দিয়াছেন। এ বিষয় আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

সর্ব্বধর্ব্বী কাল সকল জীবকেই বিনাশের মুখে নিক্ষেপ করে। শুভ কিম্বা অশুভ অদৃষ্টের ফল যেরূপই হউক না কেন, প্রাগ্-জন্মসংস্কার জীবনের গতি যেদিকেই পরিচালিত করুক না কেন, শিক্ষা, সঙ্গ ও সাধন গুণে তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হয়। চোরের ছেলে সাধু ও সাধুর ছেলে চোর হওয়া কিছু-মাত্রও আশ্চর্য্য নহে। মানবজন্মে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই লক্ষ্যের অনুসরণ করিতে হইলেই, ভগবদ্ভজন একান্ত প্রয়োজনীয়। কেবল বাহ্য লইয়া থাকিলে এই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, গুরূপদিষ্ট উপায়ে ঈশ্বর চিন্তা করিতে হইবে এবং পরজন্মে উৎকৃষ্টগতি

লাভের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মৃত্যুকালে কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধি হয় এবং যেরূপ যোনিতে তাহাকে জন্মিতে হইবে, তাহার সেই চিন্তা উপস্থিত হয়। তবেই ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে যাহাতে মরিতে পারা যায়, মনুষ্য মাত্রেরই সেজন্য ...ত জীবন ভরিয়া সেই অভ্যাস করিতে হয়।

শ্রীজানকীনাথ গোস্বামী।

দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমচন্দ্র।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় একখানি বই লিখিলে ভয় হইত, বই বিক্রয় হইবে কিনা। এক্ষণে কি বাঙ্গালা পুস্তক, কি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা, সকলই আদরে পঠিত হইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছে। কিন্তু অনেকে বলিতেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা পুস্তক নির্ব্বাচিত করিবার সময় পুস্তকের দোষগুণ বিচার না করিয়াই পাঠ্যপুস্তক ঠিক করিয়াছেন। মুসলমান ছাত্রেরা বলেন যে, দুর্গেশনন্দিনী কখনই তাঁহাদের প্রিয় হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বলেন, দুর্গেশনন্দিনীতে তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। এইরূপ নানাপ্রকার অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। এই অভিযোগের যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে হইলে বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। অবশ্য আলোচনা যত বিস্তৃত হয়, ততই ভাল। এইজন্য আমরা এই প্রবন্ধে দুই একটী অবান্তর কথাও সন্নিবেশিত করিয়াছি।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়। (১) ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাট সাহেবের চেষ্টায় বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে Vernacular Literary Society নামক একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার বার্ষিক বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, সে সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত করিবার জন্য সুন্দর সুন্দর গল্প রচনা করাইয়া প্রকাশিত করাই সভার প্রধান কার্য্য ছিল। (২) সুতরাং এই সভা হইতে সুন্দর গল্প রচনার জন্য পারিতোষিক দেওয়া হইত। বঙ্কিম বাবু এই পারিতোষিকের জন্য প্রথম দুর্গেশনন্দিনী লিখেন। কিন্তু সভা ইহাকে পুরস্কারযোগ্য বিবেচনা করে নাই। (২) ইহাতে সভার দোষ কতদূর, বলা যায় না, কারণ সঞ্জীব বাবুও বঙ্কিম বাবুর প্রথম লিখিত উপন্যাসকে প্রকাশযোগ্য মনে করেন নাই। বঙ্কিম বাবু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বিদেশে থাকিবার সময় এই পুস্তকের সংস্কার করেন; সংস্কার কার্য্য শেষ হইবার অগ্রে, সঞ্জীব বাবু, যতটুকু সংস্কৃত হইয়াছিল, তাহা দেখিতে পান ও বঙ্কিম বাবুকে ইহা প্রকাশ করিতে উৎসাহিত করেন। শেষভাগ প্রথমে ভালরূপে (৩) সংশোধিত হয় নাই। তারপর অনেকবার

(১) গিরিজাবাবুর বঙ্কিমচন্দ্র।

(২) বিশ্বকোষ "বাঙ্গালা সাহিত্য—গদ্যশাখা"।

(৩) গিরিজা বাবুর বঙ্কিমচন্দ্র, হিতবাদী সংস্করণ।

পুস্তকখানি সংশোধিত হইয়াছে। "বঙ্কিমবাবু বিবিধ প্রবন্ধের একটী প্রবন্ধে উপদেশ দিয়াছেন যে, লেখক নিজের প্রবন্ধাদি লিখিয়া কিছুদিন ফেলিয়া রাখিবেন; পরে সংশোধিত করিয়া প্রকাশ করিবেন। এই উপদেশ তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতার ফল।

যে সময়ে দুর্গেশনন্দিনী প্রথম প্রকাশিত হয়, সে সময় বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য দুই প্রকার ভাষায় লিখিত হইত—তত্ত্ববোধিনী বা বিদ্যাসাগরী ভাষা, এবং গ্রাম্য বা আলালী ভাষা। বঙ্কিম বাবু প্রথমটীকে সুবোধ্য এবং দ্বিতীয়টীকে সংস্কৃত করিয়া উভয়ের মিশ্রণে একটী ভাষা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের ভাষা।*

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার সময় বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগের আরম্ভ হইয়াছিল। বঙ্গ সাহিত্যের ইংরাজি-নবিশ মহারথিগণ তখন বঙ্গের ভাণ্ডারের বিবিধ রতন খুঁজিয়া পাইয়াছেন। মধুসূদন তখন বিলাতে। রঙ্গলাল বাবু, ভূদেব বাবু ইত্যাদি মনীষিগণ তখন নিজকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। তখন ভূদেব বাবুর অঙ্গুরীয়-বিনিময় বাহির হইয়াছে। কিন্তু তখনও শিক্ষিত বাঙ্গালী বুঝিতে পারে নাই যে, বাঙ্গালায় তাঁহাদের পাঠ্য উপন্যাস লিখা যাইতে পারে। যদিও, বঙ্কিম বাবু যখন বিষবৃক্ষ লিখিয়াছেন, এমন কি, যখন তাহা অনূদিত হইয়াছে, তখনও দুই একজন লোক পাওয়া যাইত, যাঁহারা বাঙ্গালায় যে তাঁহাদের পাঠ্য উপন্যাস লিখা যাইতে পারে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; তথাপি ইহা বলিলে অতিরঞ্জন করা হইবে না যে, বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনী বাহির হইবার পর হইতে ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালী বাঙ্গালার মাটী ও বাঙ্গালার জলের স্বাদ বুঝিতে পারিয়াছে।

বঙ্কিম বাবু সমালোচনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। তাঁহার পুস্তকগুলির দোষ ও কল্পিত দোষ লইয়া দলাদলি বাঁধিয়া যায়। (সে দলাদলির এখনও শেষ হয় নাই) চন্দ্রনাথ বাবুর "বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি" নাম্নী ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এই দলাদলি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই সংক্ষেপে লিখা আছে, সুতরাং এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। বঙ্কিম বাবুর "পাণিগৃহিত্রী" (৩০৪ পৃঃ ২২শ প ২০ খ), "সাক্ষাতের প্রার্থিতা" (১৭৬ পৃ ৫ম প ২০খ) বঙ্গ ভাষায় গৃহীত হইবে না, স্বীকার করি; কিন্তু হীরেন্দ্র বাবু বঙ্কিম সম্বন্ধীয় একটী বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও যথার্থ যে, বাঙ্গালা ভাষাকে বঙ্কিম যে খাদে ফেলিয়া দিয়াছেন, আজও বঙ্গভাষা প্রধানতঃ সেই খাদে চলিতেছে। * বঙ্কিম নিজে লিখিয়াছেন "এমন বলিতে চাহি না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয়, তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্য আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক দূর পাক খাইতেছি।" †

* বিশ্বকোষ বাঙ্গালা সাহিত্য (গদ্যশাখা) দ্রষ্টব্য।

* Y. M. C. A. তে দীনেশ বাবু বঙ্কিম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, হীরেন্দ্র বাবু সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

† বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ৩য় ভাগ (বসুমতী সংস্করণ) ২৭৯ পৃঃ।

সমালোচকগণ, বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ ইংরাজি ভাব-পূর্ণ ও ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্যতা-বিশিষ্ট বলিয়া বুঝিতে লাগিলেন।

বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থে ইংরাজি ভাব অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিম বাবু যে কতটা সমাজকে মুকুর ধরিয়াছিলেন, এবং কতটা সমাজকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে চালিত করিয়াছেন, বলা শক্ত; বোধ হয় অসাধ্য। প্রত্যেক সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য, লোকপ্রীতি অপেক্ষা উচ্চতর হওয়া উচিত। বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্য সমাজকে শিক্ষিত করা।

বঙ্কিম বাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাসেও এই ইংরাজি ভাববাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গেশনন্দিনীতে ইংরাজি ভাবের অভাব নাই। একটী ক্ষুদ্র উদাহরণ, যথা—বঙ্কিম বাবুর বিমলা ও জগৎ সিংহ উভয়েই পরিচয় জিজ্ঞাসা করা অভদ্রতা বিবেচনা করেন—অথচ যেখানে ইংরাজি শিক্ষা ও ইংরাজি ধরণ এখনও প্রবেশ করে নাই,-ভারতের এরূপ সকল স্থানে অদ্যাপি পরিচয় জিজ্ঞাসা করা আলাপের প্রথম পদ্ধতি বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু ইংরাজের সবই যে দোষ, তাহা নহে। বঙ্কিম বাবু, তাঁহার নায়কাদিকে, যতদূর সম্ভব,যাহাতে আদর্শভাবাপন্ন করিয়া বর্ত্তমান সমাজের নিকট আনয়ন করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবু বিমলা, আয়েষা ও তিলোত্তমাকে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়াছেন। শূদ্রের কন্যা, দাসী বলিয়া পরিগণিতা,তাহার কথা স্বতন্ত্র। § কিন্তু তিলোত্তমার কোর্টশিপ্ কেমন বিসদৃশ বোধ হইতে পারে। কিন্তু কবিত্ব পক্ষে কোর্টশিপ-দৃশ্য সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বিমলা, তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের হৃদয়ের পবিত্রতা জাজ্বল্যমান হইয়াছে। যে কারণে আমরা রবি বাবুর নৌকাডুবির প্রশংসা করি, সেই কারণেই আমরা দুর্গেশনন্দিনীর কোর্টশিপ্ অংশ পছন্দ করি। কবিকে সকল সময় সত্যের নিগড় পরাইতে হইলে সেক্ষপীর, কালিদাসের অনেকটা খ্যাতি নষ্ট করিতে হয়, আয়েষাকে পর্দ্দা হইতে বাহির করা অন্ততঃ কবিত্বপক্ষে প্রশংসনীয় বলিয়াই আমরা বিবেচনা করি। কালানৌচিত্য দোষ না থাকিলে প্রধান প্রধান কবির পুস্তক হইতে তাঁহাদের কালনিরূপণ করা যাইত না—এবং প্রায় সকল কবির গ্রন্থে কালানৌচিত্য দোষ পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবু ইংরাজি মেয়েদের কথা পড়িয়াছিলেন ও শিক্ষিতা ব্রাহ্মমহিলাদের দেখিয়াছিলেন, এই উভয়ের সংমিশ্রণে, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রভাব মিশ্রিত একটী ছায়া তাঁহার মনের উপর পড়িয়াছিল। বঙ্কিম বাবু অনেক স্থানে সমাজকে সরাইয়া রাখিয়াছেন—অবজ্ঞাভরে নহে, সমাজকে উন্নতহৃদয় করিবার জন্য।

"সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যাঁর মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।"

—মাইকেল মধুসূদন। *

দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিম বাবু ইংরাজি ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি, ইংরাজ যে সম্পূর্ণ দোষপূর্ণ এবং আমরা যে গুণের একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছি, ইহা বিশ্বাস করিতেন

§ বৈষ্ণব কবিদের গ্রন্থে অভিসার আছে। এবং অভিসার বর্ণনায় কবিত্ব আছে।

* মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী (বসুমতী সংস্করণ) ১৭০ পৃষ্ঠা।

না। † 'আনন্দমঠ' প্রণেতা, 'বন্দেমাতরম্' রচয়িতার ন্যায় স্বদেশপ্রেমিক কয়জন আছেন? আমাদের চক্ষে বঙ্কিম বাবু ও তাঁহার দুর্গেশনন্দিনীর মানসিংহে অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। মানসিংহ আকবরের বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসযোগ্য কর্ম্মচারী, কিন্তু মানসিংহের হৃদয় স্বদেশপ্রেমহীন নহে। মানসিংহ জগৎসিংহের যোদ্ধৃপতিত্ব গুণের পরিচয় শ্রবণ করিয়া বলেন "বুঝি আবার কুমার হইতে রাজপুত নামের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্দীপিত হইবে।" মানসিংহ জানিতেন যে, মোগল বলবান্, মোগল হিন্দু অপেক্ষা দেশশাসনে ও দেশরক্ষণে পটু। মানসিংহ সেই জন্যই মোগলের বাস্তবগুণাধিক্যের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। কিন্তু কূটবুদ্ধি এবং রাজ্যশাসন ক্ষমতায় মোগল সমকক্ষ কোন সেনাপতির অভ্যুদয় হইলে মানসিংহ হৃষ্ট ভিন্ন দুঃখিত হয়েন না; হয়ত তাঁহার বিরুদ্ধে অন্নদাতার পক্ষ হইতে যুদ্ধ যাত্রা করিতেন, কিন্তু নিশিদিন ঈশ্বর সকাশে শত্রুর জয়কামনা করিতেন। আজ যদি ঈশ্বর বঙ্কিমের শারীরিক জীবন রক্ষা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস (আমরা কি ভ্রান্ত বিশ্বাসে পতিত?) তিনি Moderate দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন (যে দলের নেতা রবীন্দ্রনাথ)। বঙ্কিম কি জানিতেন যে, ভারত আর্য্যের নহে, অনার্য্যেরও নহে, হিন্দুরও নহে, মুসলমানেরও নহে, নেটিভেরও নহে, ইংরাজেরও নহে; ভারত ভারতীর?* আমাদের বোধ হয়, দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিম, ঘৃণা কাহাকে বলে, জানিতেন না। বঙ্কিমের সহানুভূতি তাঁহার আয়েষার সহানুভূতির ন্যায় জাতি ও ধর্ম্ম বিচার করিত না। তবে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র কোন সম্প্রদায় বিশেষকে তোষামোদ করিতে ঘৃণা করিতেন। তাই আনন্দমঠের শেষ অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজের ভারতীয়ের উপর রাজ্য শাসনশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন এবং ভারতে ইংরাজ-শাসন ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়াছেন, আবার চন্দ্রশেখরে তাৎকালীন ভারতীয় ইংরাজের মানসিকাবনতি রামচরণের সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "হাঁগুলি মিগুলিতে যে বিশ্বাস করে, সে শালা।"

যাঁহারা দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমকে মুসলমান-দ্বেষী বলেন, তাঁহাদের এই কথা মনে রাখা উচিত যে, বঙ্কিমের তাৎকালিক মুসলমান-রাজগণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ইংরাজ-রচিত পুস্তক হইতে গৃহীত। বঙ্কিম হিন্দু শাস্ত্রাদি, হিন্দু জ্যোতিষাদি আলোচনা করিয়া হিন্দু সম্বন্ধে ইংরাজের ভুল সংস্কারগুলি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। যদি তিনি বঙ্গের ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন, আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান-রাজগণ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অনেক পরিবর্ত্তিত হইত। আমার বোধ হয়, বঙ্কিমের কৎলু-খাঁর জন্য তাঁহার ইংরাজ-লিখিত ইতিহাসাধ্যায়ন দায়ী; এবং ওস্মান্ তাঁহার পরিচিত মুসলমানের ব্যবহারের ফল। তবে ইহাও

† বঙ্কিম বাবু পরে মত বদলাইয়াছিলেন, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলীর ভূমিকায় বঙ্কিম লিখিয়াছেন, "আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ, আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।" (বসুমতী সংস্করণ, বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রন্থাবলী ৭ম ভাগ ২৭৪ পৃঃ)।

* ভাষার জন্য লেখক "প্রতাপাদিত্য" "প্রণেতা" ক্ষীরোদ বাবুর নিকট ঋণী। ভাবটী রবি বাবুর একটা আধুনিক বক্তৃতা হইতে গৃহীত।

মনে রাখিতে হইবে যে, কবি-স্বাভাবিক অতিরঞ্জন যে তাঁহার পুস্তকে থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। সুতরাং আমাদিগকে প্রথমে বঙ্কিমের কবিত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

'দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমের' কবিত্ব বুঝিতে হইলে তাঁহার স্ত্রী-চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

নায়িকা তিলোত্তমাকে আমরা প্রথম মন্দিরে দেখিতে পাই। তখন দেখি, তিলোত্তমা কোমলা, লজ্জাশীলা, মন খুলিয়া কথা কহিতে সঙ্কুচিতা। পরে যখন বাতায়নে তিলোত্তমাকে দেখি, তখনও সেই ভাব; প্রভেদ এই যে, কন্দর্পশরাঘাত-ক্ষত হৃদয়কে জর্জ্জরিত করিয়াছে। বিমলাকে ভালবাসে, বিমলার সহিত দু'একটী মনের কথাও বলে, কিন্তু তাহা বিমলার কৌশলে। পরে তিলোত্তমাকে জগৎসিংহের সহিত একত্র দেখি, তখন তিলোত্তমা তন্ময় হইয়া রোদন করিতেছে, তিলোত্তমা জগৎসিংহ সমীপে বাক্যহারা, নিস্তব্ধা। তিলোত্তমা নিরীহা হিন্দু বালিকা। তিলোত্তমার প্রাণের কথা মুখে ফুটে না। তিলোত্তমার কারাগারেও সেই ভাব। তিলোত্তমা জগৎসিংহের বাক্যের প্রতিবাদ করিতে অক্ষমা। হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, তথাপি বাক্য স্ফুরণ হয় না। তিলোত্তমা ধীরা, তাহাকে সহিষ্ণুতাশালিনী বলা যায় না; তিলোত্তমা অত্যন্ত আনন্দের পর হঠাৎ কোন শোক বা তাপ পাইলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। যখন তিলোত্তমা শুনিল, তাহার পিতা শত্রু হস্তে বন্দী, তখন সে পালঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আবার যখন কারাগারে রাজপুত্র বলিলেন 'বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা এখানে কি অভিপ্রায়ে?' তখন তিলোত্তমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, প্রত্যুত্তর দিবার শক্তি লোপ পাইল। যখন রাজপুত্র আবার বলিলেন "তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ, ফিরিয়া যাও; পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হও।' 'তখন তিলোত্তমা অকস্মাৎ বল্লীবৎ ভূতলে পতিতা হইল।' এ ঘোর অন্ধকারে যে এক নক্ষত্র প্রতি দৃষ্টি ছিল, সেও তাহাকে আর কর বিতরণ করে না; এ ঘোর ঝটিকায় যে লতায় প্রাণ বাঁধিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িল; যে ভেলায় বুক দিয়া সমুদ্র পার হইতেছিল, সে ভেলা ডুবিল, তিলোত্তমা মৃত্যুপথে চলিল —জগৎ সিংহের প্রেম ফিরাইয়া পাইয়া আবার বাঁচিয়া উঠিল। তিলোত্তমা শ্লেষ জানে না; জীবনের একবার মাত্র বিমলাকে শ্লেষ করিয়াছিল। সে শ্লেষোক্তি তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে উঠিয়াছিল—যবন-বিলাস-ভবনে কৎলুখাঁর জন্মোৎসবে বিমলাকে বেশভূষালঙ্কৃত দেখিয়া তিলোত্তমা হৃদয়ে বড় আঘাত পাইয়া বলিয়াছিল 'আজকার দিনের জন্য উপায় করিবার প্রয়োজন।' বিমলা জগৎ সিংহ নহে; বিমলা তাহার মিত্র, সখী, মাতা। কিন্তু তিলোত্তমাও কথা কহিতে শিখিয়াছিল। আসন্ন মৃত্যুমুখে পতিতা কুন্দনন্দিনী একদিন কথা কহিয়াছিল, —নগেন্দ্রনাথের আদর পাইয়া; * মৃত্যুমুখ হইতে পুনরাগতা তিলোত্তমাও কথা কহিতে শিখিয়াছিল—জগৎ সিংহকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া। কৎলুখাঁর বিলাসভবনে তিলোত্তমা ব্রীড়াবিবশা বালিকা ছিলনা, ভয়সঙ্কুচিতা রমণীতে পরিণতা হইয়াছিল; এখনও তিলোত্তমা আর ব্রীড়াবিবশা বালিকা রহিল না, কোমলতাময়ী যুবতীর রূপ ধারণ করিয়াছিল। তাই তিলোত্তমা জগৎ সিংহকে

* "বিষবৃক্ষ" বঙ্কিচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—দ্বিতীয় ভাগ (বসুমতী সংস্করণ)।

তাহার স্বপ্নের কথা বলিতে পারিয়াছিল। তাই তিলোত্তমা আয়েষাকে বলিতে পারিয়াছিল "আপনাকে ভুলিলে যুবরাজ আমার মুখ দেখিবেন না।" তিলোত্তমা কাঁদিতে জানে; কাঁদাইতে পারে না; হাসিতে জানে না, হাসাইতে পারে না।

তীব্র বুদ্ধিশালিনী বিমলা আগে কেবল কাঁদিতেই জানিত, কাঁদাইতে অল্পই পারিত। তাই বিমলা মানসিংহ-অন্তঃপুরে বীরেন্দ্র সিংহকে ধরা দিয়াছিল। তাই বিমলা দাসীরূপে বীরেন্দ্র সিংহের অন্তঃপুরে আসিতে পাইয়া নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করিয়াছিল। বিমলা শিখিতে পারিয়াছিল যে সংসারে আমরা কয়দিন? কাঁদিবারই বা প্রয়োজন কি? একদিকে যেমন সংসারে দুঃখ আছে, অপরদিকে সুখও আছে। সন্তানহীনা সরল শিশু পাইয়া, পিতৃপরিত্যক্তা পিতার যত্ন পাইয়া, স্বামীপ্রেমবঞ্চিতা স্বামীর প্রেম ফিরাইয়া পাইয়া হাস্যময়ী হইয়া পড়িল। একে একে বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিষ্কৃত হইতে লাগিল কিন্তু 'বিমলা পুরস্ত্রী; সুতরাং অনেকে বলেন যে দিগ্‌গজ, সেখ রহিম, কৎলুখাঁদির সহিত যে নীচজাতীয়া রসিকতায় ব্যাপৃতা ছিল, ইহা তাহার চরিত্রের কলঙ্ক এবং কবির অনুপযুক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে গিরিজা বাবু যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার উপর কলম চালাইলে ধৃষ্টতার পরিচয় দেওয়া হইবে। তিনি তিনটী কারণ দেখাইয়াছেন, যাহাতে আমরা বিমলাচরিত্রের এই অংশে দোষ দিতে পারি না। প্রথমতঃ বিমলা বাল্যকালে কতকটা স্বাধীন ছিল; দ্বিতীয়তঃ বিমলার রসালাপ মৌলিক, তৃতীয়তঃ ইন্দ্রিয়জয়ী বিদ্রূপ করিয়া অন্যকে রূপ প্রলোভন দেখাইবে না কেন? বঙ্কিমবাবু, আমাদের বিশ্বাস, বিমলাচরিত্রে সমাজের প্রতি এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ব্যক্তিসম্বন্ধে সমাজ যেন হঠাৎ কোন একটা সিদ্ধান্ত না করে। হাস্যময়ী, কৌতুকময়ী বিমলা যেমন হাসিতে ও হাসাইতে শিখিয়াছিল, সেইরূপ কাঁদিতে ও কাঁদাইতেও শিখিয়াছিল। তিলোত্তমার মনঃক্লেশ দেখিয়া বিমলা পুনরায় কাঁদিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু স্বামিবিহীনা না হওয়া পর্য্যন্ত এই ক্রন্দনশিক্ষার সম্পূর্ণ পূর্ত্তিলাভ হয় নাই। "স্বামি! প্রভু, প্রাণেশ্বর!" বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ন্যায় অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে বিমলা কহিতে লাগিল "স্বামি! কণ্ঠরত্ন! কোথা যাও! আমাদের কোথা রাখিয়া যাও?" কিন্তু বিমলার আর কাঁদা হইল না। বিমলা বুঝিতে পারিল যে, এই নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ লইতে বিমলা ভিন্ন আর কেহ নাই—বীরেন্দ্রের পুত্র নাই; একমাত্র সন্তান তিলোত্তমা; অমন মূর্ত্তিমতী কোমলতার পক্ষে পিতৃহত্যার পরিশোধ লওয়া অসম্ভব। বিমলা কান্না বুকে চাপিয়া রাখিয়া গোলাপাভ্যন্তরস্থিত কীট হইয়া গোলাপাকৃতি ধারণ করিল। যে বিমলা একটী সামান্য সৈনিককে জগৎসিংহ হস্তে নিপতিত দেখিয়া ক্লেশ পাইয়াছিল, তাহার এই কার্য্য যদি অসম্ভব হয়? তাই বিমলা স্বামীর রুধিরে মনের সঙ্কোচ বিসর্জ্জন করিল। বিমলা আরও বুঝিল যে, কাঁদিবার সময় সে অনেক পাইবে এবং পাইয়াছিল। কিন্তু অনেকে বলেন, বিমলার দারুণ প্রতিহিংসাবৃত্তি ও অমানুষিক কার্য্য পুরুষভাবব্যঞ্জক ও অস্বাভাবিক। আমরা উপরে গিরিজাবাবুর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, বিমলার কার্য্য অস্বাভাবিক নয়। তাঁহার অপরাপর যুক্তির উল্লেখ করিয়া এই সম্বন্ধে আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

প্রথমতঃ বিমলা রাজপুত-রমণী, দ্বিতীয়তঃ বিমলার অপরিসীম সাহস। গিরিজা বাবু মাইকেল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন যে—

ভেবে দেখ বীর যে বিদ্যুৎছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে।*

বিমলা-চরিত্রের উজ্জ্বল চিহ্ন তাহার তিলোত্তমা-প্রীতি। তিলোত্তমাকে বিমলা অঙ্গুরীয় দিয়া তাহার পলায়নের উপায় করিয়া নিজে এক মহাবিপজ্জনক কার্য্যে চলিল। তিলোত্তমার সুখে বিমলা সুখী, তিলোত্তমার দুঃখে ম্রিয়মাণ।

কিন্তু এই পরোপকারতৎপরা বিমলার চিত্র হইতে অধিক পরোপকারতৎপরা আয়েষার চিত্র আরও উজ্জ্বলতর। আয়েষা আদর্শ-রমণী, "যথার্থই দেবকন্যারূপিনী"। আয়েষা হাসিতে চাহে না, হাসাইতে চাহে; কাঁদিতে চাহে না, কাঁদাইতে চাহে না। পাঠক, তুমি কৃষ্ণগগনে শ্বেতসৌদামিনীকে বাহির হইয়াই লুকাইতে দেখিয়াছ, কিন্তু ধবলাকাশে কৃষ্ণবিদ্যুতের ক্রীড়া দেখিয়াছ কি? তাহা যদি না দেখিয়া থাক, তাহা হইলে আয়েষার দিকে দৃষ্টিপাত কর। এ হৃদয়াকাশে শোক আসে, আবার তখনই লুকাইয়া পড়ে; কোথায় যায়? একেবারে কি মিলিয়া যায়? জানি না। তুমি বলিতে পার, ঐ নীলাকাশের সৌদামিনী কোথায় যায়? তাহা যদি না বলিতে পার, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিও না, আয়েষা নিরাশ-প্রণয়া কি না।† কবি তোমায় উত্তর দিতে পারিবেন না। কবি আয়েষাকে আত্মঘাতিনী করেন নাই, তাহার কারণ, বোধ হয়, পাছে কোন কবিত্ববিহীন শব্দব্যবচ্ছেদক তাহার উপর অস্ত্রাঘাত করে। আয়েষা জগৎসিংহকে লিখিয়াছিল "আমি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী নহি। আমি যাহা দিবার, তাহা দিয়াছি। তোমার নিকট প্রতিদান চাহিনা, আমার স্নেহ এমন বদ্ধমূল যে, তুমি স্নেহ না করিলেও আমি সুখী। ... ... যদি কখন সুখী হও, আয়েষাকে সংবাদ দিও, যদি কখন অন্তঃকরণে ক্লেশ পাও, আয়েষাকে স্মরণ করিবে?" কিন্তু এই পত্র লিখিবার পর এক দিন আয়েষা তিলোত্তমাকে বলিয়াছিল 'ভগিনি, এ সকলের প্রশংসা করিও না। তুমি আজ যে রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিলে, এ সকল তাঁহার চরণরেণু তুল্য নহে।" আয়েষা তিলোত্তমার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া এত যন্ত্রণা পাইয়াছিল যে, অঙ্গুরীয়ের বিষে তাহার অবসান করিতে গিয়াছিল—কিন্তু পরে সেই লোভ সম্বরণ করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল "যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন?" কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের বিধানের প্রতিবাদ করে না। আয়েষা জগদীশ্বর চরণে আপনার সুখদুঃখ অর্পণ করিয়াছে। আয়েষা হৃদয়ের কষ্ট যাহাতে আত্মাকে পীড়া না দেয়, তাহা করে, আয়েষা তিলোত্তমার সরল প্রেমপ্রতিম মুখ দেখিয়া বিধাতার চরণে এই ভিক্ষা করিয়াছিল যেন ইহার দ্বারায় জগৎসিংহের চিরসুখ সম্পাদিত হয়। তীক্ষ্ণদৃষ্টি আয়েষা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার পক্ষে জগৎসিংহ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। জগৎসিংহকে পাইতে হইলে তিলোত্তমাকে কাঁদাইতে হয়, ওস্‌মানকে কাঁদাইতে হয়। আয়েষা কাঁদাইতে চাহে না; আয়েষা হাসাইতে চায়। তাই আয়েষা মুখ অবনত করিয়া কৎলুখাঁর

* মাইকেল মঃ দত্তের গ্রন্থাবলী (বসুমতী সংস্করণ ২৬ পৃঃ।

† গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ও ইহার সম্যক মীমাংসা করিতে পারেন নাই। আমাদের ত কথাই নাই। "বঙ্কিমচন্দ্র" (হিতবাদী সংস্করণ)।

ক্ষণে কাণে (কৎলুখাঁর মৃত্যুকালে) তিলোত্তমার পবিত্রতা প্রকাশ করিবার উপদেশ দিয়াছিল—ওস্‌মান আয়েষাকে মনঃপীড়িত না করিলে আয়েষার হৃদয়ের তাপ কখনই প্রকাশ পাইত না। তাই আয়েষা জগৎসিংহের নিকট আয়েষার নাম উত্থাপন করিতে তিলোত্তমাকে বারণ করিয়াছিল। আয়েষা একবার ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিল—উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিল "শুন, ওস্‌মান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর—যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কাল যদি বধ্যভূমি ইঁহার শোণিতে আর্দ্র হায়, তথাপি দেখিবে, হৃদয়মন্দিরে ইঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্য্যন্ত আরাধনা করিব। এই মুহূর্ত্তের পর, যদি আর চিরন্তন ইঁহার সঙ্গে দেখা না হয়, কাল যদি ইনি মুক্ত হইয়া শত মহিলার মধ্যবর্ত্তী হন, আয়েষার নামে ধিক্কার করেন, তথাপি আমি ইঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী দাসী রহিব। আরও শুন; মনে কর, এতক্ষণ একাকিনী কি কথা বলিতেছিলাম? বলিতেছিলাম, আমি দৌবারিকগণকে বাক্যে পারি, ধনে পারি বশীভূত করিয়া দিব; পিতার অশ্বশালা হইতে অশ্ব দিব; বন্দী পিতৃশিবিরে এখনই চলিয়া যাউন। বন্দী নিজে পলায়নে অস্বীকৃত হইলেন।" কিন্তু আয়েষার উত্তেজনার কারণ ছিল। আয়েষাকে ওস্‌মান অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছে। আয়েষার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছে, তাই আয়েষা ওস্‌মানের নিকট ক্ষমা চাহিতে চাহিতে পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল—"কিন্তু তুমি আজ আয়েষাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছ। আয়েষা অন্য যে অপরাধ করুক, অবিশ্বাসিনী নহে। আয়েষা যে কর্ম্ম করে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে। এখন তোমার সাক্ষাৎ বলিলাম, প্রয়োজন হয় কাল পিতার সমক্ষে বলিব"। কিন্তু আয়েষা কাঁদাইতে চাহে না। আয়েষা চিরানন্দদায়িনী হইতে চাহে। আয়েষা জগৎসিংহ ও ওস্‌মান উভয়ের নিকট ক্ষমা চাহিল। একজন যদি তোমাকে জীবন দান করে, আর তার স্নেহের প্রতিদান দিতে যদি না পারে, তাহা হইলে কি তোমার মনে কষ্ট হয় না? জীবনদায়িনী আয়েষার প্রেমের প্রতিদান জগৎসিংহ কি করিয়া দিবেন—তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে; কি করিয়া এই ক্ষত হৃদয়ে তিনি আয়েষার পূজা করিবেন, এইরূপ ভাবিয়া হয়ত জগৎসিংহ কষ্ট পাইবেন, তাই আয়েষা জগৎসিংহের নিকট ক্ষমা চাহিল। আয়েষা ওস্‌মানকে বলিল "ওস্‌মান...যদি দোষ করিয়া থাকি, দোষ মার্জ্জনা করিও। আমি তোমার পূর্ব্বমত স্নেহপরায়ণা ভগিনী; ভগিনী বলিয়া তুমিও পূর্ব্বস্নেহের লাঘব করিও না। কপালের দোষে সন্তাপসাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, ভ্রাতৃস্নেহে নিরাশ করিয়া আমায় অতলজলে ডুবাইও না।" আয়েষা আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিল—স্মৃতিটুকু ফিরে দিল না। আয়েষার প্রেম জাতি ও ধর্ম্ম বিচার করে নাই, তাহার দয়া জাতি, ধর্ম্ম বা পাত্র ভেদ করে নাই। হিন্দু-বন্দীকে সেবা করিতে আয়েষার কত আগ্রহ; তিলোত্তমাকে যখন আয়েষা কোলে লইল, জগৎসিংহ ও দাসী মনে করিল 'আহা, কি সুন্দর!' প্রতিদ্বন্দ্বিনী-প্রণয়িনীর আয়েষা যে উপকার করিয়াছিল, তাহা এক ঈশ্বর ভিন্ন তাহাকে আর কেহ করে নাই—আয়েষা তিলোত্তমার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর। (২)

পাঠক মহাশয়েরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে বিদেশী লোকের অবস্থান জন্য সুবিধাজনক স্থান আছে কি? ইহার উত্তর সন্তোষজনক, সুতরাং সে বিষয়ে পাঠক নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। এমন ভুবনবিখ্যাত, সুপ্রাচীন ও সুপবিত্র তীর্থে—এমন অসংখ্যাসংখ্য ভক্তাধিক ভক্ত যাত্রীবৃন্দের আধ্যাত্মিক আশ্রমধামে—ভক্তের জন্য কি স্থানের অভাব হইতে পারে? হিন্দু-শাস্ত্রের বিধি এই, অন্ততঃ ত্রিরাত্রি তীর্থ স্থানে বাস করিতে যাত্রীরা বাধ্য; প্রথম-বারের দর্শনে তিন দিন তিন রাত্রি বাস করিতেই হয়, দ্বিতীয় বা অন্যবারে তিন দিন না থাকিলেও শাস্ত্র অমান্য করা হয় না। ভাড়া দিয়া রামেশ্বরে বাসাবাটী পাওয়া যায়, কিন্তু ভাড়াটিয়া বাটীর সংখ্যা অল্প; যাত্রীরা ভাড়া দিয়া কেহ বাসা গ্রহণ করে না। অনেক রাজা, রাণী, জমিদার, বণিক ও বড় লোকের খয়রাতী সুন্দর বাটী আছে, সেই সকল বাটীতে যাত্রী ও ভ্রমণকারিগণ বিনা পয়সায় থাকিতে পারে। বাটীসমূহ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং সুবিধাজনক। জলাদির কষ্ট নাই। এই সমস্ত বাটী এক একজন পাণ্ডার অধীনে থাকে। এখানে পাণ্ডাদের জুলুম নাই। সুতরাং সর্ব্ব প্রকারেই সুবিধাজনক। পরিবার সঙ্গে লইয়াও থাকা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় লোকের দেশীয় হোটেল আছে। পয়সা দিয়া তথায় ভোজনাদি হইতে পারে, কিন্তু অবস্থানের বড় সুবিধা হয় না। রামেশ্বরে চাউল, ডাউল, ময়দা, ঘৃত, লবণ, লুচি, মণ্ডা, শর্করা প্রভৃতি সমুদয় দ্রব্যই খরিদ করিতে পাওয়া যায়। মাংসের পরিমাণ কম, সমুদ্রজ মৎস্য প্রচুর এবং খুব সস্তা, কিন্তু তীর্থ স্থানে আসিয়া প্রায় কেহই আমিষ ভক্ষণ করে না। এদেশে শূদ্রগণ ব্যতীত অপর কেহ মৎস্য মাংস আদৌ স্পর্শ বা ব্যবহার করে না। আম, জাম, নারিকেল, তাল, তর্ম্মুজ, লেবু, কদলী, বারমাস সকল ঋতুতে প্রচুর পরিমাণে সুলভে বিক্রীত হয়। আম খুব সস্তা। বার-মাসই আমগাছে আম থাকে। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, তীর্থধামের শোভা মনোমোহিনী।

এদেশের ভাষা তামিল, কিন্তু সহরে এত হিন্দুস্থানীর বাস যে, এখানে হিন্দুস্থানী ভাষা একপ্রকার সাধারণ ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাস রামেশ্বর তীর্থে প্রায় বার আনা লোক হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কয়। দোকানদার, পাণ্ডা, বাজারওয়ালা, তত্ত্বাবধায়ক, ইহারা সকলেই হিন্দুস্থানী, অতি সামান্য সংখ্যার লোক তামিল ভাষা ভাষী। প্রধান প্রধান ধনবান পুরুষ হিন্দুস্থানী। অনেক বৎসর হইতে হিন্দুস্থানীরা পশ্চিম দেশ হইতে এখানে আসিয়া আড্ডা জমাইয়া বসিয়াছে। যাত্রীর সংখ্যাও অধিকাংশ বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী ও মাড়োয়ারী। রামেশ্বরে ছোট স্কুল, ডাকঘর, তার-অফীশ, থানা, রেজিষ্ট্রী অফীশ, রামনাদের রাজার কাছারী, মন্দিরের কাছারী, হাট, বাজার, সুন্দর পথ, বলদশকট প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ঘোড়ার গাড়ী চলে না। শঙ্করলাল, গঙ্গা-রাম, বিশ্বনাথ প্রভৃতি রামেশ্বর তীর্থের মহা ধনবান ও ক্ষমতাশালী পাণ্ডা, ইহারা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। যাত্রীদের আনিবার জন্য ইহাদের বেতনভোগী লোকেরা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র যাতায়াত করে। রামেশ্বর নগর সমুদ্র তটে অবস্থিত; মন্দিরটী সমুদ্রের কোলে প্রতিষ্ঠিত বলিলে বলা যায়। দ্রব্যাদি সস্তা এবং অধিবাসীদের ব্যবহার প্রেমিকজনোচিত। ইহা স্থানমাহাত্ম্য-জনিত, সন্দেহ নাই। অধিবাসীরা শৈব, কিন্তু নিরামিষাশী।

রামেশ্বরবাসীদিগের তামিল ভাষা অনার্য্য

ভাষা। কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দের এস্থলে তামিল প্রতিশব্দ দিলাম, আপনারা দেখিবেন, এই ভাষার সহিত ভারতবর্ষীয় অন্য কোন আর্য্যভাষার সম্পর্ক নাই।

বাঙ্গালা	তামিল
চাউল	আর্শী
ডাউল	পর্প্প
লবণ	উপ্
তৈল	এণে
ঘৃত	নেই
নিদ্রা	তুকম্
উপবেশন	মুকারম্
শয়ন	পড়িতকম
দধি	তায়ের
দুগ্ধ	পাল
জল	নীর্
ভোজন	সাপড়ম্
ভাত	চোর
অগ্নি	নিপ্
তামাকু	পোয়্লে
বায়ু	কাৎ

রামেশ্বর ক্ষেত্রে কোথায় কি কি তীর্থ আছে, এক্ষণে তাহার বিবরণ দিতেছি। এখানকার সর্ব্ব প্রথম দর্শনীয় পদার্থ ভগবান রামেশ্বরেব মন্দির ও সুরম্য মূর্ত্তি। ইহাই এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং ইহারই দর্শন জন্য রাশি রাশি মুদ্রা ব্যয় করিয়া, বিষম কষ্টে, অতি দূরদেশ হইতে হিন্দু নরনারী আগমন করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সকল দেশের লোক এস্থলে যাত্রীরূপে উপস্থিত হয়। নেপাল, ভূটান, কাশ্মীর, পঞ্জাব, রাজপুতানা, পেশোয়ার, করাচি, গুজরাট, বোম্বাই, হয়দ্রাবাদ প্রভৃতি সমুদায় প্রদেশের হিন্দুকে এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি দিন অগণ্য যাত্রী বারমাসে সকল ঋতুতে সমভাবে থাকে। বিশেষ পর্ব্বাদি উপলক্ষে জনতা অবশ্য অত্যন্ত অধিক হয়, কিন্তু কখন কোন গোলযোগ হয় না। আমি দ্বিতীয় বারে রামেশ্বর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দুই জন বাঙ্গালী পুরুষ এবং কয়েকজন বাঙ্গালী রমণীকেও দেখিয়াছিলাম।

পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে সর্ব্ব প্রথমে রাম-কুণ্ডনামক সরোবরে স্নান করিতে বলে। এই সরোবর বহু কালের প্রাচীন, ইহার জল অত্যন্ত লবণাক্ত। চারিধার সুন্দর পাথর দিয়া সুকঠিন রূপে বাঁধান। স্নানের পর রামেশ্বর মন্দিরে যাইতে হয়, কেহ কেহ বা অপর কুণ্ডে কিম্বা কূপে অথবা সমুদ্রে স্নাত হইয়া থাকে। একটু দূর হইতে মন্দিরকে দেখিলে বোধ হয় যেন পর্ব্বত-গহ্বরে প্রবেশ করিতে যাইতেছি; যতই নিকটে যাই, ততই বিশাল বোধ হয়; খুব নিকটে বা দ্বার দেশে গেলে ইহার সম্পূর্ণ বিশালত্ব দেখিয়া গালে হাত দিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। সমস্ত পৃথিবীতে এতবড় দেব মন্দির আজি পর্য্যন্ত কেহ প্রস্তুত করে নাই। ইটালীর অন্তর্গত রোমের পোপ্ সাহেবের কুঠি কিম্বা অনেক রাজা বা সম্রাটের প্রসাদ এতদপেক্ষা বড় হইতে পারে, কিন্তু পোপের বাটী মন্দির নহে, ইহা তাঁহার আবাল গৃহ, রাজা বা সম্রাটদিগেরও তাহাই। রামেশ্বরের মন্দির সম্পূর্ণ দেব মন্দির। এই মন্দির দেখিলে পুলকে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়, ইহার ভিতর ও বাহির ভাল করিয়া দর্শন করিলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া যাইতে হয়। দুই চারি দিবসে ইহার কিছুই দেখা যায় না। মন্দিরের ভিতরে কোথায় কি আছে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে জানিতে বা দেখিতে হইলে অন্ততঃ দুই সপ্তাহ কালাধিক পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। অসংখ্য স্তম্ভ, অসংখ্য প্রকোষ্ঠ, অগণ্য কুঠরী, গণনাতীত ভাগ, বিভাগ প্রভৃতিতে এই মন্দির এক অত্যাশ্চর্য্য দর্শনীয় পদার্থ রূপে বর্ত্তমান। ভিতরে কত দালান, আটচালা, নাটমন্দির, হল্, চবুতরা, বারান্দা, গুপ্ত ও প্রকাশ্য গৃহ, তাহা স্থির করা যায় না। মন্দিরের ভিতরে কূপ ও সরোবর আছে। কোথাও কাচারী, কোথাও সঙ্গীত-সম্প্রদায়ের আড্ডা, কোথাও হাতি, ঘোড়া, উষ্ট্র, হরিণ, অস্ত্রশস্ত্র, পাকাগার, ধনভণ্ডার, অন্নালয়, হোম ও যজ্ঞের কুণ্ড, পূজার দ্রব্যাদির ভাণ্ডার, ভৃত্য ও সেবকাদির গৃহ, পুরোহিত প্রভৃতির আবাস, কর্ম্মচারীগণের বাটী, পুস্তকালয়, বস্ত্রালয়, অলঙ্কার গৃহ, ইত্যাদি ইত্যাদি, কোথায় যে কি আছে,

তাহার প্রকৃত বা সম্পূর্ণ বিচরণ দেওয়া অসম্ভব। স্বচক্ষে না দেখিলে এই অত্যদ্ভুত মন্দিরের ধারণা হয় না। ইহা ভূতলে অতুল। এই মন্দিরাভ্যন্তরে চল্লিশ সহস্র লোক অনায়াসে শয়ন বা উপবেশন করিতে পারে। এক কোণে বা এক দিকে একটা লোক যদি চারি পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত লুকায়িত থাকে, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাকে খুজিয়া পাওয়া যায় না। এক একটা স্থান এমন শীতল যে বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা, এক একটা স্থান আবার জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রের ন্যায় উষ্ণ। কোন স্থান ভয়ানক অন্ধকারে পরিপূর্ণ, কোলের মানুষ দেখা যায় না; আবার কোন স্থান এত আলোক পূর্ণ যে, আল্‌পিনটী পর্য্যন্ত অথবা মস্তকের একগাছি কেশ পর্য্যন্ত ভূমিতল হইতে উঠাইয়া লওয়া যায়। নানা প্রকার তপপ্রভাবী সাধু মহাত্মাদিগের ভজননিনাদে, বৈদিক বিপ্রগণের বেদধ্বনিতে, যাজ্ঞিকদিগের শাস্ত্র পাঠে, ভক্তগণের প্রার্থনারবে সমস্ত মন্দির দিবা রাত্রি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ থাকে। সে অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য লেখনী দ্বারা লেখা যায় না। মন্দিরের ভিতরের ও বাহিরের দেওয়ালে পক্ষী, পশু, কীট, পতঙ্গ, দেব, দেবী, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সর্প প্রভৃতি অগণ্য প্রকার জীব জন্তু প্রভৃতির মূর্ত্তি খোদা আছে। মন্দিরের ভিতরে জীবিত হস্তি, উষ্ট্র, হরিণ, ছাগ, অশ্ব, প্রভৃতি পশু দৃষ্ট হয়; তৎভিন্ন প্রস্তর, পিত্তল, সুবর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ নির্ম্মিত অগণ্য বড় বড় পশু-মূর্ত্তি স্থানে স্থানে প্রাঙ্গণে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। রথ, গাড়ী, শকট, ভোজন-পাত্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, বাদ্যযন্ত্র, পাল্কী প্রভৃতির সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। শস্যভাণ্ডার, অতিথি-আগার, সাধুর আশ্রম, বিপ্রগণের পূজার গৃহ, যোগীজনের নিভৃত যোগাশ্রম, পাঠাগার প্রভৃতি কত যে কি আছে, তাহা বলা যায় না। ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, সাধন, ভজন প্রভৃতিতে যাঁহারা গণনীয়, তাঁহাদের জন্য আবার স্বতন্ত্র স্থান আছে, তাহাও মন্দিরাভ্যন্তরে অবস্থিত। মহাশয়গণ! এমন অপূর্ব্ব স্থান আর কোথাও দেখিয়াছেন কি? এখানে উপস্থিত হইলে পুলকে রোমাঞ্চিত হইতে হয়।

সমস্ত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি শাস্ত্রে যে সকল দেব, দেবী, যক্ষ, রক্ষ, পশু, পক্ষী, নাগ, কীট ইত্যাদির উল্লেখ আছে, বিশেষতঃ রামায়ণ মহাকাব্যে যাহা কিছু উল্লিখিত হইয়াছে, এই অত্যাশ্চর্য্য মন্দিরের ভিতরের বা বাহিরের দেওয়ালে অথবা স্তম্ভাদিতে তৎ সমুদয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। যেন সমস্ত রামায়ণ কাব্য, মন্দিরে খোদা। তদ্ভিন্ন আরও অনেক ছবি দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেওয়ালে লতা, পাতা, ফল, ফুল, মূল, কন্দ, বৃক্ষ, কত যে কি আঁকা আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পরী, সখ্য, সাধু মূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণের গোপীলীলা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, রাম রাবণের যুদ্ধের ছবি প্রভৃতি সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুবৃহৎ মন্দিরাভ্যন্তরে বহু সংখ্যক দেব দেবীর ছোট বড় মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিবমূর্ত্তি ও শিব মন্দির প্রায় চারিদিকেই শোভা পাইতেছে। মন্দিরের এক দিকে ম্যানেজারের সুবিস্তৃত কাছারী, তাহার পার্শ্বে খাজাঞ্চীর ঘর, তৎপরে সিপাহী ও প্রহরীদিগের অস্ত্রাগার এবং তদনন্তর হাতীশালা, ঘোড়া, হরিণ, উষ্ট্র ইত্যাদির আস্তাবল। ময়ূর ও পালিত ছাগল যথেষ্ট। কোথাও "বলি" হয় না; "ভোগ" সম্পূর্ণ নিরামিষ। এই রামেশ্বর তীর্থ রামনাদের রাজার জমিদারী, কিন্তু প্রতি পয়সাটী দেবতার মন্দিরের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। মাদুরা জেলার কলেক্টর সাহেবের ইহা এলাকাভুক্ত, কারণ ইহা বৃটিশ রাজ্যভুক্ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ ভারতবর্ষের সীমার বহির্দ্দেশে অবস্থিত; ভারত মহাসাগরের সুপ্রশস্ত বক্ষে ইহা একটী রমণীয় দ্বীপ। এডেন ও রামেশ্বর ভিন্ন, ভারতের বাহিরে, দক্ষিণ দিকে, ভারতীয় গবর্ণর জেনেরলের আর কোন অধিকার নাই। সমুদয় মন্দিরটী নানা বর্ণের পাথর দ্বারা মনোহর রূপে নির্ম্মিত। সম্প্রতি দেবীকোটা নামক স্থানের জনৈক মহাধনবান বণিক লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রামেশ্বর মন্দিরের সংস্কার করিয়া দিতেছেন। এই সংস্কার বশতঃ অনেক পুরাতন জিনিষ ও

স্থান নূতন হইয়াছে এবং অনেক নূতন জিনিষ ও গাঁথনি সংযোজিত হইয়া যাইতেছে। সুবৃহৎ মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে ভগবান রামেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলাম। ইহা শিবলিঙ্গ। মন্দিরের উপরে বিশুদ্ধ সুবর্ণ-নির্ম্মিত চন্দ্রাতপ ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত স্তম্ভ দৃষ্ট হইল। দ্বারদেশে রৌপ্য ও স্বর্ণ-নির্ম্মিত ফলক দেখা যায়, মন্দিরাভ্যন্তরে দুই একখানা হীরকও জ্বলিতেছে। বহির্দ্দেশে বহুমূল্যবান ও শোভাময় ঝাড়, লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি, ফাণুশ প্রভৃতির অভাব নাই। এখানকার চন্দ্রাতপ রৌপ্য-নির্ম্মিত, তাহার মধ্যস্থলে অতি মূল্যবান মখমল। রামেশ্বর মহাদেবকে স্পর্শ অথবা তাঁহার খুব নিকটে যাইতে হইলে, মন্দিরের ম্যানেজারের অনুমতি পত্রের প্রয়োজন। যেস্থলে দাঁড়াইয়া সাধারণতঃ দর্শন করা যায়, তাহাই যথেষ্ট। রামেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিয়া "চব্বিশ তীর্থ" দর্শন ও তাহাতে স্নান করা আবশ্যক। যাঁহারা স্নান করিতে না পারেন, কুণ্ডের জল লইয়া মস্তকে দেন অথবা তাহা স্পর্শ করেন। এই চব্বিশটী তীর্থের নাম এই—মাধব, গো, গবাচ্, নল, নীল, গন্ধমাদন, ব্রহ্মহত্যা মোচন, চন্দ্র, সূর্য্য, গঙ্গা, যমুনা, গয়া, শঙ্খ, গায়ত্রী, শাস্ত্রী, সরস্বতী, মহালক্ষ্মী, অগস্ত, অগ্নি, চক্র, সতী, পার্ব্বতী, রামেশ্বর এবং কোটি তীর্থ। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক তীর্থের সম্মুখে দেবালয় আছে।

মাধবতীর্থ একটী সরোবর; মাধব হইতে গন্ধমাদন কুণ্ড পর্য্যন্ত ছয়টী তীর্থ একই স্থানে অবস্থিত। এখানে অসংখ্য শিবমূর্ত্তি আছে। গায়ত্রী, শাস্ত্রী ও সরস্বতীতীর্থ একই স্থানে দেখা যায়। মহালক্ষ্মী সুবৃহৎ কুণ্ড। এখানে বহু কূপ, পুষ্পবৃক্ষ ও নারিকেল গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। উপরে যে সকল তীর্থের নামোল্লিখিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই সুবৃহৎ রামেশ্বর মন্দিরাভ্যন্তরে অবস্থিত; কেবল অগ্নি ও অগস্ত তীর্থ, মন্দিরের বাহিরে দেখা যায়। সীতাতীর্থ বৃহৎ কুণ্ড। কোটি তীর্থকে সমুদয় তীর্থ দেখিবার পরে দেখিতে হয়। রামেশ্বর হইতে যাত্রা কালে যাত্রীরা ইহা দর্শন করেন। প্রবাদ আছে, ইহা দর্শনে কোটি তীর্থ দর্শনের ফল হয়। এই তীর্থ দর্শনে নরজন্মের সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ইহা দর্শন করিয়া যাইবার সময় যাত্রীরা করজোড়ে কহিয়া থাকেন "হে প্রভো! পূর্ব্বজন্মে ও ইহজন্মে যত অসংখ্য পাপ করিয়াছি, তাহা এবারে মার্জ্জিত হউক, আর কখন পাপ করিব না, এই প্রতিজ্ঞায় এখন আবদ্ধ হইলাম।" প্রথিত আছে, ভগবান রামচন্দ্র তাঁহার বাণ নিক্ষেপ করিয়া এই স্থানে কোটি তীর্থের জল আনিয়াছিলেন। রামেশ্বর কুণ্ড সম্মুখে প্রকাণ্ড "নান্দিকেশ্বর মূর্ত্তি" ও একটী সুবৃহৎ ঘণ্টা দেখিতে পাইবেন। এই বিপুলাকায় ঘণ্টাটী নেপালের মহারাণীমহোদয়া মন্দিরের উপরে দিয়া গিয়াছেন। ইহারই পরে সুবিখ্যাত "হরবোলা" মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির প্রবাদ কৌতুকজনক। কথিত আছে, হনুমান যখন সেতুবন্ধন করিতেছিলেন, তখন নিশাকালে কোন এক ব্যক্তি ঐ সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া যাইত। নিত্য নিত্য এইরূপ ঘটনা ঘটিতে থাকায়, হনুমানেরা পরমির্শ করিয়া রাত্রে গোপনে পাহারা দিতে লাগিল। অপরাধী ধৃত হইলে দেখা গেল, সে ব্যক্তি ঠাকুর লক্ষ্মণ। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নল ও নীল জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর! আপনি নিশিযোগে সেতু ভাঙ্গিয়া দেন কেন?" লক্ষ্মণ বলিল, রীতিমত বাঁধা হইতেছে না, সুতরাং ভাল করিয়া বাঁধিবার বন্দোবস্ত করিতেছি।" হনুমানেরা তাহাই বিশ্বাস করিল, কিন্তু সে সময়ে লক্ষ্মণ বাস্তবিক ঐ স্থানে আদৌ ছিলেন না, অন্যত্র ছিলেন। লক্ষ্মণ প্রত্যাগত হইলে নল জানিতে পারিল, ইহা ঠাকুর লক্ষ্মণের কার্য্য নহে, কোন চতুর রাক্ষসের দুষ্টামি। তখন কৃত্রিম-লক্ষ্মণ-বেশধারীকে ধরিয়া নল ও নীল হত্যা করিল। অনুসন্ধানে হনুমানেরা জ্ঞাত হইল, এই ব্যক্তি মায়াবী রাক্ষস এবং রাবণ কর্ত্তৃক প্রেরিত। যাহা হউক, এই মূর্ত্তির পার্শ্বে "কাশী বিশ্বনাথ মূর্ত্তি" ও "নবগ্রহ মূর্ত্তি" দৃষ্ট হইয়া থাকে। পার্ব্বতী মন্দিরে নেপালের মহারাণীর উপহার প্রদত্ত বহুমূল্যবান হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত ফটক দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর মস্তকোপরে বহুমূল্যবান হীরক জ্বলে। মন্দিরের একটু

দূরে জম্বু, বিকানীর, রামনাদ, ত্রিবাঙ্কোড় প্রভৃতি মহারাজাদিগের ছত্র আছে। মন্দিরের প্রথম ও দ্বিতীয় গেটের সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণে দোকানদারেরা বসিয়া মালা, শঙ্খ, ছবি, খেলানা, পুস্তক, সমুদ্র জীবের কঙ্কাল প্রভৃতি বহু দ্রব্য বিক্রয় করে।

আমি মন্দির দর্শন করিয়া মন্দিরের বাহিরে অগস্ত্য তীর্থ ও অগ্নিতীর্থ নামে দুইটী রমণীয় ও সুপবিত্র স্থান দেখিতে গেলাম। অগস্তমুনি সমুদ্রতটে এই মনোহর আশ্রমে বাস করিতেন। মন্দিরের দ্বার হইতে সমুদ্রতটে বার মিনিট মধ্যে যাওয়া যায়। একটী সুপ্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে এই আশ্রম অবস্থিত, সম্মুখে একটী কুণ্ড এবং কতকগুলি দেবমূর্ত্তি। আশ্রমে উপস্থিত হইলে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইতে হয়। একটী ক্ষুদ্র মন্দির অদ্যাপি সেই তপ-প্রভাবশালী মহামুনির দেবত্ব ঘোষণা করিতেছে। এই মন্দিরে বসিয়া মুনিবর সমুদ্র শোষণ করিতে গিয়াছিলেন।

"অগ্নিতীর্থ" স্মরণ হইলে এখনও শ্রদ্ধা, ভক্তি, আদর্শ নারীর সতীত্ব এবং সত্যের জয় মনে করিয়া হৃদয়ে অপূর্ব্বভাবের উদয় হয়। এই মহাপবিত্র স্থানে মহাসতী পরমেশ্বরী জানকীর অগ্নি পরীক্ষা হইয়াছিল। একথা বর্ণনা করিতে করিতে এখনও রোমাঞ্চিত হইতেছি। প্রশান্ত ও অনন্ত ভারতমহাসাগরের শোভাময় তটে, মহাদেব রামেশ্বর মূর্ত্তির সম্মুখে, এই পুণ্যপূর্ণ স্থানে দণ্ডায়মান হইলে, ভূতলে অতুল আনন্দের অনুভূতি হইয়া থাকে। এখানে সমুদ্র স্থির এবং তটদেশ পর্য্যন্ত সলিলরাশি অতীব স্বচ্ছ ও সুন্দর। সমুদ্রের এই অনন্তযুগব্যাপী পবিত্র উপকূলে ভগবান রামচন্দ্র, সমগ্র বিশ্বমণ্ডলকে মা জানকীর পরমেশ্বরীত্ব দেখাইবার জন্য তাঁহার অগ্নি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলেও রোমাঞ্চিত হইতে হয়। অহো! যে দেশে এমন সতী রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে আদর্শ সতীত্বের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, আজি সেই ভারতে এত বেশ্যা!! ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

"সীতার অগ্নি পরীক্ষা"—কি মহারমণীয় দৃষ্টান্ত! সমগ্র ভূতলে এই দৃশ্য অতুল। অযথা কুসংস্কার, বৃথা তর্ক বা বৃথা সন্দেহ কাহারও হৃদয়ে পোষিত হউক, শ্রীরামচন্দ্রের ইহা চিরজীবনের নীতির বিরুদ্ধ ছিল। অকারণে কাহারও অপ্রীতি উৎপাদন করা তিনি আদৌ ভালবাসিতেন না, সর্ব্বসাধারণ সতত সন্তুষ্ট থাকুক, ইহাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। লঙ্কা বিজয় ও রাবণ নিধন করিয়া যখন তিনি সীতা সতীকে ভারতবর্ষে লইয়া আসিতেছিলেন, তখন অনেক নির্ব্বোধ ব্যক্তি পরমাসুন্দরী যুবতী জানকীর বহুকাল পতি-বিরহে লঙ্কাবাস জন্য সতীত্ব সম্বন্ধে বৃথা সন্দেহ মনোমধ্যে পোষণ করিতেছিল। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া এক অপূর্ব্ব লীলা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি মা জানকীর অগ্নিপরীক্ষায় সম্মতি দিলেন। সাধ্বী সীতার অগ্নিতে পরীক্ষা হইবে, এই অপূর্ব্ব কথা স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে প্রচারিত হইল। সীতাদেবী একটুও কুণ্ঠিতা হইলেন না, সগৌরবে মহানন্দে সেই বিষম পরীক্ষাভার মস্তকে গ্রহণ করিয়া ধার্ম্মিক পতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সমস্ত লোক চমৎকৃত হইয়া তাহা দেখিবার জন্য দলে দলে সমাগত হইতে লাগিল।

পতিপ্রাণা পরমাসুন্দরী সীতা মহাসাগরের বিমল সলিলে স্নাতা হইয়া তটদেশে উপস্থিতা হইলে সখিরা বিবিধ সুরম্য মালা ও রত্নমাণিক-খচিত স্বর্ণালঙ্কারে তাঁহাকে ভূষিতা করিয়া দিলেন। হিরণ্ময় পরিচ্ছদে সীতার দৈহিক ঔজ্জ্বল্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তদনন্তর পুষ্প, সুগন্ধি ও চন্দনাদি দ্বারা ভগবতীর পূজা সমাপন করিয়া রাঘবপত্নী পতিসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে ও সাশ্রুলোচনে কহিলেন "হে নাথ, যদি আমি প্রকৃত সতী হই, তাহা হইলে আমার সতীত্বই আমাকে রক্ষা করিবে। তাহা হইলে আমার সতীত্ব ধর্ম্মই আপনাকে ও আমাকে কলঙ্কাপবাদ হইতে মোচন করিবে।" পতির পদতলে প্রণাম করিয়া ঊর্দ্ধে নীলাকাশের দিকে নয়ন নিপাত পূর্ব্বক সতী কহিলেন "হে দেবতাগণ! তোমরা সর্ব্বজ্ঞ; তোমরা মনুষ্যের অন্তর ও বাহিরের ভাব জান। আমি যদি প্রকৃত সতী হই,

তাহা হইলে আমাকে 'আশীর্ব্বাদ করিও।" অনন্তর পরব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া সাধু ও ব্রাহ্মণ-বর্গকে প্রমাণ করিলেন। তাহার পরে সম্বৃত সুবৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে হুতাশন জ্বলিয়া উঠিল। মহাকবি কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইল কুণ্ড।
বানর কটক বহি আনিল শ্রীখণ্ড।
কাষ্ঠে পুড়ি উঠিল জ্বলন্ত অগ্নি রাশি।
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম-মহিষী॥
সাতবার রামের চরণে প্রদক্ষিণ।
প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার তিন।
কনক অঞ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে।
যোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে।
শুন বৈশ্বানর দেব তুমি সর্ব্ব আগে।
পাপপুণ্য লোকের জানহ সর্ব্বযুগে।
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে অগ্নি তব ঠাঁই পাব অব্যাহতি।
শিরে হস্ত দিয়া কাঁদে লোকে সবিশেষ।
সীতা দেবী অগ্নিমধ্যে করেন প্রবেশ॥

প্রজ্বলিত হুতাশন অভ্যন্তরে সাধ্বী গুর্ব্বী জানকী উপবেশন করিবামাত্র অগ্নির উষ্ণতা কোমলতায় ও মধুরতায় পরিণত হইল। স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহ যেমন কাঞ্চন হয়, হিমানীর স্পর্শে সর্প যেমন বিষহীন হইয়া যায়, অথবা মলয়পবনের হিল্লোলে শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন চন্দনে পরিণত হয়, পরমেশ্বরী স্বরূপিণী সীতার সুপবিত্র দেহস্পর্শে প্রতপ্ত হুতাশন সুখময় কোমলভাব ধারণ করিল। স্বয়ং ভগবান স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া অগ্নি-রাশি মধ্যে সীতা মাতাকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। উঁকি মারিয়া রাম দেখিলেন, হুতাশন মধ্যে সীতা নাই! কে যেন তাঁহাকে গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছে। রামচন্দ্র অধীর হইলে দেবতারা শ্রীরামচন্দ্রকে কহিলেন "হে রাম! তুমি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, মা সীতা স্বয়ং নারায়ণী লক্ষ্মী। সীতাকে অগ্নিদগ্ধ করিতে পারে, ইহা কি সম্ভব? হে রাম! তুমি নরাকারে নরলীলা করিতেছ, এইজন্য নরের মত কথা বলিতেছ, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও, মা জানকী সর্ব্ববিধ 'পরীক্ষার অতীতা, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বরী।"

তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ।
যেই জন শুনে প্রভু তব অবতার।
ইহ পরলোক তার উভয় উদ্ধার।
কে বুঝে তোমার মায়া তুমি লোকপতি।
তুমি নারায়ণ; সীতা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতি।
হেন লক্ষ্মী অগ্নিমধ্যে রাখ কি কারণ?
মনুষ্যের কর্ম্ম হেন কর নারায়ণ॥

(লঙ্কাকাণ্ড রামায়ণ)।

অতঃপর সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের মহা জ্যোতির্ম্ময় দেবতা স্বয়ং বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মা জানকীকে ক্রোড়ে লইয়া দর্শক-মণ্ডলী সম্মুখে মহানন্দে দণ্ডায়মান হইলেন।

ব্রহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি উঠিল সত্বর।
আপনি প্রবেশে অগ্নি কুণ্ডের ভিতর।
আকাশ পাতাল যুড়ি অগ্নিশিখা জ্বলে।
আপনি উঠিল অগ্নি সীতা লয়ে কোলে।
অগ্নি হৈতে উঠিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
যেমন যা ছিল অঙ্গে গাত্র বস্ত্র খানি।
মস্তকের ফুল, কেশ, সেও না আওরে।
যোড়হস্তে কহিলেন রামের গোচরে।
অগ্নি বলিলেন, আমি পাপপুণ্য সাক্ষী।
লুকাইয়া পাপ করে তাহাও আমি দেখি।
ভাঁড়াইতে আমারে না পারে কোন জন।
না দেখি সীতার কোন পাপের কারণ।
আজি হৈতে হলো মম পবিত্র জীবন।
করিলাম আজি সীতা সতী পরশন॥

(কৃত্তিবাস)

স্বর্গ হইতে দেবতারা অসংখ্য পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, নরনারীরা "ধন্য ধন্য" বলিয়া আকাশ পাতাল আমোদিত করিতে লাগিলেন। পাঠক! সীতার অগ্নি-পরীক্ষার স্থল একবার দেখিয়া আইস; এই মনোহর, প্রাচীন, পবিত্র, প্রশস্ত ও পুণ্যময় স্থলে একবার উপস্থিত হইয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন কর। ইহা স্বর্গভূমি, ইহা পুণ্যের উৎস, ইহা পবিত্রতার আকর। অসতীরা এখানে আসিয়াও যদি অসতীত্ব বর্জ্জন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার জন্য নূতন নরকের প্রয়োজন।

"অগ্নিপরীক্ষা" তীর্থ দেখিয়া অর্দ্ধক্রোশ দূরে আমি "রামঝরোকা" নামে এক ক্ষুদ্রতীর্থ

দেখিতে গেলাম। এখানে বিশেষ কিছু দেখিবার নাই। কয়েক জন সাধু বাস করেন এবং একজন হিন্দুস্থানী সাধুর একটী ছোটরকমের অন্নছত্র আছে, কেহ কেহ এখানে ভাত ডাল খাইতে পায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ফ্রান্সের দেবী।

ফ্রান্স জগতের পূজ্য স্থান। এই স্থানই নেপোলিয়নের অভ্যুদয়-ভূমি, এই স্থানই সাম্য (Equality, and Fraternity) ঘোষণার লীলাস্থল। ফরাশী বিপ্লবের ন্যায় বিপ্লব পৃথিবীর আর কুত্রাপি হয় নাই, ফ্রান্সের ভাষা আজও "Lingua Franca," ফ্রান্সের গৌরব আজও ধরায় অনিন্দিত। সভ্যতা বা সুশিক্ষায়, ভদ্রতা বা শিষ্টাচারে—উন্নতি-পিপাসা বা শক্তিমত্তায় ফ্রান্স জগতের আদর্শ। আজিও, ওয়াটারলু বা সিদান সমরের পরও, সম্মানে ফ্রান্স পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আজও পারী নগরী সৌন্দর্য্য এবং পারিপাট্যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী। ফ্রান্স জগতে অতুল সম্মানে সম্পূজিত।

প্রাচীন রোম এবং গ্রীস, ভারত এবং মিসরের পতন-স্মৃতিতে ইতিহাস-পিপাসু সকল ব্যক্তিই ব্যথিত। কিন্তু ফ্রান্স যেন চির নবীন—প্রতি পতনেই যেন ফ্রান্সের নবোত্থান হইয়াছে—পড়িয়া পড়িয়া পড়িয়াও সে পড়ে নাই,—ডুবিয়া ডুবিয়া ডুবিয়াও সে বিস্মৃতিতে ডুবে নাই। ইহা বিধাতার এক অপূর্ব্ব কৃপার নিদর্শন। ফ্রান্স বিধাতার এক অপূর্ব্ব দেশ।

যদি বল, ফ্রান্স অপূর্ব্ব কিসে?—ইফেল টাউয়ারবা পারী নগরীর জন্য নয়, নেপোলিয়নের অধিষ্ঠান, সাম্য-ঘোষণা বা ফরাসী বিপ্লবের জন্যও নয়,—অপিচ প্রজাতন্ত্র-শাসনের প্রতিষ্ঠার জন্যও মোটেই নয়। ফ্রান্স অপূর্ব্ব—এক অপূর্ব্ব কন্যার প্রসূতি বলিয়া;—প্রায় ৫০০ বৎসর পর একথা অপ্রতিবাদে ঘোষিত হইয়াছে যে, এরূপ কন্যা জগতে আর কুত্রাপিও জন্মে নাই! ফ্রান্স জগতের পূজ্য—কৃষক-দুহিতা জেনীর প্রসূতি বলিয়া। ফ্রান্স জগতে অনন্ত কাল এই এক কারণে সম্পূজিত হইবে।

আমেরিকা পূজ্য, এমারসন ও ওয়াসিংটনের জন্য; জর্ম্মেনী পূজ্য, গেটে ও বিষমার্কের জন্য; চীন পূজ্য, কনফিউসসের জন্য; রুষিয়া পূজ্য টলষ্টয়ের জন্য; ভারত পূজ্য শঙ্কর ও গৌতমের জন্য; ইংলণ্ড পূজ্য মিল্টন ও কারলাইলের জন্য; আরব পূজ্য মোহম্মদের জন্য; প্যালেসটাইন পূজ্য খ্রীষ্টের জন্য; ইটালী পূজ্য ম্যাট্সিনির জন্য; ফ্রান্স পূজ্য ভল্টেয়ারও রুসোর জন্য এবং চিরপূজ্য শুধু জেনীর জন্য। জেনী বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। পৃথিবীতে বিধাতার এরূপ অপূর্ব্ব সৃষ্টি আর কোথাও হইয়াছে কিনা, জানিনা।

এই সব কথা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিলে লোকে উন্মাদ মনে করিত। চির-সম্পদহীনা কৃষক-দুহিতা জগতের শ্রেষ্ঠা?—এ কথা লিখিতে কে সাহসী হইবে? কালের প্রবাহ অবিরাম গতিতে চলিল—সুতরাং জেনীর সম্মান সাড়ে চারিশত বৎসরের মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত হইল না! বিশেষতঃ নবোত্থিত ইংলণ্ড

বিরোধী—জেনীর গুণকীর্ত্তন করা কাহারও সাহসে কুলাইলনা! কিন্তু বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি জেনী চিরকালই কি অবহেলিতা থাকিবে? বিধাতা এবার তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টির অপূর্ব্ব মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন—বিগত ১৮ই এপ্রেল (১৯০৯) রোমে জোয়ান-অব-আর্কের মহা-গৌরব মহা সম্মানে পোপ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে;—খ্রীষ্টের পরবর্ত্তী গৌরবে এতদিন পর, তাঁহাকে ভূষিতা করা হইয়াছে। *

এক সময়ে ইংরাজ চালিত নিষ্ঠুর ধর্ম্মযাজকেরা যাঁহাকে অপমানের সহিত নৃশংসরূপে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরাই আজ ঈশার পরবর্ত্তী স্থানে তাঁহাকে বসাইলেন। ইহাও ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব ঘটনা—প্রায় পাঁচ শত বৎসরের পর ইনি সেণ্ট নামে অভিহিতা হইয়াছেন, খ্রীষ্ট জগৎ এখন দেবতার ন্যায় তাঁহাকে পূজা করিতেছেন। এত দিন পর ইংরাজের মুখে চুণ কালী লেপিত হইল! ধিক—ইংরাজের নির্ম্মম ব্যবহারে শত ধিক!

পৃথিবীতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কি? স্বদেশের জন্য জীবন ত্যাগই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। আমি আমার নই, স্বদেশের; আমি সকল ভ্রাতার পদরেণু-তুল্য—এই শিক্ষাই সকল শিক্ষার সার শিক্ষা। এই শিক্ষার জয় ঘোষণা করিবার জন্যই কৃষক-দুহিতা জীবন ধারণ ও জীবন পাত করিয়াছিলেন। যাঁহার স্বার্থত্যাগের উন্মাদিনী শক্তিতে একদিন ফ্রান্স মত্ত হইয়াছিল, যাঁহার আহ্বানে একদিন ফ্রান্সের অসংখ্য লোক ঘর বাড়ী ছাড়িয়া স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে ধাবিত হইয়াছিল, সেই অপূর্ব্ব দেব-কন্যা

---

* BEATIFICATION CEREMONY.

Immense throngs of people were present at St. Peters, Rome, on the 18th April (1909) when the ceremony of the beatification of Joan of Arc took place.

Thirty thousand French pilgrims gathered in the Eternal City from all parts of France, headed by all the French Cardinals, Archbishops and sixty-two Bishops.

The facade of St. Peters, says Reuter, was adorned by a large standard representing the Maid of Orleans in glory while in the interior of each side of the apse were others representing her miracles. Besides this, the immense building was hung with the famous red brocade reaching from capital to base of the immense pillars, while thousand of electric light cunningly interpersed with candles hung from the roof. The function was directed by Cardinal Rampolla, Archpriest of the Basilica, and by Cardinal Martinelli, Prefect of the Congregation of Rites, assisted by the Cardinals belonging to the Congregation.

They sat in rows having behind them the Archbishops, Bishops, and high dignitaries, of many countries, those from France occupying a conspicuous position. The Secretary of the Congregation of Rites presented the Prefect of the same Cengregation with the Apostolic Brief for the Beatification, asking permission to publish it, which was granted, the same permission being asked of Cardinal Rampolla, after which the Papel Brief, which extolled the virtues of the Pucelle "already venerable", was read declaring that she was numbered with the Blessed ones.

After this, while the vast multitude stood reverently, the relics of the Beatified were exposed.

In the afternoon the immense Beasilica was again crowded when Pius X descended into the church to worship the relics of the new Blessed One. His Holiness, who

কাহিনী পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে অশ্রু ঝরে। পাঠক সংক্ষেপে জেনীর কাহিনী শ্রবণ কর। ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনে স্বার্থত্যাগের অপূর্ব্বশিক্ষা লাভ করিতে পারিবে।

জেনী (Jeanne Darc) ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম কোণে ডোমরেমি (Domremy) পল্লীতে জেনীর পিতা মাতা বাস করিতেন। জেনীর একমাত্র ভগ্নীর বাল্য কালেই মৃত্যু হয়, তিন ভাই জীবিত থাকিয়া জেনীর দুঃখসুখের অংশী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ছাপাখানা ছিল না, সুশিক্ষা কেবল পুরোহিতগণেই আবদ্ধ ছিল। সুতরাং জেনী কোন শিক্ষা পান নাই; মাতার নিকট বাল্যে কেবল সেলাইর কাজ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্য হইতেই জেনীর হৃদয় দয়া ধর্ম্মে ভূষিত ছিল। শৈশবেই লুক্কায়িত স্থানে তিনি সতত উপাসনায় ব্যাপৃতা থাকিতেন; গৃহকার্য্যে বড় মনোযোগ দিতেন না। বাল্যকালেই স্বদেশের দুর্দ্দশার কাহিনী শ্রবণ করিতেন। দুর্দ্দশা—৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সের অনেক দেশ নানা

---

was clad in white and red, was carried in the Sedia Gestatoria, a kind of portable throne, by twelve men preceded, surrounded and followed by his lay and ecclesiastical courts, and was received by Cardinal Rampolla and all the Cardinals of the Congregation of Rites.

As the aged Pope humbly knelt in the Chapel of the Sacrament before the altar where the relics were exposed, a deep silence fell over the multitude. All the bells of the several hundred churches of Rome rang out to announce to the faithful the recognition by the Holy See of the virtues and miracles of The Maid.

Among the prelates who took part in the ceremonies was Archbishop Robert Seton, descendant of Sir Thomas Seton of Arbroath, captain of the Scottish Guards in France. He was conspicuous among the faithful followers of the Dauphin fighting beside Joan of Arc at Orleans, and standing near her when Charles VII was crowned in Rheims' Cathedral.

COMMEMORATION IN PARIS.

Writing on the above date the Telegraph's Paris correspondent says :—

Today the Te Deum has been sung in all the Paris churches on the occasion of the beatification of Joan of Arc. The Duc d'Orleans is being represented at all the ceremonies in Rome by his uncle the Duc d' Alencon, to whom he addressed from Wood Norton, on the 19th April, a letter concluding thus :—

I do this not only in the name of our house but in that of the French people, of whom Jeanne was a daughter. It is in her that were incarnated religious faith and fidelity to the monarchy, and it is by her that the country was saved.

There are as many as five statues of Joan of Arc in Paris, and visits were paid to them all to-day, a wreath of immortelles being laid before each by a deputation from the Patriotic League, while numbers of admirers have brought flowers. In some districts of Paris a fair amount of bunting is to be seen, and this evening some of the churches are being illuminated.

A few rather lively incidents have occurred in connection with the visits to the statues, but the only one really worth noting happened on the Boulevard St. Michel. A wreath bearing the inscription, "The defenders of Jeanne d'Arc who are prisoner at the Sante,"

কৌশলে এবং উত্তরাধিকারীত্ব সূত্রে ইংলণ্ডের হস্তগত হইয়াছিল। ফ্রান্সের ষষ্ঠ চার্‌লসের এক কন্যা ইংলণ্ডের পঞ্চম হেনরীকে বিবাহ করে। চার্‌লসের মৃত্যুর পর (১৪২২ খ্রী)চার্‌লসের পুত্র সপ্তম চার্‌লসের পরিবর্ত্তে কৌশলে পঞ্চম হেনরীই উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ৬ষ্ঠ হেনরী ফ্রান্সের অধিকাংশ প্রদেশের অধীশ্বর হন এবং পারী নগরীতে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজা ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের রাজা রূপে অভিহিত হইতেন। বৈদেশিক, কঠোর শাসনে ফ্রান্সের নরনারী বড়ই অসন্তুষ্ট ছিল—সময়ে সময়ে বিদ্রোহ উপস্থিত হইত। বালক ৬ষ্ঠ হেনরীর সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে একবার খুব বিদ্রোহ হইয়াছিল। বালক ৬ষ্ঠ হেনরীর রাজ্যশাসন-কার্য্য,বেড্‌ফোর্ড এবং গ্লসেস্‌টারের ডিউকগণ নির্ব্বাহ করিতেন। ৬ষ্ঠ চার্‌লসের পুত্র ৭ম চার্‌লসের দলের লোকেরা শাসন কার্য্যে সময়ে সময়ে বিঘ্ন উপস্থিত করিত। তখন ইংরাজ-সৈনিকে ফ্রান্স পূর্ণ হইয়াছিল এবং বারগণ্ডির ডিউক ফ্রান্সকে দুর্গমালায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। জেনীর জন্ম না হইলে ফ্রান্স, বুঝি বা, চিরদিন ইংলণ্ডের কারায়ত্ত থাকিত।

ত্রয়োদশ হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের

---

having been affixed to that particular statue a professor who was passing by cut it down, whereupon he was collared by one of the young men who had brought the wreath and led to off the nearest police station where he was promptly set free, his captor being soon afterwards conveyed to the Sante Prison.

POPE AND FRENCH PILGRIMS

Another interesting ceremony took place at St. Peter's on the following day when the Pope received the French pilgrims, and in reply to an address of homage read, on behalf of all French Catholics, by Mgr. Touchet, Bishop of Orleans, made a speech, in which he said that, without recalling the eloquent testimony of history to the unalterable fidelity of France to the chair of St. Peter, and without pointing to the spectacle of the immense crowd which has hastened to Rome to witness the solemn glorification of their beloved compatriot Joan of Arc, he had already had, in the course of the late painful events which had occurred in that country, an admirable proof of the obedience of Catholics, and of the union joining the people to the clergy, the clergy to the bishops, and the bishops to their Supreme Shepherd. His Holiness exhorted the French to maintain this union, which constituted their strength in the struggle, and said that they would have besides the consolation of working for the welfare of their country, as religion was a guarantee for the order and prosperity of civilised society, and thus their interests were inseparable from it.

The Pontiff strongly repudiated the cowardly calumny which attempted to dishonour faithful sons of the Church with the infamous title of enemies of their country. On the contrary, love of country was stonger when united to love of the Catholic Church which dominated the world, being Christ's spouse and the depository of Truth. Therefore whoever rebelled against its authority was fighting against the Truth, and that Government which fought against the Truth outraged what was most sacred for man and could not except veneration for love. Among the ranks of the sons of the church the country always found its saviours and defenders. The Pope ended by congratulating the French Catholics who were fighting under the

সময় জেনী ফ্রান্সকে উদ্ধার করিতে প্রত্যাদিষ্টা হন। ক্রেভেণ্ট এবং ভার্নলিনের যুদ্ধের পর সপ্তম ডফিন (Dauphin) চারলসের রাজ্যপ্রাপ্তির আশা নির্ম্মূল হয়। এই সময়ে জেনী ফ্রান্সের উদ্ধারের ব্রত গ্রহণের জন্য ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করেন। একদিন তাহার পিতার বাগানে বাণী শ্রবণ করেন। আর একদিন

---

flag of that true patriot Joan of Arc, bearing the moving words, "Religion and Country."

ENGLISH CATHOLIC BISHOPS' PANEGYRIC.

In connection with the beatification, an eloquent address was sent from the Roman Catholic Bishops of England to the Bishops of France.

"One more bright ornament," says the address, "has been added to your Church, and country, and that which all true and generous hearts had long wished to see has come to pass. After mature deliberation the Apostolic See has delivered judgment on Joan, the Maid of Orleans. It is recognised at length, by this supreme verdict —a verdict which must command the serious attention of all—how great was that pure maiden's trust in God, how strong her love of fatherland, how deservedly she is held up to the admiration of every age for her tenaciy of purpose—more than man's—and a courageous endurance far in advance of her years.

"Time, which is wont to blot out the remembrance of kindly deeds, has enthroned her in the hearts of distant generations. Truth, albeit tardy, avenges the assaults of calumny, and her unending heavenly triumph wipes out the dishonour once done her. A crown more sacred than any which earth can bestow makes atonement for the iniquity of her death."

মাঠে গরু চরাইবার সময় সেণ্ট মার্গারেটের বাণী স্পষ্ট শুনিতে পান যে, "ফ্রান্স তাহার সাহায্যে ইংলণ্ডের হস্ত হইতে স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিবে।" এই বাণী শ্রবণের পর তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, অবিবাহিতা থাকিয়া আজীবন দেশোদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তদীয় পরিবারের লোকেরা এই সকল আদেশকে সামান্য ঘটনা বলিয়া উপেক্ষা করিল। তাঁহার পিতা তাহাকে সৈন্যচালনার ব্রত হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইলে জেনীকে জলে ডুবাইয়া মারিবেন। ইতিমধ্যে জেনীকে বিবাহ করিতে জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইলে পিতা মাতা প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু জেনী কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। বর কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি ঘোষণা করিলেন যে, জেনী বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন। আদালত পর্য্যন্ত ইহা গড়াইল—কিন্তু সেখানে জেনীর জয় হইল। এই ঘটনায় জেনীর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা এবং সত্যানুক্রমণের পরিচয়ে সকলেই মুগ্ধ হইলেন।

বেড্‌ফোর্টের ডিউক, এই সময়ে ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া, বারগণ্ডির সৈন্য সাহায্যে এক প্রবল সেনার দল চারলসের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। সলিস্‌বরির আরলের উপর এই সেনাদলের অধ্যক্ষের ভার অর্পিত হইয়াছিল। সারজন টাল্‌বট, সারজন ফাষ্টফ ও সার উইলিয়ম গ্লাড্‌সডেল তাঁহার সাহায্যকারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সলিস্‌বরি, বামবুলেট, পিথিভারস, জারগো, সলি এবং অন্যান্য অরক্ষিত ছোট ছোট সহর-গ্রাম দখল করিয়া চারলসের প্রধান আড্ডা অরলিনস্ আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। এই আক্রমণ সফল

হইলে চারলসের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইত। ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সলিসবরি কর্তৃক অরলিনস পরিবেষ্টিত হয়,—ফ্রান্সের লোকেরা পূর্ব্বেই অভিসন্ধি বুঝিয়া প্রতিরোধের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রথম সংঘর্ষণে ইংরাজের জয় হয়, কিন্তু সলিসবরির জীবনপাত হয়। সফোকের আরল তাঁহার পদে বরিত হন। তিনি দুর্দ্ধর্ষ প্রতিরোধকারীদিগের দুর্জ্জয় ক্ষমতা দেখিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে দুর্গপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিলেন এবং দুর্ভিক্ষ দ্বারা নগর বশীভূতের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। শীতকাল এই কার্য্যে শেষ হইল। যখন ইংরাজের সমস্ত কার্য্য সুদৃঢ়রূপে নিষ্পন্ন হইয়া আসিল, তখন সকলেই মনে করিয়াছিল, দৈব অনুকূল না হইলে অরলিনসের আর রক্ষা নাই।

জেনীর নিকট অরলিনস পরিবেষ্টনের সংবাদ যথাসময়ে আসিলে তিনি উত্তেজিতা হইয়া উঠিলেন। তিনি অরলিনস্ উদ্ধার পূর্ব্বক চারলসকে রিমস্ (Rheims) নগরে বিধিপূর্ব্বক অভিষিক্ত করিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধা হইলেন। তিনি রাজ-সন্দর্শনের জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্তা হইলেন। কিন্তু পিতা মাতা বাধা দিতে লাগিলেন,—গবর্ণর বাধা দিলেন। এই সময়ে তাহার মাতুল ডুরাণ্ড লকজার্ট (Durand Laxert) জেনীর পিতা মাতার সম্মতির জন্য আসিলেন। কাহারও নিষেধ না মানিয়া, প্রত্যাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জেনী ডোমরেমির কুটীর চিরজীবনের জন্য পরিত্যাগ করিলেন।

জেনী তাহার মামাকে খুব ভালবাসিতেন। মামার বাড়ীতে যে ৭ দিন ছিলেন, সেই ৭ দিনে মামার নিকট সমস্ত প্রাণের কথা বলিয়াছিলেন। সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বয়সের কুমারী জেনী এতদিন পর কেবল তাঁহার মামাকে সাহায্যকারী পাইলেন। মামা তাঁহার প্রত্যাদেশের কথা বিশ্বাস করিলেন এবং সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহার মামা গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু গবর্ণর বাড্রিকোর্ট (Baudricourt) সমস্ত কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং জেনীকে তাহার পিতা মাতার নিকট পাঠাইয়া দিতে মামাকে উপদেশ দিলেন। জেনী কিন্তু ফিরিবার মহিলা নহেন, তিনি এই উপহাস অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং গবর্ণর সন্দর্শনে যাইবেন, স্থির করিলেন। তাহার মামা সাথী হইলেন। তবু নির্ম্মম গবর্ণর তাঁহার প্রাণের কথা শুনিতে প্রস্তুত হইলেন না। তিনি অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। একবার মামা বাড়ীতে ফিরিলেন, আবার গবর্ণরের নিকট উপস্থিত হইয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন। একবার রাজসন্দর্শনের জন্য গবর্ণরের পা পর্য্যন্ত ধরিয়াছিলেন। এই সময়ে জেনী ভ্যাকুলারসের (Vaucouleurs) লোকের সহিত বন্ধুতায় আবদ্ধা হইলেন। তাহাদের ও জেনীর বহু দিনের অদম্য চেষ্টার পর চারলস্‌কে এ সম্বন্ধে লিখিতে গবর্ণর সম্মত হইলেন। ইতিমধ্যে ভ্যাকুলারসের দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জেনীর দলভুক্ত হইলেন। ইহারা দুইজন রাজসন্নিধানে জেনীকে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। জেনীর অমানুষী ক্ষমতার কথা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছিল, লরেনের ডিউক জেনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি জেনী সে আহ্বান অগ্রাহ্য করিলেন। গবর্ণর পত্রের উত্তর পাইলেন কি না, অজ্ঞাত রহিল, কিন্তু জেনীর মামা অন্যান্য লোকের সাহায্যে জেনীর জন্য একটী অশ্ব খরিদ করিলেন।

জেনী পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া রাজসন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। গবর্ণর বড্রিকোর্ট যাত্রীদলের নিরাপদ গমনে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

জেনীর পিতা মাতা এই সংবাদে বড়ই বিচলিত হইয়া ভ্যাকুলারসে আসিলেন, কিন্তু জেনী কিছুতেই প্রতিনিবৃত্তা হইলেন না, পিতা মাতার চক্ষের জলে তাঁহার কোনই পরিবর্ত্তন হইল না, তিনি পিতা মাতার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি যাত্রা করিলেন। ৬ জন বিশ্বাসী লোক কেবল সাথী ছিল। পথের দারুণ কষ্ট জেনী অম্লানচিত্তে সহ্য করিতে লাগিলেন। প্রার্থনাই তাঁহার প্রধান সম্বল হইল। লয়ার নদী পার হওয়ার পর জেনী প্রকাশ্যে তাঁহার প্রত্যাদেশের কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। জেনীর প্রত্যাদেশ-কাহিনী শুনিয়া সকল লোক নব আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এই সময়ে অতি কষ্টে চারলস্ কেবল ৩০০০ লোক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্লারমণ্টের ১০০০ লোক সহ মোট ৪০০০ লোক লইয়া ফাষ্টফের রসদবাহী দলকে আক্রমণ করিলেন। ফাষ্টফ ২০০০ লোক সহ বাধা দিলেন—ফরাসীগণ এত কাপুরুষ যে, ছত্রভঙ্গ হইল—৫০০ মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

সেণ্ট ক্যাথরিন-ডি-ফিরবইস নামক স্থান হইতে জেনীকে গ্রহণ করিতে পলায়িত রাজা চারলস্ পত্র দিলেন। চিনন(Chinon) নামক স্থান সাক্ষাতের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রথমতঃ জেনীকে বিবিধ প্রকারে পরীক্ষা করা হইল। রাজা ছদ্মবেশ ধারণ করিলেও জেনী তাঁহাকে বাছিয়া বাহির করিলেন এবং বলিলেন—"রাজন্, ঈশ্বর আপনাকে অমূল্য জীবন দিয়াছেন'।"

রাজা বলিলেন, 'আমি রাজা নহি, ঐ রাজা বসিয়া আছেন।

জেনী এই প্রতারণায় না ভুলিয়া বলিলেন, আপনিই রাজা, আমি কুমারী জেনী, বিধাতার প্রত্যাদেশে আপনার নিকট আসিয়াছি এবং আমি ঘোষণা করিতেছি, আমি ইংরাজের হস্ত হইতে রাজ্যোদ্ধার করিয়া আপনাকে রিমসে (Rheims) বৈধ রাজা বলিয়া অভিষিক্ত করিব।

রাজা বিস্মিত হইয়া অরলিন্সের কুমারীকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। চিননের (Chinon) একটী সৈন্য জেনার পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় জেনীর প্রতি অপভাষা প্রয়োগ করায় জেনা বলিয়াছিলেন যে, তোমার মৃত্যু নিকট। সেই দিনই জলে ডুবিয়া ঐ সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। জেনীর অলৌকিক শক্তিতে অনেকে বিস্মিত হইলেও রাজা পইটারস বিশ্ববিদ্যালয়কে জেনীর পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা পরীক্ষার পর ধার্য্য হইল যে, রাজা জেনীর সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন। নানা পরীক্ষায় দুই মাস অতিবাহিত হইল, এপ্রেল মাসে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। ব্লইস (Blois) নামক স্থানে তিনি অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়া আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহার অলৌলিক তেজপূর্ণ আবির্ভাবে সমস্ত সৈন্যের মধ্যে উৎসাহের বিদ্যুৎ সংক্রামিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে ৬০০০ লোক একত্রিত হইল। তিনি দুশ্চরিত্র লোকদিগকে বিদায় দিয়া, প্রার্থনা এবং প্রত্যাদেশের অমানুষী শক্তিতে সকলকে দীক্ষিত করিলেন। তিনি অরলিনস আক্রমণকারী ইংরাজ কাপ্তেনদিগকে ঐ নগর এবং অন্যায় পূর্ব্বক অধিকৃত সমস্ত নগর

তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে পত্র লিখিলেন। সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, এখানেও সেই প্রকার হইল, ইংরাজগণ ঘৃণার সহিত তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। সুতরাং জেনা ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রেল জেনী অশেষ ক্লেশ এবং বিপদ অতিক্রম করিয়া অরলিনস্ নগরে সদর্পে উপনীতা হইলেন। পুরুষ রমণী, বালক বৃদ্ধ সকলে তাঁহাকে উদ্ধারকর্ত্রী বলিয়া অভিবাদন করিল। অরলিন্সের যে ঘরে তিনি বাস করিয়াছিলেন, অদ্যাপিও তাহা সকলকে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পর দিন প্রত্যুষে অনেক পরামর্শ হইল; সৈন্যাধ্যক্ষগণের মধ্যে মতভেদ হইলেও, তিনি ইংরাজদিগকে প্রস্থান করিতে পুনঃ আদেশ করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারা ঘৃণার সহিত এবারও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। সুতরাং আক্রমণ করিলেন। প্রথম আক্রমণ সফল হইল। পর দিন প্রত্যুষে ইংরাজের সেণ্ট লুপ দুর্গ (St. Loup) আক্রান্ত হইল।—জেনী হঠাৎ উপস্থিত হইয়া সকলের মধ্যে অগ্নিতেজ প্রবাহিত করিলেন। ৩ ঘণ্টা যুদ্ধ চলিল এবং ইংরাজগণ পরাজিত হইলেন। ৪০ জন কয়েদী ভিন্ন দুর্গমধ্যস্থ সমস্ত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল; কেবল কয়েকজন পুরোহিত বেশধারী লোককে কুমারী জেনী ছাড়িয়া দিলেন। পর দিন, ৫ই মে, স্বর্গারোহণের দিন বলিয়া আর আক্রমণ হইল না, জেনী উপাসনায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিলেন। পর দিন পুনঃ আক্রমণ করা হইল, এবং একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ ভিন্ন (Bastille des Tournelles) সমস্ত ফরাসীদিগের অধিকারে আসিল। জেনী এই আক্রমণে একটু আহতা হইয়াছিলেন। ঐ দুর্গ গ্লাডস্ডেল (Gladsdale) বাছা বাছা সাহসী সৈন্য সহ রক্ষা করিতেছিলেন। ফরাসীদিগের মধ্যে এই দুর্গ আক্রমণ করা সম্বন্ধে মতভেদ ছিল, কিন্তু জেনী কাহারও কথা না শুনিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলে সকলে আসিয়া যোগ দিয়াছিল। জেনীর আবির্ভাবে ফরাসী সৈনিকগণ যেরূপ সাহসে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, ইংরাজগণ তেমনই ভীত হইয়াছিল। কেহই বাধা দিতে প্রস্তুত হইল না—গ্লাডস্ডেল ৫০০ দুর্দ্দান্ত সাহসী সেনানী লইয়া এই দুর্ভেদ্য দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রাতে ১০ টার সময় আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল, ১২টার সময়, দুর্গে প্রবেশের জন্য জেনী সিঁড়ি আরোহণ করিবার সময় একটী তীর তাঁহার গলদেশ ভেদ করিয়া যায় এবং তিনি একটী নালাতে পড়িয়া যান। ইংরাজগণ তাঁহাকে কয়েদ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসীগণ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। তিনি নিজ হাতে তীর নিষ্কাশিত করেন এবং ঘোষণা করেন যে, তিনি আবার প্রত্যাদিষ্টা হইয়াছেন। তিনি অব্যবহিত পরেই আবার সৈন্যগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে আবার উৎসাহে প্রদীপ্ত হইল। ইংরাজ সৈন্যগণ ভয়ে কম্পিত হইল এবং বলিল যে, স্বর্গীয় ভূত ফরাসী পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে। গ্লাডস্ডেল কিছুতেই না পারিয়া দুর্গের মধ্যে অবশিষ্ট সৈন্যগণকে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে জেনী তাঁহাকে দেখিলেন এবং আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি কথা না শুনিয়া যখন সৈন্যগণ সহ একটী সঙ্কীর্ণ সেতু উত্তীর্ণ হইতেছিলেন, তখন সেতু ভাঙ্গিয়া সকলে প্রাণ হারাইলেন। জয়োল্লাসে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইল—দুর্গের

সমস্ত সৈন্য নিহত হইয়াছিল, কেবল ২০০ আত্মসমর্পণ করিল। অরলিন্সের নিকটে ৭০০০ কি ৮৮০০ ইংরাজ সৈন্য প্রাণ দিয়াছিল। ১৪২৯ খ্রীঃ ৭ই মে অরলিনস্ ফরাসীর হস্তগত হইল। জয়োল্লাসে নগর আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইল—সমস্ত গির্জ্জায় জয়-ঘণ্টা নিনাদিত এবং জনগণের আনন্দোল্লাসে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ইংরাজগণ ৮ই মে, রবিবার, অগ্নি প্রদান করিয়া নগর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। পীড়িত এবং আহত সৈনিকদিগকে তাহারা পরিত্যাগ করিয়া চলিল। এইরূপে জেনীর প্রথম প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হইল—অরলিনস্ উদ্ধার হইল। এই সময় হইতে তিনি অরলিনসের কুমারী (Pucelle D' Orleans—Maid of Orleans) নামে অভিহিতা হইতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে অদ্য পর্যান্ত, ৮ই মে, অরলিনস নগরে, পবিত্র দিনরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা—রিম্‌সে চারলসের অভিষেকের আয়োজনে তৎপর, জেনী বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি জয়োল্লাসে প্রমত্তা এবং পরিশ্রম ও ক্লেশে দমিতা না হইয়া ১০ই মে অরলিনস্ হইতে যাত্রা করিয়া ব্লইস (Blois) ঐ দিনই পৌঁছিলেন। চারলস্ রিম্‌স অভিযানে কিন্তু সম্মতি দিলেন না। সৈন্যগণও মত না দিয়া জারগো (Jargeau) নামক সফোকের আরল্ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত স্থান আক্রমণ করিল এবং অকৃতকার্য্য হইল। জেনী এই সংবাদ পাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং অনায়াসে নগর অধিকার করিলেন। এখানে জেনী দ্বিতীয়বার আহতা হন। তিনি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যান এবং একখানি প্রস্তর দ্বারা আহতা হন। আহতা হইলেও তৎক্ষণাৎ তিনি পুনরুত্থিতা হইলেন এবং সৈন্যগণকে নবোৎসাহে মাতাইয়া নগর অধিকার করিলেন এবং আরলকে বন্দী করিলেন। সমস্ত ইংরাজ সৈন্যের অধ্যক্ষ তালবট এই পরাজয় দেখিয়া সিন (Seine) নদীর দিকে পলায়ন-তৎপর হইলেন। পথিমধ্যে, ৪০০০ লোক সহ ফাস্টফ তাঁহার সহিত যুক্ত হইলেন। ফরাসী সৈন্যদলেও অনেক লোক আসিয়া জুটিল। ১৮ই জুন প্যাটে গ্রামে (Patay) পলায়িত ইংরাজ সৈন্যগণ পুনঃ আক্রান্ত হইল। ইংরাজ সৈন্যগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, ফাসটফও পলায়ন করিলেন। লর্ড স্কেলস্, লর্ড হঙ্গারফোর্ড প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ফরাসী হস্তে বন্দী হইলেন। এই যুদ্ধে ৪০০০ হইতে ৫০০০ ইংরাজ সৈন্য হ্রাস হইয়াছিল। ২০০০ হইতে ৩০০০ মৃত্যু মুখে পড়ে, অবশিষ্ট বন্দী হয়। ফরাসী পক্ষে কেবল একজন সৈন্য মৃত্যু মুখে পড়ে(Count of Armagnac)। যুদ্ধের অবসানে ফরাসী সৈন্যগণ যখন পলায়ন-তৎপর সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছিল, তখন জেনী দেব-দূতের ন্যায় আহতের সেবা এবং মৃত্যুগ্রাসে পতিতদিগকে আশ্বস্ত করিতেছিলেন। সে এক অপরূপ দৃশ্য। তালবটও এই যুদ্ধে কয়েদী হন। জেনী সলিতে (Sully) প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কয়েদীদিগকে এবং তালবটকে মুক্তি দিতে চারলসকে অনুরোধ করিলে সকলকে মুক্তি দেওয়া হইল। এই অমানুষী দয়ার নিদর্শনে সকলে বিস্মিত হইল। এ হেন দয়ার অবতারের প্রতি শেষে ইংরাজের অত্যাচার স্মরণ হইলে ইংরাজদিগকে শত ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।

সন্দিগ্ধ চারলস্ অবশেষে রিমস্ অভিযানে সম্মতি প্রদান করিলেন।

দশ বারো সহস্র সৈন্যসহ জেনী সমভিব্যাহারে চারলাস্ রিমস্ অভিযান আরম্ভ করিলেন। পথিমধ্যে নানা নগর অধিকার করিলেন এবং ১৬ই জুলাই রিমসে পৌঁছিলেন। জেনীর দেবপ্রতিম মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে বিমোহিত হইল। সেই দিনই রিমসে চারলস্ বিধিপূর্ব্বক অভিষিক্ত হইলেন। এইরূপে প্রত্যাদিষ্টা জেনীর প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। অভিষেকের দিনে জেনী বারগণ্ডির ডিউকের নিকট যে বিস্তৃত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাবধি লিলিতে (Lille) যত্নে রক্ষিত হইতেছে। এই সময়ে জেনীর পিতা এবং মামা গৌরবের উচ্চচূড়ে সমারূঢ়া জেনীকে দেখিতে উপস্থিত হন। জেনীর এই গৌরবেও তিনি কিন্তু পূর্ব্ব বেশভূষা কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই। যখন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিল— জগতে এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় নাই. তদুত্তরে তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'বিধাতার অবোধ্য শাস্ত্র কে বুঝিবে—আমি তাঁহার প্রত্যাদিষ্টা কন্যা মাত্র।" পিতা ও মামাকে দেখিয়া তাহার স্মৃতিতে ডোমরেমির কথা জাগিয়াছিল। তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্ত করিয়া তিনি দেশে ফিরিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু চারলস্ কিছুতেই তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে চারলসের স্বার্থ-সাধনে রত থাকিতে হইল। কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনের কার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই সময় হইতে তদীয় জীবনের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। পূর্ব্বের তেজ, সাহস, অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল বটে, কিন্তু ইহার পর বিধাতার আদেশে যে তিনি চালিতা, ইহা বিশ্বাস করিতেন না এবং সৈন্যাধ্যক্ষদিগের বিরুদ্ধে চলিতেন না। হায়, জেনাকে যদি স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া হইত, তাহা হইলে আর ইংরাজ-চরিত্র কলঙ্কিত হইত না। বিধাতার দুরবগাহ বিধান কে বুঝিবে?

জয়ের পর জয় আসিয়া চারলসকে অভিবাদন করিতে লাগিল—নগরের পর নগর অধিকৃত হইতে লাগিল। সে সকল কাহিনী বিবৃত করিতে আমরা বিরত রহিলাম। চাটো-থেরিতে (Chateau-Thierry) অবস্থিতিকালীন রাজা তাঁহাকে মহা সম্মানে ও নানা উপহারে ভূষিতা করিতে চাহিলেও তিনি অস্বীকৃতা হইলেন, কেবল তাহার বাল্য লীলাস্থলকে করমুক্ত করিবার অধিকার চাহিলেন। ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই এই করমুক্তির আদেশ প্রদত্ত হয়;— ফরাসী বিপ্লবের পরেও এই আদেশ অক্ষুণ্ণ ছিল।

জয়ের পর জয় অবশেষে রাজাকে পারী নগর সন্নিধানে উপস্থিত করিল। ইংরাজগণ ভয়ে কম্পিত হইলেও, দশ সহস্র সেনানী বেড্‌ফোর্ডের ডিউকের অধীনে প্রস্তুত হইল। ৭ই আগষ্ট ফরাসী সৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলে চারলসের নিকট হইতে ডিউক এক পত্র প্রাপ্ত হন। ফরাসী সৈন্যগণ, জয়োল্লাসে, ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বিনীত, অসংযত ও চরিত্রহীন হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা দেখিয়া জেনী বড়ই নিরাশ হইয়াছিলেন। এই দুর্ব্বিনীত সৈনিকের একজনকে জেনী একদিন তাঁহার হস্তের সুবিখ্যাত তরবারির দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন,তাহাতে তরবারি ভাঙ্গিয়া যায়। এই কার্য্যে রাজা অসন্তুষ্ট হন।

সেণ্টু ডেনিস হইতে রাজা তাহার প্রাচীন রাজধানী নিরীক্ষণ করেন এবং সেপ্টেম্বর মাসে আক্রমণ করেন। জেনী ইংরাজদিগকে রাজার বশীভূত হইতে আদেশ করেন —কিন্তু তাঁহারা ঘৃণা পূর্ব্বক উপেক্ষা করে। তাঁহার পরিচয় তাঁহার পার্শ্বেই প্রাণত্যাগ করিল এবং তিনিও পাদদেশে গুরুতর রূপে আহত হইলেন। তিনি এখনও সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে সাহস দিতে লাগিলেন—কিন্তু কোন ফল হইল না। জেনী নিরাশ হইয়া দেখিলেন, ফরাসী সৈন্যগণ পলায়ন করিতেছে। তিনি যুদ্ধ হইতে চিরবিদায় লইতে এবং ঈশ্বরের কার্য্যে জীবন ঢালিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু পদে পদে বাধা পাইতে লাগিলেন—রাজাকে পরিত্যাগ করিতে সকলেই নিষেধ করিল। চারলস্ নিরুৎসাহিত হইলেন, কিন্তু বেড্‌ফোর্ডের ডিউক অমিত-তেজে পারী নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। ফরাসী সৈন্যগণের মধ্যে নানা রূপ মতভেদ উপস্থিত হইল, পারী পুনঃ আক্রমণে অনেকে নিষেধ করিতে লাগিল—জেনীর প্রতিও অনেকে সন্দিগ্ধ হইল;—সৈন্যগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে সকলেই স্বীকৃত হইল। ইহার কিয়দ্দিবস পরে, ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, প্রকাশ্যে রাজা জেনীকে ধন্যবাদ দিলেন—

"To testify and render thanks', say the letters-patent, which bear the date of December, 1429, 'to the divine wisdom, for the numberless mercies he has vouchsafed through the hands of his chosen minister, and our well-beloved maid, Joan of Arc of Demremy,"

রাজা নানা রূপে জেনীর ভ্রাতাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং জেনীকে বেশ ভূষায় সজ্জিতা ও সহচরীবৃন্দে পরিবেষ্টিতা করিতে চাহিলেন—দেবী রূপে তাহাকে সম্মান দিলেন, —কিন্তু জেনীর চরিত্র ও বেশ ভূষা পূর্ব্ববৎ রহিল,—দেবদুর্লভ পূত চরিত্র জেনীকে অপূর্ব্ব সাজে সাজাইল।

এ পর্য্যন্ত জেনী কোন সময়ে অকৃতকার্য্য হন নাই, কিন্তু এখন তাহা পরিবর্ত্তিত হইল। ওইস (Oise) নদীর তীরে কমপেন্ নগরী (Compiegne) ইংরাজ সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে জেনী কতিপয় লোক সহ তাহা প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। প্রথমত তিনি সকলকে বিতাড়িত করেন, কিন্তু ক্রমাগত দলে দলে লোক আসিয়া বিতাড়িতদিগের দলপুষ্ট করিতে লাগিল যখন, তখন তিনি আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে আদেশ করিলেন। জেনী এই দলে আছে ভাবিয়া ইংরাজগণ পশ্চাদ্ধাবিত হইতে লাগিল। জেনীর পোষাক তাহারা চিনিয়াছিল। ইংরাজগণের আক্রমণে অনেকে নদী গর্ভে পতিত হইল। অনেকে বন্দী হইল এবং জেনী সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, তিনি ইংরাজগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা হইয়াছেন। তিনি আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ফরাসীগণ আপন আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল—অরলিনসের কুমারী, অভিমন্যুর ন্যায়, শত্রুব্যূহে নিপতিতা হইলেন! অবশেষে তিনি জনৈক তীরধারীর (John of Luxemburg) দ্বারা ধৃতা হইলেন। এই অবসরে অন্য একজন (Lionel of Vendome) তাঁহাকে নিরস্ত্র করিল। ইংরাজমহলে আনন্দোল্লাসের রোল উঠিল—ফরাসীরা এই ঘটনায় যার পর নাই বিষাদে নিমগ্ন হইল!

তারপরের কথা বিষাদে পূর্ণ। সে সব বিষাদের কাহিনী লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। জেনীর প্রতি ইংরাজের নির্ম্মম ব্যবহার ইতি-

ধাসের চিরকলঙ্ক। কল্পিত অন্ধকূপহত্যার কথা লিখিবার সময় ইংরাজ-ইতিহাস-লেখক জেনীর প্রতি ইংরাজের নির্ম্মম ব্যবহার কিরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহা ভাবিতে পারি না।* জেনী এই অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত ২বার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—দ্বিতীয়বার লম্ফ প্রদান কালীন গুরুতর রূপে আহতা হইয়াছিলেন। আর লেখনী লিখিতে চাহে না। কিরূপে জেনীকে বিচার-বিভ্রাটে ফেলা হইয়াছিল, কিরূপে ষড়যন্ত্রের উপর ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল, কিরূপে প্রতারকগণের প্রতারণায় তিনি অস্থির হইয়াছিলেন, কিরূপে ধর্ম্মযাজকেরা ধনের বশবর্ত্তী হইয়া ন্যায় ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া জেনীকে অগ্নিদাহ করিতে আদেশ দিয়াছিল, ভাবিলে শরীর অবসন্ন হয়, নয়নে অশ্রু ঝরে। হায়, ধর্ম্ম, তুমি অর্থ-লোলুপ ধর্ম্ম-যাজকদিগের স্বার্থসাধনের সহায়রূপে কিরূপে মানব-সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে প্রস্তুত হও,আমরা সামান্য জীব,তাহা বুঝিতে অক্ষম। ফক্সের"বুক অব মার্টারস্"পুস্তকে কত কত লোকের প্রতি খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিরোধীদিগের অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু জেনীর প্রতি খ্রীষ্টধর্ম্ম বিশ্বাসীগণ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার তুলনা মিলে না। কেবল খ্রীষ্টের ক্রুশে দেহত্যাগে তাহার তুলনা মিলে। খ্রীষ্টের দেহত্যাগে প্যালেষ্টাইন ধন্য এবং জেনীর দেহত্যাগে ফ্রান্স পূজ্য। ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে তিনি বিচারিতা হন,—একজন উকীল বা এডভোকেটও তাঁহার পোষকতা করিতে অধিকার পায় নাই! তাঁহার শেষ উক্তি তাঁহার জীবনের পবিত্রতার কাহিনীর স্পষ্ট অভিব্যক্তি—"Does God, then, hate the English ?" ঈশ্বর কি ইংরাজদিগকে ঘৃণা করেন, এ কথার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,

"Whether God loves or hates the English, I do not know ; but I know that all those who do not die in battle shall be driven away from this realm by the king of France." আমি জানি না ঈশ্বর ইংরাজ-দিগকে ঘৃণা করেন কিনা, কিন্তু ইহা জানি, যাহারা যুদ্ধে মরিবে না, তাহারা ফ্রান্সের রাজা কর্ত্তৃক এই দেশ হইতে তাড়িত হইবে। When questioned about her standard, she said :—I carried it instead of a lance, to avoid slaying any one ; I have killed nobody. I only said :—"Rush in among the English," and I rushed among them the first myself.—'The voices', she continued, 'the voices told me to

* Here she was confined in the great tower of the castle—the only tower which now remains, and which is yet shewn as her prison. She was now treated with the most determined cruelty. Heavily ironed, her feet in the daytime were fixed in iron stocks ; and at night a chain was passed round her waist, so that she could not move upon her wretched bed * * Not only from her coarse and brutal guards was she exposed to every species of insult ; even her captor, John of Luxemburg accompanied by Warwick and Strafford, did not blush to visit her in prison, and triumph in her misery. Yet this was the age of chivalry, and Joan was a woman, and a fallen foe ! —one who, enduring the foulest wrongs at the hands of so-called Christian knights and nobles, would have received, among the pagan ancients, the honours due to the most devoted patriotism. Luxemburg gestingly told the poor captive he had come to release her, if she would promise never to take arms again. 'Do not mock me,'she replied with dignity ; 'I know that you have neither the will nor the power. The English will kill me believing that, after my death, they will gain the Kingdom of France ; but were there a hundred thousand more of them than there are, they should not conquer. It is said that her words so irritated Strafford that he drew his dagger, and would have struck her, had not his hand been stayed by the Earl of Warwick.

take it without fear, and that God would help me.' With regard to assuming mans' attire, she replied that she had worn it in obedience to the command of God.—ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে কাজ করিয়াছি, নরহত্যা করি নাই—ইত্যাদি কথা নির্ভীক চিত্তে বলিলেও তাঁহার প্রতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। কথিত আছে, একজন ইংরাজ বিচার দেখিয়া বলিয়াছিল—"A worthy woman, If she were but English" পূর্ণ একবৎসর পর—২৪শে মে, ১৪৩১ খ্রীঃ বিচার শেষ হইল। ৩০শে মে রোয়েনের (Rouen) প্রকাশ্য স্থলে তাঁহাকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া বধ করা হয়। যেমন জুডাস ইস্কারিয়ট, তেমনি বিশ্বাসঘাতক L' Oiseleur পরে অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। শেষ মুহূর্ত্তে তিনি যে মর্ম্মভেদী প্রার্থনা করিয়াছিলেন—তাহা শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।* শেষ মুহূর্ত্তে যখন অগ্নিতে সমর্পণ করিবার আদেশ হইল, বিশ্বাসঘাতক বিসপ বোভাইস (Beauvais) and উইনচেষ্টারের কার্ডিনালের সমক্ষে তিনি ক্রুস চুম্বন করিয়া প্রার্থনা করিলেন। তৎপর সকলের নিকট ক্ষমা চাহিলেন এবং সকলকে ক্ষমা করিলেন এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলেন।† দেখিতে দেখিতে সব নিঃশেষ হইল! কিন্তু জেনীর চিতা-ভস্ম হইতে নব ফ্রান্স জন্মগ্রহণ করিল।

এবং তারপর? যেমন খ্রীষ্টধর্ম্ম খ্রীষ্টের মৃত্যুতে নবজীবন লাভ করিয়াছিল, ফ্রান্সও তেমনি, নব বলে বলীয়ান হইল। প্রমত্ত ফ্রান্সকে বশীভূত করিতে বেডফোর্ডের ডিউক অসমর্থ হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে দেশের পর দেশ, নগরের পর নগর ইংরাজ-হস্ত-বিচ্যুত হইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে সমস্ত ফ্রান্স চারলসের করায়ত্ত—"This, with some subsequent movements, turned the balance so effectually against the English, that in a few years they were, with trifling exceptions, stripped of all their French possessions." এবং প্রতিশোধের জয় জয়কার হইল।

১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রিমসের আর্কিবিশপ-প্রমুখ কোর্ট পুনঃ জেনীর বিচার করেন এবং তাঁহার নির্দ্দোষিতা ঘোষণা করেন।‡ তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভে লিখিত আছে—

"The maiden's sword protects the
royal crown;
Beneath her sacred care, the lilies
safely bloom.

Scarcely, however, was the frightful tragedy concluded, before there was a pity among the spectators. Some began to think they had committed a crime in burning a saint; others wished their own persons had been burned in the place of hers. Yet, notwithstanding these demonstrations of feeling, further indignities were heaped on her remains. The blackened corpse was shewn to the people, to convince them of her identity; then a second fire was kindled and her body, reduced to ashes, was thrown in the Seine.

---

* As she rode on, her prayers were so devout and she recommended her soul to the Almighty in such touching accents, that several of the spectators were moved to tears; and some of the assessors had not the heart to follow her to the last. "O Rouen! O Rouen!" she exclaimed as she came near the market-place, 'is it here, indeed, that I must die.'

† She then declared that she forgave all those who had injured her, and concluded by entreating the prayers of the spectators. She spoke distinctly, and her words and resignation to the will of God drew tears and sobs from many who had come prepared to revile her. * * *

‡ ফরাসী উচ্চারণ না জানা থাকায় নামের, অনুবাদে ভুল থাকিতে পারে, তজ্জন্য ক্ষমা চাই। ন, সং।

শিশু কৃষ্ণ। *

মাঘ মাসের "প্রবাসী"তে ও জানুয়ারী মাসের Modern Reviewতে কারাগারে পিতৃসন্নিধানে, মাতৃক্রোড়ে শিশু কৃষ্ণের একটী চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্র পরিচয়ে "প্রবাসী"তে Modern Reviewএ শ্রীযুক্তা ভগিনী নিবেদিতা (Miss Noble) মহোদয়ার "CradleTales of Hinduism" নামক গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

শিশু কৃষ্ণের কথা বলিতে গিয়া সংকর্ষণ বলরামের কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রবাসীতে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, যথাঃ— "কংশ নিজ বন্ধু ও অমাত্য বাসুদেব ও নিজ ভগিনী দেবকীকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি এইজন্য নিজ ভগিনী দেবকীর সহিত বাসুদেবের বিবাহ দিলেন। এবং বিবাহের পর এক রথে করিয়া নিজেই সারথি হইয়া তাঁহাদিগকে বাসুদেবের গৃহে লইয়া যাইবার জন্য রথ চালাইয়া দিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে এই আকাশবাণী শ্রুত হইল "রে অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্ত রাজা এই দম্পতির অষ্টম সন্তান একটী বালক হইবে। সেই বালক বার বৎসর বয়সে নিজ হস্তে তোর প্রাণবধ করিবে।" ইহা শুনিয়া বাসুদেব ও দেবকীর প্রতি কংশের প্রীতি ঘোর বিদ্বেষে পরিণত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া আবার মথুরায় রথ লইয়া গেলেন এবং সেখানে বাসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাঁহাদের প্রত্যেক সন্তানকে কংস জন্মের পরেই বধ করিবেন। এইরূপ বার বার সাত বার সাতটী শিশু জন্মিল, কেবল বলরাম ছাড়া আর সব শিশুই কংসের নিষ্ঠুর হস্তে প্রাণ হারাইল। বলরামকে গোপনে কারাগার হইতে সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল এবং কংসকে বলা হইয়াছিল যে শিশুটী জন্মিবার পরেই মারা গিয়াছে।"

বলরাম সম্বন্ধে যে কথা লেখা হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব শাস্ত্রের উক্তির সহিত মিলে না। শ্রীযুক্তা ভগিনী নিবেদিতা কোথা হইতে বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সহোদর ভ্রাতা বলিয়া পাইলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। বলরাম রোহিণীর গর্ভজাত সন্তান, শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভাই বলিয়াই জানি। এবং বৈষ্ণব শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই পাওয়া যায়। ভাগবতে আছে—

পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহ শরীর্‌বাক্।
অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ॥

রে মূর্খ! তুই আজ আনন্দে যাঁহাকে রথে করিয়া বহন করিতেছিস্, ইহাঁরই অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তোর জীবন সংহার করিবে।

ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ।
ভগিনীং হন্তুমারব্ধ খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ।

সেই খল পাপী ভোজকুল-কুলাঙ্গার এই

---

* এই প্রবন্ধটী প্রবাসীতে ছাপাইবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় ছাপাইবার কথা জানাইয়াও ছাপান নাই। "মনোনীত" হইয়াও কেন যে ভ্রমসংশোধনার্থ ইহা ছাপান হইল না, তাহা সম্পাদক মহাশয়ই জানেন। লেখক।

কথা শুনিয়া খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক ভগ্নিনীকে বধ করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইয়া তাঁহার কেশ ধারণ করিল।

তখন বসুদেব—বাসুদেব নয়, বসুদেবের পুত্র বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম বাসুদেব—বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন,

শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজ যশস্করঃ
স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্ব্বণি॥

হে শূরগণের পূজনীয় ভোজ বংশ যশোবর্দ্ধক! তুমি কি নিমিত্ত তোমার বিবাহিতা ভগিনীকে বধ করিবে? এবং নানাপ্রকার উপদেশ দিয়াও যখন নির্দ্দয় কংসকে এই পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত করিতে পারিলেন না, তখন বসুদেব বহু সম্মান পূর্ব্বক মধুর হাস্যে সেই নৃশংস পাপাচারী কংসকে বলিলেন—

ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্বৈ সাহাশরীর বাক্।
পুত্রাণ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্॥

হে সৌম্য! দৈববাণী যাহা হইয়াছে, এই দেবকী হইতে তোমার সেরূপ আশঙ্কা নাই, দেবকীর সকল পুত্রকেই তোমার হস্তে সমর্পণ করিব।

ইহাতে কংস সন্তুষ্ট হইয়া দেবকীকে আর বধ করিলেন না।

বসুদেবও কংসের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর যথাকালে দেবী দেবকী অষ্ট পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ বসুদেব অতি কষ্টে প্রথম পুত্রটীকে কংসের হস্তে অর্পণ করিলেন। ধার্ম্মিক বসুদেবের এইরূপ সত্য পালন দেখিয়া দুর্ব্বৃত্ত কংসও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—

প্রতিযাতু কুমারোঽয়ং নহ্যস্মাদস্তি মে ভয়ং।
অষ্টমাদ্ যুবয়োর্গর্ভান্মৃত্যুর্মে বিহিত কিল॥

এই বালককে তুমি ফিরিয়া লইয়া যাও, দেবকীর অষ্টমপুত্র হইতে আমার মৃত্যু হইবে, এরূপ আকাশবাণী হইয়াছে।

তাহাই হউক্ বলিয়া সানন্দচিত্তে বসুদেব পুত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দেবর্ষি নারদ দেখিলেন, কংস শান্তি লাভ করিলে দেবকার্য্য উদ্ধারে ব্যাঘাৎ হয়, অতএব তিনি কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ব্রজবাসী নন্দ প্রভৃতি যাবতীয় গোপ ও তাঁহাদের পত্নীগণ, বসুদেব প্রভৃতি সমুদয় বৃষ্ণিবংশীয়, দেবকী প্রভৃতি যাবতীয় যদুকুল কামিনীগণ এবং কুলের জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব সকলেই দেবতা। পৃথিবীর ভারভূত দৈত্যগণকে বিনাশ করিবার জন্য ইহাঁরা দেহধারণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই কথা শুনিবামাত্র কংস বসুদেব ও দেবকীকে গৃহে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল।* এবং যখনই দেবী দেবকী হইতে যে যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ সেই সেই পুত্রকে বিষ্ণুবোধে সংহার করিতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে দেবী দেবকীর ছয় সন্তান হয়, কংস তাহাদের সকলকেই একে একে নষ্ট করে। বিষ্ণুর অংশে দেবকীর সপ্তম গর্ভ সঞ্চারিত হইলে—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ং।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ॥

ভগবান বিশ্বাত্মা যোগমায়াকে আদেশ করিলেন—

গচ্ছ দেবী ব্রজং ভদ্রে গোপ গোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দ গোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তিহি॥
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম সামকং।
তৎসন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥

* দেবকীং বসুদেবঞ্চ নিগৃহ্য নিগড়ৈ গৃহে।

হে দেবি! তুমি গো গোপগণে পরিবৃত হইয়া ব্রজে গমন কর। বসুদেবপত্নী রোহিণী গোকুলে ও তাঁহার অন্যান্য পত্নীগণ কংসভয়ে ভীত হইয়া গোপনে বাস করিতেছেন। অনন্ত নামে আমার অংশ দেবকীর উদরে আবির্ভূত হইয়াছে, তুমি সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন কর। ভগবানের আদেশে মায়া পৃথিবীতে আসিয়া দেবকীর গর্ভ লইয়া রোহিণীর উদরে স্থাপন করিলেন। পুরবাসিগণ দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইল বলিয়া হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল—

গর্ভসঙ্কষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ ।

দেবী দেবকীর গর্ভ সঙ্কর্ষণ হওয়াতে সন্তানের নাম সঙ্কর্ষণ, লোকের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত রাম এবং বলের আধিক্যবশতঃ বলভদ্র হইবে।

রূপক ছাড়িয়া দিলে এই কথাই দাঁড়ায় যে, বলদেব বসুদেবের পত্নী রোহিণীর গর্ভজাত সন্তান। শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভাই, সহোদর নন। শ্রীযুক্তা ভগিনী নিবেদিতা যদি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের Lord Gouranga * নামক গ্রন্থ পাঠ করিতেন বা একটুকু অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে এরূপ অসত্য এবং অপ্রিয় ঘটনা প্রকাশিত হইত না। হিন্দুদিগের ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণের পিতাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার করিতে হইত না।

"বলরামকে কারাগার হইতে সরাইয়া জন্মিবার পরেই মারা গিয়াছে" বলিয়া কংসকে প্রবোধ দিবার কোনও অযথা প্রয়োজন হইত না। কংস দুর্দ্দান্ত পাপাচারী ঘোর নারকী হইয়াও বসুদেবকে সত্যবাদী, সত্যপরায়ণ,সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করিত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কৃষ্ণভক্ত ভগিনী নিবেদিতা অসাবধানতা বশতঃ তাঁহাকে জগতে প্রবঞ্চকরূপে প্রচার করিলেন। আশা করি, সত্যানুরোধে তিনি এ ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

বিবাহের সঙ্গীত।

(১)

সাহানা—ঝাঁপতাল।

ঘুরিতেছে মহাবিশ্বে এক মহা নিমন্ত্রণ,
ঢেলে দাও প্রাণমন, কর আত্ম বিতরণ।
অণু পরমাণু কণা বলে একা রহিব না,
আপনার জন তরে এত তাই অন্বেষণ।
একা জীব কোথা যাও, ও পথ তোমার নয়।
জীবনের মহালক্ষ্য অনন্তের প্রেমে লয়,
প্রেম-যজ্ঞ দেবী আজ আলো করে রাজ রাজ,
কে দিবে গো পূর্ণাহুতি, কে চায় মহামিলন?

(২)

সিন্ধু—কাওয়ালি।

জীবনের মূলে ব'সে কেগো সর্ব্বমূলাধার
ঘুরাইছ সঙ্গোপনে মহাচক্র ঘটনার?
কার দেখা কার সনে,কি থাকে তোমার মনে;
কি মন্ত্র শুনাও কাণে, পর হয় আপনার।
কুড়ায়ে কুড়ায়ে খণ্ড, পরশি ও প্রেমদণ্ড,
নব শোভা, নব স্বর্গ রচিছ হে বার বার।
এ লীলা-রহস্য মাঝে সাজিয়া হে কত সাজে,
ধরা দিয়ে ধরা দিয়ে মিটেনা কি সাধ আর?

* Page XII—Introduction.

(৩)

বেহাগ—একতালা।

সুন্দর কর, উজ্জ্বল কর, কর চির মধুময়,
দুয়ারে তোমারি প্রসাদ-ভিখারী
প্রণত দুটি হৃদয়।
ফুটুক মঙ্গল, ছুটুক সৌরভ,
উঠুক জীবনে তোমারি গৌরব;
তোমারি প্রমাণ হ'ক দুটি প্রাণ,
চির আনন্দ-আলয়।
তুমি না ধরিলে কেমনে যাইবে,
কঠোর ও ব্রত কেমনে লইবে,
দুর্ব্বলে বল কে সঞ্চারে বল,
কে হরে সংশয় ভয়?
দাও গুরুদেব, নব শিক্ষা,
দাও যজ্ঞেশ্বর মহামন্ত্র-দীক্ষা,
ক'রে তোমাময় যুগল হৃদয় কর
মহা প্রেমে লয়।

(৪)

ভৈরবী—একতালা।

সবাই ফুটিতে [illegible],
ও অমৃত পরশ যথায়।
হ'ক ক্ষুদ্র বিন্দু সেও চায় সিন্ধু,
নগণ্য কীটাণু অনন্তে ধায়।
ফুটি বলে ফুল, ফুটিবে মুকুল,
ফুটিবার তরে জগত আকুল;
ক্ষুদ্র প্রাণ তাই খুঁজিছে সদাই
কেমনে ফুটিয়া আপনা বিলায়।
কি মন্ত্র দিতেছ হৃদয়ে হৃদয়ে,
তুষ্ট নয় প্রাণ আর সীমা ল'য়ে,
কি মধুর সুরে ওই প্রেমপুরে
করিছ নিখিল প্রাণ আকর্ষণ।
মহা কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে ধরিয়া
ডাকিছ সন্তানে আদর করিয়া,
দুটি প্রাণ নিয়ে, সেবা ব্রত দিয়ে,
রাখহে মাতারে মহা সাধনায়।

৫

সুরটমল্লার—একতালা।

হও তবে অগ্রসর।
এক লক্ষ্য ল'য়ে, এক প্রাণ হ'য়ে
হাতে হাত রেখে, অন্তরে অন্তর।
আসে সুখ দুঃখ, আসে দিবারাত্রি,
নাহি নাহি ভয়, অনন্তের যাত্রী,
মায়ের প্রসাদে দেব আশীর্ব্বাদে
হও চিরজয়ী, হওগো অমর।
জীবন নহেত কল্পনা স্বপন,
জীবন যে শুধু আত্ম-বিতরণ
ধন্য সেই জন, ধন্য সে জীবন,
ত্যাগ যার ব্রত, সেবা যার পণ,
সুখী হতে চাও আপনারে দাও,
আশীর্ব্বাদ জেনে সব সয়ে যাও;
(হ'ক) দুইটী জীবন ফুলের মতন
চির বিকশিত, চির সুন্দর।

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৮। অশ্রু। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৵৹। (গীতিকাব্য) এই পুস্তকের কোন বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইল না। অধিকন্তু বিলাতী কাগজে বিলাতী কালীতে ছাপা। এরূপ পুস্তকের আদর না হইলেই আমরা সুখী হইব।

৯। The Annual Report of the Sasipada Institude, Barahanagar, for the year 1908. জীবিত লোকের জীবন্ত কীর্ত্তি। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া সৎকার্য্য করিতে হয়—কিন্তু এই ইন্‌ষ্টিটিউট সে কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ। বাঁচিয়া থাকিলে বিধাতার রাজ্যে কত কি দেখা যায়!

১০। Annual Report of the Rajkumari Leper Asylum at Baidanath-Deoghur for the year 1908. বাঙ্গালীর অধ্যবসায়ের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ১৯০৭—৩১ ডিসেম্বর ৩৮ রোগী ছিল, ১৯০৮—৪৯ জন ভর্ত্তি হয়, মোট ৮৭ জন; তন্মধ্যে ২৯ জন আরোগ্য হইয়া যায়, ২৫ জন পলায়ন করে, ২ জনের মৃত্যু; ১৯০৮ ডিসেম্বরে ৩১জন অবশিষ্ট ছিল। আয়—পূর্ব্বস্থিত ২৯২৩১৸৶০ সহ ৩৫৫২০।৵২; ব্যয় ১৩৭৮৶১০॥ পাই স্থিত ২৯১৫৯।/১১॥ পাই। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু দেববর্ম্মণ মহাশয় বিশেষ সুখ্যাতির সহিত এই আশ্রম পরিচালিত করিতেছেন।

১১। অর্জ্জুন। শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ॥০। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। অর্জ্জুনের অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী বাঙ্গালা ভাষায় আর কখনও পড়ি নাই। ভাষা প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধ। স্কুলে স্কুলে এই পুস্তক অধীত হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

১২। মায়াবাদ। শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ কৃত। ইউনির্ভাসিটি লেকচার। মায়াবাদ—আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ—এই পুস্তকে প্রাঞ্জল ও মিষ্টভাষায় বিবৃত হইয়াছে। পণ্ডিতমহাশয়ের জটিল বিষয় সরল করিবার অপূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি। পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে।

১৩। হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র। শ্রীবিশ্ব-নিন্দুক রায় ওরফে বি, এন রায় প্রণীত। গ্রন্থকার বলেন—"আমি আত্মতত্ব বা আমার তত্ব লিখিয়াছি। কতকগুলি আমির সমষ্টি লইয়াই ভারত। আমাদের তত্ব সমষ্টিই ভারতের তত্ব। আমাদের হ্রাস বা পতনের কারণ বর্ণনায় ভারতের পতনের কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছি।" ইত্যাদি। হিন্দুজাতির হ্রাস বা পতনের কথা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছেন, নিবারণোপায়ের কথা এই পুস্তকে পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। গ্রন্থকার বহু ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন—সাধারণের নিকট আদর না পাইয়া তিনি নিরাশ হইতেছেন। আমরা বলি, নিরাশের কারণ নাই—বিধাতার দিকে চাহিয়া তাঁহার আদেশানুসারে কাজ করিয়া গেলেই সকলে কর্ত্তব্য শেষ হয়—ফল তাঁহার হাতে। গ্রন্থকারের চেষ্টা সফল হউক।

১৪। বনৌষধি দর্পণ। ১ম খণ্ড—শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত; ১৪।২ বিডন ষ্ট্রীট, মূল্য ৫৲। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয় উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন। চরক, সুশ্রুত, বাগভট, হারীত, সিদ্ধযোগ, চক্রদত্ত, বঙ্গসেন এবং ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে চিকিৎসা প্রসঙ্গে যে সকল উদ্ভিদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে কেবল সেই সকল উদ্ভিদের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। উদ্ভিদ সকলের সংস্কৃত নাম প্রভৃতি বিবৃতির পর বাঙ্গালাও ল্যাটিন নামও প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি সুবিস্তৃত এবং পারিপাট্য রূপে মুদ্রিত। প্রাচীন ও নব্য মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এতদ্‌সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর গ্রন্থ এদেশে আর প্রকাশিত হইয়াছে কিনা, জানি না। বহু ছাত্রের ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থের বহুল প্রচার আমরা প্রার্থনা করি। পুস্তকখানি বিলাতী কাগজে ছাপা হইয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

দানযজ্ঞ।

"The soul should delight in giving because the divine nature only gives."—

Annie Besant.

স্বর্গগত পিতৃদেব বলিতেন,—"কোন প্রকার প্রার্থনা লইয়া যখন কেহ তোমার দ্বারে উপস্থিত হইবে, তখন কোন দিকে না তাকাইয়া তোমার কর্ত্তব্য তাহাকে সাধ্যমত সাহায্য করা। সেস্থলে তোমার বিচার করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, অধিকার নাই,—লোকটা দুর্ব্বল কি সবল, অক্ষম কি সক্ষম, বড় কি ছোট, সম্পন্ন কি বিপন্ন; কেবল ইহাই বুঝিবে যে, সে ব্যক্তি যখন একটা অভাব জানাইবার জন্য তোমার দ্বারস্থ হইতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই, তখন সে তদ্বিষয়ে তোমা অপেক্ষা অনেক হীন; সুতরাং তাহার আদ্দাশ শ্রবণ করতঃ যথাসাধ্য সেবা সাহায্য দ্বারা, যতদূর সম্ভব তাহার অভাব পূরণ করা তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য; যে হেতু নিম্নস্থের প্রতি উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তির কৃপাদৃষ্টি ও আনুকূল্য ভগবানের অভিপ্রায় ও কঠোর আদেশ, তাহার অপালনে ঘোর প্রত্যবায়,—জীবজগৎ এক অখণ্ড সামগ্রী, সকলে মিলিয়া এক বিরাট দেহ।"

উক্তরূপ বিধানেই বিধাতার অধীনে চরাচর চলিতেছে। সূর্য্যদেব যদি তন্মণ্ডলান্তর্গত গ্রহরাজিকে নিজশক্তিব্যয়ে ধারণ ও পোষণ না করিতেন, তাহাদের দশা আজ কি হইত? ধরিত্রী যদি তাঁহার ক্রোড়স্থ জীবোদ্ভিদাদিকে নিজের রসরক্ত দিয়া প্রতিপালন না করিতেন, আমরা কোথায় থাকিতাম? মহৎ ক্ষুদ্রকে রক্ষা করিয়া না চলিলে বিশ্বসংসার এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে না। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে, ধনী দরিদ্রকে, সম্পন্ন বিপন্নকে, জ্ঞানী মূর্খকে, পুণ্যাত্মা পাপীকে, যদি হাত ধরিয়া না তুলিতেন, জগতের অবস্থা আজ অন্যরূপ হইত, সে অবনতি বিশৃঙ্খলার কথা ভাবিতেও প্রাণ ব্যাকুল হয়।

সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে মনে হয়, যিনি দেন, তাঁহার যেন ক্ষতি হয় এবং যে লয় সে লাভবান হইয়া থাকে। কিন্তু সুসূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক জগতে তদ্বিপরীত ফল প্রত্যক্ষ দেখা যায়; অর্থাৎ যে গ্রহণ করে, সে খাটো হইয়া শক্তি হারায়, পক্ষান্তরে যিনি দেন, তিনি আত্মপ্রসাদাদিজনিত বিপুল স্ফূর্ত্তি ও বল লাভ করিয়া উন্নত হয়েন। স্থূলজগৎ অপেক্ষা সূক্ষ্মজগতের ক্রিয়া যে অধিকতর সুদৃঢ় ফল-প্রসবিনী, তাহা একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা পাইব। জলের স্থূল সূক্ষ্মাবস্থা সমূহের তারতম্য এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এক টুকরা কঠিন বরফের অচল ভাবে এক স্থানে পড়িয়া থাকাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, অপরকে নাড়া দূরে থাকুক, তাহার নিজেরই নড়িবার চড়িবার শক্তি মোটে নাই; কিন্তু উহাকে উত্তাপ কর্ত্তৃক তরল জলের অবস্থায় আনিলে উহার যে শক্তি বাড়ে, তাহা বেশ দেখা যায়, তখন উহা সচল হইয়া সম্মুখস্থ কঠিন পদার্থগুলিকে অনায়াসে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হয়; আবার ঐ জল তেজ দ্বারা সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে পরিণত হইলে যে কিরূপ ভয়ানক শক্তি

ধারণ করে, তাহা কলকারখানা, রেলগাড়ী প্রভৃতি দেখিলেই সহজে বুঝা যায়। বাষ্পকে উত্তাপ দ্বারা সূক্ষ্ম ঐথরিক অবস্থায় লইয়া যাইতে পারিলে উহার শক্তি যে কতদূর বৃদ্ধি পায়, তাহা বৈজ্ঞানিক মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। এবম্প্রকারে তৈজসশক্তি প্রয়োগে উহাকে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মসত্তার নিকট লইয়া যাওয়া সম্ভব, যেখানে উহার শক্তির ইয়ত্তা থাকে না। বিদ্যাদান, জ্ঞানদান প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়াদি সম্বন্ধে কিছু বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কেবলমাত্র স্থূল জড়পদার্থ সমূহের দান সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা হইতেছে। দান দ্বারা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দ্রব্যাদি হস্তান্তর হইলে সূক্ষ্মরাজ্যে কিরূপ ক্রিয়া প্রকটিত এবং তদ্দ্বারা দাতা ও গ্রহীতা দুই জনে আধ্যাত্মিক রাজ্যের কে কোন্ পথে কোথায় গিয়া উপনীত হন, তদ্বিষয়েই কিছু বলা হইতেছে।

শাস্ত্রাদিতে ত্যাগস্বীকার সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ আছে, দেখা যাউক :—

মনুসংহিতা ও ভগবদ্গীতা উভয়ে বলিতেছেন, "অঘংস কেবলং ভুঙক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।" যে ব্যক্তি আপনাকে উদ্দেশ করিয়া অন্ন পাক করে, সে কেবল পাপবিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ প্রত্যহ নিজের আহারীয় দ্রব্যের কিয়দংশ অভাবযুক্ত কোন ব্যক্তিকে না দিয়া খাইলে ভোজনটা পশুবৎ হইয়া ভোক্তার শরীর ও মনের প্রতি বিষ তুল্য ক্রিয়া করিয়া থাকে। ঘোর স্বার্থপরতা হেতু ঐরূপ ব্যক্তি ইহকালে দুঃখ, পরকালে ক্লেশ ও পরজন্মে দণ্ড ভোগ করে।

যদি অভাবক্লিষ্ট ক্ষুধিত কোন মানুষ নিকটে না পাওয়া যায়, পশু পক্ষী কীটাদিকে দিয়া খাইলেও কাজ হয়। সাধুরা বলেন, একটী মানুষকে তৃপ্তিপূর্ব্বক খাওয়াইতে পারিলে সমগ্র মানবমণ্ডলীকে খাওয়াইবার ফল হয়, এবং একটী ইতর প্রাণীর ক্ষুধা শান্ত করিলে নিকৃষ্ট জীব সমূহের সেবা করা হয়। মনুবিহিত প্রাত্যহিক পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ ব্যবস্থাও তদুদ্দেশে। মানব শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থের কিরূপ অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অনুশাসনবাক্য দ্বারা বুঝা যায়।

"দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বাসন্ ন স জীবতি ॥"

দেবতা অতিথি, ভরণীয় পোষ্যবর্গ, পিতৃলোক ও আত্মা, এই পাঁচ জনকে যে ব্যক্তি পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা অন্নাদি না দেয়, সে নিশ্বাস প্রশ্বাসবিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে।"

"ভুক্তবৎস্বথ বিপ্রেষু স্বেষু ভৃত্যেষু চৈবহি।
ভুঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতীঃ ॥

ব্রাহ্মণ, আত্মীয়স্বজন ও দাস, এই তিন শ্রেণীর লোকদিগকে অগ্রে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, গৃহস্থ দম্পতী তাহাই ভোজন করিবেন।

এস্থলে "ব্রাহ্মণ-ভোজন" শুনিয়া অনেকে হয়ত মনুর উপর বিরক্ত হইবেন, কিন্তু বিরক্ত হইবার কারণ নাই। সেকালে ব্রাহ্মণ বলিলে কোন্ শ্রেণীর জীবকে বুঝাইত, দেখা যাউক। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ; সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে, বেদপাঠাত্তবেদ্বিপ্রঃ, ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।" এই ব্যাখ্যানুযায়ী ব্রাহ্মণ বড় দুর্ল্লভ সামগ্রী। যিনি ব্রহ্মকে জানেন, অর্থাৎ পরাবিদ্যাবিশারদ, এরূপ আত্মজ্ঞানী মহাজনকে ভোজন করাইবার ব্যবস্থা—বামুনকে নয়, ব্রাহ্মণকে, পণ্ডিতকে।" সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণকে খাওয়াইবার বিধি কেন? না, জ্ঞানধর্ম্মাচর্চ্চা ও ভগবদুপাসনায় সদা রত

যে মুমুক্ষু জীব, তাঁহার ভরণ পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণের ভার লওয়া সাংসারিক লোক সমূহের একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে বলে, "পণ্ডিতাঃ বনিতাঃ লতাঃ" আশ্রয় ব্যতীত কখনও রক্ষা পায় না। পণ্ডিতকে কেন পত্নী ও লতার সঙ্গে অসহায়ের দলে ফেলা হইল? ভার্য্যা স্বামীকে এবং লতা কোন মহীরুহকে আশ্রয় না করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না সত্য, কিন্তু পণ্ডিত কেন পারিবেন না? পণ্ডিত শব্দে এখানে স্কুল পণ্ডিত বুঝিলে চলিবে না, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ এস্থলে একার্থবোধক। "পণ্ডিত" শব্দের অর্থ "পণ্ডা বুদ্ধিঃ সা জাতা অস্য—শাস্ত্রজ্ঞ।"—যাঁহার বুদ্ধি জন্মিয়াছে, যিনি শাস্ত্রজ্ঞ। এখানে বুদ্ধি মানে টাকা রোজগারের বুদ্ধি নয়, ধান চা'ল বেচাকেনার বুদ্ধি নয়, যাহার নাম প্রজ্ঞা, নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, বিজ্ঞানময় কোশে যাহার অধিষ্ঠান, যে সাত্ত্বিকী-বৃত্তি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায়, কারণ উহাই আত্মার দেহ বা আধার। মহাভারতে আছে—

"পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান স পণ্ডিতঃ॥

পঠক, পাঠক, শাস্ত্রচিন্তক সকলেই বাসনাধীন বলিয়া মিথ্যাসংস্কারবিশিষ্ট মূর্খ, যে ব্যক্তি ক্রিয়াবান অর্থাৎ পূত-চরিত্র আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মোপাসক তিনিই পণ্ডিত।" এবম্বিধ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিগণকেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বলা বিধিসঙ্গত এবং তাঁহারাই আমাদের অবশ্য-প্রতিপাল্য; কারণ দুনিয়াদারীর পথানুসরণ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, সুতরাং অক্ষম। এই শ্রেণীর সংসারবৈরাগী ব্যক্তি কাজেকাজেই বনিতা লতার ন্যায় একেবারে অসহায়। শাস্ত্রাদিতে একথাও আছে যে, নিরক্ষর অপেক্ষা গ্রন্থাধ্যায়ী ভাল, তাঁহাপেক্ষা যিনি পঠিত বিষয়ের ভাবগ্রহণে সক্ষম, তিনি উৎকৃষ্ট, আবার যিনি অধ্যয়নাদি জন্য বোধ হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন, তিনি আরও উৎকৃষ্ট, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই মহাজীব, যিনি উপার্জ্জিত জ্ঞানানুযায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত নামের যোগ্য কেবল এই শেষোক্ত সমর্থ পুরুষ, তাঁহার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হউক আর না হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। ইহা আমাদের কথা নয়, শাস্ত্রকর্ত্তাগণ ঐরূপই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

বর্ণাভিব্যঞ্জক যাহার যে লক্ষণ বলা হইল, তাহা অন্যবর্ণসম্ভূত ব্যক্তিতে দেখিলে তাহাকেও তদ্রূপই স্থির করিবে। এবং মহাভারতে—

"শূদ্রেচৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন স শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রঃ ব্রাহ্মণঃ নচ ব্রাহ্মণঃ॥"

শূদ্রে যদি সদ্‌গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, আর ব্রাহ্মণে তাহা লক্ষিত না হয়, সে শূদ্র শূদ্র নয়, সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়।"

"অন্নদঃ সুখমাপ্নোতি সুতৃপ্ত সর্ব্ববস্তুবু।
ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিদ্যাদানং ততোঽধিকং॥"

যিনি অন্নদান করেন, তিনি অন্য বস্তু সকলের দাতা অপেক্ষা সুতৃপ্ত হইয়া সুখলাভ করেন। ভূমিদানের পর আর দান নাই; বিদ্যাদান তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট।"

নিঃস্ব ব্যক্তিকে অর্থাদি দেওয়া অপেক্ষা ক্ষুধিতকে অন্নভোজন করাইলে বেশী ফল হয়, তদ্দ্বারা গ্রহীতা যেমন অন্নাহারে আশু, বিগতক্লেশ হইয়া তৃপ্তিলাভ করে, দাতাও

তেমনি তৎক্ষণাৎ সুতৃপ্ত হইয়া বিমল আত্ম-প্রসাদ ভোগে সমর্থ হয়েন। মানুষের পক্ষে ক্ষুধার ক্লেশ সহ্য করা বড়ই কঠিন। সকল প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও মানুষ জীবিত থাকে এবং জীবন ধারণ বাঞ্ছনীয় মনে করে, অন্নাভাবে সেই প্রিয় জীবনের নাশ সম্ভাবনা, একারণ নিরন্নকে অন্নদান বিশেষ কর্ত্তব্য। ভূমিদান তদপেক্ষা মহৎ, কেন না তদ্দ্বারা গ্রাহকের চিরকালের অন্ন-সংস্থান হইয়া থাকে। পরন্তু বিদ্যাদান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে হেতু ভূমিও কোন কারণে কখন হস্তচ্যুত হইতে পারে, কিন্তু বিদ্যার কিছুতেই অধিকার-চ্যুতি বা ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই; এবং বিদ্যাদ্বারা অন্নের ব্যবস্থা নিশ্চয়। আবার পরাবিদ্যা বা ব্রহ্ম-জ্ঞান দানাপেক্ষা দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের পক্ষে ঐহিক পারত্রিক অমূল্য ফলপ্রদ সংসারে আর কিছুই হইতে পারে না।

"সংবিভক্তা চ দাতা চ ভোগবান্ সুখবান্নরঃ।
ভবত্যহিংসকশ্চৈব পরমারোগ্যমশ্নুতে॥

যিনি ভক্ষ্য পেয় দ্রব্য বিভাগ করিয়া অন্যের সহিত পান ভোজন করেন, এবং দানশীল ভোগবান্ ও অহিংসক হয়েন, তিনি পরম আরোগ্য সম্ভোগ করিয়া থাকেন।"

আমাদের যাহা কিছু অধিকারস্থ বলিয়া আমরা আপনার নিজস্ব মনে করি, তাহা সমস্তই ঈশ্বরের সম্পত্তি, আমরা কেবলমাত্র কিছু দিনের জন্য তৎসমুদয় ব্যবহার ও ভোগ করিতে আসিয়াছি। এই সকল ভোগ্য বস্তু আমরা বিধাতার নিকট হইতে পাই-য়াছি। কৃপণতা ও বিলাসিতা উভয়বিধ দোষ পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধনোদ্দেশে শরীর মনের পুষ্টি সম্পাদনার্থ উহা ভোগ করিয়া যাওয়াই আমাদের একমাত্র অধি-কার। অতএব পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, দাস দাসী, অবশ্যপোষ্য, আশ্রিত, অভাব-যুক্ত প্রতিবেশী, দুঃখভারাক্রান্ত দরিদ্রগণ প্রভৃতি সকলের সহিত যথাযোগ্য রূপে বিভাগ করিয়া ভোগ করাই কর্ত্তব্য। সমু-দায়ই যে কেবল নিজের জন্য, ইহা কদাচ মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়, আত্মম্ভরিতা সর্ব্বথা মহাপাপ।

উদ্বৃত্ত ধনাদি যে সঞ্চয়ীর নিজস্ব নয়, ধনীরা যে কেবল ট্রষ্টীমাত্র, ভগবানের সম্পত্তি যে ট্রষ্টরূপে তাঁহাদের নিকট শুধু গচ্ছিত, তাহা শ্রীমদ্ভাগবৎকার স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন:—

"যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎসত্বং হি দেহীনাং।
অধিকং যোহভিমন্তেত সস্তেনো দণ্ডমর্হতি॥

—যতটুকু দ্বারা জীবের ভরণপোষণ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, এতটুকুতেই তাহার সত্ব, তদধিক যাহা তাহার অধিকারস্থ, তাহা যদি কেহ নিজের সম্পত্তি মনে করে, সে চোর, চোরের ন্যায় দণ্ডার্হ।"*

---

* কোন পাশ্চাত্য মহাত্মা লিখিয়াছেন:—"Men are inclined to regard all that they have as if it was their own possession, where as, as a matter of fact, everything we possess has come to us by the co-operative efforts of all humanity.", অর্থাৎ আমাদের হস্তগত সম্পত্তিকে আমরা নিজস্ব মনে করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা কিছু আমাদের অধিকারস্থ, সমস্তই সমগ্র মানবমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টা দ্বারা আমাদের নিকট আসিয়াছে।

অন্য একজন বলিয়াছেন:—"Rich people should look upon themselves as stewards and not as owners."—ধনবানগণের উচিত আপ-নাদিগকে ধনের অধিকারী না মনে করিয়া ভাণ্ডারী মনে করা।

মোহাপাশবর্দ্ধ সাধারণ সাংসারিক জীবগণের পক্ষে দান যে একটী মহাযজ্ঞ অর্থাৎ দুষ্কর ত্যাগস্বীকার † তাহা পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ বুঝিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন :—

"দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন।
অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা স চ দুঃখেন লভ্যতে॥

হে তাত! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম্ম আর কিছুই নাই, যেহেতু অর্থেতে লোকের মহতী তৃষ্ণা, এবং সেই অর্থ কষ্টে লাভ হয়"।

দান দ্বারা পুণ্যোপার্জ্জন বড় সহজ ব্যাপার নয়। সংসারে এরূপ ভাগ্যবান কয়জন জন্মিয়াছেন, যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে দানধর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দুর্লভ মানব জন্মের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? অক্ষয় সম্পদ, অভয় বৈরাগ্যধনে ধন্য, অর্থসংগ্রহ যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য নয়, অর্থের দ্বারা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনই যাঁহারা বিশেষ কর্ত্তব্য মনে করিয়া থাকে, এবম্বিধ মহাত্মা পৃথিবীতে বিরল। কি ধনী কি নির্ধন, প্রায় সকলকেই ধনতৃষ্ণায় ব্যাকুল দেখিতে পাওয়া যায়, ধনের লালসা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে, ধনসংগ্রহ ও ধনরক্ষা যেন আমাদের জীবনের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য, আবার ধন বহু ক্লেশে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে; সুতরাং যেস্থলে কোনরূপ বাধ্যতা বা স্বার্থ নাই, সেস্থলে মোহমুগ্ধ আত্মবিস্মৃত জীবের পক্ষে অর্থত্যাগ করা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

যাচকগণ উত্যক্ত করিতেছে বলিয়া কেহ কেহ বিরক্তচিত্তে যাচকের উত্যক্তি হইতে মুক্তিলাভোদ্দেশে যৎকিঞ্চিৎ দান করিয়া ছুটি পাইয়া থাকেন, তাহাতে কোনপ্রকার পুণ্যসঞ্চয় হওয়া দূরে থাকুক, দাতার আধ্যাত্মিক অবনতিই নিশ্চয়, কারণ অপ্রেমের উদয়ে প্রত্যবায় অনিবার্য্য। প্রশান্তচিত্তে কর্ত্তব্যবোধে প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবানের আদেশ বা ইঙ্গিত সহাস্যবদনে যে কেহ কোন প্রকার ত্যাগস্বীকার করেন, তাঁহার নিশ্চয় পরমার্থ লাভ হইবে; কিন্তু দানকালে দাতার যদি কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে সুফল ফলে না। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বিরক্তির সহিত বা কষ্ট বোধ করিয়া যিনি কিছু নিজস্ব ত্যাগ করেন, তিনি কি দান জন্য কোনই ফল পাইবেন না? তদুত্তরে বলিতে হয় যে, কর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তাঁহারও কিছু লাভ হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে লাভ স্থূল বৈ সূক্ষ্ম হইতে পারে না; তিনি যেমন কোন একটা সাংসারিক কায়দাকানুনের বশে বাধ্য হইয়া হৃদয়ের অনিচ্ছাসত্বেও কষ্ট বোধ করতঃ জড়বস্তু ত্যাগ করিলেন; কেন না দান বলিয়া কোন শব্দ প্রকৃতির অভিধানে নাই, সমস্ত দানই ঋণ; গ্রহীতা এজন্মে প্রত্যর্পণ না করিতে পারেন বা ফেরত দিলে দাতা লজ্জার খাতিরে তাহা গ্রহণ করা ভদ্রতার বিরুদ্ধ মনে করিতে পারেন, পরন্তু জন্মান্তরে তাহা চক্রবৃদ্ধি অনুসারে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেই; এক পাই পয়সার হিসাবও প্রকৃতির খাতায় ভুলচুক হইবার নহে। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, দান যে প্রকারেরই হউক, উহা একটী সুন্দর ব্যবসায় *—ইহজন্মে খ্যাতিরূপ ফাউ এবং পরজন্মে বিশিষ্ট লাভ।

ইংরাজীতে যাহাকে মাইজার † (ব্যয়কুণ্ঠ, অদাতা) বলে, আমরাও সাধারণভাবে তাহাকেই কৃপণ আখ্যা দিয়া থাকি, কিন্তু কৃপণ শব্দের প্রকৃত অর্থ কৃপাপাত্র। ‡ বাস্ত-

† Sacrifice.

* Investment. † Miser. ‡ Object of pity.

থিক জ্ঞানীর চক্ষে বায়কুণ্ঠ ব্যক্তিগণ নিত্যন্তই কৃপার পাত্র, সন্দেহ নাই; যে হেতু তাহারা ইহজন্মে দীনদুঃখীর মত জীবন কাটাইয়া সকলের ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকে, পরে পরলোকে ও পরজন্মে অর্থের সদ্ব্যবহার না করা হেতু দণ্ডভোগ করে। ইহা অপেক্ষা মন্দভাগ্য আর কি হইতে পারে? কৃপণ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকারদের প্রচারিত ব্যবস্থার অনুরূপ কথা আধুনিক পাশ্চাত্য সুধীগণও প্রকাশ করিতেছেন,—

"The rich man, who is barren of virtue, is, in reality, poor, and as surely as the waters of the river are drifting to the ocean, so surely is he, in the midst of all his riches, drifting towards poverty and misfortune; and though he die rich, yet must he return to reap the bitter fruit of all his immorality. And though he become rich many times, yet as many times must he be thrown back into poverty, until by long experience and suffering he conquers the poverty within."
— James Allen (From Poverty to Power.)

অর্থাৎ, নদী সমূহের জলরাশি যেরূপ নিশ্চয়তার সহিত সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান, ঠিক সেইরূপ নিশ্চিতভাবে, ধর্ম্মহীন ধনীগণ, দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের দিকে ছুটিতেছে। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও নিশ্চয় জানিবে যে, তাহাদের দুষ্কৃতির বিষময় ফল তাহারা পরজন্মে ভোগ করিবেই। এইরূপে যতবার তাহারা কোন কারণে সমৃদ্ধিশালী হইবে, ততবার তাহাদিগকে পাণ্টা হাতে আবার দারিদ্র্যপঙ্কে নিমগ্ন হইতে হইবে,—যেমন কখন গাড়ীর উপরে নৌকা,কখন নৌকার উপরে গাড়ী—যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা সুদীর্ঘকালের যন্ত্রণাভোগজনিত অভিজ্ঞতা দ্বারা আভ্যন্তরিক দারিদ্র্য—নিকৃষ্ট স্বার্থপরতা-সম্ভূত অনুদারতা ও সঙ্কুচিত ভাব—জয় করিয়া চিত্তের প্রশস্ততা লাভ করিতে না পারে। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত নিজে দারুণ দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ দ্বারা দরিদ্রের সহিত তীব্র সমবেদনা অনুভব করিতে সমর্থ না হয়। সংসারে কিছুই দেখিয়া বা শুনিয়া ঠিক শিক্ষা হয় না, ঠেকিয়া না শিখিলে সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। যে কখন তিক্ত খায় নাই, তিক্তের বর্ণনা দ্বারা তাহার মনে তিক্তস্বাদের ভাব বসাইতে পারা একেবারেই অসম্ভব; বন্ধ্যা কখনই প্রসববেদনার ক্লেশ ঠিক বুঝিতে পারে না; এই জন্যই পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে ভুক্তভোগী হওয়া প্রকৃতির নিয়ম, নতুবা পাকা অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব নয়, এবং তদ্ব্যতীত উন্নতির দ্বার রুদ্ধ। ইহা দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার হৃদয়ের সহানুভূতি জন্মিয়া তদনুরূপ কার্য্য না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত জগতের সম্পন্ন বিপন্ন কাহারও কল্যাণ নাই।

কর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দানের ফলাফল বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর। (শেষ)

পর দিবস প্রত্যুষে আমি "সেতু" দর্শন করিতে গেলাম। এই তীর্থের অপর নামদ্বয় ধনুসতীর্থ, ধনুষকোটী, ইংরেজিতে ইহাই Adam's Bridge আখ্যায় প্রসিদ্ধ। রামেশ্বর মন্দির যেমন দর্শনীয়, এই স্থানও তেমনি দর্শনযোগ্য; ইহারই নামানুসারে তীর্থের নাম "সেতুবন্ধ রামেশ্বর" হইয়াছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এই স্থানেই সমুদ্র বাঁধিয়াছিলেন, সুতরাং ইহা অতীব প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক স্থান মধ্যে গণ্য। স্থানটী যেমন প্রাচীন, তেমনি পবিত্র। রামেশ্বর নগর হইতে ইহা প্রায় দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। নৌকা, বলদ শকট কিম্বা পদব্রজে এখানে আসিতে হয়। * সমুদ্রের ধারে ধারে নৌকা চালাইয়া আসা সকল সময়ে নিরাপদ নহে; বলদ-শকটগুলি রাশি রাশি বালুকা ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে যাতায়াত করে; পদব্রজে যাওয়া ততোধিক কষ্টকর। তথাপি প্রতি দিন সমভাবে অসংখ্য হিন্দু যাত্রী এখানে যাতায়াত করিয়া থাকে। ধন্য হিন্দুর ধর্ম্ম-স্পৃহা, ধন্য হিন্দুর দেব-ভক্তি!!

আমি নৌকা করিয়াই গিয়াছিলাম। নৌকা লম্বা ও শক্ত। সঙ্গে নানা দেশের নানা প্রকৃতির যাত্রী ছিল। নৌকায় আরোহণ করিবার পূর্ব্বে পাণ্ডা কহিয়া দিয়াছিল, রামেশ্বর হইতে ধনুষতীর্থ (সেতু) পর্য্যন্ত কোথাও পানীয় জল পাওয়া যায় না। এই জন্য আমরা তিনটা বড় মৃণ্ময় কলস ক্রয় করিয়া, তাহা নির্ম্মল কূপোদকে পূর্ণ করিয়া লইলাম। আহার্য্য দ্রব্যও পাওয়া যায় না বলিয়া বিবিধ প্রকার ফল, শর্করা, চিপিটক ইত্যাদি সঙ্গে লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সমুদ্রের কিনারা দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত নৌকা চালাইয়া সুদক্ষ তামিল মাঝিরা যে স্থানে প্রথমে নৌকা থামাইল, তাহা ভারত-মহাসাগর-বক্ষোপরে ভাসমান একটা দ্বীপ। এই দ্বীপের নিকট হইয়া ধনুষতীর্থে যাইতে হয় না, কিন্তু এই দ্বীপ দেখিবার জন্য মাঝিগণকে অধিক ভাড়া দিয়া পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমরা দ্বীপে উঠিয়া দেখিলাম, সমস্ত দ্বীপটা অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষ ও অন্যান্য তরুলতার বনে পরিপূর্ণ। দ্বীপটী লম্বায় প্রায় এক ক্রোশ, প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ। ইহা মেস্কর থানার এলাকাভুক্ত। সমুদয় দ্বীপে একাদশ ঘর মাত্র লোকের বসতি। ইহাদের জন্য একটী ক্ষুদ্র দোকান আছে, তাহাতে মুড়িমুড়কী, চাউল ডাউল ইত্যাদি সামান্য পরিমাণে ক্রয় করিতে পারা যায়। দ্বীপ দেখিবার পরে, মাঝিরা আবার নৌকা ছাড়িল। অনেক দূর যাইবার পরে আবার একটা দ্বীপে পৌঁছিলাম, ইহার দৈর্ঘ্য একমাইল, প্রশস্ততা অর্দ্ধ মাইল প্রমাণ। এই দ্বীপে একটী ক্ষুদ্র মন্দির এবং একটী খয়রাৎখানা আছে। এই দাতব্য-ছত্র হইতে অভাব-

---

* এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে ইংরাজি সমাচার পত্রে পাঠ করিলাম, রামেশ্বর তীর্থক্ষেত্র হইতে ধনুষকোটী পর্য্যন্ত রেলওয়ে তৈয়ার করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট-বাহাদুর সা, ই, রেলওয়ে কোম্পানীকে হুকুম-নামা প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রস্তু পথিকদিগকে চাউল, ডাউল, লবণ, কাঠ ও একটা মাত্র পয়সা ভিক্ষা দেওয়া হয়। যে মহাধনবান ও সুবিখ্যাত বণিকের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রামেশ্বরের মন্দিরের সংস্কার হইতেছে, তিনিই এই দাতব্য-ছত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যয়ভার-বহনকারী। আমরা এই দ্বীপ দর্শন করিয়া পুনরায় তরণীযোগে বহু দূরে গিয়া ধনুষতীর্থে পৌছিলাম। তরণী হইতে অবতরণ করিয়া খানিকটা পথ অতি কষ্টে, রাশি রাশি বালুকা ভেদ করিতে করিতে এবং কখন কখন জলে হাঁটিতে হাঁটিতে ঐ তীর্থে উপস্থিত হইতে হয়। এই অপূর্ব্ব স্থানের একদিকে মানার উপসাগর (Gulf of Manar) এবং আর এক দিকে পাকপুঞ্জি (Palk strait); মধ্যে ভূমিখণ্ড। ইহার আকার ধনুকের ন্যায়, সুতরাং ইহা সেতুতীর্থ এবং ধনুষতীর্থ উভয় নামেই প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই ভগবান রামচন্দ্র সেতু বাঁধিয়াছিলেন, ঐ ভূমিখণ্ড সেই সেতুর নিদর্শন। প্রস্তরাদির চিহ্ন নাই, গাঁথনি দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানের জল কম (shallow) এবং কিছু দূরে দূরে বিপুলাকার প্রস্তরখণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইংরেজেরা কহেন, এখানে গুপ্ত শৈল আছে; আমরা বলি, ঐ গুপ্তশৈলই রামচন্দ্রের সেতুর ভগ্নাবশেষ। জল ভয়ানক লবণাক্ত, অন্যান্য স্থানেও সাগরের জল অতিশয় লবণময়, কিন্তু এখানে যেন লবণের ভাগ অধিকতম বলিয়া বোধ হয়। আমরা কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত এই সুপবিত্র স্থানে বসিয়া মহাসাগরের চিত্তানন্দদায়িনী শোভা-সন্দর্শন করিতে লাগিলাম; পাণ্ডাদের পরামর্শ বা উপদেশ অনুসারে যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পূজায় নিযুক্ত হইয়া গেল। ইত্যবসরে গুজরাট দেশীয় যাত্রীদের সঙ্গিনী, নবদ্বীপ জেলাবাসিনী একবৃদ্ধা বাঙ্গালী বৈষ্ণবী কৃত্তিবাসের রামায়ণ খুলিয়া অতি মধুর স্বরে গান করিতে করিতে পড়িতে লাগিল—

উভয়েতে চুল বাঁধে বস্ত্র পরে টেনে।
দক্ষিণেতে বসিলেন সাগর বন্ধনে॥"
কোটী কোটী সেনাপতি বৈসে নলপাশে।
ছুঁইতে পাথর নল সলিলেতে ভাসে।
পাথর পাথরোপরি করিয়া বিন্যাস।
তাহার উপর পাড়ে পার্ব্বতীয় কাঁশ।
রাখিল পাথর গাছ সাগরের কূলে।
বড় বড় বাঁশ সে উপাড়ে ডালে মূলে।
সেহাড়া কেহাড়া হরিতকী ও আমলা।
পার্ব্বতীয় গাছ আনে সারঙ্গ কমলা।
বকুল দীর্ঘল গাছ পিয়াল তমাল।
খর্জ্জুর শ্রীফল আনে রসাল কাঁঠাল।
যত যত সেই বনে পাইল দীর্ঘল।
আনে তাল তেঁতুল গুবাক নারিকেল।
পৃথিবীর গাছ আনে নাম লব কত।
গাছেতে ডাকিল সাগরের জল যত।
সুগ্রীব অঙ্গদ ছিল পর্ব্বত উপরে।
সর্ব্বস্ব ভাঙ্গিয়া ফেলে সাগরের নীরে।
বড় গাছ আনে আর বড় বড় গোড়া।
কোটী কোটী পর্ব্বত হইল নেড়া মুড়া।
আনিয়া পাথর গাছ করিল সঞ্চয়।
স্বর্ণের পর্ব্বত আনে শুদ্ধ স্বর্ণময়।
বাছিয়া পাথর গাছ, আনে যুথে যুথে।
সবে আনি দেয় নল বানরের হাতে।
আড়ে দশ যোজন বান্ধিল রত্নাকর।
দীর্ঘে শত যোজন বাঁধিল দৃঢ়তর॥

সেই বৃদ্ধা ভক্তা বাঙ্গালী রমণীর সুমধুর কণ্ঠস্বরে যাত্রীদল, পাণ্ডা ও মাঝিগণ অবাক্ হইয়া বসিয়া গেল। যাহা হউক, আমরা ধনুষ-

তীর্থ হইতে নৌকা যোগে অনেক রাত্রে পুনরায় রামেশ্বর তীর্থে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পর দিবস আমি রামেশ্বর তীর্থের পুরা-বৃত্ত-তত্ব সংগ্রহে নিযুক্ত হইলাম। এবারে কঠিন ব্যাপারে হাত পড়িল। সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থের সুবৃহৎ মন্দির দর্শন করিয়া পাঠকের মনোমধ্যে সহসা এক প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, তাহা এই, মন্দির কত প্রাচীন? ইহা কাহার দ্বারা নির্ম্মিত এবং কোন্ সময়ে ইহা নির্ম্মিত হয়? ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মাদুরা নগরীতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মনিচী (ভগবতী) দেবীর আরাধনা করেন, তথায় আরাধনাদি সমাপন করিয়া রামনাদ রাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক সুদূর সমুদ্র তটে উপস্থিত হয়েন। সেতুবন্ধন সঙ্কল্পে মহাসাগর-কূলের যে স্থলে উপবেশন পূর্ব্বক রঘুপতি শ্রীরাম দেবাদিদেব কৈলাস-পতি মহাদেবের পূজা করিয়াছিলেন, এই সেই প্রাচীন ও পবিত্র স্থান। ভগবতী-পতি শিবকে শ্রীরামচন্দ্র "ঈশ্বর" বোধে পূজা করেন বলিয়া, এই তীর্থের "রামেশ্বর" নাম হইয়াছে। তখন এ স্থান পর্ব্বত প্রমাণ বালুকা রাশি, উপল খণ্ড, প্রস্তর ও অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। সেতুবন্ধন হইবার পরে মহাসাগর পার হইয়া রামচন্দ্র এবং তাঁহার সেনাগণ ও সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকবৃন্দ অপর পারে গমন করিবার বহু বৎসর পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত এই স্থান রামের শিবারাধনা বা তপস্যার স্থান বলিয়া সুপরিচিত ছিল। এইরূপে অনেক কাল গত হইলে পর, রামনাদের শ্রীরাজ ভৈহয়ন্থল্ নামক নরপতির গুরু যোগীবর নিরলু কঙ্কন নামক ব্যক্তির উপদেশ, পরামর্শ ও অনুরোধ মতে ঐ স্থানে রাজা ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে অরণ্যের কিয়দংশ কর্ত্তিত হয় এবং পথ প্রস্তুত হইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট ও বড় বড় পাথর হটাইয়া, গাছ কাটিয়া, এই স্থানকে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত করা হয়। তদনন্তর রমানাথপুর রামনাদ রাজ্যের অধিপতি কীর্ত্তিকর নামক বুদ্ধিমান ও ভক্ত পুরুষ অত্যন্ত প্রবল ও দিগ্বিজয়ী বীর এবং ধনবান হইয়া উঠিলে, রামনাদের মহোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ রামেশ্বরের মন্দিরের উন্নতি হইতে আরম্ভ হয় এবং ঐ রাজার সময় হইতে পর-বর্ত্তী তিন জন রাজার সময় পর্য্যন্ত এই সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়া উঠে। কালক্রমে সমুদয় রামনাদ রাজ্যের অসাধারণ উন্নতি সংঘটিত হয়। পাঠকদিগের অবশ্য জানা আছে, যিশুখ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করিবার প্রায় পঞ্চাশত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং ভারতমহাসাগর পার হইয়া লঙ্কা গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তর্ধানের প্রায় দুই শত বাষট্টি বর্ষকাল পরে বৌদ্ধ-প্রচারকেরা ধর্ম্ম-প্রচার উদ্দেশে লঙ্কায় প্রথম উপস্থিত হয়েন। তাঁহারা রামনাদের পথ দিয়াই সিংহলে গিয়াছিলেন। তখনও রামেশ্বরের মন্দির বর্ত্তমান ছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং এই মন্দির দেখিয়াছিলেন কিনা, তাহার প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু ঐ প্রচারকেরা ঐ মন্দির দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও রামেশ্বরের মন্দিরকে দুই সহস্র তিন শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের প্রাচীন বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কিন্তু রামনাদের পূর্ব্বোক্ত শ্রীরাজ ভৈদয়ন্থল্ নরপতির রাজত্বকাল ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন। তাহার পরে আর একটী প্রবল প্রমাণ এই যে, মাদুরা নগরীর ভগবতী

মন্দির তিন সহস্র বৎসরের ন্যূন কালের বলিয়া কেহ ভাবেন না; রামেশ্বরের মন্দির যে সকল রাজার সহায়তায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, মাদুরানগরীর ভগবতী মন্দির তাঁহাদেরই সাহায্য লাভ করিয়াছিল। মাদুরা তখন প্রবল পরাক্রান্ত, সুসভ্য, ধনবান, শিক্ষিত এবং স্বাধীন হিন্দুরাজার রাজধানী ছিল।

ইংরেজেরাও লিখিয়াছেন "Madura is one of the most ancient and celebrated cities in Ancient India." (Pictorial Tour Round India. 1898, Page 88. C, L. S. I. Madras. By J. Murdoch) অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে মাদুরা নগরী অত্যন্ত প্রসিদ্ধা ছিল। ইহা অতীব প্রাচীনা। "Madura is the Athens of South India." (India Past and Present, Trubner and Co. 1892) অর্থাৎ প্রাচীন কালে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে এথেন্স নগর যেমন অসংখ্য দেব দেবীর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত ছিল, দক্ষিণ ভারতে বর্ত্তমান মাদুরা নগরী ঠিক তাই। মর্ডক সাহেব লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে পাণ্ড্য বংশীয় রাজারা মাদুরায় রাজত্ব করিতেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্ব চলিয়াছিল। শেষ রাজা সুন্দর পাণ্ড্য, জৈনদিগকে বিতাড়িত করিয়া চোলদিগের রাজ্যে অধিকার করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি উত্তর দিক হইতে আগত কোন আক্রমণকারীর হস্তে পতিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হয়েন।' ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয় নগর রাজ্যের ইহা অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বিশ্বনাথ নামে একব্যক্তি 'শাসনকর্ত্তা পদে বরিত হয়েন। ইহাঁর অধীনে ৭২ জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিল, ইহাদের বংশধরগণ পালিগার, পলয়করণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরুমল নামক নরপতি মাদুরা নগরীকে ধন, বিদ্যা, সভ্যতা, প্রভুত্ব, রমণীয় মন্দির, প্রাসাদ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মাদুরা রাজ্য চান্দা সাহেবের হস্তগত হয় এবং ১৮০১ অব্দে কর্ণাটের নবাব এই রাজ্য ইংরাজ কোম্পানীকে সমর্পণ করেন। প্রাচীনা মাদুরা নগরীর সংস্কৃত বিদ্যালয় (সাহেবদের মতেও) ভূতলে অতুল ছিল। ইহা সেকালের বিশ্ববিদ্যালয়। তিরুবল্লভবর নামক শূদ্র আচার্য্য এই বিদ্যালয়ের অসাধারণ অধ্যাপক ছিলেন। দিগ্বিজয়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত এই আচার্য্যকে পরাজিত করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, ইহাতে বুঝা গেল, মাদুরা খুব প্রাচীনা; বুদ্ধদেবের সময় হইতেও পাণ্ড্যবংশ প্রাচীনতর।* এই বংশের নরপতিগণের সহায়তায় মাদুরা মন্দির ও রামেশ্বর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা হইলে রামেশ্বর মন্দিরকে প্রায় তিন সহস্র বৎসরের সমসাময়িক বলিতে পারা যায়। রমানাদ বা রমানাথপুরের প্রাচীন রাজারা মারাবার জাতীয় ছিল। আদি রাজাগণ অর্দ্ধ সভ্য বন্যরাজা বা সর্দ্দার মাত্র ছিলেন। ইংরেজেরা লিখিয়াছেন,—"The Chief of Ramnad was the head of the Maraver or thief case." (Native states of India By J.

* মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, সহদেব দক্ষিণ দিকে দিগ্বিজয়ে গমন করিয়া পাণ্ড্য প্রভৃতি জাতিগণকে দলন পূর্ব্বক কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, রাজা ভরত দিগ্বিজয় করিতে গিয়া পাণ্ড্য প্রভৃতি জাতিকে দলন করেন এবং অনেককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিনষ্ট করেন। তাহা হইলে পাণ্ড্যগণকে অতি পুরাতন জাতি কহা আবশ্যক। লেখক।

Murdoch, 1897. Madras C. L. S. Page 85.).

শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতার ৩৮ অধ্যায়ে কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ শিব মন্দিরের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে সেতুবন্ধের রামেশ্বর বিশেষ বিখ্যাত।

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকাল মোঙ্কার পরমেশ্বরম্।
কেদারং হিমবৎ পৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গোতমী তটে।
বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দারুকা বনে।
সেতুবন্ধে চ রামেশং ঘুশ্মেশঞ্চ শিবালয়ে।
দ্বাদশৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
ইত্যাদি।

অর্থাৎ সৌরাষ্ট্র দেশে সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন, উজ্জয়িনীতে মহাকাল এবং ওঙ্কার, হিমালয়ে কেদার, ডাকিনীপুরে ভীমশঙ্কর, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর, গোতমী তটে ত্র্যম্বক, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ, দারুকা বনে নাগেশ, সেতুবন্ধে রামেশ্বর এবং শিবালয়ে ঘুশ্মেশ, এই বারটী প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ। চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর এবং তাড়কেশ্বরের মহাদেবও প্রাচীন শাস্ত্রে রীতিমত উল্লিখিত আছেন। সৌরাষ্ট্র গুজরাট প্রদেশে; শ্রীশৈল কৃষ্ণানদীর তীরে (দাক্ষিণাত্যে); নর্ম্মদা তটে (মধ্য ভারতে) ওঙ্কারনাথ; রাজমহেন্দ্রী প্রদেশে ডাকিনীপুর, নাসিক (পঞ্চবটী) তীর্থে ত্র্যম্বক, নাগেশ লিঙ্গ দারুকাবনে (অর্থাৎ প্রাচীন নাগর কোয়েল নগরে, ইহা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত এবং কন্যাকুমারীকা হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

"পশ্চিম সাগরে তস্য বনং সর্ব্বসমৃদ্ধিমৎ।"
৫৬ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক, শিবপুরাণ।

"শিবালয় নামক স্থান বর্ত্তমান Ellora Caves অর্থাৎ দক্ষিণ হয়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত ইলোরা পর্ব্বত। মুহূর্ত্ত-মার্ত্তণ্ড গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে,—

শ্রীমৎ কৌশিক পাবনো হরিপদ দ্বন্দার্পিতাত্মা হরিস্তজ্জো'নন্ত ইলাসুরোচিতগুণো নারায়ণস্তৎসুতঃ।
খ্যাতং দেবগিরেঃ শিবালয় মুদক তস্মাদ্দুদক্,
টাপর গ্রামস্তদ্বসতি মুহূর্ত্ত ভুবনোমার্ত্তণ্ড মত্রা করোৎ॥

অর্থাৎ হরিপদ দ্বয়ে অর্পিতাত্মা কৌশিক পাবন শ্রীমান হরি, তাঁহার পুত্র অনন্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণে ভূষিত, তাঁহার পুত্র নারায়ণ। দেবগিরির উত্তরে বিখ্যাত শিবালয়, তাহার উত্তরে টাপর গ্রাম; নারায়ণ টাপরে বাস করিয়া মুহূর্ত্ত ভুবনোমার্ত্তণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। আরঙ্গাবাদ প্রদেশে টাপর গ্রাম এখনও বর্ত্তমান। এককালে ইহা স্বাধীন হিন্দুরাজার অধীনস্থ ছিল, এক্ষণে হায়দ্রাবাদের নিজামের অধিকার ভুক্ত। "পুরাণ প্রসিদ্ধম্ শিবালয়ম্ ধুশ্নেশ শিবালয়ম্ ইতি প্রসিদ্ধম্ জ্যোতির্লিঙ্গ স্থানম্ অস্তি।"

উপরে যে সকল শিবলিঙ্গ ও শিবমন্দিরের কথা লিখিত হইয়াছে, শোভা, সমৃদ্ধি, সৌরভ, গৌরব, বিশালতা ও প্রাচীনত্বে রামেশ্বরের মন্দিরাপেক্ষা কোনটীই শ্রেষ্ঠতর নহে, ইহা নিশ্চয়।

"শিবস্বরূপ সংহিতা" নামক প্রাচীন সংহিতায় রামেশ্বরের উল্লেখ দেখা যায়। হস্তলিখিত পুরাতন পুঁথি হইতে কতকগুলি শ্লোক উঠাইয়া দিলাম। এই পুঁথি সেতুবন্ধ রামেশ্বরের মন্দিরে দেখিয়াছি।

বাহুরূপে মহেশানি নানারূপধরোহ্যহং।
কৈলাসে জ্যোতিরূপেন কৈলাসেশ্বর সংজ্ঞকঃ।
হিমালয়ে মহেশানি পার্ব্বতী প্রাণবল্লভঃ।
কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরশ্চৈব বাণেশ্বর স্তথৈবচ।

শম্ভুনাথশ্চন্দ্রনাথশ্চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে।
আদিনাথঃ সিন্ধুতীরে কামরূপে বৃষধ্বজঃ।
নেপালেচ পশুপতিঃ কেদারে পাবকেশ্বরঃ।
হিঙ্গুলায়াং কৃপানাথো রূপনাথস্তথোদ্ধৃতঃ।
দ্বারকায়াং হরশ্চৈব পুষ্করে প্রমথেশ্বরঃ।
হরিদ্বারে মহেশানি গঙ্গাধর ইতি স্মৃতঃ।
কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেশো বৃন্দারণ্যে চ কেশবঃ
গোকুলে গোপীভিঃপূজ্যো গোপেশ্বর ইতীরিতঃ
মথুরায়াং কংসনাথো মিথিলায়াং ধনুর্দ্ধরঃ
অযোধ্যায়াং কৃত্তিবাসঃ কাশ্মীরে কপিলেশ্বরঃ
কাঞ্চী নগর মধ্যে তু মন্নাম ত্রিপুরেশ্বর।
চিত্রকুটে চন্দ্রচূড়ো যোগীন্দ্রো বিন্ধ্যপর্ব্বতে।
বাণলিঙ্গো নর্ম্মদায়াং প্রভাসে শূলভৃৎ সদা।
ভোজপুরে ভোজনাথো গয়ায়াঞ্চ গদাধরঃ।
ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বর স্তথৈবচ।
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ।
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকর নদীতটে।
ভাগীরথী নদীতীরে কপালেশ্বর ঈরীতঃ।
ভদ্রেশ্বরশ্চ কংবেশি কল্যাণেশ্বর এবহি।
নকুলেশঃ কালীঘট্টে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ।
অহং কোচবধুপুরে জল্লেশ্বর ইতিস্মৃতঃ
উৎকলে বিরজা ক্ষেত্রে জগন্নাথো হ্যহংকলৌ।
লীলাচলারণ্য মধ্যে ভুবনেশ্বর ঈরিতঃ।
রামেশ্বরঃ সেতুবন্ধে লঙ্কায়াং রাবণেশ্বরঃ।

অতঃপর আমি সুপবিত্র রামেশ্বর তীর্থ-পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবার জন্য পাণ্ডাকে সম্বাদ দিলাম, পাণ্ডা কহিলেন, "রাত্রির রেলগাড়ীতে যাইতে পারেন, অসুবিধা হইবে না"; কিন্তু ঐ রাত্রে ভয়ানক শিলাবৃষ্টি ও ঝড় হওয়ায় যাত্রা বন্ধ রহিল। পর দিবস প্রাতঃকালে নবম ঘটিকার গাড়ীতে আরোহণ করিবার জন্য ষ্টেশনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। পথে দলে দলে যাত্রীরা যাইতে লাগিল। রামেশ্বর মন্দির হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত সমুদয় পথ নর নারীর কণ্ঠ নিঃসৃত "জয় রাম জয় রাম" উচ্চরবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বাষ্পীয় শকটেও ঐ ধ্বনি অতি উচ্চ আকার ধারণ করিয়া দিকদিগন্ত আমোদিত করিতে লাগিল। যে অসাধারণ বুদ্ধি ও সামর্থ্যশালী ইংরাজ বাহাদুরের কৃপায় এই রেলপথ প্রস্তুত হইয়া অসংখ্যাসংখ্য ভক্ত হিন্দুকে সহজে ও নিরাপদে রামেশ্বর ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়া দিতেছে এবং যে পরমারাধ্য পরম পূজনীয় পরমেশ্বরের চির পবিত্র পদারবিন্দের কৃপায় এই সুদূর সাগর তটে আসিয়াও আনন্দে দিবানিশি যাপন করিয়াছি, তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া প্রণামপূর্ব্বক রেলওয়ে গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। আসল কথা এই, মানবের আত্মায় যিনি রমণ করেন, তিনিই প্রকৃত রাম। এই মহা সুখকর ও শুভকর রাম নাম জপিতে জপিতে, ভজিতে ভজিতে, স্মরণ ও উচ্চারণ করিতে করিতে যদি ভবসিন্ধু পার হইতে পারি, তাহা হইলেই মানব জীবন সার্থক হয়; নতুবা মনুষ্য জীবন অসার ও বৃথা, বৃথা এবং বৃথা।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

হিন্দুর অভিব্যক্তিবাদ।

(সমুদ্র-মন্থন, অবতার-তত্ত্ব ও কর্ম্মবাদ)

হিন্দুদিগের পৌরাণিক ও দার্শনিক সাহিত্যে যে একটী সুগঠিত অভিব্যক্তিবাদ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের সমক্ষে দাঁড়াইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। সমুদ্রমন্থন, অবতারতত্ত্ব ও কর্ম্মবাদ, এই তিনটী পর্য্যায়ে হিন্দুর অভিব্যক্তিবাদ বিভক্ত হইয়াছে। যথাক্রমে আমরা তাহার পর্য্যালোচনা করিব।

সমুদ্রমন্থন হিন্দুদিগের অতি সুন্দর একটী পৌরাণিক আখ্যান। বৈদিক কি পৌরাণিক, অনেক আখ্যানেরই অনুরূপ বা রূপান্তরিত আখ্যান ভিন্নজাতির ধর্ম্মসাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানটীর এবম্বিধ সাদৃশ্য অপর কোনও জাতির সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এইটীকে সম্পূর্ণরূপে হিন্দুরই মৌলিক-সৃষ্টি বলিয়া আমাদের স্পর্দ্ধা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ইহার সম্বন্ধে সৃষ্টিশব্দের প্রয়োগ করাতে বুঝিতে হইবে না যে, এই বিষয়টীকে আমরা কবির মনোহর কল্পনা চিত্র বলিয়াই গর্ব্ব করিবার কথা বলিতেছি। কিন্তু ইহার মধ্যে আর্য্যচিন্তার যে গভীর অভিনব রূপ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমরা স্পর্দ্ধা করিবার কথা বলিয়াছি। সেই আর্য্যচিন্তার সূত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি :—

"দেবাসুরের মধ্যে পরস্পর কলহ উপস্থিত হওয়াতে দেবগণ বিষ্ণুর শরণাগত হন—বিষ্ণু তাহাদিগকে অসুরদিগের সহিত একযোগ হইয়া অমৃতলাভার্থ সমুদ্রমন্থন করিতে উপদেশ দেন এবং আশ্বাস দেন যে, মন্থনোৎপন্ন অমৃত যাহাতে অসুরেরা না পাইয়া তাঁহারা পান, তিনি তাহাই করিবেন ও সেই অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াই তাঁহারা অসুরবিজয়ী হইবেন। দেবগণ বিষ্ণুর এই প্রস্তাবে অসুরদিগকে সম্মত করিয়া বিষ্ণুরদ্বারা অধিষ্ঠিত মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড-বিষ্ণুর অবতার কচ্ছপকে দণ্ডাধিষ্ঠান—অনন্তকে মন্থনরজ্জু করিয়া তাহা একদিকে অসুরদিগের দ্বারা ও অপরদিকে আপনাদিগের দ্বারা আকৃষ্ট করতঃ বিপুল ক্ষীরোদার্ণব মন্থন করিতে আরম্ভ করেন। সেই মন্থনের দ্বারা শঙ্খ, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, সুরভি, পারিজাত, অপ্সরা, চন্দ্র, সুরা, লক্ষ্মী, ধনুঃ, কৌস্তুভমণি, হলাহলবিষ, অমৃতসহ ধন্বন্তরি প্রভৃতি সমুদ্র হইতে উত্থিত হয়।

এইস্থলে সমুদ্রের নাম ও মন্থনোদ্ভূত বস্তুজাত আমাদের বিশেষ লক্ষ্য। আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, ক্ষীরোদ-সমুদ্র মথিত হইয়াছিল। এই ক্ষীরোদ-সমুদ্রদ্বারা আমরা কোন্ সমুদ্র বুঝিব, তাহাই প্রথমতঃ আমাদের আলোচ্য হওয়া উচিত। হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বিশ্বপ্রলয়ের পর সৃষ্টির প্রারম্ভে, ভগবান্ ক্ষীরোদ-সমুদ্রশায়ী হইয়া একমাত্র বিশ্বসত্তারূপে বিরাজিত ছিলেন। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এই ক্ষীরোদ-সমুদ্র আমাদের পৃথিবীস্থ সমুদ্র নহে, ইহা বিশ্বব্যাপী

সমুদ্র এবং ইহা আমাদের পৃথিবীস্থ সমুদ্রের ন্যায় ঘন জলময় সমুদ্র নহে, কিন্তু অতীব লঘু জলীয় দ্রবময় সমুদ্র। এই লঘুজলীয়-দ্রব্য অতীব স্বচ্ছ বাষ্প বই আর কিছুই নহে। ঋগ্বেদের অনেকস্থলেই বাষ্পব্যাপ্ত আকাশ সমুদ্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে।* বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশের প্রদেশবিশেষকে সংস্কৃতভাষায় ছায়াপথ 'স্বর্গঙ্গা' (আকাশগঙ্গা) প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে, ইংরেজীতে ইহাকে milky way বলে। গ্রীক্‌ভাষার Galaxy শব্দেরও ধাত্বর্থ ইহাই। এই milky way দুগ্ধধবল (আকাশ পথ) কথাটা আমাদের ক্ষীরোদ কথাটীর অতি পরিষ্কার রূপে মর্ম্ম-জ্ঞাপক। অতএব অসীম বাষ্পরাশি পরিপূর্ণ অনন্ত আকাশকেই যে হিন্দুরা ক্ষীরোদার্ণব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এতক্ষণে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

আমাদের প্রাগুক্ত আলোচনা দ্বারা সমুদ্র মন্থনের দৃশ্য পৃথিবী হইতে আকাশে স্থাপিত হইতেছে। সুতরাং এক্ষণে আমাদের বুঝিতে হইতেছে যে, আকাশের বাষ্প সমুদ্রই মথিত হইয়াছিল। সেই বাষ্পসমুদ্র হইতে কিরূপে পূর্ব্ববর্ণিত বস্তু সকল উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। পূর্ব্বোক্ত সকল বস্তুই অলৌকিক স্বরূপ বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত আছে। সুতরাং পার্থিব সমুদ্র অপেক্ষা স্বর্গীয় সমুদ্রের সহিতই ইহাদের সম্বন্ধ স্বাভাবিক। একটু অনুধাবন করিলেই প্রাগুক্ত মন্থন-সম্ভূত অলৌকিক বস্তু সকলে পার্থিব রূপের স্বরূপ নিহিত রহিয়াছে, পরিদৃষ্ট হইবে। ঋষিদিগের কারণানুসন্ধিৎসা এরূপ দূরপ্রসারিণী ও অন্তস্তলাবগাহিনী ছিল যে, কোন বিষয়েই শেষসীমা পর্য্যন্ত না দেখিয়া তাহার নিবৃত্তি হইত না। সুতরাং পৃথিবীতে বস্তু সকলের কেবল গৌণকারণই উপলব্ধি হইতে পারে, মুখ্য কারণ উপলব্ধি হইতে পারে না দেখিয়া মহর্ষিগণ স্বর্গের সহিত তাহাদের সংযোগ বিধান করিয়া তাহাদের মুখ্য কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন। সমুদ্র-মন্থন সমস্ত কারণের মিলন-রহস্য—মন্থন-সম্ভূত সমস্ত বস্তু ব্যক্তরূপে স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সুতরাং ইহারা তত্ত্বতঃ অনাদি হইয়া পার্থিব সমস্ত বস্তুর আদিরূপ। পৃথিবীর রূপ বিকাশের আদর্শ মহর্ষিগণ এই আদিরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমুদ্র-সম্ভূত চতুর্দ্দশটী বস্তু চতুর্দ্দশ রত্ননামে অভিহিত হইয়াছে। রত্ন শব্দের অর্থ স্বজাতি শ্রেষ্ঠ বস্তু—"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্রত্নমিহ কথ্যতে।" সুতরাং ইহার যে আদর্শ, তাহা এই রত্নশব্দ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। পৃথিবীতে কি প্রকারে এই আদর্শের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব।

সমুদ্র-মন্থনে শঙ্খের উৎপত্তি হয়, এই শঙ্খই জীবের প্রথম প্রকৃষ্ট পরিণাম। পৃথিবীর প্রথমস্তর শম্বুক ও শঙ্খজাতীয় জীবের দ্বারাই গঠিত, দেখা যায়। তৎপর পৃথিবীর স্তরে হস্তি জাতীয় অতিকায় পশুর কঙ্কাল পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নহে, বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পুরাণ-বর্ণিত ঐরাবতের লক্ষণ-বিশিষ্ট চতুর্দ্দন্ত মাষ্টোডন জাতীয় হস্তীর কঙ্কালই পৃথিবী স্তরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহারা যে জলচর ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত যে ঐরাবত ইহাদের আদি পুরুষ, সেই ঐরাবত নামের যোগার্থই 'সমুদ্র-

* ১ম মণ্ডলের ৪৭ ও ৫৫ সূক্তের সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদানুবাদের ১ম মণ্ডলের ১১০ সূক্তের ৮ম ঋকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ১০ম মণ্ডলের ৯৮ সূক্তের ১২শ ঋক দ্রষ্টব্য।

জাত'—কারণ 'ইরা * শব্দের অর্থ জল ও ইরাবৎ শব্দের অর্থ সমুদ্র। তাহা হইতে জাত অর্থে 'ঐরাবত' শব্দ সিদ্ধ হয়। জলহস্তী নামক হস্তি সদৃশ † পশুজাতির নাম ও বিশেষ রূপে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বই প্রমাণিত করে। পৃথিবীর অশ্ব সকল উচ্চৈঃশ্রবারই বংশধর, ইহারাও যে প্রথমে জলচর-সমুদ্র-জীব ছিল, তাহা ঘোটকের 'সৈন্ধব ‡ নাম হইতেই প্রমাণিত হয়। 'সিন্ধু ঘোটক' নামক জলজন্তু বিশেষের নামও অন্যতর প্রমাণ রূপে গৃহীত হইতে পারে। 'সুরভি' পৃথিবীর গোজাতির জননী। গো শব্দের এক অর্থ জল § হইতে জলের সহিত গোজাতির সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছে। পশু জাতির মধ্যে গোজাতির দুগ্ধই মাতৃস্তন্যের তুল্য গুণ বিশিষ্ট ও অন্য সর্ব্ব দ্রব্যাপেক্ষা অধিক শরীর রক্ষোপযোগী। যজ্ঞ কার্য্যেরও গাভীই প্রধান সহায়—সুতরাং তিনি হবির্ধানী। তদীয় হবির দ্বারা দেবতাদিগের প্রতিনিধি অগ্নি পূজিত ও তৃপ্ত হন বলিয়া তিনি দেবলোকেরও পোষণকারিণী। মনুষ্যের উৎকৃষ্ট পুষ্টি ও দেবতাদিগের বিশেষ তুষ্টি সম্পাদন করিয়া তিনি 'কাম-দুঘা' হইয়াছেন। পশুদিগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে উদ্ভিজ্জাদির উদ্ভব হইয়াছিল। তাহাদেরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিণাম রূপে 'পারিজাত' উদ্ভূত হইয়াছে। 'পারিজাত' শব্দের যোগার্থ (পারি (সমুদ্র +জাত)। ইহাতেই ইহার সমুদ্র হইতে উৎপত্তি প্রমাণিত হয়।

* "ইরা ভূবাক্ সুরাপ্সু স্যাৎ" ইত্যমরঃ।

† রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড সমুদ্রে সেতুবন্ধন দ্রষ্টব্য।

‡ "বাজি বাহার্ব্ব গন্ধর্ব্ব হয় সৈন্ধব সপ্তয়ঃ।

§ "র্গেবু পশুবাগ্বজ্র দিগ্নেত্র ঘৃণীভূজলে লক্ষণ দৃষ্টা স্ত্রিয়াং পুংসি গৌঃ।" ইত্যমরঃ।

বৃক্ষের ফলের দ্বারা আহার, বল্কলের দ্বারা বস্ত্র, শাখাদ্বারা বাস, কাষ্ঠের দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ ও অগ্নিপ্রজ্বালন, পুষ্পের দ্বারা অলঙ্করণ ও চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রয়োজন নিষ্পাদিত হওয়ার প্রথমজাত পারিজাত বৃক্ষ 'কল্পতরু' হইয়াছে। অপ্সরসগণ, বোধ হয়, Mermaid (জলনারী) নামক যে একপ্রকার অর্দ্ধনরাকৃতি জলজীবের কথা শুনা যায়, তাহাদেরই প্রতিরূপ। অপ্সরস্ নামই জলে ইহাদের বাসের কথা প্রকাশ করে। এই অপ্সরসগণের সহিত মনুষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। অনেকে শাপভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অনেকের আবার ঋষিদিগের, কি রাজাদিগের সহিত সহবাসে মনুষ্য-সন্তান জন্মিয়াছে, যথা মেনকা, রম্ভা, উর্ব্বশী প্রভৃতি। এই সমস্ত কারণে মনে করা যাইতে পারে যে, মনুষ্যজাতির উৎপত্তি মূলে এই অপ্সরসদিগের যোগ রহিয়াছে। Mermaid নামক যে জল-মানুষীর কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত মনুষ্য-সংসর্গের প্রাচীন ঐতিহাসিক-বৃত্তান্ত Dubois প্রভৃতি পর্য্যটনকারীদিগের গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাভারতে ভীষ্মের গঙ্গা হইতে জন্ম পূর্ব্বোক্ত সত্যেরই পৌরাণিক নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়। সমুদ্র হইতে লক্ষ্মী পদ্মাধিষ্ঠিতা হইয়া উত্থিতা হন। ইঁহার 'ইন্দিরা' 'কমলা' প্রভৃতি নাম যেমন জলের সহিত তাঁহার সম্পর্ক জ্ঞাপন করে, তদ্রূপ জলজ-পুষ্পের সহিতও সম্পর্ক জ্ঞাপন করে। সৃষ্টিতে পুষ্পই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর, পদ্ম আবার সকল পুষ্পাপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্যের আধার। লক্ষ্মী সেই পদ্মাধিষ্ঠাত্রী হওয়াতে বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের স্বরূপিণী হইয়াছেন। তিনিই সৃষ্টির আদ্যা প্রকৃতি, তাহাতেই তাঁহার নাম "লোকমাতা" হইয়াছে। পৃথিবীর নারী-

জাতির, সুতরাং মনুষ্যজাতির, তিনিই আদি জননী, সুতরাং তিনি 'মা', পৃথিবীতে স্ত্রী-প্রকৃতির তিনিই মূলাধার। যেখানে বিশেষ সম্পদের বিকাশ হইয়া থাকে, সেখানেই শোভার আবির্ভাব হয়, ইহাই লক্ষ্মীর পদাশ্রয়। সুতরাং তিনি ভাগ্য-দেবীও হইয়াছেন।

সৃষ্টি-ক্রমে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মধ্যে চন্দ্রই অগ্রে প্রকটিত হন বলিয়া, তিনিই সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন সমস্ত বিশ্বই তমোভূত ছিল, তখন নক্ষত্র সকলের ক্ষীণ আলোক সেই ঘোরান্ধকার কথঞ্চিৎ উদ্ভাসিত করিতেছিল, কালক্রমে চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া আপনার উজ্জ্বল আলোক দ্বারা অন্ধকার মধ্যে জ্যোৎস্না আনয়ন করিলেন। তাহাতেই তিনি নক্ষত্রদিগের প্রধান হইয়া 'নক্ষত্রেশ' আখ্যাপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আলোকপ্রভাবে পৃথিবীর প্রথমজাত তৃণগুল্মাদির পুষ্টি ও বর্দ্ধন হওয়াতে তিনি 'ওষধীশ' বলিয়াও পরিচিত হইলেন। মনুষ্যদিগের কালগণনাও তাহারই কলা-হ্রাস বৃদ্ধির সাহায্যে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল, তাহারই নামানুসারে কালবাচক 'মাস' শব্দ রচিত হইল—'তিথিরূপ' কাল পরিমাণও তাহারই দ্বারা নিরূপিত হইল। এমন কি, বৎসরের দ্বাদশ মাসের নামকরণ তদধিশ্রিত নক্ষত্রের দ্বারাই হইয়াছে। ঋষিদিগের যাগাদি ধর্ম্মকার্য্যেও তিনিই সময়প্রদর্শক হইয়াছেন। তাহাতেই তিনি 'দ্বিজরাজ' এই খ্যাতিও লাভ করিয়াছেন।* তৎপর সূর্য্য আবির্ভূত হইয়া তীক্ষ্ণ রশ্মিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে নিষ্প্রভ করিয়া দিবালোক সৃষ্টি করিলেন, এবং তৎসময় হইতে রাত্রি দিন বিভাগ হইল।

সর্ব্বশেষে ধন্বন্তরি উত্থিত হইয়াছিলেন। তিনি দেবাসুরের অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠাভীষ্ট অমৃত লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই অমৃতই সৃষ্টির সার পদার্থ। ধন্বন্তরি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং তিনিই যে এই অনির্ব্বচনীয় অপরিসীম প্রভাবসম্পন্ন ঐশ্বরিক পদার্থের আশ্রয় হইবেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তিনি স্বর্বৈদ্যরূপে দেবতাদিগকে সঞ্জীবনীসুধা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের আয়ুঃ, স্বাস্থ্য, সুখবিধান করিয়াছিলেন, মর্ত্ত্যে ও সোমরসে অমৃত-গুণ উৎপাদন জন্য তিনি যজ্ঞে আহূত হইয়াছেন এবং আয়ুর্ব্বিজ্ঞানেরও প্রবর্ত্তক তিনিই হইয়াছেন।

এক্ষণে আমরা মন্থনোৎপন্ন আরও দুইটী বস্তুর উল্লেখ করিব। তাহার একটী 'হলাহল' ও অপরটী 'সুরা' বা 'বারুণী'। প্রথমটী মহাদেব গ্রহণ করেন ও দ্বিতীয়টী অসুরগণ গ্রহণ করেন। 'হলাহলটী' তীব্র বিষ ও সুরা, মদ্য। এই দুইটীই অনিষ্টকর বস্তু। জগতে ইষ্টানিষ্ট উভয় প্রকার বস্তুই বিদ্যমান, সুতরাং ইহাদিগের উল্লেখের উদ্দেশ্য আছে, বুঝা যায়। মহাদেব সেই উগ্র বিষ পান করিয়া তাহা যে আপনারই প্রকৃতির উপাদান, তাহাই প্রমাণ করিলেন। দেব-প্রকৃতির প্রতিকূল বলিয়া সুরা দেবগণ গ্রহণ করিলেন না—তাহা অসুরগণ গ্রহণ করিলেন।

এই সমুদ্র মন্থনোপাখ্যানে আমরা পৃথিবীর উৎপত্তিরহস্য এই প্রকারে পাঠ করিতে পারি,—আদিতে পৃথিবী বাষ্পভূতা ছিল, এই বাষ্পরাশি প্রাকৃতিক বেগে আবর্ত্তিত হইলে,

* Particularly as we know that it was the moon who first helped men to reckon time, without which no well-regulated social life was possible." "Physical Religion by Prof. Maxmuller, P. 99.

একভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়া চন্দ্ররূপে পরিণত হয়, অপর ভাগ ক্রমে ঘনীভূত হইলে পৃথিবী জলময়ী হইল। শঙ্খ, শম্বুক প্রভৃতি জলপ্রাণী-দ্বারা ক্রমে ভূস্তর গঠিত হইতে লাগিল। কচ্ছপের উৎপত্তিদ্বারা তৎকঙ্কাল-গঠিত স্থলভাগ বিশেষরূপে উন্নত হইয়া জলোত্থিত হইল। এই কচ্ছপাস্থি-বিরচিত ভূস্তর উর্দ্ধোত্থিত হইয়া পর্ব্বতাকারে পরিণত হইলে পূর্ব্বোক্ত জলরাশি ইহারই চতুর্দ্দিকে সবেগে ঘূর্ণিত হইয়া যেন মথিত হইতে লাগিল। এই সময়ে বৃহৎ নাগ-জাতি উৎপন্ন হইয়া পর্ব্বতগাত্রে আশ্রয় লাভ করিল—তাহাকেই নাগ-মন্থন-রজ্জু বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকিবে। যে বিষ নির্গত হইয়া প্রাণ নাশ করিতে পারে—সেই কালকূট পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য প্রভাবে বিষধর সর্প প্রভৃতিতে সাম্য করা হইয়াছে, ইহাই মহাদেবের বিষ ভক্ষণ। ক্রমে সেই জল হইতে ঐরাবত (Mammoth) জাতীয় অতিকায় পশু সকল উদ্ভূত হইতে লাগিল; অশ্ব জাতীয় উভচর পশু সকলও ইহাদের অনুবর্ত্তী হইল। এই কালে জলগুল্ম ও জলজ-পুষ্পাদি উদ্গত হইল এবং পর্ব্বতে তৃণ গুল্মাদি সঞ্জাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে গো জাতীয় পশু আসিয়া দেখা দিল। এদিকে অপ্সরস্ জাতিও আবির্ভূত হইল। ইহারাই মনুষ্যের পূর্ব্বতন জাতি। তৎপরই নারী-জাতি ভূতলে আগমন করিল। সৃষ্টির রমণীয় পুষ্পালঙ্কৃতা হইয়া ইহারা লক্ষ্মীরই সাক্ষাৎ প্রতিমারূপে শোভা পাইতে লাগিলেন—তাঁহাতেই ইহাদের নাম 'রমণী', 'রামা,' 'অঙ্গনা,' 'কান্তা' হইল। ইহাদের নারী নামই ইহাদের উৎপত্তির সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করে। 'নার' শব্দ জলবাচক সুতরাং 'নারী' শব্দের 'জলজাতা' এই অর্থই স্বাভাবিক হয়,—ইহার সহিত পাশ্চাত্য "Nereid নামটীর রূপ ও অর্থের তুলনা করিলেও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়।* পৃথিবীতে নারীর বিকাশ প্রথম হয়—ইহাই বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া বোধ হয়। পুরাণে যে লক্ষ্মীর উৎপত্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাতেও ইহার সমর্থন হয়। পুরুষ রূপে ধন্বন্তরির উৎপত্তির পূর্ব্বেই ইঁহার উৎপত্তি হয়। তাঁহাকে 'লোকমাতা' 'মা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। নারীও তেমনই নরলোকমাতা, মনুষ্য জাতির মা। ধর্ম্মবিজ্ঞানেও মাতৃভাবটী ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রাথমিক ভাব বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের প্রমাণেও পুং জননেন্দ্রিয়ের বিকাশ স্ত্রী জননেন্দ্রিয় বিকাশের পরবর্ত্তী বলিয়া মীমাংসিত হইয়াছে। আদিতে স্ত্রী-পুরুষ-লক্ষণ একত্র সম্মিলিত থাকিয়া জননকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। এই মিশ্র রূপকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা Hermaphrodite নাম দিয়াছেন। নিম্ন জাতীয় ইতর জীবেও উদ্ভিজ্জের মধ্যে এই মিশ্র রূপ এখনও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই মিশ্র রূপে আবার স্ত্রী চিহ্নেরই অধিক প্রকাশ হইয়াছে—তাহা হইতে ক্রমে পুং চিহ্নের গঠন হইয়াছে। বিকাশ-ক্রমের উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় লিঙ্গের বৈলক্ষণ্য

---

* "Nineteenth Century and after" নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী মাসিক পত্রের গত এপ্রিল খণ্ডে "Are there men in other Worlds?" নামক প্রবন্ধে Dr. Louis Robinson মনুষ্য বিকাশের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধে যে অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"As the great fonnder of the evolutionary theory pointed out man still retains in his physical framework, and in the functions of his body, traces not only of gills for obtaining air from water, but also of the regular periodic recurrence of lunar influence, April, 1908.

সংসাধিত হইয়াছে। পুরাণের সৃষ্টি প্রক্রিয়ারও আমরা আদিতে 'অর্দ্ধ নারীনর' রূপের উল্লেখ পাই, তাহাই বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র স্ত্রী পুরুষ আকারে পরিণত হয়। যথা—

"সনন্দাদয়ো যেত পূর্ব্বং সৃষ্টাশ্চ বেধসা।
নতে লোকেষসজ্যন্ত নিরপেক্ষাঃ প্রজাসুতে॥
সমুৎপন্নস্তদাক্রোে মধ্যাহ্লার্ক সমপ্রভঃ।
অর্দ্ধনারীনরবপুঃ প্রচণ্ডোঽতি শরীরবান্॥
বিভজাত্মানমিত্যুক্তা তং ব্রহ্মান্তর্দধে ততঃ।
তথোক্তোঽসৌ দ্বিধাস্ত্রীত্বং পুরুষং তথাকরোৎ॥'

শ্রীপদ্ম পুরাণ—সৃষ্টি খণ্ড। 'সনন্দ প্রভৃতি প্রজাপতি কর্ত্তৃক যে সকল মানস পুত্র সৃষ্ট হইয়াছিল—তাহারা সন্তান-লাভে উদাসীন হইয়া সমাজে নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত রহিলেন; তদ্দর্শনে কোপাবিষ্ট হইলে ব্রহ্মা হইতে অর্দ্ধ নারীনর রুদ্র মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। তাহাই ব্রহ্মার আদেশে বিভক্ত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ আকার ধারণ করিয়াছে।

'মণি' সমস্ত জড় পদার্থের শ্রেষ্ঠ—তাহাদেরও শ্রেষ্ঠ কৌস্তভ মণির উৎপত্তি স্থান সমুদ্র, এই বর্ণনা দ্বারা সমস্ত জড় পদার্থেরও আকর যে জল, তাহাই স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সমুদ্রের নাম "রত্নাকর"ও সেই জন্যই হইয়াছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় তদীয় "রত্ন-পরীক্ষা" নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে 'বৃহৎ সংহিতার' মতে আকাশে রত্নোৎপত্তি হয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আধুনিক্ বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আকাশ হইতে পৃথিবীতে যে উল্কাপাত ও বজ্রপাত হয়, তাহাতে 'হীরক' আবিষ্কৃত হইয়াছে। (রত্ন পরীক্ষা ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক Sir William Crookes সম্প্রতি North American Review নামক মাসিক পত্রে The Romance of the Diamond (রত্ন-রহস্য) শীর্ষক প্রবন্ধে আকাশ হইতে উল্কাপাত রূপে সর্ব্বত্র রত্ন বর্ষিত হওয়ার যে মত প্রচলিত আছে, তাহার সমালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যেমন রাসায়নিক সংযোগে পৃথিবীতে রত্নোৎপত্তি হইতে পারে, তদ্রূপ আকাশ হইতেও উল্কাপাতের সঙ্গে রত্ন বর্ষণ হইতে পারে—এরিজোনা (Arizona) ও অন্যত্র উল্কাপাতে ইহার বিশেষ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। যথা—But it is certain, from the evidence afforded by the Arizona and other meteorites, that similar conditions have existed among bodies in space, and that on more than one occasion a meteorite freighted with jewels has fallen as a star from the sky. ("Review of Reviews" April, 1908, দ্রষ্টব্য)।

রত্নাদ আবিষ্কার পুরুষদিগের প্রয়োজনেই হইয়া থাকিবে—তাহাতেই কৌস্তভমণি নারায়ণ গ্রহণ করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মন্থনে ধনুরও উৎপত্তি হয়—আকাশের ইন্দ্রধনুতে আমরা তাহারই রূপ দেখিয়া থাকি। পৃথিবীতে মনুষ্য, ধনুর আবিষ্কার করিয়াই, হিংস্র জন্তু হইতে প্রথম আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। ইহাই পাশ্চাত্যদিগের Hunting-stage মৃগয়া-যুগ।

পরিশেষে যখন পৃথিবী শীতলা হইয়া ওষধি বন-বৃক্ষাঢ্যা হইলেন, তখন আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত হইয়া স্বর্গের অমৃত, রস-রূপে, উদ্ভিজ্জের মধ্যে সঞ্চিত হইল। ঋষিগণ সোমরসে এই অমৃতেরই আস্বাদন পাইয়া বলিয়াছিলেন "অপাম সোমমমৃতা অভূমঃ।" আয়ুর্ব্বেদ এই রসকেই সঞ্জীবন (Elixir of life) রূপে পাইতে চেষ্টা করিয়াছে।

সমুদ্রমন্থনে যে সকল বস্তু উদ্ভূত হইয়াছে—সেই সকলই সৃষ্টির ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের নিদর্শন স্তম্ভরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিদ্‌ প্রাণী, জড়বস্তু প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থই সেই সমস্তের মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সমুদ্রের ৩টী নায়ক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করা বিশেষ আবশ্যক বোধ হইতেছে। যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বিশ্ব-নিয়ন্তা, তাঁহারাই এখানে নায়ক। বিষ্ণু মন্থনের মন্ত্রণা-দাতা ও পৃষ্ঠ-পোষক, ব্রহ্মা উদ্যোক্তা ও অধ্যক্ষ, মহেশ্বর অভয় ও উৎসাহদাতা। এই নায়কত্রয়ের সহিত যেমন পূর্ব্বোক্ত রূপে সমুদ্র মন্থনের সম্বন্ধ রহিয়াছে—তদ্রূপ অন্য প্রকারেও সম্বন্ধ রহিয়াছে। জলই বিষ্ণুর আশ্রয়, সুতরাং তিনি 'নারায়ণ' তিনি পদ্ম ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং পদ্ম-নাভ, তিনি শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী—শঙ্খ ও পদ্ম জলজবস্তু, তদীয় বাহন গরুড় পক্ষী, সুতরাং তিনি 'গরুড়ধ্বজ', ব্রহ্মা জলজপদ্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়া পদ্মযোনি, অব্‌যোনি। জলপক্ষী হংস-রাজ তদীয় বাহন, তাহাতেই তিনি হংস-বাহন। মহাদেবের বাহন 'বৃষভ' সুতরাং তিনি 'বৃষধ্বজ,' তিনি পশুদিগের পালনকর্ত্তা বলিয়া 'পশুপতি।' কপর্দ্দ (কড়ি) তাঁহার জটাভূষণ, তাহাতে তিনি 'কপর্দ্দী।' সমুদ্র মন্থনের সহিত এই সমস্ত বিষয়ের যোগ-সাধন করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, আর্য্যদিগের অভিব্যক্তিবাদের সুন্দর একটী চিত্র আমাদের নিকট উন্মোচিত হইয়াছে। স্বচ্ছ বাষ্প হইতে জ্যোতিষ্ক চন্দ্র নির্গত,* ঘনীভূত বাষ্প, জলাকারে পরিণত, তাহাতে জলের শম্বুক শঙ্খাদির উৎপত্তি, তৎপর উভচর কচ্ছপোৎপত্তি, ইহাদের কাঠিন্যাবরণে ভূস্তর গঠন। ভূস্তর উত্থিত হইয়া পর্ব্বতাকার ধারণ, পর্ব্বতে নাগাদির বাস ; জলে তৃণাদির উদ্ভব, জলীয় অতিকায় পশ্বাদির আবির্ভাব, জলজ পুষ্পাদির বিকাশ—হংসাদি প্লবমান পক্ষীর প্রাদুর্ভাব, অপ্সরাদি উচ্চজাতীয় জীব-জন্ম, স্থল-তৃণ-গুল্মাদি সঞ্জাত, গোজাতীয় স্থলচর পশু প্রভৃতির সন্দর্শন—পারিজাত প্রভৃতি বৃক্ষোৎপত্তি ; খেচর গরুড় প্রভৃতি বৃহৎ পক্ষীর উদ্ভব ;—নারীজাতির সম্ভব—সমুদ্র-গর্ভে রত্নাদির উৎপত্তি, পুরুষজাতির আবির্ভাব—পৃথিবীপৃষ্ঠে মেঘবর্ষণের দ্বারা ওষধি ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতির সমৃদ্ধি ও তাহাতে শরীর পোষণ উপাদানের (কলাদির) সৃষ্টি ও সঞ্জীবন রসের সঞ্চার—এই সমস্ত বিকাশের একটী সুসম্বদ্ধ শৃঙ্খল সমুদ্রমন্থন বর্ণনায় আদ্যোপান্ত ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, এই অভিব্যক্তিবাদ পাশ্চাত্য অভিব্যক্তি-বাদের পার্শ্বে স্থান পাইবার সম্পূর্ণরূপে যোগ্য। ইহাতে অভিব্যক্তির নিয়মে প্রকৃতি-রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ বিকাশের সীমানির্দ্দেশক একটী সুন্দর মান-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু এই প্রাচ্য অভিব্যক্তিবাদের ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিক প্রসারিত। পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ পৃথিবীর অভিব্যক্তিরই ব্যাখ্যা করিয়াছে,

* চন্দ্র যে পৃথিবীর সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধ ও পৃথিবীরই সহিত বিকাশ প্রাপ্ত, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"Very long ago, as Sir George Darwin has pointed out the moon was much nearer the earth than that is now and its attraction was much stronger. "Are there men in other Worlds ?" by Dr. Louis Robinson in Nineteenth Century and after, April, 1908.

কিন্তু প্রাচ্য অভিব্যক্তিবাদ সমস্ত বিশ্ব-রহস্যই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। আমরা এখানে একটু বিস্তারিতভাবে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা প্রথমেই প্রমাণ করিয়াছি, ক্ষীরোদ সমুদ্র দ্বারা মহর্ষিগণ আকাশস্থ বাষ্পরাশিই বুঝিয়াছিলেন। নভোমণ্ডলে সেই বাষ্পরাশির জগৎ-মূলীভূত বেগবশে আবর্ত্তনই সমুদ্রমন্থন। এই বাষ্পরাশির ঊর্দ্ধ ও অধঃ, উভয়দিকেই অসীম শূন্যদেশ—সেই বিরাট পুরুষেরই দেহ—সুতরাং এক ভগবান্‌ই কচ্ছপরূপে ইহার অধিষ্ঠান ও বিষ্ণুরূপে অধিষ্ঠাতা। সেই মণ্ডলাকার বাষ্পরাশি যে নির্দ্দিষ্ট অক্ষের চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ, ইহাই মন্দর পর্ব্বত—যে অনন্তকাল ব্যাপিয়া এই আবর্ত্তন চলিতেছে, তাহাই বাসুকি রূপে বর্ণিত। সুরাসুরের বিপরীতদিকের আকর্ষণ কেন্দ্রাভিমুখ ও কেন্দ্রাতিগবলেরই রূপক। স্বচ্ছ বাষ্প এতাদৃশ আবর্ত্তন দ্বারা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বৈচিত্র্যের উৎপাদন করিতেছে। সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরিণামেরই মূল—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি বেগ আবর্ত্তিত নিখিল বাষ্পরাশি। ইহাতে লৌকিক অলৌকিক সমস্ত বিকাশই সঙ্ঘটিত হইতেছে। এখানে প্রাচ্য অভিব্যক্তিবাদের অপর একটী বিশেষত্বও উল্লেখযোগ্য। যেখানে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে—সেখানে প্রাচ্য অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা মূলকারণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পাশ্চাত্যমত অধস্তনবিকাশ হইতে ঊর্দ্ধতন বিকাশ আলোচনা করিয়াছে—প্রাচ্যমত আদিরূপ হইতে বিকাশ আলোচনা করিয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে অপর একটী বিষয়ও বিশেষরূপে লক্ষ্য করা উচিত বোধ করি। প্রাচ্যবাদীরা যে সমস্ত বিকাশ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীরই জলরূপে আদি কারণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাচ্যবাদীদিগের অভিব্যক্তি পাশ্চাত্যবাদীদিগের ন্যায় একটী অপরটী অনুগত নহে, কিন্তু সাপেক্ষ, এই মাত্রই বুঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ প্রাচ্যদিগের মন্থন বর্ণনায় যেমন সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতির সাক্ষাৎ দেখা যায়—তদ্রূপ প্রত্যেক বস্তুই স্বতঃ উৎপন্ন হয়, এই বর্ণনায় ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই চিৎশক্তির আবির্ভাব বুঝিতে পারা যায়। পাশ্চাত্যবাদীরা এই চিৎশক্তিকে ধরিতে না পারিয়া জড়তত্ত্ব সহায়ে সমস্ত বিকাশ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বিষম গোলে পতিত হইয়াছেন। আর্য্যদিগের অবতারবাদের সমস্ত বিকাশের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত চিৎশক্তির সম্প্রবেশ স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদুপলক্ষে অবতারবাদের আলোচনা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। বারান্তরে আমরা অবতারবাদ ও কর্ম্মবাদের অবতারণা করিব।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নিবেদিতা।

নব-বসন্ত-মুদিত
মলয়-বীজনে,
নব-উল্লাস-ঝঙ্কৃত
বিহগ-কূজনে,
ব্রীড়াবগুণ্ঠিতা, বিনম্রা, কুণ্ঠিতা
কে সতী অতিথি, কবির নিকুঞ্জে?

পুণ্য-সৌরভ মণ্ডিত
বিনোদ মাধুরী,
মুক্ত-বন্ধন, লম্বিত,
শিথিল কবরী;
নেত্র-নীলোৎপল, পূর্ণ-পরিমল,
শোভনে, মলিনে, কে লাবণ্য-পুঞ্জে?

পূত-প্রীতি-বিলসিত-
রুচির-হাসিনী,
ক্রূর-রাহু-কবলিত-
পূর্ণেন্দু-ভাসিনী,
সন্তাপ-বিধুরা, সংযম-মধুরা,
এস মা সুরমা, মানসমোহিনী।

তব সত্ত্বা নিবেদিত
দেব বিশ্বভৃতে,
তব শক্তি নিয়োজিত
পর-সেবা-কৃতে;
সফল জনম, ধরম, করম,—
ধন্য পুণ্যশীলে, যৌবনে যোগিনী।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

সভাপতির অভিভাষণ।

আমি যখন আপনাদিগের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের পত্র পাঠ করিলাম, তখন মনে হইল যে "কাহার পত্র খুলিলাম?" তাই খাম খানি আবার পাঠ করিলাম, দেখি, সেই কলাবান্মন-শূন্য সহজ নামটী—আমারই নাম। তখন ভাবিলাম, সম্পাদক মহাশয় নাম লিখিতে ভুল করিয়াছেন। অথবা মৃত্যুঞ্জয়-লিখিতে অশক্ত বালক যেমন হলধর লিখিয়া বসে, তেমনি, বোধ হয়, বানানের ভয়ে সম্পাদক মহাশয় আমার সহজ নামটী শিরোনামায় লিখিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, তাঁহার পছন্দের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ গত বাৎসরিক অধিবেশনে স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার আপনাদিগকে যে পর্য্যাপ্ত সাহিত্যিক আহার দিয়া গিয়াছেন, তাহার পর একটু টক্ আপনারা সকলেই ইচ্ছা করিতে পারেন। তাই একটা টকীয় সভাপতি আপনাদিগের অসাময়িক হইবে না। কিন্তু এ টক্ করম্চা; ইহা অতি ক্ষুদ্র, অতি হেয়; ইহাতে কোন সার পাইবেন না।

এবার বড় দুর্দ্দিনে আপনারা সাহিত্য-ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছেন। কেবল যে মুক্ত বঙ্গের অবস্থা বিবেচনায় দুর্দ্দিন বলিতেছি, তাহা নহে। আমাদিগের পক্ষে গত বৎসর বিশেষ দুর্দ্দিন। সেই পুণ্যশ্লোক মহাত্মা,

যিনি উত্তর বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছিলেন, যিনি সমস্ত বঙ্গের আদর্শ ভূম্যধিকারিরূপে ধনাঢ্যগণকে অর্থের সদ্ব্যবহার শিখাইতেছিলেন, সেই মহিমান্বিত রাজা মহিমারঞ্জন বঙ্গদেশ অন্ধকারে ডুবাইয়া অস্তমিত হইয়াছেন। তাই বলিতেছি,এ বৎসর আমাদিগের বিশেষ দুর্দ্দিন। সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি, মহেশচন্দ্র সরকার, হরিশচন্দ্র রায়, খগেন্দ্রনারায়ণ দাস এবং মহেন্দ্রনাথ সরকার, ইঁহারাও আমাদিগকে গত বর্ষ মধ্যেই একে একে পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাই এই সভা সেই পরলোকগত মহাত্মাদিগের অভাবে আজি গভীর শোকাকুল। কিন্তু বিধাতার রাজ্যে কিছুই অমঙ্গল-জনক নহে। তাই আপনাদিগকে শোকের বেগ সংবরণ করিতে অনুরোধ করি। রাজা মহিমারঞ্জন যে সাহিত্যিক একাগ্রতা ও জীবন-ব্যাপী অনুশীলনের মহৎ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সেই স্মৃতি এতদ্দেশীয় ধনীদিগকে উৎসাহিত করিবে, সেই দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিবে, একের স্থলে শত শত জন্ম গ্রহণ করিয়া মুক্ত হস্তে সাহিত্যের উন্নতি বিধানে যত্নবান হইবেন, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করতঃ আমরা গত বৎসরের গভীর শোকাবেগ সংবরণ করিব। বিধাতা এই আশা পূর্ণ করুন।

অদ্য আমরা সাহিত্য-সভায় মিলিত হইয়াছি। জলবিন্দু মিলিত হইয়া মহা-সমুদ্র গঠিত করে; ধূলি-কণা মিলিত হইয়া অত্যুচ্চ অচল রাজি প্রস্তুত করে। আমরা কি তাহা পারিব না? যাহার যাহা আছে, তাহা লইয়াই মিলিত হইব। "আমি সাহিত্যিক নহি, আমি পণ্ডিত নহি, এ সভায় আমার স্থান নাই" এমন যেন কেহই মনে করেন না। যিনি ধনী তিনি ধন দিয়া, যিনি জ্ঞানী তিনি জ্ঞান দিয়া, যিনি সবল তিনি বল দিয়া, যিনি গ্রন্থী তিনি গ্রন্থ দিয়া, যিনি যে ভাবে পারেন, সেই ভাবেই সাহিত্যের উন্নতি সাধনের সহায়তা করুন। সাহিত্য ভিন্ন মানব জাতির জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর নাই। যেমন ব্যক্তিগত উত্তরাধিকার আছে, ব্যক্তি যেমন পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট দেহ ও মনের উপাদান সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনই সামাজিক উত্তরাধিকারও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সমাজও পূর্ব্বগামীদিগের নিকট হইতে জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। এক পুরুষে যে সকল জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া পরবংশীয়গণকে সেই জ্ঞানের অধিকারী করে। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী বশতঃ পরবংশীয় এক ব্যক্তি নহে, দুই ব্যক্তি নহে, সমস্ত সমাজই মোটের উপর লাভবান হয়। এই সামাজিক উত্তরাধিকার না থাকিলে মানব আজি যেরূপ উন্নত হইয়াছে, তাহা কখনই সম্ভব হইত না। মানব, মানব নামেরই যোগ্য হইত না। সাহিত্য ভিন্ন এই সামাজিক উত্তরাধিকারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না। তাই সাহিত্য মানব সমাজের উন্নতির প্রধান হেতু, সাহিত্যালোচনা মানবীয় উন্নতির প্রধান হেতু, সাহিত্যালোচনা মানবীয় উন্নতির প্রধান সম্বল।

কিন্তু সাহিত্য উপায় মাত্র; উন্নতিই উদ্দেশ্য। আমরা মানব, সুতরাং মানবীয় উন্নতিই উদ্দেশ্য। অন্য সকলই তাহার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান মাত্র। পরমার্থতঃ দেখিতে হইলে বন্ধ-মুক্তিই মানব জন্মের একমাত্র লক্ষ্য, আর ভগবদ্ জ্ঞানই বন্ধ-মুক্তির এক-

মাত্র পন্থা। কিন্তু ভগবান্‌কে চিনিব কেমন করিয়া? অনেকেই এ প্রশ্নকে বড়ই কঠিন মনে করেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে, তাঁহারা আমাকে চিনেন কেমন করিয়া? আমার কথা শুনিয়া, আমার কার্য্য দেখিয়া, আমার কথায় কার্য্যে তুলনা করিয়া। ভগবদ্ জ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। ইহাতে নূতন পন্থা কিছুই নাই। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাভেস্তা প্রভৃতি তাঁহার বাক্য, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার কার্য্য। তাই বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, জগতের বিবিধ বিভাগের বৈজ্ঞানিক আলোচনা, এই দুই-ই ভগবদ্ জ্ঞান লাভের পথ। বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে মন সংযত ও পবিত্র হইবে, তৎপর ধূলি কণা হইতে জ্যোতিষ্ক পর্য্যন্ত, তৃণ হইতে মানব পর্য্যন্ত, সকলই বুঝিতে হইবে, সকলই জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নচেৎ তাঁহার কার্য্যকে উপেক্ষা করিলে তাঁহার জ্ঞান লাভের পন্থা সুগম হইবে না। অবশ্য, তিনি স্বীয় লীলাবশতঃ কাহারও জ্ঞান-পথে স্বয়ং আবির্ভূত হন, সেতো সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সে সৌভাগ্য ক'জনের ঘটে? তাই মানব সমাজের পক্ষে আপ্তবাক্য ও বিজ্ঞানালোচনা ভিন্ন মানব জন্মের সফলতা নাই, ইহা নিশ্চিত।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন,

কিন্তু সাধু অধ্যয়ন, অধ্যয়ন অধ্যাপন
যেন ভব জীবনের হয় মহাব্রত,
তাহা হ'তে চিত্তশুদ্ধি, হইলে মার্জ্জিত বুদ্ধি,
তত্ত্বজ্ঞানে তাহা হ'তে হইবে উন্নত। *

ভগবদ্বাক্যের সহিত তাঁহার কর্ম্ম, অর্থাৎ জগৎকে মিলাইয়া বুঝিলে ঐ বাক্য বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, জ্ঞান পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল হয়। তাই জগদ্ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ইহা বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তদ্রূপ নহে। তথাপি নিরাশ হইবার কারণ নাই। অনন্ত জগৎ, অনন্ত জগদ্ব্যাপার। ইহার যিনি যতটুকু অধিকারী, তিনি যদি তাহাতেই মনোনিবেশ করেন, আর মূল উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করেন, তাহা হইলেই কিছু-না-কিছু ফললাভ অবশ্যই করিবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহের কারণ নাই।

কিন্তু মূল উদ্দেশ্য কি? বন্ধ-মুক্তি, সুতরাং আত্মজ্ঞান। মানব, মানবকে চিনিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। যিনি যাহাই আলোচনা করুন, মানবকে চেনাই তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ভগবানের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ সর্ব্বদা নেত্রপথে স্থাপিত রাখিয়া মানবকে বুঝিতেই যত্নবান হওয়া উচিত। নতুবা কোন আলোচনাই সফল হইবে না।

কিন্তু মানবকে বুঝিতে হইলে শুধু মানবতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ ফল লাভের আশা করা যায় না। মৃত্তিকা, জলবায়ু, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, গ্রহ নক্ষত্র, বৃক্ষ লতা, নদী, সমুদ্র—এক কথায় সমস্ত প্রকৃতিকে না বুঝিলে মানবকে বুঝা যায় না। মানব সমস্ত প্রকৃতির সহিত একসূত্রে গ্রথিত। তাহা হইতে পৃথক করিয়া মানবকে বুঝিবার উপায় নাই। দেখুন, পার্ব্বত্য দেশের, সমুদ্রতটের, মরু প্রদেশের, হিংস্র-জন্তু-বহুল, অথবা কীট-পীড়িত, অথবা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের অধিবাসীদিগের মধ্যে দেহগত, চরিত্রগত প্রভেদ কত! তাই বলিতেছি, মানবকে চিনিতে হইলে সমস্ত প্রকৃতিকে জানা চাই। যে সকল শাস্ত্র জীব ও জড় প্রকৃতির আলোচনা

* উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী ১৬৯ পৃষ্ঠা।

করে, যথা বস্তুতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জ্যোতিষ ইত্যাদি, সেই সকল শাস্ত্রের আলোচনা ও তাহার অনুশীলন না করিয়া মানবতত্ত্বের আলোচনা করা যায় না। মানবকে বুঝাও যায় না। আর সমাজবদ্ধ মানবকে বুঝিতে হইলে, তাহার জীবন-সংগ্রাম, তাহার বিভিন্ন শাখার সংঘর্ষ ও যোগ্যতমের জয় লাভ, তাহার সামাজিক দেহ ও সামাজিক মনের বিবর্ত্তন—এ সকল বুঝিতে হইল, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, এমন কি, কাব্যশাস্ত্রেরও আলোচনা না করিয়া মানবকে বুঝিবার আশা করা সঙ্গত হয় না। তাই এই সকল শাস্ত্র, এই সকল সাহিত্য আমাদিগের অনুশীলনীয়। কিন্তু সকল শাস্ত্রই মানবতত্ত্বের অর্থাৎ মানব দেহের ও মানব মনের বিবর্ত্তনের ইতিহাস স্বরূপে আলোচিত হওয়া উচিত। অধ্যাপক রে ল্যাংকেষ্টার ইতিহাসের বিষয় বুঝাইতে গিয়া এই কথাই স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন।* ইহা কদাচ বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। সাহিত্যকে কেবল সৌন্দর্য্য-উপভোগের লোয়াজিমা মনে করা অতীব অসঙ্গত; সাহিত্যকে উপকারীতার দিক হইতে মানব জাতির পরমবন্ধু মনে করা উচিত। তাই সাহিত্য আলোচনা আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য, আর এই দিক হইতে আলোচনাই প্রকৃষ্ট আলোচনা, ইহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা অত্যাবশ্যক।

কিন্তু এই উন্নত জ্ঞানের দিক হইতে সাহিত্যকে আলোচনা করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। পারমার্থিক দিক হইতে সাহিত্যকে অনুশীলন করা সকলের প্রকৃতির অনুরূপ নহে, তাই অনেকের পক্ষেই দৈনন্দিন জীবন ব্যাপারের, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরাম বিরামের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও সাহিত্যকে আলোচনা করা বিধেয়। সমাজকে ধন-ধান্যে, সুখ-স্বাস্থ্যে, বল-বিক্রমে এবং গৌরব ও মহিমায় পূর্ণ করিয়া তুলিতেও সাহিত্য আমাদিগের প্রধান সহায়। বর্ত্তমান সময়ে একথা বিস্তৃত করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বস্তুতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্বের জ্ঞান না থাকিলে কোন জাতিই জগতে সু-প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। জ্ঞানই শক্তি। বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিয়া বিবিধ বস্তুকে সমাজের প্রয়োজন সাধনোপযোগী করিয়া লওয়া যায়; শক্তিতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃতির শক্তিকে আপন আয়ত্ত করতঃ জীবন ব্যাপারের অনুকূল করা যায়। এইরূপেই বর্ত্তমান ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান বিবিধ বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া ধনে বংশে বাড়িয়া উঠিতেছে, মানব সমাজে সুগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ধরাতল ছাইয়া ফেলিতেছে। বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, বিবিধ শিল্প বাণিজ্য, বিবিধশক্তি-চালিত যন্ত্র, এ সকল নানারূপ অর্থাগমের ও সুখ বিধানের নিমিত্তও আবশ্যক। কিন্তু উহা বিজ্ঞানালোচনা ভিন্ন হয় না। তাই বিজ্ঞান যে মানবকে কেবল পারত্রিক মঙ্গলের পথই প্রদর্শন করে, তাহা নহে, ঐহিক উন্নতিরও প্রধান সহায়। যিনি যেরূপ অধিকারী, তিনি সেই ভাবেই ইহার সাধনা করিবেন। সাধনা ভিন্ন সিদ্ধির আশা নাই। যদি নির্ধনকে ধনবান করিতে চাও, যদি দুর্ব্বলকে সবল করিতে চাও, যদি রুগ্নকে সুস্থ করিতে চাও, যদি সুখে স্বচ্ছন্দে জগতে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাও, বিজ্ঞানের পদাশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে, ইহাতে গত্যন্তর নাই। পূর্ব্বেই বলি-

* Kingdom of man, pp 57-58.

রাছি, মানবের উন্নতিই আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য আর বিজ্ঞান আলোচনাই তাহার প্রধান সহায়। তাহা না করিয়া কেবল সর্ব্বদা পর-মুখাপেক্ষায় থাকিলে কিছুই ফল নাই।

কিন্তু সাহিত্য সভায় বিজ্ঞান কেন? কেহ কেহ মনে করেন, কেবল কাব্য অলঙ্কারই সাহিত্য নামের অধিকারী। আমি তাঁহা-দিগের সহিত একমত হইতে পারি না। তাঁহা-দিগের মত সঙ্গত হউক বা অসঙ্গত হউক, আমি এই মত স্বীকার করিতে অক্ষম। আমার মনে হয় যে "কেবল কাব্যই সাহিত্য, আর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই কাব্যের উদ্দেশ্য" ইহা অপেক্ষা অমঙ্গলজনক মত আর নাই। এই মত দীর্ঘকাল হইল আমাদিগকে অধঃপতনের দিকে লইয়া যাইতেছে; ইহার পরিণাম কি, তাহা বুঝিতে আর বাকী নাই। যাহা হউক, আমি সাহিত্যকে মানবের "সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের লিখিত বিবরণ," বলিতে ইচ্ছা করি। সাহিত্য মানব মনের ভাব প্রকাশ করে। মনের সর্ব্বপ্রকার ভাবই, জগতের সর্ব্বপ্রকার সত্যই ইহার অন্তর্ভূত। তাহার মধ্য হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকার ভাব কি নির্দ্দিষ্ট প্রকার সত্যকে সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিয়া অবশিষ্টগুলিকে বর্জ্জন করিবার কোন অধিকার নাই। সর্ব্ব প্রকার ভাবেরই লিখিত বিবরণকে সাহিত্য নামে অভিহিত করিয়া বৈজ্ঞানিক সাহিত্য-কেই আমাদিগের এই সভার প্রধান আলোচ্য করা হউক। ইহাই আমার বক্তব্য।

কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ এজগতে সকলই ব্যয়সাধ্য। অর্থ ভিন্ন কোন কর্ম্মই হয় না। মুদি হইতে বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত সকলেই সর্ব্বদা হাত পাতিয়াই আছে। বিশে-ষতঃ বৈজ্ঞানিকের উদর-গহ্বর অতীব বিস্তীর্ণ, আর যেমন বিস্তীর্ণ, তেমনই গভীর। এই দরিদ্র দেশে অর্থ যুটিবে কোথায়? এ যে সেই বীজ-বৃক্ষের সমস্যা আবার উপস্থিত। বীজ হইতে বৃক্ষ, আবার বৃক্ষ হইতে বীজ, তদ্রূপ। অর্থ সাহায্যে বিজ্ঞানালোচনা, আবার বিজ্ঞানালোচনায় অর্থ লাভ। এ সমস্যার উপায় কি? উপায় সেই চিরপ্রচলিত উক্তির অনুসরণ। নিরাশ্রয়ে ন জীবন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ। একথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে নবরত্ন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে ভারতচন্দ্র প্রভৃতি ইহারই দৃষ্টান্তস্থল। সাহিত্য-সেবিগণ চিরদিনই ধনবানের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়া আসিতেছেন। ধনীর ধনের উপর তাঁহা-দিগের দখলি স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে। কিন্তু ধনিগণ অনেকেই এখন সে কথা বিস্মৃত হইতেছেন। পুণ্যশ্লোক মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় রাও সাহেব এবং স্বর্গগত রাজা-মহিমারঞ্জন ও মহারাজ রাধাকিশোর দেব মাণিক্য বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত ভবকনাথ পালিত, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি দুই চারি জন ব্যতীত এতদ্দেশে সাহিত্য-সেবার নিমিত্ত অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে আর প্রায় কাহাকেও দেখা যায় না। এখন বিলাসিতাই অনেকের প্রধান আলোচ্য হইয়াছে। ধণিগণ জমিদারী, তেজারতী ব্যবসা হইতে যে অর্থ লাভ করেন, তাহার শতাংশের একাংশও যদি দেশের প্রকৃত হিতার্থে নিয়োগ করিতেন, তবে নিজেও হইতেন, দেশীয়-গণেরও প্রচুর হিতসাধন করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁহারা স্বহস্তে উঠাইয়া দূর দূরা-ন্তরে যে সকল অর্থ বর্ষে বর্ষে ছুড়িয়া ফেলি-তেছেন, তাহার এক মুষ্টিও যদি সাহিত্যকে

দিতেন, তবেই মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত। একজন ধনীর নিকট এক নবীন গ্রন্থকার গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত কিছু সাহায্য চাহিয়াছিলেন। এ ঘটনা আমি স্বয়ং জানি। গ্রন্থকারের প্রত্যাশা শত মুদ্রার অধিক ছিল না। ঐ ধনী অনায়াসেই সেই টাকা দিতে পারিতেন। তিনি দৈনিক ৫০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ বিলাসিতায় অপব্যয় করেন; অর্থাৎ বার্ষিক প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রা তাঁহার বিলাসের ব্যয়,তথাপি সামান্ত এক শত টাকা তিনি এরূপে "অপব্যয়" করিতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন "মহাশয় এবার দুর্ভিক্ষের বৎসর।" আমি গত বর্ষের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে একটী ধন-কুবেরের দ্বারস্থ হইয়াছিলাম। তাঁহার ঘোড়ার মল মূত্র ত্যাগের স্থান প্রস্তুতের ব্যয় ৬০,০০০৲ মুদ্রা। তাঁহার Cigarette holder-এর মত পদার্থ আমি চর্ম্ম চক্ষে কখন দেখি নাই। কি জানি কত টাকাই বা তাহার দাম হইবে! তিনি শত মুদ্রাও আমাকে দেন নাই, আর বলিলেন "বঙ্গীয় সাহিত্যের আমি কি ধার ধারি?" বলা বাহুল্য যে, তৎপূর্ব্বে তিনি ২৫।৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে কয়েক খানা মটর গাড়ীর "অর্ডার" দিতে বিস্মৃত হন নাই। কেহ বা বিড়ালের বিবাহে, কেহ বা সুরা সেবায়, কেহবা লোমহীন ও লোমশ ছোট বড় কুকুরের পরিচর্য্যায় * এবং তদ্রূপ অপরাপর অত্যাবশ্যক কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু যাহাদিগের দুঃখ-দারিদ্র্য-জীর্ণ কম্পিত হস্তাগ্র হইতে ধন রাশি কাড়িয়া লইতেছেন, তাহাদিগের কথা কি একবারও মনে পড়ে না? হা বিধাতঃ! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? যাহারা শক্তি থাকিতেও দেশীয় সাহিত্য সেবায় বিরত, দেশীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিতে পরাঙ্মুখ, অর্থ সাহায্য করিতে অসম্মত, তাঁহারা স্বর্গে সঙ্গে লইয়া যাইবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন কিনা, জানি না, কিন্তু অনেকেই অর্থ রাখিয়া যাইতে পারেন না, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কি বলিব? কথা সরে না। হায়! কতদিনে ইহাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান জাগ্রত হইবে?

উত্তর বঙ্গ চিরদিনই সাহিত্য আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। এইখানেই ভট্ট দিবাকরাত্মজ কুল্লুক ভট্ট, মহামহোপাধ্যায় হলায়ুধ, অনিরুদ্ধ ভট্ট, নব্য ন্যায়তত্ত্ব-বিকাশ-ভাস্কর গদাধর ভট্টাচার্য্য,উদীচ্য ভট্টাচার্য্য, রামকৃষ্ণ, রত্নমালা ব্যাকরণ-রচয়িতা পুরুষোত্তম, ভাষাবৃত্তিকার পুরুষোত্তম,জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় উদ্‌য়নাচার্য্য, ভক্ত চূড়ামণি নরোত্তম দাস, গোবিন্দ মিশ্র * প্রভৃতি সাহিত্য আলোচনায় জগৎকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও এই প্রদেশেই ৺শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত, ৺ হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী, ৺ শ্রীশচন্দ্র তর্কালঙ্কার সাহিত্যালোচনায় জীবনপাত করিয়াছেন। আর এখনও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কবিরাজ কুণ্ডীর ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, নলডাঙ্গার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী, শ্রীমান্ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য, দিঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়,মৌলবী তস্‌লিম্ উদ্দিন অমোম্মদ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অক্লান্ত

* ইঁহার কুকুর হাওয়া পরিবর্ত্তন জন্ত দার্জিলিং যায়।

* ইনি কোচবিহারপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে (১৭৮৩ খ্রীঃ) কোচবিহারে বাস করিতেন; এবং বাঙ্গালা ভাষায় গীতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রংপুর সাঃ পঃ পত্রিকা।

পরিশ্রমে সাহিত্যালোচনায় জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই উত্তর বঙ্গের লোক। আর এই উত্তর বঙ্গেই সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখা অতি অল্পদিন মধ্যেই সাহিত্যালোচনায় এবং সাহিত্যিক অধ্যবসায় ও শ্রম স্বীকারে যশস্বী হইয়াছেন। উত্তর বঙ্গ প্রাচীন দেশ। ইহার উচ্চ ভূমি, ইহার সীমা-সংলগ্ন পর্ব্বতমালা, ইহার বিবিধ শাখা-ভুক্ত মানব ও ইতর প্রাণী, ইহার উদ্ভিজ্জ,—এ সকলই এই প্রদেশকে নানা বিষয়ে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে। এই প্রদেশে মানবজাতির "মংলয়েড়" শাখা-ভুক্ত জনগণের সহিত অতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্যগণ বসবাস করিতেছেন। এই প্রদেশের পার্ব্বত্যগণ "নিগ্রয়েড্" এবং সম্ভবতঃ দ্রাভিডিয়ান শাখা ভুক্ত। কখন বা শত্রুভাবে, কখনও বা মিত্র ভাবে, এই বিভিন্ন শাখা-ভুক্ত মানবের সংশ্রব, সংঘর্ষণ ও নৈকট্য-বশতঃ উত্তর বঙ্গ উৎসাহে, অধ্যবসায়ে, দৃঢ়-তায়, ও কার্য্যকুশলতায় এক বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। সংশ্রবে ও নৈকট্যে পরস্পরের জ্ঞানের আদান প্রদানে পরস্পরকে জ্ঞান-শালী করিয়া তুলিয়াছে, সংঘর্ষণে পরস্পরকে আক্রমণে বা আত্মরক্ষায়, বিবিধ যুদ্ধ কৌশ-লের উদ্ভাবনায়, শৌর্য্যে বীর্য্যে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। কখন বা সকলকে শান্তি সাম্রাজ্যের ছায়াতলে আনিয়া তাহাদিগকে শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য প্রভৃতি কলা কৌশলে ভারতবিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছে। আমার বিবেচনায়, ইহাই উত্তর বঙ্গের উন্নতির মূল কারণ। এ কারণ আমরা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি, তাই ইহাকে স্মৃতিপথে জাগাইয়া দেওয়া অসঙ্গত নহে। এই কারণ অল্পাধিক পরিমাণে সমস্ত বঙ্গদেশেই ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু সমতল ক্ষেত্রে ও পার্ব্বত্য দেশে প্রভেদ অনেক, অপরাপর জাতির নৈকট্য ও দূরত্বে প্রভেদ অনেক,—তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। তাই উত্তর বঙ্গ বাঙ্গালার ইতিহাসে বিশেষ গৌরব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এ গৌরব ইহাকে চিরদিন মহি-মান্বিত করুক।

মানব জাতির বিবিধ শাখাস্থ জনগণের সংশ্রব ও সংসর্গের ফল বাঙ্গালী যেরূপ ভাবে উপভোগ করিয়াছে, তাহাতে প্রথম হইতেই ইহাদিগের একটা স্বাতন্ত্র্য উৎপন্ন হইয়াছিল। শেষে তাহা সম্যকরূপে রক্ষিত হইতে পারে নাই, তথাপিও এই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালীকে আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে অদ্যাপি পৃথক ভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তাই বাঙ্গালা আর্য্যা-বর্ত্তের শীর্ষস্থানীয়। এই জাতির উদ্ভাবনী শক্তির কথা স্মরণ করিলে, ইহাদিগের সাহি-ত্যিক মৌলিকতা লক্ষ্য করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। নব্য ন্যায় বাঙ্গালীর অমর কীর্ত্তি, বৈষ্ণব সাহিত্য একদিকে যেমন ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-বিষয়ক মৌলিক-তার পরিচায়ক, অপর দিকে তেমনই বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্মদাতা অথবা প্রধান প্রতি-পালক। এই জাতি এক সময়ে কলা নৈপুণ্যে এসিয়ার সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চলে স্থাপত্য ভাস্কর্য্য ও চিত্র বিদ্যার মূলতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া যে আদর্শের স্থাপনা করিয়াছিল, সুধিগণ এখনও সুদূর চীন জাপানাদি প্রাচ্য সাম্রাজ্যের শিল্প-সৌভাগ্যের মধ্যে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করিয়া থাকেন। হ্যাভেল সাহেব সম্প্রতি বরেন্দ্র শিল্প গোষ্ঠীর পরিচয় প্রদানোপলক্ষে ইহা প্রমাণ করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বাঙ্গালী যাহাতে হাত দিয়াছে, তাহা-তেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে এই জাতি যেরূপ অল্প সময় মধ্যে বহু বিস্তীর্ণ বঙ্গ সাহিত্য গঠিত করিয়াছে, ও তাহাকে অত্যল্পকাল মধ্যেই যেরূপ শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে, ইহা জগতের কোন জাতি পারিত কি না, সন্দেহ। এ সকল কথা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গের সৌর্য্য ও রাজত্বলিপ্সা এ স্থলে উল্লেখ না করিয়া নীরব হইতে পারি না। উত্তর বঙ্গেই মহাস্থান গড়, উত্তর বঙ্গেই গৌড় ও বারেন্দ্র ভূমি, উত্তর বঙ্গেই পাল-রাজধানী। উত্তর বঙ্গেই কোচবেহার। এই সকল জনপদের উত্থান পতনের ইতিহাস মানব তত্ত্বের অঙ্গীভূতরূপে আলোচিত হয় নাই; হইলে বঙ্গ সাহিত্যের এক বিস্ময়কর নবীন অধ্যায় উদ্ঘাটিত হইবে। যে সকল শিলালিপি ও স্তম্ভাদি বঙ্গ দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই উত্তর বঙ্গের। এ সকল পাঠে ও আলোচনায় বঙ্গ সাহিত্য লাভবান হইতেছে। কাব্য, অলঙ্কার, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব আলোচনায় মানবের অশেষ উপকার, সন্দেহ নাই। কিন্তু ঘরে আগুন লাগিলে যেমন দ্রব্য সামগ্রী ছাড়িয়া গৃহস্থ দেহ রক্ষার জন্যই অধিকতর প্রয়াসী হয়, তেমনই অধঃপতিত মৃতপ্রায় মানবজাতিরও কর্ত্তব্য যে অন্য আলোচনা সংযত করতঃ মানব তত্ত্বের ও শক্তিতত্ত্বের আলোচনাতেই বিশেষ ভাবে মনোযোগী হয়। উপরে যে সকল বিজ্ঞানের বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই অধুনা আমাদিগের প্রধান আলোচ্য হওয়া উচিত। আমরা মরিতে বসিয়াছি। পেটে অন্ন নাই, দেহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জন্ম সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে। এ অবস্থার পরিণাম কি? এই কি সুকুমার সাহিত্যালোচনার প্রকৃত সময়? কৃষিতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব আলোচনা ও তাহার উপদেশ সকল কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা না করিয়া যে আর ধরাতলে টিকিতেই পারি না। অনন্যমনে এক লক্ষ্য ভাবে এখন ঐ সকলেরই অনুশীলন করা বিধেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, বিদ্যাপতি কবহুঁ কি করহুঁ লিখিয়াছিলেন, এই পাঠ-দ্বৈধের মীমাংসা করিবার নিমিত্ত আমরা যতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তাহার শতাংশের একাংশও উৎসাহ প্রদর্শন করি না। এই অবস্থা অতীব সর্ব্বনাশকর। সুকুমার সাহিত্যের প্রতি অত্যাশক্তি একটু কমাইবার সময় আসিয়াছে, এ কথা বলিয়া এবং কখন কখন কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া তিরস্কৃত হইয়াছি, কিন্তু তথাপিও ইহার উল্লেখ না করিয়া নীরব থাকিতে পারিলাম না।

বৈজ্ঞানিক আলোচনা শুনিলেই ভীত হইবার আবশ্যক নাই। সকলেই সেই ক্ষণজন্মা জ্ঞানযোগী প্রফুল্লচন্দ্র অথবা জগদীশচন্দ্রের ন্যায় বিজ্ঞানের পদে আত্মোৎসর্গ করিয়া দিবার অধিকারী নহে। কিন্তু সকলেই সাধ্যমত ইহার অনুশীলন করিতে অথবা উৎসাহ দিতে সমর্থ। তাহা হইলেই যথেষ্ট হয়। নচেৎ বর্ত্তমান যুগে ধরাতলে জীবিত থাকিবারই উপায় নাই, সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া তো পরের কথা। আমরা প্রেমিক ছিলাম, অধুনা রাজনৈতিক হইয়াছি; কখন কি জ্ঞানপিপাসু হইব না?

আর একটা কথা না বলিয়া আসন গ্রহণ করা অসঙ্গত এবং অসম্ভব। আমাদিগের মাতৃরূপিনী মহিলাবর্গের এই মহতী সাহিত্যসভায় স্থান হয় নাই। আমাদিগের কোন

কিছুতেই তাঁহাদিগের স্থান নাই। সাহিত্য মানবজাতির উন্নতির প্রধান সহায়। কিন্তু মানবের অর্দ্ধাংশেরও অধিক সংখ্যককে বাদ দিয়া অপর অর্দ্ধাংশ উন্নত হইতে পারে কিনা, তাহা আপনারা বিবেচনা করিবেন। আমার নিকট ইহা শশবিষাণবৎ অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়। নারী সাহিত্যচর্চ্চায় অধিকারিণী। নারিগণকে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত রাখিলে স্বহস্তে জাতীয় উন্নতির মূলোচ্ছেদ করা হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অমর কবি হেমচন্দ্র বলিয়াছেন,—

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।"

এই মহাবাক্য আমাদিগের প্রত্যেকের হৃদয়ে অঙ্কিত হওয়া উচিত। কিন্তু অনেকেই নারীগণের সাহিত্যালোচনা আমাদিগের হইতে পৃথক পথে চালিত করিতে ইচ্ছা করেন। এস্থলে এই দুরূহ বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করা নিষ্প্রয়োজন বোধ করি। নারীগণের প্রকৃতিগত পার্থক্য, আমি স্বীকার করি; পুরুষ ও স্ত্রী জাতির বর্ত্তমান প্রভেদ তো প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু এতদুভয়ের মৌলিক প্রভেদ স্বীকার করি না। মূলতঃ, বোধ হয়, স্ত্রী মূর্ত্তিই আদি, পুং মূর্ত্তি তাহারই বিকার মাত্র, অর্থাৎ তাহা হইতেই জাত। এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা আমি অন্যত্র * প্রকাশ করিয়াছি। সে যাহা হউক, মূলতঃ স্ত্রী পুং ভেদ থাকুক আর না থাকুক, বর্ত্তমান সময়ে প্রভেদ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, এই বর্ত্তমান প্রভেদ সুদীর্ঘ কালের অধীনতাবশতঃই অনেকাংশে উৎপন্ন হইয়াছে। এ অধীনতায় পুংজাতির আপাততঃ কিছু সুবিধা না আছে, এমত নহে। আপনাদিগের মধ্যে নারী-দ্বেষী কেহ আছেন কি না, জানি না; আশা করি, নাই; যদি থাকেন, তবে তাঁহাকে আমি একটী কথা অস্ফুট স্বরে বলিতে ইচ্ছা করি যে, সেই সুবিধাটুকু একটু একটু করিয়া ছাড়িয়া দিলে, অধিক সুবিধা পাইবেন, সন্দেহ নাই। সুবিধা কেন, পারিবারিক এবং জাতীয় উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিবেন, বলিয়াই বিশ্বাস করি। কিন্তু অগ্রে তাঁহাদিগকে উন্নত সাহিত্যের অধিকারিণী না করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হওয়া যায় না; আমরা ব্রতী হইলেও অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই বলিতেছি, সেই মাতৃরূপিনিগণকে সাহিত্যালোচনার অংশভাগিনী করুন; দেখিবেন, তাঁহারা আপনাদিগের প্রকৃত সহায়তা করিতে সমর্থ হইবেন, বরং আপনাদিগের অপেক্ষাও অধিক ফললাভ করিবেন। দৃষ্টান্তের জন্য বড় অধিকদূর অন্বেষণ করিতে হইবে না। তাহা সুপণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয়ের গৃহাশ্রমকে নিয়ত অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। বিদুষী তর্করত্ন-দয়িতার সুকুমার রচনাবলী পাঠ করিলে কে প্রকৃত প্রস্তাবে কবিপদবাচ্য, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। স্ত্রীশিক্ষা প্রকৃত পথে পরিচালিত হইলে এইরূপই হইবার কথা। কারণ সাহিত্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্ত্রী-রূপিনী। নরনারী উভয়ের মঙ্গলেই মানব সমাজের মঙ্গল। আর, মানব সমাজের মঙ্গলই সাহিত্যালোচনার উদ্দেশ্য। ধরাতলস্থ জীবাবশেষ যেমন জীব-দেহের ইতিহাস বিবৃত করিতেছে, সাহিত্যও তেমনই মানব মনের ক্রম-বিকাশ দেখাইয়া দিতেছে। তাই, এই ভাবেই সর্ব্ববিধ সাহিত্যের আলোচনা হওয়া উচিত, নচেৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করা সঙ্গত হইবে না।

* নব্যভারতে "স্ত্রী পুং ভেদ" দ্রষ্টব্য।

যাহাতে বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই সাহিত্য আলোচনার অধিকারী হয়, তাহা করিতেই হইবে। যাহাতে বঙ্গভাষায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সৎ-কাব্যাদি বিবিধ শাস্ত্র রচিত হয়, এবং সর্ব্ব বয়সের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেরই পাঠোপযোগী হয়, তৎপ্রতি মনোযোগ করা সাহিত্য সভার বিশেষ কর্ত্তব্য। যিনি সক্ষম তিনি মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়নে, যিনি অধ্যবসায়শীল তিনি অনুবাদ প্রচারে বা মর্ম্মার্থ প্রকাশক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনায়, বঙ্গসাহিত্যের গৌরব ও উপকারিতা বৃদ্ধি করুন। বিবিধ ভাষা হইতে উপযুক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করা এখন অত্যাবশ্যক হইয়াছে। যাহাতে কেবল মাত্র বঙ্গসাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াই এতদ্দেশীয় নরনারী উচ্চ শিক্ষিত হইতে সক্ষম হয়, মানবীয় সর্ব্ববিধ জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করিবার অধিকারী হয়, তাহা করিতেই হইবে। নচেৎ কখনই বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন হইবে না। বঙ্গ সাহিত্যকে জগতের সাহিত্য-সমাজে গৌরবান্বিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, যাহাতে কেবল মাত্র ইহারই সাহায্যে পাঠক উন্নত জ্ঞানের অধিকারী হয়, তৎপক্ষে বিশেষ ভাবে যত্নবান হওয়া অত্যাবশ্যক হইয়াছে। আর অনর্থক কালহরণ করিবার অবসর নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এক্ষণে, উপসংহারকালে, কি বলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিব, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আপনারা যে আসনে আমাকে বসাইয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গসাহিত্যের ধন্যবাদার্হ হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি না। কিন্তু আপনারা অতি ধীরতার সহিত এতক্ষণ যে কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অন্য অনেক বিষয়ের ন্যায় সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এক নব যুগ উদিত হইতেছে; আর আপনাদের এই রংপুর নগরই যে সেই যুগ-প্রবর্ত্তক, তাহা কখনই বিস্মৃত হইবেন না। যে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী এই সৌভাগ্যবান নগর হইতে বহির্গত হইয়াছে, বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে তাহা কলনাদিনী মহা স্রোতস্বিনীরূপে বঙ্গদেশ পবিত্র করুক, আর আপনারা সমবেত শক্তিতে নবীন সাহিত্যের অবতারণা করতঃ সেই শুভ কার্য্যের সহায় হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে পূর্ণতা প্রদান করুন। *

শ্রীশশধর রায়।

* সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর শাখার চতুর্থ মাসিক অধিবেশন পঠিত।

শিশু কৃষ্ণ।

(১)

মহাশয়,

আষাঢ়ের "নব্যভারতে" প্রকাশিত "শিশু-কৃষ্ণ" শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকায় লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"এই প্রবন্ধটী প্রবাসীতে ছাপাইবার জন্য পাঠান হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় ছাপাইবার কথা জানাইয়াও ছাপান নাই। "মনোনীত" হইয়াও কেন যে ভ্রমসংশোধনার্থ ইহা ছাপান হইল না, তাহা সম্পাদক মহাশয়ই জানেন।"

আমার যতদূর মনে পড়িতেছে, এই প্রবন্ধটী ছাপা হইবে;এরূপ কথা লেখক মহাশয়কে লিখি নাই। তাঁহাকে মুদ্রিত পোষ্টকার্ডে প্রবন্ধের প্রাপ্তি সংবাদ জানাইয়াছিলাম। প্রবন্ধটী ছাপাইব, এরূপ লিখিয়া থাকিলে লেখক মহাশয় আপনার নিকট সেই পত্র পাঠাইলে * আমার ভ্রম দূর হইবে। প্রবাসীতে প্রকাশার্থ বিস্তর লেখা আসে। আমাকে একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রও সম্পাদন করিতে হয়। এইজন্য অনবসর প্রযুক্ত আমি নূতন লেখকগণের লেখা পড়িবার জন্য একজন শিক্ষিত সহকারী নিযুক্ত করিয়াছি। অনেক প্রবন্ধ তাঁহার মনোনীত হইয়াও পরে আমার মনোনীত হয় না। বক্ষ্যমান প্রবন্ধটী এইরূপে তাঁহার মনোনীত হইয়াও আমার অমনোনীত হইয়াছিল কি না,মনে পড়িতেছে না।

শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতার পক্ষসমর্থন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল লেখক মহাশয়কে ইহা জানান যাইতে পারে যে, তিনি তাঁহার Cradle Tales-এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, ঐ গল্পগুলিতে অনেকস্থলে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ অনুসৃত হয় নাই। অনেকস্থলে লেখিকা লোকমুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে,মনোনীত লেখাও অনেক সময় স্থানাভাবে পড়িয়া থাকে। ইতিমধ্যে প্রকাশে বিলম্ব দেখিয়া লেখক ফেরত চাহিলে ফেরত দেওয়া হয়। কোন্ প্রবন্ধ কি কারণে ছাপিতে বিলম্ব ঘটে, কেনই বা ফেরত যায়, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর কোন্ সম্পাদক দিতে পারিলে তিনি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্ পুরুষ। আমার ততটা শক্তিসামর্থ্য নাই। ইতি— নিবেদক,

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী-সম্পাদক।

* প্রবন্ধের কোণে "মনোনীত" কথাটি লেখা ছিল, পাঠ করিয়াছি। ন, স.।

(২)

গত আষাঢ় মাসের নব্যভারতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত শিশুকৃষ্ণ শীর্ষক একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ভগিনী নিবেদিতা-লিখিত শিশুকৃষ্ণ বিষয়ক চিত্র পরিচয় সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে তিনি দুইটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। প্রথম আপত্তি এই যে, বলরামকে শ্রীকৃষ্ণের সহোদর ভ্রাতা বলা হইল কেন? দ্বিতীয় কথা, প্রকারান্তরে "হিন্দুদিগের ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণের" পিতাকে মিথ্যাবাদী (ও প্রবঞ্চক) বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। হিন্দুসন্তান সুরেন্দ্রবাবু অবশ্যই অবগত আছেন, দুই একজন নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু ইতিহাসের গর্ভ শোষণ (গবেষণা?) দ্বারা যাহাই প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করুন না কেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই মাথায় ভুরি ভুরি ঐ মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার চাপ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার ইষ্টদেবত্বের কোনই হানি হয় নাই। সুতরাং তাঁহার পিতার একটা মিথ্যা ধরা পড়িলে যে হিন্দুধর্ম্ম হঠাৎ রসাতলে যাইবে, সে আশঙ্কার কোনই কারণ দেখা যাইতেছে না। তবে এ তর্ক উঠিতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের নামে ওগুলি অপবাদ, সত্য ঘটনা নাই। উত্তর এই, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ইষ্টদেবতা মনে করেন, তাঁহারা ওগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করতঃই ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন এবং ভক্তির সহিত কিছু অমিল হইল বলিয়া মনে করেন না। যাক্ সে কথা। এখন ঐ দুই আপত্তি বিষয়ে বিচার করা যাক্।

সুরেন্দ্র বাবু নিজেই বলিয়াছেন, "দেবী দেবকীর গর্ভ সঙ্কর্ষণ হওয়াতে নাম সঙ্কর্ষণ হইয়াছে।" সুতরাং বলরাম সম্বন্ধে দেবী দেবকীর গর্ভটা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া

চলে না। দেবকীর গর্ভ হইতে সন্তান আনিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন,—ইহাই হইল আধ্যাত্মিকা। এই খানেই পুরাণের কার্দ্দানি। কিন্তু দেবকীর গর্ভের যোগ যাইতেছে না। কাজেই বলরামের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সহোদরত্ব নাখোচ করা চলিবে না। "রূপক ছাড়িয়া দিলে" এত সহজেই যদি বলরাম নিছক্ রোহিণীনন্দন হইতে পারিতেন, তবে পুরাণকার এত হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হইতেন না। পুরাণে তো কত লোকেরই জন্ম বিবরণ আছে, কিন্তু গর্ভ হইতে গর্ভান্তরে প্রবেশ তো এই একটী। সুতরাং ইহার একটা অর্থ অবশ্যই আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে অর্থে যশোদানন্দন, বলরামও সেই অর্থে রোহিণীনন্দন, উভয়েই দেবকী গর্ভজাত এবং উভয়েই কংসভয়ে অন্য মাতৃক্রোড়ে প্রতিপালিত। সুরেন্দ্র বাবু এখানে রূপক কোথায় পাইলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা তো দেখিতেছি, একটী ঐতিহাসিক ঘটনার উপর পুরাণকার তাহার পৌরাণিক রংএর কিঞ্চিৎ কারুগিরি করিয়াছেন। পুরাণ হইতে ইতিহাস বাহির করিতে হইলে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়, সেই প্রণালী অনুসারে আমরা বুঝি এই যে, বলরাম দেবকীর "আটাসে" ছেলে, কংস-কারাগারেই জন্ম কিন্তু রোহিণী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। বলরাম পূর্ণ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া গর্ভপাতের সংবাদ অবিশ্বাস্য হয় নাই। ইতিহাসকে পুরাণে পরিণত করিবার জন্য পুরাণকার বলরামকে রোহিণীর ক্রোড়ে স্থাপন না করিয়া একেবারে গর্ভে স্থাপন করিয়াছেন। নইলে পুরাণ হইবে কেন? তবে প্রশ্ন হইতে পারে, কারাগার হইতে বাহির করা হইল কিরূপে? উত্তর, শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপে বাহির করা হইল। পুরাণ পাঠক মাত্রই অতি সহজে বুঝিতে পারেন যে, কংসের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে আর্য্য অনার্য্য লইয়া এক বিরাট ষড়যন্ত্রের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, যাহার ফলে কংসের বিনাশ। দেশশুদ্ধ লোক তামাসা দেখিবার জন্য একত্রিত হইয়াছে, তাহারা মল্ল কর্ত্তৃক মল্ল বধ, মল্ল কর্ত্তৃক হাতী বধ প্রভৃতি কত কি তামাসা দেখিল, শেষে দেখিল, তাহাদের রাজার মাথা দেহচ্যুত হইল—সেই সভার মাঝখানে। কিন্তু প্রজারা সব তামাসা দেখিয়াই ঘরে গেল। এ যে ষড়যন্ত্রের ফল, ইহা তো সহজেই অনুমেয়। এই ষড়যন্ত্র কৃষ্ণ বলরামের জন্মের সময়েই আরম্ভ হইয়াছিল। যে পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যেমন অনিবার্য্য, আরাঙ্গীবের ন্যায় তাহার নিজের পক্ষে সন্দিগ্ধমনা ও নিষ্ঠুর হওয়াও তেমনি অবশ্যম্ভাবী। রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়াই তো দেবকীর সন্তান বিনাশে কংসের এত আগ্রহ; তেমনই আবার প্রতিক্রিয়ায় সেই সন্তান রক্ষার জন্যই প্রজাগণের মধ্যে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি। এই ষড়যন্ত্রের ফলেই শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জীবন রক্ষা। তবে আমরা চিত্র পরিচয়ে কোথায় বসুদেবকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক বলা হইয়াছে, ইহার আভাস পাইলাম না। এরূপ কি অনুমান করা যায় না যে, বসুদেবের অজ্ঞাতসারেই "বলরামকে কারাগার হইতে সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল এবং কংসকে বলা হইয়াছিল যে শিশুটী জন্মিবার পরেই মারা গিয়াছে।" তবে কথা, এই সত্যের অনুরোধে না হয় ভগিনী নিবেদিতা * বলরামের

* কেবল সুরেন্দ্র বাবুর সাক্ষ্যেই আমরা ভগিনী নিবেদিতাকে চিত্র পরিচয়ের লেখিকা বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। প্রবাসীতে তাহার নাম নাই।

বেলায় ভ্রম সংশোধন করিয়া লইলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে যে নাগরাজ বাসুকীর সাহায্যে বসুদেব স্বয়ং যমুনা পারে যশোদার ক্রোড়ে রাখিয়া বিনিময়ে তাঁহার সদ্যপ্রসূতা কন্যাকে আনিয়া দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান বলিয়া কংসকে উপহার দিলেন, এ ভ্রম সুরেন্দ্র বাবু সংশোধন করিয়া দিতে পারিবেন কি? আমরা সর্ব্বদাই একটা মস্ত ভুল করি। সেটা এই যে, পাশ্চাত্য আদর্শের আলোকে পৌরাণিক চরিত্রের দোষ গুণ বিচার করিতে যাই। সেই জন্য আমাদের পক্ষে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। চরিত্র সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ ভিন্ন। প্রাচ্য আদর্শে যাহা পূর্ণ বলিয়া মনে হয়, পাশ্চাত্য আলোকে তাহা নিখুঁত বোধ হইবে না। আমরা যদি নূতন আলোকে বিচার করিয়া বাদ সাদ দিয়া পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে নিখুঁত করিতে যাই, তবে এক পুরাণের স্থানে আর এক পুরাণ স্থাপন করিব, ইতিহাস আমাদের হাত ছাড়া হইয়া যাইবে। "মিথ্যা" ও "প্রবঞ্চনা" কথা দুটী বড়ই শক্ত। যে চরিত্রে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা দেখা যায়, তাহা যে অনেক পরিমাণে মূল্যহীন হইয়া পড়ে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু কোন্ কার্য্য মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা দোষে দুষ্ট, তাহা লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ইহা মনে না রাখিলে সত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িবে। বসুদেবের যে কার্য্যে সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার নূতন আলোকের সাহায্যে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আভাস দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছেন, পৌরাণিক আদর্শে তাহা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা নহে। সুতরাং উক্ত কার্য্য আরোপ করিয়া পুরাণকার চরিত্রের খর্ব্বতা সাধন করেন নাই। পুরাণকারের আলোকে পৌরাণিক চরিত্র পাঠ না করিলে, আপন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে না। আমি পৌরাণিক আদর্শ সমর্থন করিতেছি না। তাহা করিবার আমার অধিকার নাই। কেন না, আমার কাছে যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ মিলাইয়া এক নূতন আদর্শের আবির্ভাব হইয়াছে, তখন আমি ব্যক্তিগত ভাবে এই নূতন আলোকের অনুসরণ করিতে বাধ্য। কিন্তু পৌরাণিক চরিত্র পাঠ করিতে যাইয়া যদি আমি এই নূতন আলো হস্তে উপস্থিত হই, তবে সব গুলাইয়া যাইবে। তাই আমার মনে হয়, যাঁহারা পৌরাণিক চরিত্রকে এই নূতন আদর্শের আলোকে খাঁটি বানাইতে যান, তাঁহারা ঠিক পথ অনুসরণ করেন না।

বহুদূর যাইতে হইবে না, চারিশত বৎসরের আগেকার একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাইবে, এত সহজে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার অপবাদ দেওয়া চলে না, বৈষ্ণবগণ গৌর নিতাইকে কৃষ্ণ বলরামের অবতার মনে করেন। গৌর বৃন্দাবন যাইবার জন্য উন্মত্তপ্রায়, "গৌরাঙ্গ যারে দেখে তারে পুছে বৃন্দাবন কত দূরে।" নিতাই পথের বালকগণকে শিখাইয়া দিলেন, "গঙ্গার রাস্তাকেই তোরা বৃন্দাবনের রাস্তা বল।" গঙ্গাকেই যমুনা বলিয়া পরিচয় দিয়া নিতাই চৈতন্যকে বৃন্দাবন লইয়া যাইতেছি বলিয়া নবদ্বীপে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। ভক্তগণ কেহ কখনও নিতাইকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক ভাবিয়া ভক্তির বাধা অনুভব করেন নাই। যেহেতু, আদর্শ অন্যরূপ। রূপ পলায়ন করিয়া চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হইলেন। সনাতনও পলায়ন করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া

উঠিলেন এবং পীড়ার ভাণ করিয়া বাটীতে বসিয়া রহিলেন। বঙ্গেশ্বর দেখিলেন, বিষম বিভ্রাট। সনাতনকে ছাড়িয়া রাজ্য চলিবে না। যখন হুসেন সা দেখিলেন, নিবারণ অসম্ভব, তিনি সনাতনকে কারারুদ্ধ করিলেন। রূপ বলিয়া পাঠাইলেন, কোনও স্থানে দশ হাজার টাকা রাখিয়া আসিয়াছি, সেই টাকার সাহায্যে মুক্ত হইতে চেষ্টা কর। সনাতন সেই টাকার সাহায্যে কারামুক্ত হইয়া গৌরের সঙ্গে মিলিত হইলেন। এদিকে দেখুন, সক্রেটিস অভিযুক্ত, কিন্তু একেবারে শক্ত পাথর, কোন ওজর নাই, কোন ভাণ নাই। মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা পাইয়া এক মাসের জন্য কারারুদ্ধ। কারাগার হইতে পলাইয়া জীবন রক্ষার সকল আয়োজন প্রস্তুত। অনুমতি পাইলেই শিষ্যগণ এমন ব্যবস্থা করিতে পারেন, আর শত্রুগণ তাঁহাকে ধরিতে পারিত না। কিন্তু সক্রেটিস কি বলিলেন? "এরূপ কার্য্য আমার চরিত্রের সঙ্গে সুসঙ্গত হইবে না"; এবং অব্যাকুলিত-চিত্তে বিষপান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। এ বিষয়ে যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে বিভিন্নতা আছে, তাহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে, না করিলে ফল হইবে পদে পদে ভ্রান্তি।

এখন একটী অবান্তর কথা বলিয়াই শেষ করিব। শ্রীকৃষ্ণই বসুদেবের পুত্র বলিয়া বাসুদেব, না বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পিতা বলিয়াই বসুদেব। একটী স্মৃতি আছে—

বসুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
স চ দেবঃ পরংব্রহ্ম বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, পরব্রহ্মের কোন বাবা না থাকিলেও তিনি বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্মের অবতার ধরা হয় বলিয়া তিনি স্বাধীন ভাবেই বাসুদেব খেতাব পাইতে পারেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

গীতায় অবতারবাদ। (২)

(ঘ) অবতার ক্রমবিকাশের ফল।

কাহাকে আমরা অবতার বলিতে পারি না, তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। অবতীর্ণ হওয়া কাহাকে বলে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচিত হইল।

পূর্ব্বে আমরা অবগত হইয়াছি যে, দ্বিতীয় পুরুষ অন্যান্য অবতারের বীজ ও নিধান, তিনিই আদ্য অবতার। পুরাণে তাঁহাকে বিরাট পুরুষ বলা হইয়াছে এবং উপনিষদে তাঁহাকে প্রজাপতি আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে অবতারতত্ত্বের গূঢ়রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। যথা,—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্যনান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরত্ততোঽহং নামাভবৎ তস্মাৎ অপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহমযমিত্যেবাগ্র উক্ত্বাথান্যন্নাম প্রব্রূতে যদস্য ভবতি স যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন্ ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষ ঔষতি হবৈ সতং যোঽস্মাৎ পূর্ব্বো বুভূষতি য এবং বেদ।" ১।৪।১

অর্থাৎ এই পুরুষকার বিশিষ্ট আত্মাই পূর্ব্বে ছিলেন। তিনি অনুবীক্ষণ করিয়া আপনা ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি "অহমস্মি" এই বাক্য

প্রথমে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য "অহং" নাম বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত কেহ সম্বোধন করিলে "এই আমি" এই কথা প্রথমে বলিয়া লোক পরে পিতৃমাতৃদত্ত তাহার নির্দ্দিষ্ট অন্য নাম বলিয়া থাকে। যে হেতু তিনি অন্যান্য সকলের পূর্ব্বে সকল পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি পুরুষ বলিয়া অভিহিত। যিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত মূলের অর্থ স্পষ্ট বুঝিবার জন্য নিম্নে শাঙ্করভাষ্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

"জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং সমুচ্চিতাভ্যম প্রজাপতিত্ব প্রাপ্তিব্যাখ্যাতা"—অর্থাৎ সমুচ্চিত জ্ঞান ও কর্ম্ম হইতেই যে প্রজাপতিত্ব প্রাপ্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। "আত্মৈবাগ্রেতি প্রজাপতিঃ প্রথমোহণ্ডজঃ শরীরী অভিধীয়তে"—আত্মা শব্দে প্রজাপতি অভিহিত হইয়াছেন, যিনি প্রথম, অণ্ডজ ও শরীরী। "বৈদিকজ্ঞানকর্ম্মফলভূতঃ স এব কিমিদং শরীরভেদজাতং তেন প্রজাপতি শরীরেণাবিভক্তমাত্মৈবাসীৎ অগ্রে প্রাক্‌শরীরান্তরোৎপত্তেঃ"—বৈদিক জ্ঞান ও কর্ম্মের ফলভূত সেই প্রজাপতি শরীরান্তর উৎপত্তির পূর্ব্বে অবিভক্ত শরীরবিশিষ্ট ছিলেন। "পুরুষবিধঃ পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণো বিরাট্"—তিনি পুরুষকার, মস্তক হস্তপদাদি লক্ষণবিশিষ্ট বিরাট। "পূর্ব্বজন্মশ্রৌতবিজ্ঞানসংস্কৃতঃ সোহহং প্রজাপতিঃ সর্ব্বাত্মা"—পূর্ব্বজন্মের শ্রৌত বিজ্ঞানরূপ সংস্কারবিশিষ্ট আমি সেই সর্ব্বাত্মা প্রজাপতি। "জ্ঞানকর্ম্মভাবনানুষ্ঠানবহ্নিনা কেবলং জ্ঞানবলাদোষতি ভস্মীকরোতি হবৈ সঃ তং কং যোহস্মাদ্বিভুষঃ পূর্ব্বো প্রথমঃ প্রজাপতিত্বম্ বুভুষতি ভবিতুমিচ্ছতি তমিত্যর্থং। তদ্দর্শয়তি য এবং বেদেতি সামর্থ্যাৎ জ্ঞানভাবনাপ্রকর্ষবান্। নম্বনর্থায় প্রজাপত্য প্রতিপিত সৈবংবিদা চেদহ্যতে। নৈষ দোষঃ। জ্ঞানভাবনোৎকর্ষাভাবাৎ প্রথমম্প্রজাপতিত্বপ্রতিপত্যভাবমাত্রত্বাৎ দাহস্য। উৎকৃষ্ট সাধনঃ প্রথমম্প্রজাপতিত্বম্ প্রাপ্নুবন্ ন্যূনসাধনো ন প্রাপ্নোতীতি স তং দহতীতি উচ্যতে ন পুনঃ প্রত্যক্ষম্ উৎকৃষ্ট সাধনে নেতরো দহ্যতে।"—অর্থাৎ সেই প্রজাপতি পূর্ব্বজন্মে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভাবনার অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহারা প্রজাপতি হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে আসঙ্গ ও অজ্ঞান লক্ষণ প্রজাপতিত্বের ইচ্ছুক অন্যকে দাহন করেন। কিন্তু তাহা হইলে এই সন্দেহ আইসে যে, প্রজাপতি হইবার ইচ্ছা বড়ই অনর্থকর। কিন্তু সেইরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই। এখানে দহন শব্দের অর্থ উৎকর্ষলাভ মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভাবনা দ্বারা মনুষ্য যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হয়, সেই সকল অধিকারের মধ্যে প্রজাপতিত্বই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। উপনিষদের প্রজাপতিকে পুরাণে বিরাটপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ, তিনিই Solar Logos। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। ভগবান্ এক হইলেও বিরাট পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডভেদে বিভিন্ন। এক এক কল্পে এক একজন বিরাট পুরুষ হইয়া থাকেন। জীব ব্রহ্মাণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরত্ব লাভ করিলেও অন্য জীবের উৎকর্ষসাধন জন্য অবতার গ্রহণ করেন। কোনও ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এইরূপে যাঁহারা অবতার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী এই বিরাটপুরুষ। এইজন্যই তাঁহাকে আদ্য অবতার বলা হয়।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা ইহা অবগত হইলাম যে, অবতার ক্রমবিকাশের (Evolution) ফল। জীব, সাধনার দ্বারা ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া যখন ব্রহ্মাণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া থাকেন, তখন বিশেষ কার্য্যের জন্য অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই বিশেষ কার্য্য হইতেছে অন্য জীবের উৎকর্ষ সাধন।

শ্রীমতী এনিবেসাণ্ট অবতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"Fundamentally He is the result of evolution. In far past Kalpas, in worlds other than this, nay, in universes earlier than our own, those who were to be Avatars climbed slowly, step, by step the vast ladder of evolution, climbing from mineral to plant, from plant to animal, from animal to man, from man to jivanmukta, from jivanmukta higher and higher yet, up the mighty hierarchy that stretches beyond Those who have liberated themselves from the bonds of humanity; until at last, thus climbing, They cast off not only all the limits of the separated Ego, not only burst asunder the limitations of the separated self but entered Ishvara himself and expanded into the all consciousness of the Lord, becoming one in knowledge as they had ever been one in essence with that eternal Life from which originally they came forth, living in that life, centres without circumferences, living centres, one with the Supreme"

Avatar, pp 9, 10.

অবতার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "বিরাটপুরুষকেই আমরা ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলিব। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে কত মহাত্মা ঈশ্বর হইবার প্রয়াস করেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভার নিজ মস্তকে বহন করিবার জন্য সমুৎসুক। সকলেই চাহেন যে, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের সম্পূর্ণ অধিকার গ্রহণ করিবেন। বিশ্বই সকলের ধ্যান। বিশ্বগত সকলের কর্ম্ম। তাঁহাদের সত্তাও বিশ্বব্যাপী। তাঁহারা সকলেই বিভু। সকলেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজনই বিরাট্‌পুরুষের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্য সকলে সেই বিরাট্‌পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং বিশ্বের পালন জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকেই বিষ্ণুর লীলাবতার বলে। তাঁহাদের নিজের কিছুই প্রয়োজন নাই। এইজন্য অবতার গ্রহণ তাঁহাদের লীলা মাত্র। যদিচ বিরাট্ পুরুষ তাঁহাদের বীজ ও নিধান, তথাপি তাঁহারা বিরাট্ পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। যদ্যপি এ ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারা বিরাট্ পুরুষ হইতে সক্ষম হন নাই, অন্য ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারাই বিরাট্ পুরুষ হইবেন। যেমন নদ নদীর সমুদ্র জল মধ্যে পতিত হইয়া সমুদ্রের জল বলিয়াই পরিগণিত হয়, সেইরূপ লীলাবতার সকল বিরাট্ পুরুষে লীন হইয়া তাঁহার সহিত অভিন্ন ভাব ধারণ করেন। তথাপি তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা আছে। সে স্বতন্ত্রতা কেবল বিশ্বকার্য্যে পরিলক্ষিত হয়। যখন তাঁহারা অবতার গ্রহণ করেন, তখনই তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা। তাঁহাদের করুণায় জগৎ ব্যাপিত রহিয়াছে। তাঁহাদেরই কৃপাবলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, জীবের মহত্ব। তাঁহাদেরই নির্দ্দেশিত পথ অবলম্বন করিয়া জগৎ উন্নতির অভিমুখে ধাবমান হইতেছে এবং তাঁহাদের প্রভূত সত্বস্রোত জগতের মালিন্য ক্রমশঃ নষ্ট করিতেছে।"—পৌরাণিক কথা, পৃঃ ৩৫।৩৬।

প্রয়াগে যেমন গঙ্গা ও যমুনা মিলিত হইয়া পুনরায় ত্রিবেণীতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে,

অথবা প্রলয়ে যেমন সকল জীব ভগবানে নিমজ্জিত (merge) হইয়া পুনরায় সৃষ্টিতে বহির্গত (re-emerge) হইয়া থাকে, সেইরূপ সিদ্ধ মুক্তেরা ভগবানে নিমজ্জিত (merge) হইয়া তাঁহাদের সংবিতের কেন্দ্র (centre) অক্ষুণ্ণ রাখেন, প্রয়োজন হইলে অবতার হইয়া আবার বহির্গত (re-emerge) হইয়া থাকেন। সাধনার দ্বারা মনুষ্য যে ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাইতে পারেন, ক্রমবিকাশিত হইয়া মনুষ্য যে বিভিন্ন প্রকার অধিকারী হইয়া অবশেষে প্রজাপতিত্ব অথবা বিরাট পুরুষত্ব লাভ করিতে পারেন, অবতারতত্ত্ব বুঝিতে হইলে তাহা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। অবতার ক্রমবিকাশের ফল, তাহা আমরা বৃহদারণ্যকোপনিষদ হইতে অবগত হইয়াছি। যোগবাশিষ্ঠেও এই কথার প্রতিধ্বনি পাইয়াছি। যথা—

পৌরুষেণৈব যত্নেন সহসাম্ভোরুহাস্পদম্।
কশ্চিদেব বিভুল্লাসো ব্রহ্মতামধিতিষ্ঠতি ॥১৪
সারেণ পুরুষার্থেন স্বেনৈব গরুড়ধ্বজঃ।
কশ্চিদেব পুমানেব পুরুষোত্তমতাং গতঃ ॥১৫
পৌরুষেণৈব যত্নেন ললনাবলিতা কৃতিঃ।
শরীরী কশ্চিদেবেহ গতশ্চন্দ্রার্দ্ধ চূড়তাম্ ॥১৬
(মুমুক্ষু—৪)

অর্থাৎ কোন জীব বিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্নের ফলেই কমলাসনে ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত। কোন পুরুষ স্বীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষকার বলেই গরুড়ধ্বজ পুরুষোত্তম হইয়াছেন। ইহসংসারে কোনও এক প্রাণী পুরুষকার প্রযত্ন ফলেই অর্দ্ধ নারীশ্বর শিবরূপে বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ সাধনার দ্বারাই জীব ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা মহাদেব হইয়া থাকেন। আমরা যাঁহাদিগকে এখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা মহাদেব বলিয়া অবগত আছি, তাঁহারা যে কত কল্প ধরিয়া সাধনা করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সেই সাধনার ফলেই এই কল্পে তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং মহাদেবের পদে অধিষ্ঠিত। তাঁহাদের সাধনা স্বার্থের জন্য নহে। তাঁহারা জীবন-মুক্ত। তাঁহাদের নিজের কিছুরই প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য জীবের উৎকর্ষ সাধন। তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভার নিজ মস্তকে বহন করিবার জন্য সমুৎসুক।

মনুষ্য যেরূপ সাধনা করিয়া থাকেন, তাহার ফলে সেইরূপ অধিকারী হইয়া থাকেন। ব্রহ্মসূত্রেও (৪।৪।১৮) উক্ত হইয়াছে যে,—"অধিকারী মণ্ডলস্থোক্তেঃ।" ইন্দ্রাদি দেবগণ এখন যে সকল পদে অধিষ্ঠিত, তাহা তাঁহারা সাধনার দ্বারা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা যেরূপ সাধনা করিয়াছেন, সেইরূপ মণ্ডলের অধিকারী হইয়াছেন। ঋষি, প্রজাপতি, মনু, দেব এবং মহাতেজস্বী মনুপুত্রগণ সাধনার দ্বারা সংবিতের যেরূপ বিকাশ করিয়াছেন, সেই বিকশিত অবস্থায় আজ তাঁহারা স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত। মনুষ্যের সংবিৎ পুষ্প-কলিকাবৎ অপ্রস্ফুটিত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা যখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইবে, তখন ঐশ্বরিক সংবিতে পরিণত হইবে। সাধনার দ্বারা মনুষ্যের সংবিৎ ক্রমবিকশিত হইয়া ঐশ্বরিক সংবিতে পরিণত হইয়া থাকে। এই ক্রমবিকাশের এক এক অবস্থার এক একটী নাম আছে। কোন অবস্থাকে ঋষি বলে, কোন অবস্থাকে প্রজাপতি বলে, কোন অবস্থাকে মনু বলে, কোন অবস্থাকে দেবতা বলে, এবং কোন কোন অবস্থাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু বা মহাদেব বলা হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহা-

দেবাদি, পদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সিদ্ধ-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত পুরুষেরই এই সকল পদ লাভ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, যদি কোনও কল্পে কোন জীব উপাসনা বলে সৃষ্টির অধিকার গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আর দ্বিতীয় পুরুষকে সে কল্পে ব্রহ্মার কার্য্য করিতে হয় না। তিনি সেই জীবে সৃষ্টির জন্য শক্তি সঞ্চারণ করেন। যথা,—

"ভক্তি মিশ্র কৃত পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন॥
গর্ভোদকশায়ীদ্বারে শক্তি সঞ্চারি।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি॥
কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥'

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য খণ্ড, বিংশ পরিচ্ছেদ।

পদ্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে,—

"ভবেৎকচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপুপাসনৈঃ।
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥"

অর্থাৎ কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনা প্রভাবে ব্রহ্মা হন। আর কোন কোন মহাকল্পে মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মা হইয়া থাকেন।

জীব যখন ব্রহ্মাণ্ডের সীমা অতিক্রম করিয়া ঐশ্বরিক সংবিৎ বা ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার চরম অধিকার লাভ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পুরুষ জীবের চরম অধিকার—তিনি জীব ও পরমপুরুষের মিলন স্থান। জীব যখন সেই চরম অধিকার লাভ করেন, তখন তিনি অন্য জীবের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই চরম অধিকার লাভ করিতে জীবের যে কত জন্ম অতীত হইয়া যায়, কত কল্প যে কাটিয়া যায়, কত সাধনা যে করিতে হয়, তাঁহার আর ইয়ত্তা নাই। শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে,—

"বহূনি মে ব্যতিতানি জন্মানি"—গীতা ৪।৫—অর্থাৎ, আমি অনেকবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ঈশ্বরত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে তিনি যে কত জন্ম ধরিয়া সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার যদিও উল্লেখ নাই, কিন্তু তজ্জন্য যে তাঁহাকে অনেক জন্ম অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই সাধনার বলেই তিনি ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া অবতার হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা অবগত হইলাম যে, অবতার ক্রমবিকাশের ফল মাত্র। সাধকগণ জীবন মুক্ত হইয়া যখন প্রজাপতিত্ব লাভ করেন, তখন তাঁহাদের সংবিতের কেন্দ্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া থাকেন। যখন অবতার গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহারা অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন—অপ্রাকৃত বৈভব হইতে প্রাকৃত বৈভবে অবতরণ করিয়া থাকেন।

(ঙ) কে অবতার হন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু না শিব?

পূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, দ্বিতীয় পুরুষ কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। সেই ব্রহ্মাণ্ডে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্ররূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ॥"

* ১-২-৬২

কেবল মাত্র এক জনার্দ্দনই সৃষ্টি, স্থিতি অথবা প্রলয় করিয়া থাকেন বলিয়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা শিব বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। এই তথ্যটী আমাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা শিব পৃথক নন, তাঁহারা মূলতঃ (in essence) সেই এক জনার্দ্দনই, কেবল জনার্দ্দনের বিভিন্ন বিভাব (aspects) লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাদিগকে আমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা শিব বলিয়া থাকি। যে বিভাবে তিনি সৃজন করেন, সেই বিভাবকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মা বলা হয়, যে বিভাবে তিনি পালন করেন, সেই বিভাবকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু বলা হয় এবং যে বিভাবে তিনি সংহার করেন, সেই বিভাবকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে শিব বলে। মোটের উপর তাঁহাদের সত্তা একই (unity of existence)। কারণ বস্তু এক, দুই হইতে পারে না। একই বহু হইয়া প্রতিভাত। ঐ অদ্বিতীয় সদ্বস্তু, অংশতঃ প্রতীত হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। তাঁহাদের কার্য্য (functions) বিভিন্ন প্রকারের বলিয়াই তাঁহারা আমাদের নিকট পৃথক বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য যে, তাঁহার কোন বিভাব হইতে অবতারগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে—অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু না শিব অবতার হইয়া থাকেন? আমরা শাস্ত্রে কেবল বিষ্ণুরই অবতারের কথা পাইয়া থাকি। শিব অথবা ব্রহ্মার অবতারের কথা পাই না। বিশেষ কার্য্যের জন্য ইঁহারা দুই জনে সময় সময় বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া এই বিশ্বরূপ নাট্যশালায় অভিনয় করেন নাই। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে, মহাদেব কিরাতের বেশ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য যখন কাশীধামে সশিষ্যে আগমন করিতেছিলেন, তখন তিনি চণ্ডালের বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার জ্ঞানের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা সম্বন্ধেও এইরূপ অনেক উপাখ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ইঁহারা যে সকল আকার ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষণস্থায়ী, সময় বিশেষের এবং কার্য্য বিশেষের জন্য ঐরূপ আকার উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষ্ণু অপেক্ষা ব্রহ্মারুদ্রাদির ন্যূনতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"অথাপি যৎ পাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।
সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥"
—(১।১৮।২১)

অর্থাৎ ব্রহ্মদত্ত অর্হণোদক যাঁহার পাদনখ দ্বারা বিসৃষ্ট হইয়া রুদ্রের সহিত সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, সেই মুকুন্দ হইতে আর ভগবৎ পদার্থ কি আছে। বরাহপুরাণ ঐরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদ্যাঃ সমা বিষ্ণোরভেদতঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বসমাঃ প্রোক্তাঃ প্রকৃতস্তু সমাসমা॥"

অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতার অভেদহেতু বিষ্ণুর সম বলিয়া, ব্রহ্মাদি দেবতা অসম বলিয়া এবং প্রকৃতি সমা ও অসমা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। পদ্মপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,-

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্ম রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥"

বিষ্ণুই সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর, তিনিই সদারাধ্য; কিন্তু তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ হইলেও ব্রহ্মা রুদ্রাদি অবজ্ঞেয় নহেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি হইতে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, শাস্ত্র বিষ্ণু অপেক্ষা ব্রহ্মা রুদ্রাদির ন্যূনতা করিয়াছেন।

বিষ্ণু জীব পালক। তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তাঁহার কার্য্য হইতেছে পালন করা। তিনি জীবের অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার করুণায় জগৎ উদ্ভাসিত। তিনি পালনকর্ত্তা স্বামী বলিয়াই অবতারগণের বীজ (source) স্বরূপ। তিনি ভিন্ন জীবগণকে আর কে পালন করিবেন? তিনি অবতার হইয়া এই পৃথিবীতে আসিয়া জীবগণকে উন্নতির পথে লইয়া যান এবং ক্রমবিকাশের (evolution) স্রোত বেগে প্রবাহিত করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দেব।

মুগ্ধ।

(১)

ঠোঁটের বোঁটায় দোলে ফুটে রাঙা হাসির ফুল;
আমি এসে পুষ্প চয়নে,—
ভুলে খালি ফুলের পানে চাই।
ঝলক্ ভরে তরল্ আলো ছাপিয়ে পাতার কূল
উছ্‌লে পড়ে উজল্ নয়নে;
সেই আলোকে নেয়ে-ধুয়ে যাই।
ঝরে দেদার সুধার ঝরা গীতি-ধ্বনিতে;
স্বর্ণাকূলের বাতাস্ লাগে গায়,
ছিটে ফোঁটা মধু শুধু পাই।
ফুলে' ফুলে' জোয়ার ওঠে রূপের নদীতে,
দুলে দুলে তরী ভেসে যায়;
কূলে কূলে আমি ছুটে ধাই।

(২)

জালে পড়া পাখী আছি পাখা ছড়িয়ে;
কাঁটা-গাঁথা আটা-মাখা পাশ!
দাঁড়িয়ে দূরে দেখ্‌ছ শিকারী?
যেতে হুকুম্ দিচ্চ বাঁধন্ পায়ে জড়িয়ে?
এত বেজায় নিঠুর পরিহাস!
উড়্‌তে নারি কচ্চি স্বীকারই।
টোপ্ গিলেছি লোভে প'ড়ে, উগ্‌রে ফেলা দায়;
দিঠির জোড়া-বঁড়্‌শি বিঁধেছে।
মজা তোমার, মাছের বেপারি!
হেঁচ্‌কা টানে মাছ্ খেলালে কণ্ঠা ছিঁড়ে যায়,—
বোঝেনা, যে খেলায় মেতেছে,
এই দুনিয়ায় এম্নি বেভার-ই
প্রাণের দখল চাইনে, কেবল মুষ্টি ভিখারী,
তবু কেন দোরে ফেলে যাও?
প্রেমনিধি থাকুক্ ভাঁড়ারে।
চাইনে প্রেমের জমীদারী; গরিব বেচারি—
খুসি হব, যদি মোরে দাও
দুটি দানা আঁচল্ ঝাড়ারে।
তৃপ্তি আমার, মুগ্ধ প্রাণে কাটিয়ে দেওয়া দিন;
মন্ মজাতে নেইক মনে সাধ।
জীবন্ ভরা থাকুক্ ধাঁধা রে!
বসি রূপের সিংহাসনে, বাজিয়ে প্রেমের বীণ্
—সুরের নেশায় করে দিয়ে মাৎ,
বিশ্ব রাখ মোহে বাঁধারে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিমচন্দ্র। (শেষ)

আয়েষা দুর্গেশনন্দিনীর উজ্জ্বলতম চিত্র। কালিদাস অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, অথচ সখিপ্রেমে তাহারা উদাসীনা, সর্ব্বত্যাগিনী। * বঙ্কিম বাবু নায়িকা হইতে আয়েষাকে উজ্জ্বলতর আঁকিয়াছেন। আয়েষা, তিলোত্তমা ও বিমলা, তিনই ভাস্কর-খোদিতা মূর্ত্তি। আয়েষা বাস্তবজীবনে মিলে না। তিলোত্তমা মিলিলেও মিলিতে পারে; কিন্তু তাহাকে লইয়া সংসার করা চলেনা—তুমি যদি তিলোত্তমার ন্যায় স্ত্রী পাও, তাহা হইলে মহাবিপদে পড়িবে। কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন নাই, তুমি তিলোত্তমাকে বুঝিতে পারিবেনা। বিমলা দেখিতেই ভাল; অমন জ্বালাময়ী স্পর্শ করিলে পুড়িয়া যাইতে হইবে। ইংরাজী সাহিত্য পড়িয়া ও বাঙ্গালী চরিত্র দেখিয়া বঙ্কিম আমাদের সমক্ষে তিনটী আদর্শ স্ত্রী-চরিত্র স্থাপন করিলেন। তন্মধ্যে আয়েষা সর্ব্বোচ্চে, কিন্তু এত উচ্চে যে দেবীত্ব পদ অধিকার করিয়াছে; তাহাকে নায়িকা করিলে উপন্যাসের মাধুর্য্য নষ্ট হয়; তজ্জন্য বঙ্কিম তিলোত্তমাকেই নায়িকা করিয়াছেন। সুতরাং আয়েষাকে বঙ্কিম তিলোত্তমাপেক্ষা হীন করেন নাই, তদপেক্ষা উচ্চে স্থান দিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু যেমন চণ্ডী ও বিলাসিনী কৎলুখাঁ-গৃহিণীগুলির চিত্র আঁকিয়া মুসলমানরাজ হারেমের কৃষ্ণ দিক্ দেখাইয়াছেন, তেমনি আবার আয়েষাকে আঁকিয়া বঙ্কিম মুসলমানান্তঃপুরের উজ্জ্বল দিক্ও দেখাইয়াছেন। বঙ্কিম দেখাইয়াছেন 'রমণী রমণী' হিন্দুই হউন, আর মুসলমানই হউন।

ওস্মান চরিত্রকেও তিনি জগৎসিংহ অপেক্ষা অযথা হীন করেন নাই। জগৎসিংহ বীর, কৌশলময়, যোদ্ধৃপতিত্ব-গুণ সম্পন্ন; ওস্মান্ও। জগৎসিংহ সত্যপ্রিয়; ওস্মান্ও। জগৎসিংহ ধার্ম্মিক, মন্দিরদ্বারে পদাঘাত করেন না; বিষম মনোকষ্টে গুরুদেবকে স্মরণ করেন; ওস্মানও ধার্ম্মিক, পীড়িত আততায়ীর শুশ্রূষা করেন, তাঁহাকে যত্ন করেন। সত্য বটে, গড়মান্দারণের ব্রাহ্মণগণকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করায় ওস্মান্কে আপত্তি করিতে দেখিনা; বরং তাহাকে বলিতে শুনি, "মুসলমানের বিবেচনায় মহম্মদীয় ধর্ম্মই সত্যধর্ম্ম; বলে হউক, ছলে হউক, সত্যধর্ম্ম প্রচারে আমাদের মতে অধর্ম্ম নাই; ধর্ম্ম আছে;" কিন্তু ওস্মান্ প্রভুর কার্য্যের স্বাপক্ষীয় যুক্তি দিয়াছেন মাত্র। তাঁহার হৃদয় উদার ছিল, তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে তিনি জগৎসিংহকে যখন যুদ্ধে আহ্বান করেন, তখন জগৎসিংহের মৃত্যু-আশঙ্কায় যথাযোগ্য সৎকারের ব্যবস্থা কখনই করিতেন না। জগৎসিংহ সংযতচিত্ত, ওস্মানও। একদিকে—আয়েষার কারাগৃহে প্রেমস্বীকার জগৎসিংহকে বিশেষ টলাইতে পারে নাই, অন্যদিকে বিমলার কটাক্ষ ওস্মান্কে আদৌ বিচঞ্চল করিতে পারে নাই। জগৎসিংহ বাক্যমাধুর্য্যনিপুণ ও রমণী-সম্মানতৎপর। জগৎসিংহের মন্দিরে বিমলার সহিত কথোপকথন ইহার প্রমাণ। ওস্মানও। ওস্মান্, বিমলা ও তিলোত্তমা রাজান্তঃপুরে অবরুদ্ধা বলিয়া লজ্জিত। জগৎসিংহ কৃতজ্ঞ, যতক্ষণ না ওস্মান্ তাঁহার অঙ্গে পদাঘাত করিয়াছিলেন, ততক্ষণ তিনি ভীরুতাপবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করেন নাই। আর ওস্মানের কৃতজ্ঞতার ফলেই বিমলা স্বামীর সহিত দেখা করিতে পারিয়াছিল এবং তিলোত্তমাকে কৎলুখাঁর বিলাস ভবন হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিল। জগৎসিংহ স্থিরপ্রসাদ, যখন জ্বরে অজ্ঞান, তখনও তিলোত্তমাকে স্বপ্ন দেখেন; যখন জ্বরে অজ্ঞান, তখনও তাঁহার প্রথম চিন্তা

* রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

তিলোত্তমা। তিনি তিলোত্তমার আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়াও স্মৃতিলোপ করিতে পারেন নাই। জগৎসিংহ মন্দিরে বিমলাকে বলিয়াছিলেন "লোকে আমার হৃদয় পাষাণ বলিয়া থাকে, পাষাণে যে মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়; পাষাণ নষ্ট হইলে তাহা আর মিলায় না।" ওস্‌মানও স্থিরপ্রসাদ, ওস্‌মান্ সুবিবেচক হইয়াও আয়েষার প্রেমে অন্ধ; তজ্জন্যই ওস্‌মান গুণগ্রাহী ও জগৎসিংহ-গুণমুগ্ধ হইয়াও দোষ গুণ বিচার না করিয়া জগৎসিংহের বধাভিলাষী হইয়া উঠিয়াছেন, এমন কি, জগৎসিংহ তাঁহাকে জীবিত ছাড়িয়া দিলেও বলিয়াছিলেন "তোমার বধাভিলাষী শত্রু জীবিত থাকিবে!" ওসমান্ নিজেই বলিয়াছেন, "আমরা পাঠান, অন্তঃকরণ প্রজ্জ্বলিত হইলে উচিতানুচিত বিবেচনা করি না।" ওস্‌মান পাঠান এবং পাঠান বলিয়া গর্ব্বিত—"পাঠান বাঙ্গালী নহে।" জগৎসিংহ রাজপুত এবং রাজপুত বলিয়া গর্ব্বিত। জগৎসিংহ প্রতিজ্ঞাপালনে কখন বিরত হয়েন না। জগৎসিংহ শরীর পতন করিয়াও, বিধর্ম্মীর উপপত্নীর চিন্তা মন হইতে দূর করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন—যাহাকে তিনি বিধর্ম্মীর উপপত্নী মনে করিয়াছেন, সেই তিলোত্তমা তাঁহার সমীপে আসিলে তিনি নারী-সম্মান মাত্র প্রদান করেন, হৃদয় ছিঁড়িয়া গেলেও সামান্য প্রেমজ্ঞাপক বাক্যোচ্চারণ করেন না। জগৎসিংহের এই অলৌকিক আত্মসংযমের সহিত তুলনায় ওস্‌মানের প্রেমান্ধতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, জগৎসিংহ নায়ক; সুতরাং জগৎসিংহকে ওস্‌মান হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া চিত্রিত। জগৎসিংহে নায়ক লক্ষণ সকলই আছে—জগৎসিংহ "ত্যাগী কৃতী কুলিনঃ সুশ্রীকোরূপ যৌবনোৎসাহী,
দক্ষোহনুরক্ত লোকস্তেজোবৈদগ্ধশীলবান্ নেতা।"

অতএব বঙ্কিমচন্দ্র ওস্‌মানকে অযথা হীন করেন নাই। বস্তুতঃ সাবিত্রীর যেমন বর জুটে নাই, সত্যবান্ ভিন্ন অপর কেহ যেমন অমন তেজোময়ীকে হৃদয়ে ধরিতে সাহস করে নাই, সেইরূপ, আয়েষার প্রেমপ্রতিদানক্ষম হইতে হইলে হৃদয়ে এমনই এক উৎকৃষ্ট প্রেম পোষণ করিতে হইবে, যাহা কেবল ওস্‌মানেই সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওস্‌মানকে আয়েষা ভ্রাতৃভাবে চিরকাল দেখিয়াছে, সতী এখন অন্য ভাবে তাহাকে দেখিতে পারিতেছে না। তাই আয়েষার ভাগ্যে বিবাহ ঘটিয়া উঠিল না। ভালই হইয়াছে, আয়েষার বিবাহ হয় নাই। জগৎসিংহ-প্রেম-বিষধর-রক্ষিতা আয়েষা জগৎকে তাহার সুগন্ধী কীর্ত্তি বিতরণ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা প্রচার করুক ও জগতের আনন্দবর্দ্ধন করুক—ওস্‌মান্ কিম্বা জগৎসিংহের সহিত তাহার বিবাহ হইলে ঐ করুণাময় প্রাণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেটুকু অধিকার আছে, সব লোপ পাইবে।

এদিকে কবি জগৎসিংহকে যেরূপ আদর্শ হিন্দুরাজকুমার ও ওস্‌মান্‌কে আদর্শ মুসলমান রাজকুমার করিয়া গড়িয়াছেন, সেইরূপ বীরেন্দ্রসিংহ ও কৎলুখাঁতে, তাঁহার জ্ঞানে সাধারণতঃ তাৎকালীন রাজপুত ও মুসলমান রাজগণ কিরূপ ছিল, দেখাইয়াছেন।

বীরেন্দ্রসিংহ ক্ষুদ্র রাজপুত রাজা; তাঁহার সদ্‌গুণের অভাব নাই—অপত্য স্নেহ, পত্নীর প্রতি বিশ্বাস, নির্ভীকতা এবং কথঞ্চিৎ পণ্ডিতভক্তি। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ খামখেয়ালী এবং অসংযতচিত্ত। যার রূপে মুগ্ধ হইয়া পিতার সহিত কলহ করিয়াছিলেন, সেই তিলোত্তমা-জননী যখন নারী জীবনের এক সন্ধিস্থলে পতিতা, তখন বীরেন্দ্র সিংহ বিমলার রূপে মত্ত আছেন। বীরেন্দ্র সিংহের কুলগৌরব আছে, তিনি শূদ্রী কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন না, কিন্তু সেই শূদ্রী কন্যার নিকট প্রেমভিক্ষা করিতে লজ্জাবোধ করেন না—জগৎ সিংহের কুলগৌরব আরও উচ্চদরের; বীরেন্দ্র সিংহের ভয় লোকলজ্জাকে, জগৎসিংহের আপনার আত্মাকে। বীরেন্দ্র সিংহ ক্রোধী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ, রাজা মানসিংহের প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ, বিমলাকে তাঁহার নিজের মৃত্যুর প্রতিহিংসা লইতে সঙ্কল্প করিতে দেখিয়া উল্লসিত।

কৎলুখাঁর গুণ অপত্য-স্নেহ এবং নির্ভীকতা। কৎলুখাঁর চিত্র একান্ত আত্মসুখরত এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিলাষী।

প্রতিহিংসা—পাশবিক; বীরেন্দ্র সিংহকে ক্লেশ দিবে বলিয়া তাহার ত্রয়োদশবর্ষীয়া * বালিকা তিলোত্তমাকে বিলাসভবনে অবরুদ্ধ করিয়াছে।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, বঙ্কিম বাবুর মুসলমান-রাজ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ইংরাজ ঐতিহাসিকের নিকট হইতে লব্ধ। টডের রাজস্থান রাজপুত রাজগণকে উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, কিন্তু মুসলমান রাজগণের পক্ষসমর্থনকারী লেনপুলের তখনও অভ্যুদয় হয় নাই। ইহা ভিন্ন যে সময় বঙ্কিম বাবু দুর্গেশনন্দিনী লিখিয়াছিলেন, তখন হিন্দু বাঙ্গালীর কয়জন সাধুভাষায় লিখিত বাঙ্গালা উপন্যাস বুঝিতে পারিত বা বুঝিতে পারিলেও পড়িত? মুসলমান বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা বঙ্কিমের উপন্যাস পাঠ করিতে পারিত বা ইচ্ছা করিত, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিম জানিয়া শুনিয়া কখনই মুসলমান সুধীবৃন্দের মনোকষ্টের কারণ হইতেন না। চিন্তাশীল মুসলমানগণের দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে অধিকতর সদয় মত পোষণ করা উচিত বলিয়া আমাদের বোধ হয়।

কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অভিযোগ করেন, ইহাতে তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ আছে। এই অভিযোগ যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। দিগ্‌গজ ও অভিরাম স্বামী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদ্রূপচিত্র বলিয়া বোধ হয়। দীনবন্ধু বাবু সার্ব্বভৌম পুত্রকে নবীন তপস্বিনীতে ব্যঙ্গ করিয়া ভালই করিয়াছেন; কিন্তু হতভাগা দিগ্‌গজ 'পিতৃনামে চ মধ্যমঃ' হইবার চেষ্টা করে নাই, তাহাকে সমাজ সমক্ষে টানিয়া আনিবার কি প্রয়োজন ছিল? স্বীকার করি, অর্দ্ধৈতিহাসিক গল্প চালাইয়া লইয়া যাইবার জন্য বঙ্কিম বাবুর একটী গর্দ্দভবুদ্ধি লোকের আবশ্যকতা হইয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গালায় বিদ্যাদিগ্‌গজ ভিন্ন আরও অনেক গর্দ্দভবুদ্ধি আছেন। আর অভিরাম স্বামীকে অত পণ্ডিত অথচ অত অসংযতাত্মা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মনে ক্লেশ দিয়াছেন। হয়ত বঙ্কিম তখন সবে মাত্র কালেজ * হইতে বাহির হইয়াছেন বলিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর একটু বিতৃষ্ণা ছিল; হয়ত অভিরাম স্বামী তাঁহার পরিচিত কোন এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চিত্র মাত্র। বঙ্কিমের আত্মজীবনী যতদিন না প্রকাশিত হয়, ততদিন এ বিষয়ে শেষ কথা বলা যায় না। তবে ব্রাহ্মণ † পণ্ডিতের উপর যে বঙ্কিমের পরে ভক্তি হইয়াছিল, চন্দ্রশেখর তাহার প্রমাণ।

দোষশূন্য কাব্য নাটক বা উপন্যাস দুষ্প্রাপ্য, আমাদের বোধ হয় অপ্রাপ্য সুতরাং বঙ্কিমের প্রতিভা স্থানে স্থানে তেমন স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই। আয়েষার রূপবর্ণনা সরস হইলেও রুচিকর হয় নাই; ভারতচন্দ্র দাশরথি রায় ইত্যাদির প্রতি কটাক্ষ বঙ্কিমের নিকট আমরা আশা করি না। তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের প্রথম মিলন মন্দিরে, তিলোত্তমা ও বিমলা শিব পূজা করিতে গিয়াছিলেন; আষাঢ় মাসের রাত্রে স্ত্রীলোকে শিব পূজা করিতে যায় না; বঙ্কিমও মন্দির ভিন্ন অন্য কোথাও তিলোত্তমাকে বিমলার সহিত বস্তুতঃ একাকী পাঠাইতে পারেন না। বিমলার স্কন্ধে সঙ্কীর্ণতানয়ন কখনই কবির অভিপ্রেত নহে, যদি তাহা হইত, তাহা হইলে তিনি বিমলা দ্বারা কখনই জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার গোপন-মিলন সংঘটন করাইতেন না—অথচ বিমলা জগৎ-

* পুস্তক লিখিত ঘটনা ১৫৯০ সালে হইয়াছে বলিয়া লিখিত; বিমলার বয়স এখন ৩৫। বিমলা ৬ বৎসরে ওস্মানের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার পর চতুর্দ্দশ বর্ষ কাটিয়া গেলে বিমলা পিতার সন্ধান পান; অর্থাৎ ১৫৭৫ (খ্রীঃ অঃ) সালে তিলোত্তমাকে বঙ্কিম বাবু কিশোরী, বালিকা ইত্যাদি বিশেষণ দিয়াছেন—সুতরাং বিমলার পিতার সহিত সাক্ষাৎ ও বীরেন্দ্র সিংহের সহিত প্রথম সাক্ষাতের মধ্যে দুই বর্ষ ব্যবধান রাখিয়া আমরা তিলোত্তমাকে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বলিয়া বর্ণনা করিলাম।

* যদিও কালেজ কথার আজকাল চলন নাই, আমরা ঐ কথাই ব্যবহার করিয়াছি। পূজনীয় রায় রূসময় মিত্র বাহাদুর একদিন বলিয়াছিলেন 'তখন কালেজ বলা হইত, কেননা, তাহা হইতে কালে এক আধ জন বি-এ জন্মাইত, এক্ষণে কলে বি, এ, জন্মায়—' টীকাকার মহাশয়েরা ধন্য।

† বিশ্বকোষে 'বঙ্কিমচন্দ্র' দ্রষ্টব্য।

সিংহকে বলিতেছে "মহাশয়, স্ত্রীলোকের, সুনাম এমনি অপদার্থ বস্তু যে, বাতাসের ভর সহেনা, আজিকার এ প্রবল ঝড়ে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর।"—বঙ্কিম বলেন, বিমলাকে বাধ্য হইয়া এইরূপ বলিতে হইয়াছিল; তিলোত্তমা কন্দর্পশরহতা, জগৎসিংহ-সান্নিধ্যে আর কিছুক্ষণ থাকিলেই তাহার আরোগ্যের সম্ভাবনা লোপ পাইবে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই "কেহ বা উত্তর করিল 'মহারাজ, রাজপুতপতির শত শত মহিষী। এখানে 'রাজপুত পতি' দ্বারা কাহাকে বুঝাইতেছে? যদি তিলোত্তমাকে রাজপুতপতির মহিষী ধরিয়া 'রাজপুত পতি শব্দে 'জগৎসিংহ' অর্থ করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, জগৎসিংহ দক্ষিণ নায়ক হইতে প্রেম-প্রভাবে অনুকূল নায়কে পরিণত হইলেন; আর যদি বিমলাকে রাজপুতপতির মহিষী ধরিয়া লইয়া 'রাজপুত পতি' শব্দে 'মানসিংহ' অর্থ করা যায়, তাহা হইলে কবিত্বপক্ষে আরও সুন্দর হয় বলিয়া বোধ হয়। "উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।" জগৎসিংহের বয়স এক্ষণে ২৩।২৪ বৎসর, এতদিন মনোমত পাত্রী পান নাই বলিয়া অবিবাহিত। বলা বাহুল্য, আমরা 'মানসিংহ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। বিমলাকে আমরা তিলোত্তমাকে কর্কশ সম্ভাষণ করিতে দেখিনা, অথচ মন্দিরে বিমলা বলিতেছে, 'সে কথার উত্তর আমি তোমার পিতার কাছে দিব'—আমরা 'তোমাকে বলিলাম না, কিছু মনে করিও না' এই পদটী উহ্য করিয়া লইলাম। তিলোত্তমা মাতার বিবাহের কয় বৎসর পরে জন্মিয়াছিল? তিলোত্তমার জন্মকালে তাহার মাতার বয়স অন্ততঃ ২২ হইয়াছিল। এক স্থলে দেখিতে পাই যে, জগৎসিংহ জানেন যে, বীরেন্দ্রের কন্যার সহিত মানসিংহ-পুত্রের বিবাহ হইতে পারে না, তাহার কারণ যে অতি গুহ্য বৃত্তান্ত সামান্য পরিচারিকায় জানিতে পারে না, তাহাও জানেন। দেখিতে পাই, বিমলার জগৎসিংহকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবার কি অধিকার, তাহাও জানেন; অথচ বিমলাকে যে কেন কবি এক দীর্ঘলিপি লিখাইয়া আত্মপরিচয়াদি দেওয়াইলেন, বুঝিতে পারি নাই। হিতবাদী সংস্করণে গিরিজা বাবুর বঙ্কিমচন্দ্রের পশ্চাতে যে পরিশিষ্ট আছে, তাহাতে দুর্গেশনন্দিনীর একটী সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আছে, সমালোচক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, অভিরাম স্বামী অন্তঃর্যামী না সর্ব্বব্যাপী? বঙ্কিম বাবুর জ্যোতির্গণনায় অত্যধিক বিশ্বাস ছিল—অথচ তিনি মোগল সেনাপতিকে আসরে নামাইয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। বাল্যকালে গল্প শুনিয়াছিলাম যে, এক জ্যোতিষী একটী লোককে, তাহার কাশীতে মৃত্যু হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। পরে তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠ-লগ্ন দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে 'ক' এর মস্তকটী বিভিন্ন হইয়া গিয়াছিল ও ক্ষীরোদ বাবুর 'নন্দকুমারের অভিনয় দেখিয়া লেখকের ভ্রাতা বলিয়াছিলেন যে, বাসুদেব শাস্ত্রী নন্দকুমারের কপালে রাজদণ্ড দেখিয়াছিলেন, এক অর্থে এবং তাহার কপালে রাজদণ্ড ফলিয়াছিল আর এক অর্থে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও দুই চারিটী দোষ বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু সমালোচকের ক্ষুদ্র চক্ষুতে আমরা যতই কেন দোষ বাহির করি না, দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিম যে একজন প্রতিভাশালী কবি, * ইহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্ত্রীচরিত্রগুলিকে কতকটা স্বাধীনতা দিয়া কেবল মাত্র সাহস দেখান নাই; কবিত্ব, মাধুর্য্য এবং নাটকীয় সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। "যে দিন বিধাতা স্ত্রীলোককে স্বামীর নাম মুখে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই দিন আত্মপরিচয়েরও পথ বন্ধ করিয়াছেন।" বিমলার এই যুক্তিপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর না দেওইয়া কবি বঙ্কিম মনোহর কৌশল দেখাইয়াছেন। যদি জগৎ সিংহ উত্তর দেন, তবে তাহা কখনই ভাল হইবে না, এবং যদি উত্তর না দিতে পারেন, তাহা

* আমরা, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর মৌলিকত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিলাম না। যতদিন না বঙ্কিমের আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়, ততদিন গিরিজা বাবুর মতই শিরোধার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিব। "বঙ্কিমচন্দ্র" (হিতবাদী সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

হইলে নায়কের গৌরব হানি হয়। এইজন্ত কবি বলিয়াছেন 'যুবক এ কথার উত্তর করিল না, তাহার মন অন্যদিকে ছিল।' শকুন্তলায় রাজনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখিয়া যখন প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়া সম্মানদর্শন-তৎপর হইল, তখন দুষ্মন্ত তাহাদিগকে ব্যর্থ-ঘটিতবাক্যে ভুলাইলেন। তাহার পরিচয় পাইয়া যখন বিমলা ও তিলোত্তমা দণ্ডায়মান হয়েন, জগৎসিংহ তখন বাক্যমাধুর্য্যে তাঁহাদিগের সঙ্কোচ দূর করেন। আমরা এমত বলি না যে, বঙ্কিম কালিদাস অপেক্ষা উচ্চ কবি; স্থানভেদে, অবস্থাভেদে, ঘটনাভেদে দুর্গেশনন্দিনীতে যাহা সাজে, শকুন্তলায় তাহা সাজে না। বঙ্কিমের কবিত্বের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলার সৌন্দর্য্য-বর্ণনা, আয়েষার চলন-মাধুর্য্য, জগৎসিংহ-শুশ্রূষা, কৎলুখাঁর সভা-বর্ণনা, বীরেন্দ্র সিংহের মৃত্যুদৃশ্য, তিলোত্তমা ও জগৎ সিংহের তিলোত্তমার রোগাবস্থায় মিলনদৃশ্য ইত্যাদি বারম্বার পড়িলেও পুরাতন হয় না।

বঙ্কিম বাবু সমালোচনা হইতে অনেক উচ্চে। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী কবিকে সম্যক বুঝা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। যেখানে আমরা কবিত্বের হানি হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতেছি, হয়ত পরে কোন প্রতিভাশালী সমালোচক প্রমাণ করিবেন যে, সেখানেও বঙ্কিম কবিত্ব দেখাইয়াছেন। তবে একথা আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি যে, বঙ্কিম যদি দুর্গেশনন্দিনী ভিন্ন অন্য কোন বই না লিখিতেন, তাহা হইলেও তিনি বঙ্গসাহিত্যিকগণের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার দুর্গেশনন্দিনী নির্ব্বাচন করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। যে পুস্তক অসংস্কৃতাবস্থায় Vernacular Literary Societyর নিকট পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই, তাহাকে সংস্কৃতাবস্থায় পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন-যোগ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রতিভার আদর করিয়াছেন এবং আপনাদের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস সমূহের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে লিখিত এবং সহজবোধ্য, সম্প্রদায় বিশেষের উপর একটু কটাক্ষ আছে বলিয়া এখানি কাব্যপূর্ণ উপন্যাসকে চাপিয়া রাখা উচিত বলিয়া বোধ হয় না। মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট পদ্য সকল কাব্যরসামোদী আনন্দ সহকারে পাঠ করে। তবে আমরা এরূপ আশা করি যে, যখন বঙ্গভাষার চর্চ্চা আরও বিস্তৃত হইবে, যখন শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই বঙ্গভাষা বহুল পাঠ করিবে, তখন বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, আনন্দমঠ ইত্যাদি সহজবোধ্য পুস্তক সকল বি-এ পরীক্ষার পাঠ্য না হইয়া মধ্য পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্ধারিত হইবে, এবং বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, সীতারাম, চন্দ্রশেখর ইত্যাদি বি, এ, পরিক্ষার্থিগণকে একত্রে শিক্ষা ও আনন্দ দান করিবে। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র।

গর্ব্বী।

> "The best of men
> That e'er wore Earth about him was sufferer;
> A soft, meek, patient, humble, tranquil spirit,
> The first true gentleman that ever breathed."

দম্ভ আজি মূর্ত্তি ধরি তোমারি ভিতর
বাঁধিয়াছে নিজ নীড়, হে গর্ব্ব-সম্ভব!
অঙ্গ-ভঙ্গি প্রকাশিয়া, উদ্গারি বচন,
কানকী জোনাকী দলে আপনার জ্যোতি,
দুর্দ্দম ক্ষমতারাজি করিছ জ্ঞাপন;
কুটবন্ধে বশীভূত ছুছুন্দরী রাজি।
উপরেতে সোণালী সাজ ভিতরে বালুকা,
গোময়ে জোনাকী গোঁজা বুদ্ধির কিরণ।
বংশ-মঞ্চস্থিত অহো, কুষ্মাণ্ড-সম্মত!
বৃথা ভাব আপনারে ভেনাস্ (Venus) অমুক;
তুমি যাহা তাই যদি বুঝিতে বারেক,
উপেক্ষার নিষ্ঠীবন করিয়া নিক্ষেপ
যাইতে না প্রতিভার করিতে নির্ব্বাণ,
কেড়ে নিতে চাহিতে না সুজন সম্মান।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

সাধক চতুষ্টয়।

যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, জন্ম—১৭ই অগ্রহায়ণ, ১২৬৪ সাল, ৩রা ডিসেম্বর ১৮৫৭ খ্রীঃ।
মৃত্যু—৫ই শ্রাবণ, বুধবার ১৩১৬, ২১শে জুলাই, ১৯০৯ খ্রীঃ।
গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত—জন্ম—৮ই আশ্বিন,১৭৭৭ শক।
মৃত্যু—২৯শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৮৩১ শক, (১৩১৬ সাল)।
বঙ্কুবিহারী বসু——মৃত্যু—৪ঠা জুলাই, ১৯০৯ খ্রীঃ, ২০শে আষাঢ়, ১৩১৬ সাল।
কৈলাসচন্দ্র বাগচী—জন্ম—সেপ্টেম্বর, ১৮৪৯ খ্রীঃ, পাবনা গুনাইগাছা গ্রামে।
মৃত্যু—৩রা জুলাই, ১৯০৯ খ্রীঃ, ১৯শে আষাঢ়, ১৩১৬ সালে, কলিকাতায়।

সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সকল সম্প্রদায়ে এমন দুই চারি জন সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,যাঁহাদের পুণ্যের প্রভাবে দেশ,কাল এবং জাতি ধন্য হইয়া রহিয়াছে। নানক, কবীর, তুকারাম, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধুর আবির্ভাবে ভারতভূমি পবিত্র হইয়া রহিয়াছে।—তাঁহাদের কথা কখনও দেশ ভুলিতে পারিবে না। সাধুর পূজা কোন্ দেশে নাই?

সময়ে সময়ে আমরা মনে করি, পৃথিবীতে এত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইল কেন? ধর্ম্ম ত সনাতন—সব ধর্ম্মই মূলে এক, তবে এত ভেদ-বোধ কোথা হইতে আসিল? সাধকেরা বলেন—সাধনার বিভিন্ন পথ,কিন্তু লক্ষ্য এক অবিনশ্বর। যাঁহারা সিদ্ধ, যাঁহারা ব্যক্তিত্ব বা দলের গণ্ডির উপর উঠিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন ভেদবোধ নাই। যে পথ ধরিয়াই যিনি অগ্রসর হউন, সাধনার চরম অবস্থায়, লক্ষ্য-ধামে পৌঁছিলে আর বিভিন্নতা-বোধ থাকে না। একে স্থিতি, একে গতি, একেই মুক্তি। বদ্ধাবস্থাতেই সব পৃথক পৃথক, মুক্তাবস্থাতে—সব একাকার। ব্রাহ্মসমাজ আধুনিক সমাজ। এ দেশে প্রচলিত অপবাধ এই—এই আধুনিক ব্রাহ্মসমাজ সংস্কার রূপে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজ-বন্ধন শিথিল করিয়া দিতেছেন, কিন্তু গঠন-কার্য্যে কৃতীত্ব দেখাইতে এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হন নাই। অপবাধ এই—মতে ব্রাহ্ম আদর্শ হইলেও চরিত্রে আজও এদেশের আদর্শ হইতে পারেন নাই। অপবাধ এই—ব্রাহ্ম বাক্সর্ব্বস্ব, কাজে অপটু। একথার জীবন্ত প্রতিবাদ—ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সাধক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র জীবন। কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, অঘোরনাথ, কেদারনাথ, মহর্ষি, রাজনারায়ণ, রামতনু, উমেশ চন্দ্র, আনন্দমোহন চরিত্রালোকে যে সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, সে সমাজ শুধু বাক্সর্ব্বস্ব নয়। অগণ্য দোষ ত্রুটী থাকা সত্বেও একথা নির্বিবাদে ঘোষণা করা যাইতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ বহু সাধকের পুণ্যপূত চরিত্রাদর্শে উজ্জ্বল হইয়াছে। এত দিন পর, ব্রাহ্মসমাজ এদেশের উপেক্ষার পরিবর্ত্তে গৌরবের জিনিস হইয়াছে।

যে সকল মহাত্মা দেহধারী রহিয়াছেন—তাঁহাদের কথা আজ আমরা তুলিব না। যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা লিখিবার সময় কোন সঙ্কোচের কারণ নাই। যে সাধক-চতুষ্টয়ের নাম প্রবন্ধের শির্ষে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা চরিত্রাদর্শে যে কোন সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন। এমন নীরব পবিত্র জীবন সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালেই আদরের জিনিস। সত্যই লিখিতেছি, ব্রাহ্মসমাজ এখন আর উপেক্ষার জিনিস নয়।

বাক্যেও নয়, কর্ম্মেও নয়—জীবনের শোভা কেবল সুচরিত্রে। কে কত বক্তৃতা করিয়াছে,বা কত প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছে, অথবা কে কত কাজ করিয়াছে, তাহা দ্বারা জীবনের প্রকৃত গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় না। ঈশা বা মুশা, ম্যাটসিনী বা জেনী, বুদ্ধ বা মহম্মদ, কেশব বা চৈতন্য, টলষ্টয় বা কনফিউসস্, এমার্সন বা কারলাইল,

নানক বা কবীর, তুকারাম বা রামপ্রসাদ, দয়ানন্দ বা রামকৃষ্ণ—ইঁহারা এসংসারে মহৎ কেবল সুচরিত্রে। চিদানন্দময়ের অক্ষয় শান্তি-নিকেতন—মানব চরিত্র। চরিত্র-ধামে যে অটল, অচল, অজেয়, দুর্দ্ধর্ষ, সে-ই শান্তি-নিকেতনের অমর দেবশিশু। আসুক দুঃখ দারিদ্র্য, শোক সন্তাপ, নিন্দা তিরস্কার, বিদ্বেষ পরশ্রীকারতা, অপবাধ এবং নির্য্যাতন—দেবশিশুগণ নিত্য অবিচলিত;—প্রবল ঝটিকা বহিয়া যাক্—তাঁহারা যেমন নির্ব্বিকারচিত্ত আদিতে, তেমনই নির্ব্বিকার-চিত্ত ঝটিকার অন্তে;—মানব সবিস্ময়ে তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। রিপুর উত্তেজনায় টলে কে?—সে ত তুমি, আমি এবং ঐ সংসারের দাসগণ। দুঃখ দারিদ্র্যে, অথবা বৃথা নিন্দা তিরস্কারে বা অশান্তি নির্য্যাতনে লক্ষ্য ভোলে কে? সে ত তুমি, আমি এবং ঐ বাহির-সর্ব্বস্ব মানব-সমাজের কলঙ্কিতগণ? জেনী বা ঈশা, দয়ানন্দ বা রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ বা মহম্মদ এবং আর আর সকল দেবশিশুগণ ভুলিতে পারেন না, কথনও ভোলেন নাই। তাঁহারা অমর, তাঁহারা অক্ষয় চরিত্র-সিংহাসনে চির-প্রতিষ্ঠিত দেবাভাস বা চিদাভাস।

আমরা অমর দেবশিশুদিগের কথা বলিতেছিলাম—সকল দেশে সকল সমাজেই এইরূপ দেবশিশুর আবির্ভাব হইয়াছে এবং হইয়া থাকে; এবং তাঁহাদের পুণ্যের বলেই সমাজ এবং দেশ রক্ষা পায়। ব্রাহ্মসমাজ যাহাদের সুচরিত্রে ধন্য হইয়াছে, সাধু যোগেন্দ্রনাথ, গঙ্গাগোবিন্দ, বঙ্কুবিহারী এবং কৈলাস চন্দ্র তাঁহাদের অন্যতর। এই সাধক-চতুষ্টয়ের নীরব এবং নিষ্কাম জীবনালেখ্য দেখিয়া আমরা ধন্য এবং কৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহাদের চরিত্র দেখিয়া সময়ে সময়ে মনে হইয়াছে, ইঁহারা মানব, না দেবতা? তাঁহাদের তিরোধানের পর বুঝিতেছি, তাঁহারা আমাদিগকে স্বর্গের আদর্শ দেখাইবার জন্যই যেন দেবাভাস রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পূত চরিত্রালোক দেখিয়া এদেশের নরনারী ধন্য হইয়াছে।

যোগেন্দ্রনাথ—ডাক্তার এবং সুলেখক ছিলেন, তিনি আজীবন শিষ্য,—বাল্য হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অদম্য জ্ঞান-পিপাসায় বিভোর ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—এরূপ না করিলে পাঠের পিপাসা বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে সম্মানের চক্ষে দেখি নাই। তিনি দরিদ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন। অবসর পাইলেই বিনা ভিজিটে যাইয়া দরিদ্রের সেবা করিতেন। তাঁহার তিরোধানে দরিদ্রদের ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সে জন্যও তাঁহাকে ভালবাসি নাই। তিনি প্রেমের কাঙ্গাল ছিলেন, সকলকে ভালবাসিতেন, কিন্তু ভালবাসায় অন্ধ হইয়া নীতি ও ধর্ম্ম ভুলিতেন না। দেখিয়াছি, ভালবাসিতে ভালবাসিতে তিনি বিভোর হইয়া আপনাকে ভুলিয়াছেন, কিন্তু তবুও ধর্ম্মকে ভোলেন নাই। বাহিরে কোন প্রকার আস্ফালন নাই, অধিক বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাই, কিন্তু ভিতরে ডুবিয়া মজিয়া বিভোর হইয়া রহিয়াছেন কেবল জ্ঞানময় প্রেমে। সে প্রেম—সংসারের প্রেম নয়; সে—গভীর ভগবদ্ভক্তি। তিনি যে দিন প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে শ্মশানের চিতায় তুলিয়া দিলেন, সেদিনও তাঁহাকে দেখিয়াছি;—দেখিয়াছি, তিনি নির্ব্বিকারচিত্ত;—শোকের অতীত চিদানন্দে বিভোর। শেষ জীবনে দারুণ বহুমূত্র রোগে বড়ই ক্লেশ পাইতেছিলেন, কিন্তু আর্ত্তনাদ করিতে একদিনও দেখি নাই। কোন দুশ্চিন্তাই তাঁহাকে বিমর্ষ করিতে পারিত না,—দুঃখেও আত্মহারা নহেন, সম্পদেও স্ফীত নহেন, নিন্দায়ও কাতর নহেন, প্রশংসায়ও উৎফুল্ল নহেন। তিনি সকল অবস্থাকে জয় করিয়া সতীহারা মহাদেবের মহা জ্ঞান-প্রেম-যোগে যেন বিভোর হইয়াছিলেন। শেষে,—তাঁহার জ্ঞান-মূলক প্রেম—ভগবদ্ভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। এমন নিষ্কাম জ্ঞান-প্রেমমূলক যোগ ধর্ম্মের সমন্বয় অতি অল্প জীবনেই দেখিয়াছি। তাঁহার দৃষ্টি সদা লাভালাভ-গণনার অতীত ধামে ছিল। তদীয় যোগময় চরিত্রের অভিব্যক্তি—তাঁহার মৃত্যু শয্যায় প্রকটিত হইল। নির্ম্মম ডাক্তারগণ বিনা ক্লোরফরমে পৃষ্ঠের কারবঙ্কলে বহুবার অস্ত্র চালনা করিলেন, তিনি একবারও ক্লেশ জ্ঞাপন

করিলেন না! অপারেশনের এক ঘণ্টা পরেই তাঁহার নাড়ী ডুবিতে লাগিল,—আর কিছুক্ষণ 'পরেই মহাপ্রস্থান করিলেন;—কিন্তু দুঃখ ক্লেশের পরিব্যক্তি হইল না;—মহাযোগী মহাযোগে আত্মসমর্পণ করিলেন! সে স্বর্গীয় দৃশ্য কেবল তদীয় নিষ্কাম পূতচরিত্রেরই যোগ্য। তিনি যে পবিত্র চরিত্রের আভাস রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সন্তানগণ তাঁহার অধিকারী হউক, বিধাতার চরণে কেবল এই প্রার্থনা।

গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত।—সাধু কালী নারায়ণের পুত্র, শ্রীযুক্ত কে, জি, গুপ্তের ভ্রাতা। নিজেও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সুতরাং তিনি সম্পদ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার মাতৃদেবীর চরিত্রের কি এক অনিন্দিত চরিত্রাভাস পাইয়াছিলেন, তিনি আজীবন দরিদ্র-সহবাস এবং দরিদ্র-সেবাই ভালবাসিতেন। এমন অকপট সেবা-পরায়ণতা অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। দরিদ্রের সেবার কথা বলিবার সময় তাঁহার নয়নের কোণে অশ্রুর সমাবেশ হইত,—তদীয় সদা-প্রফুল্ল বদন মলিন হইত। তিনি সদা প্রফুল্ল ছিলেন,—হাসিতেন এবং অন্যকে হাসাইতে পারিতেন,—কিন্তু পর-দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ হইলেই কেমন হইয়া যাইতেন। তিনি অকপট-চিত্ত ও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন—অহঙ্কার নামক যে একটা দস্যু সংসারকে উচ্ছিন্ন করিতেছে, কি মন্ত্র সাধনায়, জানিনা, তাহাকে তিনি সম্পূর্ণ রূপে জয় করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন—খ্রীষ্টের উপমিত—"মেষশিশুর" ন্যায়;—উঠিতে বসিতে, শুইতে যাইতে স্বভাবের নিষ্কলঙ্ক শিশু সদৃশ ছিলেন। যে তাঁহার সংস্পর্শে একবার আসিত, সেই মোহিত হইয়া ভাবিত—এমন বড় ঘরে এমন কোমল মূর্ত্তির বিকাশ কিরূপে হইল? তিনি আজীবন ছিলেন —কোমলতার প্রতিমূর্ত্তি। সে ত মূর্ত্তি নয়—সে যেন কোমলতা ফুটিয়া জমাট হইয়া রহিয়াছে,—সংসারের উত্তাপে তাহা ম্লান নয়, পৃথিবীর অহঙ্কার তাহাকে মলিন করিতে পারে নাই;—কুসুমনিভ দেবশয্যায় শয়ান—সংসারের অস্পৃশ্য, অনিন্দিত দেবশিশু। অধিক দিন দেখি নাই, কিন্তু যে কয় দিন দেখিয়াছি—তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম, গঙ্গা-গোবিন্দ কলুষিত সংসারের জীব নহেন। দারুণ বহুমূত্র রোগের পরিণামে বিষম ক্ষতাঙ্কুর যখন পায়ে দেখা দিল, তিনি অতলে ডুবিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন!

বলিয়াছি, গঙ্গাগোবিন্দ অকপট-চিত্ত ছিলেন। তাঁহার সরলতা, দেব-পূত-সাধনার অহেতুকী মন্ত্র। হাসিতে, খেলিতে, চলিতে—তিনি এই মন্ত্র সাধনায় তন্ময় হইয়া থাকিতেন। সংসার এবং তিনি—এ দুয়ে কখনও মিশ খাইত না,—তিনি সদা যেন কি এক জ্ঞানে, কি এক ধ্যানে বিভোর থাকিতেন। সে জ্ঞান এবং সে ধ্যান—নিষ্কাম সেবা-ব্রত-পরায়ণতা। তিনি কল্যকার চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক, সর্ব্বস্ব পর-সেবায় ঢালিয়া দিতেন। ঢালিয়া দিতেন, অথচ তাহার পরিব্যক্তি ছিল না। অনন্য-সাধারণ সেবাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। এই মন্ত্র সাধন করিতে করিতে তিনি মহেশ্বরে নিমগ্ন হইলেন।

বঙ্কুবিহারী বসু ই, বি, এস-রেল-ওয়ের কর্ম্মচারী মাত্র, কিন্তু তাঁহার কথা লিখিতেছি কেন? চিরদারিদ্র্যে কিরূপে নীরব-চরিত্র মহাধন ফুটিয়া উঠে, তাহার জীবন্ত নিদর্শন বঙ্কুবিহারী। তিনি যোগেন্দ্র-নাথের ন্যায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকা-তাস্থ উপাসকমণ্ডলীর অন্যতর আচার্য্য ছিলেন, তাহাতেই কি প্রকাশ পায় যে তিনি চরিত্র-বান ছিলেন? না—তাহা মোটেই নয়। আচার্য্যগিরি—তাহা ত খোসামুদী বা পদলেহন বা আনুগত্যের অবশ্যম্ভাবী ফল;—জানি, এখানে এবং সেখানে, এদেশে এবং সেদেশে কত আচার্য্য পুরোহিত আছেন, যাঁহারা, চরিত্র ত দূরের কথা, সংসারের সামান্য শিষ্টতা এবং ভদ্রতা রক্ষা করিয়াও চলিতে পারেন না। তাঁহারা লাভ-লোকসান-গণনায় সদা ব্যস্ত, এবং সম্মানের কাঙ্গাল,—তাঁহারা অর্থ বা যশ মান অর্জ্জনের জন্য না পারেন, এমন কাজ নাই। গণ্ডী বা দলের প্রভুত্বরক্ষার জন্য তাঁহারা না পারেন, এমন জঘন্য কাজ নাই। আচার্য্য হইয়া যোগেন্দ্রনাথ এবং

বঙ্কুবিহারী আচার্য্য নামের কলঙ্ক দূর করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কখনও দলের সঙ্কীর্ণতার পোষকতা করেন নাই; কিম্বা তোমাকে বা তাহাকে দলে আনিবার জন্য কখনও ব্যাপৃত হন নাই,—আরম্ভে শিষ্যত্ব,—পরিণতিতেও শিষ্যত্ব। বঙ্কুবিহারী সুগায়ক ছিলেন,তিনি তাঁহার "সঙ্গীত-সঙ্কীর্ত্তন"অন্যকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য গীত হইত না,—তিনি উদ্বুদ্ধ হইবেন, নিজে সম্ভোগ করিবেন, এই জন্যই প্রাণ ভরিয়া গাহিতেন। যে সকল গান অন্যকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য রচিত, তাহা তিনি প্রায়ই গাহিতেন না,—সম্ভোগের চরম অবস্থায় যাহা গাওয়া যায়, তাহাই তিনি গাইতেন। গানের সময় ভাবে তিনি বিভোর হইয়া যাইতেন,নয়নে অশ্রু ঝরিত,তেমন স্বরসম্পদ না থাকিলেও, তিনি অন্যকে আপনার সাধনায় আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন,—লোকেরা বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার গানে ফুটিয়া বাহির হইত তাঁহার সমগ্র হৃদয়খানি, যাহা সদা নিভৃতে লুক্কায়িত থাকিত। সে হৃদয়খানি যোগীজনোচিত সাধনা-পূত চরিত্রের খনি;—তাহাতে চঞ্চলতা ছিল না, গভীরতা ছিল; তাহাতে আসক্তি ছিল না, বৈরাগ্য ছিল। তিনি গাহিতেন, বৈরাগ্যের গান;—মজিতেন অনাসক্তির অতলে। ৫৪ বৎসরের অর্জ্জিত সে চরিত্র সংসারের অতীত এমন কোন জিনিস, ভাষায় যাহা ব্যক্ত হয় না, কথায় যাহা নিবদ্ধ হইবার নয়।

কৈলাসচন্দ্র বাগচী। আর একজনের কথা বলা হইলেই অদ্যকার কাহিনী শেষ হয়। তিনি চারিজনেরই বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রস্থানও করিলেন সকলের অগ্রে;—আর বুঝিবা—সর্ব্বাংশেই সকলের শ্রেষ্ঠ। যোগেন্দ্রনাথ জ্ঞানযোগী—কত সুন্দর২ প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কত কি করিয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সেবাযোগী—তিনিও কত দরিদ্রের অভাব মোচন করিয়াছিলেন, কত কি করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কুবিহারী গায়ক ছিলেন,—তিনিও কতরূপে কত জনের উপকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কৈলাসচন্দ্র জ্ঞানযোগীও নহেন, সেবাযোগীও নহেন, গায়কও নহেন,—তিনি কেবল নীরব সাধক। তাঁহাতে যেন সকল প্রকার সাধনার সমাধি হইয়াছিল। তিনি যে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন,তাহার কোনই বহিঃপ্রকাশ ছিল না—কিন্তু তাঁহার সন্তানগণে তাহা প্রতিফলিত। ঘোর দারিদ্র্যেও তিনি নির্ব্বিকার-চিত্ত, ঘোর অত্যাচারেও তিনি অবিচলিত,তিনি সংসারের সর্ব্ববিধ দোষ ত্রুটীর যেন জীবন্ত প্রতিবাদ—তিনি চিরদিন অজাত-শত্রু। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর অন্যায় ব্যবহারে দরিদ্র কৈলাসচন্দ্রের সামান্য যে চাকুরী সম্বল ছিল, তাহাও যখন গেল, তিনি তখন নিশ্চিন্ত হইলেন:—বলিলেন—"সব কাড়িয়া লইয়া বিধাতা বেশ করিলেন।" এরূপ না হইলে তিনি উদাসীন যোগী হইতে পারিতেন কি? ঘোর দারিদ্র্য মহাসাধককে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিতেছে,—কিন্তু তিনি নির্ব্বিকারচিত্ত,—বিরূপ বা বৈলক্ষণ্য, বিক্ষোভ বা বিতৃষ্ণা কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না। দারুণ ঝটিকা-তাড়িত জাহাজ অবিলচিত-গতিতে লক্ষ্য পথে চলিয়াছে—কিছুতেই বিচ্যুতি নাই। সাধক ত মহা সাধক;—জ্ঞানী ত মহাজ্ঞানী, সেবক ত মহা সেবক, গায়ক ত মহা গায়ক। তাঁহাতে কি ছিল না?—জ্ঞান ছিল, প্রেম ছিল, সেবা ছিল, পূজা ছিল, উৎসর্গ ছিল—নিষ্ঠা ছিল—বিশ্বাস ছিল, ভক্তি ছিল, সব মিলিয়া জমিয়া উঠিয়াছিল—একটী নীরব জীবন, যাহার তুলনা এ সংসারে বড়ই বিরল। কৈলাসচন্দ্রকে পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছিল, ভগবদ্ভক্তি। তিনি আপনা-হারা, সংসার-হারা;—চির উদাসীন,—অজপায় সিদ্ধ অদেহী মহাযোগী। কৈলাসচন্দ্রকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই ধন্য হইয়াছেন। মনে হয়, যোগেন্দ্রনাথ, গঙ্গাগোবিন্দ এবং বঙ্কুবিহারী—এই তিন কৈলাসচন্দ্রে জমিয়া পূর্ণ যোগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই পূর্ণ যোগে ব্রাহ্মসমাজ ধন্য হইয়াছে—বঙ্গপ্রদেশ কৃতার্থ হইয়াছে। সকলে প্রার্থনা করুন, এইরূপ পূর্ণাঙ্গ জীবন ঘরে ঘরে প্রকটিত হউক।

ঢাকার বিবরণ।

শাসন, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ।

ঢাকার ১৫।১৬ মাইল পূর্ব্ব দিকে সোণারগাঁও অবস্থিত। মুসলমান শাসন কালে সোণারগাঁও একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত থাকিতেন। তিনিই এতৎপ্রদেশ শাসন করিতেন।

এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে কাজি ও কাননগুদিগের কার্য্যালয় ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এতৎ প্রদেশে দ্বাদশ ভৌমিকের প্রভুত্ব বিস্তৃত এবং কিছু দিন তাহাদের হস্তেই দেশ শাসিত হয়।

১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা নগরী স্থাপিত হইলে, এই স্থানে বাঙ্গালার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানীতে যথারীতি বিচার, শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কার্য্য চলিতে থাকে। মফস্বলের বিচার ও শাসন ক্ষমতা তখনও কাজিদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কাননগু জমা জমির বিচার করিতেন। কেন্দ্রে কেন্দ্রে ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরগণার জমিদারগণও নিজ নিজ "এলাকার" বিচার করিতেন। রাজস্বের জন্য জমিদারগণ দায়ী ছিলেন। পরগণার জমিদারগণের রাজস্ব প্রদানের ক্রটীর বিচার রাজধানীতে হইত। রাজস্ব প্রদানের ক্রটী ব্যতীত জমিদারদিগের অন্য কোন বিষয়ের ক্রটী, ক্রটী বলিয়াই গণ্য হইত না। ক্ষমতাবান জমিদারেরা রীতিমত রাজস্ব প্রদান করিলে "সাতখুন মাপ" পাইতেন। এরূপ অবস্থায় প্রজা-সাধারণ যমযাতনা ভোগ করিত।

ঢাকা হইতে বিভিন্ন সময় রাজধানী রাজমহল (১) ও মুসিদাবাদে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ঐ ঐ সময় ঢাকায় নায়েব নাজিমের কার্য্যালয় থাকিত; সুতরাং বিচার, শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কার্য্য যথারীতি পূর্ব্ববৎ পরিচালিত হইত।

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে এ জেলার শাসন প্রণা কতকটা পরিবর্ত্তন হয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করিয়া ঢাকায় হুজুরি ও নিজামত বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন। হুজুরি বিভাগ মুর্শিদাবাদের দেওয়ান রেজা খাঁর অধীন থাকে। ঢাকায় উক্ত বিভাগের কার্য্য পরিচালন জন্য একজন ডেপুটী দেওয়ান নিযুক্ত হন। ঢাকার ডেপুটী দেওয়ান কেবল এতৎ প্রদেশের রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব সংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা করিতেন। নিজামতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার হইত। নিজামতের নিজ খরচ ও কর্ম্মচারীগণের বেতন ইত্যাদির জন্য নিজামত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ভূমিকরও গ্রহণ করিতেন।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হুজুরি ও নিজামত, এই উভয় বিভাগের তত্ত্বাবধান জন্য একজন রাজস্ব-পরিদর্শক (Revenue Superviser) নিযুক্ত হন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত রাজস্ব-পরিদর্শকই কালেক্টর নামে অভিহিত হন। ঐ সনে কোম্পানী রেজাখাঁর নিকট হইতে দেওয়ানী বিভাগের কার্য্য হস্তান্তরিত করিয়া ঢাকায় এক দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত করেন। কালেক্টর দেওয়ানী আদালতের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হন।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী আদালতের কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য নায়েবের পদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্ত্রী সভা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির বিচার (আপিল) করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রী সভা

(১) সুলতান সুজা ঢাকা হইতে রাজধানী রাজমহলে পরিবর্ত্তন করেন। মীরজুম্লা পুনরায় রাজধানী ঢাকায় আনয়ন করেন, অতঃপর মুর্শিদকুলি খাঁ তাহা মুর্শিদাবাদে স্থাপন করেন।

উঠিয়া গিয়া নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। এবং ঢাকা কালেক্টরী ও দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকার কালেক্টর "চিফ" নামে অভিহিত হন।

মিঃ ডে, ঢাকায় প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টর এবং মিঃ ডানকেনসন প্রথম জজ নিযুক্ত হন।

এই সময় ঢাকা জেলার আয়তন ১৫৩৯৭ বর্গ মাইল ছিল। ক্রমে ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান ঢাকা কলেক্টরী হইতে পৃথক হইয়া যায়। অতঃপর ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর * ও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাকরগঞ্জ ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে ঢাকার কলেবর ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে।

ক্রমে শাসন-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে পুলিশ ষ্টেসন (থানা) আউটপোষ্ট (ফাঁড়ি থানা) চৌকী প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে রেভিনিউ কমিশনারের কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথম প্রথম রেভেনিউ কমিশনার, কমিশনার অব সার্কিট (Commissioner of Circuit) নামে অভিহিত ছিলেন। পূর্ব্বে কাছাড় এবং শ্রীহট্ট জেলাও ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অতঃপর মহকুমা বিভাগ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুন্সিগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হইয়া জেলার শাসন কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মাণিকগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। ঐ সময় মাণিকগঞ্জ মহকুমা ফরিদপুরের অধীন এবং মাদারিপুরের কতক অংশ ও আটীয়া থানা ঢাকা জেলার অধীন ছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মাণিকগঞ্জ মহকুমা ও নবাবগঞ্জ থানার কতক অংশ ফরিদপুর জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আটীয়া থানা ঢাকা জেলা হইতে ময়মনসিংহ জেলায় পরিবর্ত্তিত হয়।

১৮৬৬—৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলার কোন্ কোন্ স্থানে মহকুমা, চৌকী, থানা, ফাঁড়ি থানা ছিল, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

মহকুমা	চৌকী
ঢাকা সদর	সদর, পলাস
থানা	ফাঁড়ি থানা
ঢাকা	ফরিদাবাদ, লালবাগ, টঙ্গী
কাপাসিয়া	
রায়পুরা	নরসিংদি
রূপগঞ্জ	
সাভার	
নবাবগঞ্জ	

মহকুমা	চৌকী
মুন্সিগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
	বহর
থানা	ফাঁড়ি থানা
নারায়ণগঞ্জ	বৈদ্যেরবাজার, রোহিতপুর
রাজাবাড়ী	মুন্সিগঞ্জ
শ্রীনগর	—

মহকুমা	চৌকী
মাণিকগঞ্জ	মাণিকগঞ্জ
	লেছরাগঞ্জ
থানা	ফাঁড়ি থানা
মাণিকগঞ্জ	বালিয়াটী
জাফরগঞ্জ	—
হরিরামপুর	—

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া বিক্রমপুর পরগণার অর্দ্ধাংশ ঢাকা জেলা হইতে পৃথক হইয়া যায়।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুনের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনা অনুসারে ঐ সনের ১লা আগষ্ট হইতে বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগ সহ ৪৫৮ খানা গ্রাম বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১

* ফরিদপুর বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন কালেকটরী হইলেও ফরিদপুরের দেওয়ানী আদালত তখনও ঢাকাতেই স্থাপিত ছিল।

(১) এই গ্রাম গুলি মুলফতগঞ্জ থানার অধীন ছিল। ১৮৬৬ সনের পূর্ব্বেই মুলফতগঞ্জ থানার শাসন সংক্রান্ত কার্য্য বাখরগঞ্জ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে ন্যস্ত করা হইলেও কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। ঐ থানার অধিবাসীগণ এই পরিবর্ত্তনে আপত্তি উত্থাপন করিলে এতকাল ঐ পরিবর্ত্তন স্থগিত থাকে। মুলফতগঞ্জ থানা সহ মাদারিপুর মহকুমা ১৮৭৪ সনে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা দ্বয় ঢাকা বিভাগ হইতে পরিত্যক্ত হয়। এবং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ ত্রিপুরা জেলা ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরাও ঢাকা বিভাগ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হইয়া জেলার কার্য্যভার চারি ভাগে বিভক্ত হয়।

বর্ত্তমান সময় ঐ জেলায় চারিটী মহকুমা, ৪টী চৌকী ১২টী থানা, ৫টী ফাঁড়ি থানা ও ১৩টী সব রেজেষ্টরী কার্য্যালয় স্থাপিত আছে।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

ভট্টিকাব্য ও তাহার কবি।

"দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোহয়ং শব্দলক্ষণ চক্ষুষাম্।
হস্তামর্ষ ইবান্ধানাং ভবেৎ ব্যাকরণাদৃতে॥"
ভট্টিকাব্য দ্বাবিংশ সর্গ। ৩৩ শ্লোক।

ভট্টিকাব্য সাহিত্য জগতে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি; কাব্য ভাণ্ডারের অতুলনীয় রত্ন। উক্ত মহাকাব্য ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা অবলম্বন করিয়া লিখিত। রাবণ বধ পর্য্যন্ত দ্বাবিংশ সর্গে উক্ত গ্রন্থ খানি গ্রথিত। এমন সংস্কৃতাধ্যায়ী অধ্যাপক বা ছাত্র শিক্ষিত সমাজে কম আছেন, যাঁহারা ভট্টিকাব্যের কাছে ঋণী নহেন। ভট্টি কাব্যের অধ্যয়নে, ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে বলিয়া, প্রত্যেক সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্র ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ভট্টিকাব্য অধ্যয়ন করেন। উক্ত কাব্যের শ্লোকগুলি বড়ই নিকটান্বয়। কাজেই ব্যাকরণাধ্যায়ী বালকের পক্ষে কিছু সহজগম্য। কিন্তু ইহার শব্দগুলি বড়ই কর্ক্কশ ও কঠোর। এই সরলান্বয়ের সঙ্গে শব্দ-কাঠিন্যই উক্ত কাব্যের বিশেষত্ব। ভট্টিকাব্যে, বালককে মধুর সহিত কুইনাইন খাওয়ানের ন্যায়, কাব্যের সুললিত রসের সহিত ব্যাকরণের কঠোর রসকে বালকদের পান করান হইয়াছে। ভট্টিকাব্যের মহত্ত্বই এইটুকু। সত্য সত্যই ভট্টিকাব্যখানি যেন ব্যাকরণের দ্বিতীয় অবতার। কবি সত্যই বলিয়াছেন;—

"দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোহয়ং শব্দলক্ষণ চক্ষুষাম্।
হস্তামর্ষ ইবান্ধানাং ভবেৎ ব্যাকরণাদৃতে॥"

অর্থাৎ যেমন অন্ধ ব্যক্তিদিগের হস্ত স্পর্শে ঘটপটাদির জ্ঞান হয়, তদ্রূপ ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ না করিয়াও উক্ত কাব্য অধ্যয়ন করিয়াই ছাত্রবর্গ পদার্থ বোধে ও শব্দাদি যোজনায় সমর্থ হয়। বাস্তবিক, ব্যাকরণের সঙ্গে কাব্যের এমন সুন্দর সম্মিলন, এমন সমবায়-সম্বন্ধ বুঝি আর কোথাও দেখিতে পাইব না।

উক্ত কাব্যে, কবির কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য, উভয়েরই পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই! এক দ্বিতীয় সর্গ ও একাদশ সর্গেই কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেই দ্বিতীয় সর্গে আবার—

"প্রভাত-বাতাহতিকম্পিতা কৃতিঃ
কমুদ্বতীরেণুপিশাঙ্গ বিগ্রহম্।
নিরাস ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী
ন মানিনীশ্চং সহতেহন্য সঙ্গমম্॥"

এবং—

"নতজ্জলং যন্ন সুচারু পঙ্কজং
ন পঙ্কজং তত্ যত্লীণ ষঠপদং।
ন ষট্পদোহসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ ফলং
ন গুঞ্জিতং তন্ন জহার যন্মনঃ॥"

এই শ্লোক দুইটী কবির কবিত্বের চরমোৎকর্ষ। নবম সর্গে ণত্ব ও ষত্বের দৃষ্টান্ত এবং দশমে অলঙ্কার শাস্ত্রীয় শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার সমস্ত উদাহরণগুলি একত্র সন্নিবিষ্ট আছে। তারপর ত্রয়োদশ সর্গ হইতে দ্বাবিংশ সর্গ পর্য্যন্ত কবির আখ্যাতের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্যই বলিতেছিলাম, কাব্যখানিতে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য, উভয়ের যুগপৎ সমাবেশ হওয়ায়,

ভট্টিকাব্য সাহিত্য জগতের অতুলনীয় শিল্প হইয়া পড়িয়াছে।

এখন এই অতুলনীয় শিল্পের শিল্পী কে? এই অপূর্ব্ব কাব্যের প্রকৃত কবি কে?

আজ অনেক দিন হইতেই এই ভট্টিকাব্যের কবি সম্বন্ধে মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় বার আনা লোকের বিশ্বাস যে, ভট্টিকাব্য কবি ভর্ত্তৃহরি প্রণীত। অবশিষ্ট চার আনা লোকের মতও ভিন্ন ভিন্ন। এই কাব্যের প্রামাণিক টীকাকার দুইজন। একজন জয়মঙ্গল, অপর ভরত মল্লিক।

পণ্ডিত শিরোমণি ভরতমল্লিকের মতে ভট্টিকাব্য কবি ভর্ত্তৃহরি প্রণীত। যথা তাঁহার টীকার ভূমিকায় "ভর্ত্তৃহরির্নাম কবিঃ শ্রীরাম কথাশ্রয়ং মহাকাব্যং চকার।" প্রাচীন টীকাকার জয়মঙ্গল বলেন;—"কবির্ভট্টিনামা রাম কথাশ্রয়মহাকাব্যং চকার।" উপরি উক্ত ভরত মল্লিকের মতকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া, বঙ্গের "জীবনীকোষ"-প্রণেতা প্রভৃতি মনস্বিগণ, কবি ভর্ত্তৃহরিকেই ভট্টিকাব্যের কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিকের মতের প্রতিপোষক প্রমাণ কিছুই পাই না। এবং বিপরীত পক্ষে তর্ক করিয়া ভরত মল্লিকের মতকে খণ্ডন করা যাইতে পারে। কাব্যকর্ত্তা কাব্যের শেষে একটী মাত্র শ্লোকের দ্বারা আপনার যাহা পরিচয় দিয়াছেন, সেই শ্লোকের দ্বারাই ভরত মল্লিকের মত একেবারে অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে। সেই শ্লোকটী এই, যথা,—

"কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধর সূনুনরেন্দ্র পালিতায়াং॥" অর্থাৎ—

"আমি শ্রীধরপুত্র নরেন্দ্ররাজার রাজধানী বলভী নগরীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম।"

"ভক্তমাল" রচয়িতা ভট্টিকাব্যের সেই শেষ শ্লোকে "শ্রীধরসূনু" এই শব্দটী দেখা মাত্রেই উহার প্রকৃত অর্থ বা অন্বয় না বুঝিয়াই, বোধ হয়, কাব্যকর্ত্তাকে প্রসিদ্ধ শ্রীধর স্বামীর পুত্র বলিয়া অনুমান করিয়া থাকিবেন। যথা—"ভক্তমালে" শ্রীধর স্বামীর চরিতাখ্যানে—

"জয় জয় শ্রীধর স্বামী ভুবনপাবন।
ভাগবত উপদেশে তারে জগজন॥
* * *
গৃহে এক মাত্র স্ত্রী পূর্ণ গর্ভবতী।
ত্যজিয়া যাইতে বন হৈল দৃঢ়মতি॥
হেন কালে নাড়ী পুত্র প্রসব করিয়া।
কাল প্রাপ্ত হৈল তার বালক রাখিয়া॥
সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে।
চিন্তয়ে বালক এই কেবা রক্ষা করে॥
* * *
এতেক ভাবিয়া ত্যজি গমন করিল।
অনাথ বালক গ্রাম্য লোকেতে পালিল॥
সেই শিশুকালে মহা পণ্ডিত হৈলা।
"ভট্টি" নামে রামলীলা সাহিত্য বর্ণিলা॥"

"ভক্তমাল" রচয়িতার বিরুদ্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, যাহার সামান্য মাত্র অন্বয় বোধ আছে, সেও "কাব্যমিদং" ইত্যাদি শ্লোক দেখিয়া কখনই শ্রীধর স্বামীর পুত্রকে "ভট্টি" কাব্যের কবি বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

সম্প্রতি ভরত মল্লিকের বিপরীত পক্ষে তর্ক এই যে;—কাব্যকর্ত্তা স্বয়ং লিখিয়াছেন, "আমি বলভীপতি নরেন্দ্ররাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম।" এ কথা কি কখন ভর্ত্তৃহরির উক্তিতে সম্ভব? ভর্ত্তৃহরি স্বয়ং রাজা হইয়া অপরের রাজধানীতে থাকিয়া গ্রন্থ রচনা করিবেন, একথা বাতুল ভিন্ন অপরে কেহ বিশ্বাস করিবে না। ভর্ত্তৃহরি শেষে বিরাগী হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। সন্ন্যাস অবস্থায় রাজবাড়ীতে থাকিয়া কাব্য রচনা করিবেন, একথাও বিশ্বাসযোগ্য নহে।

ভর্ত্তৃহরি একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন; এবং কবি বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার "নীতিশতক" "শৃঙ্গারশতক" "বৈরাগ্যশতক" প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা তাঁহার নাম ধাম দেখিতে পাই। "ভট্টিকাব্যে" তাঁহার নামের গন্ধও নাই। পণ্ডিত-কুলপতি ভরত মল্লিকের কথা যেখানে অপ্রমাণ হইল, সে স্থলে এই ভট্টিকাব্যের প্রণেতা, কে?

আমাদের প্রাচীন প্রামাণিক টীকাকার জয়মঙ্গল বলেন;—ভট্টিকাব্য ভট্টি নামক

কবির বিরচিত। যথা তাঁহার কৃত টীকার ভূমিকায় "কবি ভট্টি নামা রাম কথাশ্রয় মহা-কাব্যং চকার।" "ভট্টিকাব্য" নাম দ্বারাও আমাদের ইহা বিশ্বাস হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত "কাব্যমিদং বিহিতং" ইত্যাদি শ্লোকের টীকার শেষে জয়মঙ্গল লিখিয়াছেন;—"ইতি বলভীবাস্তব্যস্য ভট্ট মহাব্রাহ্মণস্য মহাবৈয়াকরণস্য কৃতৌ" ইত্যাদি। এই টীকা অনুসারেও উক্ত কাব্য ভট্টি নামক কবির কৃত বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। এই "ভট্ট মহাব্রাহ্মণ" বোধ হয়, আমরা যাহাকে "ভাট ব্রাহ্মণ" বলি, তাহাই।

এদিকে পুরাবৃত্ত পাঠে প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যাইতেছে যে,—তথাকার রাজারাও, সেই সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেন। অতএব ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, উক্ত কাব্যকর্ত্তা ঐ রাজধানীতে বাস করিয়া ঐ রাজবংশের বীজপুরুষ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। এবং প্রাচীন প্রামাণিক টীকাকার জয়মঙ্গলের মতানুসারে উক্ত কবির নামই "ভট্টি।" কবি নিজের নামে কাব্যের নাম রাখিয়াছেন, "ভট্টিকাব্য।" কবির নামে কাব্যের নাম আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই; "যথা "মাঘ" "ভারবি।"

নবদ্বীপের পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকটে প্রাচীন তাম্রশাসন আছে। তাহাতেও "শ্রীধরসূনু নরেন্দ্র পালিত বলভী নগরীর কথা লিখিত আছে। এবং সেই বলভী বাস্তব্য ভট্টিকাব্যের কবি 'ভট্টি' নামেরও উল্লেখ লিখিত আছে। তাহা হইলে, ভট্টিকাব্যের কাল প্রায় ১১০০ বৎসরের অধিক।

পাঠক, যত দিন পর্য্যন্ত বিপরীত পক্ষের কোন প্রতিকূল তর্ক প্রাচীন টীকাকার জয়মঙ্গলের মতকে নিরাকরণ না করিয়াছে, তত দিন পর্য্যন্ত আমরা জয়মঙ্গলের ভট্ট মহা ব্রাহ্মণ মহাবৈয়াকরণ 'ভট্টি' কবিকেই ভট্টিকাব্যের কবি বলিয়া স্বীকার করিব।

শ্রীগৌরগোপাল সেন।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৫। ধূলি। কোষ-কাব্য—শ্রীললিতমোহন দত্ত বিরচিত। মূল্য ॥০। ২১ পৃষ্ঠাব্যাপী অতি ক্ষুদ্র পুস্তক,—সুতরাং মূল্য বড় অধিক ধরা হইয়াছে। বিলাতী কাগজে ছাপা। কিন্তু কবিতা কয়টী সুন্দর হইয়াছে।

১৬। ভারতীয় বিদুষী। শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত, মূল্য ॥৵০। ৩৪টী ভারতীয় বিদুষীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তকে সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। মণিলাল বাবুর এইরূপ চেষ্টার জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত।

১৭। Lessons from the Koran, Published by the Reform Publishing Society, মূল্য ৸০। কোরাণের যাবতীয় উপদেশ সংক্ষেপে সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে। অল্প সময়ে অনেক অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়।

১৮। A Dying Race, by U. N. Mukherjee, Price As 4. এই সুচিন্তিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা গ্রন্থকারের নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ হইলাম। কিরূপে বঙ্গের হিন্দুজাতি তীব্রগতিতে বিনাশের পথে ধাবিত হইতেছে, অতি বিজ্ঞতা সহকারে গ্রন্থকার তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের লোক গণনায় বঙ্গে ১৭১ লক্ষ হিন্দু ও ১৬৭ লক্ষ মুসলমান ছিল। অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান অপেক্ষা ৪½ লক্ষ অধিক ছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের লোক গণনায় হিন্দু সংখ্যা ১৭১ হইতে ১৭২½ লক্ষ হয়। মুসলমান ১৬৭ লক্ষ হইতে ১৭৯ লক্ষ হয়। অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান হইতে ৬ লক্ষ কম হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের লোক গণনায়—মুসলমান সংখ্যা ১৭৯ হইতে ১৯৬ লক্ষ হয়, হিন্দুসংখ্যা ১৮১ লক্ষ হয়। হিন্দু হইতে মুসলমান সংখ্যা ১৫ লক্ষ অধিক হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের লোক

গণনায় মুসলমান সংখ্যা ১৯৬ লক্ষ হইতে ২২০ লক্ষ হয়, হিন্দুসংখ্যা ১৯৪ লক্ষ হয়। অর্থাৎ ৩০ বৎসরের মধ্যে যে মুসলমান সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা ৪ লক্ষ কম ছিল, তাহা হিন্দু সংখ্যা হইতে ২৫ লক্ষ অধিক হয়। এই সব কথা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় একবার অতি সুন্দর রূপে নব্যভারতে আলোচনা করিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টীর আলোচনা করিয়া দেশের এক মহৎ কাজ করিয়াছেন। সকলেরই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত। স্বদেশী কাগজে সুন্দররূপে মুদ্রিত—মূল্য অতি সুলভ। ঘরে ঘরে এই পুস্তকের আদর হউক।

১৯। সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ। শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত, বিনা মূল্যে বিতরণীয়। সুচিন্তিত প্রবন্ধ। সব মতের সহিত ঐক্য হইতে না পারিয়া থাকিলেও, এ পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি।

২০। Modern India by Swami Bebekananda, মূল্য ।০। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের উদ্বোধনে প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবাদ। বিবেকানন্দের সমস্ত লেখা ব্যাপিয়া যে প্রতিভার স্ফুরণ রহিয়াছে, এই পুস্তকে তাহার অভাব নাই। "But, gradually, the idea is being formed in the minds of the English public, that the passing away of the Indian Empire from their sway will end in imminent peril to the English nation, and be their ruin. So, by any means whatsoever, the supremacy of England must be maintained in India. * * * Therefore, when such remarkable traits of character are still predominant in the English as a nation, it is utterly useless to spend so much energy and power for the mere preservation of meaningless "prestige." If that power were employed for the welfare of the subject-people, that would certainly have been a great gain for both the ruling and the ruled races." বিবেকানন্দের প্রতি কথায় স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি নানাপ্রকার সুচিন্তিত কথায় পূর্ণ।

২১। রাজকাহিনী—মেবার। প্রথম খণ্ড। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৸০। শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পাদিত্য ও পদ্মিনীর কাহিনী বিবৃত। ভাষা প্রাঞ্জল। স্বদেশানুরাগের এই অপূর্ব্ব কাহিনী, আশা করি, সকলে পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

২২। সনাতন সাধন তত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য,—শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত। গ্রন্থকার সর্ব্ব প্রথমে "আদ্যাশক্তি শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালিকার" এক একখানি ছবি দিয়াছেন। পুরী ধামের শ্রীমন্দিরের যে সকল কুৎসিত চিত্র দর্শন করিয়া দর্শকগণ চক্ষু অবনত করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, দক্ষিণা-কালিকা-চিত্রও সেই জাতীয়। কালিকা-তন্ত্র হইতে দক্ষিণা কালিকার ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার সেই কুৎসিত ভাবটীকে আরো প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। কালিকা তন্ত্র যে অতি আধুনিক গ্রন্থ, তাহার রচনা প্রণালী, কবিত্ব, শব্দ বিন্যাসই তাহার প্রমাণ। আমরা একথা অসঙ্কোচ বলিতে বাধ্য যে, যিনি মাতৃ মূর্ত্তিতে ঐন্দ্রিয়িক অভিনয় আনয়ন করিতে পারেন, সেই তন্ত্র-রচয়িতা ভক্ত নহেন, কবিও নহেন।

লেখক সনাতন সাধন-তত্ত্ব বলিতে তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালী বুঝিয়াছেন এবং যাঁহারা লেখকের সহিত এক মত নহেন, তাঁহারা ইংরাজি-শিক্ষিত ও ভ্রান্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় যে, ভারতবর্ষীয় যাজ্ঞবল্ক্য-প্রমুখ ঋষিবৃন্দ, বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি ধর্ম্ম-গুরুগণ, নানক, চৈতন্য, কবির প্রভৃতি সাধকগণ, কেহই তন্ত্রের নাম উল্লেখ করেন নাই। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিলোপ সময়ে অধঃপতনের অবস্থায় তান্ত্রিক আচারের জন্ম হয়। তান্ত্রিক সাধন অতি আধুনিক। লেখক পতঞ্জলির যোগ শাস্ত্রের তান্ত্রিক সাধনায় ভিত্তি স্থাপন করিতে চাহেন। যাঁহারা পাতঞ্জল দর্শন বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, "পতঞ্জলি প্রদর্শিত যোগ অর্থে সংযোগ নহে—বরং বিয়োগ বা উদ্যোগ। ভোজ বৃত্তিতে উক্ত হইয়াছে—'প্রকৃতি পুরুষের যে বিয়োগ বা বিবেক (পার্থক্য জ্ঞান) পাতঞ্জল শাস্ত্রে তাহাকেই যোগ বলে।' * * "পাতঞ্জল শাস্ত্রে যোগ

শব্দে ঈশ্বরের সহিত জীবের সংযোগ বুঝায় না; কিন্তু চিত্ত নিরোধের উদ্যোগ বা ব্যাপার মাত্র বুঝায়।" এই পতঞ্জলি হইলেন 'সনাতন যোগের' গুরু?

গ্রন্থকার পঞ্চ-মকারের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং যুক্তি কোথায়? তিনি পঞ্চ-মকারকে সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নিবৃত্তি করিবার ব্যবস্থাই পঞ্চ-মকারের তামসিক সাধনা।" পঞ্চ-মকারের জঘন্য পথে—প্রবৃত্তির পাপময় পথে চলিতে চলিতে নিবৃত্তির উদয় হইবে ভাবিয়া এই পন্থার প্রশ্রয় দেওয়াও কি অন্যায় নহে? যাহা পাপ, তাহা পরিত্যাগের আয়োজনেই ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। নিবৃত্তিতেই ধর্ম্মের জন্ম।

গ্রন্থকার জাতিভেদের সমর্থন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "এই ভাবে জাতিগত, সমাজগত সেবাই আর্য্যের নিম্নস্তর নির্দ্দিষ্ট শূদ্রত্ব। ইহার উপরে বৈশ্যত্ব।" * "সাধক মাত্রের বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করাই ব্যক্তিগত বৈশ্যত্ব বা বৈষ্ণবত্ব।" ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন এই, এইরূপ গুণগত বৈশ্যত্ব, শূদ্রত্ব, ব্রাহ্মণত্ব ইত্যাদি ভাব হিন্দু ভারতে কোথায়? একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণের—ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণের পাঁচটী পুত্র। সেই পাঁচটী পুত্র পাঁচ প্রকার গুণবিশিষ্ট হইতে পারে; কিন্তু সমাজে তাহারা ত সকলেই ব্রাহ্মণ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষার জন্য লেখক যে সকল কথা বলিয়াছেন, তিনি স্বয়ংই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। যে ডালে বসিয়াছেন, সেই ডাল কাটিয়াছেন। তন্ময়ত্ব সম্বন্ধেও লেখক "স্ববিরোধ দোষে" জড়িত হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—"তখন সংসারের যে দিকে যাহা কিছু দেখেন, তাহাতেই তাঁহার ধ্যেয় দেবতার পূর্ণ বিকাশ পরিদর্শন করেন। তখন তাঁহার বিদ্যদৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়া জলে স্থলে, অনলে অনিলে মহামায়ার অনাদি ও অনন্ত সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের তত্ত্ব দেদীপ্যমান প্রত্যক্ষ করেন, আর সেই বিশ্ব প্রকৃতি মধ্যেই বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্ব প্রকৃতির লীলা রহস্য দেখিতে দেখিতে সাধক প্রকৃতিময় বা আত্মহারা হইয়া যান।" লেখক এবম্বিধ তন্ময়ত্বের লক্ষণও বর্ণনা করিয়াছেন;—"তাঁহার ভাবে যিনি যতদূর আত্মহারা হইয়াছেন, তিনি তাঁহাতে ততদূর তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সত্তাসাগরে আমার আত্ম অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে ডুবাইয়া দেওয়াই, আমার তন্ময়ত্ব।"

যাঁহার চিত্ত তন্ময় হইবে, তাঁহার স্বরূপ কি? লেখক চণ্ডী হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"জড় ও অজড়,চেতন ও অচেতন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল তত্ত্বের মধ্যেই গুপ্ত ও ব্যক্ত ভাবে অবস্থিতা শক্তিরূপিনী দেবীকে আমরা বার বার প্রণাম করি।" * * "যিনি সর্ব্ব ভূতে চেতনা হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পদে বার বার প্রণাম করি।" লেখক আরও অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত সেই অমর অমৃত মন্ত্রটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"হে প্রভো, আপনি রূপবিহীন হইলেও আমি আপনার ধ্যান রচনা করিয়া রূপবিশিষ্ট রূপে বর্ণনা করিয়াছি, আপনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও আমি মানবগণকে তীর্থ যাত্রার উপদেশ দিয়া আপনার সর্ব্বব্যাপকতার অপলাপ করিয়াছি, আর আপনি অবাঙ্মনসোগোচর হইলেও আপনার গুণ রচনা করিয়াছি —অতএব হে অখিলগুরো, আমার বিকলতারূপ এই দোষত্রয় নিজ গুণে ক্ষমা করুন।" লেখক এই অমূর্ত্ত চিন্ময় তত্ত্ব, ঈশ্বরের গুণ চিন্তা, তাঁহাতে তন্ময়ত্ব ইত্যাদি কথা উত্থাপিত করিয়া নিজেই মূর্ত্তি-পূজা, মূর্ত্তি-ধ্যানের কি প্রতিবাদ করেন নাই? তিনি স্বীয় মতসমর্থনের জন্য এবম্বিধ যে সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা 'স্ববিরোধী" নহে কি? লেখক বারম্বার এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে, গুরুর কৃপা, গুরুর উপদেশ, গুরুর সাহায্য ব্যতীত সাধন তত্ত্ব কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। এই রূপ হইলে পুস্তক প্রণয়নেরইবা কি প্রয়োজন ছিল?

প্রথম অধ্যায় ।

১৯। (অতএব) নিত্য শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পুরুষের সেই (প্রকৃতি) সংযোগ ব্যতীত সে দুঃখযোগ (বা বন্ধন) হয় না।

সেই সংযোগ = অবিবেক। অবিবেক হেতু বন্ধন অভিমান হয়। (অনিঃ)

অগ্নিসংযোগে যেমন জলের উষ্ণতা, সেইরূপ সংযোগবিশেষ হইতে আত্মার বন্ধন উপাধি হয়। এই সংযোগে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নাই। প্রকৃতি নিজে পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না। পুরুষ অবিবেক বশতঃ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত বোধ করে। এই সংযোগ হইলে, তবে প্রকৃতি পুরুষকে বদ্ধ করে। প্রসঙ্গক্রমে এই সূত্রে সাংখ্য দর্শনের সিদ্ধান্ত ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (বিঃ ভিঃ)।

এই সংযোগ = প্রকৃতিপুরুষ যোগ। প্রকৃতিসংযোগেই পুরুষ বদ্ধ হয়। যখন সংযোগ থাকে না, তখন বন্ধনও থাকে না। এইজন্য বন্ধন ঔপাধিক—স্বাভাবিক নহে। স্মৃতিতে আছে—

যথা জলদগৃহাশ্লিষ্টগৃহং বিচ্ছিন্ন রক্ষ্যতে।
তথা সদোষ প্রকৃতি বিচ্ছিন্নোয়ং ন শোচতি॥

বৈশেষিকদিগের মতে, পুরুষের দুঃখযোগ পারমার্থিক। তাহা ভ্রম। যেমন স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ মণি—জবাদির সংযোগ ব্যতীত রঞ্জিত হয় না, তেমনই নিত্যমুক্ত পুরুষে উপাধি-সংযোগ হেতু দুঃখ ব্যতীত স্বাভাবিক দুঃখাদির সম্ভব নাই।

"যথা হি কেবলো রক্তঃ স্ফটিকো লক্ষ্যতে জনৈঃ।
রঞ্জকাদ্যপধানেন তদ্বৎ পরম পুরুষঃ॥"
ইতি সৌরপুরাণ।

নিত্য = কালাদি অনবচ্ছিন্ন।
নিত্য শুদ্ধ = সদা পাপ শূন্য।
নিত্য বুদ্ধ = অলুপ্ত চিদ্রূপত্ব।
নিত্যমুক্ত = সদা পারমার্থিক দুঃখযোগ বিহীন। পুরুষে দুঃখযোগ প্রতিবিম্বরূপ, ইহাই বন্ধন। ইহা পারমার্থিক নহে।

আত্মা নিত্য ও বিভু, ইহা ন্যায়দর্শনেরও সিদ্ধান্ত। ন্যায় মতেও অন্তঃকরণ যোগ ব্যতীত আত্মার দুঃখযোগ সম্ভবে না। অন্তঃকরণই আত্মার দুঃখভোগের নিমিত্ত কারণ।...... "আমি সুখী বা দুঃখী আমি কর্ত্তা, "আমি গৌর" ইত্যাদি নানা ভ্রমাত্মক অনুভবের কারণ পুরুষ নহে, এই অন্তঃকরণ সহিত সংযোগই তাহার কারণ।

"তস্মাৎ তৎসংযোগাচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥"
ইতি কারিকা।

"দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগঃ হেয়হেতুঃ"—
ইতি পাতঞ্জল।

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। ইতি গীতা।

(প্রকৃতিস্থ = প্রকৃতি সংযুক্ত।)

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহু র্মনীষিণঃ॥
ইতি শ্রুতি।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কালাদির সহিত সংযোগের ন্যায়, মুক্ত ও অমুক্ত সকল

পুরুষের সহিতই প্রকৃতির সংযোগ হইতে পারে। তখন এ সংযোগ কিরূপে বন্ধন কারণ হইবে? ইহার উত্তর এই যে, অপর জন্মনামা স্বস্ববুদ্ধি ভাবাপন্ন প্রকৃতির সহিত সংযোগই এস্থলে সংযোগ শব্দের অর্থ। ব্যাস যোগভাষ্যেও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বুদ্ধিবৃত্তি উপাধিদ্বারাই পুরুষের দুঃখযোগ হয়।

বৈশেষিকেরা এ সম্বন্ধে ভোগজনকতা অবচ্ছেদকত্ব দ্বারা অন্তঃকরণসংযোগের বিশেষত্ব স্বীকার করেন। সাংখ্যেও সেইরূপ বিশেষ সংযোগ স্বীকৃত। এজন্য সুষুপ্তিতে ভোগ প্রসঙ্গ নাই।

নিজ নিজ ভুক্তবৃত্তি এবং বাসনা রূপ যে কিছু বৃত্তি থাকে, তাহাই সংস্কার প্রবাহ, তাহা অনাদি। সেই জন্য, তাহার সহিত আত্মার স্বস্বামিভাব ব্যবস্থিত আছে।

কেহ কেহ বলেন, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ অঙ্গীকার করিলে, পুরুষের পরিণাম ও সঙ্গ স্বীকার করিতে হয়। অতএব এই সূত্রে অবিবেকই সংযোগ শব্দের অর্থ। (অনিরুদ্ধও ইহাই বলেন)। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। কেন না, অবিবেক এই সংযোগের হেতু, ইহা সূত্রান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। (৬।১১ এবং ২৭ সূত্র।) পাতঞ্জলেও অবিদ্যাকে এই সংযোগ হেতু বলা হইয়াছে।

প্রলয়কালে প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ থাকে, কিন্তু তখন ভোগ থাকে না। অতএব সংযোগই অবিবেক নহে। এই সংযোগ অবিবেক হইলে আত্মাশ্রয় দোষও হয়।

তাহা হইলে সংযোগ অবিবেকের হেতু, ও অবিবেক সংযোগের হেতু—ইহা বলিতে হয়। অতএব এই সংযোগ অবিবেক হইতে ভিন্ন। এই সংযোগ সামান্য গুণাতিরিক্ত ধর্ম্মের উৎপত্তিরূপে পরিণামও নহে। কুটস্থ বিভু আত্মার পরিণাম হইতে পারে না। আর সংযোগ মাত্রই সঙ্গ নহে। পরিণামের হেতুভূত সংযোগই সঙ্গ।

এস্থলে আরও প্রশ্ন উঠে যে প্রকৃতিপুরুষ উভয়ই বিভু নিত্য। তবে কিরূপে অহাদের মহত্তত্ত্বাদির হেতুভূত অনিত্য সংযোগ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, ত্রিবিধ গুণসমুদয় রূপ প্রকৃতির পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন উভয় রূপ আছে। এই পরিচ্ছিন্ন রূপ বিশিষ্ট প্রকৃতি দ্বারাই পুরুষের সংযোগ উৎপত্তির সম্ভব হয়। (অর্থাৎ পুরুষ সংযোগে প্রকৃতি হইতে যে বুদ্ধি, অহঙ্কার মন ইন্দ্রিয়াদিরূপ তত্ত্বের পরিণাম হয়, তাহার অপরিচ্ছিন্ন (বা সমষ্টি) এবং পরিচ্ছিন্ন বা ব্যষ্টিরূপ আছে। এই ব্যষ্টিরূপে বহু বা অনন্ত অন্তঃকরণের পরিণাম হয়। যে পরিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণের সহিত যে পুরুষের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার হেতু স্বস্বামিভাব আছে, তাহার সহিতই সে পুরুষের সংযোগ হয়।)

কেহ কেহ ভোগ্য ও ভোক্তারূপ হেতুই প্রকৃতি পুরুষের নিত্য সংযোগ স্বীকার করেন। তাহা হইলে জ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।

অতএব পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ বিশেষই বন্ধনের কারণ। ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রেত।

২০। অবিদ্যা হইতেও বন্ধন হয় না। কারণ যাহা অবস্তু, তাহা দ্বারা বন্ধনযোগ হইতে পারে না।

এই সূত্রে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও মায়াবাদ নিরাশিত হইয়াছে। উক্ত মতে অবিদ্যা বন্ধন কারণ। তাহা সঙ্গত নহে।

অবিদ্যা,—বিদ্যার প্রাগভাবই হউক, আর প্রধ্বংশ অভাবই হউক, তাহা অবস্তু। অবস্তুর দ্বারা বস্তুর বন্ধন সম্ভব হয় না। (অঃ নিঃ)

ইদানীং এস্থলে নাস্তিকের অভিপ্রেত বন্ধনকারণ নিরাকৃত হইতেছে। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ ও অদ্বৈতবাদ মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। উভয়ই বিভিন্নরূপ বৌদ্ধমত মাত্র। যথা—

"ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ ॥

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ মতে প্রকৃতি আদি কোন বাহ্য বিষয় নাই। সুতরাং উক্তরূপ সংযোগ অসম্ভব। ক্ষণিক বিজ্ঞানসন্তান মাত্রই দ্বিতীয় তত্ত্ব। সাংবৃত্তিক অবিদ্যা মিথ্যাজ্ঞান। তাহাই বন্ধন কারণ। যথা—

"অভিন্নোঽপি হি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাস নিদর্শনৈঃ
গ্রাহ্য গ্রাহক সংবিত্তি ভেদবানিব লক্ষ্যতে ॥

ইহাই ক্ষণিক বিজ্ঞান মত। সেইরূপ অদ্বৈতবাদীরাও অবিদ্যাকে অবস্তু বলেন। স্বপ্নদৃষ্ট রজ্জুর ন্যায় তাহা বন্ধন কারণ হইতে পারে না। বন্ধন সাংখ্যমতে অবাস্তব নহে। অবাস্তব হইলে, তাহা নিবৃত্তির জন্য বহু আয়াস সাধ্য। যোগাদি অনুষ্ঠান বৃথা।

২১। অবিদ্যা বস্তু হইলে সিদ্ধান্ত হানি হয়।

অদ্বৈতবাদীদের অবিদ্যা তাত্ত্বিক নহে, তাহা অবস্তু। তাঁহারা অবিদ্যাকে বস্তু বলিতে পারেন না। ইহাতে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের হানি হয়। তাহা বলিলে আত্মাব্যতিরিক্ত অন্য বস্তু থাকা স্বীকার করিতে হয়—আর অদ্বৈতবাদ থাকে না। এজন্য উক্ত হইয়াছে—

২২। আর তাহা হইলে বিজাতীয় দ্বৈত থাকার আপত্তি হয়।

বিজাতীয়—অর্থাৎ ভিন্ন জাতীয়। বিজাতীয় বস্তু স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদীর মত ভঙ্গ হয়। সুতরাং তাহা হইলে, ক্ষণিক বিজ্ঞান প্রবাহরূপ সন্তান ব্যতীত ভিন্ন জাতীয় দ্বৈতের আপত্তি হয়। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী ক্ষণিক বিজ্ঞান ভিন্ন আর দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকার করেন না। ক্ষণিক বিজ্ঞানমতে ক্ষণিক বিজ্ঞানের বিষয় অনন্ত। এই মতে স্বজাতীয় দ্বৈত স্বীকৃত। কেবল বিজাতীয় দ্বৈত অস্বীকৃত। এই মতানুসারে জ্ঞান প্রবাহ রূপ অবিদ্যা—বন্ধের পরে উৎপন্ন হয়, তাহা বন্ধের কারণ নহে। বাসনারূপ অবিদ্যাই বন্ধের কারণ। কিন্তু তাহা জ্ঞান হইতে বিজাতীয়। (অনিঃ) (বিঃ ভিঃ)।

এই সকল সূত্রে ব্রহ্ম-মীমাংসা সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হইয়াছে, এরূপ ভ্রম হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ব্রহ্মমীমাংসায় কোন সূত্রেই অবিদ্যা মাত্রই বন্ধের কারণ, এরূপ উক্ত হয় নাই। "অবিভাগো বচনাৎ" ইত্যাদি ব্রহ্ম মীমাংসার সূত্রে অবিভাগ লক্ষণ অদ্বৈত স্বীকৃত। অবিদ্যার বস্তুত্ব স্বীকার করিলেও তাহাতে বিরোধ হয় না। আধুনিক বেদান্তবাদ মায়াবাদ মাত্র। মায়াবাদী বিজ্ঞানবাদীদের অন্তর্গত। তাহাদের মত মূল বেদান্তের অভিপ্রেত নহে। তাহারা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

"মায়াবাদম্ অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ রূপিনা।"
"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদং অবৈদিকম্।"
ইতি পদ্মপুরাণ।

আরও এক কথা। মায়াবাদীরা স্বজাতীয় দ্বৈতও স্বীকার করে না। তাহাদের সম্বন্ধে বিজাতীয় দ্বৈত বলা নিরর্থক। অতএব এই সূত্রে প্রধানতঃ বিজ্ঞানবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। (বিঃ ভিঃ)

এই স্থলে বিজ্ঞানভিক্ষু আধুনিক অদ্বৈত-বাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন।

২৩। আর যদি অবিদ্যা—বিরুদ্ধ উভয় রূপ হয় ?

এরূপ হইলে ত উক্ত আপত্তি বৃথা হইবে ? ইহার উত্তর পরবর্ত্তী সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

বিরুদ্ধ উভয়রূপ=বস্তু ও অবস্তু উভয়-রূপ। অবিদ্যা অনাদি হইলেও যদি নাশ হয় বলিয়া তাহাকে প্রাগভাবরূপ বলা যায়। (অনিঃ।

সৎ ও অসৎ এই বিরুদ্ধ উভয় রূপ, অথবা সদসতের অতিরিক্ত রূপ। তাহা হইলে পারমার্থিক অদ্বৈত ভঙ্গ হয়।

সাংখ্য যে প্রপঞ্চ জগৎকে সদসৎ বলেন, সে সদসতের অর্থ ভিন্ন। ব্যক্ত যাহা তাহা সৎ, আর অব্যক্ত—অসৎ। (বিঃ ভিঃ)

২৪। না, (তাহা বলা যায় না, কারণ) কখন সেরূপ পদার্থের প্রতীতি হয় না।

আর অবিদ্যাই যদি বন্ধহেতু হয়, তবে জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা ক্ষয় হইলে তাহার পর আর কিরূপে প্রারব্ধ ভোগ হইতে পারে ? কারণ নাশে কিরূপে কার্য্য থাকে ? কিন্তু জীবন্মুক্তির পরেও প্রারব্ধ ভোগ হয়। একারণ সাংখ্যমতে সিদ্ধান্ত এই যে, সংযোগ দ্বারাই অবিদ্যা ও কর্ম্মাদি বন্ধনকারণ হয়। এই জন্মাখ্য সংযোগ প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ না হইলে নাশ হয় না। সেইজন্য অবিদ্যা নাশ হইলেও প্রারব্ধ ভোগ হয়। (বিঃ ভিঃ)

২৫। বৈশেষিকাদির ন্যায় আমরা ষট্ পদার্থবাদী নহি।

বৈশেষিকগণ ছয় পদার্থ স্বীকার করেন, নৈয়ায়িকগণ ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করেন। (১।৮৫, ৮৬ দ্রষ্টব্য) সাংখ্যে এরূপ পদার্থের সংখ্যা নিয়ম নাই। সাংখ্য পণ্ডিতগণ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করেন বটে, কিন্তু পদার্থের কোন সংখ্যা নাই। প্রত্যেক তত্ত্ব মধ্যে পদার্থ সংখ্যা অনন্ত হইতে পারে।

বৈশেষিক দর্শনে ষট্ পদার্থের নাম যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। পরবর্ত্তী বৈশেষিক পণ্ডিতগণ অভাব আখ্য সপ্তম পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন।

অবশ্য এই কারণে অবিদ্যাকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে সাংখ্য মতে আপত্তি নাই। সে আপত্তির অন্য কারণ আছে। (বিঃ ভিঃ)

২৬। পদার্থের সংখ্যা নিয়ম না থাকিলেও যাহা যুক্তিবিরুদ্ধ এরূপ পদার্থ কেহ স্বীকার করে না। যে স্বীকার করে, সে বালক বা উন্মত্তের সমান।

সদসতাত্মক, বা সৎ নয় অসৎও নয়, এরূপ পদার্থ যুক্তিবিরুদ্ধ। তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।

"নাসদ্রূপা ন সদ্রূপা মায়া নৈবোভয়াত্মিকা।
সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী॥"
সৌরপুরাণ।

"বিকারজননীং মায়ামষ্টরূপা মজাং ধ্রুবাম্।"

অতএব প্রকৃতি বা মায়া পরমার্থতঃ সৎ বা অসৎ নহে। তাহা সদসৎ উভয়াত্মিকাও নহে। তাহা লয়াখ্য ব্যবহারে অসৎ, পরিণামী নিত্যতারূপ ব্যবহারে সৎ। ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (বিঃ ভিঃ)

(উক্ত যুক্তি দ্বারা আধুনিক মায়াবাদও নিরস্ত হইল।)

২৭। অনাদি বিষয়ে উপরাগ নিমিত্তও ইহার (পুরুষের) বন্ধন হয় না।

(উপরাগ বা) বাসনার সহিত অসঙ্গ আত্মার সম্বন্ধ নাই। বাসনা হেতু আত্মার বন্ধন নহে। বৌদ্ধমতে স্থির আত্মা নাই। (আত্মা বিজ্ঞান প্রবাহ মাত্র)। কাজেই তাহার সহিত বাসনার সম্বন্ধ হইতে পারে না। ক্ষণিক বাহ্য বাদী বৌদ্ধমতে, প্রবাহ রূপে অনাদি যে বিষয়, বাসনা, তাহা দ্বারা পুরুষ দুঃখবদ্ধ হয়। ইহা সঙ্গত নহে।

২৮। বাহ্য ও অভ্যন্তর উভয়ের মধ্যে দেশ ব্যবধান থাকায়, উপরঞ্জ উপরঞ্জক সম্বন্ধ সম্ভব নহে। যেমন স্রুঘ্নদেশস্থ কাহারও সহিত, পাটলি-পুত্রস্থ কাহারও এরূপ সম্বন্ধ সম্ভব হয় না।

সূর্য্যের সহিত জলের উপরাগ রশ্মি সম্বন্ধ জন্য হয়, তাহা উক্তরূপ দেশান্তর সম্বন্ধ নহে।

বাহ্য বিষয় দ্বারা অন্তরস্থ জ্ঞানধারা রূপ আত্মা উপরঞ্জিত হইতে পারে না। উভয়ের দেশ ব্যবধান আছে। স্রুঘ্নস্থ জবাকুসুম পাটালিপুত্রস্থ স্ফটিককে উপরঞ্জিত করিতে পারে না। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ সংঘটন সম্ভাবনা নাই। সেইরূপ দেশ ভেদ জন্য বিষয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ না হওয়ায় আত্মায় বাসনা বা সংস্কার সংযুক্ত হইতে পারে না। আর বৌদ্ধমতে আত্মা ক্ষণিক। যে আত্মা বিষয় গ্রহণ করে, পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তে সে আত্মা থাকে না। সে আত্মার বাসনাও পরবর্ত্তী আত্মায় আসিতে পারে না।

পাটলিপুত্র আধুনিক পাটনা। স্রুঘ্ন—প্রাচীন নগর কোথায় ছিল, জানা যায় না।

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

বেদমন্ত্র।

"পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্
পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্।
পুনশ্চক্ষুঃ পুনশ্রোত্রং ম আগন্॥"

আমাদের সেই আয়ু, আত্মা, প্রাণ, মন,
ফিরিয়া আসুক পুন শ্রবণ, নয়ন।
যাহা হইয়াছে নষ্ট—যাহা আর নাই,
ফিরিয়া আসুক তাহা—পুন তাহা পাই।

আসুক বাহুর বল বুকের সাহস,
ফিরিয়া আসুক সেই বীরকীর্ত্তি—যশ!

আসুক বিশ্বাস ভক্তি আসুক মমতা,
উদ্যম উৎসাহ বীর্য্য জিত-ইন্দ্রিয়তা!

আসুক সে সত্যনিষ্ঠা সংযম বিনয়,
সে তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য সুধা শান্তিময়!
ফিরিয়া আসুক সেই আনন্দ মঙ্গল,
লইয়া পতাকা হস্তে জয় কোলাহল!
সেই বিদ্যা সেই বুদ্ধি আসুক সে জ্ঞান,
বেদমন্ত্রে করে কবি আবার আহ্বান!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

শ্রীতুকারাম।

বহুপুণ্যের ফলে শুভযুগে আমাদের মধ্যেও মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। মাটীর গুণে, জলবাতাসের গুণে, তাপশৈত্যের তারতম্য গুণে, পুণ্যভূমি পুণ্য ফল প্রসব করে। দেশের নর-নারীর রীতি নীতি, জ্ঞানধর্ম্ম, ভাবকর্ম্ম, দেহপ্রাণ ও আত্মা হইতে তিল তিল করিয়া উপাদান সংগ্রহ করিয়া মহাজনের মহাজীবন গঠিত হয়। সমগ্র দেশের পূতশক্তি পূতইচ্ছা কেন্দ্রীভূত এবং ঘনীভূত হইয়া কর্ম্মবীর অথবা ধর্ম্মবীর-রূপে সাকারমূর্ত্তিতে জনসমাজে প্রকাশিত হয়। এই জন্যই মহাপুরুষেরা ব্যক্তিবিশেষের, পরিবার বিশেষের, গণ্ডীবিশেষের বা জাতি-বিশেষের একস্ব নহেন—তাঁহারা সকলের সাধারণ সম্পত্তি। প্রত্যেক স্বদেশবাসীর তুল্যস্বত্ব তাঁহাদিগের উপর, জন্মভূমির পূর্ণস্বত্ব তাঁহাদিগের উপর, বিশ্বজগতের সাধারণ স্বত্ব ও অধিকার তাঁহাদিগের উপর। তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিমাণ কেবল আমাদের দাবীর গুরুত্ব ও পরিমাণ পরিচায়ক। বিধাতার বিশেষ কৃপায় মূর্ত্তিমান মহাশক্তির চরণরেণু-স্পর্শ যে কুলে, যে সমাজে, যে জাতিতে এবং যে দেশে হইয়াছে, সে কুল ধন্য, সে সমাজ ধন্য, সে জাতি ধন্য, সে দেশ ধন্য।

ইহা দার্শনিক সত্য যে সুচিন্তা সদিচ্ছার জনয়িত্রী এবং সদিচ্ছা সাধুচেষ্টার প্রসূতি। মানব জগতে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি, সাধু-চিন্তা, সাধুইচ্ছা এবং সাধুচেষ্টা প্রকাশের স্বাভাবিক ক্ষেত্র। জাতীয় জীবনের উন্মেষ যথাক্রমে এই ত্রিবিধ ক্রিয়াতে পরিস্ফুট হয়। ধর্ম্ম, সমাজ কিম্বা রাজনীতি উদ্বুদ্ধ জাতির জীবন প্রবাহের স্পন্দনরূপী এবং চেতনা-শক্তির প্রতিবিম্বরূপী মহাপুরুষদিগের লক্ষ্যীভূত বিষয় ও কর্ম্মক্ষেত্র।

ধর্ম্মবিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব ও রাজনীতি-বিপ্লব জাতীয় জীবনের সঞ্চার, প্রসার ও পরিণতির স্বাভাবিক ক্রিয়ার বাহ্য প্রকাশ মাত্র। ক্রমবিবর্ত্তনের অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক বিধানানুসারে ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে মানব ইতিহাসে,পৌনঃপৌনিক দশমিকের ন্যায়,কত শত জাতির উত্থান,পতন ও বিলয় হইতেছে—কত কত ধর্ম্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক,রাজ-নীতিসংস্কারক আবির্ভূত হইয়া জাতীয়মত, জাতীয়জীবন ও জাতীয় চরিত্র গঠনকার্য্য সমাধা করিতেছেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই ঐ একই নিয়ম, একই ক্রম, একই পরিণাম। আদি, মধ্য ও অন্তস্তরে ক্রমে জাতির উদ্বোধন, বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির অবস্থা সূচনা করে। পক্ষান্তরে উন্নতির পরাকাষ্ঠা কেবল ধ্বংশের আগমন-বার্ত্তাবহ।

যে কোন জাতির ইতিহাসে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই আমরা এই স্বয়ংসিদ্ধ মহাসত্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। আমাদের এই স্বর্গাদপি গরীয়সী বাঙ্গালা দেশেও চেতনা সঞ্চারের পূর্ব্বাভাস ধর্ম্মান্দোলন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জাতীয় জীবনের উদ্বোধন ব্রত উদযাপন করিয়া তিরোহিত হইলেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সামাজিক আন্দোলনে জীবনপাত করিলেন।

বর্ত্তমান যুগের বীর। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ ও পূজ্যপাদ সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিচর্চ্চার বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া এই পতিত জড়জাতির নব-জীবন-বিকাশ-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন। প্রতিকূল অবস্থা এবং ঘাত প্রতিঘাতের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে এ ক্ষীণ জাতির উন্নতির পরিমাণ এবং পরমায়ুর সীমা কতদূর,তাহা একমাত্র বিধাতা ভিন্ন অন্য কেহ বলিতে পারে না।

যখন মোগল গৌরব-সূর্য্য ভারতগগনের তুঙ্গস্থানে মধ্যাহ্নের প্রখরকিরণে ভীষণরূপে দীপ্তি পাইতেছিল, যখন দিল্লীশ্বরের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বিক্রমকেশরী অভিমানী দুর্দ্ধর্ষ শিশোদীয় রাজপুত ভূপতিরাও মুকুটভূষিত মস্তক অবনত করিয়া কুর্নিস করিতেছিলেন, সেই সময়ে, পশ্চিমঘাটের অরণ্যানী উপরে একখণ্ড ক্ষুদ্র রক্তগৈরিক বস্ত্র নিঃশব্দে মৃদুমন্দ হিল্লোলে ধীরে ধীরে উড্ডীয়মান হইতেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চবটীবনের নির্জ্জন গিরিকন্দর মুখরিত করিয়া 'হর হর দেব শঙ্কর' গুরুগম্ভীর ধ্বনি বজ্রনির্ঘোষে নিনাদিত হইতেছিল। তখন কে জানিত যে সকল পাটীল, দেশমুখ্য ও জায়গীরদার সনদ বগলে করিয়া নবাব দরবারে সেলাম ঠুকিয়া কৃতার্থ বোধ করিত, তাহাদের দরিদ্রগৃহে এবং অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য-দেশে একটী বর্ণজ্ঞান-হীন কিশোর জায়গীরদার-কুমার দুর্গম গিরিবর্ত্মে অসভ্য অনার্য্য তস্কর সংসর্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এমন মহাশক্তির বীজ সংগ্রহ করিতেছে, যাহা অঙ্কুরিত, পরিপুষ্ট ও সম্বর্দ্ধিত হইয়া একদিন সমগ্র ভারত-ভূখণ্ড কম্পিত করিবে? তখন কে জানিত, মহারাষ্ট্র দেশের নিবিড় অরণ্যে যে বর্গীর দাবাগ্নি ধূমায়মান হইতেছিল, তাহা একদিন সমস্ত ভারতীয় রাজশক্তি ভস্মীভূত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপ্রাসাদ গ্রাস করিতে উদ্যত হইবে এবং গান্ধারের উপত্যকা ও অধিত্যকা-মুক্ত খাইবার গিরিবর্ত্মবাহী প্রবল আফগান-সামন্তস্রোতকে কুরুক্ষেত্রের সমর-প্রাঙ্গণে স্পর্দ্ধার সহিত আহ্বান করিবে?

মহারাষ্ট্রগৌরব জিজাবাই-সুত শঙ্কর-অবতার রাজর্ষি শিবাজী সপ্তদশ শতাব্দীতে যে হিন্দুরাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,তাহার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে হইলে অনুসন্ধান আবশ্যক, জাতীয় জীবনের এই মহোচ্ছ্বাসের ভিত্তিমূলে কোন্ ধর্ম্মোচ্ছ্বাস বিদ্যমান রহিয়াছে। এস্থলে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন নহে যে, ধর্ম্মে জাতীয় জীবন উদ্বোধন,সমাজে তাহার প্রসার এবং রাজনীতিতে তাহার পরিণতি। যে জাতির ধর্ম্মশক্তি যত প্রবল, তাহার উন্নতি ও ঐশ্বর্য্য তত উজ্জ্বল। রোমে এবং গ্রীসে, আরবে এবং মিশরে, ক্যালডিয়ায় এবং পুণ্যপঞ্চনদ ভূমে সর্ব্বত্রই জাতীয় ইতিহাস এই মহাসত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সেদিন শিবরাত্রির পুণ্যদিনে নারঙ্গাঘাটের পরপারে পতিতপাবনী জাহ্নবী-পুলিনে সাহাবাদ জিলার সদ্যজাত অনাবৃত সিকতাক্ষেত্রে মহাতেজা ব্রহ্মচারী ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, "যত দিন ধর্ম্মজীবন ও ভগবদ্ভক্তি ফিরিয়া না আসিবে, ততদিন ভারতের দুর্গতি দূর হইবে না। এখনও বহু দূর।" যে ভগচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, "তস্য অলভ্যম্ কিম্? কিমপি ন, কিমপি ন, কিমপি ন।"

মহাপ্রাণ শিবাজী মহারাষ্ট্র শক্তি আরাধনার পুরোহিত সত্য, কিন্তু এই মহাপূজার সঙ্কল্প ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার ভার এক পর্ণকুটীরবাসী দারিদ্র্যক্লিষ্ট পুণ্যাত্মা সাধুর হস্তে ছিল। তিনি ভক্ত তুকারাম বাবা। রামদাস স্বামী আপন ভাবে অনুপ্রাণীত করিয়া মহারাষ্ট্র শক্তির

নেতৃত্বের জন্য শিবাজীকে স্বহস্তে গঠিত করিয়াছিলেন। তুকারাম ধর্ম্ম, নীতি ও বিশ্বাসের মন্ত্রে সমগ্র জাতিকে দীক্ষিত করিয়া সুষুপ্ত দেশে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। রামদাস ও তুকারাম গৌর-নিতাই, হরি হর। তাঁহারা একে দুই,দুইয়ে এক—উভয় উভয়ের অনুপূরক। পতিত জাতির উদ্ধারের জন্য, হিন্দুর নষ্ট গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য,এই দুই দেবর্ষি ও মহর্ষি মারবার দেশে একযোগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তন, রামপ্রসাদের পদাবলী, তুলসীদাসের দোহাবলী এবং তুকারাম বাবার অভঙ্গ গাথা অপূর্ব্ব সামগ্রী। তাহার ছত্রে ছত্রে ভাবলহরী ও ভক্তির উৎস, প্রতি শব্দে বীণার ঝঙ্কার এবং প্রতিবর্ণে অমিয়াক্ষরণ। তুকারামের ভাবের টানে ও প্রেমের প্লাবনে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল, মরুদেশ উর্ব্বর হইয়াছিল, রত্নাকর সাধু হইয়াছিল, শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইয়াছিল। মহারাজ তুকারামের ভক্তি-প্রবাহ মরাঠা জাতির স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিল, নবতেজ বিকাশ করিয়াছিল, শক্তির যোজনা করিয়াছিল, যাহার আলোকচ্ছটায় একদিন বিশ্বজগৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। সেদিন বোধ হয় দূরে নহে, যেদিন কবির মিঞার দোহাবলীর ন্যায় 'তুকারাম বাবাচ্যা অভঙ্গাঞ্চী গাথা' ভারতের প্রতিগৃহে গীত হইবে, প্রতি হৃদয়ে উন্মাদনা আনিবে, প্রতি প্রাণে তাড়িত শক্তি যোজনা করিবে। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষীণশক্তি ভক্তহৃদয়ের অমৃতলহরী যতটুকু মাত্র ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে, তাহা আমাদের সাধারণ সম্পত্তি। আমরা মহাজন চরণে প্রণত হইয়া এই অলোক-সামান্য ভক্ত মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই চারিটী কথার আলোচনা করিব।

মহারাষ্ট্রচক্রনায়ক পেশবার রাজধানী পুণ্যা নগরীর বায়ু কোণে প্রায় ১৬ মাইল দূরে দেহু একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের পিতৃহীন বালক বিশ্বম্ভরকে তাহার জননী অতি সাবধানে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর যৌবনে পদার্পণ করিলে তাহার ধর্ম্মানুরাগ, ঠাকুর দেবতায় ভক্তি এবং আচার নিষ্ঠার কথা চারিদিক রাষ্ট্র হইল। পবিত্র নদনদী এবং স্থাপিত দেবদেবী সম্বন্ধে লোক-পরম্পরাশ্রুত নানা অলৌকিক মাহাত্ম্যের গল্প শুনিয়া বিশ্বম্ভরের তরুণ হৃদয়ে ধর্ম্মবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিশ্বম্ভর তাহাদের কুল-দেবতা পণ্ঢরপুরের বিঠবা রখুমাইর (লক্ষ্মী-নারায়ণ) অলৌকিক মহিমা সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী আশৈশব শুনিয়াছিল। এখনও তাহার ধর্ম্মপ্রাণা সাধ্বী জননী প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে আদেশ করিলেন 'বাবা বিশ্বম্ভর তুমি প্রতি একাদশীতে উপবাস থাকিও, আর পণ্ঢরপুরে যাইয়া কুলদেবতা বিঠবা ঠাকুরের পূজা দিও।' লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় কিছু-মাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, অবিচলিতভাবে, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার সহিত বিশ্বম্ভর মাতৃ আজ্ঞা প্রতি-পালন করিতে লাগিলেন। জনশ্রুতি আছে, এইরূপ ষোড়শ বার একাদশী ব্রত পালন করিবার পর এক দিন শুদ্ধা অষ্টমী নিশিতে বিশ্বম্ভরের স্বপ্নাদেশ হইল। বিঠবা রখুমাই স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া ভক্ত বিশ্বম্ভরের নিকট তাঁহাদের ভূগর্ভস্থ মূর্ত্তির কথা প্রকাশ করিলেন। বিশ্বম্ভর স্বপ্নে প্রাপ্ত দেবমূর্ত্তি ইন্দ্রয়নী তীরে যথাবিধি স্থাপনা করিলেন। তদবধি দেহুগ্রামের বিঠবা দেব বিশ্বম্ভরের কুলদেবতা হইলেন। সাধু তুকারাম বিশ্বাসী বিশ্বম্ভর-

কুলে উজ্জ্বল কোহিনুর—পুরুষানুক্রমে দেব সেবার মহাপ্রসাদ।

তুকারাম বিশ্বম্ভরের অষ্টম পুরুষ নিম্নস্তরে।

বিশ্বম্ভর
├ হরি
│ └ বিঠবা
│ └ পদাজী
│ └ শঙ্কর
│ └ কানাই
│ └ বল্লভ
│ └ তুকারাম
└ মুকুন্দ
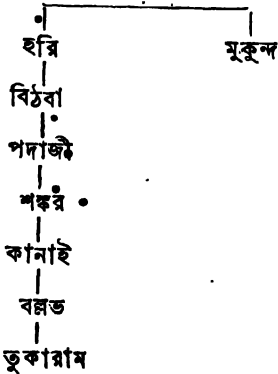
বিশ্বম্ভরের ২ পুত্র—হরি ও মুকুন্দ। উভয়েই সেনাবিভাগের রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং প্রভুকার্য্যে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। মুকুন্দের পত্নী পতিশোকে চিতা-রোহণ করিয়া অনুমৃতা হইলেন। হরির সহধর্ম্মিণী অন্তঃস্বত্বা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিঠবা জন্মগ্রহণ করেন। বিঠবার পুত্র পদাজী, পদাজীর পুত্র শঙ্কর, শঙ্করের পুত্র কানাই—কানাই বল্লভজীর পিতা। ইহারা সকলেই পরম ধার্ম্মিক এবং বিঠবা দেবের উপাসক ছিলেন। বল্লভজী দেবানুগ্রহে ৩টী পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিবেন—সাবজী (শ্যামজী), তুকারাম ও কান্হোবা (কানাই)।

বল্লভজীর মধ্যম কুমার ভক্তচূড়ামণি তুকারাম সন ১৫৩০ (১৬০৮ খ্রীঃ) শকাব্দায় দেহগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব সময় সর্ব্ববাদী-সম্মত নহে। অভঙ্গ গাথার আভ্যন্তরিক প্রমাণে নিশ্চিত জানা যায় যে, ১৫৭১ শকে (১৬৪৯ খ্রীঃ) ২রা ফাল্গুন, সোমবার, প্রাতঃকালে তুকারামের তিরোভাব হয়। এবং সাধারণতঃ প্রবাদ আছে, তিনি ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমে সংসার হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। ইহাতে স্বতঃই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে, ১৫৩০ শকই তাঁহার আবির্ভাব কাল। তুকারাম জাতিতে শূদ্র ছিলেন এবং অতি সামান্য বণিকের (মুদীর) ব্যবসায় করিতেন:—

'জাতি শূদ্র বংশ কেনা বেবসায়।'

কিন্তু শাস্ত্রকার যথার্থই বলিয়াছেন,—'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।' পাণ্ডবের টিটকারী শুনিয়া অদ্বিতীয় বীর কর্ণ সদম্ভে উত্তর দিয়াছিলেন, "সূতোবা সূতপুত্রোবা যোবা কোবা ভবাম্যহম্। দৈবায়ত্তম্ কুলেজন্ম মমায়ত্তংতু পৌরুষম্।' তাই আজ শূদ্র তুকা চতুর্ব্বর্ণের নমস্য।

বল্লভজী বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত বিষয়কার্য্যে অসমর্থ হইলে জ্যেষ্ঠপুত্র সাবজীর উপর সংসারের ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। বিষয়-বিমুখ ভগবৎপরায়ণ সাবজী এই গুরুভার স্কন্ধে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সুতরাং অদৃষ্টের ফেরে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তুকারামকে বিষয়জালে আবদ্ধ হইতে হইল। হয়ত এই ক্ষুদ্র ঘটনা আমাদের এই আখ্যায়িকার নায়কের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। দারিদ্র্যের কষাঘাত, আত্মীয় বিয়োগের শোক-দাহ এবং কর্কশা গৃহিণীর পরুষবাক্য ও নির্ম্মম তাড়না তুকারামের বিষয়বাসনা ঘুচাইয়া দিল। সংসারের মায়াবন্ধন কাটিতে হইলে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের প্রয়োজন। তুকারামের জীবনে তাহার অনটন হয় নাই। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর চিন্তামণির ধিক্কার-বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তুলসীদাসের

ব্রাহ্মণী রত্নাবলী উদ্ধৃতবাক্যে গোঁসাইজীর দিব্যজ্ঞান জন্মাইয়া দিয়াছিলেন—

জিতমো হেত হরামসোঁ,হোতরামসোঁ জোর।
চল্যোজায় বৈকুণ্ঠকুঁ,রোক ন রাখৈঁ কোর।

তুকাপত্নী জিজাইবাই প্রত্যক্ষভাবে স্বামীকে তত্ত্বোপদেশ না করিলেও পরোক্ষভাবে বৈরাগ্য শিক্ষা দিতে ত্রুটী করেন নাই।

তাৎকালিক প্রথানুযায়ী তুকারাম রখুমাই ও জিজাবাই,এই দুই স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে প্রিয়তরা পত্নী রখুমাই বহুকষ্ট ভোগের পর ইহধাম ত্যাগ করেন। ঐ বৎসরই তাঁহার প্রাণের কুমার শম্ভু অনন্তধামে চলিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ পরলোক গমন করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাবর্জী তীর্থযাত্রা উপলক্ষে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। শোকের উপর শোকে তুকারামের মন ভাঙ্গিয়া গেল। এই সময় দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া ব্যবসায় অচল হইল, দোকান দেউলিয়া হইয়া গেল। তুকারামের দুঃখের মাত্রা পূর্ণ হইল, বিষয় বিড়ম্বনা ষোল কলায় পরিণত হইল। তুকা সকল জঞ্জালের হাত এড়াইলেন—সংসারে উদাসীন হইয়া গ্রামপ্রান্তে বিধবামন্দিরে যাইয়া দেবতার সেবাইত হইলেন। কবি স্বয়ংই কহিতেছেন—

সংবসারেঁ জালোঁ অতিদুঃখেঁ দুঃখী,
মায়বাপ সেখীঁ ক্রমিলিয়া।
দুষ্কালেঁ আটিলেঁ দ্রব্যেঁ নেলা মান,
স্ত্রী একী অন্ন অন্ন করিতাঁ মেলী।
লজ্জা বাটে জীবা ত্রাসলোঁ যা দুঃখেঁ,
বেবসায় দেখেঁ তুটী যেতাঁ।
দেবাচেঁ দেউল হোতেঁ তেঁ ভঙ্গলে,
চিত্তাসী জেঁ আলেঁ করা বেঁসেঁ।

পিতামাতা স্বর্গারোহণ করিলে সংসারে আমি বহু কষ্ট ভুগিয়াছি। দুর্ভিক্ষ আমার ধনমান সমস্ত লইয়া গেল, আমার স্ত্রী অন্ন অন্ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। আমি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলাম, দুঃখে আমার শান্তি ধ্বংস হইল, দেখিলাম দিন দিন আমার ব্যবসায় মাটী হইয়া যাইতেছে। অদূরে দেবতার ভগ্ন মন্দির ছিল—আমি তাহাই আশ্রয় করিতে মনস্থ করিলাম। তুকারামের মর্ম্মভেদী কাতরোক্তিতে পাষাণ গলিয়া যায়। কিন্তু তুকা সংসারতাপে ক্লিষ্ট হইয়া কাপুরুষের ন্যায় মহাদেব ও বিঠবা, এই পুত্রদ্বয়ের ভার সসত্বা পত্নী জিজাইবাইর দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপাইয়া ফকীরী গ্রহণ করেন নাই। মানববুদ্ধির অগোচর কি এক দৈবশক্তির হস্তে তিনি ক্রীড়নক মাত্র হইলেন। কে যেন তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে তাড়না করিল এবং সম্মুখে বিঠবা দেব মোহনবংশী বাজাইয়া তুকার প্রাণমন হরণ করিলেন। নারায়ণের শ্রীচরণাশ্রয়ে তুকার-সকল জ্বালা জুড়াইল। ভক্ত তুকা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আবার গাহিলেন—

ঘরেঁ জালেঁ দেবা নিঘালেঁ দিবালেঁ,
বরী যা দুষ্কালেঁ পীড়া কেলী।
(অনুতাপেঁ তুঝেঁ রাহিলে চিন্তন,
জানা হা বমন সংবসার।)
বরেঁ জালেঁ দেবা বাইল কর্কশা,
বরীহে দুর্দ্দশা জনামধ্যেঁ।
বরেঁজালেঁ জগীঁ পাবলোঁ অপমান,
বরেঁ গেলেঁ ধন ঢোরেঁ গুরেঁ।
বরেঁ জালেঁ নাহীঁ ধরিলী লোকলাজ,
বরা আলোঁ তুজ শরণ দেবা।
বরেঁ জালেঁ তুঝেঁ কেলেঁ দেবাইল,
লেঁকরেঁ বাইল উপেক্ষিলীঁ।
তুকাহ্মণে বরেঁ ব্রত একাদশী,
কেলে উপবাসীঁ জাগরণ।

হে প্রভো! ভালই যে আমি দেউলিয়া হইয়াছিলাম এবং ভালই যে দুর্ভিক্ষ আমাকে পেষণ করিয়াছিল।

দারুণ সন্তাপে আমাকে তোমার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে এবং বিষয় ভোগ আমার নিকট ন্যাক্কারজনক বোধ হইয়াছে।

হে দেব! ভালই হইয়াছে যে আমার স্ত্রী কর্কশভাষিণী এবং ভালই যে লোকসমাজে আমার এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল। ভালই যে সংসারে আমার এত অপমান হইয়াছে, ভালই যে আমি ধনবিত্ত সব খোয়াইয়াছি। ভালই যে আমি লোকলজ্জা গ্রাহ্য করি নাই এবং ভালই যে আমি তোমার শরণাগত হইয়াছি। ভালই হইয়াছে যে, আমি স্ত্রী-পুত্র উপেক্ষা করিয়া তোমার মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছি। তুকা বলে আমি ভালই করিয়াছি যে, উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিয়া একাদশী ব্রত পালন করিয়াছি। একদিকে আত্মীয়স্বজনের অন্তরায়, অপরদিকে শ্যামনটবরের মুরলীধ্বনি, মীরাবাই উভয়শঙ্কটে পড়িয়া তুলসীদাস গোঁসাইজীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ভক্ত উপদেশ দিয়াছিলেন—

প্রিয়নরামবৈদেহী, জিনহকোঁ প্রিয়নরামবৈদেহী।
তজিয়ে তিন্হেঁ কোট বৈরীসম, যদ্যপি পরম সনেহী।
পিতাতজে প্রহ্লাদ বিভীষন বন্ধু ভরতমহতারী।
হরিহিতগুরুবলী ব্রজবনিতনপতি ভয়ে জগমঙ্গলকারী।

মীরা সকল ত্যাগ করিয়া হরিভজন জীবনের সার করিলেন, তুকাও সকল ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপদে লীন হইলেন।

তুকারামের পারিবারিক সুখের মোহন চিত্র এবং দাম্পত্য প্রণয়ের একটু নমুনা এস্থলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কায়নেনোঁ হোতা হাবেদার মেলা,
বৈরতো সাধিলা হোউনি গোহো।
(ঞ কিতী সর্ব্বকাল সোসাবেঁ হেঁ দুঃখ,
কিতীলোকাঁ মুখ বাসূঁ তবী।
ঝবে আপুলী আইকায় মাঝেঁ কেলেঁ,
ধড় যা বিধ্বলেঁ সংসারাচেঁ।
তুকাহ্মণে যেতী বাইলে অসড়ে,
কুন্দোনিয়াঁ রড়ে হাঁসে কাহাঁ।

জানি না; এই হতভাগ্য পূর্ব্বজন্মে আমার বৈরী ছিল কিনা যে, এজন্মে পতিরূপে প্রতিহিংসা সাধন করিয়াছে। (সর্ব্বদা কত দুঃখইবা আমি আর সহ্য করিব এবং লোকের কাছেই বা কতবার সাহায্যের জন্য যাইব?) রসাতলে যাউক বিঠল—সে আমাদের কি উপকার করিয়াছে? তুকা কহে বাইজী এইরূপে ক্রোধ করিয়া কভু হাসে কভু ফুকারিয়া কান্দে।

তুকারামের বদান্যতা আর তাঁহার জবরদস্ত অভিভাবিকা জিজাইবাইর তাব্র শাসন করুণরসাত্মক।

গোণী আলী ঘরা, দাণে খউঁ নেদী পোরাঁ।
ঞ। ভরী লোকাঞ্চী পাটোরী মেলা চোরটা
খাণোরী)।
খবলনী পিসী, হাতা ঝোঁবে জৈসী সাঁসী।
তুকাহনপণে খোটা, রাঁড়ে সঞ্চিতাচা সাঁটা।

দানার বোঝা ঘরে আসিলে ছেলেপিলেদিগকে খাইতে দেয় না। (মিন্সে ঘরের চোর কেবল পরের ধামা ভরিয়া সব বিলাইয়া দেয়)। তুকা বলে, এই ক্রুদ্ধানারী অসুরের ন্যায় আমার হাত চাপিয়া ধরে। 'আ সর্ব্বনাশী, তোর পূর্ব্বজন্মের কত পাপই সঞ্চিত আছে!'

সময় সময় কোন্দল একটু জমাট বাঁধিয়া উঠিত। তখনকার চিত্র বেশ করুণ হাস্যরসাত্মক।

ন করবে ধন্দা, আইতা তোঁড়ীপড়ে লোন্দা।

(শ্রু। উঠিতেঁ তেঁ কুটিতেঁ টাল, অবঘা
মঁাড়িলা কোহ্লাল)।
জীবন্ত চিমেলে, লাজা বাটুনিয়াঁ প্যালে।
সংবসারাকড়ে, ন পাহাতী ওস পড়ে।
তলমলতী যাঞ্চ্যা রাঁড়া, ঘানিতী জীবা নাবেঁ
ধোঁড়া।
তুকাম্হণে বরেঁ জালেঁ, ঘেগে বাইলে লীহিলেঁ।
কোন কাজ করে না, বিনা ক্লেশে রাশি রাশি খাদ্য আসিয়া পড়ে। (শয্যা ত্যাগ করিবা মাত্রই করতাল বাজাইয়া এমন অসহ্য কোলাহল করিতে থাকে যে কাণে তালা লাগে)। এরা সব বেঁচেও যেন মরে আছে—লজ্জার মাথা জলে গুলে খেয়েছে। সংসারের কিছুই দেখে না—সংসার জাহান্নমে যাউক। এদের হতভাগিনী গৃহিণীরা দুঃখের জ্বালায় অস্থির—তাহারা পোড়াস্বামীকে অভিসম্পাত করে, আর মাথায় পাথর হানিয়া মরে। তুকা বলে 'বেশত ভালই, বাই, তোমার অদৃষ্টলিপি তুমি ভোগ কর।'

এ কোন্দল হরপার্ব্বতীর কোন্দল—বহ্বাড়ম্বর লঘুক্রিয়া। আমাদের সমাজে উৎকট দাম্পত্য প্রেমের এক যুগতরঙ্গ গিয়াছে—তখন এইরূপ বেপ্পায় ভালবাসার অপূর্ব্ব চিত্র অতি সাধারণ ছিল। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি পৃষ্ঠা তাহার আলোকচিত্র ধরিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে নূতন মার্জ্জিত ভাবের চাকচিক্যে সে চিত্র মলিন হইয়াছে সত্য, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

তুকাঘরণী জিজাইবাই যখন দেখিলেন যে, বিষপ্রয়োগেও রোগে ঔষধ ধরিল না, তখন নিরুপায় হইয়া মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন :—
বরেঁ জালেঁ গেলেঁ, আম্হী অবঘেঁ মিলালেঁ।
(শ্রু। আতাঁ খাইল পোটভরী,
ওল্যা কোরড্যা ভাকরীঁ।)
কিতী তরী তোঁড়, যাশীঁ বাজিবুঁমী রাঁড়।
তুকা বাইলে বান বলা, চীথূ করুনিয়াঁ বোলা।
গিয়াছে বালাই গিয়াছে, ভালই হইয়াছে; আজ হইতে আমি সবই পাইলাম। (এখন মোটা ভাত পেট ভরিয়া খাইব)। ধিক্ আমার অদৃষ্ট, তাহাকে কতই না গালাগালি দিতে হইত। (তুকা বলে) "জিজিবাই দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলেও তুকাকে ভালবাসে।"

শেষ পংক্তি কত গভীর এবং হিন্দু পত্নীর চরিত্র কিরূপ পরিস্ফুট করিয়াছে!

যখন তুকারাম বৈরাগ্য বশতঃ সংসারের মায়া বন্ধন ছিন্ন করিয়া গৃহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন জিজাই বাই তাঁহাকে কতই না অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন! সাধুপতি পত্নীকে নানাপ্রকারে উপদেশ করিলেন এবং বিষয়-মৃগতৃষ্ণিকার অনিত্যতা ও পারলৌকিক সুখের মোহন চিত্র উজ্জ্বল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন।

"জড়িত বিমানে বৈসবিতী মানেঁ
গন্ধর্ব্বঁাচে গাণেঁ নাম ঘোষ।"
এবং "দ্বিজাঁ পাচারুনি শুদ্ধ করীঁ মন,
দেঈ বোহেঁ দান যথাবিধ।
নকো চিন্তা করূঁ বস্ত্রা যা পোটাচী,
মাউলী আমুচী পাণ্ডুরঙ্গ।"
"সভা সম্মার্জন তুলসী বৃন্দাবন,
অতীত পূজন ব্রাহ্মণার্চেঁ।
বৈষ্ণবাঞ্চী দাসী হোঁই সর্ব্বভাবেঁ
মুখীঁ নাম ধ্যাবেঁ বিঠোবাচেঁ।" ইত্যাদি।

তুকারাম কিছুদিন সংসারে থাকিয়াও পদ্মপত্রের জলের ন্যায় অনাসক্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া বিঠবা দেব

মন্দিরে প্রণাম করিতে যাইতেন এবং সারাদিন দেহু হইতে মাইল চতুষ্টয় দূরস্থিত ভাণ্ডার পাহাড়ে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। সূর্য্যাস্ত হইলে বিঠবা মন্দিরে প্রত্যাগত হইতেন এবং ভজন, কীর্ত্তন ও তাণ্ডব নৃত্য করিয়া রজনী যাপন করিতেন। সম্ভবতঃ মুষ্টি ভোজনের জন্ত অন্নপূর্ণা জিজাই বাইর শরণাগত হইত। কেন না, 'তুকাবাইলে মানবলা, চীথূ করুনিয়াঁ বোলা।' সমস্ত 'তুনিয়াদারী' ছাড়িয়া দিয়া এবং একলক্ষ্য হইয়া তুকারাম সাধন ভজনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভগবৎ কৃপা ব্যতিরেকে দুর্ব্বল মানব দুর্গম সাধনা পথে অগ্রসর হইতে পারে না। বিধাতার বিশেষ করুণা ভিন্ন পরম দেবতার চরণপ্রান্তে পৌঁছিবার শক্তি সাধকের নাই, কিন্তু তাঁহার এমনই মহিমা, ভক্তের প্রতি তাঁহার এমনই টান যে, আমরা এক বিঘত চলিতে পারি না, তিনি এক হস্ত আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লন। আমরা আছাড় পড়িতে পড়িতে তিনি হাতে ধরিয়া আমাদের স্খলিতপদ চালনা করেন। কলিতে শূদ্রতপস্বী ভক্ত তুকারামের ঘোর সাধনায় বৈকুণ্ঠের আসন টলিল। তাঁহার অস্ফুট কাতর ধ্বনিতে বিশ্বপতির টনক পড়িল। এক মাঘী শুক্ল দশমী নিশীথে স্বপ্নে কে যেন বাবাজী মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া তুকারামকে 'রামকৃষ্ণ হরি' এই ইষ্ট মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং প্রকাশ করিলেন যে, রাঘব চৈতন্ত ও কেশব চৈতন্ত তাঁহার গুরু।

সদ্‌গুরু রায়েঁ কৃপামজ কেলী,
পারে নাহী ঘডলী সেবা কাঁহীঁ।
(ধ্রু। সাঁপড়বিলেঁ বাটে জাতাঁ গঙ্গাস্নানা,
মস্তকীঁ তো জাণা ঠেবিলা কর)।
ভোজনা মাগতী তুপ পাবশের,
পড়িলা বিসর স্বপ্নামাজী।
কাঁহীঁ কলে উপজলা অন্তরায়,
ম্হণোনিয়াঁ কায় ত্বরা ঝালী।
রাঘব চৈতন্ত কেশব চৈতন্ত,
সাঙ্গিতলী খুণ মানিকেচী।
বাবাজী আপলেঁ সাঙ্গিতলেঁ নাম;
মন্ত্র দিলা রামকৃষ্ণ হরি।
মাঘ শুদ্ধ দশমী পাহুনি গুরুবারে,
কেলা অঙ্গীকার তুকাহ্মণে।

সদ্‌গুরুরাজ আমাকে কৃপা করিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহার কোন সেবা করিতে পারি নাই। (স্বপ্নে গঙ্গাস্নানের পথে তাঁহার দর্শন লাভ হইল। তিনি আমার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।) ভোজনের জন্ত এক পোয়া ঘৃত চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমার বিস্মৃতি হইয়াছে। তিনি অন্তরায়ের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, এই জন্যই কি এত তাড়াতাড়ি অন্তর্ধান হইলেন? তাঁহার প্রভুর নাম রাঘব চৈতন্ত কেশব চৈতন্ত বলিয়াছিলেন, নিজের নাম বাবাজী বলিয়াছিলেন। মাঘ মাসে শুদ্ধ দশমী তিথিতে বৃহস্পতিবার আমাকে রামকৃষ্ণ হরি মন্ত্র দিয়াছিলেন। 'সদ্‌গুরু পাবে, ভেদ বতাবে জ্ঞান করি উপদেশ।' তুকার সদ্‌গুরু লাভ হইল, এখন তিনি করতলগত আমলকীবৎ। জাহ্নবী যমুনা শৈলপতির রত্নভাণ্ডার লুটিয়া আনিয়া যে পুণ্যদেশ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কেন্দ্র স্থানে প্রেমের বাণ ডাকিয়া 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু' হইয়া 'নদে ভাসিয়া' গিয়াছিল। তাহার বিপুল তরঙ্গ মলিবারের উন্নত বেলাভূমিতে আঘাত করিল। তুকারাম গৌরাঙ্গপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া বলিলেন—

বিশ্বাসে মিলয়ে হরি তর্কে বহুদূর।

পারমার্থিক বিষয়ে মহারাষ্ট্রের সহিত বাঙ্গালার অদ্ভুত সমাবেশ এক অতি দুর্জ্ঞেয় রহস্য। সেতুবন্ধ তীর্থপথে নিত্যানন্দের সহিত মাধবেন্দ্রপুরীর মিলন, মাধবেন্দ্র শিষ্য ঈশ্বরপুরীর নিকট শ্রীচৈতন্যের দশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ, পরমানন্দপুরী এবং স্বরূপদামোদরের নীলাচলে গৌরাঙ্গের সহিত মিলন রহস্য-বিজড়িত। তুকারামের স্বপ্নলব্ধ গুরু রাঘব-চৈতন্য ও কেশবচৈতন্য, ইহাও এক প্রহেলিকা। এই সকল ঘটনার অভ্যন্তরে বিধাতার যে ইঙ্গিত ও অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা বুঝিবার শক্তি মানবের নাই। রাঘব-চৈতন্য প্রভু কেশবভারতী এবং সম্ভবতঃ পাণিহাটীর রাঘব পণ্ডিতের কথাই বলিয়াছেন।

তুকারামের জীবন-নাট্য তিনটী প্রস্ফুট গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। আদি অঙ্কে দোকানদারী, মুখরা গৃহিণীর হুঙ্কারের ভয়ে কর্ম্মকারের কুম্ভকার ব্যবসায়ের ন্যায় অতি সন্তর্পণে গৃহ-ধর্ম্ম পালন। পরিণাম ফল সমূলে বিনাশ—শিবের সমুদ্র মন্থনে অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল উদ্‌গার। মধ্য অঙ্কে সংসারের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বিঠবা মন্দিরে এবং ভাণ্ডার পাহাড়ে সাধনা ও সিদ্ধি। ভজন, পূজন, কীর্ত্তন ও ধ্যান, এই অবস্থার নিত্যক্রিয়া। এইখানে সাধু তুকা তাঁহার স্বভাব ও মনো-বৃত্তির অনুরূপ ক্ষেত্র পাইলেন—তাঁহার জীবনের ও প্রতিভার বিকাশ আরম্ভ হইল। প্রতিভার এবং বিশ্বাসী জীবনের সহিত দৈব-বাণী এবং আদেশের কেমন এক প্রহেলিকা-ময় নিকট সম্বন্ধ। তুকারামের ইষ্টমন্ত্র আদেশ হইল, ধর্ম্মমতের ইঙ্গিত হইল, স্বপ্নে দেবদর্শন হইল—ইহাই তাঁহার সিদ্ধি ফল। তৃতীয় বা শেষ অঙ্কে তুকারাম প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ। ভাবের উন্মাদনায়, বিশ্বাসের দৃঢ়তায়, ভক্তির উচ্ছ্বাসে এবং সাধনার কঠোরতায় যে জীবনের এবং প্রতিভার উন্মেষ হইয়াছিল, তাহার পরিণতি ভাষায় ও সাহিত্যে। ভাবোদ্যান হইতে বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া মালী তুকা বিনাসূতায় মালা গাঁথিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার অমূল্য অভঙ্গ-গাথা। এই সাহিত্য-ভাণ্ডারের মহামূল্য রত্ন আজও মহারাষ্ট্রভাষার গলদেশে মণিময় কণ্ঠহারের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তুকা-রামের কবি-জীবন অতি সুন্দর, অতি মধুর। তাঁহার সরল, সহজ, সুললিত রসাত্মিক আত্মগত কথা প্রবাহে তাঁহার নিজের জীবন প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে—মহারাষ্ট্র জাতীয় চরিত্রের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে—ভক্তজীবনের উচ্চাঙ্গের ভাবলহরীর মৃদুমন্দ স্পন্দন রহিয়াছে।

এই মহাব্রত উদ্যাপনে তুকারাম স্বয়ং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রবৃত্ত হন নাই। আবার সেই আদেশ—আবার ঐশীশক্তির সঞ্চার। কিন্তু এবার বাবাজী বা চৈতন্য প্রভু নহেন। কবিগুরু নামদেব স্বপ্নে দর্শন দিয়া তুকারামকে কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন :—

নামদেবেঁ কেলেঁ স্বপ্নামাজী জাগেঁ,
সবেঁ পাণ্ড রঙ্গে যেউনিয়াঁ।
ধ্রু। সাঙ্গতলেঁ কাম করাবেঁ কবিত্ব,
বাউঙ্গে নিমিত্য বোলোঁ নাকো।

নামদেব পণ্ডরঙ্গ সঙ্গে আমাকে স্বপ্নে জাগাইলেন এবং আদেশ করিলেন,—

"কবিতা রচনা করিও, বৃথা বাক্যে সময় নষ্ট করিও না।"

ভক্তি বিষয়ে শ্রীচৈতন্য তুকারামের আদর্শ-গুরু, রচনা বিষয়ে নামদেব তাঁহার আদর্শ

ছিলেন। নামদেব মহারাষ্ট্র ভাষায় অভঙ্গ ছন্দে এক অতি প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি জাতিতে সিম্পি (সীবনকার) এবং পণ্ঢর-পুরের বিঠবা দেবের উপাসক ছিলেন। তিনি কবীরের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। সম্ভবতঃ সমধর্ম্মী বলিয়া তুকারাম তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, নামদেবের রচিত অভঙ্গ সংখ্যা ৯৫ কোটির মাত্র কয়েক সহস্র ন্যূন। অবশিষ্ট ৫ কোটি অভঙ্গ রচনা করিয়া শতকোটি পূর্ণ করিতে তুকারাম স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই প্রবাদের মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে, জানিবার উপায় নাই। এপর্য্যন্ত তুকারামের রচিত প্রায় ৫ সহস্র অভঙ্গ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রতি অভঙ্গ কতকগুলি শ্লোকের সমষ্টি। শ্লোকগুলি বাঙ্গালা পয়ারের ন্যায় সরল ছন্দে রচিত। তুকারাম মুখে মুখে অভঙ্গ রচনা করিয়া ভজন এবং কথকতা করিতেন। তাঁহার শিষ্য গঙ্গাজী মওয়াল ও সন্তাজী তেলী সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় শ্লোকগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। শেষ জীবনে তুকারাম অভঙ্গ রচনায় এরূপ সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি প্রায় অভঙ্গ ছন্দেই কথোপকথন করিতেন। সুতরাং তাঁহার রচিত শ্লোক যে সর্ব্ব সাকল্যে ৫ কোটি হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

স্বপ্নাদেশ ও দৈবশক্তি লাভ হইলেও তুকারাম 'হঠাৎ কবি' হইতে পারেন নাই ধর্ম্মানুরাগী এবং ভক্তির প্রাবল্য বশতঃ নাম-দেব-রচিত বিঠবা স্তোত্র পাঠে তাঁহার একান্ত আগ্রহ হয়। বারংবার আবৃত্তি করিয়া নামদেবের অভঙ্গগাঁথা তিনি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। উপাস্য দেবতা বিঠবা ঠাকুরের সহিত অভঙ্গস্তুতি তুকার জপমাল্য হইয়াছিল। ভাবে তন্ময়তা আসিলেই স্বপ্নে দেবতার সাক্ষাৎ হইল, কাব্য রচনার অভিষেক হইল। মিল্টন বহু অধ্যয়নের পরও প্রচুর সংগ্রহের পর স্বর্গবিচ্যুতি (Paradise Lost) লিখিবার শক্তিলাভ করিয়াছিলেন, মধুসূদন বহু চেষ্টার পর এমন মধুচক্র রচনার আভাস দিয়াছিলেন,'গৌড়জন যাহে' আনন্দে 'মধুপান' করিতে পারিবে। তুকারামও বহু সাধনার পর দেবদত্ত অমানুষী কবিত্ব শক্তি লাভ করিলেন।

ভক্ত তুকারাম আপনার ভাবে বিভোর হইয়া অভঙ্গছন্দে কথকতা করিতে আরম্ভ করিলেন। এ কথকতা ব্যবসাদারী নহে, দক্ষিণা ও উদরান্নের জন্য কষ্টকল্পনা নহে। ইহাতে ছিল সরস প্রাণের আগ্রহ, নির্ম্মল ভক্তির স্ফটিক উৎস, ভাবসিন্ধুর অনন্ত-লহরী এবং বিশ্বাসের জ্বলন্ত তেজ। যে শুনিল,সে-ই মোহিত হইল, নাস্তিকের পাষাণ প্রাণ বিগলিত হইল, তুকারামের ভাবের, ভক্তির, বিশ্বাসের, এবং অমৃতস্যন্দিনী ভাষায় যশের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। চঞ্চল মলয়জ ছুটাছুটি করিয়া সে সৌরভ দিগদিগন্তর ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। ধর্ম্মের পথ মর্ম্মরমণ্ডিত, চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত, অতি সুগম, সহজ নহে। তুকারামের সুনাম ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ নির্য্যাতন ও মহা পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তুকারামের সারাজীবনই পরীক্ষাময়।

'যে করে মোর আশ, করি তার সর্ব্বনাশ,
তবু যে না ছাড়ে আশ,হই তার দাসানুদাস।'

ইহাই জীবনের বিধি। ধ্রুবের পরীক্ষা হইয়াছিল, প্রহ্লাদের পরীক্ষা হইয়াছিল, যিশুর পরীক্ষা হইয়াছিল, বুদ্ধের পরীক্ষা হইয়াছিল, নানকের পরীক্ষা হইয়াছিল;

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পরীক্ষা হইয়াছিল—তুকারামের পরীক্ষা কেন হইবে না? স্বর্ণকার বিশুদ্ধ অষ্টাপদ পুনঃ পুনঃ তীব্র উত্তাপে গলাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে। তুকারাম-কাঞ্চন অগ্নিতাপে তপ্ত হইয়া আরো অধিক শোভা পাইয়াছিলেন। হয়ত এই কঠিন পরীক্ষা না হইলে তুকারাম তুকারাম হইতেন না। হয়ত বা আমরা আজ বিশুদ্ধ স্বর্ণকে গিল্টি বলিয়া পলকের তরেও সন্দেহ করিবার অবসর পাইতাম।

তুকারাম, তুমি বৈরাগী হইতে পার, সর্ব্বত্যাগী হইতে পার, দিনান্তে মুষ্টিভোজী হইতে পার, জীর্ণ পর্ণকুটীরবাসী হইতে পার, বাসনার অতীত হইতে পার, কিন্তু হিংসা, দ্বেষ, ক্ষুদ্রতা, ষড়যন্ত্র, প্রভুত্বপ্রিয়তা, পরশ্রী-কাতরতা ও অন্ধ স্বার্থপরতা তোমাকে সহজে ক্ষমা করিবে না। সংসারের লোক যে সুনামের জন্য লালায়িত, তুমি কেন তাহা নির্ব্বিবাদে ভোগ করিবে? সংসারের লোক যে লোকের উপর আধিপত্যের জন্য না করিতে পারে, এমন পাপ নাই, তুমি কেন তাহা বিনা বিসংবাদে লাভ করিবে? সংসারের লোক কত পরিশ্রম করিয়া,কত ফিকির করিয়াও যে জ্ঞান, বিদ্যা এবং ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, তোমার কেন তাহা বিনা চেষ্টায় আপনা হইতে হয়? তোমার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়, এজন্য তোমাকে শাস্তিভোগ করিতেই হইবে—ইহাই সংসারের বিধি।

ক্রমশঃ

শ্রীরসিকলাল রায়।

হিন্দুর অভিব্যক্তিবাদ।

(সমুদ্রমন্থন, অবতারতত্ত্ব, কর্ম্মবাদ।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

সমুদ্র-মন্থনে আমরা সাধারণ বিশ্বাভিব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি—অবতারবাদে পার্থিব বিশেষাভিব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হইব। পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির অধিবাস আরম্ভ হওয়ার পর অবতার-লীলা প্রকটিত হইয়াছিল। তখন মাত্র স্থলভাগ জলের উপর উত্থিত হইয়াছে। সময় সময় তাহা জলপ্লাবিত হইত। ইহারই মধ্যে প্রবল প্লাবনে সেই স্থলভাগ গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া জীবকুল বিপন্ন ও বিনষ্ট হয়। মনুষ্যজাতির আদি পিতা মনু পূর্ব্বেই এরূপ মহাপ্লাবনের আশঙ্কা করতঃ একটী নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে নৌকাতে আরোহণ করিয়া একটী বৃহৎ মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করতঃ রক্ষা পাইলেন। এই মৎস্যই বিষ্ণুর মৎস্যাবতার। ইহা নর-মুখ ও মৎস্যদেহ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই রূপটী আমাদের নিকট এক্ষণে অদ্ভূত বলিয়া

প্রতীত হইলে ও মৎস্য ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী কোন জাতীয় লুপ্তজীব হওয়া অসম্ভব নহে।* শিশুমার (walrus) জাতীয় জলজন্তুর সহিত মনুষ্য মুখের সৌসাদৃশ্য সকলেরই সুবিদিত। শিশুমার নামই যেন এবিষয়ে প্রমাণ প্রদান করে। 'শিশুমার' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি অভিধানে'শিশুকে মারে যে',এইভাবে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় 'মার' শব্দটীর সমুদ্রার্থ বিস্মৃত হওয়াতেই এইরূপ অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে। Mermaid শব্দে আমরা পূর্ব্বোক্ত অর্থে এই মার শব্দের সংযোগ দেখিতে পাই। কোন কোন ভাষাবিৎ পণ্ডিত এই mer বা mere শব্দে বারি শব্দেরই অপভ্রংশ দেখিতে পান। তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তির সহিত বিশেষ পার্থক্য হয় না। উভয় ব্যুৎপত্তিতেই আমরা শিশুমার শব্দের অর্থ সমুদ্র-শিশু বা বারি (জল) শিশু করিতে পারি। তাহা হইলে এই নরাকৃতি মৎস্যের মনুষ্যের সহিত সহানুভূতি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। গ্রীকপুরাণেও আমরা Arion নামক সুপ্রসিদ্ধবাদক সমুদ্র পার হইবার সময় অর্থলোভী আততায়ী নাবিকদিগের হস্ত হইতে সঙ্গীতমোহিত ডল্ফিন্ নামক মৎস্যের পৃষ্ঠেবাহিত হইয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, এইরূপ কাহিনী পাঠ করি।†

মৎস্যাবতারে 'হয়গ্রীব' রূপে—হয়গ্রীব নামক বেদহর্ত্তা দৈত্যকে নিহত করা হয়, এরূপ আখ্যানও প্রচলিত আছে। এই আখ্যানটীতে অতি মূল্যবান্ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রহিয়াছে, আমরা দেখিতে পাইব। অশ্বমস্তক ধারণ করিয়া হয়গ্রীবরূপ গ্রহণ করা হয়, এইরূপ বর্ণনাপ্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—

"সুনাসিকেন কায়েন ভূত্বা চন্দ্রপ্রভস্তদা।
কৃত্বা হয়-শিরঃ শুভ্রং বেদানা মালয়ং প্রভুঃ।"
মহাভারতম্।

সুতরাং তখন অশ্বজাতির উদ্ভব হইয়াছিল ও মনুষ্য মৃগয়াতে তাহাকে হনন করিত ও তাহার চর্ম্মদ্বারা সজ্জিত হইত, ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। দৈত্য হয়গ্রীব কিরূপ জীব ছিল ও কিরূপেই বা বেদাহরণ করিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। হয়গ্রীব অবতারের বর্ণনায় আমরা অশ্বমুখের উল্লেখ পাই। এই হয়গ্রীব দৈত্যও তবে অশ্বমুখ জীবই ছিল, বোধ হইতেছে। কিম্পুরুষ বা কিন্নর নামক জাতি বিশেষের আকৃতির বর্ণনায় আমরা তাহাদের অশ্বমুখের উল্লেখ পাই। সুতরাং হয়গ্রীব এই জাতীয়ই ছিল। কিম্পুরুষ ও কিন্নর উভয় শব্দেরই যোগ ও রূঢ়ার্থ কুৎসিত নর সুতরাং ইহাদিগকে মনুষ্যেরই (নরের) অসম্পূর্ণবিকাশ, অতএব মনুষ্যের অগ্রবর্ত্তী জাতি বলিয়া বুঝা যাইতেছে। হয়গ্রীব বেদ হরণ করে—এই বেদ কি ?

* পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও মৎস্য ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী কোন অদ্ভুত জীবের কল্পনা করিয়া থাকেন যথা—"These fish ancestors of men were very different from any modern forms. The nearest approximation to them is to be found in the bichir of the Nile and in certain species of Africa, South America and Australia known as "difnoians." Dr. Theodore N. Gill quoted in Popular Science Siftings—March 28, 1908.

† শিশুমার জাতীয় মৎস্যের চর্ম্ম মনুষ্যের পরিধেয় রূপে (Seelskin) ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়ও অবগত হওয়া যায়। মৎস্যজীবী ও জলবিহারী আদিম মনুষ্যের এই চর্ম্ম পরিধান করা অসম্ভব নয়। মহা প্লাবনে যে নাবিক মনুর নৌকা পরিচালিত করিয়াছিলেন, তিনি এই মৎস্যের চর্ম্ম পরিহিত ছিলেন এবং তিনিই প্লাবন হইতে নৌকাসহ সকলকে উদ্ধার করেন বলিয়া ভগবানের মৎস্যাবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন, এরূপও হইতে পারে।

বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, যাহা দ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায়। ভাষা দ্বারাই আমাদের জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। বেদ শব্দাত্মক সুতরাং বেদকে শব্দব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে। সুতরাং বেদ ও ভাষা যে অভিন্ন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। ভাষার প্রথম উৎপত্তিতে তাহা শ্রুতিগতই মাত্র, সুতরাং বেদের এক নাম শ্রুতি। বেদাপহরণোপাখ্যানে আমরা ভাষার উৎপত্তিরই মূলতত্ত্ব জানিতে পারি বলিয়া বলিতে পারি। কিন্নর জাতিতেই প্রথম ভাষার স্ফুরণ হয়—ঈশ্বর হইতে বাক্‌শক্তি তাহারাই প্রথম প্রাপ্ত হয়—ইহাই ব্রহ্মা হইতে হয়গ্রীব কর্ত্তৃক বেদাপহরণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাষা রহস্য সম্বন্ধে কিন্নরেরা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে চাহে নাই। তাহাতেই আর্য্যনেতা অশ্বমুখ লাগাইয়া (পরিয়া) কিন্নর সাজিয়া কিন্নর জাতি হইতে ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাকে সংশোধন করতঃ তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করেন ও ইহার নাম সংস্কৃত ভাষা রাখেন। তৎপর আর্য্যগণ প্রবল হইয়া কিন্নর জাতিকে বিনাশ করেন, ইহাই হয়গ্রীব বধ। বরাহাবতার পর্য্যন্ত ভাষার সংস্করণ কার্য্য চলিয়াছিল বলিয়াই বরাহ বেদ উদ্ধার করেন, বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মৎস্যাবতারে ভাষা প্রাপ্ত হওয়াতে তখন বেদ ধৃত হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে। বরাহাবতারে ভাষার সংস্করণ শেষ হওয়ায় তৎকালে বেদের উদ্ধার হইয়াছে। বেদ অর্থে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভাষা বুঝিলে বেদের সম্বন্ধে হিন্দুদিগের অন্য সকল প্রচলিত সংস্কারেরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভাষা স্বতঃ উৎপন্ন বলিয়াই ইহা অপৌরুষেয়—বেদও অপৌরুষেয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ভাষা দ্বারা বস্তু সকলের নামকরণ হয়, তাহাতেই বেদ শব্দ হইতে বস্তু সকলের নাম দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত আছে। এই ভাষা ব্রহ্মার (ঈশ্বরের) শক্তি বলিয়া ব্রহ্মা বেদ ধারণ করেন উক্ত হইয়াছে এবং শব্দের ধ্বংস নাই বলিয়া বেদ নিত্য বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

কালে মৎস্য-কূর্ম্ম-কঙ্কাল দ্বারা ভূপঞ্জর ঔন্নত্য প্রাপ্ত হইলে, পৃথিবী পুনর্ব্বার বাসযোগ্যা হইলেন—ইহাই কূর্ম্ম, কূর্ম্মাবতার লীলা। কূর্ম্ম কঙ্কাল দ্বারা গঠিত হইয়াই যে পৃথিবী সমুদ্রোপরি ভাসমানা হইয়াছিলেন—আমেরিকা মহাদেশের আদিম জাতির পুরাণে তাহার অতি স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়—

"The striking analogy between the tortoise myth of North America and India, is by no means a matter of new observation, it was indeed noticed by Father Latifan nearly a century and a half ago. ......The earth is supported on the back of a huge floating tortoise, the tortoise sinks under and causes a deluge, and the tortoise is conceived as being itself the earth floating upon the face of the deep." "Early History of mankind", by Tylor.

ক্রমে জলোত্থিত পৃথিবী মৃত্তিকা সঞ্চয় দ্বারা বর্দ্ধমানা হইলেও তাহাতে আর্দ্রভূমিসুলভ মূলক জাতীয় উদ্ভিদ্ সঞ্জাত হইলে বরাহ জাতি আসিয়া তাহাকে দন্ত দ্বারা উৎখনন করিতে লাগিল—তখন বুঝা গেল, পৃথিবী প্লাবন হইতে নিরাপদ হইয়াছেন। ইহাই বরাহের দন্ত দ্বারা সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উদ্ধার। তাৎকালিক মনুষ্যের বরাহের ন্যায় কন্দমূলই একমাত্র আহার ছিল, সুতরাং বরাহের ন্যায় পৃথিবী খনন করিয়াই ইহারা আহার্য্য সংগ্রহ করিত এবং বরাহ চর্ম্ম দ্বারা

শরীর আচ্ছাদিত করিত। এই মনুষ্যই নৃ-বরাহ (নররূপী বরাহ) অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই নৃবরাহাবতার দ্বারা হিরণ্যাক্ষ দৈত্য নিপতিত হয়। এই দৈত্যের পিঙ্গল বর্ণ চক্ষু দ্বারা ইহাকে আর্য্যজাতির সহিত বৈরভাবাপন্ন অনার্য্য মঙ্গোলীয় জাতীয় মনুষ্য বলিয়াই বোধ হয়। এই বরাহবতারের পর কোন্ কোন পুরাণে "যজ্ঞাবতারের" উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অবতার মনুষ্য জাতির উন্নতির ইতিহাসে বিশেষ বিশেষ স্থান পাইবার যোগ্য। আমরা সকলেই "যজ্ঞ" বলিতে অগ্নিতে উপাসনা বলিয়া থাকি। সুতরাং এই 'যজ্ঞাবতার' যে সেই অগ্নির প্রথম আবিষ্কার সূচনা করিতেছে—তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। অগ্নির ব্যবহার মনুষ্যের মধ্যে যখন প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন হইতেই মনুষ্য উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেদ বা ভাষা যেমন একদিকে মনুষ্যের জ্ঞানের অর্গল উন্মোচিত করিয়াছে, তদ্রূপ অগ্নিও অপর দিকে মনুষ্যের উন্নতি-মার্গের প্রদর্শক হইয়াছে। এই দুইটীই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার—এবং হিন্দুগণ 'বেদ' ও 'যজ্ঞের' প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া এখনও সেই স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন।

এই অবতারের পরই নৃসিংহাবতার। তখন মনুষ্য অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলবান্ সিংহকে নিহত করিয়া আরও পরাক্রম্ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ সিংহচর্ম্ম পরিহিত হইয়া তিনি নরসিংহ মূর্ত্তি শত্রুর নিকট প্রকটিত করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিতে তিনি হিরণ্যকশিপু দৈত্য নিপাত করেন। গ্রীক্ পুরাণের Hercules কেও আমরা স্বকীয় বিক্রম-নিহত সিংহের চর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সিংহের মস্তক শিরোভূষণ করিয়া সিংহবিজয়ী রূপে পরিচয় দিতে দেখিতে পাই। আমাদের মহাদেবের বেশেও ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ও হস্তিচর্ম্ম উত্তরীয় হইয়াছে। ইহার পরই নরনারায়ণাবতার—এই অবতারে দ্বিবিধ ভাবের বিকাশ দেখা যায়। এক ভাবে হিংস্র স্বভাব দূরীভূত হইয়া মনুষ্যের ধর্ম্মভাব উৎপাদিত হইয়াছে। অপর ভাবে বীর ও ধর্ম্ম ভাবের সংমিশ্রণ হইয়াছে। এক্ষণে উভয়েই ঋষিরূপে পরিণত হইয়াছেন। এই খানেই আমরা প্রথম ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ দেখিতে পাই, তাহাতেই এই অবতাররূপী ঋষিদ্বয়কে ধর্ম্মরূপ মাতার গর্ভজাত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা:
"তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী। ভূত্বাত্মোপশমোপেত মকরোৎদুশ্চরংতাপঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়। চতুর্থাবতারে ধর্ম্ম ভার্য্যার গর্ভে নরনারায়ণ ঋষি হইয়া আত্মোপশমান্বিতদুশ্চর তপস্যা আচরণ করেন। অতঃপর 'ঋষভ' অবতারের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে মনুষ্য গোজাতির সহিত পরিচিত হইয়া ইহাদিগকে প্রতিপালিত করিতে আরম্ভ করেন, এইখানেই মনুষ্যের পশুপালন-ধর্ম্ম Pastoral stage প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাই মনুষ্যের সমাজ বন্ধনের প্রথম আয়োজন—তাহাতেই শ্রীমদ্ভাগবতে 'ঋষভ' অবতার আশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। "অষ্টমে মেরু দেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ। দর্শয়ন বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রম নমস্কৃতম্।"১৩ শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় অধ্যায়। অষ্টমে অগ্নীধ্র পুত্রের ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভ হইয়া অবতীর্ণ হন। এই অবতারে সুধীবর্গকে সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃত বর্ত্ম অর্থাৎ

পরম হংস সম্বন্ধীয় রীতিনীতি প্রদর্শন করেন।

এক্ষণে বামনাবতার আবির্ভূত হইলেন। এই অবতারে শান্ত ব্রাহ্মণভাবের স্ফূরণ হইয়াছে। পূর্ব্বের পশুবলের স্থলে এই সময়ে বুদ্ধিবলের অনুশীলন ও উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে শারীর বলের প্রাধান্য আর স্বীকৃত না হওয়ায় এই অবতারের শরীর অতি খর্ব্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের মতেও প্রথম মনুষ্য খর্ব্ব হইয়াই বিকাশ-লাভ করে। সভ্য মনুষ্যের মধ্যে মস্তিষ্কের অধিক বিকাশ হওয়াতে পূর্ব্বের শারীরবিকাশের সঙ্কোচ দ্বারাই তাহা সংসাধিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া প্রকৃতির সাম্যরক্ষার জন্য ঈদৃশ ব্যবস্থা হইয়াছে। মস্তিষ্কের উন্নতি হওয়াতে শত্রুপক্ষ কৌশলের দ্বারা জয়েরই চেষ্টা দেখা যায়। হিরণ্যকশিপুর বংশধর দৈত্যরাজ বলির নিকট এই বামনাবতার ত্রিপদা ভূমি যাচ্ঞা করিলেন—

"প্রাহ সস্মিতগম্ভীরং ভগবান্ বামনাকৃতিঃ।
মমাগ্নি শরণার্থায় দেহিং ভূমিং পদত্রয়ং॥"

বামন পুরাণে ৩১শ অধ্যায়।

বলিরাজ বামনের তিনপদ পরিমিত স্থান অতি সামান্য মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা পূরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সুচতুর বামন তখন পদ শব্দের অর্থ স্থান করিয়া তিনটী স্থান বলির নিকট চাহিয়া বসিল। তাহাতে বলির জন্য পাতাল ভিন্ন পৃথিবীতে আর স্থান রহিল না। সুতরাং প্রবল পরাক্রান্ত বিজয়ী এই দৈত্যরাজ একটী ক্ষুদ্রকায় মনুষ্যের বুদ্ধির নিকট পরাভূত হইয়া আমেরিকাতে নির্ব্বাসিত হইলেন ও তথায় রাজ্য স্থাপন করিলেন। তাহার চিহ্ন 'বলিভিয়া' নামে এখনও বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বোক্ত হিরণ্যাক্ষ বলির পূর্ব্বপুরুষ হিরণ্যকশিপুরই ভ্রাতা ছিল। উভয়ের নামের হিরণ্য শব্দ দ্বারা ইহারা তাম্রবর্ণ অনার্য্য জাতীয় মনুষ্য ছিল বলিয়াই বোধ হয়। আমেরিকার তাম্রবর্ণ আদিম অধিবাসীরা দৈত্যরাজ বলিরই বংশধর ছিল, ইহা বিশেষরূপে সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়। এইরূপে শত্রু নির্ম্মূলিত হইলে পর ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্থিতির জন্য রাজারূপে 'পৃথু' অবতারের আবির্ভাব হইল। তিনিই প্রথম ঔষধি বীজ হইতে শস্যোৎপাদন প্রণালী আবিষ্কার করিয়া লোকের খাদ্য শস্যের-প্রাচুর্য্য বিধান করেন। বীজ রোপণের নিয়ম প্রচারের দ্বারা পৃথিবীতে প্রভূত শস্যোৎপাদনের উপায় প্রদর্শন করেন বলিয়া তিনি পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি পৃথিবীর অধিক উৎপাদিকা শক্তি আবিষ্কার করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই অবতারের এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়—"ঋষিভির্যাচিতোভেজে নবমং পার্থিবংবপুঃ। দুগ্ধেমামোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উসত্তমঃ॥ ১৪। ১ম স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ঃ। পরে ঋষিগণের প্রার্থনায় পৃথুরূপ রাজ-দেহ ধারণ করিয়া নবম অবতার হন। হে বিপ্রবর্গ! এই অবতারে ভগবান্ পৃথিবী হইতে ঔষধ্যাদি সকল বস্তু দোহন করিয়াছিলেন, এই কারণে এ অবতার সর্ব্বজনের অতিশয় কমনীয়।"

এইরূপে শান্তিস্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহা অধিক কাল স্থায়ী হইল না, আর্য্যগণ এবার আত্মকলহে মত্ত হইলেন। পূর্ব্বে যে শারীরিক বলের চর্চ্চা ও আদর ছিল, তাহাতে আর্য্যদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়জাতি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। এক্ষণে তাঁহারা রাজশক্তি পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়া কেবল শারীর বলে

সমগ্র আর্য্যসমাজের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইল। কিন্তু তাহা নব-বিকাশোন্মুখ মানসিক ও নৈতিক-বলের পরিপন্থী হইল। সুতরাং এই ক্ষত্রিয় বলকে বিধ্বস্ত করিবার জন্যই পরশুরাম অবতীর্ণ হইলেন। তিনি পরশুসহায়ে পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয় করিলেন। এই সময়ে আমরা ব্রাহ্মণের দ্বারা পরশু নামক প্রথম অস্ত্রাবিষ্কারের প্রমাণ পাই। পরশুরামের প্রবলপরাক্রমের দ্বারা ক্ষত্রিয়গণ বিজিত ও বিনষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নিকট মস্তক অবনত করেন। সুতরাং সেই প্রভাব দ্বারা ক্ষত্রিয়ের যে উন্নতি হয়, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র শিষ্য ধনুর্ব্বাণধারী রামচন্দ্র অবতীর্ণ হন। ইনি অস্ত্রের আরও উন্নতপ্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহার লঙ্কাবিজয়াভিযান কেবল আর্য্যাধিকার বিস্তারের ইতিহাস নহে, কিন্তু আর্য্যদিগের সমুদ্রযান নির্ম্মাণের ও ইতিহাস। সৈন্যসহ সমুদ্র পারে আসিয়া শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন। তখন নল নামক বিশ্বকর্ম্মা পুত্র পিতার শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া জানিতে পারায় তাঁহারই দ্বারায় সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণের পরামর্শ করা হইল। তজ্জন্য নলের তত্ত্বাবধানে অগণিত বৃক্ষ সকল সমুদ্রতীরে যন্ত্রযোগে আনীত হইল। নলের অসাধারণ শিল্পকৌশলে সেই সকল বৃক্ষদ্বারা অর্ণবযান প্রস্তুত হইয়া তৎসমস্ত পরস্পর যোজিত হইয়াই সম্ভবতঃ সমুদ্রবক্ষে নৌ-সেতু গঠিত হইয়াছিল। সমুদ্র-পোত নির্ম্মাণ ও তৎসহায়ে সমুদ্রে আর্য্যরাজ্য বিস্তারের অনুষ্ঠান এই অবতারেই প্রথম হয় বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রকে বিশেষরূপে শাসন করেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

"নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্য চিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনিচক্রে.বীর্য্যাণ্যতঃপরম্‌॥"২২
১ম স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ঃ।

"অষ্টাদশাবতারে দেবকার্য্য করিবার বাসনায় নরদেহ অর্থাৎ রাঘবরূপ ধারণ করিয়া মহা বীরত্বের কার্য্য সমুদ্রনিগ্রহাদি করিয়াছিলেন।" এই অবতারে আরও একটী নূতন স্মরণীয় ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়, তাহা অনার্য্যজাতির মিলন। বানর ও ভল্লুক দ্বারাই শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যগঠিত হয়। পক্ষীজটায়ু ও সম্পাতিকে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিতে দেখা যায়। রাক্ষস বিভীষণ যুদ্ধের পূর্ব্বেই শ্রীরামচন্দ্রের সহিত মিত্রতাবন্ধন করেন। যুদ্ধের পর তিনি রাবণেরই রাজ্যে শ্রীরামচন্দ্রের সামন্তরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত জাতিই অনার্য্যবংশীয় মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ব্বোক্ত পশুপক্ষীর নামে আত্মপরিচয়, জাতীয়বিশিষ্ট চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। পশুবিশেষের চর্ম্ম কি পক্ষীবিশেষের পালক আপনার বেশ ভূষার জন্য নিয়ত ব্যবহার হইতে মনুষ্যজাতি বিশেষ যে তত্তৎ চিহ্নদ্বারা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে অসভ্য অনেক জাতিকেই পূর্ব্বোক্ত কারণে বা অন্তবিধ উপকারবশতঃ ইহাদের দ্বারা জাতীয় রক্ষার হেতুতে পশু বা পক্ষীর নামে আপনাদের সাধারণ জাতীয় নাম রাখিতে জানা গিয়াছে। ইহাকেই tolem বলা হইয়া থাকে। হিন্দুসমাজে সিংহ, নাগ প্রভৃতি বংশ নাম বর্ত্তমানেও প্রচলিত রহিয়াছে। রাক্ষসগণের ন্যায় নরমাংসভুক্ মনুষ্য জাতি এখনও বর্ত্তমান দেখা যায়। সুতরাং শ্রীরাম অবতারে হিন্দুদিগের সহিত অনার্য্য জাতিদিগের প্রথম সন্ধি ও সমাজবন্ধন ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা।

ইহার পর হলধর ও কৃষ্ণ,এই যুগলাবতার হলধরই প্রথম ভূমিতে হলচালনা দ্বারা কৃষিকার্য্যের পথপ্রদর্শক হইয়া আর্য্যসভ্যতার উৎকর্ষসাধন করেন। কৃষ্ণাবতারও এই তত্বই প্রচার করে। কারণ কৃষ্ণ শব্দ কৃষ্ (কর্ষণার্থক) ধাতু হইতে উৎপন্ন। তদীয় গোপালন, পশুপালন ধর্ম্মেরই ঐতিহাসিক নিদর্শন। শ্রীরামাবতারে আমরা আর্য্য জাতির সমুদ্র বিজয়ের প্রমাণ পাইয়াছি—এই অবতারে আমরা আর্য্য-জাতির বৈদেশিক উপনিবেশ স্থাপনের প্রমাণ প্রাপ্ত হই। গ্রীক্ দেবতা Hercules যে বলরামেরই সহিত অভিন্ন, তাহা গ্রীক্ পুরাতত্ববিৎ Diodorus ও Amian স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। ভারতের প্রত্নতত্ব বিশারদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত কর্ণেল টড্ পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন—Hercules বলরামের 'হরিকুলেশ' নামেরই অপভ্রংস—এবং Hercules বংশধর (Heraclide) দিগের গ্রীসে প্রত্যাবর্ত্তনের যে ঐতিহাসিক কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা যদুবংশ ধ্বংসের পর গ্রীসে বলরাম কর্ত্তৃক উপনিবেশ যাত্রার বিবরণ বই আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ এই বর্ণনাতে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যাবর্ত্তন কাহিনীর মূল ঘটনার ও অনুসন্ধান পাওয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে কর্ণেল টড্ (Col. Tod) লিখিয়াছেন,—

"Both Krishna and Baldeo (Balaram) or Apollo and Hercules are esh ঈশ (lords) of the race-(Cul-কুল) of Heri (Heri-cul-esh হরিকুলেস) of which the Greeks might have made the compound Hercules. Might not a colony after the Great War have migrated Westward? The period of the return of Heraclide, the descendants of Atreus (Atri, the progenitor of the Hericula) (হরিকুল) would answer. It was about half a century after the Great War.—Tod's Rajasthan.

ইহার পর ক্রিয়-বহুল, হিংসা-কঠোর বৈদিক উপধর্ম্ম হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিবার জন্য বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অহিংসা পরমধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বিশুদ্ধ উচ্চনীতির উপর ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

তৎপর ধর্ম্মের গ্লানি হইলে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য কলিতে কল্কী অবতারের আবির্ভাব হইবে।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, অবতারবাদে মনুষ্যের উন্নতিক্রমের সহিত ইতরজীবের উন্নতিক্রমও প্রদর্শিত হইয়াছে। মৎস্য, অশ্ব, কূর্ম্ম, বরাহ, সিংহ, বানর, ভল্লুক, পক্ষী, গো প্রভৃতি প্রাণিগণ যেরূপে মনুষ্যের সংস্রবে আসিয়াছে, তাহার পুরাবৃত্ত মনুষ্যের পুরাবৃত্তের সহিত এইখানেই গ্রথিত হইয়াছে।

মনুষ্যের জীবন কিরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছে, নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুসকলের কি প্রকারে আবিষ্কার হইয়াছে, উন্নতির বিবিধমার্গ কিরূপে প্রসারিত হইয়াছে—তাহার ধারাবাহিক স্থূল বিবরণ এই অবতারবাদ হইতেই সঙ্কলিত হইতে পারে।

মৎস্যাবতারে মনুষ্য জলবিহারী ছিল—হয়গ্রীবাবতারে মনুষ্য ভাষার আবিষ্কার করিয়া প্রকৃত মনুষ্যজীবন আরম্ভ করে—বরাহকল্পে জলসান্নিধ্যে মনুষ্যের প্রথম বাস ছিল এবং আর্দ্র পৃথিবীতে বাস হেতু তখন কন্দমূলই খাদ্য হইয়াছিল ও বরাহ চর্ম্মই আচ্ছাদন হইয়াছিল। ইহার পর ধন্বাবতারে প্রথম

অগ্নির আবিষ্কার হয়, তৎপর নৃসিংহাবতারে গভীর বনপ্রদেশের গুহাসমীপস্থ বৃক্ষাদি আশ্রয় হইয়াছিল—ফল মূল আহার্য্য হইয়াছিল ও সিংহচর্ম্ম পরিধান হইয়াছিল। এই প্রকার অবস্থানই এই সময়ে নির্দ্দিষ্ট হইত যেন জল সুপ্রাপ্য হয়—এই সময়ের অবস্থা বর্ণন করিয়া মৎস্তপুরাণে লিখিত হইয়াছে—

"পর্ব্বতাদধিবাসিন্যোহ্যনিকেতাঃ পরন্তপ।
রসোল্লাসঃ কালযোগাৎ ॥"

হে পরন্তপ! সে সময়ে কেহ গৃহে বাস করিত না। সকলেই পর্ব্বত গুহায় বা সমুদ্রতটে বাস করিত এবং ইচ্ছানুসারে জলের উদ্ভাবন করিতে পারিত।"

নরনারায়ণাবতারে ফল মূল ভক্ষ্য ও বৃক্ষের বল্কল পরিধেয় হইয়াছিল এবং বাসগৃহ ও ভূষণাদির প্রয়োজন ও (পত্র পুষ্পরূপে) তদ্দ্বারা সংসাধিত হইত—কূর্ম্ম পুরাণে লিখিত আছে,"সকৃদেব তয়া বৃষ্ট্যা সংযুক্তে পৃথিবীতলে প্রদ্দুরাসংস্তথা তাসাস্তেভ্যোবৃক্ষঃ প্রজায়তে। বর্ত্তয়ন্তিস্ম তেভ্যস্তাস্ত্রেতাযুগমুখে প্রজাঃ ॥"

সেই বৃষ্টিদ্বারা পৃথিবী একবার মাত্র সম্পৃক্ত হইলে, তাহাদিগের আশ্রয়স্বরূপ বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ঐ বৃক্ষ হইতে উহাদের আবশ্যক বস্তু সকল উৎপন্ন হইত। 'ত্রেতাযুগের প্রথমে প্রজাগণ ঐরূপ বৃক্ষ হইতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

"প্রাদুর্ব্বভূবুস্তাসান্তু বৃক্ষাস্তে গৃহসংজ্ঞিতাঃ।
বস্ত্রাণিতে প্রসূয়ন্তে ফলান্যাভরণানিচ ॥"

পুনর্ব্বার সেইরূপ গৃহভূত বৃক্ষসকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। সেই সকল বৃক্ষ, বস্ত্র, এবং আভরণরূপ ফল-প্রসব করিত।

ইহার পর ঋষভাবতারে পশুপালনকাল উপস্থিত হইল। এই সময়ে গবাদি পশু মনুষ্যের পালিত হইল। মনুষ্য ইহাদিগকে চারণ করিয়া ইহাদের দুগ্ধে পুষ্টি লাভ করিতে লাগিল এবং ওষধিশস্যে জীবন ধারণ করিতে লাগিল। এই সময়ে গুল্ম, ওষধি ও বৃক্ষাদির সবিশেষ বৃদ্ধি হইল। মনুষ্য এক্ষণে পূর্ব্বের সংহতি (যৌথ) জীবন পরিহার করিয়া প্রকৃত পারিবারিক জীবনে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিল। কূর্ম্ম পুরাণে এই সময় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে——

"যদা আলোবহুতরা আপন্নাঃ পৃথিবীতলে।
অপাম্ভুমেশ্চ সংযোগাদোষধ্যস্তাস্তদাভবন্ ॥
অকালকৃষ্টাশ্চানুপ্তা গ্রামারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ।
ঋতুপুষ্পফলৈশ্চৈব বৃক্ষগুল্মাশ্চ জজ্ঞিরে ॥
ততঃ প্রাদুরভূত্তাসাং রাগলোভশ্চ সর্ব্বশঃ।
অবশ্যম্ভাবিতার্থেন ত্রেতাযুগবশেনবৈ।
জগৃহুঃ পর্য্যগৃহ্নন্ত নদীক্ষেত্রাণি পর্ব্বতান্।
বৃক্ষগুল্মৌষধীশ্চৈব প্রসহ্যতুবথাবলম্ ॥"

'এইরূপে পৃথিবীতে যখন অধিক পরিমাণে জল উৎপন্ন হইল, তখন ঐ জল ও মৃত্তিকার সংযোগে ওষধি সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ ওষধির নিমিত্ত ভূমির কর্ষণ বা বীজ বপনের আবশ্যকতা হয় নাই। এইরূপে কতকগুলি আরণ্য,কতকগুলিগ্রাম্য,সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্দ্দশ প্রকার প্রত্যেক ঋতুতে বিভিন্ন পুষ্প ও ফল দ্বারায় শোভিত বৃক্ষ ও গুল্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিতা হেতু ত্রেতাযুগের প্রভাবে প্রজাদিগের বিষয়ানুরাগ ও লোভ সর্ব্বপ্রকারে প্রবল হইয়াছিল। সেই লোভবশতঃ তাহারা আপন আপন বলানুসারে নদীতীরস্থ ক্ষেত্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, গুল্ম ও ওষধি সকল বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে লাগিল।

ইহার পর বামণাবতার। এই অবতারে জাতিভেদ উৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত স্বাধিকারস্পৃহা. ব্রাহ্মণের মধ্যে

এখনও তেমন প্রবল হয় নাই। ব্রাহ্মণ এখনও পূর্ব্বেরই প্রাকৃতিক ভাবে জীবন পরিচালিত করিতে লাগিলেন—ভোগবাসনা অপেক্ষা ধর্ম্ম চর্চ্চাই তাঁহার অধিক অনুরাগের বিষয় হইল। তবে এক্ষণে তদীয় জীবন-পর্ব্বে এই পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইল যে তিনি বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সামান্য ভাবে ভূমিতে যজ্ঞীয়াগ্নির সান্নিধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ পার্থিব সম্পদ্ এইরূপে উপেক্ষা করাতেই বামন বলির নিকট ত্রিপদ ভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহার পর পৃথু অবতার। তাঁহা হইতেই পৃথিবীতে প্রথম রাজপদ ও রাজশাসন প্রবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বে ওষধি সকলের স্বভাবজাত শস্যই মনুষ্যের উপজীব্য ছিল। এক্ষণে পৃথু প্রথম বীজ-রোপণ কৌশল প্রচার করিয়া পৃথিবীতে শস্য উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এই আবিষ্কারটী জগতের এইরূপই হিতকর হইয়াছিল যে, ইহা ঈশ্বর যেন স্বয়ং পৃথুকে দিয়াছিলেন এরূপ বোধ হইয়াছিল—তাহাতেই কূর্ম্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"পিতামহ নিয়োগেন দুদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ ॥"

পরশুরামাবতারে পরশু দ্বারা বৃক্ষাদি ছিন্ন হইয়া শাখা প্রশাখাদি দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল ও যজ্ঞাগ্নিসংরক্ষিত হইয়াছিল। এই সময়েই অস্ত্রের ব্যবহার প্রথম আরম্ভ হয়। রামাবতারে ধনুর্ব্বাণ উদ্ভাবিত হইয়াছিল ও সমুদ্রপোতাদি প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেদপ্রণেতৃ ঋষিদিগের অগ্রণী বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের প্রভাব এই অবতারের উপর বিশেষ রূপে প্রখ্যাপিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে যে বৈদিক সাহিত্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল—তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর ক্ষত্রিয় জনকরাজ উপনিষদ্-জ্ঞান প্রথম প্রচার করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে এরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি রাজর্ষি আখ্যা দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। হলধরাবতারে কৃষি-কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া শস্যাদি উৎপন্ন হওয়ায় খাদ্যের প্রাচুর্য্য হইয়াছিল—শিল্পেরও সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই অবতারে ঋষিদিগের মধ্যে মহর্ষি ব্যাসদেবের ব্যক্তিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। তিনি এই ব্যক্তিত্বের দ্বারা যেন সকলকেই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এত মহিমান্বিত হইলেও তিনি বৈদিক ঋষি নহেন। তাঁহার পূর্ব্বেই বেদ সকল বিরচিত হইয়াছিল—এক্ষণে তিনি কেবল তাহাদিগের সঙ্কলন করিলেন, তাহাতেই তিনি 'বেদব্যাস' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি বেদপ্রণেতা না হইলেও পঞ্চমবেদরূপ মহাকাব্য "মহাভারত" ও "পুরাণ" সকল প্রণয়ন করিয়াছেন এবং উপনিষদমূলক "বেদান্ত-দর্শন"ও তিনিই রচনা করিয়াছেন। ধর্ম্মসংহিতা সকলও এই সময়েই রচিত হইয়াছিল এবং তাহাতেও তাঁহার হাত দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধাবতারে আর্য্য অনার্য্য সকলের মধ্যেই সভ্যতা ও ধর্ম্মের বিস্তার হইয়াছিল এবং ধর্ম্মনীতির সবিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এই সময়ে নীতিশাস্ত্র, গল্প প্রভৃতি নৈতিক সাহিত্য ও কাব্য নাটকাদির উৎপত্তি ও সবিশেষ পরিপুষ্টি লক্ষিত হয়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের সাতিশয় পারিপাট্যও এই সময়ে প্রদর্শিত হইয়াছিল। বৈদেশিক ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক বাণিজ্যও এই সময়ে সম্যক্ প্রকারে প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিতে পাইলাম যে হিন্দুর অবতারবাদে মানব-বিকাশের

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের 'মৃগয়াযুগ' (hunting-stage) 'পশুচারণ-যুগ' (pastoral stage) 'কৃষি-যুগ' (agricultural stage) ও শিল্প-বাণিজ্য-যুগ (industrial and commercial stage) প্রভৃতি সমস্তই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা আরও দেখিতে পাইয়াছি যে, মনুষ্যের বিশেষতঃ আর্য্য-জাতির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক সমস্ত বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির একটী সুলক্ষিত ঐতিহাসিক-সূত্র এই অবতার-বাদের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। এই অবতারবাদে আমরা আর্য্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পুরাবৃত্তও পাঠ করিতে সমর্থ হই। বেদই আর্য্যধর্ম্মের মূল—তাহাতেই প্রথমাবতারেই বেদ-ধারণের কথা পাওয়া যায়। কূর্ম্ম আর্য্য-জাতিকে পৃষ্ঠে আশ্রয়দান করিয়া বেদ-রক্ষার সাহায্য করিয়া অবতার হইয়াছেন। বরাহ-কল্পে বৈদিকধর্ম্ম পুষ্টিলাভ করিতে আরম্ভ-করে—তাহাতে বরাহ বেদোদ্ধার-কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু আর্য্য-দিগের ধর্ম্মচর্চ্চা শীঘ্রই অনার্য্যদিগের নিকট হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইল। ধর্ম্ম লইয়া আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে ভীষণ সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই সঙ্ঘর্ষে আর্য্যগণই বিজয়ী হইলেন। অনার্য্য-নেতা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য-কশিপু নিহত হইল। এবং অনার্য্য রাজা বলি আর্য্যভূমি হইতে বিতাড়িত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত দৈত্যদিগের নামের হিরণ্য শব্দটী বিশেষ রূপে লক্ষণীয়। হিরণ্য শব্দের অর্থ সুবর্ণ। সুতরাং হিরণ্যাক্ষ শব্দের অর্থ পীত-চক্ষু; হিরণ্যকশিপুর অর্থও বোধ হয় পীত-দেহ। ইহার মধ্যে আমরা যেন মঙ্গোলীয় জাতির লক্ষণই পাইতেছি। এখনও ইহারা পীতবর্ণ জাতি (yellow racc) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আমেরিকার Red Indian নামক আদিম জাতির তাম্রবর্ণ এই পীতবর্ণেরই রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অনার্য্যজাতির প্রতিপক্ষতা বিদলিত হইল বটে, কিন্তু আর্য্যদিগের মধ্যে ঘোরতর আত্ম-কলহ বাধিয়া গেল। তাহা-দিগের মধ্যে এক্ষণে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই দুই ভাগ হইয়া প্রাধান্যের জন্য প্রবল বিরোধ চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের পক্ষ আশ্রয় করিলেন,ক্ষত্রিয় বলের পক্ষ আশ্রয় করিলেন। পরিণামে ধর্ম্মেরই জয় হইল। এই জয়ের দ্বারা বেদ-চর্চ্চায় নবোৎসাহ সঞ্চারিত হইল, এবং বৈদিক সাহিত্য অপূর্ব্ব সমৃদ্ধি লাভ করিল। এই সময়েই বেদ সকলের পূর্ণ-পরিণতি হইল। ইহারই পর বেদ-বিভাগের কাল ও বেদানুগমনে পুরাণ ও সংহিতা-রচনার কাল আসিল। হিন্দুদিগের উচ্চ চিন্তা হইতে যে ষড়দর্শন প্রসূত হইল, তাহাতেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম বৈদিক বিকৃত কর্ম্ম কাণ্ডের বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেও সাত্ত্বিক কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড কখনও বর্জ্জন করে নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত আলোচনা দ্বারায় আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, হিন্দু আর্য্যদিগের সমস্ত উন্নতিরই মূলে বৈদিক ধর্ম্মই জল-সিঞ্চন করিয়াছে।

এক্ষণে আমরা হিন্দু অভিব্যক্তির অন্য একটী দিক্ প্রদর্শন করিব। হিন্দুগণ সমুদ্র-মন্থনে মৌলিক বা সাধারণ অভিব্যক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অবতারবাদে বিশেষাভিব্যক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মা-নুসারে আমাদের জীবনের উন্নতি অবনতি হয়, ইহা একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহাই কর্ম্মফল রূপে সুবিদিত হইয়াছে। আমরা

সাধারণতঃ শুনিয়া থাকি "বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী।" কর্ম্মের অনুগত হইয়াই বুদ্ধি আমাদিগের বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ জীবনগতি নির্ণয় করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যক্তিগত বিকাশের মূলে কর্ম্মই একমাত্র প্রবর্ত্তক। হিন্দুর স্বর্গনরকের সোপান এই কর্ম্মদ্বারাই গঠিত। সত্ব, রজঃ, ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের বিভিন্ন মিশ্রণের দ্বারা কর্ম্মের আবার অনন্ত-বৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে। হিন্দুর চৌরাশী লক্ষ বা কোটী কোটী যোনি ভ্রমণ বা জন্মান্তর এই কর্ম্মেরই বিপরিপাক মাত্র যথা—

"দেহাদুৎক্রমণঞ্চাস্মাৎ পুনর্গর্ভ্তেচ সম্ভবম্।
যোনি কোটী সহস্রেষু সৃতীশ্চাস্যান্তরাত্মনঃ।"
মনুসংহিতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়,৬৩ শ্লোক।

'দেহ হইতে জীবাত্মার উৎক্রমণ, পুনর্ব্বার গর্ভ্তবাসে জন্ম গ্রহণ এবং কুকুর শৃগালাদি কোটী কোটী নিকৃষ্ট জীবের গর্ভ্তে গমনাগমন, এই সকল আপন আপন কর্ম্মের ফল, ইহা চিন্তা করিবে।

সুতরাং হিন্দুর ব্যক্তিগত বিকাশের সংখ্যা গণনার সাধ্যাতীত। যেস্থলে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ এখনও সমস্ত বিকাশের সংখ্যা গণনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই, তৎস্থলে সেই স্মরণাতীত কালেই হিন্দু সমস্ত বিকাশের সংখ্যা গণনা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা অবশ্যই হিন্দুর দূর-লক্ষিণী প্রতিভার পরিচয়। হিন্দুর এই অগণিত ব্যক্তিগত বিশেষের কিন্তু মূল-রহস্য সেই এক কর্ম্মফল। ইহাকে Natural selection (স্বতঃ নির্ব্বাচন) বা adaptation (সাম্যকরণ) যাহাই বলা যাউক না কেন, সকলই সেই কর্ম্মফলেরই অর্থান্তর মাত্র। প্রাচ্য অভিব্যক্তিবাদের এই বিশালতা দ্বারা পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের চমৎকারিত্ব যে অনেক পরিমাণে আচ্ছন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু অভিব্যক্তিবাদের যে তিনটী পর্য্যায় আমরা উপরে প্রদর্শন করিলাম, তাহার সহিত হিন্দুর সাহিত্যবিকাশও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করিলেই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারি। বৈদিক উপাসনার প্রধান লক্ষ্য অমৃত পান করিয়া অমরত্ব (দেবত্ব) লাভ, তাই অমৃতকল্প সোমরস পান করিয়া ঋষিগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গাইয়াছিলেন—"অপাম সোমমমৃতা অভূমঃ," এই অমৃতই সমুদ্রমন্থনের সার। সুতরাং সমুদ্রমন্থন বৈদিক অভিব্যক্তি। পুরাণেই অবতারবাদের উৎপত্তি সুতরাং অবতারতত্ত্ব পৌরাণিক অভিব্যক্তি। কর্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদ দর্শনপ্রতিপাদিত সত্য, সুতরাং কর্ম্মবাদ দার্শনিক অভিব্যক্তি। এইরূপে হিন্দুর বেদ, পুরাণ, দর্শন, প্রধান তিন শ্রেণীর সাহিত্যে অভিব্যক্তির তিন ক্রম পরিস্ফুট হইয়া ইহা পূর্ণাবয়ব লাভ করিয়াছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গীতায় অবতারবাদ। (৩)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(চ) . অবতরণের প্রণালী (modus)।

অবতরণের প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মুক্তির পূর্ব্বে এবং পরে সাধকের কিরূপ অবস্থা হইয়া থাকে এবং মুক্তিরই বা অর্থ কি, তাহা অবগত হওয়া উচিত।

মুক্তির অর্থ স্বাধীনতা। জীব যে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ, কষ্ট প্রভৃতি ভোগ করিতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নাম মুক্তি। ইহাই মুক্তির সাধারণ অর্থ।

বৌদ্ধদের মতে নিম্নোক্ত প্রকারে মুক্তি পাওয়া যায়। "অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উদ্ভব হয়। সংস্কার হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয়। জ্ঞান হইতে নাম রূপের, এবং নাম রূপ হইতে ছয় ইন্দ্রিয়ের ছয় বিষয় উদ্ভূত হয়। ছয় ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে অনুভব, অনুভব হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে রাগ, রাগ হইতে সত্তা, সত্তা হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জরা, মৃত্যু, শোক, রোদন, ক্লেশ, খেদ, ও হতাশ। আমাদের সমগ্র দুঃখই এইরূপে উদ্ভূত হয়। অবিদ্যার বিনাশের দ্বারা সংস্কার নষ্ট হয়, সংস্কারের নাশ দ্বারা নামরূপের নাশ হয়, নামরূপের নাশ দ্বারা ছয় ইন্দ্রিয় বিষয়ের নাশ হয়। এইরূপ পর পর নাশ দ্বারা জন্ম ও আনুষঙ্গিক দুঃখের নাশ হয়।" * বৌদ্ধদের মতে ইহাই নির্ব্বাণ বা মুক্তি।

হিন্দুদের মতেও জন্ম জরা ব্যাধি প্রভৃতি হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি। কিন্তু সাধারণতঃ মানব আবর্ত্তে (Human Evolution) ফিরিয়া না আসার নামই অনেকে মুক্তি বলিয়া থাকেন।

উপনিষদে আমরা দুইটী মার্গের কথা দেখিতে পাই।—দেবযান ও পিতৃযান। সাধারণ জীব মৃত্যুর পর পিতৃযানে গমন করিয়া থাকেন। এই যানের অপর নাম ধূমমার্গ বা দক্ষিণায়ন। এই যানে যাঁহারা যান, তাঁহারা আবার মানব আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিয়া থাকেন। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, সাধারণ জীব ত্রিলোকীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহারা ত্রিলোকীর মধ্যে—অর্থাৎ ভূ, ভুবঃ ও স্বর্লোকের মধ্যে—যাওয়া আসা করিতেছে। ইঁহারাই পিতৃযানগামী।

দেবযানের অপর নাম উত্তরায়ণ। যে সকল সাধক দেবযানে যাত্রা করেন, তাঁহারা ত্রিলোকীর সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ মহঃ, জন তপঃ ও সত্য লোকে উপনীত হইয়া থাকেন। সত্যলোকের অপর নাম ব্রহ্মলোক। সেখান হইতে তাঁহাদের আর ফিরিতে হয় না। "এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" (ছান্দোগ্য, ৪।১৫।৫)—অর্থাৎ, এ পথে গমনকারীকে আর মানব আবর্ত্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি"—অর্থাৎ, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে দীর্ঘায়ুঃ ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমিত কাল বাস করেন। অন্যত্র—"স খল্বেবং

---

* পদ্মা।

বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে'' (ছান্দোগ্য ৮।১৫ ১), অর্থাৎ, তিনি এইরূপে থাকিয়া যত দিন ব্রহ্মার আয়ুঃ তত দিন ব্রহ্মলোকে থাকেন। কিন্তু গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে জীবের ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যথা,—"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন''—(৮।১৬ অর্থাৎ, হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতেও জীব পুনরায় আবর্ত্তন করিয়া থাকে। শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন যে, "ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ তত্রত্যানাম্ অনুৎপন্নজ্ঞানানাম্ অবশ্যংভাবি পুনর্জন্ম"—অর্থাৎ, ব্রহ্মলোক বা সত্য লোক যখন বিনাশী, তখন ব্রহ্মলোকগত জীবেরও অবশ্যই পুনর্জন্ম হইবে, যদি না তাহাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত সাধকের কল্পের মধ্যে আবৃত্তি হয় না, কিন্তু কল্প ক্ষয় হইলে, তাঁহাকেও ফিরিতে হয়, কারণ কল্পক্ষয়ে ব্রহ্মলোকাদিরও নাশ হয়।

পূর্ব্বোক্ত দেবযান ক্রম-মুক্তির পথ। যাঁহারা এইরূপ ক্রমমুক্তি-ফলদায়ী উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের ব্রহ্মলোক অবস্থান কালে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবেই তাঁহারা কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ লাভ করেন। স্মৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানো প্রবিশন্তি পরং পদম্॥

অর্থাৎ কল্পান্তে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে কৃতার্থ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন। সুতরাং মানব আবর্ত্তে না ফিরিলেই যে জীবের মোক্ষ হইবে, তাহা নহে। এ কল্পে সে মানব আবর্ত্তে না ফিরিতে পারে বটে, কল্পান্তে তাহাকে ফিরিতে হইবে। কিন্তু যদি সে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহা হইলে তাহার পরমপদ প্রাপ্তি হইবে।

উপাসনার তারতম্যে মুক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে। এই প্রকার মুক্তি সম্বন্ধে আমরা বায়ুপুরাণে দেখিতে পাই যে,—

"দশমন্বন্তরানীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ॥
বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ॥
নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োপাসকগণের মুক্তিকাল দশ মন্বন্তর, সূক্ষ্মভূত উপাসকগণের শত মন্বন্তর, অহঙ্কারোপাসকের সহস্র মন্বন্তর, বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের উপাসকের দশ সহস্র মন্বন্তর এবং এবং প্রকৃতি উপাসকের লক্ষ মন্বন্তর। নির্গুণ পুরুষকে পাইলে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিলে কাল পরিমাণ থাকে না অর্থাৎ প্রত্যাবৃত্তি হয় না।

সুতরাং মানব আবর্ত্তে ফিরিয়া না আসিলেই যে মুক্তি হয়, তাহা নহে। তাহা হইলে মুক্তির লক্ষণ কি? দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে সংবিতের (consciousness) অনন্ত ও সার্ব্বজনীন প্রসারণের (expansion) নামই মুক্তি। প্রসারিত সংবিতের উচ্চতম স্তর গুলিকেই সাধারণতঃ লোকে ভ্রমক্রমে মোক্ষপদ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ভগবান্ সংবিৎময়—তিনি সংবিৎ ভিন্ন আর কিছুই নহেন—তিনি চৈতন্যের মহাসমুদ্র। তাঁহাকে অবগত হইতে হইলে কেবল মাত্র সংবিতের দ্বারাই অবগত হইতে হইবে।

জীবও অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় সেই সংবিতের সামান্য কণা মাত্র উপাধিরূপ

গণ্ডির দ্বারা আবদ্ধ। তাহার ভিতর ঐশ্বরিক সংবিতের (Divine consciousness) ক্ষমতা সকল অপ্রকাশিত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্রমবিকাশের দ্বারা ঐ সকল ক্ষমতা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইজন্য দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্যের সংবিৎ কুসুমকলিকাবৎ অপ্রস্ফুটিত কিন্তু উহা যখন সম্যগ্ প্রস্ফুটিত হইবে, তখন ভগবান রূপ কুসুমে পরিণত হইবে। মনুষ্য সংবিতের সম্যগ্ প্রস্ফুটিত অবস্থার নামই মুক্তি বা মোক্ষ। কিন্তু এই অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে মনুষ্যকে সংবিতের বিভিন্ন পর্ব্ব পার হইতে হয়। এবং উক্ত পর্ব্ব পার হইতে মনুষ্যকে এক এক লোক ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য এক প্রকার সংবিতে ভূর্লোক ভোগ করিয়া থাকেন, তদপেক্ষা উচ্চতর সংবিতে ভুবর্লোক, তদপেক্ষা উচ্চতর সংবিতে স্বর্লোক এবং তদপেক্ষা উচ্চতর সংবিতে মহর্লোক ভোগ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে উচ্চ হইতে উচ্চতর সংবিতে জন, তপ ও সত্য লোক ভোগ করিয়া থাকেন। এই খানেই ব্রহ্মাণ্ডের সীমা শেষ। আরও উচ্চতর সংবিতে জীব ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া থাকেন। আমরা এইরূপ যোগীর কথা শাস্ত্রে পাইয়া থাকি। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্দে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ যোগী এক ব্রহ্মাণ্ডে মুক্ত হন বটে, কিন্তু অপর ব্রহ্মাণ্ডে মুক্ত নহেন, কারণ সকল ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকারে গঠিত নহে। এই প্রকারে জীব যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থায় যাইতে থাকেন, ততই সংবিতের প্রসারণ হইয়া থাকে। যখন তিনি উপাধিরূপ গণ্ডির বাহির হইয়া থাকেন, তখনই তিনি মুক্ত হইয়া থাকেন। ... ...

কিন্তু মুক্তির পরও মুক্তের আরও অবস্থা আছে। বৌদ্ধেরা এই সকল অবস্থাকে যথা ক্রমে পর-নির্ব্বাণ ও মহা-পর-নির্ব্বাণ বলিয়া থাকেন।

মুক্তির পরেও দুইটী পথ আছে। সেই দুইটী পথের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মুক্তের শরীর থাকে কিনা, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"অভাবং বাদরিরাহহ্যেবম্। ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ। দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধং বাদরায়ণোহতঃ। তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ। ভাবে জাগ্রদ্বৎ।"

(ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১০-১৪)

অর্থাৎ বাদরি বলেন, থাকে না, জৈমিনি বলেন, থাকে। বাদরায়ণের মত এই যে, শরীর থাকা না থাকা, মুক্তের ইচ্ছাধীন। যদি শরীর থাকে, তবে জাগ্রতবৎ ভোগ হয়; যদি না থাকে, তবে স্বপ্নবৎ ভোগ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—"স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা, সপ্তধা"—তিনি এক হন, তিন হন, পাঁচ হন, সাত হন, অর্থাৎ মুক্ত ইচ্ছাবশে কায়ব্যূহ রচনা করিতে পারেন এবং তাঁহার সংবিতের প্রসারণ হওয়াতে সেই সমস্ত দেহে অনুপ্রবেশ করিতে পারেন। মুক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বটে কিন্তু উক্ত হইয়াছে যে,—"জগদ্ব্যাপার বর্জ্জনম্" (ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৭)—অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি লয়ে তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। আরও উক্ত হইয়াছে যে "প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্ন আধিকারিমণ্ডলস্থোক্তে" (ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮)—অর্থাৎ তাঁহার যে ভোগ হয়, তাহা এই সৌরমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ। কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সকল ব্রহ্মাণ্ড সমান নহে, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে মুক্ত

হইয়াছেন, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন, অপর ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। শ্রীরামানুজও এই কথা বলিয়াছেন যে,—"আধিকারিকা অধিকারেষু নিযুক্তা স্তেষাং মণ্ডলানি লোকাঃ তৎস্থাভোগা মুক্তস্য ভবন্তি।"

এখন দেখা যাউক, মুক্তের কি কি ঐশ্বর্য্য ভোগ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—"আপ্নোতি স্বারাজ্যম্ আপ্নোতি মনসস্পতিং সর্ব্বে দেবাঃ তস্মৈ বলিম্ আহরন্তি। সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুৎতিষ্ঠন্তে। সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"—অর্থাৎ তিনি স্বরাট্ হন, তিনি মনের অধিপতি হন। সমস্ত দেবগণ তাঁহাকে বলি প্রদান করেন। সংকল্প মাত্রেই পিতৃগণ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন। তিনি সমস্ত লোকে কামচর হইয়া থাকেন। ইহাকেই স্বারাজ্যসিদ্ধি বলে। বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে, মুক্তের যে ঐশ্বর্য্য, তাহা সংকল্প মাত্রে উপনীত হয়।

কিন্তু আমাদের মনে এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে যে, সকল মুক্তেরাই কি এইরূপ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন? তাহা করেন না। এই জন্য বৌদ্ধেরা মুক্তের ভিতর তিনটী শ্রেণী করিয়াছেন। যথা,—ধর্ম্মকায়মুক্ত, সম্ভোগকায়মুক্ত এবং নির্ম্মাণকায় মুক্ত। যে সকল মুক্ত পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাঁহাদিগের স্বারাজ্যসিদ্ধি হইয়াছে, তাঁহাদিগকে সম্ভোগকায় মুক্ত বলে। বিদেহমুক্তদিগকে ধর্ম্মকায় মুক্ত বলে। তাঁহাদের শরীরের নাশ হইলে, তাঁহারা ব্রহ্মে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমক্ষ্যেঽথ সংপৎস্যে"—অর্থাৎ জীবন্মুক্তের ততদিন বিলম্ব হয়, যতদিন না তাঁহার প্রারব্ধক্ষয় হয়, পরে তিনি ব্রহ্মে সংযুক্ত হন। তাঁহাদের আর তখন কোন পৃথক্ সত্তা থাকে না। বিদেহমুক্ত সম্বন্ধে বাসদেব বলিয়াছেন যে—"বিদেহ-প্রকৃতিলয়াস্তু মোক্ষপদে বর্ত্তন্তে, ন লোক মধ্যে ন্যস্তা ইতি" (পা। সূ বিভূতি পদ, ২৬)—অর্থাৎ বিদেহ ও প্রকৃতি লয় যোগীগণ মোক্ষপদে অবস্থিত, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বাস করেন না, উপনিষদোক্ত দৃষ্টান্তের লবণের পুত্তলি যেমন জলে মিশিয়া যায়, ধর্ম্মকায়মুক্তগণও সেইরূপ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। এই দুই প্রকার মুক্ত ভিন্ন আরও এক প্রকার মুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে নির্ম্মাণকায় মুক্ত বলা হয়, ব্যাসভাষ্যে ইহাদিগকে 'নির্ম্মাণদেহ' বলা হইয়াছে। তাঁহারা ব্রহ্মে নিমজ্জিত হন বটে, কিন্তু তাঁহাদের পৃথক সত্তা থাকে। তাঁহারা তাঁহাদের সংবিত্তের কেন্দ্র (centres) অক্ষুণ্ণ রাখিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করিলেই ব্রহ্মে নিমজ্জিত হন এবং মনে করিলেই বহির্গত (re-emerge) হইয়া থাকেন।

ধর্ম্মকায় ও নির্ম্মাণকায় মুক্তগণ দুইটী বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই দুইটী পথ জীবন্মুক্তির পর পারে। এই দুইটী পথ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ইঙ্গিতে আভাস দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিক পথাবলম্বী, তাঁহারা এই দুইটী পথ সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন। Voice of the silence নামক গ্রন্থে এই দুইটী পথ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। *

* The Shanga robe, 'tis true, can purchase light eternal. The Shanga robe alone gives the Nirvana of destruction; it stops rebirth, but, O, Lanoo, it also kills compassion. No longer can the perfect Buddhas, who don the Dharmakaya glory, help mans' salvation. Alas! shall selves be sacrificed to self; man-

"সংজ্ঞা (বোধি) অনন্ত জ্যোতিঃ আহরণ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার ফলে যে নির্ব্বাণ লাভ হয়, তাহা বিনাশের নামান্তর। তাহাতে গতাগতি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা করুণা নিঃশেষিত হইয়া যায়। যে সিদ্ধ বুদ্ধ ধর্ম্মকায়ের মহিমায় আপনাকে মণ্ডিত করেন, তিনি জীবের উদ্ধার সাধনে সহায় হইতে পারেন না। হায়! ব্যষ্টির জন্য কি সমষ্টি উৎসন্ন হইবে? একের কল্যাণের জন্য কি সমগ্র মানবের কল্যাণ নিরুদ্ধ থাকিবে? এই নির্ব্বাণের পথ আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার পথ; ইহা অনাবৃত (সাধারণ) পন্থা। রহস্য পথের পথিক বোধিসত্বগণ, পরম কারুণিক বুদ্ধগণ, এই পথ পরিহার করেন। জীবের হিতার্থে দেহ বহন করা প্রথম সোপান। ছয় পরিমিতা আয়ত্ত করা দ্বিতীয় সোপান। যিনি নির্ম্মাণকায়ের দীনবেশে বিভূষিত হন, তাঁহাকে জীবের পরিত্রাণের জন্য আপনার অনন্ত সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়। নির্ব্বাণের ভূমানন্দের অধিকারী হইয়া সে আনন্দ পরিবর্জ্জন করা—ইহাই এই পথের সর্ব্বোচ্চ শেষ সোপান। সেবার পথে ইহার উপর আর নাই। ইহাই জীবের হিতার্থে আত্মোৎসর্গকারী সর্ব্বসিদ্ধ বুদ্ধগণের মনোনীত রহস্য পথ" (পন্থা, ৩য় ভাগ, ৯ম সংখ্যা)।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, জীবন্মুক্তির পরে কি কি দুইটী পথ আছে। একটী নির্ব্বাণের পথ (Path of Emancipation) আর একটী সেবার পথ (Path of Renunciation)। "নির্ব্বাণের পথ অনন্ত সুখময়। সে পথের পথিককে জরাজন্মমৃত্যুগ্রস্ত নশ্বর সংসারে আর পদার্পণ করিতে হয় না। তিনি জগতের দুঃখ দহনের অতীত হইয়া কর্ম্মচক্রে নিপীড়িত জীবমণ্ডলীর সম্পর্ক হারাইয়া, একান্তে নিশ্চিন্তে ভূমানন্দ অনুভব করেন। কিন্তু যিনি সেবার পথের পথিক, যিনি জীবের হিতব্রত উদ্যাপন করিতে উদ্যত, যিনি সংসারের দুর্ভর দুঃখভার নিজস্কন্ধে বহন করিতে প্রস্তুত, যিনি হৃদয়ব্যাপী করুণার বশে অসংখ্য জীবের দুঃখের তুলনায় নিজের ক্ষুদ্র সুখ তুচ্ছ করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি করিবার জন্য দেহবন্ধ স্বীকার করিতে হয়। আর জীবকে নানা দুঃখের অঙ্কুশ তাড়নায় নিপীড়িত দেখিয়া করুণাবসে আর্দ্র হইতে হয়। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যত দিন একটী জীবও সংসারজালে নিবদ্ধ থাকিবে, তত দিন আমি নির্ব্বাণের সুখ তুচ্ছ করিব; যত দিন জগতে একটী প্রাণীরও উষ্ণশ্বাস প্রবাহিত হইবে, একটী জীবেরও শুষ্কনেত্রে অশ্রুবারি বিগলিত হইবে, তত দিন আমি মহিমামণ্ডিত মুক্তির পথের পথিক হইব না।" *

এই দুইটী পথের মধ্যে সেবার পথই শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধধর্ম্মে সেবার পথের বিশেষ প্রশংসা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল সাধক

kind unto the weal of units? Know, O, beginner, this is the open path, the way to selfish bliss, shunned by the Bodhisattvas of the Secret Heart, the Buddhas of compassion.

To live to benefit mankind is the first step. To practise the six glorious virtues is the second. To don Nirmankaya's humble robe is to forego eternal bliss for self, to help on man's salvation. To reach Nirvana's bliss, but to renounce it, is the supreme, the final step—the highest on renunciation's path. Know, O, disciple this is the secret path, selected by the Buddhas of perfection, who sacrificed the self to weaker selves."

* পন্থা, ৩য় ভাগ, ৯ম সংখ্যা।

সিদ্ধ হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রথম হইতেই সাবধান করিয়া দেওয়া হয় যেন তাঁহারা নির্ব্বাণের পথ ত্যাগ করিয়া সেবার পথ গ্রহণ করেন, আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া যেন দুঃখকাতরক্লিষ্ট জীবের জন্য নিজকে উৎসর্গ করিতে শিক্ষা করেন। Voice of the Silence নামক পুস্তকে এইরূপই উল্লিখিত হইয়াছে। *

কল্পকল্পান্তর ধরিয়া যাঁহারা এইরূপে নির্ব্বাণকে তুচ্ছ করিয়া সেবার পথে ব্রতী হইয়া থাকেন, তাঁহারাই পর-নির্ব্বাণের অধিকারী হইয়া থাকেন। মহাপরনির্ব্বাণের অবস্থা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর। না জানি সেই অবস্থা পাইতে সাধককে আরও কত সাধনা করিতে হয়?

বৌদ্ধদিগের মতে নির্ব্বাণী বুদ্ধদিগকে "প্রত্যেক বুদ্ধ" বলে। "প্রত্যেক বুদ্ধ" নিন্দাবাচক শব্দ; যাঁহারা জীবের দুঃখে উদাসীন হইয়া সেবার পথ পরিহার করিয়া, নির্ব্বাণের ভূমানন্দে মগ্ন থাকেন, তাঁহাদিগকে "প্রত্যেকবুদ্ধ" বলে। হিন্দুধর্ম্মে সেবার পথ সম্বন্ধে এত পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই। স্থানে স্থানে কেবল মাত্র ইঙ্গিত করা হইয়াছে। জৈমিনি-মীমাংসাদর্শনের মতে সত্য সত্যই কাহারও মুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অপর কোন কোন দার্শনিক এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, একটী জীব বদ্ধ থাকিতে অপর জীব মুক্ত হইতে পারে না।

* The open way, no sooner hast thou reached its goal will lead thee to reject the Bodhisattvic body, and make thee enter the thrice glorious state of Dharmakaya which is oblivion of the world and men for ever.

The secret way leads also to Paranirvanic bliss—but at the close of Kalpas without number; Nirvanas gained and lost from boundless pity and compassion for the world of deluded mortals.

সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহ মুক্ত হন নাই। ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি কেহই নহেন। তাঁহাদিগকে বদ্ধজীবগণের অনুরোধে অপেক্ষা করিতে হইতেছে। ঐ সকল দার্শনিকগণের মত এইরূপ যে আত্মা এক অখণ্ড বস্তু, উহার কোন অংশে যদি মায়ার দাগ থাকে, তাহা হইলে অপর অংশ কেমন করিয়া মুক্ত পদবাচ্য হইবে? যখন একেবারে মায়ার দাগ মুছিয়া যাইবে, যখন সমস্ত জীব মুক্ত হইবে, তখনই জীবন্মুক্তগণ মুক্ত নামের অধিকারী হইবেন। শরীরের এক অংশ রোগগ্রস্থ থাকিলে তাহাকে সুস্থ বলা যায় না। ফল কথা, নির্ব্বাণ মুক্তি অতীব দুর্লভ, "শুকোমুক্তঃ প্রহ্লাদো বা", উহা কাহারও ঘটিয়াছে কি না, সংশয় স্থল। সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টি প্রভৃতি মুক্তি আপেক্ষিক মাত্র। উহাতে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে।

হিন্দুধর্ম্মের ভিতর অধুনা সেবার পথ যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সকলের মুক্তির উপরই ঝোঁক দৃষ্টি হয়। কিন্তু এই সেবার পথ চাপা পড়িয়া যাইলেও স্থানে স্থানে ইহার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রে আমরা নিম্নলিখিত সূত্রটী দেখিতে পাই; যথা—"যাবদধিকারম্ অবস্থিতিরাধি কারিকাণাম্"। (৩।৩।৩২)—অর্থাৎ, অধিকারী পুরুষগণ অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মবিদামপি যেষাংচিৎ ইতিহাসপুরাণয়োঃ দেহান্তরোৎপত্তি দর্শনাৎ। তথাহি অপান্তরতমানাম বেদাচার্য্যঃ পুরাণর্ষিঃ বিষ্ণুনিয়োগাৎ কলি দ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সংবভূবেতি স্মরণং। বশিষ্ঠশ্চ ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রঃ সন্ নিমিশাপাদপগত

পূর্ব্বদেহঃ পুনর্ব্রহ্মাদেশাৎ মিত্রাবরুণাভ্যাম্ সম্ভূবেতি। ভৃগ্বাদীনাং অপি ব্রহ্মণ এব মানসানাং পুত্রাণাং বারুণে যজ্ঞে পুনরুৎপত্তিঃ স্মর্য্যতে। সনৎকুমারোহপি ব্রহ্মণএব মানসঃ পুত্রঃ স্বয়ং রুদ্রায় বরপ্রদানাৎ স্কন্দত্বেন প্রাদুর্বভূব। এবমেব দক্ষ নারদ প্রভৃতীনাং ভূয়সী দেহান্তরোৎপত্তিকথা তেন তেন নিমিত্তেন ভবতি। *** এবমপান্তরতমঃ প্রভৃতয়োপি ঈশ্বরাপরমেশ্বরেণ তেষু তেষু অধিকারেষু নিযুক্তা সন্তঃ সত্যপি সম্যগ্ দর্শনে কৈবল্য হেতৌ অক্ষীত কর্ম্মাণে যাবদধিকারমবতিষ্ঠতে। তদবসানে চ অপবৃষ্যন্তে।"

অর্থাৎ, ইতিহাস পুরাণাদিতে দেখা যায় যে, কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ (জীবন্মুক্ত) দেহান্তর স্বীকার করেন। যেমন অপান্তরতমা নামে জনৈক পুরাতন বেদাচার্য্য ঋষি ভগবান বিষ্ণুর নিয়োগে কলিদ্বাপরের সন্ধি সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ একজন ঋষি, তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র, তিনিও নিমি রাজার শাপে গতদেহ হইয়া ব্রহ্মার আদেশে পুনর্ব্বার মিত্রাবরুণ দ্বারা পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বরুণের যজ্ঞে আবার উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এইরূপ দক্ষ নারদ প্রভৃতির ভূয়োভূয়ঃ দেহান্তর গ্রহণ শুনা যায়। ব্রহ্মার অপর মানস পুত্র সনৎকুমার, তিনিও রুদ্রের বর উপলক্ষে কার্ত্তিকেয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এমতে অপান্তরতমা প্রভৃতি ঈশ্বরগণ পরমেশ্বরের নিয়োগে বিশেষ বিশেষ অধিকারের ভার গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণ সাধক কৈবল্য সত্ত্বেও অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করেন; অধিকার শেষ হইলে পরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। "এইরূপ অধিকারী পুরুষের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেবর্ষি নারদ। বহু যুগযুগান্তর পূর্ব্বে নারদ অপূর্ব্ব সাধনা বলে নির্ব্বাণ লাভের যোগ্যতা লাভ করেন। কিন্তু তিনি জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া অতল নির্ব্বাণ সাগরে নিমগ্ন হইতে সম্মত হন নাই। সেইজন্য আমরা দেখি যে, যদিও তিনি দেব-ঋষি এবং স্বভাবতঃ মানবের সহিত সম্পর্কহীন, তথাপি জীবের প্রতি অপার করুণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি জগন্ময় নিয়ত হরিনামামৃতের উৎস খুলিয়া দিতেছেন; আর যেখানে যে সাধক আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও সাধনপথে বিঘ্ন বিপত্তি অনুভব করিতেছেন, নারদ বিধিমতে তাঁহার সাধন পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। পঞ্চমবর্ষীয় অনাথ শিশুকে কে পদ্মপলাশলোচন হরির সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল? জননী-জঠর-স্থিত ভক্তাবতার প্রহ্লাদকে কে ইন্দ্রের বজ্রাঘাত হইতে বাঁচাইয়াছিল? অধিকারী পুরুষ নির্ব্বাণপরাঙ্মুখ দেবর্ষি নারদ।"

"অধিকারী পুরুষের অপর দৃষ্টান্ত মনু, * সপ্তর্ষি প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের ২য় অংশে কোন্ কোন্ মন্বন্তরে কে কে মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি হইবেন বা হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আছে। এ বিবরণ অলীক উপাখ্যান নহে। প্রত্যেক মনু ও সপ্তর্ষিগণ পুরাকল্পের জীবন্মুক্ত সিদ্ধ পুরুষ।

* মনুর সহিত অপর ১৯ জন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশক ঋষির নাম উল্লেখযোগ্য। যথা,—"মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যোমনঃঙ্গিরা যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী। পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিতা দক্ষগোতমৌ শাতপো বশিষ্ঠশ্চধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ।" ইঁহারা সকলেই ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রকাশক ঋষি। ইঁহারা সকলেই অধিকারী পুরুষ। লেখক।

তাঁহারা স্বেচ্ছায় নির্ব্বাণ তুচ্ছ করিয়া ভগবানের নিয়োগে জগৎ কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন ভার গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান আছেন।"

"মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এইরূপ একটী মহাপুরুষের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তিনি পরে সাবর্ণি মনু হইয়াছিলেন। ইনিই অষ্টম মনু। স্বারোচিষ মন্বন্তরে (কোন পুরাকল্পে, যাহার বিবরণ আমরা কিছু জানি না) ইনি সুরথ নামে রাজা ছিলেন। কিরূপে কোন্ সাধনা বলে এবং কি উপায়ে মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া তিনি সিদ্ধি লাভ করেন, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে তাহারই বর্ণনা আছে। তাহা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে সুরথের এক বৈশ্য বন্ধু তাঁহারই অনুসৃত সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন এবং নিম্ন শ্রেণীর সাধক বলিয়া নির্ব্বাণের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সাধকপ্রবর সুরথ নির্ব্বাণের ভূমানন্দ অয়ত্ত করিয়াও ভবিষ্য মন্বন্তরে মনুর অধিকাররূপ গুরুভার বহন করিবার জন্য কাল প্রতীক্ষা করেন।"

"আরও উচ্চ শ্রেণীর অধিকারী পুরুষ ইন্দ্রাদি দেবরাজগণ সৃষ্টি সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের পরিদর্শন রূপ অধিকার গ্রহণ করিয়া, পরমেশ্বরের নিদেশ অনুসারে অবস্থান করিতেছেন। বিষ্ণুপুরাণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, কল্পে কল্পে অধিকারী দেবতার পরিবর্ত্তন হয়; অর্থাৎ এ কল্পে যিনি ইন্দ্রের অধিকারে নিযুক্ত আছেন, কল্পান্তে তাঁহার অধিকার পরিসমাপ্তি হইলে, অপর একজন ইন্দ্রত্বের ভার বহন করিতে নিযুক্ত হন। এইরূপ অগ্নি, যম, বরুণ প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণের সম্বন্ধেও ঘটে।"

"কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে বৈদিক দেবতারা গুণময় ভগবানের এক একটী গুণের কল্পিত মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাঁহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাঁহারা যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে বিশ্বরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ পরিচালন করিতেছেন, একথা অনেকে অবগত নহেন। কিন্তু সত্য সত্যই দেবতারা অধিকারী মুক্ত পুরুষ। অর্থাৎ মানব সাধকের মধ্যে কেহ কেহ যেমন জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াও, মনু সপ্তর্ষি প্রভৃতির অধিকারে আপনাদিগকে নিযুক্ত করেন, সেইরূপ দেব সাধকের মধ্যেও কোন কোন দেবতা নির্ব্বাণকে তুচ্ছ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অধিকারের ভার স্বীকার দ্বারা জগদীশ্বরের সহায়তায় নিযুক্ত থাকেন। সাংখ্যসূত্রে "উপাস্য বা মুক্তস্য" এইরূপ একটী সূত্র আছে। সাংখ্যকারের মতে বৈদিক সূক্ত দ্বারা যাঁহাদের উপাসনা করা হইয়াছে, তাঁহারা ঈশ্বর নহেন, মুক্ত পুরুষ; অর্থাৎ সাধনার ফলে দেবতার পদবীতে উন্নত নির্ব্বাণতুচ্ছকারী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। ইঁহারাই বৌদ্ধ ধর্ম্মোক্ত পরম কারুণিক সর্ব্বসিদ্ধ বুদ্ধগণ, যাঁহারা জগতের হিতার্থে কল্প কল্পান্তর নির্ব্বাণ-সুখ পরিহার করিয়া জীবের কল্যাণের জন্য আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন।" *

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা অবগত হইলাম যে, যাঁহারা নির্ব্বাণে সুখ তুচ্ছ করিয়া সেবার পথে অগ্রসর হন, তাঁহারা অধিকারী পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। এই সকল অধিকারী পুরুষগণ নির্ম্মাণকায়ের দীনবেসে সজ্জিত হন। ইঁহাদের সংবিৎ জীবমুক্ত ধর্ম্মকায়ের সংবিৎ অপেক্ষা প্রশস্ত। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পর-নির্ব্বাণ এবং অপরে মহা-পরনির্ব্বাণের অধিকারী হইয়া

* পন্থা, ৩য় ভাগ, ৯ম সংখ্যা পৃঃ ২৫৭-২৬৩ দ্রষ্টব্য।

থাকেন। অধিকারী পুরুষগণের মধ্যে দক্ষ নারদ প্রভৃতি অপেক্ষা মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ এবং মনু, সপ্তর্ষি অপেক্ষা ইন্দ্রাদি দেবরাজগণ শ্রেষ্ঠ—এইরূপে আমরা ক্রমোচ্চ-বিধানে সংবিতের প্রসারণ দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকি।

নির্ম্মাণকায়ের দীন বেশে সজ্জিত, পরম কারুণিক সর্ব্বসিদ্ধ বুদ্ধগণই অধিকারীগণের ভিতর শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই সকল অধিকারী পুরুষগণের ভিতর যিনি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হইবার প্রয়াস করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ভার নিজ মস্তকে বহন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত,—তিনি চাহেন যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের সম্পূর্ণ অধিকার গ্রহণ করিবেন। এইরূপ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে কত অধিকারী মহাপুরুষগণ ঈশ্বর হইবার প্রয়াস করিয়া থাকেন। ইঁহাদেরই সত্তা বিশ্বব্যাপী, ইঁহারা সকলে বিভু এবং সকলেই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর। ইঁহাদের মধ্যে যিনি সাধনার বলে সকলের অপেক্ষা অগ্রসর হইয়া থাকেন, তিনিই বিরাট্ পুরুষের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কল্পান্তরে তিনিই বিরাট পুরুষ হইয়া থাকেন। অন্য সকলে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের সংবিতের কেন্দ্র অক্ষুণ্ণ রাখেন। বিশ্বের পালন জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইঁহাদিগকেই বিষ্ণুর লীলাবতার বলে। যদিও তাঁহারা বিরাট পুরুষে লীন হইয়া তাঁহার সহিত অভিন্ন ভাব ধারণ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা আছে। যেমন অসংখ্য কোষাণুর (cells) সমষ্টিতে জীবদেহ নির্ম্মিত হইলেও কোষাণু সকলের স্বতন্ত্রতা আছে, অর্থাৎ কোষাণুর সমষ্টি জীবের একটী মহান্ সংবিৎ বহন করিলেও প্রত্যেক কোষাণুর যেমন ব্যষ্টিগত এক একটী পৃথক সংবিৎ থাকে, সেই প্রকার উক্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ যখন ভগবানে নিমজ্জিত হইয়া ভগবানের ঐশ্বরিক সংবিতের সহিত এক হইয়াছেন, তখন কোষাণুর ন্যায় তাঁহাদের পৃথক অস্তিত্ব থাকে। যেমন সুস্থ দেহের প্রত্যেক কোষাণু নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেহের পুষ্টি ও পরিণতির জন্য আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত অধিকারী পুরুষগণ নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে বিরাট পুরুষে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। যখন বিশ্বের পালনের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহারা অবতার রূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যদ্যপি তাঁহারা এ ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট পুরুষ হইতে সক্ষম হন নাই, অন্য ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহারাই বিরাট পুরুষ হইবেন।

আমরা এক্ষণে মুক্তির পূর্ব্বে সাধকের অবস্থা জীবন্মুক্তির পরে অধিকারী পুরুষগণের অবস্থা এবং মুক্তি কাহাকে বলে, তাহা অবগত হইলাম। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে, যাঁহার সংবিৎ গণ্ডিপার হইয়া এতদূর বিস্তার হইয়াছে, তিনি আবার কেমন করিয়া সেই মুক্ত সংবিতকে গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ করিয়া নিজেকে অবতার রূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত সুবারাও (Subba Rao) মহাভারতের দুইটী শ্লোকে আমাদের মনযোগ আকৃষ্ট করিয়াছেন। সেই দুইটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ রাম অবতারকে লওয়া যাউক। রাম যদি ভগবানের অবতারই হন, তাহা হইলে সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁহার আর পুনর্জন্ম

হইবে না, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আর কোন শরীর থাকিবে না, তিনি পূর্ব্বে যে সচ্চিদানন্দময় ভগবান ছিলেন, পরে সেই ভগবানই হইবেন। কিন্তু আমরা সেইরূপ দেখিতে পাই না। মহাভারতে লোকপাল সভাখ্যানপর্ব্বে নারদ যখন যমরাজের সভার বর্ণনা করিতেছেন, সেখানে তিনি বলিয়াছেন যে, অন্যান্য রাজাদের সহিত দাশরথি রামও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

"রামো দাশরথিশ্চৈব লক্ষণোহথ প্রতর্দ্দনঃ।
অলর্কঃ কক্ষসেনশ্চ গয়ো গৌরাশ্ব এব চ ॥"

(সভা—লোকপাল—৯—১৮)

কিন্তু আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই যে, মৃত্যুকালে রামচন্দ্র "বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ মহানুজঃ"—অর্থাৎ ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরে তাঁহার বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ করিলেন। এবং তৎপরে তিনি "বিষ্ণুময় দেব" রূপ পাইলেন (রামায়ণ—উত্তর—১২৩—১২।১৩)। যদি তিনি সেই বিষ্ণু অথবা Logos এ মিলিত হইলেন, তবে যমরাজের সভায় আবার আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই কেন? নীলকণ্ঠ তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন —"রাম লক্ষণয়োর্বিষ্ণুশেষরূপেণ স্বস্থান স্থয়োপপি প্রতিমারূপেণ উপাসকানুগ্রহার্থং অত্রাবস্থানং বেধ্যম্।" অর্থাৎ উপাসককে অনুগ্রহ করিবার জন্য তিনি প্রতিমারূপে এখানে বর্ত্তমান ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেও আমরা এইরূপ দেখিতে পাই। মহাভারতের অন্তর্গত মৌষল পর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্যাধ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শরের দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল, তখন তিনি— "গচ্ছন্নূর্দ্ধং রোদসী ব্যাপ্যলক্ষ্যা"—আকাশ মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া—"দিবং প্রাপ্তঃ"—স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে দেবতারা তাঁহাকে যথোচিত বন্দনা করিলে পর, তিনি তাঁহার স্বকীয় অপ্রমেয় স্থান প্রাপ্ত হইলেন —"স্থানং প্রাপ স্বং মহাত্মাহপ্রমেয়ম্" (মৌষল।৪।২৬)। কিন্তু আমরা আবার স্বর্গারোহণ পর্ব্বে দেখিতে পাই যে, মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গে গমন করেন, তখন—"দদর্শ তত্র গোবিন্দং ব্রাহ্মেণ * বপুষান্বিতং। তেনৈব দৃষ্টপূর্ব্বেন সাদৃশ্যেনৈব সূচিতম্॥" (স্বর্গারোহণ—৪—২)—অর্থাৎ সেখানে তিনি দেখিলেন যে ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মার আরাধ্য দেহ ধারণ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট আকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

এখন আমরা এক সমস্যায় পড়িলাম। রাম অথবা কৃষ্ণ যদি মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়া স্বকীয় ধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা যে বিরাট পুরুষ হইতে উদ্ভূত হইয়া অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পর যদি সেই বিরাট পুরুষেই পুনর্নিমর্জ্জিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিমা অথবা মূর্ত্তি আমরা কেমন করিয়া যথাক্রমে যমলোকে এবং স্বর্গলোকে দেখিতে পাই? এই সমস্যার যবনিকা উত্তোলন করিতে পারিলেই অবতরণের প্রণালী অবগত হওয়া যাইবে।

মহাভারত ও পুরাণাদি পাঠে আমরা এই সমস্যা নিরাকরণের কিঞ্চিৎ আলোক পাইয়া থাকি। আমরা মহাভারতের নিম্নলিখিত স্থানসমূহে দেখিতে পাই যে, অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ নরনারায়ণ ঋষি ছিলেন ;—

(১)	আদিপর্ব্ব	১২ অধ্যায়	৬ শ্লোক,
(২)	বনপর্ব্ব	১২ "	৪৬ "
(৩)	ঐ	৩৬ "	৩৩ "
(৪)	ঐ	৪০ "	১ "
(৫)	ঐ	৪৭ "	৯ "

* "ব্রাহ্মেণ ব্রহ্মণা আরাধ্যেন"—নীলকণ্ঠ।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এমন কি রামায়ণেরও নিম্নলিখিত স্থানে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ যে নরনারায়ণ ঋষি ছিলেন, তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা,—

(৬) উত্তরকাণ্ড—৬৩ অধ্যায়,২০ শ্লোকে।

স্কন্দপুরাণেও ঐ কথা বলা হইয়াছে। যথা
"ধর্ম্মপুত্রৌ হরেরংশৌ নর-নারায়ণাভিধৌ।
চন্দ্রবংশমনুপ্রাপ্য জাতৌকৃষ্ণার্জ্জুনাবুভৌ ॥"

অর্থাৎ হরির যে অংশদ্বয় নারায়ণ ও নর নামে অভিহিত হইয়া ধর্ম্মের পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারাই চন্দ্রবংশ প্রাপ্ত হইয়া, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ভাগবত পুরাণেও (৪,১।৪৯ ও ১০।৬৯।১৬) পূর্ব্বোক্ত নরনারায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত স্থান গুলির আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, কৃষ্ণ নারায়ণ নামক একজন পুরাতন বিখ্যাত ঋষি ছিলেন। তিনি অযুত বৎসর উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাতে বিষ্ণু তেজ পরিপূর্ণ ছিল।

যিনি ভগবানের ভক্ত হন, তিনি ভগবানকে সকলই অর্পণ করিয়া থাকেন। নারায়ণ ঋষি উগ্র তপস্যার দ্বারা তাঁহার উপাধি সকলকে এমন পবিত্র করিয়াছিলেন যে, ভগবান্ যখন শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতরণ করিয়াছিলেন, তখন নারায়ণ ঋষির উপাধি সকলকে উপযুক্ত বোধে আশ্রয় করিয়াছিলেন। নারায়ণ ঋষির উপাধি সকল, ভগবানের বৈষ্ণব তেজ প্রকাশের উপযুক্ত আধার হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা দুইটী বিষয় পাইতেছি। প্রথম যিনি অবতার হন, তিনি জন্মজন্মান্তরে বহু তপস্যা করিয়া ভগবানে নিমজ্জিত হন। এইজন্য শ্রীমতী বেসাণ্ট বলিয়াছেন যে "Fundamentally he is the result of evolution"—অর্থাৎ অবতার ক্রমবিকাশের ফল। কিন্তু ইহার ভিতর কিঞ্চিৎ গূঢ় রহস্য আছে। মনুষ্যই যদি ক্রমবিকশিত হইয়া অবতার হন, তাহা হইলে তাঁহাকে মনুষ্য না বলিয়া অবতার বলি কেন? ইহার উত্তরে জীব গোস্বামী তাঁহার 'কৃষ্ণ সন্দর্ভে' বলিয়াছেন যে, ভগবান মনুষ্যত্ব অঙ্গীকার করেন বটে, কিন্তু উহা অপ্রসিদ্ধ মনুষ্যত্ব, উহা মানব-পুরুষত্ব, অর্থাৎ তিনি পুরুষ বটে, কিন্তু প্রাকৃতত্ব-রহিত। তিনি তখন আমাদের মতন সাধারণ মনুষ্য নহেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাতে আর নারায়ণ ঋষির ব্যক্তিত্ব ছিল না—নারায়ণ ঋষি তখন ব্রহ্মে নিমজ্জিত—যিনি অবতরণ করিলেন, তিনি বৈষ্ণব তেজরূপী স্বয়ং ভগবান নারায়ণ ঋষির উপাধিরূপ আধার লইয়া আসিলেন।

এই স্থলেই আমরা আবেশ ও অবতারের ভিতর পার্থক্য পাইতেছি। যাঁহারা আবিষ্ট হন, তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব থাকে, তাঁহাদের পৃথক সত্তা থাকে; কিন্তু ঐ পৃথক সত্তা সত্ত্বেও, ভগবানের ঐশ্বরিক সত্তার আবেশ হইয়া থাকে। এইজন্য যখন ঐ ঐশ্বরিক সত্তার তিরোধান হয়, তখন উহা পূর্ব্বে যে ব্যক্তির সত্তা ছিল, সেই ব্যক্তির সত্তাই থাকে। কিন্তু অবতারের আর পৃথক ব্যক্তিত্ব থাকে না। তিনি অপ্রসিদ্ধ মনুষ্য। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অপ্রাকৃত ও ঈশ্বরত্বময়। কিন্তু ভগবান্ যখন অবতরণ করেন,তখন তিনি তাঁহার মূলপ্রকৃতি বৈষ্ণবী মায়াকে সঙ্কুচিত করিয়া অর্থাৎ অবিদ্যার অধীনতা স্বীকার না করিয়া অবতরণ করেন। অবতার অবিদ্যাকে গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন, কিন্তু অবিদ্যা প্রসূত কর্ম্ম তাঁহাকে স্পর্শ করিতে

পারে না। এইজন্ত অবতরণ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

"অজোঽপিসন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপিসন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"

গীতা—৪·৬।

অর্থাৎ আমি জন্মরহিত হইয়াও এবং বিনাশ-বিহীন সকল ভূতের ঈশ্বর হইয়াও স্বকীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া নিজ মায়া দ্বারা আবির্ভূত হই। *

এখন দেখা যাউক, আমরা কেমন করিয়া ভগবানকে নারায়ণ ঋষি বলিতে পারি। একটী সাধারণ উদাহরণ হইতে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। যখন কোন ব্যক্তি ভূতাবিষ্ট হয়, তখন সে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ লোক যদি ঐ ব্যক্তি ভূতাবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া অবগত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা বলিবে যে, ঐ ব্যক্তিই কত আশ্চর্য্য কথা বলিতেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত ব্যাপার অবগত আছে, সে বলিবে যে ঐ ব্যক্তি বলিতেছে না, ভূতে ঐ সকল কথা বলিতেছে। অবতার সম্বন্ধেও ঐরূপ হইয়া থাকে। যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি আর নারায়ণ ঋষি নহেন, তিনি অজ, অব্যয়, ঈশ্বর; কিন্তু নারায়ণ ঋষির উপাধি সকলকে আধার করিয়াছেন বলিয়া, লোকে বলিবে যে তিনি নারায়ণ ঋষি ভিন্ন আর কেহ নহেন। এই জন্য সাধারণতঃ বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ ঋষি ছিলেন। এই জন্য বৈষ্ণবেরা বলেন যে, অবতারের দেহ "প্রাতিভাসিক দেহ"মাত্র; তিনি "মায়ামানুষবিগ্রহ।"

"আবেশে" দুইটী পৃথক সত্তার অস্তিত্ব থাকে—এক ঐশ্বরিক সত্তায় অস্তিত্ব এবং যিনি আবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু যাঁহারা অবতার বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের কেবল একটী সত্তার অস্তিত্ব থাকে—তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্।

স্থূলভাবে দেখিতে গেলে অবতারকে ক্রমবিকাশের ফল বলিতে হয়। তিনি যখন বিরাট পুরুষে নিমজ্জিত হন, তখন তাঁহার সংবিতের কেন্দ্র সকল (Centers) অক্ষুণ্ণ রাখেন—জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন না। যখন অবতরণ করেন, তখন এই সকল কেন্দ্র ধরিয়া ফিরিয়া আসিয়া উপাধি গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হন। কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে গেলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি স্বয়ং ভগবান্, অপরের উপাধি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন মাত্র। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীরামচন্দ্র যাঁহাদের উপাধি আশ্রয় করিয়াছিলেন, মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিবার সময় তাঁহাদের উপাধি সকল উচ্চতর লোকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই হেতু শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পরও তাঁহার ব্রাহ্মদেহ আমরা স্বর্গলোকে এবং শ্রীরামচন্দ্রের তিরোধানের পরও তাঁহার দেহ যমলোকে দেখিতে পাই। এই সকল দেহকে শাস্ত্র "প্রাতিভাসিক দেহ" বলিয়াছেন।

ভগবান কি প্রকারে অবতরণ করেন, তাহার প্রণালী অবধারণ করা গেল। জগতের পালনের জন্য ভগবান যে সময় সময় নির্ম্মাণকায় ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা আমরা "কুসুমাঞ্জলিতে" দেখিতে পাই। পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বরের বর্ণনা করিয়া উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়েরপরামৃষ্টো নির্ম্মাণকায়ম্ অধিষ্টায় সম্প্রদায়প্রদ্যোতকেহনু-

* এখানে অনেকে "স্বাম্ প্রকৃতিং" অর্থে "দৈবী প্রকৃতিং" অর্থাৎ জীব অর্থ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, ভগবান্ আত্মমায়া দ্বারা জীবে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন।

গ্রাহকশ্চেতি"। অর্থাৎ তিনি ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয় দ্বারা স্পৃষ্ট বা সম্বদ্ধ নহেন, তিনি নির্ম্মাণকায় * অধিষ্ঠান করিয়া বেদের প্রকাশক হন এবং ঘট, পট ইত্যাদি কর্ত্তব্য বিষয়ে তিনি অনুগ্রাহক বা শিক্ষক রূপে গণ্য হইয়া থাকেন। যখন কোন বিশেষ কার্য্যের সাধনের প্রয়োজন হয়, তখন তিনি অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দেব।

পুরাতত্ত্ব।*

প্রাচীনকালে অনেক জাতি এই পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তার করিয়া কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কেহ বা আপনাদের জ্ঞান গরিমার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, কাহারও বা কোনই চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না। গ্রীশ মৃত, তবুও বর্ত্তমান সভ্যতা আপন দর্শন ও কলা বিদ্যার মন্দিরে তাহাকে জীবিত রাখিয়াছে। রোম আজ কোথায়? তবুও রোমের দান অগ্রাহ্য করিয়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা দাঁড়াইতে পারে না। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা কে কি করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন অতীতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তবে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ আজকাল মিসর ও আসিরিয়া সম্বন্ধে যেরূপ অক্লান্তভাবে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন, তাহাতে মনে হয়, শীঘ্রই উক্ত সভ্যতা সকলের ছাপও বর্ত্তমান সভ্যতার গাত্রে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এ কথা ঠিক যে, সভ্যতা-মঞ্চের কে কত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন,তাহা নির্ণয় করা দুরূহ,এবিষয়ে ভারতবাসী-গণ সময়ে অসময়ে ভারতের পক্ষ হইতে যে দাবী করিয়া বসেন,তাহা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। একথা বলা বাহুল্য যে, শত বর্ষের পুরাতন প্রাচ্যতত্ত্বের উপর যে দাবী প্রতিষ্ঠিত, তাহা আজ গৃহীত হইতে পারে না। আজ কাল নিত্য নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে, দশ বছরের পুরাতন কথাও আজ গ্রাহ্য নহে, এরূপস্থলে এ বিষয়ে কোন মত দেওয়া কত কষ্টসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। মূল কথা, ভারত সম্বন্ধে পুরাতন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ের পণ্ডিতগণের গবেষণায় তাহা ভ্রান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নব নব আবিষ্কারের আলোকে ভারতের একচেটিয়া দাবী অননুমোদনীয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সভ্যতার পূর্ণতা ও উচ্চতার বিচারে ভারত ও গ্রীশ সমস্থানীয়। যদি বর্ত্তমান সভ্যতার উপরে প্রভাবের কথা আনা যায়,তবে গ্রীশের দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য। কেন না, বর্ত্তমান সভ্য জগতের উপর ভারতের যদি কোন প্রভাব থাকে, তবে তাহা পরোক্ষ এবং তাহার নির্ণয় অনুমান সাপেক্ষ। কিন্তু গ্রীশের হাত প্রত্যক্ষ ও সর্ব্ববাদীসম্মত। তবে ভারতীয় সভ্যতা যে একদিন দ্রাবিড়, মালয় ও মঙ্গো-

* "নির্ম্মাণকায়" অর্থে টীকাকার হরিদাস ভট্টাচার্য্য "নির্ম্মাণার্থং কায়ঃ" অর্থাৎ নির্ম্মাণের জন্য শরীর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'নির্ম্মাণকায়ের' যে বিশেষ অর্থ আছে,তাহা আমরা পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি।

* জ্যৈষ্ঠ মাসের 'দেবালয়ে' প্রকাশিত ভারত-মহিমা-পাঠে উদ্বুদ্ধ।

ণীয় জাতি সকলের উপর আপনার প্রভাব ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। আর যদি প্রাচীনত্বার কথা ধরা যায়, তবে তো ভারতের দাবী একেবারেই টিকিবে না। মিসর, আসিরিয়া, বেবিলোন প্রভৃতি ভারত অপেক্ষা বহুপ্রাচীন, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কেহ কেহ ভারতীয় সভ্যতাকে গ্রীশ ও ইস্রেল অপেক্ষা প্রাচীন বলেন, কিন্তু এ বিষয়ে বহু মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে চীনকে ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায়। অথচ একেবারে দ্বিধাশূন্য হইয়া রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, চীন সভ্যতার মূল বৌদ্ধধর্ম্ম। যে জাতি খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কংফুচের মত জ্ঞানীর জন্ম দান করিয়াছিল, সেই জাতি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসাদে বুদ্ধিবৃত্তি সকল মার্জ্জিত করিয়া সভ্যতা পাইয়াছিল বলাও যা, আর উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসী বিলাতী কাপড় পরিত বলিয়া ইংরাজাগমনের পূর্ব্বে তাহারা উলঙ্গ ছিল বলাও তা। চীন ভারতের দ্বারা সুসংস্কৃত হইয়া কংফুচের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞানী আর কয়জন উৎপন্ন করিয়াছে? রামপ্রাণ বাবু নির্ব্বিচারে একটী কথা ধরিয়া লইয়াছেন, সেটী এই—ভারতীয় সভ্যতা সর্ব্বপ্রাচীন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তার পর তিনি যে যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝান যায়। সিংহ ভারতে জন্মে। মিসরেও সিংহ দেখা যায়। উভয়েরই ঘাড়ে কেশর আছে। এ সাদৃশ্য কখনও দৈবাধীন নহে। মিসরীয় সিংহ যে ভারতীয় সিংহ হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রমাণও করা যায়। আমাদের বোসের সার্কাস পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহাদের সঙ্গে সিংহ আছে। এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে, তাঁহারা আপনাদের কৌশল প্রদর্শনের জন্য আলেকজান্দ্রিয়ার মত সহরে যান নাই। তাঁহাদেরই খাঁচা হইতে একজোড়া সিংহ জঙ্গলে গিয়া বংশবৃদ্ধি করিয়াছে। সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইল, আফ্রিকার সিংহ ভারতীয় সিংহবংশোৎপন্ন!

ম্যাক্সমূলার বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষেই মানব জাতির মানসিক বৃত্তি সমূহের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। এবং এ কথাও জানা গিয়াছে যে, ভারতের সঙ্গে এসি-রিয়ান জাতির বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং প্রমাণ হইল, কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি বিদ্যা সর্ব্ববিষয়েই এসি-রিয়ান্ জাতি ভারতবাসীর নিকট ঋণী। ইহারই নাম "মুখস্য চোটাৎ"॥ বাণিজ্য সম্বন্ধ থাকিলেই কি ঐ সব আদান প্রদান অবশ্যম্ভাবী? এমন অনেক দেশ আছে, যার সঙ্গে ভারতের কোটী কোটী টাকার বাণিজ্য চলিতেছে, কিন্তু ধর্ম্ম সমাজ ও বিদ্যা সম্বন্ধে এক পয়সারও ঋণের আদান প্রদান চলিতেছে বলিয়া তো মনে হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এসি-রিয়ান সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী, এরূপ স্থানে প্রদান না হইয়া আদানের সম্ভাবনাই বেশী। তারপর, ভারতের পূর্ণাঙ্গ সভ্যতাটা এক দিনে স্বর্গ হইতে প্রস্তুত হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হয় নাই। ভারতেও সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং ভারতে যখন পূর্ণবিকাশ সাধিত হইয়াছিল, তখন এসি-রিয়ান সভ্যতার অবস্থা কি? তাহার তখন অন্যের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণেরই ক্ষমতা ছিল কি না? এ সব বিষয়ের তথ্য নির্ণয় না করিয়া নিঃসন্দেহে এক তরফা ডিক্রির নির্দ্দেশটা নিতান্তই তাড়াতাড়ি হইয়া পড়িয়াছে। তারপর

গ্রীক্ দর্শন সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে, তর্কের খাতিরে পিথাগোরাস্, প্লেটো বা নিউপ্লেট-নিক মতের উপরি হিন্দু দর্শনের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইলেও, এ সিদ্ধান্ত একটা অপ সিদ্ধান্ত যে গ্রীক দর্শন হিন্দুদর্শনের নিকট ঋণী। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা আশ্চর্য্যের কথা নহে, না থাকিলেই বরং আশ্চর্য্যের কথা হইত। কেন না, উভয়েই মানব চিন্তার ফল, তার উপর উভয়েই আর্য্য-শাখা। শত বিভিন্নতা সত্বেও মানব প্রকৃতি মূলতঃ এক। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে, মানব সমাজের বিকাশের বিশেষ বিশেষ স্তরে, দেশ কালের ব্যবধান সত্বেও, বিভিন্ন দেশে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বাধীন ভাবেই, কেবল সত্য নহে, একই কুসংস্কার আসিয়া হাজির হয়। সুতরাং বাহ্যিক সাদৃশ্য ঋণ সাব্যস্ত করে না। বরং গ্রীক ও হিন্দু দর্শনের উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রকৃতি এমন বিভিন্ন মার্গাবলম্বী যে, যদি আমি গায়ের জোরে বলি, একটা অন্যটা হইতে গৃহীত, তবে ইহাই প্রমাণ হয়, আমি হিন্দু দর্শন জানি না, না হয় গ্রীক্ দর্শনের ধার ধারি না, অথবা উভয় সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞ।

জাতি সকলের মধ্যে যে আদান প্রদান হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কোন্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারে? তবে নবীন জাতিই যে কেবল প্রাচীন জাতির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে, তাহা নহে, উল্টা ব্যবস্থাও হয়। এমন কি, উচ্চতর জাতিও নিম্নতর জাতির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। ভারতীয় আর্য্যগণ কি এ দেশের আদিম অধিবাসী দ্রাবিড়দিগের নিকট ঋণ গ্রহণ করেন নাই? বৌদ্ধধর্ম্মের ছাপ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের গায়ে আছে, তাই বলিয়া কি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের ঋণ ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে নাই? ভারত হইতে যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম চীনে গিয়াছিল, তেমনি চীন হইতেও বহু জিনিষ ভারতে আসিয়াছে—শুনিয়াছি ঘ টাটা পর্য্যন্ত। কে না জানে যে, ভারতীয় জ্যোতিষে যবনা-চার্য্যগণের ঋণ স্বীকৃতই রহিয়াছে। হিন্দুগণ নক্ষত্র চক্রের আবিষ্কর্ত্তা, একথা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, রাশিচক্র বিদেশ হইতে গৃহীত হই-য়াছে। ফলিত জ্যোতিষ নাকি একে-বারেই ধার করা। সব জিনিষই ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ হয়। ভারতের সর্ব্বপ্রথম নাটক পূর্ণাঙ্গ। 'যবনিকা' কথাটা এই ঋণেরই দলিল হইয়া রহিয়াছে। এই যে সেদিন পেশোয়ারে বুদ্ধদেবের ভস্মাস্থি পাওয়া গিয়াছে, তাহা যে বৃহৎ কৌটায় রক্ষিত, সেই কৌটার গাত্রে এক গ্রীক্ শিল্পীর নাম পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতগণ বহুদিন হইতেই অনুমান করিয়াছেন যে, ভারতীয় স্থপতি ও ভাস্কর শিল্পের উপর গ্রীসের প্রভাব রহিয়াছে। এতদিন অস্বীকার করিলেও এখন আর সে ঋণ অস্বীকার করিবার পথ রহিল না। যাহা হউক, সব সময়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া না গেলেও এ কথা বলা যায়, যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মরূপ বিরাট পাহাড়কে ঠেলিয়া সাফ্ দেশের বাহির করিয়া-ছিল, তাঁহারা যে বিদেশের ঋণ বেমা-লুম হজম করিবার শক্তি রাখেন না, তাহা নহে। স্বদেশ-প্রীতি উত্তম। কিন্তু সত্য আরও উত্তম। অসত্য-প্রতিষ্ঠা, বৃথা দম্ভ স্বদেশের কল্যাণ করিতে পারিবে না। আরও অন্ধকার বাড়াইবে।

এই আলোচনায় একটী কথা স্মরণ

রাখিতে হইবে। আর্য্যসভ্যতা ও ভারতীয় সভ্যতা এক নহে। ভারতবর্ষ আর্য্যগণের আদিম নিবাস নহে, উপনিবেশ মাত্র। তাঁহারা যখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখন অসভ্য বর্ব্বর ছিলেন না, সঙ্গে একটা সভ্যতা লইয়া আসিয়াছিলেন। সে সভ্যতার উপর ভারতের একচেটিয়া দাবী নাই। তাহার উচ্চতা কত,তাহাও নির্ণয় করা দুরূহ। তাহা যত বড় বা যত ছোট হউক না কেন, তাহার উপর হিন্দুর সহিত জার্ম্মাণ গ্রীক্ ও পারসিকগণের সমান দাবী। তিলক মহাশয় বলিতেছেন, আর্য্যগণ সুমেরু প্রদেশ হইতে আসিয়াছেন। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা সেস্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। সেখান হইতে পঞ্চনদ প্রদেশে তাঁহারা ট্রেনে করিয়া হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন নাই। মধ্যস্থিত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে তাঁহারা আরও কত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দৌরাত্মে সব ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের এক শাখা এই ভারত সমুদ্রে আসিয়া ঠেকিয়াছেন। ইহার মধ্যে কত শত জাতির সহিত সাক্ষাৎ ও আদান প্রদান হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা, বোধ হয়, মানব সাধ্যের অতীত। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতার কাল নির্ণয় ভারতের আভ্যন্তরীন প্রমাণ সাপেক্ষ। ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে যে জ্যোতিষিক প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে আর্য্য সভ্যতার কাল নির্ণীত হইতে পারে,ভারতের নহে। কেন না,তিলক মহাশয় প্রমাণ করিতেছেন যে,ঋগ্বেদে আর্য্যগণের সুমেরু প্রদেশে অবস্থানের কথাও আছে। ঋগ্বেদে এমন সব প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনা আছে;যাহা ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন, আকাশ মার্গে গ্রহ-নক্ষত্রগণের পরিভ্রমণ বিষয়ক বর্ণনায় আছে যে, ইন্দ্রদেব সমস্ত আকাশকে ছাতার ন্যায় দণ্ডোপরি স্থাপন করিয়া ঘুরাইতেছেন। মানুষের মস্তকোপরি জ্যোতিষ্কগণের এইরূপে ভ্রমণ করিবার অভিজ্ঞতা, সুমেরু প্রদেশে অবস্থিতি না করিলে, প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কুষ্ঠী বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের গ্রহ সন্নিবেশ গণনা করিয়া ভারতীয় সভ্যতার কাল নির্ণীত হইবে না। প্রমাণ চাই হাতে কলমে, প্রমাণ চাই খনকের সাহায্যে। অন্যান্য দেশে—মিসর বা আসিরিয়ায় এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে সব সভ্যতাকে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫০০০।৭০০০ হাজার শতাব্দীতে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ দেশের স্থপতি ভাস্করগণ কি প্রমাণ দিতেছেন? ভারতের মুদ্রাতত্ত্ব বা শিল্পের ভগ্নাবশেষ কিছুতেই এপর্য্যন্ত আমাদিগকে বৌদ্ধযুগের ওপারে লইয়া যাইতে সক্ষম হয় নাই। এরূপ স্থলে ভারতবর্ষটাকে ঠেলিয়া লইয়া মানব সভ্যতার আদিতে স্থাপন করার চেষ্টা নিতান্তই পণ্ডশ্রম। এরূপ দাবীর দ্বারা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত হিন্দু শ্রোতা বা পাঠকের নিকট সহজে করতালি লাভ হইলেও স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উপহাস ছাড়া অন্য কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই।

শেষ কথা এই, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের অন্নসংস্থান, আবহাওয়া, ভূমি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির বিচিত্রতায় যেমন,মূলতঃ এক হইলেও,বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্ম সমাজ ও বিদ্যার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী; তেমনই, আবার দেশের দূরত্ব থাকিলেও, ঐ সকলের একতায় মানব সমাজের বিকাশে সাদৃশ্যও অপরিহার্য্য। ইহা না বুঝিয়া

জগতের মান-চিত্র খানার উপর গৈরিক মাটী আগাগোড়া লেপিয়া দিবার বাসনা যেমন অনৈতিহাসিক, তেমনই অস্বাভাবিক। ভারত মঙ্গোলীয়, দ্রাবিড়ীয় ও মালয় জাতি সকলের উপকার সাধন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রতীচ্য জগৎকেও স্বীয় জ্ঞানালোকে প্রভাবিত করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্ববাদী-সম্মত। কিন্তু ইহাতেই তাহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। ভারত মাতার বক্ষে এখনও বহুমূল্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ্ লুক্কায়িত রহিয়াছে, যাহা না পাইলে জগতের উদ্ধার নাই। তাহা বিশ্ব মানবকে দিতে হইলে আমাদিগকে দাতৃত্বের পদবী লাভ করিতে হইবে। ধর্ম্মের পৌত্তলিকতা, সমাজের জাতিভেদ এবং সর্ব্বোপরি রাজ-নৈতিক সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দাতার আসন গ্রহণ করা আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, ভারত ইতিপূর্ব্বে জগৎকে যাহা দিয়াছে, তাহা অপেক্ষাও উচ্চতর, মহত্তর, অধিকতর মূল্য-বান্ সামগ্রী দেয় রহিয়াছে। কিন্তু তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া কার্য্যে পরিণত করি-বার পথে—এই মহদুদ্দেশ্য সাধন করিবার পথে আমাদের প্রাচীন গৌরবের মিথ্যা আত্মম্ভরিতাই সর্ব্ব প্রধান অন্তরায়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বাণ ও শোণিতপুর।

১। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে জ্যৈষ্ঠের নব্যভারতে প্রকাশিত "বাণ ও শোণিতপুর" শীর্ষক প্রবন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন যে, "মহর্ষি বেদব্যাস, মহাভারতের প্রধান নায়িকা পঞ্চপাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীও একদা মনে মনে কর্ণের প্রতি অভিলাষিণী হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।" বেদব্যাস কোথায় এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, উমেশ বাবু তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং সাহস করিয়া আমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। কেন না, মহাভারত অকূল সমুদ্র, ইহার কোন্ গর্ভে, কোন্ অমূল্য রত্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা এক জনের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহাতে আবার মহাভারতে দশ হস্তের কারুগিরি রহিয়াছে। সুতরাং কেহ কোন স্থলে এরূপ এক কথা যে বসাইয়া দিতে না পারেন, তাহা একে-বারে অসম্ভব নহে। তবে উক্তরূপ কোন কারুগিরি যে ব্রহ্মবাদিনী দ্রৌপদীর চরিত্রের সঙ্গে সুসঙ্গত হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যে কবি, স্বয়ম্বর স্থলে কর্ণ লক্ষ্যভেদ করিতে উদ্যত হইলে, দ্রৌপদীর দ্বারা বলাইয়া লইয়াছেন "আমি সূতপুত্রকে বিবাহ করিব না" এবং এরূপ কার্য্য করিতে যাইয়া যে মনস্বিনী রমণী সেই বিরাট স্বয়ম্বর স্থলে স্বামী নির্ব্বাচনে স্বীয় স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য পিতা ও ভ্রাতার অপেক্ষাও করেন নাই, তাঁহাকে যদি বেদব্যাস আবার একদা সেই কর্ণেরই অভিলাষিণী করিয়া গড়িয়া থাকেন, তবে তাহা বেদব্যাসের লেখনীর উপযুক্ত হইবে না, আমরা এই মাত্র বলিতে পারি। আমরা তো জানি, উহা কাশিরামের কারুসাজি এবং বঙ্গভাষানভিজ্ঞ কেহ দ্রৌপদীর এই কলঙ্কের কথা অবগত নহেন। উমেশ বাবু আমাদের এ সন্দেহ দূর করিবেন কি?

২। উমেশ বাবু উষার সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনই ওজর নাই। কেন না, সকলেরই স্বাধীন মত পোষণ করিবার অধিকার আছে। তবে তাহার মত পুরাণকার ও পৌরাণিকগণ সমর্থন করিবেন কি না সন্দেহ। হরিবংশে দেখিতে পাওয়া যায়, সাধ্বীগণ মধ্যে গণ্যা হইতে পারিবেন না বলিয়া উষা নিজেই কত আক্ষেপ করিতেছেন—

কথমেবং কৃতা নাম কন্যা জীবিতুমুৎসহে॥
কুলোপক্রোশনকরী কুলাঙ্গারী নিরাশ্রয়া।
জীবিতংস্পৃহয়েন্নারী সাধ্বীনামগ্রতঃ স্থিতা॥

৩। উমেশ বাবু বাণরাজা ও শোণিতপুরের ইতিহাস নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পুরাণ হইতে ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে প্রথমে একটা মহা সমস্যার পূরণ প্রয়োজন। পুরাণে যে সমস্ত আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার কতকগুলির মূলে যে ঐতিহাসিক ঘটনা বিদ্যমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কতকগুলির মূল যে রূপক তাহাও তো অস্বীকার করিবার যো নাই। এই রূপক আবার কতকগুলি জ্যোতিষিক—যেমন দক্ষযজ্ঞ; আবার কতকগুলি আধ্যাত্মিক—যেমন চণ্ডীকাব্য। আর কতকগুলি আবার প্রাকৃতিক—যেমন বৃত্রবধ। আমরা তো জানিতাম, উষাহরণ একটী সূর্য্য সম্বন্ধীয় রূপক—solar myth. সহস্রবাহু বাণকুমারী উষা, আর সহস্র কিরণ রবিতনয়া উষা; দিবা আগমনে সে উষার তিরোধানই উষাহরণ। পৌরাণিক গল্পের উষাহরণ নাম খাটে না, কেন না, অনিরুদ্ধই বাণালয়ে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই হরণ করিয়া আনা হইয়াছিল, উষাকে তো কেহ হরণ করে নাই। কিন্তু দিনের আগমনে রবিকন্যা উষা বাস্তবিকই অপহৃতা হয়েন, তাহাকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। কোথা দিয়া অলক্ষিতে চলিয়া যায়—ইহাই তো হরণ। আবার দিন তো অনিরুদ্ধই বটে—তাহাকে কে রোধ করিবে—দিনকে তো কেহই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। অনিরুদ্ধ দিন আসিলেই উষা অপহৃতা হয়েন। শোণিতপুর তো সূর্য্যরশ্মিরই উপমা "জবাকুসুম সঙ্কাশম্"। তবে স্থান সম্বন্ধীয় জনপ্রবাদ অবশ্যই বিচার্য্য। কিন্তু উমেশ বাবু নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, দুইটী স্থান উষাকে দাবী করিতেছে। এই বিভিন্ন দাবী ইতিহাসের পরিপন্থী। সকলেই পুরাণের ঘটনার সঙ্গে স্বীয় স্বীয় জন্মস্থানকে সংযুক্ত করিতে যায় বলিয়া এই বিরুদ্ধ দাবী উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। কথা এই, এমন কি পৌরাণিক সম্ভব ও অসম্ভব ঘটনা আছে, যাহার সঙ্গে জনপ্রবাদ কোনও না কোনও স্থানকে জড়াইতেছে না? বৃন্দাবনের কথা ছাড়িয়াই দি, যেখানে পুরাণ বর্ণিত কৃষ্ণলীলার এমন অতি ক্ষুদ্রতম ঘটনাও নাই, যাহার সঙ্গে কোনও স্থানের সংযোগ দেখান যাইবে না। এখন পর্য্যন্তও লোকে সন্ধ্যা বেলা ফুলশয্যা বিছাইয়া সকালে দলিত ফুল দেখিয়া মনে করে যে, রাধাকৃষ্ণ রাত্রিকালে এখানে বিহার করিয়াছেন। এমন কি, কৃষ্ণ মাখন খাইয়া কোথায় হাত মুছিয়াছিলেন, সেই মসৃণ স্থান পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে স্থান বিশেষে এমন সুড়ঙ্গ আছে, যাহা দেখাইয়া বলা হয়, এই রাস্তায় হনুমান্ একস্কন্ধে কালী ও একস্কন্ধে রাম লক্ষ্মণকে লইয়া মহিরাবণের পাতালপুরী হইতে উঠিয়াছিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী এক মন্দিরে সেই কালী আজও বিরাজ করিতেছেন! অথচ রামায়ণে মহিরাবণের নাম গন্ধও নাই।

কালীপূজার প্রাচীনত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের জন্যই এ জনপ্রবাদের সৃষ্টি। সারদীয় দুর্গোৎসবকে তো জনপ্রবাদ শ্রীরামচন্দ্রের ঘাড়ে চাপাইয়াছে, এমন কি, বিজয়ার কোলাকুলি পর্য্যন্ত। কিন্তু রামায়ণে কিছুই নাই। সুতরাং আমরা মনে করি না যে জনপ্রবাদ আছে বলিয়া "এ সমস্তই অলীক, এরূপ মনে করা অসাধ্য।"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

স্বদেশ প্রেম। (৪)

সামাজিক।

৪র্থ অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

স্থান কেদার বাবুর শয়ন ঘর। কাল রাত্রি। (কেদার বাবু ও তাঁহার স্ত্রী আসীন)।

কেদার বাবুর স্ত্রী। বিয়ে না দিলে মেয়ে ত আর ঘরে রাখা যায় না।

কেদার বাবু। বিয়ের চেষ্টা ত সাধ্যমত কচ্ছি।

স্ত্রী। লোকে যে বুড়ই নিন্দে কচ্ছে। আর কিছু কাল বিয়ে না হলে, না জানি আরও কি কথা বল্‌বে!

কেদার। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে) সকলই ভগবানের হাত। বড় মেয়েটীর বিয়ে দিতে যে পৈতৃক বিষয় টুকু ছিল, তা বেচেছি? এখন আছে এই ভদ্রাসন বাড়ী।

স্ত্রী। ভদ্রাসন বাড়ী আছে বলে বসে থাক্‌লে কি হবে?

কেদার বাবু। আমি কি বসে আছি। বাড়ী বন্ধক দিয়ে টাকা কর্জ্জ নেবার জন্য আজ বোসের বাড়ী গিছিলাম। তারা বলেছে, বাড়ী বাঁধা রেখে ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা দেবে।

স্ত্রী। আর পাঁচ শ টাকা? দু হাজার টাকা না হলেত হবে না। তাদেরইত নগদ ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা গুণে দিতে হবে।

কেদার বাবু। তাই ত ভাব্‌ছি। আমারত আর কিছু নেই। তাত তুমি জান। তবে বিক্রী কর্লে দু হাজার টাকা পাওয়া যায়।

স্ত্রী। বিক্রী কর্ব্বে? বাড়ী বিক্রী কর্লে— আমরা দাঁড়াব কোথায়?

কেদার। ধর, কর্জ্জ নিলাম। শোধ দেব কেমন কোরে? যা আয় আছে, তাতে ত দুবেলা খাওয়াই হচ্ছে না।

স্ত্রী। কথাত সত্যি। উপায় কি?

কেদার। (দীর্ঘনিশ্বাস) উপায় বেচে কিনে পথের ফকীর হওয়া। আমি একটা টুকনি নেব, তুমি একটা টুকনি নিও, সুনীতির (মেয়ের) বিয়ে দিয়ে দুজনে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কর্ব্বো। আর রক্তশোষক পাত্র-পক্ষদিগের গুণগান কর্ব্বো।

স্ত্রী। তোমার হাতে পড়ে আমার তাই হবে (ক্রন্দন) (আঁচল দিয়ে চোখ মুছিতে মুছিতে) তুমি ধীরেন (ছেলে)কে বিয়ে কর্ত্তে, আর একবার, বল না কেন? সে এণ্ট্রান্স পাস দিয়েছে, রামযাদু বাবু ত বল্‌ছে, হাজার টাকা নগদ দেবে। কাল কেনারাম বাবুর লোক এসেছিল, সে বলেছে কেনারাম বাবুর মেয়ের সঙ্গে যদি ধীরেনের বিয়ে দেও, তা হলে কেনারাম বাবু আড়াই হাজার টাকা নগদ দেবেন। ঐ আড়াই হাজার টাকা পেলে সুনীতির বিয়ে দিয়ে ৫০০৲ টাকা আমাদের হাতে থাকবে। বাড়ী বাঁধা দিতে হবে না।

কেদার। তুমি ধীরেনকে আর একবার বুঝিয়া দেখো।

স্ত্রী। আমি অনেক বুঝিয়েছি। সে যে কি গোঁ ধরেছে! কি একটা দলে মিশেছে! পোড়ারমুখো শিশুদ্ধানন্দ না বিশুদ্ধানন্দ তার কাণে কি মন্ত্র দিয়েছে, আমার কথা সে আর মোটেই শোনে না। তুমি পুরুষ

মানুষ, তুমি যদি তাকে জোর কোরে বল, সে কি তোমার অবাধ্য হ'তে পারে ?

কেদার। জোর কর্লে (রাম ধন বাবুর ছেলে) বিজয়ের মত হবে; ধীরেন বাড়ী থেকে চলে যাবে। দেখ্‌ছো সব ছেলে গুলো এখন কি রকম হচ্ছে। হাজার কষ্ট হলেও, এমন কি মর্ত্তে হলেও, ছেলেরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। আমি জেনেছি দু মাস হলো, তোমার ছেলে ধীরেন 'দেবভবনে' প্রতিজ্ঞা করেছে 'টাকা নিয়ে বিয়ে কর্ব্বো না।'

স্ত্রী। কি ? দিব্বি করেছে, টাকা নিয়ে বিয়ে কর্ব্বে না ? ওমা ! টাকা কিনা বাড়ীতে উস্‌লে পড়ছে। ভারি বড় মানুষের ছেলে। বিজয় জমিদারের ছেলে। সে টাকা না নিয়ে বিয়ে কর্ত্তে পারে। আচ্ছা বিজয়ের সঙ্গে সুনীতির বিয়ের প্রস্তাবটা তুমি রামধন বাবুর কাছে আর একবার করে দেখ্‌লে হয় না ?

কেদার। নিরর্থক। কেবল অপমান। পাছে বিজয়কে আমি বিয়ের কথা বলি, তাই আমাকে তার বাড়ীর মাষ্টারি পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে দিয়েছেন। আর দ্বারবানকে বলে দিয়েছেন "কেদার বাবুকে এ বাড়ীতে আস্‌তে দিবে না"। কি অপমান ! কি লাঞ্ছনা। অপরাধ আমার মেয়ে হয়েছে !

স্ত্রী। অপমান বল্লে কি হবে ? যখন মেয়ে হয়েছে, তখন আর মান অপমান কি ? রামধন বাবুও গঙ্গার ধারে রোজ বেড়াতে যান, সেখানে কাল পায়ে জড়িয়ে ধরো— আর আমি ধীরেনকে বল্‌বো, তুমি যদি কেনারাম বাবুর মেয়েকে বিয়ে না করো, আমি আত্মহত্যা কর্ব্বো। আরও একটা মতলব আছে। তোমার ঘটেও বুদ্ধি নেই, কাজে আমাকে সব মতলব কর্ত্তে হচ্ছে। তুমি এখন একটু বাহিরে বসগে—

(কেদার বাবুর প্রস্থান)

স্ত্রী। সুনীতি, সুনীতি ?

(নেপথ্যে) মা, সুনীতির প্রবেশ।

স্ত্রী। শুন মা তোমাকে আমি একটা কথা বলি। তোমার এখন জ্ঞান হয়েছে। লজ্জা কর্লে চলবে না, পড়েছোত মহাভারতে শাস্ত্র কথা,—

অনূঢ়া কুমারী যদি হয় ঋতুমতী।
উভয়ত সপ্তকুল হয় অধোগতি॥
কুলেতে কলঙ্ক হয় সংসারেতে লাজ।
এ কারণে কন্যা দিতে না করিবে ব্যাজ॥

তাই বলি, তোমার বাবা যেন শোনেন না।

সুনীতি কাণে কাণে কি বলিলেন, সুনীতি মাথা হেট করিল।

স্ত্রী। মা লক্ষ্মী, কথা শোন, তোমারই ভাল হবে।

সুনীতি। মুখ নীচু করিয়া মাথা নাড়িল।

২য় দৃশ্য।

স্থান।

কেদার বাবুর বাটীর অপর কক্ষ।

(সুনীতি একাকিনী বসিয়া)

সুনীতি। (স্বগতঃ) হা ভগবান ! কেন আমি জন্মেছিলাম ! আমি কি হতভাগিনী ! আমার জন্য চতুর্দ্দিকে বিপদ ও অপমান। মা আমাকে যা বলেছেন, তা আমি পার্ব্বো না। সে কত দিনকার কথা—তিনি—জানি তিনি দেবতা। না :আমার দ্বারা তা হবে না। কিন্তু এ দিকে এই হতভাগিনীর বিয়ের জন্য বাবা রামধন বাবুর পায়ে পড়্‌বেন,— দাদাকে টাকা নিয়ে বিয়ে কর্ত্তে জেদ কর্লে, তিনি হয়ত বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন। মা হয়ত আত্মহত্যা কর্ব্বেন। অথবা বাড়ী বাঁধা পড়ে বিকিয়ে যাবে—বাবা, মা ও দাদা আশ্রয়হীন হবেন—কি করি, সহজ উপায়, আমি আত্মহত্যা কর্লেই ত সব চুকে যায়। আত্মহত্যা পাপ, নরকে যেতে হবে। যে দেশে মেয়ের বিবাহে এত লাঞ্ছনা, সে দেশে কুমারীদের জন্য কেন সন্ন্যাসিনী-মঠ নাই— দাদাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা কর্ব্বো— আমাদের দেশে সন্ন্যাসিনীর মঠ আছে কিনা। যদি সন্ন্যাসিনীর মঠ না থাকে, বাড়ীতে সন্ন্যাসিনী কুমারী হয়ে থাক্‌লে কি দোষ আছে ? লোকে পাগল বল্‌বে— বলুক। কালকে থেকে আমি গেরুয়া বসন

পরবো, চুল বাঁধবো না, এক সন্ধ্যা আহার কর্ব্বো, আর জপ তপ কর্ব্বো। আর দাদা, মা ও বাবার সেবা কর্ব্বো। আর ভগবানের আরাধনা কর্ব্বো—(চক্ষু মুদিয়া)।

সুঃ। (চক্ষু খুলিয়া) কাল কেন? আজই গেরুয়া বসন পরে দেখি না কেন, কেমন হয়।

(প্রস্থান ও কিছুকাল পরে তরুণী তাপসীর বেশে পুনঃ প্রবেশ। বাতায়ন পথে দণ্ডায়মান) (স্বগত) সন্ন্যাসিনী হয়ে চলে যাই না কেন? এই রাত্রিতে বড়ই অন্ধকার, একলা—তা হোক, কিন্তু কুলের যে কলঙ্ক, লোকেত সন্ন্যাসিনী ভাববে না। মিছা হলেও কুলের কলঙ্ক আমার দ্বারা হবে না।

(ধীরেন্দ্রের প্রবেশ)

ধীরেন্দ্র। সুনীতি! সুনীতি।

(চমকিয়া) দাদা?

ধীরেন্দ্র। ও কি, ও বেশ কেন?

সুনীতি। কিছু নয়। সথ করে পরেছি।

ধীরেন্দ্র। এ সথ কেন সুনীতি?

সুনীতি। এ সথ কেন? তুমি কি সব জাননা, দাদা আমি বিয়ে কর্ব্বো না। আমি ঘরে তাপসী হয়ে থাকবো।

ধীরেন। সুনীতি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। বিজয় যদি তোমাকে গোপনে বিবাহ করে,তাতে তুমি রাজি আছ—গোপনে বিয়ে কর্লে কিন্তু তার বাবা তাকে, বোধ হয়, কিছু বিষয় দেবেন না।

সুনীতি। (লজ্জায় মুখ লাল) আমার জন্যে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে পথের ভিখারী হবেন—না? আমি যেখানেই যাব, সেখানেই কি অমঙ্গল? তা হবে না। (স্বগত (—হৃদয় শান্ত হও। যা হবার নয় তা কেন ভাবছো) না, দাদা। আমি তাতে রাজি নহি, আমি গৃহে তাপসী কুমারী হয়ে থাকবো।

ধীরেন্দ্র। ছি! ও কথা বলো না।

সুনীতি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তুমি কি শোনোনি, আমার জন্য কাল বাবা গঙ্গার ধারে রামধন বাবুর পায়ে পড়বেন, আমার জন্য তোমাকে হয়ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্তে হবে, না হয় গৃহত্যাগী হতে হবে; আমার জন্য মা হয়ত আত্মঘাতী হবেন, অথবা আমার জন্য এই বসতবাটী বিক্রী করে, তোমরা আশ্রয়শূন্য হয়ে পথে পথে বেড়াবে। আমার কেবল এই সব কথা মনে হচ্ছে, আর কান্না পাচ্ছে। আমার দুই পথের এক পথ। হয় আত্মহত্যা, না হয় গৃহে চিরকুমারী তাপসী হয়ে থাকা।

ধীরেন্দ্র। (সুনীতির চক্ষু মুছাইয়া) তোমার বিবাহের জন্য, আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্ব্বো—

সুনীতি। না, দাদা, তুমি যা মাকে বলেছ, আমি তা শুনেছি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্লে নরকগামী হতে হয়। আমার জন্য দাদা, নরকগামী হবে? তা কোন মতেই হবে না।

ধীরেন্দ্র। হবেনাত কি হবে?

সুনীতি। হবে যা ভগবান্ কর্ব্বেন।

৩য় দৃশ্য।

স্থান—কৈলাসচন্দ্রের শয়ন ঘর।

কাল—রাত্রি।

কৈলাসচন্দ্র। (স্বগত) এক বৎসর হয়ে গেল বিয়ে হয়েছে। বৌকে আনা হয়েছে। লোকে বলে আমার বৌ তাপসী হয়েছে। আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য—এত রূপ আমি কখনও চোখে দেখিনি। কখন স্বপনে ভাবি নাই, স্ত্রীলোক এত সুন্দর হতে পারে! এমন রূপ—তার উপরে নগদ ১৫০০৲ টাকা। হবে না? "বিয়ে পাশ করেছি, তার ওপর একটু সম্পত্তি আছে, যদি একটা কাল মেয়ে বিয়ে কর্তাম তা হলেও ৩০০০।৪০০০৲ টাকা পেতাম। যা হোক, এ বিয়েতে বার্গেন (Bargain) টা ঠকা হইনি। বাবা বার্গেনে খুব মজবুত। হবে না কেন,হোজের মুচ্ছিদ্দি। আমার স্ত্রী শুনিছি বেশ লেখা পড়া জানে। বস্। What Bargain? Beauty plus money, plus learning. আমি বি-এ, আমার স্ত্রী লেখা পড়া না জান্‌লে কি সাজে?

উঃ আসতে এত বিলম্ব হ'চ্ছে কেন? ঘরের মধ্যে সেই নবোঢ়া রূপসী প্রবেশ কল্লে। কি রূপের ঢেউই উঠলে! আমি হাত ধরে

তাকে খাটে বসাব, আস্তে আস্তে তার ঘোমটা খুলবে, আমার কবিত্বময় ভাষায় তাকে কত সম্ভাষণ কর্ব্বো, তার মুখচন্দ্র চুম্বন কর্ব্বো।

(সুনীতির প্রবেশ)

একি! তাপসীর বেশ? বন্ধুরা রহস্য কোরে বলতো, এক তাপসীর সঙ্গে কৈলা-সের বিয়ে হবে—সত্যই তাই দেখছি। কিন্তু তাপসীর বেশে আমার স্ত্রীর অপরূপ রূপলহরী আরও যেন উথলে পড়্ছে—প্রিয়ে, প্রেয়সী, চন্দ্রাননে, শকুন্তলাকে দেখে দুষ্মন্তের যা মনে হইছিল, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিক মনোজ্ঞা বল্কেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরানাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম॥

বুঝলে কি? বাঙ্গালা কোরে বলি—পদ্ম সুন্দর, সব তাতেই সুন্দর, এমন কি, শৈবালের মধ্যে পদ্ম সুন্দর দেখায়। চন্দ্র সুন্দর, তাতে যে কালিমা আছে, তাতেও যেন তার শোভা বৃদ্ধি হয়েছে। শকুন্তলা সুন্দর, বল্কল পরে যেন তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। ফল কথা, যাদের আকৃতি মধুর, স্বভাবতঃ যারা সুন্দর, তারা যা পরে, তাই তাদের অল-ঙ্কার স্বরূপ হয়, তাতেই তাদের আরও সুন্দর দেখায়। এই গেরুয়া বসনেও তোমাকে, প্রিয়ে, তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে, আমি তা বর্ণনা কর্ত্তে পারি না। আমি বড়ই সৌভাগ্যশালী যে তোমার মত রত্ন লাভ করেছি (একদৃষ্টে নিরীক্ষণ কোরে) বোধ হচ্ছে যেন তুমি গোলাপকুসুম-স্তবক। সুন্দরি, তোমার নবযৌবন, বিকশিত কুসুমরাশির ন্যায়, তোমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যপে রয়েছে। এস খাটের উপর বসো। তুমি আমার হৃদয়ের দেবী। আমি তোমার দাস, অনুগত ভৃত্য (হাসি) ভৃত্যকে অভয় দেও। তা হ'লে তোমার হাত ধোরে খাটে বসাই।

(সুনীতি দূরে ধরাসনে বসিলেন)

কৈলাস। ওকি, ওখানে বস্‌লে কেন? তোমার স্থান আমার হৃদয়ে (উঠিয়া হাত ধরিবার উপক্রম)

তাপসী (সুনীতি) আমাকে ছোঁবেন না এখন।

কৈলাসচন্দ্র। এখন ও সকল কথা আর লোকে মানে না। স্পর্শ করাতে দোষ নাই।

(তাপসী)। আপনি বুঝেন নাই। আমি যতদিন এই বেশে আপনার কাছে আস্‌ব, ততদিন এই হতভাগিনাকে স্পর্শ করিবার আপনার অধিকার নেই।

কৈলাস। তোমাকে স্পর্শ করার আমার অধিকার নেই? এ কি কথা?

তাপসী। আপনি আমার পিতাকে ফতুর কোরে আমাকে বিয়ে করেছেন। তিনি যে ১৫০০৲ টাকা দিয়েছেন, তা দিতে তাঁকে বাড়ী বাঁধা দিতে হইছিল। কাল খবর পেলাম যে একমাসের মধ্যে সে টাকা সুদ সমেত না দিতে পার্লে বাড়ী বিক্রি হয়ে যাবে, ঢোল বাজিয়ে গিয়েছে। এই একমাসের মধ্যে ঐ টাকা ফেরত দিতে হবে।

কৈলাস। এমন কথাত কখন শুনিনি যে বিয়ের টাকা শ্বশুরকে ফিরিয়ে দিতে হয়। An original girl!। এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিয়েছে? তোমার বাবা? তোমার বাবা আচ্ছা ধড়িবাজ ত?

তাপসী। বাবা অত ছোট লোক নয়।

কৈলাস। তোমার বাবা ছোট লোক নয়, আমিই ছোট লোক।

তাপসী। আপনি আমার স্বামী, প্রভু। বিয়ের উপলক্ষে লোককে সর্ব্বস্বান্ত করা, ছোট লোকের কাজ, না বড় লোকের কাজ, আমি আপনাকে তা কেমন কোরে বলবো।

কৈলাস। বাজারে ভাল জিনিষ নিতে হলে অধিক দাম দিতে হয়। ফজলি আম, টাকায় আটটা। আর রসো দেশী আম টাকায় ১০০টা। তোমার বাবা বি-এ চেই-ছিলেন, সুতরাং দেড় হাজার টাকা দিতে হয়েছে: এফ-এ নিতেন, খুব সম্ভব ১০০০ টাকায় হত। এনট্রান্স পাশ নিতেন, পাঁচশো টাকায় হত। যেমন জিনিষ, তেমন দর।

তাপসী। বিবাহ কি একটা সওদাগিরি কেনা বেচা? ধর্ম্ম সম্বন্ধ নয় কি?

কৈলাস। আমি তোমার কাছে বিবাহ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে চাই নে। ও সব ফাজলাম ছেড়ে দেও। আমার কাছে ও সব ফিকির খাটবে না।

তাপসী। ফিকির নয়। আমার কথা অতি স্পষ্ট। আবার বলছি, আপনি যে ১৫০০৲ টাকা নিয়েছেন, যতদিন সে ১৫০০৲ ফেরত না দেবেন, ততদিন আমাকে ছোবেন না। ততদিন আমার সঙ্গে আপনার ধর্ম্মসম্বন্ধ স্থাপন হবে না।

কৈলাস। ছি, ওরকম কথা বলো না। পাগলামি করো না। চুপ করে ঘাড় হেট কোরে থাক্‌লে কেন—খাটের উপর এস।

তাপসী। (ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল)

কৈলাস। যদি আমি জোর করি?

তাপসী। আপনি বি-এ পাশ করেছেন, আপনি আমার উপর পশুর মত বলপ্রয়োগ কর্ব্বেন না।

কৈলাস। তুমি যদি আমার অবাধ্য হও, আমি পুনর্ব্বার বিয়ে কর্ত্তে পারি তা জান?

তাপসী। আপনি আর এক শতটা বিয়ে করুন, তাতে আমার আপত্তি নাই। আপনার তাতে লাভও হবে, প্রতিবারে দেড় হাজার টাকা পাবেন।

কৈলাস। আমি তোমাকে যত কিছু বলছিনে, ততই বাড়াচ্ছ?

তাপসী। কি বলবেন? কি বলবার আছে?

কৈলাস। বলবার আছে শুনবে? তোমার বিয়ের সময় যে সকল বেনামি পত্র পেইছিলাম, এমন মনে হচ্ছে হয়ত তা সত্যি।

তাপসী। কি বেনামি পত্র?

কৈলাস। বিবাহের পূর্ব্বে বিজয় নামক রামধন বাবুর পুত্রের সঙ্গে তোমার ভাব হইছিল। যে পরপুরুষকে আপন দেখে, স্বামীকে পর দেখে, স্বামীর কাছে যেতে চায় না—

তাপসী। (ললাটে করাঘাত কোরে)—হা ভগবান! এই কথা আমার শুনতে হ'ল্লো!—গরিবের মেয়ে টাকার অভাবে দুই এক বৎসর বিয়ে দিতে বিলম্ব হইছিল—আমার স্বামার মুখে এই কথা—এই দারুণ বাক্য শেল—

কৈলাস। হাঁ হাঁ, আমি আরও অনেক কথা জানি। তোমার বাবা গঙ্গার ধারে রামধন বাবুর পায়ে পড়েন নি কি? তোমার দাদার সঙ্গে বিজয়ের সহিত তোমার গোপনে বিয়ে দিবার যুক্তি হইনি কি?—সব জানি গো—সব জানি - অত জারি করো না। বিজয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য তোমার বাবা ছুঁচোমির চূড়ান্ত করেছে। এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি, বদমায়েস বিজয় তোমাকে বিয়ে কর্ব্বে, এই প্রলোভন দিয়ে ঘনিষ্ঠতা করেছিল—তারপর তোমাকে দূর করে দিয়েছে—আর সেই বদমায়েসটা সন্ন্যাসী বেশ নিয়ে ভণ্ডামি করে বেড়াচ্ছে। ও! তাই তোমার সন্ন্যাসিনীর বেশ! বুঝিছি।

তাপসী। আপনি যা খুসি বলুন, ভগবান জানেন—আট বৎসর বয়সের পর আমি বিজয় বাবুকে কখন দেখিনি। তবে তাঁর বিষয় সকলে যা বলে, তাতে আমি জানি, সত সহস্র বিদ্যাধরী যদি তার পায় কাছে গড়াইয়া পড়ে, তিনি একবার চেয়েও দেখেন না।

কৈলাস। শ্রী বিষ্ণু, তিনি ভীষ্মদেব।

তাপসী। তিনি ভীষ্মদেব হোন আর না হোন, তিনি বিয়েতে টাকার লোভ করেন নি। অত বড় জমিদারী, তা ছেড়ে সন্ন্যাসী হবার জন্য কাশী গিছিলেন। বাপ মা ছাড়ে না, তাই গৃহে আছেন। দেখুন, আপনি দেড় হাজার টাকার মায়া ছাড়্‌তে পার্চ্ছেন না।

কৈলাস। বিজয় আজও বি-এ পাশ করিনি। তবু তোমার চোখে আমি বিজয়ের কাছে নগণ্য, তুচ্ছ, তুই কলঙ্কিনী পাপীয়সী—ফের যদি বিজয়ের কথা বল্‌বি, জুতা মেরে তোর মুখ ছিঁড়ে দেব।

তাপসী। আমি গরিবের মেয়ে কেন জুতা মারবে না? তুমি বি-এ পাশ করেছ, আমার বাবার কাছে দেড় হাজার টাকা

নিয়ে আমাকে বিয়ে করেছ। কেন আমাকে জুতো মারবে না।

কৈলাস। বলচি চুপ কর (হাত তুলিয়া) তা না হলে এখনি মা'র খাবি।

তাপসী। আমি দাসী, তুমি প্রভু— মার্ব্বে না কেন? আমি অসহায়া বালিকা, তুমি বলবান পুরুষ—তুমি আমাকে কেন মার্ব্বে না। যে কাপুরুষরা বিয়েতে অর্থ শোষণ করে অন্য পরিবারকে পথে বসাতে পারে, সে কাপুরুষরা তাদের অসহায়া স্ত্রীকে নিরপরাধে মার্ত্তে পারে।

কৈলাস। হারামজাদি, আমাকে কাপুরুষ বল্লি—(তাপসীর গালে জোরে চপটাঘাত) পাজি, ছুঁচো, বদমায়েস।

তাপসী। (হাত জোড় করিয়া) আমি স্ত্রী,আপনি স্বামী ; সুতরাং আমি বদ্‌মায়েস। বাবা! আপনারা যে বসতবাড়ী বাঁধা দিয়ে, দেড় হাজার টাকা দিয়ে, আমার বিয়ে দিয়েছেন, দেখুন আমাকে বি-এ পাশ জামাইয়ের হাতে দিয়ে আমাকে কেমন সুখী করেছেন, দেখুন সে—

কৈলাস। জুতা না হলে চুপ কর্ব্বি নে।

তাপসী। (হাত যোড় করে)— এ দাসীকে আপনার যত জুতা মার্ব্বার সাধ থাকে, আজ তা মিটিয়ে নিন, কা'ল এ জগতে আপনার নিকট জুতা খাবার কোন লোক থাকবে না।

কৈলাস। (হাতে জুতা তুলিয়া) ভাল চাস্‌ত, এখনও চুপ কর্।

তাপসী। হে বসুন্ধরে ? বিদীর্ণ হও, তোমার উদরে আমি প্রবেশ করি—(চক্ষু মুদিয়া উপর দিকে মস্তক তুলিয়া করযোড়ে) মা দুর্গা, বঙ্গের অর্থগৃধ্নু কাপুরুষদিগকে সুমতি দেও—

কৈলাস। ফের "কাপুরুষ" ? জুতা প্রহার ও তাপসীর মূর্চ্ছা ও পতন—

কৈলাস। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, নেকামি করে পড়ে যাওয়া হ'ল। থাক্ ওখানে পড়ে।

(নেপথ্যে) কৈলাসের মা। কি বকাবকি হচ্ছে এতক্ষণ ? আগেই বলেছিলাম, কেদার মাষ্টারের মেয়ে খ্যাপা—ব্যাপক। কৈলাস তখন শুন্‌লো না। সুন্দর মেয়ে দেখে ভুলে গেল। আমি বল্‌লাম, রাধাকৃষ্ণ বাবুর মেয়েকে বিয়ে কর, ২০০০৲ টাকা পাওয়া যাবে। তখন মার কথা শুনা হলো না। এখন, গুরুবাক্য না শুনায় ফল দেখুক।

৪র্থ দৃশ্য।

স্থান—বহির্ব্বাটী।

কাল—প্রভাত।

রামনাথ বি-এ ও তাহার পিতা রূপচাঁদ।

রূপচাঁদ। তুমি কি পাগল হয়েছ! বিয়ের টাকা তোমার শ্বশুরকে ফিরিয়ে দিবে ?

কৈলাস। হাঁ, বাবা।

রূপচাঁদ। তোমার আইন পড়ার খরচ কোথায় পাবে ?

রামনাথ বি-এ। আমি মাষ্টারি করে বি-এল দেব।

রূপচাঁদ। এ কুবুদ্ধি তোমার কেন হল ? তুমি পাগল হয়েছ, আমিত আর পাগল হইনি। আমি তোমাকেও টাকা দেব না। বিয়েতে কি আমার খরচ হই নি ? তোমাকে এত দিন পড়িয়েছি—তাতে আমার টাকা খরচ হই নি ? সে বার তোমার চিকিৎসাতে আমার কত টাকা খরচ হয়ে গেল। তোমাকে মানুষ কর্ত্তে আমার দশ হাজার টাকা খরচ হযেছে।

কৈলাস। পরিবার থাকলে তা প্রতিপালন কর্ত্তে খরচ হয়।

রূপচাঁদ। কিন্তু এই খরচের টাকা আসে কোথা থেকে ? তুই এমনি কুলাঙ্গার পুত্র, ভেবেছিস্ আমি তোর বিয়ের টাকা নিয়ে বড়মানুষ হব।

কৈলাস। বাবা, আপনার কথার উত্তর দিতে আমার কেমন একটা আত্মগ্লানি হয়েছে। আমার প্রাণ কেমন হুহু করে জ্বলে যাচ্ছে। আমাকে মাপ কর্ব্বেন। এই টাকাটা ফেরত দিতে না পার্লে, আমার সংসারাশ্রম করা অসম্ভব।

রূপচাঁদ। টাকা কি এখনি ফেরত

দিতে হবে? একটা দুটা টাকা নয়—দেড় হাজার টাকা—যে টাকা বুকের রক্ত—তা ফেরত দেওয়া আর বুকের রক্ত চিরে দেওয়া সমান কষ্টকর।

কৈলাস। আপনার আশীর্ব্বাদে বেঁচে থাক্‌লে আমি উপার্জ্জন করে যা পাব, আপনার চরণে এনে দেব। দেড় হাজার টাকায় আমরা বড়-মানুষ হব না। টাকাটা দয়া করে এখনি দেন।

রূপচাদ। (কুপিত হইয়া বাক্স খুলিয়া দেড় হাজার টাকা ফেলিয়া দিয়া) এই নেও তোমার টাকা, বাপু।

(টাকা নিয়ে কৈলাসের প্রস্থান)

রূপচাঁদ। ছেলেটা কি খেপেছে? না বৌমা গুণ করেছে? লোকে বলে বৌমা "তাপসী"—তন্ত্র মন্ত্র জানে। টাকাটা বেরিয়ে গেল। উঃ আমার বুক যে হুঁ হুঁ করে জল্‌ছে। হে অর্থ! জগতে তুমি এক সার-পদার্থ—তুমিই সত্য। ধর্ম্ম মিছে, ঈশ্বর মিছে, পাপ-পুণ্য মিছে, টাকা, তুমিই সত্য। তাই টাকা আসিলে সুখ, টাকা চলিয়া গেলে দুঃখ। টাকা—টাকা—টাকা।

৫ম দৃশ্য।

স্থান কেনারামের শয়ন-কক্ষ।

(তাপসী ধরাতলে শয়ানা)।

(রামনাথের টাকা হস্তে প্রবেশ)

কৈলাস। হাঁ এখনও তেমনি শুয়ে, প্রিয়ে উঠ। টাকা এনেছি। ফেরত দেব, আমি সত্যই অতি কাপুরুষ। তাই টাকা নিছিলাম। আমি অতি পাষণ্ড, তাই দেব-কন্যা সদৃশী সহধর্ম্মিণীকে প্রহার করেছিলাম। প্রিয়তমে, সুনীতি, আমায় ক্ষমা কর। তুমি এ অন্ধকে চক্ষু দিয়েছ, এত তর্ক কোরে বিশুদ্ধ বিবাহ সভার লোকে যা আমাকে বুঝাতে পারিনি, তোমার কথাতে আমি তা বুঝেছি—আম নিতান্ত অপরাধী, আমাকে ক্ষমা কর।—নির্ব্বাক! নিশ্বাস পড়ছে না যেন। তাই ত—অসাড়—কি হলো! কি হলো—সুনীতি—সুনীতি—প্রিয়ে দেবি—তুমি অধমকে ত্যাগ কোরে কোথায় গেলে—(দরজার দিকে দৃষ্টি করিয়া) মা, শীঘ্র এদিকে এস—শীঘ্র ডাক্তার আন্‌তে বল, বাবু বাহিরে আছেন, শীঘ্র খবর দেও—ইনি অচেতন—যেন মড়া—শীঘ্র এস।

কৈলাসের মা (প্রবেশ করিতে করিতে) কি হলো, বৌমা মূর্চ্ছা গিয়াছেন। মূর্চ্ছা রোগ আছে বুঝি? ভাল বৌ হয়েছে। তখনি বলেছিলাম ও বিয়ে কর না, বাবা—আরে মুখে জলের ছিটে দে—

কৈলাস। মা ধর, খাটের ওপর শোয়াই। (খাটের ওপর শয়ন করান হইল ও মুখে জল সিঞ্চন)

(রূপচাঁদের প্রবেশ)

রূপচাঁদ। হয়েছে কি? হিষ্টিরিকৃস (hysterics)?

কৈলাসের মা। আমার কথা কথাই নয়—তখন শোনা হল না—এখন দেখ মূর্চ্ছা রোগ।

রূপচাঁদ। আরে স্মেলিং সল্‌ট আনো। বাতাস কর। (স্বগত) মূর্চ্ছা কি? মৃত্যুর লক্ষণ যেন বোধ হচ্ছে। বৌটা মলে বোধ হয় টাকাটা কৈলাস ফেরত দেবে না।

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডাক্তার। (নাড়ী দেখিয়া ও নিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া) A case of suspended animation হোতে পারে। We will try electricty (তাড়িত যন্ত্র লাগাইয়া) Somewhat hopeful (তাপসীর একটী নিশ্বাস ছাড়িল) Yes, Breathing restored (আবার নাড়ী দেখিয়া) Scened, মহাশয় ভয় নাই। প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখছি, এই ঔষধ খাওয়াইবেন। তাহার আধ ঘণ্টা পরে একটু দুধ দিবেন, তার পরে আমাকে খবর পাঠাইবেন। (কৈলাস ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

(তাপসীর জ্ঞান লাভ)

(কৈলাসের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি)

কৈলাস। দেবি! আমাকে ক্ষমা কর, আমি পশু, আমি নরাধম, আমি কুলাঙ্গার। আমাকে ক্ষমা কর, আমি পিশাচ, আমি পাষণ্ড, আমার অপরাধ ক্ষমা কর—সুনীতি, আমি দেড় হাজার টাকা অদ্যই বৈকালে তোমার পিতাকে ফেরত দিব। এই টাকা এনেছি।

তাপসী। আরও কাছে আসুন। এখন

আপনি মনুষ্য, এখন আমার স্বামী—আমার মৃত্যু নিকট, আমি মরে গেলে বাবা ও টাকা ফেরত নেবেন না, তা আমি জানি। আপনি ঐ টাকাটা 'বিশুদ্ধ-বিবাহ-প্রণালী প্রচলন সভায়' দিবেন। আমার নিবেদন, আমি মরে গেলে আপনি আবার বিবাহ কর্বেন, কিন্তু টাকা লইবেন না। আমি যে কিছু দুর্বাক্য বলেছি, তা ক্ষমা করুন, ভুলে যান, আমার মাথায় আপনার চরণধূলি দিন। (তাপসীর চরণধূলি গ্রহণ) আমাকে চুম্বন কর প্রিয়তম! আমি নিতান্ত তোমারই (কৈলাসের চুম্বন) প্রিয়তমে জীবিতেশ্বরী।

সুনীতি। (কৈলাসের গলা জড়াইয়া তাঁহাকে চুম্বন) প্রাণেশ্বর—এ হতভাগিনীকে বিদায় দিন—হৃদয়েশ্বর, চলিলাম।

(চক্ষু মুদ্রিত—প্রাণত্যাগ)

কৈলাস। সুনীতি সুনীতি, দেবি, প্রাণেশ্বরি, কোথায় গেলে, তুমি কথা কও, আবার একবার তাকাও—প্রিয়তমে যথার্থই এ অধমকে ছেড়ে চলে গেলে, আমি ও তোমার সঙ্গে আছি—(মৃতদেহকে জড়াইয়া ক্রন্দন)

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

গিরিজাপ্রসন্ন। (৫)

পিতৃবিয়োগ।

১৩০০ সালে গিরিজাপ্রসন্নের পরম ধার্ম্মিক পিতা মথুরানাথ রায়চৌধুরী মহাশয় ৫২ বৎসর বয়সে মানব দেহ সম্বরণ করেন। অসময়ে পিতৃবিয়োগে গিরিজাপ্রসন্ন নিতান্ত ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়িলেন। মথুরানাথের চারি পুত্র, তন্মধ্যে গিরিজাপ্রসন্নই জ্যেষ্ঠ, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান ও ধার্ম্মিক, কাজেই ধর্ম্মপালনের জন্য ও লোকের অভিলাষিত আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য তিনিই বিষয় ভার গ্রহণ করিলেন এবং প্রজাপুঞ্জের শাসন সংরক্ষণাদির জন্য নূতন নূতন ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা সংস্থাপিত করিলেন। তাঁহার ষ্টেটের কাগজ পত্র পূর্ব্বে ভালরূপ প্রস্তুত ছিল না। যাহাতে ভবিষ্যতে কোন রূপ সন্দেহ বা দোষের কারণ সমুপস্থিত না হয় এবং বর্ত্তমানে কার্য্যপ্রণালী ন্যায্য ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতে পারে, তজ্জন্য কার্য্যকুশল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া সকল প্রকার দোষ সংশোধন করিতে লাগিলেন! কিন্তু কয়েক মাস কার্য্য করার পর ভ্রাতৃবর্গকেও কার্য্য করিবার ক্ষমতা পর্য্যায়-ক্রমে এক বৎসর প্রদান করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন এবং ধর্ম্মবিগর্হিত স্বেচ্ছাচার-মূলক কার্য্য নিবারণের জন্য কয়েকটী সুন্দর নিয়ম সংগঠিত করিলেন। গিরিজাপ্রসন্ন ১ম বৎসর কর্ত্তৃত্ব কালে সম্পূর্ণ রূপ ঐ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলেন ও তৎপর ভ্রাতৃবর্গকেও বিষয় কার্য্য চালাইবার সময়ে ঐ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে পরামর্শ দিলেন।

সুপণ্ডিত Helps লিখিয়াছেন :—It is more difficult to goveran family than to govern a province. একটী রাজ্য শাসন অপেক্ষা একটী পরিবার পালন করা কঠিন। গিরিজাপ্রসন্ন ইহা জানিতেন, তাই পূর্ব্ব হইতেই ন্যায় পথ অবলম্বনের জন্য এত সতর্কিত হইতেছিলেন। অনেক সময় ষ্টেটের কর্ত্তৃত্ব পরিচালনকারীর কার্য্যে বহু দোষ পরিলক্ষিত হয়, গিরিজাপ্রসন্ন ঐ সব দোষ নিবারণের জন্য প্রতি বৎসর কর্ত্তৃত্ব পরিচালন-কারীকে একটা বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহার প্রবর্ত্তিত এই সব নিয়ম বিলুপ্ত হইয়াছিল! সে যাহা হউক, গিরিজাপ্রসন্নের এই সব সাধু ও নিঃস্বার্থ দৃষ্টান্ত দেখিয়া, ক্ষুদ্র নদী যেরূপ অনন্তবিস্তারী সাগরের উদ্দেশে প্রধাবিত হয়, প্রজাপুঞ্জও তাহার মহানুভাবতা ও সত্যনিষ্ঠায় একান্ত সঞ্চালিত হইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে শান্তি লাভ করিতে লাগিল। কয়েক দিন মধ্যে তাঁহার যশালোক মধ্যাহ্ন

ভাস্করের ন্যায় চতুর্দ্দিক বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। গিরিজাপ্রসন্নের ন্যায় একজন সুপণ্ডিত সত্য-শাসিত মহাপুরুষ বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলে, তাঁহার বিচার কার্য্যে শুধু স্বীয় জমিদারীর অধীনস্থ প্রজাগণ কেবলমাত্র পরিতুষ্ট হইবে কেন, ভিন্ন স্থানের অধিবাসীগণও তাঁহার অসাধারণত্ব অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। বহু ভূম্যধিকারী পরস্পর ঝগড়া বিরোধ করিয়া নিষ্পত্তির জন্য মহানুভব গিরিজাপ্রসন্নের নিকট স্মরণ লইত। অনেক সময় বরিশাল আদালতে বিচারপ্রার্থী লোক আদালত হইতে মোকর্দ্দমা তুলিয়া গিরিজাপ্রসন্নের নিকট বিচারপ্রার্থী হইত। ইহা দ্বারাই, বোধ হয়, অনুমান করা যাইতে পারে যে, ন্যায় রক্ষার জন্য গিরিজাপ্রসন্ন বিষয় রক্ষাকালেও কতদূর যত্নবান ছিলেন, এবং তজ্জন্য প্রজাবর্গ ও বিভিন্ন স্থানীয় লোকের হৃদয় কিরূপ আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্নের কর্ত্তৃত্বকালে তাঁহার অধীনস্থ লোক তদীয় প্রতিভার পরিচয় পাইবার ও দিবার যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইল। গিরিজাপ্রসন্ন উৎকৃষ্ট বোদ্ধা ও ন্যায়পরায়ণ, কাজেই কাহারও কার্য্যের দোষ গুণ তাহার অপরীক্ষীত থাকিত না। যে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ হইত, তাঁহাকে তিনি যথোচিত পুরস্কৃত করিতে ত্রুটি করিতেন না। কর্ম্মচারীদিগকেও তিনি কার্য্যকুশল করিবার জন্য যথোচিত পরিশ্রম করিতেন। তাহার কোন একটী কর্ম্মচারী কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দেওয়ায়, তিনি তাহার চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়া একখানি সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই সার্টিফিকেট দর্শন করিয়া তাঁহার একজন বন্ধু তাহাকে একটী চাকুরী দেন। আমরা শুনিতেছি, গিরিজাপ্রসন্ন সার্টিফিকেটে ঐ লোকটীর যে সব গুণ উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সব গুণ তাহার চরিত্রে প্রত্যক্ষ করিতেছেন ও তৎপ্রতি যথোচিত প্রীত হইয়াছেন। গিরিজাপ্রসন্নের ন্যায় গুণগ্রাহী লোকের অধীনে কাজ করা কতদূর সুখের হইত, তাহা গুণী ব্যক্তিগণ ইহা দ্বারাই কল্পনা করিতে পারিবেন। কি পাঠ্য জীবনে, কি ওকালতী ব্যবসায় সময়ে, কি বৈষয়িক কার্য্যে, যখন যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন, তখনই তিনি সেই কার্য্যের মধ্যে তাহার লক্ষ্য স্থির রাখিয়া বিশেষত্ব দেখাইতে পারিতেন। তিনি তাঁহার নিজের জীবন উন্নত করার জন্য যেরূপ প্রতিনিয়তই যত্নবান ছিলেন, তাঁহার জীবনের বিভিন্ন কার্য্যের সহচরগণ যাহাতে মহৎ হইয়া জগতের হিতসাধন করিতে পারেন, তাহার দিকেও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন। পুত্রের উন্নতিতে তাঁহার কত উল্লাস, তাহা তাঁহার বন্ধুগণই জানেন। পাশ্চাত্য দেশীয় পার্লিয়ামেণ্টের কোন মন্ত্রী ডাক্তার জনসনকে গালি দিয়া বলিয়াছেন যে, লেখকগণ রচনা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যের উপযোগী হয় না। সে দেশের লেখকগণকে সেরূপ দোষারোপ করা যাইতে পারে, কারণ তাহারা কি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, কি অননুষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাহার বিচার করিয়া কার্য্য করিতে শিখে না। যে কার্য্য তাহাদের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির অনুকূল, তাহারা সেই কার্য্যই সম্পাদনীয় ও অনুষ্ঠেয় বলিয়া ধারণা করে। ভারতবর্ষের লোক প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায় না, তাহাদের কি অনুষ্ঠেয় কি অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হয়, যে কার্য্য প্রবৃত্তির অনুকূলে নহে, সে কার্য্যটী যদি অনুষ্ঠেয় হয়, তাহা হইলে তাহারা প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া অনুষ্ঠেয় কার্য্যে বিশেষত্ব দেখাইয়া থাকেন। বিষয় কার্য্য এই সময় গিরিজাপ্রসন্নের প্রবৃত্তির অনুকূলে ছিল না, গিরিজাপ্রসন্ন তথাপি ইহা অনুষ্ঠেয় বোধ করিয়া যদ্রূপ এই কার্য্যে প্রতিভা দেখাইয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর।

গিরিজাপ্রসন্নের আর একটী ন্যায়াচরণ তাঁহার অধীনস্থ ও বিষয়-সম্পর্কীয় লোকদিগকে বড়ই উৎসাহিত করিত। সেটি পাওয়ানা ও দেনাদারদের প্রতি উচিত ব্যবহার। তাহার কর্ত্তৃত্ব কালে যাহারা তাঁহার নিকট ঋণাবদ্ধ হইত, তিনি বিশেষ কারণ না থাকিলে নিয়মিত সময় ঋণ আদায়ের কোনরূপ ত্রুটি করিতেন না। আর তিনি যদি কাহারও নিকট ঋণী থাকিতেন, তবে নির্দ্দিষ্ট

দিনে ঋণ পরিশোধে কোনরূপ ঔদাস্য করিতেন না। যদি উত্তমর্ণকে ঋণ শোধ দিবার জন্য কোন সময় সঞ্চিত অর্থের অভাব অনুভব করিতেন, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহা পরিশোধের জন্য এত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন যে, তজ্জন্য অপরের নিকট ঋণাবদ্ধ হইয়া দেনা শোধ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। বিষয় কার্য্যের মধ্যে থাকিয়া নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতি এত লক্ষ্য কি সুন্দর নহে?

ক্ষমা।

বাটীতে অবস্থান সময়ে একবার গিরিজাপ্রসন্ন জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। তাঁহার গৃহচিকিৎসক তাঁহাকে চিকিৎসা করেন। গিরিজাপ্রসন্ন তাঁহার অধীনে কিছুকাল চিকিৎসিত হইয়া ফললাভ না করায়, অন্য একজন সুচিকিৎসক নিযুক্ত করেন। ভগবানের কৃপায় এই নবীন চিকিৎসক একদিন মাত্র চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে নিরাময় করেন, এবং বলেন যে, তাহার গৃহচিকিৎসক রোগ নির্ণয়ে দক্ষ নহে, তাই তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল ভুগিতে হইয়াছে। যদি আরও কিছুদিন সে চিকিৎসা করিত, তাহা হইলে রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত। গিরিজাপ্রসন্নের গৃহচিকিৎসক গিরিজাপ্রসন্নের অধীনস্থ লোক। তিনি গিরিজাপ্রসন্নের রোগ মুক্তির পর, একদিন দেখিতে আসিয়াছিলেন, গিরিজাপ্রসন্ন তাঁহার চিকিৎসা ব্যবসায়ে অদূরদর্শিতা ও অপারকতার কথা উল্লেখ করিয়া তিরস্কার করেন, কিন্তু নবীন চিকিৎসক ইহা শ্রুত হইয়া গিরিজাপ্রসন্নকে সরলভাবে বলেন, আপনার চিকিৎসায় পূর্ব্ববর্ত্তী চিকিৎসকও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে নাই, তবে রোগোৎপত্তির কারণ নির্ণয়ে সে অসমর্থ হইয়াছিল, এইজন্যই রোগ এতদিন আরাম হয় নাই। আমি যে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, যদি উহাদ্বারা আপনি উপকৃত না হইতেন, তাহা হইলে আমিও ত আজি নিন্দার ভাজন হইতাম। গিরিজাপ্রসন্ন তখন আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া পূর্ব্বচিকিৎসক তাঁহার গৃহে সমুপস্থিত হইলে তাহাকে অযথা কটুক্তির জন্য মুক্তকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁহার ভ্রান্তি কেহ প্রদর্শন করিয়া দিলে তিনি তাহা স্বীকার করিয়া ভ্রান্তি বা দোষ ক্ষালনের জন্য এইরূপ নম্র হইতে জানিতেন। যে লোকের নিকট তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে লোক কখনই গিরিজাপ্রসন্নের নিকট এতদূর নম্রতা প্রত্যাশা করিতে পারিত না। গিরিজাপ্রসন্ন নিরভিমান ও আত্মদর্শীপুরুষ, তিনি অম্লানবদনে স্বকীয় দোষ উপলব্ধি করিয়া হৃদয়খান পবিত্র করিলেন। এরূপ মহত্বসূচক দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে অনেক ঘটিয়াছিল, সে সব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যে পাঠকবর্গের চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট করি, সেরূপ আমাদের সময় নাই। আমরা চাই, গিরিজাপ্রসন্নের নির্ম্মল হৃদয়খানি সাধারণের সম্মুখে ধরিতে। এইরূপ দুই একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাদের সেই উদ্দেশ্য কি সফল হইতেছে না?

ব্রহ্মচর্য্য পালন।

পিতৃবিয়োগের পর গিরিজাপ্রসন্ন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিলেন। এতদিন তাঁহার ভগবৎপ্রেম ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অন্তরাভ্যন্তরে নিহিত ছিল—পিতৃবিয়োগ-বায়ুতে উহা প্রধূমিত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে হইলে সাত্ত্বিক আহারের প্রয়োজন। আহারের সঙ্গে মন ও দেহের অতি নিকট সম্বন্ধ। ঋষিরা সাত্ত্বিক ভাবের যে সমস্ত লক্ষণ লিখিয়া গিয়াছেন, গিরিজাপ্রসন্ন সেই সব লক্ষণ বর্দ্ধিত করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করিলেন ও দেহ এবং মনের পুষ্টির জন্য সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করিয়া অন্য গুণবিশিষ্ট আহার পরিত্যাগ করিতে অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন। দুগ্ধপানে কোন কারণবশতঃ বাল্যকালেই গিরিজাপ্রসন্নের অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। ওঝা যেরূপ সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষত-মুখ হইতে বিষ তুলিবার জন্য ক্রুর সর্পকে নিযুক্ত করিয়া তাহা দ্বারা কার্য্য সাধিত করিয়া লয়, গিরিজাপ্রসন্নের অতি তেজস্বী মন, তদ্রূপই, ব্রহ্মচর্য্য-নাশক দুষ্প্রবৃত্তিকে তাহার অভীষ্ট সাধনের উত্তরসাধক করিয়া লইল। যে দুগ্ধপানে তিনি বীতশ্রদ্ধ, সেই গোদুগ্ধই এখন তাহার প্রধান ও রুচিকর আহার হইল। গিরিজাপ্রসন্ন ক্রমান্বয়ে

সত্ত্বগুণ বিরোধীয় আহার পরিত্যাগ করিলেন; অন্তঃশুদ্ধির জন্য বহিরঙ্গ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মসঙ্গত কোন আচারই তাহার উপেক্ষণীয় হইল না।

এই সময় তিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রথম প্রাতঃস্নান করিতে অভ্যাস করেন। তাঁহার বাটীর পূর্ব্ব ভাগের দীর্ঘ জলাশয়ে সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করিতেন। সে সময় উহা তাহার প্রদীপ্ত কান্তিতে প্রফুল্লতা-শোভিত হইত। কি প্রাবৃটের অবিরল বারিধারায়, কি শীতের তুষার-শীতল শৈত্যে, কি অন্য কোন প্রকার অনিবার্য্য প্রতিবন্ধকে তিনি এই দৈনিক নিয়মিত অনুষ্ঠান হইতে একদিনের তরেও বিরত হয়েন নাই। গিরিজাপ্রসন্নের বাটীতে কতকগুলি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। গিরিজাপ্রসন্ন সন্ধ্যোপাসনা সমাপনান্তে প্রতিদিন উপাসনার জন্য মন্দিরস্থিত দেবতা দর্শন করিতে গমন করিতেন, ও স্বহস্তে দেবালয়গুলি পরিস্কৃত করিয়া উহার শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেন।

দেবালয়ের সম্মুখে কয়েকটী পুষ্পবৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। দেবতাদর্শন ও উপাসনাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে, তিনি স্বয়ং পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিতেন। সংগৃহীত পুষ্পের কতক মন্দিরস্থিত দেবতাদের পূজার জন্য পূজকের নিকট অর্পণ করিয়া উল্লাসিত হইতেন, কতক স্বীয় পূজার জন্য গৃহে ফিরাইয়া আনিতেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার নির্জ্জন ভজনপ্রকোষ্ঠে বসিয়া উপাসনাদি করিতেন ও একাগ্রচিত্তে তাহার প্রকৃতি-সুলভ গম্ভীরস্বরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেন। সমস্ত গীতাখানি তাঁহার আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ ছিল, তাহা একবার করিয়া প্রতিদিন আবৃত্তি করা তাঁহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে একটী ছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

অভিন্ন।

মূঢ় আমি, তাই তোমা ছাড়ি', প্রাণপণে
বাসনা মিটাতে চাই, আপনার বলে
তুমি শুধু অন্তরালে দাঁড়ায়ে গোপনে,
হাসিছ কতনা হাসি মন কুতূহলে।
নিবেদিত ফুলরাশি কিসের হরষে—
ফল ঝরে, তবু তার না ফুরায় হাসি?
যত বিফলতা মোর, অমৃত পরশে
লভিছে জীবন নব, তোমা মাঝে আসি'
তামসী হৃদয়াকাশে ফুটে ক্ষুদ্র তারা,
করুণা-সিন্ধুতে তব ছায়া তার পড়ে;
অমনি সহস্র দেহে হ'য়ে আত্মহারা,
কাঁপিয়া উঠিছে তারা প্রত্যেক লহরে।
নিরাশার নীহারিকা ঝরে দু নয়নে
আঁধারি' ধরণী, বৃক্ষে ঝরে পত্র দল,
তুমি আসি' কোথা হতে বসন্ত পবনে
আবার ফুটাও ফুল সৌন্দর্য্যে বিমল।
সফল বাঞ্ছাও মোর উঠে যবে ফুটে,
তোমার অরুণ রশ্মি পড়ে তারি'পর,
মলিন এ আঁখিবারি ছিল হেথা লুটে।
মুক্তা সম সেও হল কি সুন্দরতর।
যাত্রাকালে তোমা হ'তে লয়েছি বিদায়,
পথ মাঝে তবু তুমি রহিয়াছ সাথী,
সঙ্গীতে সুরের মত, ফুলে গন্ধপ্রায়
আমাতে, আমারি বিশ্বে ব্যাপ্ত দিবা রাতি।
ভিন্ন ভিন্ন করি তায় চাই আনিবারে
ফুল হতে গন্ধ, আর সুর হতে গান,
কায়া হতে ছায়াটুকু, সে কি কেহ পারে?
নাহি পাই ফুলফল, নাহি পাই ঘ্রাণ।
যথা যাই, তথা তব অসীম করুণা
দিতেছ বিছায়ে নাথ! পথের মতন,
তিলেক ছাড়িতে তাহা আর পারিব না,
প্রাপ্ত হ'য়ে সেই বুকে লভিব পতন।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

ছায়া রূপে।

কে তুমি রূপসি নিত্য নিশাকালে,
শিয়রে আসিয়া হাসি দাও দরশন।
ও মুখ-পঙ্কজ দেখি কেন মোর
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে স্মৃতি পুরাতন?
বিরলেতে বসি সারানিশি দিন,
যার তরে করিয়াছি কতই সাধনা।
সেই কি সুন্দরি ছায়া রূপ ধরি,
আসিয়াছ পুরাইতে অভাগা-বাসনা?
কিন্তু কই তার সুচিকণ কেশ,
উজ্জ্বল সিন্দুর রাগ—সীমন্ত-শোভন।

মুক্তাদন্ত-পাতি বিম্ব ওষ্ঠাধর,
নয়নের-প্রেম জ্যোতি—অমিয় বচন ॥
কোথা তার সেই হাসিভরা মুখ,
প্রেম ভরা হৃদি খানি—প্রেম-প্রস্রবণ,
কেশরী লাঞ্ছিত কটি-সুশোভিত,
গজ বিনিন্দিত কই মন্থর গমন ?
নিরখি যাহায় উঠিত ফুটিয়া,
অন্তর-নিহিত যত মনের বাসনা।
দিত ভুলাইয়া যার সুধা বাণী
সংসারের নিদারুণ সহস্র যাতনা ;—
সেই কি গো তুমি ধরিয়াছ আজ
মানস-মোহিনী রূপ—অভিনব বেশ।
কোটি ইন্দু সম আনন সুন্দর
নবীন নীরদ সম—এলাইত কেশ ॥
কামধনু জিনি' নয়ন ভ্রুভঙ্গ,
অরুণ অধরে খেলে মৃদু মন্দ হাসি।
সুধার আধার বিম্ব ওষ্ঠাধর,
শোভিত দশন তাহে মুক্তা ফল রাশি ॥
কৌমুদী মিলিত গোলাপের রাগ,
অঙ্গের বরণ তব—অতি বিমোহন।
ললাট-শোভিত সুন্দর অলকা,
চরণ-সরোজ কিবা—মন্থর গমন ॥
দয়াবতী সতী করুণা প্রকাশি',
শুনিয়া কি ব্যথিতের কাতর রোদন,
এসেছ নামিয়া পুণ্যধাম হ'তে,
শান্তি-বারি হাতে ল'য়ে দিতে দরশন ?
কত নিশি দিন অশ্রু উপচারে,
করিয়াছি কায়মনে তব উপাসনা।
আঁখি জল সহ জীবন ফুরা'ল,
আইলে কি এত দিনে পুরা'তে বাসনা ?
হের তোমা তরে এ হৃদি-মন্দিরে,
রাখিয়াছি সযতনে আসন পাতিয়া।
সে প্রেম-আসন শূন্য হৃদি মাঝে,
তব অধিষ্ঠান বিনা রয়েছে পড়িয়া ॥
জীবন-সঙ্গিনী গৃহলক্ষ্মী মোর
এস, হৃদে শান্তিবারি কর বরিষণ।
ঘুচে যেন ব্যথা মিলি' তোমা সনে,
অন্তিমেতে পাই চির শান্তি-নিকেতন ॥

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

২৩। রামকৃষ্ণ। শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত। মূল্য।০। ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। উদ্দেশ্য ভাল, রচনাও ভাল। কিন্তু বিলাতী কাগজ।

২৪। হোমিও-গাথা। শ্রীকুলচন্দ্র দে প্রণীত, মূল্য ১৲। বিলাতী কাগজে বিলাতী কালীতে ছাপা। কবিতায় হোমিও-চিকিৎসা-প্রণালী সুলিখিত।

২৫। সঙ্গীত-সুধাসার। শ্রীজানকীনাথ গোস্বামী কথক কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ১৲। ধর্ম্মভাবে গ্রন্থখানি পূর্ণ। গানগুলি অতি সুন্দর। সকলের আদরের একান্ত যোগ্য।

২৬। সমাজ-সংস্কার। শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত, মূল্য ॥০। যে মানব-দেবতার লেখনী হইতে এই অমূল্য প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে প্রণিপাত করিতেছি।

বঙ্গদেশ যাঁহাদের পুণ্যাধিষ্ঠানে ধন্য হইয়াছে, এই গ্রন্থকার তাঁহাদের অন্যতর। এরূপ নিষ্কাম স্বদেশ-সেবক এদেশে অধিক নাই।

গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পড়িলাম। এরূপ গ্রন্থের সমালোচনা আমরা আর কি করিব ? যে গ্রন্থের পংক্তিতে পংক্তিতে স্বদেশানুরাগ, মানবপ্রীতি এবং পুণ্য প্রস্ফুত, সে গ্রন্থ মস্তকে এবং বক্ষে সযত্নে ধারণ করিতে হয়, তাহার সমালোচনা চলে না। আমরা একার্য্যে নিতান্ত অসমর্থ। গ্রন্থখানিকে মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

প্রতিভা বা প্রেম, জ্ঞান বা গবেষণা, কোন্ বিষয়ে গ্রন্থকার হীন, আমরা জানি না। এ গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রতিভা, প্রেম, জ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় রহিয়াছে। এরূপ গ্রন্থ পড়িবার অবসর পাইলাম, ইহাতেই কৃতার্থ হইয়া বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি।

এই গ্রন্থখানি গৃহে গৃহে প্রচারিত হউক, বিশ্বপতির চরণে একমাত্র প্রার্থনা।

অবগুণ্ঠিত ভারতবর্ষ।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।"
ভগবদ্গীতা।

পুষ্প-স্তবক সৌরভ এবং অমুদিত রূপ-প্রাখর্য্যে ক্ষণস্থায়িত্ব অতিক্রম করিয়া উহার চতুরস্রে-বেষ্টিত বক্ষে ধমনীস্পন্দন জাগ্রত করিতে পারে না, এজন্য প্রহরান্তে গুচ্ছ-কদম্বের মুদিত-শ্রী বিস্ময় উৎপাদন করে না।

যাহার সার্থকতা ক্ষণকালের জন্য, তাহার পরিণতি দুঃখজনক নহে।

কিন্তু আমরা অনেক কাজে হাত দিই, যাহা আমরা ঠিক দু'দিনের মনে করি না। এসব কাজে পাথেয় যদি সঙ্কীর্ণ হয়, হৃদয়ের অফুরন্ত শক্তির সঞ্চয় অপেক্ষা আকস্মিক অনুকূল বাত্যাবর্ত্ত যদি আমাদের নেশা জন্মায়, তবে সাময়িক কার্য্যের ত্রুটি হোক্ না হোক্, ভবিষ্যের কর্ম্ম-প্রাঙ্গণের বিপুল জটিলতার মাঝে পথ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইবে।

কিন্তু হৃদয়ের শক্তি আমাদের কোন্ খানে? শক্তি জিনিষটা এমন নহে যে, হুকুম দেওয়া মাত্র আমাদের সম্মুখে করযোড়ে উপস্থিত হইবে—জীবন-নাট্যে শক্তি পদার্থকে কখনও কঞ্চুকীর ন্যায় হাজির করা যায় না।

আমরা সহস্রাধিক বৎসর কাল যে নৈতিক চর্চ্চার অশ্রান্ত প্রবাহিত স্রোতের মাঝে পুষ্ট হইতেছি, হৃদয়ের শক্তি-বিচারে কি তাহার কোন স্থান নাই? কল টিপিলে সর্ব্বত্র স্থান কাল এবং বিষয় নির্ব্বিশেষে যদি শক্তির ফোয়ারা উৎসারিত হইত, তবে কর্ম্ম-জগতে এত অসামঞ্জস্য দেখা যাইত না। সন্তরণ-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির জলে ঝাঁপ দেওয়ার উৎসাহ, বা জলজীবীর স্থল-সন্তরণ-স্পৃহা পদে পদে কণ্টকিত হইত না।

তাহা ছাড়া কলেরও ত বিশিষ্টতা আছে যে কল টিপিলে উদ্যানে ফোয়ারা ছুটে, সে কলের তাড়নায় রেলগাড়ী ছুটিবে, এ বিশ্বাস কাহারও নাই।

কাজেই শক্তির রুদ্ধ-মুখ উৎসের সন্ধান প্রয়োজন; কোন্ গোপন-কক্ষের মৌন-অবগুণ্ঠনে তাহা অমর আলোকে দেবী-প্রতিমার ন্যায় দীপ্ত হইতেছে, হৃদয়-নীলিমার কোন্ ছায়াপথে ধ্রুবতারার ন্যায় তাহা অনিমেষ নেত্রে অনন্তকাল জাগ্রত রহিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহার বিচার প্রয়োজন। ইহার উপর আমাদের কর্ম্ম-প্রবাহের সফলতা এবং হৃদয়ের লুপ্ত শক্তির পরিধি নির্ণয় করা নির্ভর করিবে।

এই পথ সন্ধানে নগ্ন মশালের আলোক একমাত্র আশ্রয় নহে। রূঢ় শক্তির বপ্র-ক্রীড়া এই গুহা পথ নির্ণয় করিতে পারিবে না। আফ্রিকার মরুবাসী ঐন্দ্রজালিকের নিষ্ঠা ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আলাউদ্দিনের ক্রীড়া-লোলুপ বিভ্রম-মুগ্ধ অর্থহীন চেষ্টায় ধাবিত হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে হইবে। নচেৎ জীবন-উজ্জ্বল প্রদীপের সন্ধান পাইব কিরূপে?

নৌকা সঞ্চালনই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে জলের গভীরতা যে দিকে বেশী, সে দিকেই যাওয়া ভাল, নচেৎ স্বল্প জলের মাঝে মৃত্তিকা-পাশবদ্ধ নৌযানকে দাঁড় টানিয়া অগ্রসর করা চলে না। যাহারা গভীর সলিল-বক্ষে সঞ্চরণ করিতেছে, তাহারা কখনও ভাসমান

শৈবালপুঞ্জের ক্ষণিক প্রতিঘাতকে প্রবল দ্বীপের মারাত্মক সঙ্ঘর্ষ বলিয়া মনে করে না।

স্থান কাল বিষয় নির্ব্বিশেষে যখন লৌকিক শক্তির তারতম্য ঘটে, তখন কোন্ স্থানে, কোন্ কালে বা কি কি বিষয়-পথে তাহা তীব্রতর হওয়া সম্ভব, তাহার বিচার প্রয়োজন।

কোন স্থান-বিন্দু-পথে চেষ্টা ক্ষণরুদ্ধ হইলে তৎপ্রতি কিছুমাত্র অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া কিম্বা ব্যাপারটীর আপাততঃ প্রতীয়মান অবস্থাকে বিন্দুমাত্র মূল্যবান মনে করা মূঢ়তা মাত্র। যাহাদের দৃষ্টি অতীতের শোণিত-সোপান সঞ্চরণ করিয়া ভবিষ্যের প্রাণ-ধারার সহিত যুক্ত হইয়াছে, সাময়িক অস্থায়ী ঘটনা-বিপর্য্যয় তাহাদের নিকট প্রত্যুষ-মেঘাড়ম্বরের অলীক পদার্থ রূপে প্রতীয়মান হয়। এজন্য চারিদিকে আশার আলোক কখনও নিবে না, আনন্দের রাগিণী কখনও ডুবে না। সফলতার বৈজয়ন্তী কখনও ভূমি-লুণ্ঠিত হয় না। সাধনা-পথের ক্ষণিক পরাজয় নিবিড় পরিচয়ে মরীচিকার ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং প্রত্যেক ছায়াময়ী বিফলতা সমুদ্রের সৈকতভূমে সহস্রশীর্ষা ঊর্ম্মি-ভঙ্গের ন্যায় প্রতিপদে অনন্ত উৎসাহে সফলতাকে আলিঙ্গন করিতে ছোটে।

এইজন্য মুহ্যমান ব্যক্তি-হৃদয়ের নিবিষ্ট চিন্তা প্রয়োজন; নচেৎ হাহাকার কোলাহল একের নহে, বহুর অশান্তির কারণ হইবে।

ব্যক্তিগত চিত্তেও দেখা যায়, এমন দুই একটী জায়গা আছে, যেখানে আঘাত করিলে লোক বিশেষ একান্ত বিচলিত হয়, জীবনকে তাম্রপাত্রন্যস্ত চন্দন-লিপ্ত পুষ্পের ন্যায় ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করে না। দুর্ব্বল ও সহস্র দ্বিরদের শক্তি লাভ করে। দৈনন্দিন জীবনে এইরূপ কত দৃষ্টান্ত ঘটিতেছে।

ভারতীয় সভ্যতার মূল প্রকৃতি হইতে আমরা এখনও নিজকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি নাই। তাহার সহিত আমাদের কর্ম্ম-পুঞ্জের সামঞ্জস্য স্থাপন যিনি আবশ্যক মনে করেন না, তিনি এক মুহূর্ত্তে ফলাফল প্রভৃতিকে যুগপৎ আকাশে উত্তোলন কিম্বা পাতালে নিক্ষেপণ, এই উভয় কার্য্যেই কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন।

যিনি নিবিড়ভাবে ভারতের অন্তর্নিহিত সহস্র মহর্ষির আশীর্ব্বাদপূত গূঢ় শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে কোনও কার্য্যই অসাধ্য কিম্বা দুঃসাধ্য মনে করেন না। তাহাদের চিন্তা প্রবাহে ঋষিজন-বন্দিত ক্ষাত্রধর্ম্ম-সেবিত ভারতবর্ষের শক্তির সফল ধর্ম্মিত্বে আস্থা প্রতি মুহূর্ত্তে জোয়ার ভাটা খেলে না! তাহারা জানে, ভারতবর্ষ এক মহাসাগর-সঙ্গমে সহস্র বৎসর হইতে ছুটিয়াছে, উহার এই শক্তি কখনও কোনও ঐরাবত-রূপী বিপুল-বিঘ্ন দ্বারা রুদ্ধ হইবে না, বরং লক্ষ ধারার দ্বারা পুষ্ট ও উপচিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে বিধি-নির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই শক্তির প্রমাণ কি? এই অশ্রান্তবাহী শক্তি কোন্ পথে ছুটিয়াছে? দ্বিতীয়তঃ এই শক্তির দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান কার্য্যপরম্পরার কি সহায়তা হইতে পারে?

এই প্রশ্নের বিচার কিছু অভিনিবেশ-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ এই শ্রেণীর সূক্ষ্ম অথচ অতিরুদ্র-সত্য আলোচনা অবিশ্বাসীদের পক্ষে যেমন বিপজ্জনক, বিশ্বাসীদের পক্ষেও ইহাতে ইতস্ততঃ করিবার নানা কারণ আছে।

কোন লোক-সঙ্ঘের আন্তরিক মর্ম্ম-কথা জ্যামিতি দ্বারা মাপ করা চলে না, কিম্বা কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে ওজন নেওয়াও চলে না। লৌকিক ঘটনাপুঞ্জ দেখিয়া যেমন বিশ্বাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি শক্তি কল্পিত হইয়াছে, তেমনি বহু পরিমাণে দেশকাল-নিমিত্তের অবস্থা বিচার পূর্ব্বক ভারতের অপরাজেয়, অনম্য, অমর এবং অজর শক্তির সন্ধান করিতে হইবে।

এই শক্তির সহিত সাময়িক রাষ্ট্রধর্ম্মগত চেষ্টা-নিবহের সম্পর্ক কোথায়, এই প্রশ্ন যদিও আধুনিক কোলাহলে অপেক্ষাকৃত অধিক স্থান অধিকার করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে, তবু মনে রাখিতে হইবে, সাময়িক কোলাহলে যাহা অনাবশ্যক রূপে বৃহৎ মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা পারমার্থত বৃহৎ নহে। আমার সম্মুখস্থ ইষ্টক-স্তূপকে যদি সুদূর আকাশ প্রান্তে বিগলিত শৈলছায়া অপেক্ষা বৃহৎ দেখায়, ঘন-পরিচয়ে উপলব্ধি হইবে, এই স্তূপ কখনও মহাকায় শৈলের চরণে পুঞ্জীভূত উপলখণ্ড-সমূহের একতমের সহিতও তুলনীয় নহে।

ভারতের এই অপরিমেয় শক্তির বিচার আনন্দজনক, সন্দেহ নাই। ভারতের সাহিত্য যোগীর করস্পর্শে, ভক্তের অশ্রুজলে, সেবকের স্বেদে, ক্ষত্রিয়ের রুধিরে এই কাহিনী অঙ্কিত করিয়াছে। বিশ্বাসী ভক্ত-পূজকের ন্যায় স্রক-চন্দন-নত-শীরে এই সাহিত্যমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হও, দেখিবে, অগুরু ধূম্রের অন্তরালে তাহা এখনও দেদীপ্যমান; কাল ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, ইহা প্রলয়-ঙ্কর ঝঞ্ঝা ঝড় অতিক্রম করিয়া এখনও জ্যোতির্ময়তা হারায় নাই, ভারতের এই মর্ম্ম-শক্তির সহিত সাময়িক কার্য্যপরম্পরার সম্পর্ক বিচারে আমরা যেন কিছুতেই জগতে ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক প্রার্থিত চরম লক্ষ্যকে না ভুলি, কারণ ইহার প্রতিষ্ঠা জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিবে। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের উত্থান জগতরাজ্যে ঐ ভাববিপ্লবের পূর্ব্ব-সূচনা, সন্দেহ নাই।

এই প্রশ্নের বিচার কিছু গুরুতর, সন্দেহ নাই, তবু ইহার উল্লেখ না থাকিলে জগত রাজ্যে আমাদের কর্ম্মপরম্পরার সার্থকতা কোথাও স্ফুট হইবে না।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাহিরের আকার অভ্যন্তরের শক্তি-নির্ণয়ে সহায়তা করে না, কাজেই ভারতের মর্ম্মের মাঝে কোন্ কোন্ প্রণালীতে কি ভাবে কোন্ দ্রব্য সৃষ্ট হইতেছে, তাহা তত্ত্বান্বেষী ভিন্ন অন্য কাহারও উপলব্ধিগম্য নহে। কথিত আছে, ফরাসী-জর্ম্মণ-যুদ্ধে জর্ম্মাণ সেনাপতি শত শত ক্রোশ দূরে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া সেই বৃহৎ সমর-বাহিনী পরিচালিত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায় নাই; তাঁহার স্কন্ধে অস্ত্রশস্ত্র লম্বিত হয় নাই; তাঁহার কর্ণে সমর-বাদ্য-ঝঙ্কার পৌঁছে নাই। তাই বলিয়া একথা অস্বীকার করিলে কি করিয়া চলিবে, ক্ষুদ্র তাঁবুর ভিতর উপবিষ্ট, সংবাদ-স্তূপের মধ্যে মগ্ন, সেই মানবটীর মনোময়ী-শক্তির তাড়নায় ঐ বিপুল অক্ষৌহিণীর পুলক-সঞ্চার হইয়াছিল।

ভারতের বহিঃপ্রস্ফুট যে কোন কার্য্যের আলোচনায় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহা অন্যান্য কার্য্য-পরম্পরার সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত এবং সমগ্র ভাব-কর্ম্ম-নিচয় এক মৌলিক ভাব হইতে প্রস্রবণের ন্যায় নির্গত হইতেছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতি একই মহান্ আদর্শের অধীন এবং শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় একটী অঙ্গ-

টিকে অস্বীকার করিয়া চলিতে পারে না। জীবন, ভারতবর্ষে, স্বতঃই বিচ্ছিন্ন হইয়া চলে না।

অবিশ্বাসীদের একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, কোনও পদার্থ-বিচারে তাহাকে যথাস্থানে রাখা চাই, নচেৎ তৎসম্বন্ধে জ্ঞান অভ্রান্ত হইবে না। ইউরোপের বিজ্ঞান-স্ফীত ক্ষাত্রচাতুর্য্য-ত্রস্ত এশিয়াবাসীর পক্ষে জগতের যাবতীয় তত্ত্বই এই ব্রাহ্মণ্য-বর্জ্জিত ক্ষাত্র ঐশ্বর্য্যের কপাট-মরীচিকার আলোকে বিচার করিতে হইবে, এমন চাপল্য বোধ হয় শিশুর পক্ষেও সম্ভব নহে; ইহাতে পদে পদে বিপদ আছে।

যে ব্যক্তি কিম্বা জাতির পক্ষে যাহা আদর্শ, তাহার অনুরূপেই তাহার কর্ম্মপ্রণালী গঠিত হয়। তাহাকে বিচার করিতে হইলে তাহার দিক্ হইতেই তাহাকে দেখিতে হয়। ভারতবর্ষের জনৈক লোকমান্য স্বামী এ সম্বন্ধে একটী ঘটনা উল্লেখ করেন, তাহা এই :—

একদিন তিনি আমেরিকার কোন নগরের মেলার কতকগুলি পণ্যবিপণিতে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ কেহ পশ্চাত হইতে তাহার সুদীর্ঘ উষ্ণীষাগ্র সজোরে আকর্ষণ করে। স্বামী ফিরিয়া তাহাকে এই অভদ্রোচিত ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে ক্ষমা প্রার্থনাসূচক স্বরে বলিয়া উঠে "আপনি ওভাবে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন কেন?

এই সম্বন্ধে স্বামী বলেন :—"The sympathies of these men were limited within the narrow range of their own language and their own fashions of dress. That very man who asked me why I did not dress as he did and wanted to illtreat me because of my very dress, is in all probability a very good man; he may be a good father and a good citizen; but the kindness of his disposition died out when he saw a man of different dress. The one point we ought to remember is that we should always try to see others through their own eyes. I never wish to judge the customs of one race with a different standard."

কাজেই আশা করা যায়,ভারতবর্ষের বিচারে মোটোর-যানের দ্রুতগতি বা তারহীন টেলিগ্রাফকে নব্যবিচারক, গায়ত্রী মন্ত্র রূপে ব্যবহার করিবেন না।

অপর পক্ষে একটী দৃষ্টান্ত দিই।

ভারতবর্ষীয় অনেক পর্য্যটককে ইউরোপের লণ্ডন ও প্যারীনগরে আসিয়া মুগ্ধ হইতে শোনা যায়। তাঁহারা উহাদের অভ্রভেদী অট্টালিকা, পারিপাট্য, বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা, সাধারণের কর্দ্দম-বিহীন পোষাক, দ্রুতগমন, কর্ম্ম ব্যস্ততা, বিপণি-সমূহের বিচিত্র শোভা, উদ্যানের বায়ুসঞ্চারী ফোয়ারা,কৃত্রিম বৃক্ষলতা প্রভৃতির বিতান, বৈদ্যুতিক আলোকের ইন্দ্রজাল প্রভৃতি দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং ভারতের নব্য প্রণালীতে মুদ্রিত পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রবন্ধাদি লেখেন।

কল্পনা বড় সামান্য জিনিষ নহে,বিশেষতঃ যে কল্পনার সহজ সত্যের আবিষ্কার সম্ভব, তাহা না করিয়াও পারি না। বর্ত্তমান লণ্ডন কিম্বা প্যারীনগরী যদি ভারতের শঙ্কর-নানকের দৃষ্টিপথ গোচর করা যাইত,তবে তাঁহারা ঘূর্ণিত-মূর্দ্ধা হইতেন, মনে করি না। তাঁহারা কি লৌকিক জীবনপথে ঐ হর্ম্ম্য-সমূহকে তৃণপুচ্ছ অপেক্ষা বেশী সমাদর করিতেন? ভারতবর্ষ এসব ছায়াবাজী দ্বারা কখনও বিভ্রান্ত হইতে পারে না।

টেমস্ বা সীন্ তীরশায়ী নর-নারীর মনোজগতের উপর অনুবীক্ষণ নিক্ষেপ করিলে

কি বিপরীত দৃশ্য দেখা যাইবে? একদিকে অভ্রস্পর্শী প্রাসাদচূড়ার কীরিট-পর্য্যায়, অন্য দিকে ব্যসন-মূর্চ্ছিত মনোবৃত্তির অনুকূলগতি, তামসিকতার দীপালী! একদিকে কুবের-ভোগ্য কাঞ্চন-স্তূপ, অন্যদিকে দারিদ্র্যের আর্ত্তনাদ, প্রবৃত্তির শৃঙ্খল-বিহীন ভোগ-বিলাস! কস্তুরী-গন্ধ-বিভ্রান্ত মৃগশিশুর ন্যায় ইতস্ততঃ-সঞ্চারী মানবপুঞ্জ বুটজুতার সংঘর্ষ, পক্ষীপুচ্ছ রচিত টুপীর বায়বগতি, সান্ধ্য মেঘের বর্ণবৈচিত্র্যে ভরপুর সিল্কের প্রাচুর্য্য প্রভৃতির মাঝে আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে! সয়তান যেন কুহকজাল নিক্ষেপ করিয়া এই ক্রীড়ামন্দিরে বিহার করিতেছে।

দেখা যাইবে, একদিকে বহিরের পরিচ্ছন্নতার বাড়াবাড়ি, কর্দ্দম ও ধূলি-বিহীন চত্বর, নির্ম্মল শ্বেত-মর্ম্মর-গৃহ-সোপান, চর্ব্বি-সংঘর্ষ-উজ্জ্বল পিত্তলের হস্তদণ্ড, মক্ষিকাতঙ্ক স্ফটিকদ্বার, নিষ্কলঙ্ক অটোমেটিক স্প্রীং, প্যারি গালিচার সুকুমার-স্পর্শ, কুশ্যান-কেদারার স্প্রীং মঞ্চের নৃত্য, ভৃত্য বালিকার মৃদু হাস্য ও সম্ভাষণ, ইতর জনের লোভবেষ্টিত হস্তকম্পন প্রভৃতির মাদকতা, অন্যদিকে গৃহে গৃহে ক্ষুদ্রগম্ভীর তুলিকায় অঙ্কিত কূটবুদ্ধিজালের প্রাকার বেষ্টন, হত্যাযন্ত্রের বাহুল্য, অর্থ ও শ্রমের হৃদয়হীন সংঘর্ষ, ব্যক্তিগত অদীনতা ও অবিনয় সংবাদ পত্রে প্রতিফলিত প্রতিদৈবসিক ক্ষুদ্রতার চরম দৃশ্য, এবং মত্তবিপণির হর্ষ কোলাহল প্রভৃতি। হিংসা দ্বেষের লক্ষমুখী শ্রান্তিহীন সংগ্রাম, দুর্ব্বহ পীড়া ক্লান্তি এবং গ্লানির আতিশয্য, অহরহ দাহকর রাক্ষসী ক্ষুধার প্রাদুর্ভাব, উহাদের হৃদয়রক্ত-রঞ্জিত। বহিরের পরিচ্ছন্নতা অনেকের চোখে পড়িবেই না। বিপণির বিলাস দ্রব্য তাহার নিকট অদৃশ্য হইবে; সে দেখিবে, একটা খ্রীষ্টানী কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে—একটা ছোট খাট পেণ্ডীমোনিয়াম।"

ভারতবর্ষকে হৃদয়পদ্মে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে অধিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে ইউরোপ একমাত্র জগতের সেব্য পদার্থরূপে প্রতীয়মান হইবে না।

ইউরোপকে সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে এবং ঠিক বর্ত্তমান সময়ে আবশ্যকও নহে। দৃষ্টির বৈপরীত্য সম্ভব, একথার দৃষ্টান্ত দিতেছি মাত্র।

কাজেই দৃষ্টির প্রকৃতি-ভেদ রহিয়াছে। বহির্দৃষ্টি পর্য্যাপ্ত নহে, ইহাতে যথার্থ জ্ঞান হয় না; আমরা শরীরস্থ রক্তসঞ্চালন দেখি না বলিয়া আমাদের শিরায় যে রুধিরের কাজ করিতেছে না, এমন নহে।

ভারতবর্ষকে বল্মীকস্তূপ-বেষ্টিত মানবের ন্যায় অকর্ম্মণ্য মনে করা ঠিক নহে। ঐ তাপসের হৃদয়ে যে হুতাশন জ্বলিতেছে, তাহা ভবিষ্যতে কোন্ ভাবপ্রলয় উপস্থিত করে, তাহা কে জানে?

কোন্ দিক হইতে এই বল্মীকাবৃত মৌনী মুনিকে বিচার করিবে? ক্ষাত্র ধর্ম্মের অভাব? সে তরবারীর দ্বারা বিদ্রূপকারীর দেহ ছিন্ন করিতেছে না? ষ্টীম্ এঞ্জিনের বয়লার সম্পর্কীয় নিগূঢ় তথ্য জানিবার সাধনা তাহার নাই? একথা তুমি কি বিশ্বাস করিবে যে, ক্ষত্রিয়ের বাহুশক্তি অপেক্ষা তাহার বাহুশক্তি বেশী, শূদ্রের সেবা অপেক্ষা তাহারা সেবা-ধর্ম্ম কম নহে? বৈশ্যের বিষয়বুদ্ধি অপেক্ষা তাহার বুদ্ধি আবিল নহে।

আমাদের বানপ্রস্থাশ্রমীর দৈহিক শক্তি কোথায়? মনুসংহিতাকার বলিতেছেন:—

"পুষ্প মূলফলৈর্বাপি কেবলৈর্ব্বর্ত্তয়েৎ সদা;
কালপক্কৈঃ স্বয়ং শীর্ণৈ র্বৈখানসমতেস্থিতঃ॥

ভূমৌ বিপরিবর্ত্তেত তৈষ্টেদ্বা প্রপদৈর্দ্দিনম্।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ সবনেসূপযন্নপঃ॥
গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তু স্যাদ্বর্ষাস্বভ্রাব কাশিকঃ।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে ক্রমশো বর্দ্ধযংস্তপঃ॥"

মনু ৬—২১ হইতে ২৩

"অথবা কেবল পুষ্প, মূল, ফল দ্বারা সর্ব্বদা জীবিকা করিবে বা সহকারে পরিপক্ক ফল, যাহা বৃক্ষ হইতে আপনিই পতিত হয়, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং বানপ্রস্থের অন্য জীবিকা, যাহা শাস্ত্রে আছে, তাহাও ভোজন করিবে।"

"কেবল ভূমিতে লুটিয়া যাতায়াত করিবে অর্থাৎ নিয়মিত স্থানে ও আসনে একবার উত্থিত হইবে, একবার পর্য্যটন করিবে এবং পদাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া দিন যাপন করিবে এবং কিছুকাল উত্থিত ও কিঞ্চিৎকাল উপবিষ্ট থাকিবে, মধ্যে পর্য্যটন করিবে না। সায়ং, প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সময়ে স্নান করিবে।"

"গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নি, উর্দ্ধে সূর্য্য, এই পঞ্চ তাপে আত্মাকেও তাপিত করিবে, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থলে গাত্রাবরণ ব্যতিরেকে বৃষ্টি ধারায় দণ্ডায়মান হইবে এবং হেমন্তকালে আর্দ্রবসন পরিধান করিবে, এইরূপে ক্রমে ক্রমে তপস্যা বৃদ্ধি করিবে।"

এইরূপ শারীর চর্চ্চা কোন ক্ষত্রিয়ের বিভীষিকা জন্মাইবে না? তারপর মানসিক চর্চ্চা? সাংখ্যকার উল্লেখ করেন।—

"যমনিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা-ধ্যান সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গাণি।—২।২৯সূত্র।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, এই পঞ্চ বহিরঙ্গ, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অন্তরঙ্গ ভারতে তত্ত্বান্বেষীর মানসিক চর্চ্চা।

ভারতের মানসচর্চ্চামূলক এই অষ্টাঙ্গ-যোগ ধর্ম্মগ্রন্থ মাত্রেই আছে, ইহা ভারতবর্ষের চিত্ত-চর্চ্চার একমাত্র উপায়। সকলেই এই সমস্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞ, এমন বলি না, তবে তত্ত্বান্বেষী কাহারও ভারতবর্ষে এই প্রণালী অবিদিত নহে। কাজেই বল্মীকে উপ-বিষ্ট ব্যক্তি নিতান্ত উপহাসের বিষয়, এমন মনে হয় না।

বাহিরের চাকচিক্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মৌলিক ভাব-সম্প্রদায় বিস্মৃত হইলে চলিবে না। স্বামী বিবেকানন্দ এমেরিকার হারবার্ড ইউনিভারসিটীতে এক আলাপে কোন প্রশ্ন-কারীকে বলিয়াছিলেন:—

"When I came to this country I found that the labourers were informed of the present condition of politics but when I asked them what is religion and what are the doctrines of this and that particular sect, they said: "We do not know, we go to church." In India If I go to a peasant and ask him who governs you he says I do not know, I pay my taxes. But if I ask him what is religion he gives you a clear answer. He may not read or write but he has learnt all these from the monks and is very fond of discussing."

বিলাতের লোক রাজা, মন্ত্রী, সভা, ইলেকসন লইয়া উন্মত্ত। আমাদের প্রজা-সাধারণ এই সমস্ত চিনে না, জানিতেও চাহে না। তাহাদের পক্ষে শাক্ত-বৈষ্ণবের অধ্যাত্ম মতামত, রামসীতা রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির জীবন-লীলা, লক্ষ্মী সরস্বতীর পৌরাণিক চরিত্র প্রভৃতি, লাট সাহেবের গোলক-নৃত্যের ঘূর্ণি-বাত্যা, লেডির মুষ্টিযোগ, ইলেক্‌সনের কাড়াকাড়ি, উপাধির শিলাবৃষ্টি, বজেটের ভোজবাজী অপেক্ষা প্রত্যক্ষতর এবং সত্যতর, কারণ এই সমস্তের সহিত তাহাদের হৃৎ-পিণ্ডের রক্তসঞ্চালন নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই সমস্ত চরিত্র-মূলক ভাবপুঞ্জ প্রতিমুহূর্ত্তে তাহা-

দের দৈনন্দিন জীবনকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে।

ত্যাগ তাহাদের পক্ষে বেশী কিছু নহে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ত্যাগ কোন জাতি জগতে দেখাইয়াছে কিনা; জানি না। ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণতরঙ্গে ওতপ্রোত নৃপশিশু ভারতবর্ষেই কেবল কমণ্ডলু-হস্তে কোপীনকণ্ঠে পথের ধূলি-লিপ্ত-ভিখারী হইয়াছে, কিন্তু এই খানে ত্যাগের লক্ষ্য ভিন্ন রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার জন্য পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে যে সমস্ত আত্মবলি সম্ভব হইয়াছে, তাহা কখনও শুধু অধ্যাত্ম লক্ষ্য-বিরহিত পাশব ক্ষাত্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে।

লোকচিত্তের মর্ম্ম কথার উপর তাহার কর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রকৃতি নির্ভর করে—কাজেই আমাদের দেশের হৃন্মন্দিরের আরাধ্য দেবতা কে?—এই বিচার করিতেই হইবে। এ দেবতার প্রাত্যহিক অর্চনা সনাতন কাল হইতে অখণ্ডভাবে ধ্বনিত হইতেছে। দেহ মন অকুণ্ঠিতভাবে ভারতবর্ষ এই চরম-লক্ষ্যের উদ্দেশে নিয়োগ করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাময়িক উচ্ছ্বাস-জাত ক্ষণস্থায়ী শক্তি কাহারও লোভনীয় নহে,কিন্তু যে শক্তির শিকড় ও তন্তুজাল সহস্রবর্ষের জীবচিত্তের, ভক্তসাধকের, কর্ম্মীত্যাগীর হৃদয়-রসে পুষ্ট হইয়া আজ অমর দেহ লাভ করিয়াছে,তাহার মূলচ্ছেদ করিতে কোন্ প্রগল্‌ভ নৃপতি সাহসী হইবে? কাহার কম্পিত হস্ত ধরিত্রীর লক্ষ ধমনীধৃত হিমাদ্রিকে স্থানচ্যুত করিতে চাপল্য প্রকাশ করিবে? এই জন্য এই দুর্লভ শক্তির অমোঘ সহায়তা লাভ করিতে হইবে। সমগ্র ভারতবর্ষকে দক্ষিণ সমুদ্রের বারিপ্রবাহে জল-প্লাবিত করিয়া পৃথিবী হইতে মুছিয়া না দিলে এই শক্তির বিনাশ সম্ভব হইবে না। হাইড্রোলিক প্রেস, বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ কিম্বা ষ্টীম-ধূম্রের দ্বারা বর্ত্তমান নৃপতিবৃন্দ সেই চেষ্টা করিতে পারেন, তৎপূর্ব্বে দুরাশা করা ভাল নহে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী নিবিড় প্রশ্ন উঠে।

গণ্ডূষ-জল-সঞ্চারী ঐতিহাসিকদের এবং আধুনিক সময়-বুদ্বুদের কণায় ভাসমান রাজনৈতিকদের মুখে একটী কথা প্রায়ই উচ্চারিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর অপরাহ্নে তরল ইংরাজী বক্তৃতার দ্বারা ভাব প্রকাশ সুলভ হইলে ইহা যে কত শতবার উচ্চারিত হইয়াছে, জানি না। সে কথাটা বলিতে গেলে মুম্বই প্রদেশের তথাকথিত দেশপ্রেমে ভরপুর এক ব্যক্তির উক্তি মনে পড়ে—"The mass of India are sunk in the depth of ignorance and superstition" ইত্যাদি অর্থাৎ তাহারা অকর্ম্মণ্য, বিলাতের পলিটিক্সের হিসাব রাখে না, অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করে, রেলগাড়ীতে চড়ে নাই, দুর্ভিক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দেশের কোন কাজ করে না, ভালমন্দ বোঝে না, নীতি-দুর্নীতি পার্থক্য করে না, কুটীরে বাস করে, গণ্ডমূর্খ, হয়ত পিতাকে পিতা,মাতাকে মাতা, কিম্বা ভ্রাতাকে ভ্রাতা বলিয়া জানে না। (Ignorant এর অর্থ ইহা ছাড়া আর কি?) দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্মজ্ঞানহীন, আন্দামানদ্বীপ-সুলভ বন্যজাতির ন্যায় স্বভাববান্ কিম্বা গরিলা হইতে কিঞ্চিৎ উন্নততর অবস্থাবান।

ইহার অধিকাংশ উত্তর দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু যখন তাহাদের অকর্ম্মণ্য দেশের প্রতি, দেশের ধর্ম্মের প্রতি বক্তা অপেক্ষা অপ্রেমিক বলিয়া কৃপা প্রকাশ করা হয়, তখন নিতান্ত ধীর ব্যক্তিকেও বিচলিত

হইতে হয়। নিজকে পণ্ডিত এবং সংস্কার-হীন ঘোষণা করিয়া বিদেশী রাজপুরুষগণ অথবা তাহাদের ভারতবাসী certified copy-গণের স্তোক বাক্য লাভ করিবার কি অন্য উপায় নাই?

অকর্ম্মণ্য জগতে কোন জীবই জীব নহে। জীবের ধর্ম্মই এই যে, কিছু কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রতিমুহূর্ত্তে মধুকরের ন্যায় সে কর্ম্মচক্র রচনা করিতেছে। কত দর্শনকার এই কার্য্যক্রম লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ঊর্ণনাভের তন্তুগ্রথিত রম্য বৃত্তপুঞ্জের ন্যায়, মানবের প্রাত্যহিক চিত্ত মুহুর্ম্মুহুঃ কত জীবনকথা বুনিয়া তুলিতেছে, ইয়ত্তা নাই। তবে কি ভারতবর্ষেই এই অলঙ্ঘ্য নিয়মের ব্যতিক্রম রহিয়াছে? এখানে ইংরাজের বিদ্যুত-ডিনামো-শশীর আলোক-পুলকিত দরবার-পুলিনে ইউরোপ হইতে অপহৃত প্যাট্রিয়টিজম রূপী সুরবাঁধান ক্লারিওনেটে নব্য-কৃষ্ণেরা ফুংকার দিলে "মাস" (mass) নাচিয়া উঠে না, এই কি অপরাধ? ঐ রবে প্রাচীন ভারতের নবাইংরাজী নাম প্রাপ্ত নদ নদী উজান বহিয়া কূল ছাপিয়া ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্টের খরচ বাঁচায় না, এই কি দোষ?

আজ এই পুত্তলিকাগণের নিকট সমগ্র ভারতবর্ষ সুর বিহীন হইয়া গিয়াছে। কোন সুর নাই, কোন গুণ নাই, কোন সৌন্দর্য্য নাই, কিম্বা যাহা আছে, তাহা সামান্যমাত্র। অতীতের দুর্ব্বোধ্য রহস্যময় সঙ্গীত-যন্ত্রের ন্যায় জড়ীভূত হেমতারগুলি তাহাদের বাক্-স্কিনের গ্লোভ-মসৃণ অঙ্গুলাগ্রে বাজিয়া উঠে না, বিলাতী বড় বড় অর্গেন-ওয়ালারা যখন ইহাকে শুষ্ক অলাবু-যুগের ক্রীড়নক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছে, তখন তাহাদের শিষ্য-পিপীলিকাগুলি উহাকে আহার্য্য মনে করিয়া উৎসাহে অগ্রসর হইবে না কেন?

কিন্তু জিনিষটা দুর্ব্বোধ্য হইলেই তাহা অর্থহীন হইবে এখন কোন কারণ নাই। পীরামিডের উপরে লিখিত অক্ষরগুলি বোঝা যায় না বলিয়া তাহাকে শকুন্তের চঞ্চু-অঙ্কিত রেখাপুঞ্জ কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই।

কাজেই মানবের কর্ম্ম-চক্র-রচনা এখানে স্থগিত নহে—তবে এই কর্ম্মচক্রটী কোন্ প্রণালীর এবং কোন্ লক্ষণ ও ধর্ম্মযুক্ত, তৎ-সম্বন্ধে অজ্ঞতা ইহার অভাব অনুভবের অন্যতম কারণ হইতে পারে। কারণ যাহা বুঝি না, তাহা বিজ্ঞ আমরা কিছু নহে বলিয়া পুলকিত হই।

কথামালায় আছে, কতকগুলি অন্ধ একবার এক হস্তীদেহ স্পর্শ করিয়া হস্তীকে তাহার নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছিল, কারণ যাহাদের জ্ঞান যতটুকু সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহারা যতটুকু মাত্র উপলব্ধি করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল।

এই ক্ষুদ্রতার পঙ্কিল দৃষ্টিপাতে ভারতের বিরাট ও ব্যাপক ধর্ম্মানুগত সমাজবন্ধনের অচ্যুত শৃঙ্খলে বদ্ধ কর্ম্ম-পরম্পরা চোখে পড়িবে না। যে মর্ম্ম-কেন্দ্রের ধ্রুব চৌম্বক আকর্ষণে ভারতের পরিধির ক্ষুদ্রতম রেণু পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইতেছে; প্রতি মুহূর্ত্তে যাহার আণব-ধমনীতে ভারতের এই অবিচ্ছিন্ন জীবনীশক্তি কাজ করিতেছে, তাহা চোখে না পড়া আশ্চর্য্য কিম্বা অসম্ভব নহে। কারণ যে তুলাদণ্ড লইয়া ওজন লওয়ার উৎসাহ দেখা যায়, তাহা মেড্ ইন জর্ম্মণী বা "মেড ইন ইংলণ্ড!" এই দ্বীপসুলভ কাটাকাটি মারামারি জাত দোদুল্যমান সাময়িক চর্চ্চার কর্দ্দম পঙ্কলে ডুব দিয়া নিজকে ব্রহ্মাণ্ডের বহুমুখী

অনন্তকাল প্রবাহিত জাগ্রত দৈবী জীবন-ধারার রসাস্বাদনে সমর্থ মনে করা অদ্ভুত, সন্দেহ নাই। কিন্তু জগতের বিরাট ইতিহাস, ব্রিটিশ চ্যানেলের উত্তরস্থ এংলো-স্যাক্সন জাতির ক্ষীণ কলনাদ, করতালি বা সুখ দুঃখের উপর নির্ভর করে না, একথা না বলিয়া উপায় নাই।

তবে ভারতবর্ষ কোন্ জিনিষটাকে একান্ত কাম্য পরমার্থ বলিয়া মনে করিয়াছে? কোন্ দেবতা তাঁহার হৃদয়-পদ্মে সহস্রাধিক বর্ষ অধিষ্ঠিত রহিয়াছে?

ভারতের সাহিত্য তাহা মুক্ত-বক্ষে দেখাইবে। ভারতের যাবতীয় ললিতকলা, শিল্প ভাস্কর্য্য প্রভৃতি তাহা প্রমাণিত করিবে। ভারতের সমাজ, পরিবার এবং ব্যক্তি মাত্রই তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে স্বপ্রকাশ করিতেছে।

ভারতে বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ কতটুকু স্থান অধিকার করিয়াছে? বিজেতারূপে মোগল বংশ কতটুকু স্থান অধিকার করিয়াছিল? মানচিত্র হরিৎ বা লোহিতবর্ণ পূর্ণ করিলে অধিকার করা হয় না, অধিকার করা বড় শক্ত কার্য্য। বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে অধিকার করা চিরকাল অসম্ভব ছিল, এবং অসম্ভব থাকিবে। তাহার নানা কারণ আছে।

সমুদ্রের উপর দু'খানি নৌকা ভাসাইলে বা বেলুনে চড়িয়া হিমালয়ের স্থান বিশেষে উপনীত হইলে তাহাকে যেমন সাগর বা পর্ব্বত অধিকার করা বলা যাইতে পারে না, তেমনি, ভারতের বহির্মৃত্তিকার উপর মোগল কয়েকটা তাঁবু ফেলিয়াছিল বলিয়া ভারত অধিকৃত হইয়াছে, বলা যায় না। ভারতবর্ষ মোগলের নিকট চিরকাল রহস্যময় ছিল। উত্তর মেরুর ন্যায় অনধিগম্য, দুর্ব্বোধ্য, দুরূহ সত্ত্বায় ভারতবর্ষ মোগলনেত্র হইতে বহু ক্রোশ দূরে ছিল। কেবল সম্রাট্ আকবরই ভারতবর্ষকে যথার্থভাবে অধিকার করিতে কল্পনা করিয়াছিল; সে চেষ্টা বিশেষ সফল না হইলেও ভারতে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

মোগলের পক্ষে ভারত অধিকার করা যতটুকু সম্ভব ছিল, ইংরাজের পক্ষে ততটুকুও নাই। ইংরাজের নৌকা ভারতের কোথায়ও নোঙ্গর পর্য্যন্ত ফেলিতে পারিতেছে না। এজন্য ইংরাজের প্রধান প্রতিনিধি আক্ষেপ করিতেছেন, ভারতবর্ষ এখনও পর্দ্দান্তরালে রহিয়াছে, এখনও তাহাকে বোঝা গেল না, দেখা গেল না। অবশ্য উহার এক শত একটী কারণ আছে।

এই সমস্ত জাতি সুপ্ত ঐরাবতের লাঙ্গুলে উত্তীর্ণ মশকের অপেক্ষা ভারতের ত্রিশ কোটি কুটীরের চিন্তালোক উজ্জ্বল জীবনে অধিক স্থান দখল করে নাই।

তবে কি ভারতে মোগলরাজের সমসাময়িক আর কোনও গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিল, কিম্বা এখনও আছে?

বস্তুতঃ রাজ প্রতিনিধির হতাশোক্তি মিথ্যা নহে। ভারতবর্ষ এখনও বহির্জগতের নিকট অবগুণ্ঠিত রহিয়াছে। ম্যাক্সিম গানের প্রাচুর্য্য, ডিনামাইটের ক্ষিপ্ত বেগ, টর্পিডো প্রভৃতি লইয়া ইংরাজ এখনও ভারতের উপকূলে শিরে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বসিয়া রহিয়াছে। ঐ বিরাট তলহীন সমুদ্রবৎ প্রতীয়মান পদার্থ এখনও অপরীক্ষিত, অলব্ধ, অজ্ঞাত, কুহেলিকাচ্ছন্নবৎ উদ্ভাসিত হইতেছে। বিংশ শতাব্দীর কামানের গোলক বৃষ্টি এখনও তাহার ক্ষুদ্র মস্‌লিন-অবগুণ্ঠন খানি উড়াইয়া দিতে পারিল না।

বিদেশী রাজনীতিবেত্তা, পরিব্রাজক প্রভৃতি ভৌগোলিক ভারতের শাখা প্রশাখার

গোলক বাঁধার রেখা সমূহের বিচিত্র গতিতে ঘুরিতে ফেরিতে ইতস্ততঃ করে নাই, কিন্তু প্রাণরূপী ভারতবর্ষ, অধ্যাত্মপন্থী, ব্রহ্মনিষ্ঠ ভারতবর্ষ, সহস্রাধিক বর্ষের সাধনা-উপলব্ধ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভারতবর্ষ, শত দার্শনিকের চিন্তাপুষ্ট সামাজিক ভারতবর্ষ, তাহার বিচিত্র ধর্ম্মশ্রেণী-প্রবাহ এবং জটিল জীবন যাত্রার ঐহিক সম্পদ লইয়া এখনও হিমালয়ের শীর্ষ স্থান বা রত্নাকরের মহার্হ বক্ষের ন্যায় অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

ভারতের এই রুদ্ধ-মুখ সত্বার ফলে কত রকমের পাণ্ডিত্যমূলক কল্পনা-জল্পনা বর্দ্ধিত হইতেছে, ইয়ত্তা নাই। সকলেই স্বকীয় খদ্যোত-কিরণে ইহাকে বিম্বিত করিয়া অলীক উৎসাহ অনুভব করিতেছে, ইহাতে ব্যাপারটী অধিকতর অস্পষ্ট হইতেছে।

ভারতের কত ইতিহাস রচিত হইয়াছে—প্রতীচ্যদের উৎসাহ এক্ষেত্রে বেশী,—কত খ্রীষ্টাব্দ শকাব্দ প্রভৃতি জড়ীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের হাস্যজনক পরিমাণ জ্ঞানের অভাব দ্বারা মুহূর্ত্তেই প্রমাণিত হয়—ইন্দ্রধনু-বর্ণ-রঞ্জিত ভারতের দেহাংশুকের বিচিত্রতার মাঝে প্রবেশের অধিকার ইহারা পায় নাই। অপ্রেমিকের পক্ষে ইতিহাসের মাঝে সনাতন এবং সাময়িক এই দুই ব্যাপারের পার্থক্য নির্ণয় দুঃসাধ্য।

এজন্য অধ্যাত্মনিষ্ঠ সামাজিক ভারতবর্ষ কাহারও চোখে পড়ে নাই। অথচ ইহার ইতিহাসই ভারতবাসীর পক্ষে একমাত্র সত্য পদার্থ—একমাত্র সনাতন ব্যাপার, যাহা অখণ্ডভাবে ভারতবাসীর জীবনসূত্র কুহেলিকাচ্ছন্ন অতীতের নিভৃত আশ্রম হইতে বর্ত্তমানের জটিল ধূলি-ধূসরিত মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া আছে। ভারতবর্ষ অন্যথা দুর্ব্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের একটা গুপ্ত সাম্রাজ্য আছে। ইহার সিংহাসন কখনও নৃপতি-বিহীন ছিল না—এখনও সে সিংহাসন শূন্য নহে; তাহাতে মহার্হ মহিমায় নৃপতি উপবিষ্ট আছেন। ইহার গঠন, ইতিহাস এবং নীতিপর্য্যায় দ্বারা ভারতের দীনতম কৃষক পর্য্যন্ত চালিত হইতেছে। ভারতবর্ষের ব্যক্তি ও সমাজের জীবন-নিয়ামক এই নৃপতির সিংহাসন কেহ কাড়িয়া লইতে পারে নাই। সিংহদ্বার কোথায়, তাহা পর্য্যন্তও শস্ত্র-সর্ব্বস্ব মূর্খ তাতার নর্ম্মাণেরা বুঝিতে পারে নাই। আমরা সকলেই এই নরাধিপতির প্রজা। এইজন্য গৌরব বোধ করা আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষ প্রতি পদক্ষেপে ইহা প্রমাণ করিতেছে। এই ধর্ম্মের সাম্রাজ্য আমাদিগের নিকট কর আদায় করিতেছে।

সৌভাগ্যের বিষয়, ভারতবর্ষের ধর্ম্ম-জিনিষটা religion বা ঐ রকম কিছু নহে—ভারতের "ধর্ম্ম" বড় ব্যাপক জিনিষ, ইহা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, সাম্রাজ্য সব কিছুকে একই সূত্রে ধারণ করিয়া আছে এবং ইহাদের অন্যান্যের মাঝে এমন সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছে যে, ব্যক্তি মাত্রেরই কার্য্যে পরিবার, সমাজ, সাম্রাজ্য যুগপৎ সকলেই পুষ্ট হইতেছে। ইহা বিরোধ নিরাকৃত করিয়া সমগ্র শক্তিকে সংহত করিয়াছে।

ভারতবর্ষে মানবের বা সমাজের জীবনে কোন স্বতন্ত্র ডিপার্টমেণ্ট নাই—স্বতন্ত্র আফিসে স্বয়ং হাকিম বিরাজ করে না। এক কার্য্যের সহিত অন্য কার্য্যের তালাক-দেওয়া একাকীত্ব নাই। "রিলিজ্যান" এক সীমানার মাঝে, ষ্টেট ভিন্ন সীমানার ভিতর, এই-

রূপ কোন্ বিভেদ নাই। ইউরোপ ডিপার্টমেণ্ট বড় ভালবাসে, সেখানে শিল্পী হয়ত শিল্পবিশেষ লইয়া সারা জীবন পরিশ্রম করে এবং তাহার পারিশ্রমিক পায়। ইহা ছাড়া তাহার বিশ্বজীবনের সহিত সম্পর্ক কোথায়, খুঁজিবার প্রয়োজন বোধ করে না। শ্রম-বিভাগের আতিশয্যে মানবজীবন বিস্ময়কর ভাবে সঙ্কীর্ণ ও মূলহীন হইয়া উঠিতেছে।

সহস্রধা বিচ্ছিন্ন জীবন চেষ্টার মাঝে মুদ্রিত পুস্তকে লিখিত "এটিকেট" এবং "গুড্-ম্যানার্স্"এর হুকুমই যা কিছু বন্ধন, এ সবের সূক্ষ্মতম খুটিনাটির প্রতি তাহাদের খরতর দৃষ্টি। কোথায় ডিনারে কোন্ চাম্‌চেটী কোন্ হাতে লইতে হইবে, কোন্ জিনিষের সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম কোন্ জিনিষ মিশ্রিত হইবে—আলাপ কিরূপ হইবে, কখন কে উঠিবে, কে বসিবে, ইত্যাদি ব্যাপার সম্বন্ধে একটা কোড্ প্রচলিত আছে। সেটা যদিও সুসংস্কার বলিয়া কোলাহল উঠে না, তবু উহার নিয়মিত রক্ষায় প্রাণপণ চেষ্টা আছে।

ইহার প্রধান কারণ, সেখানে মানবের চেষ্টা-নিবহের মূলে কোন সংহত, ব্যাপক, যোজক অন্য সূত্র নাই।

কথোপকথন, চলাফেরা, কণ্ঠস্বর, হাস্য, দেখাসাক্ষাৎ, পরিচ্ছেদের প্রকৃতি ও প্রণালী, প্রাতরাশ 'লান্চ্যান্' 'ডিনার' 'টি' 'স্যাপার' 'বল' 'সান্ধ্যপার্টি' 'ক্রীড়া' 'রাজদরবার' সম্বন্ধে সকলেই সেখানে একই নিয়ম মানিয়া চলিতেছে ; ইহাই তাহাদের 'সোসাইটি।' ব্যক্তিনিবহ-রচিত এই 'সোসাইটির' মাঝে উপরোক্ত ব্যাপার লইয়া যাহা কিছু সাম্য ; উহাই বলিতে গেলে 'সোসাইটির' ভিত্তি। এই সমস্তের উপর সেখানকার 'সোসাইটি' স্থাপিত।

যেখানে ডিপার্টমেণ্টের রাজত্ব বেশী, সেখানে ইহা অস্বাভাবিক নহে। ইউরোপের মানব ইহা লইয়াই এমন বাড়াবাড়ি করে যে, নিতান্ত ইউরোপ-ভক্ত ছাড়া এ সব ভূমণ্ডলের অন্যান্য জাতির পক্ষে বোঝাও কষ্টকর হয়। তাহাদের দৈনিক জীবনও নানাভাবে বিভক্ত, তাহাতে নানা প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে—'মর্ণিং ড্রেস্,' 'ইভনিং ড্রেস্', প্রভৃতির প্রাচুর্য্য ঘড়ির কাঁটার দ্বারা বিভক্ত দৈনিক কালবিভাগের দৃষ্টান্ত।

পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহানুভবতা অপেক্ষা খণ্ড মনুষ্যত্বের মত্ততা যেখানে কিছু বেশী—এজন্য খণ্ডতা হিসাবে তাহার যতটা বাহবা প্রাপ্য, পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া তাহার দৈন্য ততটা প্রস্ফুট হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষে এইরূপ আত্মবিরোধী সমাজ গঠিত হয় নাই—ভারতে ধর্ম্মই সমাজকে ধারণ করিয়া আছে—ধর্ম্মই মানবের প্রত্যেক কার্য্যকে অন্তর্ভূত করিয়া লইয়াছে। কথাটি অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিব।

ভারতবর্ষ মানবের গন্তব্য পথকে একটী মাত্র জন্ম এবং একটী মৃত্যুর মধ্যপ্রদেশস্থ কালে অবস্থিত মনে করে নাই। কাজেই এই সমাজের ভিত্তি হাস্যের প্রকৃতি, ক্রীড়ার নিয়ম বা ডিনারের এটিকেটের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। মুক্তিমুখী অনন্তপথে ইহা একটা পান্থশালা মাত্র—কাজেই পাথেয় সঙ্কীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ এই মুক্তিসিদ্ধ দাবী করে। মানব মাত্রেই মুক্তির অধিকারী, এজন্য মানবের কর্ম্মপরম্পরা এই ভবিষ্য লক্ষ্যকে অবহেলা করে নাই। আত্যন্তিক দুঃখের

নিবৃত্তি খুজিতে গিয়া ভোগবিলাসের তৃপ্তি-হীন কূপে ঝাপ দেওয়া ভারতবর্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

মানুষের প্রত্যেক কর্ম্মই তাহাকে মুক্তির পথে লইয়া যায় এবং ক্রমশঃ শৃঙ্খল-মুক্ত করিতে থাকে। ধনী, দরিদ্র, আসক্ত ও উদাসীন, প্রত্যেকেই এই পথে অগ্রসর হইতেছে। মানবের প্রখরতা ও উগ্রতার তারতম্যে মানব স্বল্পকালের মাঝে, একই জন্মে বা সহস্র জন্মান্তরে ঈপ্সিততম বস্তুর সন্ধান পাইতেছে। এই জন্য প্রত্যেক কর্ম্মই এখানে ধর্ম্মের অঙ্গ, ধর্ম্ম সাধনের উপায়, উর্দ্ধগমনের সোপান মাত্র। ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক কর্ত্তব্য একই পথে মানবকে অগ্রসর হইতে প্রণোদিত করিতেছে।

কর্ম্মের ভিতর দিয়াই কর্ষবন্ধন প্রতি মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইতেছে। যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা আসক্তির বহুমুখী গতি সংযত হইয়া আসে। অভাবকে অতিক্রম করিয়া চলা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম; তাহাতে ইন্ধন দিয়া ভোগ লালসা বৃদ্ধি করিয়া নহে। তজ্জন্য ইউরোপে উত্তরোত্তর অভাব বাড়িয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষে তাহা সর্ব্ব প্রকারে সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ইউরোপ অভাবকে দূর করিবার জন্য আরও দশটা অভাব সৃজন করিতেছে।

বিলাতী দোকানের মূল্য তালিকাগুলি দেখিলে দেখা যাইবে, অশন-ভূষণ, আহার বিহার প্রভৃতির জন্য উপাদানের সংখ্যা কিরূপ উত্তরোত্তর জটিল ও বিবর্দ্ধমান হইয়া উঠিতেছে। কোন একটা কিছুতে তৃপ্তি হইতেছে না, একটা হইতে অন্যটাতে অসংখ্য পরিবর্ত্তন দ্বারা সুখের মধুধারা বেশী করিয়া আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা আছে।

ভারতবর্ষ ঠিক বিপরীত প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। সুখের বৃদ্ধি অভাবকে সংক্ষিপ্ত করিয়াই সম্ভব, এজন্য যাহা ভোগবিলাসের দ্বারা আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়াছে, তাহা হইতে মন সংহরণ করিয়াছে।

এজন্য ভারতে কোট, আলষ্টার, সার্ট, বুট প্রভৃতি অস্বাভাবিক দানবী আকর্ষণ, বক্তৃতা ও আন্দোলন ছাড়াও, স্বভাবতঃই লুপ্ত হইয়া, ক্রমশঃ কোর্ত্তা ও চটিজুতায় আসিয়া পৌঁছিতেছে। কিছুকাল পরে হয়ত জাপানের ন্যায় চেয়ার টেবিল প্রভৃতি কণ্টক-মণ্ডিত গৃহে শুভ্র নির্ম্মল ফরাস্ বিরাজ করিবে; অনেকের গৃহে ইতি মধ্যেই করিয়াছে।

প্রাচীন শিল্পকলা নবজাগরণে, শুধু চিত্রে নহে—ভাস্কর্য্য প্রভৃতির মাঝেও সনাতন ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিবে। তখন দেখা যাইবে, আমাদের স্কন্ধ হইতে অনেক অনাবশ্যক বোঝা অন্তর্ধান করিয়াছে।

ভারতবর্ষে উপরোক্ত অভাব-মূলক আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্তিই যথার্থ স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার জন্যই ভারতে সামাজিক বিধি বিধান, প্রভৃতি। সকলেই অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে এই স্বাধীনতা পথে ছুটিয়াছে—অন্য কোন ক্ষুদ্র স্বাধীনতা ভারতের লক্ষ্য হয় নাই।

প্রত্যেক লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য যেমন সাধনা প্রয়োজন, ইহার জন্যও ভারতবর্ষ সাধনা-মগ্ন। কুস্তি-খেলোয়ার যেমন নানাবিধ আহার প্রভৃতির দ্বারা দেহ পুষ্ট করে এবং নানা কসরৎ দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাংসপেশী-সমূহ দৃঢ় করিতে অভ্যাস করে, তেমনি, বিক্ষিপ্ত-চিত্ত মানবের জীবনব্যাপী মনকে

লক্ষ্যানুসারে দৃঢ় করিতে বহু চেষ্টা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের ব্রহ্মচর্য্যবানপ্রস্থাদি চতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠা লোকের চিত্তগঠনের জন্য— ইহা একরূপ এক্সারসাইজ্ (Exercise) বা ট্রেনিং—ক্ষুদ্র হইতে সহজে অজর্জ্জরিত চিত্তে মহত্তের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য জীবনের এই বিরাট শিক্ষাগারে এই সমস্ত শ্রেণীভাগ রহিয়াছে। ইহাও যেন এক শ্রেণীর জিউজুৎসু। অনেক চিন্তার, অনেক সাধনার পরে মনীষীরা এই উপায়ে প্রবৃত্তিকে সংযত করা সহজসাধ্য এবং এই পথে অগ্রসর হইলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প কালের মাঝে দুঃখকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভব মনে করিয়াছে। এতদ্‌সম্পৃক্ত অনুশীলনমূলক, ভারতের যাবতীয় আচার অর্চ্চনা, ধ্যান ধারণা, আঁহার বিহার প্রভৃতি লোক চরিত্র গঠন করিয়াছে। অবশ্য অধিকারী ভেদে, জ্ঞান ও মননের তীব্রতা ও ব্যাপকতা ভেদে সকলের পক্ষে এক পথই অবলম্বনীয় নহে। কেহ অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মাঝে সন্ন্যাসের গৌরবে চিত্তকে অলঙ্কৃত করিয়াছে, প্রবৃত্তি-মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ক্ষমতাশালী পুরুষের পক্ষে সম্ভব— সাধারণের পক্ষে ধীরে ধীরে চতুরাশ্রমের চতুর্ম্মন্দিরে অর্চ্চনা করিয়া অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

যে জাতির যাহা লক্ষ্য, সে তাহারই অনুরূপে আত্মগঠন করে। ইউরোপ compulsory military training এবং স্যাণ্ডোর ব্যায়াম পর্য্যায় প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যেক মানবকে প্রস্তুত করিতেছে। যাহার যেই লক্ষ্য, তাহার গঠন-প্রণালী সেই হিসাবে কল্পিত। কিন্তু বন্দুকে ক্ষিপ্রতার সহিত গোলকসমূহ স্থাপন ও সুদূরে নিক্ষেপ মানব ইতিহাসের, বোধ হয়, চরম কথা নহে।

রুষ জাপান যুদ্ধের পরে জাপানের "জিউজুৎসু" নামক ব্যায়াম-প্রণালী ইউরোপে বড়ই আদৃত হইতেছে। কারণ "মারামারি" প্রভৃতির জন্য এই প্রণালী উৎকৃষ্ট। ইহা আহার বিহার প্রভৃতি সংযত করিয়া মাংসপেশী দৃঢ়কারী এবং হস্তকৌশলের ক্ষিপ্রতা বাড়ায়।

জানি না, কখনও মানব সমাজের চরম পরিণতি এবং লক্ষ্যের জন্য মানব পার্থিব জীবনে ভারতের মহত্তর, ব্যাপকতর চতুরাশ্রমমূলক বিরাট জিউজুৎসু ব্যায়ামে মনোনিবেশ করিবে কিনা। এই নব জিউজুৎসু তিন বৎসর বা পাঁচ বৎসরের মাত্র নহে। ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ বানপ্রস্থ-সন্ন্যাস-মূলক বিরাট অনুশীলন ঐহিক জীবনের সমগ্র সময়টা অধিকার করিবে। তবেই মানব ঈপ্সিততম, প্রার্থিততম ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভের অনন্ত অমৃতাস্বাদের অনির্ব্বচনীয় অম্লান আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে।

এই জিউজুৎসু কোন জাতিবিশেষের জন্য নহে। ইহা সমগ্র মানব জাতির জন্য, আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর সাধক ইহা সপ্রমাণ করিয়াছে। ভারত যে স্বাধীনতা চাহে, তাহার জন্য উপরোক্ত চতুরাশ্রমিক জিউজুৎসু সকলকে অধ্যয়ন করিতে হইবে। ভারতের যাহা আদর্শ, তাহার অনুরূপে অনুশীলন-প্রণালীও নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

'আশ্রমে'র নামেই সম্প্রতি আমরা চকিত হই এবং সংসার হইতে অস্বাভাবিকভাবে ছিন্ন এক সম্প্রদায়ের কথা মনে উঠে। নিবিড় ধর্ম্মপ্রাণতা আমাদের পক্ষে হাস্যজনক হইয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ ইউরোপের

আদর্শ অহরহ আমাদের চোখে ভাসিতেছে—তাহা হৃদয়বিশেষে ভারতের আদর্শকে বর্ত্তমান সময়ে ম্লান করিয়া তুলিয়াছে। ভারতবর্ষে ধর্ম্মের যে কোন স্বতন্ত্র ডিপার্টমেণ্ট নাই, ইহা বাল্য কিশোর, যৌবন বার্দ্ধক্য সর্ব্বসময়েই যে আমাদের কর্ম্মপুঞ্জকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, অন্তত আমরা এই চোখেই ভারতবর্ষকে দেখি—তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। এজন্যই বর্ত্তমানে আশ্রম-বিভীষিকা দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমানের হোটেলযুগে আশ্রম করা চলে না।

তাঁহারা ভুলিয়া যান, আশ্রমকে যে অরণ্যের মাঝে করিতে হইবে, কিম্বা হিমালয়ের চূড়ার উপর কল্পনা করিতে হইবে, এমন কোন কারণ নাই। গৃহীর গৃহই আশ্রম, অর্থাৎ গৃহী গৃহকে মননের দ্বারা ধর্ম্মকর্ত্তৃক অনুমোদিত ও আদিষ্ট মনে করিবে, তবেই তাহার আসক্তি সংক্ষিপ্ত হইবে। সলিল-মগ্ন শতদল যেমন জলদ্বারা স্পৃষ্ট হয় না, তেমনি, আসক্তিশূন্য-চিত্তে গৃহকর্ম্ম করিবে, উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভগবদ্ প্রাপ্তি।

অবশ্য যাহারা মানবজীবনকে প্রজাপতির জীবন হইতে পৃথক্ করিতে পারে না—তাহারা উপরোক্ত কর্ম্মপরম্পরা উপলব্ধি করিবে না।

জাতিবিশেষে আদর্শের তফাৎ আছে—এখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড জাতীয় সঙ্গীতরূপে এই গান করিতে ইতস্ততঃ করে না :—

"Rule Britannia, Britannia rules the waves."

—এই "রুল" করিবার প্রবৃত্তি, তৃষ্ণার্ত্ত বাসনা সেখানে লক্ষ্য। আর কিছু চাহে না, কেবল 'রুল' কর, 'রুল' কর। জাহাজ তৈয়ার কর, আকাশ-যান হাওয়ায় উড়াও। অন্ততঃ অন্য কোনও প্রবৃত্তি এই সমস্ত জাতীয় সঙ্গীতে ছায়াপাত করিতে সমর্থ হয় নাই।

মানবের অফুরন্ত শক্তি-"ডিনামো" যদি সব কিছু ছাড়িয়া একটী বিষয়ে ক্ষিপ্ত হয়, তবে সাময়িক অলীক সফলতার উচ্ছ্বাস তাহাদের দুর্লভ হইবে না—কিন্তু তার পর? সুরাসুর যুদ্ধে অসুরেরা কি কখনও ক্ষণিক জয়লাভ করে নাই? মানবের ইতিহাস কি ইতিমধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তবে কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ ভাব-সম্পদ দ্বারা পার্থিব জ্ঞানকে অলঙ্কৃত করিবে, তাহা জানিবার এখনও বাকী আছে।

ইউরোপে যে জ্ঞানের চর্চ্চা নাই—এমন নহে। তবে তাহা সঙ্কীর্ণ আদর্শের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে হইতেছে—একথা বলিলে বিশেষ অন্যায় করা হয় না। কারণ উল্লেখ করিতেছি।

ইউরোপে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক এবং রসায়নজ্ঞ সুধী সাধনামগ্ন আছেন। কিন্তু কেন? সে কি পৃথিবীর দুঃখভার লঘু করিবার জন্য? সে কি স্বার্থমুক্ত জ্ঞানের জন্য? প্রকৃতির কয়েকটা শক্তি আয়ত্ত করিবার জন্য ইউরোপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। কোনও শক্তির অপচয় তাহার পক্ষে দুঃসহ। জলপ্রপাতের বেগ, বায়ুর গতি, উষ্ণ জলের বাষ্প, ঘর্ষণজাত বিদ্যুত, অরণ্য পাদপের দার্ঢ্য প্রভৃতিকে কৌশলে নিজের কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে। রাবণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ আদিত্যগণের ন্যায় পঞ্চভূতের শক্তিসম্পদ তাহার ইন্দ্রজালযষ্টির কম্পনে শিহরিয়া উঠিতেছে।

কিন্তু ঐ সব শক্তি আয়ত্ত করিবার জন্য তাহার প্রাণপণ চেষ্টা কেন? একটী কথায় উত্তর পাওয়া যায়। ঐহিক সম্পদ বাড়াইবার

জন্য—অর্থ সঞ্চয়েরই জন্য, অর্থ সঞ্চয় দ্বারা সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য।—ইহাই তাহাদের দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ের আদর্শ। যদি এই মুহূর্ত্তে দেখা যায় যে, তাহাদের চেষ্টায় পাউণ্ড শিলিং (Pound-shilling-pence) নাই—তদ্দ্বারা অর্থ বৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর নয়, তবে যে প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়কে আজ ইউরোপ পূজা করিতেছে,কল্য তাহাকে পদাঘাত করা আশ্চর্য্য নহে।

এখনও উপরোক্ত ব্যাপারের দৃষ্টান্ত ঘটিতেছে। ইউরোপের মার্কণি এবং ভারতের জগদীশচন্দ্র বসু, উভয়েই একই সত্যের আবিষ্কার করিয়াছিল। মার্কণি ইউরোপের রক্তানুযায়ী সংস্কার ও শিক্ষাদ্বারা তারহীন টেলিগ্রাফের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনের নানা পন্থায় ঘুরিয়াছে—কি করিয়া তাহার আবিষ্কারকে Pound-shilling-penceএ পরিণত করা যায়, তজ্জন্য তাহার প্রাণপণ শ্রম। ভারতবর্ষে জগদীশচন্দ্র তাহার প্রথম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রকে প্যাটেণ্টও করিলেন না—তবু বলিলেন—"আমি সেই সত্যের সন্ধান পাইয়াছি—এবং তাহাকে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি—যাহা চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের তত্ত্বজ্ঞানীর মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে—

"He who sees oneness of things in this universe to him alone belongs eternal knowledge and to none else..." জগদীশচন্দ্রের সম্মুখে স্বর্ণকুন্তলা, রৌপ্যাম্বরা, হীরকবলয়া অর্থদেবী ম্লান হইয়া গেল,—অনন্ত জীবন-পথের এই পার্থিব পান্থশালার আত্যন্তিক দুঃখ, নিরাকরণার্থ সহস্র বর্ষাধিক কালের তপস্যামগ্ন মনীষীমূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল—যিনি বলিয়াছিলেন—"এক রূপেণ ব্যবস্থিতো যো অর্থঃ সঃ পরমার্থঃ।" কোন্ ভারতবাসী এই পরমার্থ সন্ধানে আত্মহারা হইবে না? সহজেই দেখা যাইতেছে, ভারতের ধর্ম্ম বিচিত্র প্রকৃতির, ইউরোপের প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভারতবর্ষের ধর্ম্ম বড়ই ব্যাপক—ইহার লক্ষ্য অপেক্ষা বৃহত্তম লক্ষ্য কল্পনা অসম্ভব—ইহার সাধনা-প্রণালীও সঙ্কীর্ণ বা সাময়িক নহে—হইতেও পারে না। ইহা ভারতবর্ষকে ওতঃপ্রোতভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। বর্ত্তমান যুগে ভারতের এই দুর্লক্ষ্য গুপ্ত সাম্রাজ্য চূর্ণ করা অসম্ভব; ইহা হইতেই ভারতে শোণিত সঞ্চার হইতেছে—ইহার প্রাণরক্ত দ্বারা শঙ্করাচার্য্য হইতে আধুনিক যুগের রাজর্ষি রামমোহন পর্য্যন্ত পুষ্ট হইয়াছেন। তবু জ্ঞানযোগীর কথা নহে—ভারতের দীনতম মানব এই ভাবচক্রের উত্তরাধিকারীরূপে তাহা ভোগ করিতেছে।

এই আদর্শে ভারতবর্ষকে বিচার করিলে বিস্মিত হইতে হইবে।

যে ব্যক্তি বা সমাজ যাহাকে পরমার্থ মনে করে, তাহার জন্যই সে ত্যাগ করিতে অগ্রসর হয়। ইউরোপ অর্থসঞ্চয় দ্বারা ঐহিক দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব মনে করিয়াছে—এজন্য তাহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার (যাহা না হইলে অর্থসংগ্রহ অসম্ভব) জন্য দলে দলে লোককে মৃত্যুমুখে পাঠায়, কামান গোলা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রাদিও কল্পনা করিয়া থাকে। এবং এইজন্য যতটুকু একতার প্রয়োজন, তাহা তাহার পক্ষে একান্ত সহজে লক্ষ্য হইয়াছে। আজ একটী রণতরী ইংলণ্ডকে নখাগ্র দ্বারা স্পর্শ করুক—ইংরাজ-সমাজ আত্মকলহ এবং বিরোধ তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া অগ্রসর হইবে, এইরূপ একতা বাহির হইতে উক্ত-

ঘোরতর সংঘর্ষ ও আক্রমণ দ্বারা তাহাদের সংস্কারগত হইয়াছে। ইউরোপের সাম্রাজ্য বাণিজ্যমূলক—রণসজ্জাও সেই জন্য।

অথচ অন্যান্য বিষয়ে ইউরোপে পারস্পারিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাচারিতা অত্যন্ত অধিক। শুধু অর্থ ও আহারের জন্য এই সংহত চেষ্টার তুলনা শুধু প্রাণীতত্ত্ববিদের মতে ইতর জন্তুদের মাঝেই দেখা যায়। পিপীলিকার এই আত্মরক্ষামূলক একতা অত্যন্ত অধিক—মধুমক্ষিকা অপেক্ষা অধিক আর কাহারও নাই।

ফ্রেডারিক বারবরোসা (Frederic Barborossa) হইতে যখন ইতালীয় নগরগুলি একত্র হইয়া সংগ্রাম পূর্ব্বক ১১৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্টার (charter) করতলগত করে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে Cologne এবং Brunswick যখন ব্যারণগণের বিরুদ্ধে Hanseatic league গঠন করে—তখন হইতে এই প্রবৃত্তির উদ্ভব অনুভূত হয়। অবশ্য তখন আরবদের সহিত সংঘর্ষে যুক্ত হইয়া ইউরোপ সবে মাত্র বর্ব্বরতা অতিক্রম করিবার সূচনা করিতেছিল।

বস্তুতঃ ইউরোপ এখনও এই মধুকরের বৃত্তি অতিক্রম করিতে পারে নাই। চারিদিক হইতে মধু সঞ্চয় দ্বারা এবং মধু ভাণ্ড আক্রমণে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য পুচ্ছাগ্রে বিষাক্ত হুল্ লইয়া আত্মরক্ষা করা—এই স্বার্থমূলক একতা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান কথা। তবে সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপকে এসিয়ার সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে—এখানকার মৃত্তিকা স্রোতোবেগে ভাসিয়া গিয়া সেখানে ক'একটা অতি ক্ষুদ্র দ্বীপবিন্দু সৃজন করিয়াছে, এজন্য দু একটা লোক বিশ্বজনীন ভাবালোক হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

একতামাত্রই শক্তিমূলক, চৌর্য্য, নরহত্যা বা যে কোন কার্য্যের জন্যই হোক্ পাঁচজন লোক এক উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হইলেই একটা সংহত ক্ষমতা জন্মে। ইহাতে করতালি দেওয়ার কিছুই নাই। তবে প্রশ্ন এই—মধুকর বৃত্তির জন্য একতাই কি শ্রেষ্ঠ একতা? তবে মানব ও মধুকর পিপীলিকা প্রভৃতির মধ্যে তফাৎ কি?

ভারতবর্ষে মানব দল বাঁধিয়া মধুকর সাজিতে পারে নাই। মধু সঞ্চয়ই উদ্দেশ্য—ইহার প্রতিবন্ধক দুঃসহ ঈর্ষা ও হিংসা জাগ্রত করিয়া তুলিবে—এমন ব্যাপার ভারতে ঘটে নাই।

এখানে শাস্ত্রধর্ম্ম চরম ব্যাপার ছিল না। তাহা ব্রাহ্মণ্যের অর্জ্জিত জ্ঞানালোক, এবং অন্য বর্ণাদির নানা বন্ধন-রজ্জুতে সংযত ছিল।

প্রাচীন সাহিত্যে ভারতের নৃপতিগণের দিগ্বিজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা মধু সঞ্চয়ের জন্য নহে। কালিদাস নৃপতি রঘুর দিগ্বিজয় ব্যাপারের অন্তে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই বিশ্বজয়ের মূলেও ধর্ম্মভাব; রক্তলোলুপতা বা অর্থোদ্দেশে শকুনিবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য নহে। রঘু অনন্ত রত্ন সঞ্চয় করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সমস্তই দান করিলেন—তাহার হস্তে মৃৎপাত্রমাত্র রহিল—"মৃৎপাত্র শেষামকরোৎবিভূতিম্।" মানব ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত ও আদর্শ ভারতেই সম্ভব।

বস্তুতঃ প্রাচীনকালে নিঃস্বার্থ ও ধর্ম্ম ব্যবস্থামূলক এই প্রণালীর দিগ্বিজয় পারস্পরিক সংযোগ এবং সংস্পর্শ দ্বারা সাহিত্য, নীতি, জ্ঞান প্রভৃতি বিস্তার করিত।

এমন কি, আধুনিক কালে দক্ষিণ ভারতে

এবং অন্যত্র "বহিরাক্রমণের উচ্ছৃঙ্খল ইত-রতার পীড়ায় যে কয়েকটী স্বাধীন রাজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেখানেও ক্ষুদ্রকীর্ত্তি চরম ব্যাপার হয় নাই। শিবাজী, রামদাস এবং ভবানী মূর্ত্তির অন্তর্স্পর্ক তাহা প্রমাণ করিতেছে।

পক্ষান্তরে নবম এবং দশম শতাব্দীতে Hungarianগণ যে উৎপাতের দ্বারা Constantinople হইতে স্পেন এবং ইতালী পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত করিয়াছিল, জর্ম্মণীর Bavaria, Swabia লুণ্ঠন করিয়াছিল, দক্ষিণ ফ্রান্সকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছিল এবং ইতালীকে জনহীন প্রায় করিয়াছিল; কিন্তু Ruricএর অধীনস্থ সম্প্রদায় বা Bulgarian-গণ, নর্ম্মাণগণ, ডেন্‌গণ ইউরোপকে যে ভাব-প্রণোদিত হইয়াও বিধ্বস্ত করে, সে ভাব আরবগণের সম্পর্কে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধি লাভ করিলেও, যাহার পশুত্ব একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী (১২৭০ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত উপলক্ষ্য-মাত্র ক্রুশেদ যুদ্ধ উন্মোচিত হয়—যে ভাবের রক্ষার জন্য ত্রয়োদশ হইতে [illegible]শ খ্রীষ্টাব্দের (১২৭০ খ্রীঃ হইতে ১৪৮৫ খ্রীঃ) মাঝে Feudalism অন্তর্ধান করে—Reformationএর যুগে, (১৪৮৫ খ্রীঃ হইতে ১৬৪৯ খ্রীঃ) যাহা Maximillian, Charles V, Francis I, Guslavus Adolphus, Cortez, Phillip II, Charles VIII, প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া প্রস্ফুট হইয়াছে, তাহা শেষযুগে আমেরিকার সঙ্ঘর্ষ, Treaty of Westphalia (১৭৪৮ খ্রীঃ) Treaty of Aix Chapelle (১৬৬৮ খ্রীঃ) Peace of Nymeguen (১৬৭৮ খ্রীঃ) Treaty of Ryswick (১৬৯৭ খ্রীঃ) Treaty of Utrecpt (১৭১৩ খ্রীঃ), Treaty of Paris (১৭৬৩ খ্রীঃ), Treaty of Carlowetez, "Pragmatic Sanction" প্রভৃতির ইতিহাসের মাঝে মুকুলিত ও সম্ববিকশিত, বোধ হয়। অপেক্ষাকৃত ভাবপ্রধান ফরাসীজাতি এই মধুকর বৃত্তি অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ স্থাপন করিতে যাইয়া কিরূপ লণ্ড-ভণ্ড ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাহাও কাহারও অবিদিত নহে।* এই উচ্চ ভাব কর্ত্তৃক সাময়িক উচ্ছ্বাস লাভ করিয়া ইউরোপ মধুকর বৃত্তির জন্য যতটুকু ভাব দরকার, ততটা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট উদ্গার করিয়া ফেলিয়াছে। কল্পনা ও ভাবমূলক আদর্শ এই বৃত্তির অনুকূল আদর্শ নহে বলিয়া ইউরোপ তাহা পছন্দ করে না।

এজন্য ইউরোপ প্রত্যেক বিষয়ে Historical methodএর দোহাই দিয়া আত্মরক্ষা করে। ইউরোপ Historic হইতে চাহে, Ideal নহে। অথচ কল্পনামূলক ভাব অর্থাৎ 'Idea'র প্রভাব তাহারা অস্বীকার করিতে পারে না। কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের স্বীকারোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"We have never seen in our generation—indeed the world has never seen more than once or twice in all the course of history—a literature, which exercised such prodigious influence over the minds of men over every cast and shade of intellect as that which emanated from Rousseau between 1749 and 1762. It was the first attempt to re-erect the edifice of human belief after the purely iconoclastic efforts commenced by Bayle and in part by air our Locke and consummated by Voltaire.

এ বিষয় আলোচনার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ নহে, তবে ইংরাজেরা আমাদের

* ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

Ideal দিক্‌টা একেবারে কেন উপলব্ধি করে না, তাহার কারণ ইহা ছাড়া আর কিছু নহে। ইউরোপের factএর উপর বড়ই আস্থা, কোন্ idealএর দ্বারা সমাজকে গঠন করা যায়, তাহা বিশ্বাস করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না। এই কারণেই ইংরাজ এবং তাহাদের শিষ্যগণ 'বর্ত্তমানের ধর্ম্মাদিষ্ট এবং ধর্ম্মানুরঞ্জিত বর্ত্তমান ভারতের বিরাট ভাবময়ী উচ্ছ্বাস-বন্যাকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

ভারতের আদর্শের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক চেষ্টা-পরম্পরার যোগ কোথায়, আমাদের 'মাস্' (Mass)-এর ত্যাগের ক্ষেত্র ও পরিধি কোথায় এবং বর্ত্তমান জগৎরাজ্যে তাহার প্রয়োগ প্রতিষ্ঠা এবং অব্যর্থ শক্তি কোথায়, এবং সেই শক্তি প্রাপ্তির জন্য আমাদের চেষ্টার স্বরূপ কি হওয়া উচিত, বিশেষতঃ ভারতের মহান্ আদর্শ অকলঙ্ক রাখিয়া সামগ্রিক পথে কি ভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, তাহা পরে আলোচনা করিতেছি; কিন্তু ভারতের ভাবময়ী ইতিহাস (Psychological History) বিস্মৃত হইলে বর্ত্তমানকে উপলব্ধি করা যেমন দুষ্কর হইবে, তেমনি, তাহাঁর প্রতিবিধানের পথ,হেমন্তের শিশিরাচ্ছন্ন অরণ্যানীর ন্যায় দুর্গম ও দুর্লক্ষ্য বোধ হইবে। ক্রমশঃ।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

স্বদেশ-প্রেম। (৫)

৪র্থ অঙ্ক।

৯ দৃশ্য।

স্থান—কেদার বাবুর অন্তঃপুর।

কাল—প্রভাত।

কেদার বাবুর স্ত্রীর দেহ উদ্বন্ধন-রজ্জু-লম্বিত।

(ঝী দণ্ডায়মান)

ঝী। ওগো! সর্ব্বনাশ হোয়েছে। ওগো শীগ্‌গির এস গো। বাবু! বাবু! সর্ব্বনাশ হোয়েছে—

(বেগে ধীরেন্দ্রের প্রবেশ

ধীরেন্দ্র। কি হয়েছে? কি হয়েছে?

ঝী। আরে সর্ব্বনাশ হোয়েছে।

ধীরেন্দ্র। বাবা, বাবা ছুরি নিয়ে আসুন। শীঘ্র শীঘ্র —মা কি কোরেছেন দেখুন এসে।

(ধীরেন্দ্র তাহার মাতার লম্বিত দেহ উচ্চে ধরিয়া) বাবা! বাবা!—

(নেপথ্যে—কি কি!)

(বেগে কেদার বাবু ছুরি লইয়া প্রবেশ করিলেন,রজ্জু কাটিয়া দেহ নামাইলেন)

কেদার বাবু। ধীরেন—ডাক্তার ডাক্তার—

(ধীরেন্দ্রের বেগে প্রস্থান)

ঝী। বাবু—কি হবে গো, কি হবে, পরাণ বেরিয়ে গিয়েছে বাবু। মা ঠাকুরুণ সগ্‌গে গিয়েছেন। গঙ্গা! গঙ্গা!

(প্রতিবেশিনীর প্রবেশ)

প্রতিবেশিনী। হায় হায় কি হলো! কাল যে সুনীতির মা আমায় বলেছিল—সুনীতির শোক সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছিনে। আমি মর্ব্বো। সত্যিই তা কর্লো! হায় হায়!

কেদার বাবু (লাফাইয়া) হোহো বহুৎ আচ্ছা। কোথায় সুনীতি? ওই সুনীতি শুয়ে রয়েছে। মেয়ে অমন কোরে শুয়ে রয়েছে কেন গা?

(ধীরেন্দ্রের ডাক্তার লইয়া প্রবেশ)

(ডাক্তারের প্রতি) তুমি কে রূপচাঁদ বৈবাহিক, পাজি, পাষণ্ড,আমার মেয়েটা গলা টিপে মেরে ফেলেছিস্—হো হো (হাসি)

সুনীতি—মা তোমারে বিয়ের জন্য যত টাকা লাগে, আমি খরচ কর্ব্বো। ওগো

ভাত দেও—শীঘ্র বেরোবো। আজ যে বন্ধকী খত রেজিষ্টারি কর্ত্তে হবে। তা নলে ত মেয়ের বিয়ে হবে না—হবে না—হবে না।

(আর দুই জন প্রতিবেশিনীর প্রবেশ।)

তুই কে? বাড়ী নিলাম কর্ত্তে এসে ছিস্? টাকাটা যোগাড় কোরে দিচ্ছি—শুনবিনে?—খুন কর্ব্বো (যষ্টি গ্রহণ) খুন কর্ব্বো—কি করি—কি করি—ধীরেন্দ্র (তাহার বাবাকে ধরিয়া) বাবা করেন কি? বাবা আসুন, আসুন, এ ডাক্তার বাবু—

ডাক্তার। ভরসা নাই।

(ডাক্তারের প্রস্থান)

কেদারবাবু। ভরসা নেই? সুনীতির বিয়ে হবে না? টাকা কর্জ্জ পাওয়া যাবে না? বাড়ী বন্ধক দেব—য়্যা, য়্যা—

৫ম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

স্থান—রামধন বুব্বর অন্তঃপুর।

কাল—রাত্রি।

জমিদার রামধন বাবু ও তাহার স্ত্রী আসীন।

রামধন বাবু। তুমি জান, বিজয়ের মনে মনে সুনীতিকে বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছা ছিল—তাই সে অন্য মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে অসম্মত ছিল। এখন সুনীতি মারা গিয়াছে। এখন বোধ করি বিজয় বকুলপুরের জমিদারের সেই মেয়েটী বিয়ে কর্ত্তে পারে। তারা কা'ল আবার লোক পাঠিয়ে ছিল। শেষ জবাব চায়।

স্ত্রী। সে মেয়ের আজও বিয়ে হয়নি? তবে মেয়ের কোন দোষ আছে বা।

রামধন। তা নয়। আমি আশ্বাস দিয়ে তাদের এতদিন রেখেছি। আর তারা রাখবে না। এদিকে দশহাজার টাকা দিতে চেয়েছে। এই ফাল্গুন মাসে বিয়ে দিতে চায়।

স্ত্রী। বিজয় বিয়ে করে তবে ত।

রামধন। সুনীতি যখন মারা গিয়েছে, তখন অন্য মেয়ে বিয়ে করায় বিজয়ের কেন আপত্তি হবে?

স্ত্রী। সে যে প্রতিজ্ঞা করেছে, টাকা নিয়ে বিয়ে কর্ব্বে না, তাত তুমি জান।

রামধন। ও সব কিছু নয়। অমন প্রতিজ্ঞা অনেকেই করে থাকে। কেদার বাবুর সেই সুন্দরী মেয়েটী বিজয়ের প্রতিজ্ঞার কারণ ছিল।

স্ত্রী। আমার কিন্তু বোধ হচ্ছে, সুনীতির মৃত্যুর পর বিজয়ের মুখ আরও গম্ভীর হয়েছে, ধ্যানে যেন পূর্ব্বের অপেক্ষা মগ্ন। এখন সংসারের কোন জিনিষই যেন আর দেখতে পায় না। আমি দেখলাম, তার চোখ হতে জলের ধারা পড়ছে।

রামধন। চোখের জল পড়ছিল?

স্ত্রী। হাঁ—এ লক্ষণ ত ভাল নয়। সংসারের কোন বস্তুর পানেই নজর নেই, কিন্তু আগের চেয়ে সকলের অধিক সেবা করে। চাকর চাকরাণীদের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দয়া—গরিব লোকদের আগের চেয়ে আরও অধিক দয়া করে, তাদের দেখলেই ছুটে গিয়ে, তাদের সঙ্গে আলাপ করে, খাওয়ায়, দাওয়ায়, কাপড় দেয়, তারপর তাদের হাতে পয়সা দিয়ে বিদায় দেয়। কখন কখনও তাদের দুঃখ দেখে আমার চোখে জল পড়ে।

রামধন। এত কথা ত তুমি আগে বলনি।

স্ত্রী। তুমি কি শোনো! তুমি বই আর কাগজ নিয়ে থাক। বিজয় এখন আতপ চা'ল খায়, এক সন্ধ্যা নিরামিষ খায়। রাত্রি দশটায় ঘর বন্ধ ক'রে চোখ বুজে ধ্যান করে, কোন কোন দিন ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে রাত পুয়ে যায়।

রামধন। ও সব ছেলেমি—অল্প বয়সের পাগলামি শীঘ্রই যাবে। পাত্রীপক্ষকে বলেছি ২০ দিন পরে ঠিক ঠাক কর্ব্বো। বুঝছো না?—দশ হাজার টাকা!

স্ত্রী। এখনও তুমি টাকার কথা ছাড়। আগে টাকার কথা ছেড়ে দিলেই বিজয় বিয়ে কর্ত্তে রাজি ছিল। এখন টাকার কথা ছেড়ে দিলেও বিজয় হয়ত মোটেই বিয়ে কর্ব্বে না।

রামধন। হাঁ, মোটেই বিয়ে কর্ব্বে না,? ভারি বুক!

স্ত্রী। হা নাথ! তুচ্ছ টাকার জন্য ছেলেকে হারালে! আমি বুঝি না? আমি দিন রাত্রি বিজয়কে চোখে চোখে রাখি। জাননা কি, নাথ, স্নেহ দিব্যচক্ষু দেয়। অগাধ বিজ্ঞে যা ভেবে বুঝতে পারে না, স্নেহ, বিশেষতঃ জননীর স্নেহ, তা অনায়াসে বোঝে। নাথ,আমি বলছি তুমি দেখে নিও। এ অভাগিনীর কথা সত্য হয় কিনা—বিজয় গৃহে রয়েছে বটে, কিন্তু সে এখন আর আমাদের নয়।

রামধন। সে এখন কাদের?

স্ত্রী। কাদের? সে সেই জানে। তার বৈরাগ্য, এখন যেন তার আর আমাদের মধ্যে একটা ভারি বড় প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা কি তুমি এখনও বুঝতে পাচ্ছ না? এখন আমার বোধ হয়, বিজয় যেন কোন দেবতা, স্বর্গ হতে নেমে এসেছে, যেন দয়া করে আমাদের গৃহে রয়েছে।

রামধন।, নিজের ছেলেকে সব মারই দেবতা বোধ হয়। ও সব কথা যাক্। কাজের কথা শোনো। তুমি যুত পেলেই বিজয়কে আবার বিয়ের কথা বল্বে। ২৫শে তারিখ তাদের খাঁটী জবাব দিতে হবে। আমার কথা শুনো। বিজয়ের টুক্‌টুকে বউ হবে। তোমার ঘর সংসার কর্ব্বে, বিজয় ঘরে থাক্‌বে—আর দশ হাজার টাকা। দশ হাজার টাকা ফাউ। তাতে বৌমার বেশ এক প্রস্ত জড়াও গহনা হবে। গাঙ্গুলিদের বাড়ী যখন তুমি বৌ নিয়ে নিমন্ত্রণ থেতে যাবে—বৌমার জড়াও গহনা দেখে গাঙ্গুলিদের চোখ টাটাবে—আর জমীদার বেহাই হবে। নিত্য জাকাল জাকাল তত্ত্ব আস্‌বে। আমি কি বিজয়ের মন্দ কামনা কচ্ছি?

স্ত্রী। নাথ, তুচ্ছ টাকা ও লোক লৌকুতার জন্য সোণার চাঁদ বিজয়কে হারিও না। আবার টাকা নিয়ে বিয়ে কর্ত্তে বল্লে আমার বিজয় বোধ হয় এবার সন্ন্যাসী হয়ে যাবে, আর ঘরে আস্‌বে না। বড় ভয় হয়। তবে আমি কখনই তোমার অবাধ্য নহি, কখন অবাধ্য হব না। বলবো, যা করেন মধুসূদন।

রামধন। হুঁ, বুঝিয়ে বল। ভয় নেই।

২য় দৃশ্য।

স্থান—"মেসের" বাসা।

কাল—অপরাহ্ণ।

বিজয় ও কৈলাস আসীন।

বিজয়। হাঁ? আপনি যথার্থই তাঁকে মেরেছিলেন!!

কৈলাস। আপনাকে সমুদয় ত বলেছি। আর সে পাপ-কাহিনী মুখে বল্‌তে পারিনে। শুনেছি, আপনি অল্প বয়সেই সাধু হয়েছেন—শুনেছি আপনি দেবতা—সুনীতি বলেছিল আপনি দেবতা (বিজয় আরও গম্ভীর) তা দেখ্‌ছি। আপনি যদি দেবতা হন, এ অধমকে শাস্তি দিন। আমার বুক দিন রাত্তির জ্বলে যাচ্ছে—উঃ উঃ (নিজের বুকে হাত বুলাইয়া) কিসে শান্তি পাই, বিজয় বাবু, বলে দিন।

বিজয়। আমরা সকলেই পাপী, ভগবান, আমাদের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। তাঁর স্মরণাপন্ন হোন, তিনি মহাপাপীকেও দয়া করেন, তাঁকে আশ্রয় কর্লে তিনি মহা পাতকীকেও উদ্ধার করেন।

কৈলাস। (নিজের মাথায় হাত দিয়া) সেই পবিত্র মুখখানি, সেই সকরুণ দৃষ্টি মনে করে, আমি কোন মতেই যে হৃদয়ের দারুণ শোক সম্বরণ কর্ত্তে পাচ্ছি নে। (ক্রন্দন করিতে করিতে বিজয়ের পা ধরিয়া) বিজয় বাবু! আমি বড়ই পাপী, বড়ই পাষণ্ড, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। কিসে আমার মনে শান্তি হয়, বোলে দিন।

বিজয়। মোহ প্রাপ্ত হবেন না। ভগবানে ভক্তি করুন—আর ক্ষমা করুন—আর গীতা পড়ুন—৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথামৃত পড়ুন, আর লোকের সেবা করুন। পরমেশ্বরের উপাসনা করুন। তিনি সর্ব্বজনের একমাত্র গতি। তাঁর দয়ার সীমা নাই।

কৈলাস। আমি বুঝেছি, আমার স্ত্রী, নিজের প্রাণের অপেক্ষা আমাকে ভালবাস্‌তেন। তাই নিজের প্রাণ ত্যাগ করে, আমাকে জ্ঞান দিয়ে গেলেন। বিয়েতে টাকা নেওয়া যে কাপুরুষের কাজ, তা এ

মূর্খকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন। আমি নরকের পথে যাচ্ছিলাম। নিজের প্রাণত্যাগ করে, তা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে, স্বর্গের পা স্বর্গে উড়ে গেল! আমি যে নরক, সে যে স্বর্গ; আমি যে পিশাচ, তিনি যে দেবকন্যা; আমি যে নিষ্ঠুর নীচতা, সে যে উদার দয়া; আমি মূর্তিমান পাপ, তিনি যে পুণ্যের মূর্ত্তি; আমি যে অন্ধকার, সে যে জ্যোতি; আমি যে দুঃখের কণ্টক, তিনি যে আনন্দময়ী; আমি যে বিষ, সে যে অমৃত। নরকে আর স্বর্গে কি মিল হোতে পারে? পিশাচে আর দেব কন্যায় কি বিবাহ হতে পারে? যখন আমার হৃদয়ে অর্থ-পিশাচের ভাব ছিল, তখন সে আমাকে স্পর্শ করে নাই। যেই আমার অর্থ-পিশাচের ভাব চলে গিয়াছিল, তখনই, মৃত্যু-শয্যায় শয়ন কোরেও, আমার চরণধূলি নিয়েছিল, আমাকে ভক্তি ও ভালবাসা দিছিল। না না, আমি তার ভালবাসা ও ভক্তির যোগ্য নহি,—সে দয়া, ভক্তি নহে। আমি অতি অধম, বিজয় বাবু—আমি কি কর্ব্বো, বলুন (ক্রন্দন)

বিজয়। ধৈর্য্য ধরুন। ভগবানের আরাধনা করুন, গীতা পড়ুন, আর সেবা-ধর্ম্মের অভ্যাস করুন—তাতেই শান্তি পাবেন।

কৈলাস। কারা আস্ছে বুঝি? এ কলঙ্কিত মুখ আর কাহাকে দেখাব না, এখন চল্লাম। পায়ের ধূলা দিন, (ধূলি মস্তকে গ্রহণ ও কৈলাসের প্রস্থান)।

(রমানাথ, হরগোবিন্দ, গণেশ ও ভূপেন্দ্রের প্রবেশ)।

রমানাথ। বিজয়, আমি আজ তোমার কাছে দুটী নূতন ছাত্র এনেছি, ইনি ভূপেন্দ্র বাবু, গণেশ বাবু এঁর নাম। বিজয়, তোমার শরীর আজ ভাল নাই? তবে আজ থাক্।

বিজয়। (একটু হাসিয়া) সংসারের শরীর বা মন খারাপ কর্ব্বার কারও অধিকার নাই।

রমানাথ। বেশ। তা হলে ভূপেন্দ্র বাবুকে Free Trade ও Protection সম্বন্ধে ভাল কোরে বুঝিয়ে দেও। তিনি Political Economyটা অনেক দিন পড়ে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, Free Trade জাতীয় আর্থিক জীবনের এক মাত্র মুক্তির উপায়।

বিজয়। আপনি এখন কি কর্চ্ছেন?

ভূপেন্দ্র বাবু। আমি এইবার বি-এ দেব। Political Economy এবং Philosophy আমার পাঠ্য বিষয়। আমি শুনিছি আপনি বেশ Economics বুঝেন। Free Trade সম্বন্ধে আপনার সহিত আলোচনা কর্ত্তে ইচ্ছা করি। Free Trade কি আপনার মতে ভাল নহে?

বিজয়। অবাধ বাণিজ্য, স্বেচ্ছাধীন ক্রয় বিক্রয় ভাল।

ভূপেন্দ্র। তবে আপনার সঙ্গে আমার কোন তর্ক নাই।

বিজয়। কিন্তু Free Trade অর্থে দুইটী বুঝাতে পারে। (১) প্রচলিত অর্থ—প্রত্যেক দেশ অপর দেশে বাণিজ্য কর্ব্বে, (অর্থাৎ নিজেদের বস্তু বিক্রয় কর্ব্বে, অথবা অপর দেশের বস্তু বিক্রয় কর্ব্বে, অথবা অপর দেশের বস্তু ক্রয় কর্ব্বে) তাতে কেউ শুল্ক বসিয়ে বা অন্য কোন উপায়ে বাধা দিতে পার্ব্বে না। এইরূপে প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক দেশের লোক স্বাধীন ভাবে বাণিজ্য কর্ব্বে। (২) এইটী প্রচলিত অর্থ*। কিন্তু এই স্থলে এক দেশের লোকের কর্তৃক স্বাধীন ক্রয় বিক্রয় অপর দেশের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধ হতে পারেনা কি?

ভূপেন্দ্র। সেটা কি রকম?

ভূপেন্দ্র। সেটা কি রকম?

বিজয়। যখন পণ্য বিক্রয়ের জন্য সৈন্য আবশ্যক হয়, তখন কেনা বেচাটা স্বাধীন ভাবে হয়, তা বলা যায় না। ধরুন, চীন রাজ্য বলে যে, আমাদের দেশে কাকেও মদ বা অহিফেন বিক্রয় কর্ত্তে দেব না। কোন ইউরোপীয় জাতি বল্ল, আমরা জোর কোরে বিক্রয় কর্ব্বো। অর্থাৎ আমাদের পণ্য দ্রব্য তোমাদের দেশে বিক্রয় কর্ত্তে না দিলে, সৈন্য পাঠাব, যুদ্ধ কর্ব্বো। চীন রাজ্য যুদ্ধের ভয়ে, ইউরোপীয় পণ্য চীনদেশে বিক্রয় কর্ত্তে দিল। এখানে আপনি বাণিজ্যকে স্বাধীন বাণিজ্য বলিতে পারেন?

ভূপেন্দ্র। কিন্তু প্রত্যেক চীন ক্রেতা ত

* Bounty কথা এখানে ছাড়িয়া দেওয়া গেল।

স্বাধীন ভাবে স্বতঃ প্রবৃত্ত হ'য়ে ক্রয় করে। চীন রাজার, প্রজাদিগের স্বাধীন বেচা কেনার উপর, হস্তক্ষেপ কর্ব্বার কি অধিকার আছে?

বিজয়। রাজা, প্রজাগণের, (অর্থাৎ অধিকাংশ প্রজাগণের) প্রতিনিধি। অধিকাংশ প্রজার যাতে মঙ্গল হয়, রাজা তাই করেন, কর্ত্তে পারেন। যে কাজে অধিকাংশ প্রজার অমঙ্গল হয়, সে কাজ কি রাজা নিষেধ কর্ত্তে পারেন না? Government আছে কি কর্ত্তে? একদিকে, প্রজারা যাতে নিজ নিজ প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা কোরে, স্বাধীন ভাবে কাজ কর্ত্তে পারে, গবর্ণমেণ্ট তা কোরে থাকেন; আর একদিকে, যাতে অধিকাংশ লোকের অনিষ্ট হয়, তা নির্ব্বোধ বা দুষ্ট প্রজারা স্বাধীন ভাবে যাতে না কর্ত্তে পারে, তাই করেন। গবর্ণমেণ্ট হিতকার্য্যে স্বাধীনতার রক্ষক, অনিষ্ট কার্য্যে স্বাধীনতার সঙ্কোচক। সুতরাং যদি গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, কোন দ্রব্য দেশে বিক্রয় হ'লে দেশের অনিষ্ট হবে, সেই জন্য কি গবর্ণমেণ্ট সেই দ্রব্য বিক্রয় করা নিবারণ কর্ত্তে পারেন না?

ভূপেন্দ্র। অবশ্য পারেন।

বিজয়। তবে ধরুন, চীন দেশের গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চীনদেশে যদি জার্ম্মাণী (Germany) জোর কোরে জিনিষ বিক্রয় করে, সেই বাণিজ্যটা Free Trade, না Forced Trade?

ভূপেন্দ্র। হাঁ এক দিকে দেখ্‌লে অর্থাৎ চীন দেশের রাজার দিক দিয়ে দেখ্‌লে, ওটা Forced Trade. আবার চীন দেশের ক্রেতাদিগের অর্থাৎ consumersদিগের দিক্ হতে দেখ্‌লে, সেটা Free Trade। আপনি ত স্বীকার করেন, consumers-দের স্বার্থ দেখ্‌তে হবে।

বিজয়। নিশ্চয়ই Consumersদের স্বার্থ দেখ্‌তে হবে। কিন্তু আপনি বোধ হয় এক শ্রেণীর Consumersদের কথা ভাবছেন; আর এক শ্রেণী Consumersদের কথা মনে কচ্ছেন না। তারা Producers। দেশের Consumersরা জিনিষ যাতে সস্তা দরে পায়, রাজার দেখা আবশ্যক। কিন্তু যাতে দেশের Producers-রা খেতে পায়, (অর্থাৎ তাদের ব্যবসায় নষ্ট হোয়ে তারা অন্নাভাবে মারা না যায়) তাও কি রাজার দেখা উচিত নহে? Producers-রাও Consumers। যাহাদের সাধারণত Consumers বলে, তাহারা ক্রেতা Consumers; যাহাদের Producers বলে তাহারা বিক্রেতা Consumers। দেশে এই উভয় শ্রেণীর Consumersরা যাতে অন্ন পায়, রাজার তাহাই কর্ত্তব্য। যদি এমন হয় যে, ইংলণ্ডের উৎপন্ন শস্যে ইংরাজদিগের খাদ্যের অকুলান হয়, তাহা হ'লে অবশ্য ইংলণ্ডে বিদেশীয় শস্য বিক্রয় নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত নহে, সেখানে Free Tradeই ভাল। যদি অন্যদিকে এমন হয়, ভারতের উৎপন্ন শস্যের কতক অংশ ভারতবাসী শিল্পীগণের ঘরে না গেলে তারা অন্নাভাবে মর্ব্বে, তা হলে ভারতবাসী শিল্পীগণ যাতে অন্ন পায়, গবর্ণমেণ্টের তাই করা উচিত, অর্থাৎ তাদের জিনিষ যাতে বিক্রয় হয়, তাই করা কর্ত্তব্য। তাতে যদি Free Trade ত্যাগ কর্ত্তে হয়, ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। আমার নিকট এ কথা অতি সহজ।

ভূপেন্দ্র। তবে আপনি কি স্বীকার করেন না যে, অবাধ বাণিজ্যের দরুণ যে দেশে যে বস্তু উৎপাদন কর্ব্বার বিশেষ উপযোগিতা আছে, সেই দেশে সেই জিনিষ প্রস্তুত করা হয়। তাতে কি সকল দেশেরই পরিণামে উপকার হয় না?

বিজয়। Free Tradeই সাধারণ নিয়ম, অর্থাৎ সাধারণত Free Trade মঙ্গলজনক, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু অবস্থা বিশেষে, এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, অর্থাৎ স্থল বিশেষে Protection মঙ্গলজনক।

ভূপেন্দ্র। দেশে মূল ধন না বাড়্‌লে গবর্ণমেণ্ট Protection চালালেও শিল্পের উন্নতি হতে পারে না। মূল কথা মূলধন, capital.

বিজয়। হাঁ, অনেক Economist বলিয়া থাকেন, Industry is limi-

ted by capital. ওটাকে Wages Fund Theory বলে। কিন্তু আর একটা Theory আছে। সেটাকে Produce theory of wages বলে। পূর্ব্বসঞ্চিত মূলধন সামান্য মাত্র থাকিলেও, যদি কোন শিল্প ব্যবসায় চলিবার সুবিধা পায়, অর্থাৎ জিনিষের কাটতি অধিক হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন জিনিষের মূল্য হইতে ক্রমেই মূলধন বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ক্রমে অধিক শিল্পী বা শ্রমীর অন্নসংস্থান হয়।

ভূপেন্দ্র। কিন্তু যদি কোন শিল্পের উন্নতির জন্য বিদেশীয় কোন জিনিষের আমদানি বন্ধ করা হয়, তাহা হোলে দেশের রপ্তানি কম্‌বে না কি? কারণ the great maxim of Free-raders এই যে, Imports must be paid for by exports. যে পরিমাণে দেশের আমদানি কম্‌বে, সেই পরিমাণে দেশের রপ্তানি মালও কম উৎপন্ন হবে। সুতরাং কতকগুলি শিল্পী বা শ্রমীর কাজ যাবে, আর তাদের অন্নাভাব হবে। অর্থাৎ Protection দরুণ যে পরিমাণে বিদেশীয় মালের আমদানি কম্‌বে, সেই পরিমাণে দেশী মালের রপ্তানি কম হইবে, সুতরাং দেশের ধন কমে যাবে।

বিজয়। এ কথাটা সকল স্থানে খাটে কি? ধরুন, ভারতে দেশী কাপড়ের চলন হোয়ে, বিলাতী কাপড়ের আমদানি ক্রমে বন্ধ হোয়ে গেল। ভারতের তাঁতিরা এ দেশীয় অন্ন কিন্‌তে লাগলো। চাউল গমের রপ্তানি কম হতে লাগলো বটে। কিন্তু তাতে কোন ভারতীয় শিল্পী বা শ্রমীর কাজ গেল না, কারও রুটী মারা গেল না। সুতরাং এস্থলে ভারতের রপ্তানি কমাতে ভারতের কোন অনিষ্ট হল না।

ভূপেন্দ্র। কিন্তু ভারতের কৃষকেরা বিলাতী কাপড় সস্তা দরে কিন্‌লে তাহাদের টাকা বাঁচত, তাতে অন্য কোন জিনিষ কিন্‌তে পার্ত্ত, তাতে ভারতে কোন নূতন শিল্পের প্রচলন হতে পার্ত্ত।

বিজয়। যদি কোন নূতন শিল্পের প্রচলন হতে পার্ত্ত, একথা ঠিক হয়, তা হলে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ভারত-কৃষকগণের কিছু কিছু টাকা বাঁচলে, তাতে ভারতে কি নূতন শিল্প প্রচলন হতে পারে, বলুন।

ভূপেন্দ্র। বল্‌তে পারি না।

বিজয়। আর বিলাতী কাপড় কিনে যে টাকা বাঁচে, ঐ দরের দেশী কাপড় কিনেও সেই টাকা বাঁচতে পারে। হয়ত তাতে কাপড় কিছু মোটা হবে। ভারতীয় তাঁতিদের একবারে অন্নাভাব হওয়া চেয়ে কৃষকদের একটু মোটা কাপড় পরা শ্রেয়ঃ নহে কি?

ভূপেন্দ্র। অবশ্য কতকগুলি লোক মরার অপেক্ষা আর কতকগুলি লোকের মোটা কাপড় পরা শ্রেয়ঃ।

আচ্ছা ধরুন, যদি এমন হয়, ভারতীয় তাঁতিরা তাঁত ছেড়ে কৃষি কর্ল্লে অনায়াসে খেতে পারে, তাতে কি ক্ষতি আছে?

বিজয়। ক্ষতি আছে।

(১) তাঁতিদের বংশগত ও শিক্ষাগত যে কৌলিক নিপুণতা আছে, তা কৃষিকাজে লাগে না। (২) আর দেশের সকল লোকেই যে লাঙ্গল ধরে চাসা হবে, এটাও ইচ্ছনীয় নয়। কেবল মাত্র কাজের পরিমাণ দেখ্‌লে চল্‌বে না; কাজের তারতম্য গুণাগুণ, তাও দেখ্‌তে হবে। দেশের কতক লোকের বুদ্ধি ও কৌশলক্ষম কার্য্য ইচ্ছনীয়।

ভূপেন্দ্র। মানি। তবে Protection এ অনেক সময়, স্বার্থপর Capitalist শ্রেণী বিশেষের উপকার হয়, তা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, তাহা কি আপনি স্বীকার করেন না?

বিজয়। করি।

ভূপেন্দ্র। বিদেশীয় জাতির শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা না থাকিলে দেশের শিল্পের উন্নতি হয় না।

বিজয়। ঠিক। তবে কোন শিল্প কার্য্য যদি নিতান্ত শৈশবাবস্থায়, বা শিক্ষার অবস্থায় থাকে, তখন সেই শিল্পের উন্নতির জন্য কিছুকাল তাকে বলবান পরিপক্ক বিদেশীয় প্রতিযোগিতার হাত হতে রক্ষা করা ভাল।

ভূপেন্দ্র। তাতে আমার আপত্তি নেই।

বিজয়। এই শিল্প শিক্ষার তরুণ অবস্থায়, গবর্ণমেণ্ট যদি নিপুণ বিদেশীয় শিল্পী এনে কল কারখানা করে প্রজাদিগকে শিক্ষা দেন, তা হলে আরও ভাল হয়, আর

Protection এর দীর্ঘকালের জন্য দরকার হয় না।

ভূপেন্দ্র। ঠিক কথা। তবে Free Tradeয়ে প্রায়ই বাণিজ্যের উন্নতি হয়। বাণিজ্যের উন্নতি দেশের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ।

বিজয়। কোন কোন স্থলে বাণিজ্যের প্রসারই দেশের অবনতি ও অন্নাভাবের কারণ হইতে পারে।

ভূপেন্দ্র। বলেন কি ?

বিজয়। কোন দেশে বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইলে, অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির বৃদ্ধি হইলেই লোকে ধরিয়া নেয় যে, দেশে ধনের বৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু এমন হতে পারে, দেশের ধন বাড়্ছে না, অথচ আমদানি রপ্তানি বাড়্ছে।

ভূপেন্দ্র। অসম্ভব।

বিজয়। অসম্ভব নয়। ধরুন, যেন ভারতে পূর্ব্বে বিদেশীয় বাণিজ্য ছিল না। ভারতীয় শিল্পীগণের দ্রব্যের সহিত ভারতীয় কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময় হতো। তারপর, ধরুন, সস্তা বিদেশীয় মালের আমদানিতে ভারতীয় শিল্পের লোপ হল। যে ভারতের অন্ন ভারতীয় শিল্পীগণ খেতো, বিদেশীয় শিল্পীগণ এখন সেই অন্ন খেতে লাগ্লো। তাতে বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানি ও ভারতীয় শস্যের রপ্তানি খুব বাড়্ল। স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণ তাতে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে মনে কর্ত্তে লাগলেন। কিন্তু এই অনুমিত দৃষ্টান্তে ভারতের দুঃখ বৃদ্ধি হবারই কথা, অর্থাৎ শিল্পীকুলের অন্নাভাব হবারই কথা। তবে ভারতে প্রকৃত ঘটনা কি হচ্ছে, তা Statistics না দেখ্লে বলা যায় না।

ভূপেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য! স্থল বিশেষে বাণিজ্য প্রসারেও অবনতি হতে পারে? তাইত!

বিজয়। আপনি যেন আমার কথা ভুল বুঝবেন না। বাণিজ্যে দেশের উন্নতি হচ্ছে কি না, বুঝতে হলে, দেখ্তে হবে, দেশের ধনের সমষ্টি বৃদ্ধি হচ্ছে কি না।

ভূপেন্দ্র। আর দেশে Free Trade ভাল না Protection ভাল, তা বুঝতে হলে, কি কর্ত্তে হবে—সংক্ষেপে ?

বিজয়। কোন দ্রব্য সম্বন্ধে, অবাধ বাণিজ্য ভাল, না রক্ষিত বাণিজ্য ভাল, তা বুঝতে হলে, দেশের সমুদয় অবস্থা আলোচনা করে দেখ্তে হবে, কিসে দেশের সকল লোকের অন্ন সংস্থান হয়, অবাধ বাণিজ্যে, না রক্ষিত বাণিজ্যে। Economicsএর মূল মন্ত্র হচ্ছে—Food for all। আমার বোধ হয়, এই কথাটা লক্ষ্য না করার দরুণই বড় বড় Economistsরা ভ্রান্ত হোয়েছেন। ধনতত্ত্বের ভিত্তি Food for all.

ভূপেন্দ্র। রমানাথ, গণেশ ও হরগোবিন্দ (সকলে এক সঙ্গে) Food for all—Food for all—

বিজয়। সমাজতত্ত্বেই হোক, আর ধনতত্ত্বেই হোক, অসংযত প্রতিযোগিতা অমঙ্গলজনক।

রমানাথ। বুঝলেন, গণেশ বাবু, Tradeয়ে যেমন অসংযত প্রতিযোগিতাকে সংযত কর্ব্বার জন্য অবস্থা বিশেষে "Protection" আবশ্যক হয়, তেমনি সমাজে বর্ত্তমান অবস্থায় বিবাহে টাকার অসংযত প্রতিযোগিতা সংযত কর্ব্বার জন্য সামাজিক Protection আবশ্যক হয়েছে—আমাদের "বিশুদ্ধ বিবাহ-প্রচলন-সভার" প্রয়োজন হয়েছে।

গণেশ বাবু। আমি দেবভবনে উত্তমানন্দ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু তবু আমার কয়েকটী সন্দেহ আছে।

বিজয়। আজ আর সময় নাই।

রমানাথ। আগামী রবিবারে এখানে আস্বেন। আপনার সন্দেহগুলি ভেঙ্গে নেবেন। (সকলের প্রস্থান)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

আর্য্যঋষিদিগের সৃষ্টিব্যাখ্যা।

আমরা "হিন্দুর অভিব্যক্তিবাদ" প্রবন্ধে সমুদ্রমন্থন বর্ণনায় সূক্ষ্মবাষ্পমধ্যে যে আর্য্য-ঋষিগণ সৃষ্টির বীজ নিহিত দেখিয়াছিলেন, তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি। এই তত্ত্বটী কি প্রকারে তাঁহাদের হস্তে পরিস্ফুট হইয়া বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিব্যাখ্যার এক সাধারণ ভিত্তিভূমি গঠিত করিয়াছিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে আমরা বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অবতার পাশ্চাত্য মনীষিগণ অগাধ গবেষণা, বিস্তৃত পর্য্যবেক্ষণ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণদ্বারা সৃষ্টি ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করিব। সমস্ত সৃষ্টি ব্যাপারের মূলানুসন্ধান করিয়া ইঁহারা দুইটী অবলম্বনই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখিতে পাইয়াছেন। সুতরাং এই দুইটী-কেই তাঁহারা সৃষ্টিকার্য্যের নিত্যসত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সেই দুইটীকে তাঁহারা জড় ও শক্তি (matter and force) নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই দুইটীই পরস্পর সাপেক্ষ। ইহাদের একটী উপাদান যোগাই-তেছে—অপরটী তাহারই সংযোগ বিয়োগ সাধনদ্বারা অশেষ পরিণামে প্রবর্ত্তিত করি-তেছে। ইহাতেই বিশ্ববৈচিত্র্যের উৎপত্তি হইতেছে। ইহাই সৃষ্টিলীলা।

আমরা পূর্ব্বে সমুদ্র মন্থন বর্ণনায় যে ক্ষীরোদসাগররূপ সূক্ষ্ম-বাষ্প-রাশির উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের জড়োপাদন-স্থলীয় হইতেছে এবং মন্থনবেগ-টাই শক্তি স্থানীয় হইতেছে। এই প্রকারে বুঝিলে সৃষ্টিসম্বন্ধে পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত প্রাচ্য-সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কোন প্রকারেই অগ্রসর বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিন্তু প্রাচ্য সিদ্ধান্তটী রূপকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিয়া অনেকেই আমাদের কৃত ব্যাখ্যাতে কষ্টকল্পনা দ্বারা স্বজাতির গৌরবখ্যাপন ব্যতীত আর কোন অর্থই দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে যেরূপভাবে এই সিদ্ধান্তটীর বিস্তার ও প্রচার হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সুপ্রণালী-বদ্ধ একটী মতবাদ আর্য্য-ঋষিদিগের মধ্যে গঠিত হইবার চেষ্টা অতি প্রাচীনকালেই হইতেছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অল্প কারণই থাকিবে।

আর্য্যঋষিগণ সমুদ্রমন্থনবেগে প্রথম সূক্ষ্ম-ভাবে যে তত্ত্বটী উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাকে ক্রমে স্থূলভাবে বুঝাইয়া সাধারণ-গোচর করাই তাঁহাদের লক্ষ্য হইল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও এই প্রণালীতেই পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারাই বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিয়া থাকেন। আর্য্য মহর্ষিগণ সূক্ষ্মমন্থনবেগের ক্রমস্থূল পরি-ণাম অনুসরণ করিতে করিতে তেজের সঙ্গেই ইহার যোগ দেখিতে পাইলেন—সূর্য্যকে আবার এই তেজের আধার দেখিয়া ইহার নাম সূর্য্য (সৃ—ক্যপ) 'সরতি গচ্ছতি' এই অর্থে গতিশীল বা বেগশীল রাখিলেন। পৃথিবীর অগ্নিতে এই সূর্য্যেরই যেন মূর্ত্তি ইহারা দেখিলেন। ইহার যে অগ্নি নাম দিলেন, তাহাও ইহার ঊর্দ্ধগমন বা বেগই

বুঝাইতে লাগিল। ইহাকে শীঘ্রই তাঁহারা জীবনের প্রধান উপাদান বলিয়াও বুঝিতে পারিলেন, তাহাতে ইহার এক নাম অনল হইল। বায়ু এই অনল বা উষ্ণত্ব সম্পর্কেই 'অনিল' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। শ্বাস বায়ুও' উষ্ণত্ব সংযোগে জীবনরক্ষাহেতু বিশেষ রূপে 'প্রাণ' নামে অভিহিত' হইয়াছে। অপরদিকে সূক্ষ্মবাষ্প হইতে অমৃতরসই উৎকৃষ্ট পরিণাম বলিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন। এই সুধারসের স্থানও তাঁহারা চন্দ্র বলিয়া জানিলেন, তাহাতেই চন্দ্র সুধাকর নাম প্রাপ্ত হইলেন। এই সুধারস পৃথিবীতে বর্ষিত হইয়া পৃথিবীকে আর্দ্রা করিয়া থাকে। চন্দ্র কিরণ হইতেই এই সুধারস ক্ষরিত হইয়া থাকে বলিয়াই চন্দ্রের 'সুধাংশু' ও 'ইন্দু' নাম হইয়াছে। চন্দ্র এই সুধারসের দ্বারা উদ্ভিজ্জাদির পোষণ করেন বলিয়াই তিনি 'ওষধীশ' নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। উদ্ভিজ্জের মধ্যে এই সুধারস সঞ্চারিত হইয়া 'সোমরস' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চন্দ্র এই সোমরসের মূল উৎস বলিয়া ইহার এক নাম 'সোম'ও হইয়াছে। এই পার্থিব সোমরস আবার মৃতসঞ্জীবন রসরূপে যজ্ঞে পীত হওতঃ আর্য্য ঋষিদিগকে নবজীবন দান করিত। তাহাতেই তাঁহারা এইরূপে ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন যথা—"অপামসোমমমৃতা অভূম।" জীবনের মূলীভূত এই 'অগ্নি' ও 'সোম' দুইটী তত্ত্বকে ঋষিগণ জগতের সমস্ত সত্তার মূলেই আধাররূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিলেন। তখন "অগ্নীষোমাত্মকং জগৎ" বলিয়া ইঁহারা শ্রুতিতে জগতের এই মূলতত্ত্ব প্রচার করিলেন। পুরাণ ইঁহারই অনুবাদ করিয়া আরও স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিলেন "অগ্নীষোমাত্মকং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্।" লিঙ্গপুরাণ ৩৪ অধ্যায়। বেদের যজ্ঞে এই অগ্নীষোমেরই সংযোগ। সুতরাং যজ্ঞকে আমরা সৃষ্টিরই রূপক বলিয়া মনে করিতে পারি :—"Sacrifice is an imitation of the chief phenomena of the sky and the atmosphere." Vedic India by Ragozin p 388. পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-মূলতত্ত্ব Matter and Force এর সহিত "অগ্নীষোমাত্মকং জগৎ" এই শ্রুতিতত্ত্বটী মিলাইলে কি প্রাচ্যমতটীই অধিক পূর্ণ ও বিশদ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না ? এই তত্ত্বটী এরূপই সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে পরিগৃহীত হইল যে, এখন হইতে ইহাই সৃষ্টিব্যাখ্যার মূল সূত্র হইল। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সমস্ত সত্তায় এই দ্বৈতভাবেরই অনুপ্রবেশ লক্ষিত হইল। পুরাণ কিরূপ সরল ভাষায় যুক্তিপ্রয়োগ-সহকারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পূর্ব্বোক্তত্ত্বটীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়, যথা—

"বিবিধা তেজসোবৃত্তিঃ সূর্য্যাত্মাচানলাত্মিকা।
তথৈব রসবৃত্তিশ্চ সোমাত্মাচজলাত্মিকা ॥৫
বৈদ্যুতাদিময়ং তৈজোমধুরাদি ময়োরসঃ।
তেজোরস বিভেদৈস্তু তমেধৃতচ্চরাচরম্ ॥ ৬
অগ্নেরমৃত নিষ্পত্তিরমৃতেরগ্নিরেধতে।
অতএব হবিঃ ক্লৃপ্ত মগ্নীষোমং জগদ্ধিতম্ ॥৭
হবিষে শস্যসম্পত্তির্বৃষ্টিঃ শস্যাভিবৃদ্ধয়ে।
বৃষ্টয়েচ হবিস্তস্মাদগ্নীষোমধৃতং জগৎ ॥ ৮

শিবপুরাণ—বায়বীয় সংহিতা,২৪শ অধ্যায়।

তেজের নানারূপ—সূর্য্য ও অগ্নিরূপ, তদ্রূপ রসও, সোমরূপ ও জলরূপ। তেজ বিদ্যুৎপ্রকৃতিক ও রস মধুরপ্রকৃতিক। তেজ ও রস সংযোগেই চরাচর ধৃত রহিয়াছে। অগ্নি হইতে অমৃত উৎপত্তি। অমৃতদ্বারা অগ্নি বর্দ্ধিত হয়, অতএবই হবিঃ (অগ্নির জন্য)

বিহিত হয়—অগ্নীষোম জগতের হিতজনক। হবির জন্য শস্য সমৃদ্ধি হয় (শস্যসমৃদ্ধি দ্বারা হবিঃ বর্দ্ধিত হয়), বৃষ্টিদ্বারা শস্য প্রাচুর্য্য হয়। হবিঃ আবার বৃষ্টির কারণ হয়, অতএব জগৎ অগ্নীষোমদ্বারাই বিধৃত রহিয়াছে।

আধিভৌতিক সত্তায় পূর্ব্বোক্ত দ্বৈত ভাবের অনুপ্রবেশ আমরা আলোচনা করিয়াছি—এক্ষণে আধিদৈবিকসত্তায় ইহার অনুপ্রবেশ আলোচনা করিব। আমরা উপরে সূর্য্যের তেজোরূপের উল্লেখ করিয়াছি। 'ব্রহ্মপুরাণে'ইহার দেবভাবের স্বরূপে যেখানে স্তুত হইয়াছে—সেখানে অগ্নি সোমই তাহার সারভূত বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"সমেতমগ্নীষোমাভ্যাং নমস্তস্মৈ গুণাত্মনে।" ৩২।১৫। শিব রুদ্ররূপী অগ্নিরই নামান্তর বলিয়া তাঁহাতেই পূর্ব্বোক্ত অগ্নীষোমভাবের পূর্ণ সমাবেশ দেখা যায়। তদীয় স্বরূপে আমরা দুইটী ভাবের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করিয়া থাকি—একটী উগ্ররুদ্র বা ভৈরব ভাব, অন্যটী শান্ত শিব বা শঙ্করভাব। শিবের অষ্ট মূর্ত্তির মধ্যে যেমন অগ্নি একটী মূর্ত্তি, তদ্রূপ চন্দ্র (সোম) এবং জলও অপর মূর্ত্তি। এই অগ্নি মূর্ত্তিতে যেমন ভীষণ সংহার ভাব প্রকটিত, তেমনই সোম ও জলমূর্ত্তিতে মঙ্গলময় 'বরাভয়' ভাব প্রকটিত। এই প্রকারে তদীয় স্বরূপের অর্দ্ধ অগ্নিময় ও অর্দ্ধ সোমময় হওয়াতে তিনি 'অগ্নীষোমাত্মক' হইয়াছেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে মহাদেবের এই দ্বিবিধ প্রকৃতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট অতি পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা—"বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিয়া থাকেন যে, মহাদেবের মূর্ত্তি দুই প্রকার। তন্মধ্যে একমূর্ত্তি অতি ভীষণ ও অপর মূর্ত্তি মঙ্গলময়। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় আবার নানাবিধ মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ভীষণ মূর্ত্তি অগ্নি, বিদ্যুৎ ও ভাস্কর এবং সৌম্য মূর্ত্তি ধর্ম্ম, জল ও চন্দ্র স্বরূপ। মুনিগণ উঁহার শরীরের অর্দ্ধাংশকে অগ্নি ও অর্দ্ধাংশকে সোম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ১৬১ম অধ্যায় কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। এই দ্বিবিধ ভাবের মধ্যে শান্ত ভাবটী হইতে একটী অভিনব ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে যে একটী মধুর কোমল ভাবের বিকাশ হইয়াছে,তাহাই 'উমার' ভাব। সোমভাবই উমাভাবের মূল—তাহাতেই 'সহ উময়া' (উমার সহিত) সোম শব্দের এরূপ ব্যাখ্যাও প্রচলিত আছে। এই উমাভাবে একদিকে যেমন রমণীয়, কমনীয় স্ত্রীভাব-সূচিত, তদ্রূপ অপরদিকে স্নিগ্ধ বৎসল মাতৃভাবও সূচিত। পৃথিবীতে আমরা দেখিয়া থাকি, পিতা জন্মদান করেন বটে, কিন্তু গর্ভধারণ ও পোষণের দ্বারা মাতারই সংস্রব সন্তানের সহিত সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং মাতাতেই সন্তান সমস্ত কর্ত্তৃত্বের আরোপ করিতে অভ্যস্ত হয়—এমন কি, সন্তান সমস্ত শান্তির আধারও মাতাতেই দেখিতে পায়। তাহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেই শিশুসন্তান মায়ের আঁচল আশ্রয় করিয়াই আপনাকে নিরাপদ মনে করে এবং কোন অন্যায়ের প্রতীকার করিবার জন্য 'মাকে বলিয়া দিব' বলিয়া অন্যায়কারীকে শাসাইয়া থাকে। ইহা দেখা যায় যে,যত দিন নারী সন্তানের মাতা না হয়, তত দিন তাহার সত্তা স্বামীতেই নিমজ্জিত থাকে—কিন্তু সন্তানের মাতা হইলেই তাহার স্বাতন্ত্র্য প্রখ্যাপিত হয়—তখন তিনি প্রকৃত গৃহিণী হন—তখন সংসারে তাঁহারই আধিপত্য হয়। পূর্ব্বে আমরা শিবভাবের মধ্যে যে স্ত্রীভাবের অনুবন্ধ দেখিয়াছি, তাহার

বিকাশ ঠিক্ উপরে প্রদর্শিত স্বাভাবিক ক্রমানুসারেই হইয়াছে। প্রথম 'গৌরী'রূপে উমা শিবেরই অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া শিবের 'হরগৌরী'-রূপে তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে মিলিত রহিয়াছেন। কিন্তু যখন তিনি কার্ত্তিকেয়-গণেশ-জননী দুর্গামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন দশপ্রহরণধারিণী হইয়া তিনি শিব হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; শিব এখন অলক্ষিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কালী-মূর্ত্তিতে শিব একেবারে পদতলে শায়িত। এই সকল মূর্ত্তিতে আমরা সৃষ্টির এই গূঢ় মর্ম্মই উপলব্ধি করিতে পারি যে, এই সমস্ত মূল তত্ত্ব দুইটীর পরস্পর এরূপই অবিচ্ছিন্ন অঙ্গাঙ্গিভাব রহিয়াছে যে, কোনটীকেই প্রধান বলা যায় না, উভয়টীই স্বস্ব প্রধান—সুতরাংই কখন বা অগ্নি উপরে স্থান পাইতেছেন—কখন বা সোম উপরে স্থান পাইতেছেন। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই অগ্নীষোমরূপে মূলতত্ত্ব দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়ায় যেমনই অগ্নিধারা সোম অধিষ্ঠিত, তদ্রূপ সোমের দ্বারাও আবার অগ্নি অধিষ্ঠিত। অগ্নি সোমের এই নিত্যসাপেক্ষ ভাবের উপরই যে উমামহেশ্বরের পূর্ব্বোক্ত নিত্য সম্বন্ধ ভাব ও পরস্পরাধিষ্ঠান ভাব প্রতিষ্ঠিত, তাহা পুরাণকারের বর্ণনায় অতি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে যথা—

"অহমগ্নির্মহাতেজাঃ সোমশ্চৈবা মহাম্বিকা। ৭

লিঙ্গপুরাণ ৩৪শ অধ্যায়।

'আমি মহাতেজঃ সম্পন্ন অগ্নি আর মহতী অম্বিকা (উমা) সোম।'

"অগ্নিরূর্দ্ধং জলত্যেষ যাবৎ সৌম্যং পরামৃতম্।
যাবদগ্ন্যাস্পদং সৌম্যমমৃতঞ্চ স্রবত্যধঃ॥ ৯
অতএবহি কালাগ্নিরধস্তাচ্ছক্তিরূর্দ্ধতিঃ।
আবর্ত্তা দহনক্রোর্দ্ধমধশ্চাপ্লাবনং ভবেৎ॥ ১০
আধারশক্ত্যেব ধৃতঃ কালাগ্নিরয় মূর্দ্ধগঃ।
তথৈবনিম্নগঃ সোমঃ শিবশক্তিপদাস্পদঃ। ১১
শিবশ্চোর্দ্ধমধঃ শক্তিরূর্দ্ধং শক্তিরধঃ শিবঃ।
তদিত্থং শিবশক্তিভ্যাং নাব্যাপ্তমিহকঞ্চন। ১২"

শিবপুরাণ—বায়বীয় সংহিতা ২৪শঅধ্যায়।

ইহার স্থূল মর্ম্ম ইহাই বুঝায় যে অগ্নি সোমের ন্যায় শিব শক্তি বা উমা মহেশ্বরের দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হওয়াই তাঁহাদের পরস্পর উর্দ্ধাধোভাবের কারণ।

এখানে উমাকে শিবের শক্তি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শক্তি স্বরূপিনী হইয়া তিনি এক্ষণে অপূর্ব্ব মহিমা ধারণ করিয়াছেন—শিব একেবারেই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছেন। উমাই এক্ষণে কর্ত্রী হইয়াছেন ও শিব উদাসীন হইয়াছেন। এই শক্তির পূর্ণবিকাশেই এক্ষণে সৃষ্টি পূর্ণরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মহাদেবে যে সৃষ্টিশক্তির অঙ্কুর ছিল, তাহাই এক্ষণে উমাতে পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে। মহাদেব এক্ষণে নির্লিপ্তবৎ অবস্থিত রহিলেও শক্তি তাঁহারই বলিয়া, তাঁহারই সাক্ষাতে ব্যতীত ইহার যে স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, তাহা দেখাইবার জন্যই যেন তাঁহারই সম্মুখে নৃত্য করিয়া তিনি 'নৃত্যকালী' হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহাকে সৃষ্টিলীলা প্রদর্শন করিয়া চরিতার্থ হইবার জন্যই যেন ইঁহার দৃষ্টি কেবল তাঁহারই প্রতি আবদ্ধ। এই অসীম শক্তির উৎপত্তি যেমন মহাদেবে, তাঁহার শেষ বিশ্রামও মহাদেবে, তাহারও প্রমাণ এই যে,মহাদেবই সৃষ্টির সংহারকর্ত্তা। তিনি যখন সৃষ্টি আপনাতে উপসংহৃত করিবেন, তম্মূলীভূত শক্তিও যে সঙ্গে সঙ্গে উপসংহৃত করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই শক্তি তত্ত্বের প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য শক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিলে ইহার সারবত্তা আরও অধিক উপলব্ধি হইবে বলিয়া আমা-

দের বিশ্বাস। পাশ্চাত্য মতে শক্তির বৈজ্ঞানিক নাম Energy। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই শক্তিই মূল—ইহারই প্রভাবে সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির বিকাশ হইতেছে। এই শক্তি আবার বিশ্বের পরা শক্তি বলিয়া ইহার অলৌকিক লক্ষণ এই যে, যদিও ইহার নিত্য ক্রিয়া হইতেছে, তথাপি কখনও ইহার কোনও অপচয় হয় না—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহার নাম হইয়াছে Conservation of Energy। আমাদিগের বিশ্বসৃষ্টি বিধায়িনী 'শক্তি' ও 'আদ্যাশক্তি' নামে পরিচিতা, ইঁহাও পাশ্চাত্য-শক্তিরই ন্যায় নিত্য ক্রিয়াশীল হইয়াও 'অব্যয়'। এই তুলনাদ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, পাশ্চাত্য নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য আমাদিগের শাস্ত্রে বহু পূর্ব্বেই ঋষিদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে।

উপরে শক্তিতত্ত্বের যে বিবরণ আমরা প্রদান করিয়াছি, তাহাই যে সাংখ্যদর্শন মতের আদি, একটু অনুধাবন করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব। শক্তিই সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি এবং মহাদেবই সাংখ্যদর্শনের 'পুরুষ'। প্রকৃতিতেই সমস্তকর্তৃত্ব নিবদ্ধ * এবং তৎসহযোগেই সংসার প্রবর্ত্তিত, পুরুষ উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট। প্রকৃতি নাট্যাভিনয় নিযুক্তা পুরুষ প্রেক্ষক। পুরুষের চৈতন্য দ্বারা প্রকৃতির কর্তৃত্ব উপসংহৃত হইলেই সংসার নিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং পুরুষও মহাদেবেরই ন্যায় সৃষ্টি সংহারকই বটেন। শক্তিকে আমরা 'আদ্যাশক্তি' বলিয়াছি—প্রকৃতিও তেমনই 'মূল প্রকৃতি' বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকে। শক্তিতত্ত্ব হইতেই যে সাংখ্যমতের উৎপত্তি হইয়াছে, পুরাণ তাহারও প্রমাণ দিয়া থাকে—যথা—"অহমগ্নিশ্চ সোমশ্চ প্রকৃত্যা পুরুষঃ স্বয়ম্॥" ৭ লিঙ্গপুরাণ ৬৪শ অধ্যায়।

'অগ্নিও আমি, সোমও আমি; এবং প্রকৃতির সহিত স্বয়ং পুরুষও আমি।'

কোন পুরাণে মহাদেব স্পষ্ট সাংখ্যদর্শনরূপে ও তদগ্রণী রূপে স্তুত হইয়াছেন, যথা—

"সাংখ্যায় সাংখ্যমুখ্যায় যোগাধিপতয়ে নমঃ॥" ৩৬ ব্রহ্মপুরাণ ৪০ অধ্যায়।

এ পর্য্যন্ত আমরা কেবল ত্রিমূর্ত্তির একতম মহেশ্বরের সহিত সৃষ্টি ব্যাপার সংযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমরা অপর দুই মূর্ত্তির সহিত সংযোগের বিষয়ও আলোচনা করিব। এই দুই মূর্ত্তি বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি। বিষ্ণু সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্তা রূপে প্রসিদ্ধ। হরিবংশে বিষ্ণু সোম ও মহাদেব অগ্নিস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—যথা—"রুদ্র অগ্নিময় এবং বিষ্ণু সোমাত্মক বলিয়া স্তুত হন, এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সেই অগ্নিসোমাত্মক।" বিষ্ণুপর্ব্ব ১৮১ম অধ্যায়—বঙ্গবাসীর অনুবাদ। সোমরসের দ্বারাই সমস্তের পোষণ হয়—সুতরাং বিষ্ণু রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া যে সোমরূপে বর্ণিত হইবেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই বোধ হয়। শাস্ত্রে আমরা বিষ্ণুর দুইটীরূপ দেখিতে পাই, একরূপে তিনি 'হিরণ্ময় বপুঃ,' অন্যরূপে তিনি 'নবদূর্ব্বাদলশ্যামতনু।' তাঁহার স্বর্গের রূপ হিরণ্ময়রূপ * আর মর্ত্ত্যের রূপ নবজলধর শ্যামরূপ।† রসের দ্বারা যেমন জগতের পুষ্টি হয়, তেমনই আবার সূর্য্যরশ্মিদ্বারা জগৎ উজ্জীবিত হয়, তাহাতেই সূর্য্য 'সবিতা' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন,

* "প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ।" সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করেন বলিয়াই "প্রকৃতি" এই যোগার্থই তাহার প্রমাণ।

* "ধ্যেয়ঃসদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্ময় বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।"

† "নূতন জলধররুচয়ে গোপবধূটী দুকূলচৌরায়।
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসার মহীরুহস্য বীজায়॥"

কারণ তিনিই জগতের প্রকৃত প্রাণদাতা। ('জগৎ সবিতা' যথা জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে ইত্যাদি মন্ত্রে)। সুতরাং বিষ্ণু সূর্য্যরূপে স্বর্ণকান্তিধারী কিন্তু মর্ত্ত্যে তদীয় রশ্মি সংযোগে রস হরিৎবর্ণতা * সম্পাদিত হইয়া পোষণোপযোগী হয় বলিয়া হরিৎবর্ণ বা শ্যামবর্ণ যেমন পুষ্টির চিহ্নরূপে প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপ হইয়াছে, তদ্রূপ জগৎ পোষণকারী বিষ্ণুরও রূপ হইয়াছে। এই বিষ্ণুর মধ্যে তেজঃ ও রস উভয় ভাবেরই সমাবেশ হইয়াছে, আমরা দেখিতে পাইলাম। যজ্ঞেও এই উভয়রূপেই সম্মিলন হইয়াছে, আমরা দেখিয়াছি—সুতরাং বিষ্ণুও শাস্ত্রে 'যজ্ঞমূর্ত্তি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন,যথা—"যজ্ঞোবৈবিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতিঃ। অভিধনেও যজ্ঞ শব্দ বিষ্ণুবাচক পাওয়া যায়—যথা—যজ্ঞঃ স্যাদাত্মনিমখে নারায়ণ-হুতাশয়োরিতি হৈমঃ।

এক্ষণে আমরা ব্রহ্মামূর্ত্তির বিষয় আলোচনা করিব। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে বিদিত। তৎকৃত সৃষ্টি ব্যাখ্যার বর্ণনায়ও পূর্ব্বোক্ত অগ্নীষোম তত্ত্বই অনুসৃত দেখা যায়, যথা—

"ব্রহ্মতেজোময়ং শুক্রং যস্য সর্ব্বমিদংরসঃ।
একস্যভূতং ভূতস্যদ্বয়ং স্থাবরজঙ্গমম্॥"

শব্দকল্পদ্রুমধৃত মহাভারত মোক্ষধর্ম্ম।

ব্রহ্মতেজই শুক্রস্বরূপ, এবং দৃশ্যমান সমস্ত রসস্বরূপ। উভয়ের যোগে চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মা যে মূলে অগ্নি দেবতা, তাহা অগ্নি মূর্ত্তিরূপে তাঁহার পূজা হইতেই প্রমাণিত হয়। বেদে সৃষ্টির যে বিবরণ পাওয়া যায়,তাহাতেও তাঁহার অগ্নি প্রকৃতিই স্পষ্ট রূপে লক্ষিত হয়—যথা—"ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোহধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোঅর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঅজায়ত—অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথোস্বঃ॥" উদ্ধৃত বর্ণনাটী যে ব্রহ্ম সৃষ্টিবিষয়ক, তাহা ধাতাশব্দ দ্বারাই প্রতিপাদিত হইতেছে। কারণ 'ধাতা'শব্দ অভিধানে বিশেষরূপে 'ব্রহ্মবাচী। এখানে উদ্ধৃতপঃ হইতেই সমস্ত সৃষ্টি প্রসূত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই 'তপঃ দ্বারা আমরা অগ্নির সূক্ষ্মাবস্থা তাপ বা তেজ বুঝিলেই সুন্দর অর্থসঙ্গতি হয়। পাশ্চাত্য শক্তি অর্থাৎ Energyর যে প্রকৃতি, ইহাও আমাদের নিকট সেই প্রকৃতির বলিয়াই মনে হয়। "প্রথম এই তাপ প্রকাশিত হইলে তাহা হইতে ঋত অর্থাৎ বিশ্ববিধান, তৎপর সত্য অর্থাৎ সমস্ত উৎপন্ন হইল, কিন্তু এই সমস্তই তখনও তমসাচ্ছন্ন রহিল, এই অন্ধকারের মধ্যে বাষ্পসমুদ্র উৎপন্ন হইল, ইহার পর চন্দ্র সূর্য্য উৎপন্ন হইয়া রাত্রি দিন কাল বিভাগ হইল, তাহার পর পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ প্রভৃতি উৎপন্ন হইল।" ইহাই পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টি বর্ণনার মর্ম্ম। আমরা সমুদ্র মন্থনে যে বাষ্প রাশির আবর্ত্তন হইতে বিবিধ সৃষ্টির বর্ণনা পাইয়াছি, —এখানের বর্ণিত 'সমুদ্রে'ও যেন সেই বাষ্প রাশিরই কথা পাইতেছি এবং আমরা বষ্পরাশিতে যে বেগ সংযোগের উল্লেখ করিয়াছি —এখানেও তাপই যেন বাষ্পরূপ সমুদ্রে সেই বেগ সঞ্চালিত করিয়াই তাহা হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীর সৃষ্টি করিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

হিন্দুর দর্শনও এই তত্ত্বটীকে নিত্য জ্যোঃতিঃস্বরূপ" বর্ণনা করিয়াছে, যথা—

* এই হরিৎবর্ণ রস Chlorophyl নামে পরিজ্ঞাত।

"সাংখ্যো বদন্তি তংদেবং জ্যোতীরূপং
সনাতনম্।
যোগিনো যংবদন্ত্যেবং জ্যোতীরূপং
সনাতনম্ ॥"
শব্দকল্পদ্রুমধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ১২৮ম অঃ।

এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ সমস্ত জ্ঞানেরই আধার, সুতরাং ইহা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ। গায়ত্রীতে ইহারই ধ্যান করিতে হয় বলিয়াই গায়ত্রীর এত মাহাত্ম্য।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

স্বাধীনতা। *

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আসি ?
ছিলি নাকি ট্রান্সভালে, কোন দিন কোন কালে,
কিম্বার্লী জোহান্সবার্গে হীরা সোণা ঢালি ?
নীরক্ত বুয়ার বুক, নাহি তেজ একটুক,
ক্রুগার আগার আজ প্রিটোরিয়া খালি !
সে দেশ ছাড়িলি তাই, সেখানে আদর নাই,
তোর কি আদর জানি আমরা বাঙ্গালী ?
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আসি ?

২

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আসি ?
সে দিন লক্ষ্মণ সেন, মুখে উঠে রক্ত-ফেন,
সতর সিপাই হাতে তোরে দিল ডালি !
খিলিজি দাসের দাস, সে দিল গলায় ফাঁস,
আজিও জগৎ যুড়ে দেয় গালাগালি !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আসি !

৩

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আসি ?
'যুটে ক'টা বনমেষ, বিসর্জ্জিল অবশেষ,
পশুর ঘৃণিত হেয় ক'রে চতুরালী,
হায় সে পাপীর লোভে, নরকে বাঙ্গলা ডোবে,
বাঙ্গলার ইতিহাসে মাখিয়াছে কালী !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আসি ?

৪

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আসি ?
নূতন আলোক মুখে, নূতন আনন্দ বুকে,
নূতন নূতন ভাবে কুটীর ভাসালি !
নূতন নূতন আশা, নূতন নূতন ভাষা,
নূতন এ কাঁদা হাসা কোথা ইহা পালি ?
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আসি ?

৫

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আসি ?
যুগ যুগান্তের পরে, আসি বাঙ্গালীর ঘরে,
চঞ্চল পতাকা খানি অঞ্চলে উড়ালি !
কোথা অমরিকা দেশ, সাগরের সীমা শেষ,
আনন্দে ব্রেজিল দেয় ব্রেভো—করতালি ?
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আসি ?

৬

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আসি ?
কোথা ছিলি এত দিন, তুরুষ্ক পারস্য চীন,
সবারি ফিরেছে দিন দেখি আজি কালি !
যে দেশে আসিলি নেচে, সকলি উঠিল বেঁচে,
ফিলিপাইন কিউবা সে কত ভাগ্যশালী !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আসি !

৭

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আসি ?
আমরা নেশায় ভোর, কি বুঝি সম্মান তোর,
দারোগা ডিপুটী মোরা পেলু আরদালী !
ক'—রে সে দেশের কথা, সে আদর সে মমতা,
কেমন জার্ম্মেণ ফ্রেন্স বৃটন্ ইটালী !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আসি ?

* বয়স ৩ বৎসর। ইহার ডাক নাম 'মাতী', সোহাগের নাম 'সোণার কুচি' পোষাকী নাম 'স্বাধীনতা'।

৮

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
ও মোর 'সোণার কুচি', পবিত্র সরল শুচি,
ও মোর মাণিক 'মাকা' মায়ের দুলালী,
কোথা কোন্ রণভুঁই, মাড়ায়ে আসিলি তুই,
কোথারে রুধির রাঙ্গা চরণে মাখালি !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

৯

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
তুই ছুঁলে তৃণ কুটা, সে যে হয় সোণা মুঠা,
দেখিনিরে তোর মত হেন ইন্দ্রজালী !
তুই দিলে ভস্ম-ছাই, কোহিনুর হাতে পাই,
কাঞ্চন কৌস্তভ হয় মাটী ধূলা বালি !
ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?

১০

ও আমার স্বাধীনতা কোথা হতে আলি ?
আবার নাচ্‌রে ছুটে, রঙ্গিনী সঙ্গিনী যুটে,
নীলগিরি হিমকূটে কর কালাকালি !
চরণের তলে শব, ভুলি মৃত্যু পরাভব,
জাগুক দীনের দীন অধীন বাঙ্গালী,
রণ রণ ঝন ঝন ঘন করতালি !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

প্রাতঃস্মরণীয়া দয়াময়ী।

স্বর্গীয়া দয়াময়ী চৌধুরাণী মহোদয়া টাঙ্গাইল মহকুমার পরগণা কাগমারীর।/০ আনা হিস্যাব জমিদার ৬ কালীনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। এই মহীয়সী মহিলা ফরিদপুরান্তর্গত ধীপুর গ্রামবাসী ৬ রামকান্ত বসু মহাশয়ের কন্যা। জন্ম সময় নিশ্চয় নির্দ্ধারণ করা কঠিন। ঘটনা পরম্পরা যতদূর অবগত হইতে পারা যায়, তাহাতে ১১৯০—১২০০ সনের মধ্যে দয়াময়ীর জন্ম। অতি শৈশবে বিবাহ এবং ৯ বৎসর বয়সেই বৈধব্য সংঘটিত হয়। দয়াময়ী নিরন্ন পিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং ভগবানের কৃপায় মধ্যবিৎ পিতার গৃহ হইতে এক অতি উচ্চ প্রাচীন ধনী পরিবারে পতিত হইয়াছিলেন। উচ্চবংশ ও বিভবে যাহাদের স্থান, সংসারে তাঁহারা স্বভাবতঃ অতি উদার প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। ভগবান দয়াময়ীকে যেমন এক বিপুল সংসারে অগাধ ধনের অধিশ্বরী করিয়া পঠাইয়াছিলেন, তেমনি তাঁহাকে ধনের যথোপযোগ্য ব্যবহারও শিক্ষা দিয়াছিলেন। দয়াময়ী বয়স্থা হইয়া জমিদারী এবং বংশরক্ষার জন্য প্রথমতঃ শিবনাথ রায় মহাশয়কে দত্তক গ্রহণ করেন। কিম্বদন্তী শিবনাথকে বিভিন্নচিত্রে চিত্রিত করিয়াছে। শিবনাথ অল্প বয়সেই চরিত্রহীন হইয়া উঠেন। মাতা নানা উপায়ে তাঁহার সংশোধনের চেষ্টা করিয়াও কোন ফল প্রাপ্ত হন নাই। মদ্যাশক্তিই শিবনাথের কলঙ্ক ছিল। যে স্থানে মদিরা, সেই স্থানেই নানারূপ অত্যাচার ও ব্যভিচার। কোন চেষ্টাতেই যখন শিবনাথকে সৎপথে আনা গেল না, মাতা তখন নিরুপায় হইয়া, এহেন সন্তান বংশের কলঙ্ক মনে করিলেন। বংশধারা ও সংসারের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার সঙ্কল্প মনে রাখিয়া দয়াময়ী ঢাকাস্থিত তদানীন্তন Provincial Courtএ শিবনাথ প্রকৃত দত্তক ও ভূম্যধিকারী নহেন বলিয়া তাঁহাকে "নাকোচ" করিবার জন্য প্রার্থনা করেন।

এই সময় সুঁকস্তাইল নিবাসী ৺ব্রজরাম গুপ্ত মহাশয় ।/০ আনী সরকারের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। এই মোকদ্দমায় শিবনাথের তলব হয়। মোকদ্দমা শুনানীর দিনও, কাছারি যাইবার পথে, শুণ্ডিকালয়ে প্রচুর মদ্যপান করিয়া একরূপ জ্ঞানহীন অবস্থায় শিবনাথ বিচারালয়ে উপস্থিত হন। বাদিনীর বর্ণনা ও শিবনাথের তদানীন্তন অবস্থা দৃষ্টে বিচারপতিগণ একান্ত দুঃখিতচিত্তে শিবনাথের বিরুদ্ধেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। শিবনাথ ঢাকা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অল্পদিন মধ্যেই দেশত্যাগী হন। ইহার পর তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, শিবনাথ ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। পূজার্চ্চনায় তান্ত্রিকোক্ত প্রথাবলম্বন করায় শাক্ত মাতা শিবনাথকে "নাকোচ্" করিতে প্রয়াস পান। যাঁহারা শিবনাথকে বীরাচারী বলেন, তাঁহারা তাঁহাকে একান্ত সাধক ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ইঁহাদের মতে শিবনাথ অতি সদাশয় দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। যোগ্য ব্যক্তিকে দান করা, বিপন্নের সাহায্য করা, অন্নহীনে অন্নদান করা, তাঁহার জীবনের প্রধান এক সুখ ছিল। সাধনাবলে তিনি নানারূপ বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটন করিতে পারিতেন। এরূপ শুনা যায়, একদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া শিবনাথের নিকট ভিক্ষার্থী হয়। ব্রাহ্মণের সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন। পুত্র মাতাকে বলিলেন—"আমাকে হাজার টাকা দিতে হইবে, আমি ব্রাহ্মণের কন্যা-দায় মোচন করিব।" মাতা অস্বীকার করায়, শিবনাথ নাকি অভিমানে জীবন পরিত্যাগের অছিলায় এক পুকুরে ডুব দিয়া অনেক সময় অদৃশ্য হইয়া থাকেন। শিবনাথ বুঝি এতক্ষণ জীবিত নাই, মনে করিয়া শোকাকুলিত হইয়া মাতা তাঁহার অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করেন। পরে তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করেন এবং ব্রাহ্মণও কন্যাদায়মুক্ত হয়। শিবনাথ দত্তক নহেন, প্রমাণিত হইয়া, পেরুয়া চাক্‌নার জমিদারীতে গমন করিয়াছিলেন। সে স্থানে কোন ব্যক্তির অসঙ্গত ব্যবহারে রাগান্ধ হইয়া তাহাকে হত্যা করেন এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন। এ বিপদ হইতে শিবনাথ মাতা দয়াময়ীর চেষ্টায় অব্যাহতি প্রাপ্ত হন। অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়া শিবনাথ পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া যান। কালক্রমে দয়াময়ী যখন গৃহত্যাগ করিয়া ৺কাশীবাস করিতে গমন করেন, তখন আবার শিবনাথ মাতৃ সকাশে আগমন করিয়া তাঁহারি পাদমূলে বসিয়া সুপুত্রের ন্যায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। শিবনাথ চিরদিনের জন্য সন্তোষ পরিত্যাগ করিলে পর দয়াময়ী অলোয়াভবানী গ্রামস্থিত জ্ঞাতি নিয়োগী পরিবারের একটী সন্তানকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইনিই ।/০ হিস্যার বর্ত্তমান জমিদার সুকবি এবং সুবক্তা শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মহোদয়গণের পিতামহ—।/০ ভৈরব নাথ রায়। সতীসাধ্বী মাতা পুত্র শিবনাথের চরিত্রহীনতায় একান্ত ব্যথিত চিত্তে আদালতে দত্তক অসিদ্ধ করিবার জন্য যে বর্ণনা দাখিল করেন, তাহাতেই দয়াময়ীর তাৎকালীন হৃদয়ের ভাবের সম্যক আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবেদন পত্রে ছিল—"আমার দত্তক গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। যে সময় আমি বিধবা হই, সে সময় দত্তক গ্রহণ করিবার অধিকার জন্মে নাই।" চৌধুরাণী মনে করিয়াছিলেন,—শিবনাথের ন্যায় দত্তক

না থাকাই ভাল; শিবনাথের ন্যায় দত্তক দ্বারা বংশরক্ষা অপেক্ষা বংশলোপ সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর। পবিত্রতাতে দয়াময়ীর কত শ্রদ্ধা ছিল, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যেই আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু দয়াময়ীর এই কার্য্যের ফল ভবিষ্যতে শুভপ্রদ হয় নাই। শিবনাথের তাড়িত হইবার পর দয়াময়ী যখন ৺ভৈরবনাথ রায় মহোদয়কে দত্তক গ্রহণ করেন, তখন ।৶০ হিস্যার তদানীন্তন জমিদার গোলকনাথ রায়চৌধুরী মহোদয়, দয়াময়ী দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়া Supreme Courtয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়া দয়াময়ীর শিবনাথকে "নাকোচ" করিবার মোকর্দ্দমার বর্ণনা দাখিল করিয়া দিয়া নিজকেই ।/০ হিস্যার জমিদারীর আসন্ন উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করেন। এইবার দয়াময়ীর নিজ অপরিণামদর্শিতার ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দয়াময়ীর পূর্ব্বোক্ত কার্য্যেও আমরা ভগবানের অঙ্গুলি-তাড়নাই দেখিতে পাইতেছি। মানব সমাজে লোক-শিক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে মহাজনগণ জন্মগ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্তদ্বারা সংসারের পঙ্কিলতার প্রতি সাধারণের ঘৃণার উদ্রেক করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান ঘটনায়ও ইহার এক অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সংঘটিত হইতে আমরা দেখিতে পাই। এক দিকে যেমন ৺গোলকনাথ,অন্যদিকে তেমনি ৺কমললোচন, স্বার্থ এবং পরার্থের দুইটী অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। এই বিপদের সময় সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর এক অদ্ভুত উপায়ে কাগমারীর অন্যতর ভাবী উন্নতিস্থল ।/ আনীর ভবিষ্যদ্বংশীয় জমিদার মহোদয়দিগের সংসার রক্ষার উপায় বিধান করেন। দয়াময়ীর ভাগিনেয় কমললোচন চৌধুরী মহাশয় এই বিপদের সময় ব্যক্তিগত মহত্ত্বের যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, সংসারে তাহার তুলনা নাই। কমল যখন দেখিলেন, মাহামহ বংশ ও ঐশ্বর্য্য লোপ পাইতে চলিয়াছে, তখন আর তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার সমক্ষেই কি তাঁহার মাতুল-গৃহে সান্ধ্য প্রদীপ জ্বলিবে না? এ চিন্তা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি Supreme-courtয়ে এক প্রতি-দরখাস্ত দাখিল করিয়া স্বয়ং ।/০ আনীর আসন্ন উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করিলেন। ৺গোলকনাথের দাবী অগ্রাহ্য হইল। এদিকে আবার "মৃত্যুর সময় মাতুল তাঁহার বংশরক্ষার জন্য আমাকে দত্তক রাখিয়া দিতে অনুমতি করিয়া গিয়াছেন," বলিয়া কমল এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া ভৈরবনাথকেই তাঁহার মাতুলের দত্তকরূপে স্থিরতর রাখিলেন। দয়াময়ী, ভাগিনেয়ের এরূপ উদার মহৎহৃদয়ের দৃষ্টান্তে বিস্মিত হইলেন, এবং কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে কমলকে জমিদারী পোগল-দিঘী অঞ্চল দান করিতে অভিলাস প্রকাশ করেন। কিন্তু কমল সংসারে শরা থানার ন্যায় সঙ্কীর্ণ হৃদয় লইয়া জন্মেন নাই। তাঁহার হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত উদার ছিল বলিয়া, তিনি এ দান প্রত্যাখ্যান করিলেন। বলিলেন,—"আমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি মাত্র। আমার মাতুলের গৃহে সান্ধ্য-প্রদীপ জ্বলিবে, তাহাতে আমি যত সুখী, নিজে বড় লোক হইলে আমি তাহার শতাংশের একাংশও সুখী হইব না।" আমরা সামান্য ২।১ কথায় কমললোচনের ত্যাগ-স্বীকারের কথা প্রকাশ করিলাম বটে, কিন্তু যখন মনে করি, বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা মুনাফার জমিদারী কমল নির্ব্বিকার-চিত্তে অবাধে অগ্রাহ্য করিলেন, তখন মনে হয়, কমল বুঝি এ সঙ্কীর্ণ পাঁপ সংসারের

জীব ছিলেন না ? এ ত্যাগ-স্বীকার পাশ্চাত্য জগতের দুন্দুভি-ঘোষিত Sir Sydney Smithএর ত্যাগ স্বীকার অপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নহে কি? Supreme-courtএর মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সঙ্গে সঙ্গেই দয়াময়ীর বিপদ একরূপ কাটিয়া গেল। দয়াময়ী শান্তি লাভ করিয়া তাঁহার দেবচরিত্রানুরূপ ধর্ম্মাচরণে জীবন ও অর্থ নিয়োগ করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন। এই সময় দয়াময়ীর ব্যবহার প্রকৃতই দয়াময়ীর নামের সার্থকতা সম্পাদন করে। দয়াময়ীর দেবচরিত্রে আন্তরিকতা এক বিশেষত্ব ছিল। তিনি যাহাই করিতেন, তাহাতেই তাঁহার আন্তরিকতা ফুটিয়া বাহির হইত। দেবদ্বিজে প্রীতি, দরিদ্রে অন্নদান, ধর্ম্মাচরণ ও কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহার বৈধব্যের বিশেষত্ব ছিল। বঙ্গগৃহ সৌন্দর্য্য, পুণ্য এবং প্রেমে মধুর ও পবিত্র করিবার জন্যই ললনা-কুল-রাণী বঙ্গরমণীদিগের আবির্ভাব। ভারত-ললনা-কুলের ন্যায় গভীর প্রেম-ভক্তি-পুণ্য-পবিত্রতা ও আত্মবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে অন্য কোন দেশের মহিলা-সমাজ এ পর্য্যন্তও সক্ষম হন নাই। দয়াময়ীর স্ত্রী-প্রকৃতি গৃহে সঙ্কীর্ণ শুন্যাবাসে সন্তুষ্টি লাভ না করিয়া,সমস্ত সমাজ পুণ্য,প্রেম ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া ধন্য হইয়া এবং ধন্য করিয়া গিয়াছেন। দয়াময়ী তদানীন্তন দুর্গম পথ পর্য্যটন করিয়া ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যে তীর্থেই দয়াময়ী যাইতেন, সেই স্থানেই পূজার্চ্চনা, দান-ধ্যানে লোকদিগকে স্তম্ভিত করিতেন। শ্রীক্ষেত্রে, কামাখ্যায়, চন্দ্রনাথে এবং বারাণসী ক্ষেত্রে তিনি যেরূপ ব্যয় বিধান করিয়াছিলেন, তৎকালে সেরূপ আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। যে তীর্থে তিনি গিয়াছেন, সেই স্থানেই দেবোদ্দেশে বহুমূল্যবান ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, দয়াময়ী শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ পর্য্যটনে যাইয়া তথাকার তদানীন্তন পাণ্ডা-দিগকে বার্ষিক ৩৫০্ টাকা আয়ের সম্পত্তি মাত্র ৬০্ টাকা জমায় দান করিয়াছিলেন। অতঃপর দয়াময়ীর পুত্রবধূ বর্ত্তমান ভূম্যধিকারী মহোদয়দিগের পিতামহী ৺গৌরমণি চৌধুরাণী মহোদয়া যখন শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন, তখন উক্ত সম্পত্তির জমা ৬০্ টাকার স্থলে ৬্ টাকায় ধার্য্য করিয়াছিলেন। এই সম্পত্তির কিয়দংশ পাণ্ডাগণ বর্ত্তমান ভূম্যধিকারীদিগের পিতা স্বনামধন্য জমিদার ৺দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মহোদয়ের নিকট দশ সহস্র টাকা মূল্যে বিক্রয় করে। এখনও অবশিষ্টাংশ হইতে পাণ্ডাগণ বার্ষিক প্রায় ১৫০্ দেড়শত টাকা উপস্বত্ব পাইতেছে। এই বিক্রয়-মূল্য হইতেই দয়াময়ীর দত্ত সম্পত্তির তায়দাদ ও ধর্ম্মসম্বন্ধে আন্তরিকতা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কেবল ইহাই নহে—দয়াময়ী তাঁহার গুরুদেব শান্তিপুর-নিবাসী গোস্বামী প্রভুদিগকে বার্ষিক সাত হাজার টাকা উপস্বত্বের জমিদারী দান করিয়া গিয়াছেন। এরূপ বৃহৎ দান, ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকিলেই সম্ভব, অন্যথা নহে। দয়াময়ীর দত্ত নাখেরাজ, পীড়পান ইত্যাদির উপস্বত্ব হইতে আজও অনেক দেব দেবীর সেবার্চ্চনা হইতেছে। কাগমারীবাসী অনেক ব্রাহ্মণদিগের গ্রাসাচ্ছাদন জন্য দয়াময়ী প্রচুর ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানেও এই ব্রহ্মোত্তরই অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের একমাত্র উপজীবিকা। দানে দয়াময়ীর কোন দিনও সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল না। বঙ্গদেশের মহিলাসমাজ

ধর্ম্মজগতে অতুলনীয়া। ইহাদের মত সরল বিশ্বাসী প্রাণী জগতে দুর্লভ। বিশ্বাস বিষয়ে বঙ্গরমণীকুল সংসারে বরণীয়া। প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা-কুল রাণী দয়ামরী তাঁহার দৈনিক পূজার্চ্চনায় কথঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়া ছিলেন। সমাজ-প্রচলিত শিবপূজা ব্রত নিয়মাদিতে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকা সত্বেও তিনি কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে প্রাতঃস্নান করিয়া পূতঃদেহ-মনে যখন প্রগাঢ় স্থৈর্য্যের সহিত মনন করিতেন এবং ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইতেন, তখন তাঁহার আকৃতি দেখিয়া কেহই বিস্মিত না হইয়া পারিত না। তাঁহার বদনমণ্ডলে কি এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইত, যে দেখিত, সে-ই স্তম্ভিত হইত। প্রায় এক প্রহর কাল মনন করার পর দৈনিক শিব পূজাদি নানা উপচারে সমাধা করিয়া তবে সংসারের কার্য্যে নিযুক্তা হইতেন। সাংসারিক কোন বাধা বিঘ্নই দয়াময়ীর দৈনিক পূজার্চ্চনার বিঘ্ন ঘটাইতে পারিত না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দয়াময়ীর প্রত্যেক কার্য্যেই আন্তরিকতা ছিল। তাঁহার সময়ে প্রায়শঃই ।/০ আনীর জমিদার বাটীতে স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ভদ্র লোকদিগের আহারের নিমন্ত্রণ হইত। নিমন্ত্রিতদিগকে কখনও বহির্ভবনে আহার করিতে দেওয়া হইত না। চৌধুরাণী নিজে দেখিয়া শুনিয়া সকলকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইতেন। যাঁহাদিগের আহারের নিমন্ত্রণ থাকিত, চৌধুরাণী মহোদয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত থাকিতে লজ্জিতা হইতেন না, বলিতেন "ইহারা আমারই লোক।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অতি শৈশবেই দয়াময়ীর বৈধব্য ঘটে। এদিকে হিন্দুর বাল-বিধবার প্রতি সমাজের যেরূপ ব্যবস্থা, তাহা এস্থলে বলা নিষ্প্রয়োজন। দয়াময়ী এই শৈশবেই প্রৌঢ় বিধবার ন্যায় ব্যবহার করিতেন। অতি সন্তুষ্ট চিত্তে হবিষ্যান্ন গ্রহণ, মৃৎশয্যায় শয়ন, মস্তক মুণ্ডন এবং পূজার্চ্চনাদি করিয়া তিনি দিন কর্ত্তন করিতেন। দয়াময়ী এক বিপুল সংসারের কর্ত্রী হইয়াও পূর্ব্বোক্তরূপ কৃচ্ছ্র-সাধন করিয়া ধন্য মনে করিতেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, হিন্দুর ঘরে বর্ষিয়সী ও ভক্তিমতী বিধবা যতদিন আছে, ততদিন তাঁহাদেরি পুণ্যফলে হিন্দুত্ব নাম লোপ পাইবে না। এরূপ শুনা যায়, দয়াময়ীর পূর্ব্বে কাগমারী পরগনায় যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক বাস করিতেন, জমিদার বাড়ীতে তাঁহাদের যথোপযুক্ত রূপ সম্মান রক্ষিত হইত না। এইজন্য বাজুহা পরগণার অধিবাসিগণ কাগমারীর ভদ্র লোকদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখিতেন না, এবং তাঁহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও নারাজ ছিলেন। দয়াময়ী ইহা শুনিয়া যাহাতে "মাঝি মহাশয়, বামন বেটা" ব্যবহার না থাকে এবং বাজুহা পরগণার অধিবাসিগণ কাগমারীর লোকদিগকে ঘৃণা করিতে না পারেন, তদুপায় অবলম্বন করেন এবং বহুল নিষ্কর ভূমি দান করিয়া অনেক সম্রান্ত লোকদিগকে কাগমারীতে বাস করিতে প্রলুব্ধ করেন। ১২৩২ হইতে ১২৩৪ সনের মধ্যে বেড়াবুচিনার নিয়োগী মহোদয়গণ নদী ভাঙ্গায় বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। টাঙ্গাইলের পাদরী সাহেবদিগের বর্ত্তমান বাড়ীর দক্ষিণ ময়দানই পূর্ব্বতন বেড়াবুচিনা গ্রাম ছিল। বর্ত্তমানে যেস্থানকে বেড়াবুচিনা গ্রাম বলে, প্রকৃতপক্ষে তাহা অলোয়া-ভবানী—বেড়াবুচিনা নহে। নিয়োগী মহা-

শয়গণ, কোথায় বাড়ী করিবেন, চিন্তা করিতে ছিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, নিজ নিজ তালুকের কোন স্থানে ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিবেন। দয়াময়ী ইহা শুনিয়া নিয়োগী বংশের ৩টী প্রাচীন মাতব্বর ভদ্র লোককে আহ্বান করেন এবং অলোয়া-ভবানীতে বাড়ী করিতে অনুরোধ করিয়া প্রচুর নিষ্কর জমি প্রদান করিবেন, এরূপ মতপ্রকাশ করেন। নিয়োগী মহাশয়গণ ধর্ম্ম বুদ্ধিতে কর প্রদান না করিয়া বাস করিবেন না, বলিয়া জেদ করায় অগত্যাপক্ষে ফি পাখী ⁄ ও জিরাৎ ৶ জমা নির্দ্ধারণে যথোপযুক্ত জমি প্রদান করিয়া সমস্ত নিয়োগী মহাশয়দিগকে ঐ গ্রামেই প্রতিষ্ঠা করেন। সুখের বিষয়, ।⁄ আনীর বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এ পর্য্যন্তও উক্ত জমার কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। দয়াময়ী একবার মহা সমারোহে মহাভারত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজে মহাভারত প্রতিষ্ঠার প্রচুর ফল-শ্রুতি আছে। এ কার্য্যে দয়াময়ী যেমন প্রচুর ব্যয় করিয়াছিলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া পুণ্য ও গৌরব অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এরূপ শুনা যায়, একদা জনৈক ব্রাহ্মণ কুষ্ঠ ব্যাধিতে ভোগিয়া ভোগিয়া কীটদষ্ট পূতিগন্ধময় কঙ্কালাবশেষ দেহে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। একদিন রাত্রিতে হতভাগ্য ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন, "দয়াময়ী চৌধুরাণী ব্রহ্মযজ্ঞ, মহাভারত-প্রতিষ্ঠা ও সর্ব্বজয়া ব্রত উদযাপন করিয়া যে অক্ষয় পুণ্যফল অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার যে কোন একটীর পুণ্যফল যদি তিনি, লোভ-শূন্য মনে, তোমাকে দান করিতে পারেন, তবেই তোমার ব্যাধি নিরাময় হইবে, অন্যথা নহে।" ব্রাহ্মণ স্বপ্নে ভগবানের এই নিদারুণ প্রত্যাদেশ জানিয়া নিরাশ হইলেন। মনে করিলেন,—"সংসারে লোকে কপর্দ্দক ব্যয় করিয়া পুণ্যার্জ্জন-লোভ ত্যাগ করিতে পারে না, আর চৌধুরাণী, করুণাময়ীই হউন না কেন, এরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, তৎপুণ্যফল নির্লোভ হইয়া আমার মত হতভাগ্যকে দান করিবেন? অসম্ভব। মা, জগত্তারিণী, এ হতভাগ্য সন্তানের এ কঠোর পরীক্ষা কেন মা? আমার প্রতি তবে আর তোমার দয়া হইলনা, মা? কোন্ পাপে আমি মানব-সমাজ হইতে বিতাড়িত হইলাম, মা? আর কি সে সমাজে আমার স্থান লাভ হইবে না? মা, পাপের শাস্তি কি আমার এখনও শেষ হয় নাই? করুণাময়ী, পতিত-পাবনী এ দীনে করুণা কর মা? আর তো লোকের ঘৃণা উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিনা মা।—এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে আশার তাড়নায় ব্রাহ্মণ সন্তোষ দয়াময়ী সকাশে আসিয়া "দীন দয়াময়ী মা, তোর হতভাগ্য পাপী সন্তানের অবস্থা অবলোকন কর মা?" ইত্যাদি বলিয়া করুণ রোদনে বক্ষ ভাসাইতে লাগিল। তখন দয়াময়ীর কোমল-হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি নিজে আসিয়া রোগীর সমস্ত কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "বাবা, যদি আমার অদৃষ্টে প্রকৃতই ফল লাভ হইয়া থাকে, এবং আমার ফলদান করিবার অধিকার থাকে, তবে অকপট চিত্তে তোমাকে আমি মহাভারতের ফলদান করিলাম। কিন্তু আমি কিরূপে জানিব, তোমার ব্যাধির উপশম হইয়াছে?" ব্রাহ্মণ তখন বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য—এক রমণী-শিরোমণির কৃপার উপর ভগবান তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রমণী চিরদিন পুণ্যবতী—

রমণীর পুণ্যে তাঁহার স্বামীর সংসার পুণ্যময়। এহেন রমণীরত্নের পুণ্যফলে ব্রাহ্মণ এক বৎসর পরে নিরাময় দেহে চৌধুরাণী মহোদয়াকে তাঁহার পুণ্যফলের কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করিতে আসিলেন। সেই পূতিগন্ধময় কুৎসিৎ-দর্শন ব্রাহ্মণকে এক রূপবান ব্যক্তি রূপে দেখিয়া, সন্তোষের আপামর সাধারণ বিস্ময়ে অভিভূত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কি এক মহীয়সী দেবীর কার্য্যে তাহারা দেহ পাত করিতেছে ভাবিয়া গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিল। ধন্য দয়াময়ী এবং ধন্য সেই সময়—যে সময় দয়াময়ীর ন্যায় মহিলারত্ন এ পাপ সমাজকে পুণ্যময় করিয়াছিলেন। হায়, কোথায় সে সময়! দয়াময়ী উৎফুল্লহৃদয়ে ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। "মা, তুই আমার গর্ভধারিণী, আমি তোর দীনতম সন্তান" বলিয়া ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ের নয়নজলে বক্ষ ভাসাইতে লাগিল। দয়াময়ী সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তাঁহার আদ্রার জমিদারী হইতে উপযুক্ত পরিমাণ ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়া দীনতার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

দয়াময়ী ৺ কাশীধামে যাইবার পূর্ব্বে একবার ব্রহ্মযজ্ঞ সঙ্কল্প করিয়া একদিনে বহু সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজন করান ও প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করেন ও সর্ব্বজয়া ব্রত সম্পাদন করেন। এই সর্ব্বজয়া ব্রত সম্পূর্ণ এক বৎসরে উদ্‌যাপন করিতে হয়। এ ব্রতের ন্যায় কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত হিন্দুশাস্ত্রে দ্বিতীয় আর লেখে নাই। জীবন-যাত্রার সর্ব্বপ্রধান অত্যাবশ্যকীয় পদার্থনিচয় দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাই এই ব্রতের প্রধান বিধি। দয়াময়ী এই বিধানানুসারে একমাস জল, একমাস অন্ন, একমাস বস্ত্র, একমাস শয্যা ইত্যাদি রূপে অবশ্য-ভোগ্য বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ বৎসর ব্রত উদ্‌যাপন করেন। এই সময় যে ঘটা হইয়াছিল, কেহ কখনো সেরূপ দেখে নাই বা শুনে নাই। ব্রত উদ্‌যাপিত হইলে, প্রচুর জিনিস উদ্বর্ত্ত হয়। মুচ্ছুদ্দি ৺ ব্রজরাম দয়াময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদ্বর্ত্ত জিনিস কি করা হইবে?" দয়াময়ী উত্তর দিলেন—"ব্যয়ের জন্য জিনিস সংগ্রহ করিয়াছি, গৃহে আর গ্রহণ করিব না, দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দাও।" অনেক চেষ্টায় সেই জিনিস উপযুক্ত পাত্রে বিতরিত হইয়াছিল। দয়াময়ী যত দিন ৺ কাশীধামে বাস করিতেছিলেন, তত দিন ২।৩ শত দরিদ্র তাঁহার দ্বারে প্রতিদিন অন্ন পাইত। কাশীতে তৎকালে এরূপ লোক খুব অল্পই ছিল, যাহারা কোন না কোন রূপে দয়াময়ীর দয়ার অংশ ভোগে বঞ্চিত ছিল। কাশীতে সকলেই দয়াময়ীকে "অন্নপূর্ণা" বলিয়া ডাকিত। তাঁহার মৃত্যুতে কাশীক্ষেত্রে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল—যেন তাঁহাদের সকলেরই মাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে। দয়াময়ী প্রকৃত পক্ষেও দরিদ্রের জননীই ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, গৃহে কিম্বা ৺ কাশীধামে সর্ব্বত্রই, দয়াময়ী নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত, অতিথি, অভ্যাগত, দাস দাসীদিগের আহার হইলে নিজে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। কোন দিনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না।

যেস্থানে শোক দুঃখ, সেই স্থানেই দয়াময়ী করুণাময়ী জননীরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া শোকগ্রস্তকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেন, অন্নহীনকে অন্নদান করিতেন, রোগীর দেহে হস্ত বিলেপন করিয়া রোগ-জ্বালা প্রশমন করিতেন। এ হেন দয়াময়ীকে যে লোকে "অন্নপূর্ণা" বলিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

দয়াময়ীর জীবদ্দশায় একবার এতৎ প্রদেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। দরিদ্রের জীবন রক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না। আর্ত্তের ক্রন্দনে দয়াময়ীর কোমল হৃদয় ব্যথিত এবং বিচলিত হইল। সম্মুখে কি তাঁহার প্রজাগণ হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া জীবন দিবে? তিনি ঘোষণা করিলেন—"এ দুর্ব্বৎসরে কাহাকেও কর দিতে হইবে না।" এ কি সামান্য দান? ধন্য দয়াময়ী! ধন্য তাঁহার মানব-দুঃখকাতর কোমল হৃদয়! দয়াময়ীকে এখন লোকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কাশী প্রাপ্তির অনেক দিন পর পর্য্যন্তও প্রাতঃরুত্থানের সময় গোড়া হিন্দু স্ত্রী পুরুষগণ "দুর্গাকালী" নামের সঙ্গে সঙ্গে দয়াময়ীর পবিত্র নাম আকণ্ঠ পূরিয়া লইয়া ধন্য হইত। গৃহে কি প্রবাসে, রান্নার পূর্ব্বে সকলেই "অন্নপূর্ণা," "রাণী ভবানী" ও "দয়াময়ী"র নাম লইয়া উনুনে অগ্নি প্রজ্বলিত করিত—না করিলে সেদিন আর আহার হইবে না, ইহাই সর্ব্ব সাধারণের বিশ্বাস ছিল। দয়াময়ীর সময় কাগমারী ।/০ আনী হিস্যার জমিদারীর রাজস্ব ১৩৪০৬৲ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল। আর এখন? গবর্ণমেণ্ট তবুও বলেন, "জমিদারগণ অত্যাচারী;" কিন্তু বলিবার সময় খাস মহলের কথা সম্যক ভুলিয়া যান।

।/০ আনীর বর্ত্তমান জমিদার মহোদয়গণের পিতা ৺ দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী মহোদয় জীবনের নানারূপে বিব্রত ছিলেন। বলিতে কি, তিনি সুখ শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। যখনই কোন বিপদ হইতে মুক্ত হইতেন, তখনই বালকের ন্যায় অকপট এবং ভক্তি গদ্‌গদ্‌চিত্তে বলিতেন, "আমার জীবন ও সংসার রক্ষা কেবল আমার পুণ্যবতী পিতামহী ৺ দয়াময়ী ঠাকুরাণীর পুণ্যফলে সাধিত হইতেছে।"

দয়াময়ী অনেক দিন হয় এ নশ্বর সংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় কার্য্যাবলী ও নাম লোকে এখন প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। ইহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না, যে সমাজে দয়াময়ী বাস করিতেন, সে সমাজ যদি গুণগ্রাহী হইত, তাহা হইলে রাণী ভবানী, অহল্যাবাই ও রাণী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি মহিলারাণীদিগের সমশ্রেণীতে তাঁহার স্থান হইত। জননী সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই সন্তানের জননী; কিন্তু যিনি গর্ভে ধারণ না করিয়াও সকলের মাতা, যাঁহার করুণারূপ স্তন্য পিযূষ মাতৃহীনের জন্য সর্ব্বদাই ক্ষরিত হয়, তিনিই প্রকৃত জননী। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই মা জগজ্জননী লোক-সমক্ষে চাক্ষুষ হন এবং লোকও ধন্য হয়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

বিশ্ব-চিন্তা।

(একটী শোকবিহ্বল লোক নির্ঝরিণী-তটে উপবিষ্ট এবং চিন্তাপরায়ণ। মানব-হৃদয় কিরূপে একচিন্তা হইতে অপর চিন্তায়, বিশ্বাস হইতে অবিশ্বাসে, অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাসে এবং মিথ্যা হইতে ধ্রুবে গিয়া উপনীত হয়, এই কবিতায় তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।)

১

সংহারো সংহারো বিশ্বে হে দেব মহান!
স্বার্থের সংঘাতে পূর্ণ
এ সংসার হোক চূর্ণ,
বাজাও বাজাও তব প্রলয়-বিষাণ!
জগতের কোলাহল, বধির করিল যেরে,
থামাও থামাও ওগো, দাও থামাইয়া!
সসীমে অসীম গীত কাজ নাই আর গেয়ে,
এ ভীষণ মরুভূমে কি ফল গাহিয়া?
এস এস শিব ধ্রুব এস সত্য সনাতন
এস প্রীতি, মহাধৃতি এস ভূমা, শান্ত!
রচিয়া নূতন বিশ্ব মহান পবিত্র এস
সেই সুখ-সান্ত-মাঝে, এস হে অনন্ত!
কেহ চাহে অর্থ-ধন,
কেহ চাহে সে যৌবন—

কত আসে ফেরে সবে,
সয়তান নাচে ভবে—
মহাপাপ হৃদে লয়ে
নরস্রোত যায় ব'য়ে
কি কাজ থাকিয়া এই, পাপে ভরা বিশ্ব !
হান হান বজ্র হান
ভেঙে কর খান খান,
সাগরে ডোবাও সব, হে দেব অদৃশ্য !

২

জানি আমি এই বিশ্ব, নাট্যশালা-প্রায় !
নর-নারী অভিনেতা,
গাহে গান, কহে কথা,
ভূমিকা হইলে শেষ, অনন্তে মিলায় !
কেহ ল'য়ে প্রণয়নী কাটায় শর্ব্বরী দিবা
কম-হাসে, প্রেম-ভাষে, আর আলিঙ্গনে !
কেহবা নিরাশে কাঁদে, কেহবা সুখেতে দেখে,
পর দুখ বুঝেনা সে, লয়ে নিজ জনে !
কোথা আজ বিশ্ব-প্রেম, পরার্থে আপন দান,
সর্ব্বজীবে ভালবাসা, আপনা বিলানো !
এযে ঘোর নিঠুরতা, দয়া নাই, কামুকতা,
বিশাল-বসুধা-বুকে কালিমা-মাখানো !
এই যদি বিশ্ব-রীতি,
কোথা তবে পুণ্য নীতি,
কেন তবে দেব-প্রাণ
সব ভুলে আত্ম-দান,
মিছে যত শাস্ত্র-গাথা
ভগবান ? মিছে কথা—
এ ভুবন অরাজক, কোথা ভগবান ?
সাঙ্গ কর পুণ্য তান,
থেমে যাক বেদ গান,
ভগবান নাই বিশ্বে, নাই তাঁর দান !

৩

আছে ভগবান ? কোথা,--নাই—নাই—নাই !
দয়া-হীন ভগবান,
ক্রুর-সর্প শয়তান
কেবা ভাল, কেবা মন্দ বল মোরে ভাই !
ওই যে বিধবা কাঁদে, শিরে করাঘাত করি
(আলু থালু শ্বেত বস্ত্র) "স্বামী কোথা গেল ?"
ওই যে জননী কাঁদে, মৃত পুত্রে চাপি বক্ষে
"রে-মোর সোণার বাছা, নয়নের আলো !"
হের ওই পতি কাঁদে, মৃতা-প্রিয়া-গণ্ড চুমি
"মোর হৃদি বিধি, নিধি, কেন কেড়ে নিলে ?"
হের ওই পুত্র কাঁদে, মাতার চিতার পাশে
"মা আমার ! গেলি কোথা,ফেলি তোর ছেলে ?"
আছে যদি ভগবান—
কোথা তাঁর দয়া, দান ?
গৃহে গৃহে হাহাকার
কেন তবে অনিবার ?
এ ঘোর শোকের রব
পূর্ণ করে বিশ্ব-ভব
সৃষ্টি আজো আছে কিন্তু দয়া নাই তায় !
কেবল পিশাচ সব—
করিতেছে হাহারব
তারি মাঝে কি ক্রন্দন উঠে উভরায় !

৪

থাম,—
কি বলিছ মোহে ভুলে, নাই ভগবান ?
একি মোর পাপ কথা
থামাও নিরয়-গাথা,
নাই যদি নিয়ামক, বিশ্ব, কার দান ?
বুদ্ধদেব শ্রীচৈতন্য শঙ্কর নানক আর
খ্রীষ্ট, রামকৃষ্ণ তবে, কার আত্ম মুক্ত ?
এই বিশ্ব-ধর্ম্ম ভূমি নহে মাত্র পাপে ভরা
ধর্ম্ম-পূত উৎস জলে, এ ভুবন-সিক্ত !
আছে বটে মহা পাপ, তার পাশে আছে ধর্ম্ম
অন্ধতম আছে তাই, আলোক-আভাস !
কালের মহান চক্র ঘুরিছে ফিরিছে সদা
আবর্ত্তন-ফলে সুখ, দুঃখের বিকাশ !

আছে বটে মহা দুখ
তার পাশে আছে সুখ,
পাষাণে তটিনীধার
শুষ্ক শাখে পাখী গায়,
পর্ব্বতে কুসুম ফুটে
বন-ফুলে অলি জুটে
ভ্রমর সে, শ্বেত পদ্মে, বিজলী অম্বরে!
ওই বসি মহাবীর
ফেলেনা শোকেতে নীর?—
ভাঙা-মেঘে রবি-দীপ্তি, কোমল, কঠোরে!

৫

বেদাভাস ঘটাকাশ,—তাহাতে মরণ!
পরমাত্মা-অংশ জীব
নিজে ধ্রুব সত্য শিব
অমঙ্গলে,—হে মঙ্গল! লভো'গো জীবন!
ছোট শিশু পেয়ে খেলা,চাহেনা মাতার পানে,
পেয়ে বিশ্ব ক্রীড়নক, ভুলে আছি শিব!
সংসারের নাগপাশ, বাঁধিল, মারিল যেরে
হা হা এ'নরক-মাঝে, কোথায় ত্রিদিব?
এস এ'হৃদয় মাঝে হে ব্রহ্ম চৈতন্য জ্ঞান!
কোথা সে চিদ্রূপ-পূত ভূমা'র বিভাস!
পরাভক্তি সত্যবেদ, গায়ত্রী-স্বরূপা শক্তি,
মহান ওঙ্কার কোথা,—হে দীপ্ত প্রকাশ!
আজ হেথা কত জল
কাল সেথা পা'বে তল,
চন্দ্র তারা নীলাম্বরা
শ্যামা-ধরা শোভা-ভরা,
সৃষ্টি পূর্ব্বে কোথা হায়
প্রলয়ে মুছিয়া যায়,—
নিখিল জগত মিথ্যা,—ছায়াবাজী-প্রায়!
উজলিয়া চিদাকাশ,
এস দীপ্ত বেদাভাস!
অমামসি-নাশী-বিভা কোথায়, কোথায়!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

জন্মান্তর, কর্ম্ম এবং আত্মোন্নতি। (শেষ)

"অজরা মরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্ম মাচরেৎ॥"

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপনাকে অজর এবং অমর মনে করিয়া বিদ্যা এবং অর্থ চিন্তা করিবেন। ধর্ম্ম চিন্তার সময় মনে করিবেন যে, মৃত্যু আমার কেশ আকর্ষণ করিতেছে, শীঘ্রই আমাকে বিনাশের পথিক হইতে হইবে। এই উপদেশ বাল্য, যৌবন কি বার্দ্ধক্য কাল বিভাগানুসারী নয়। ইহা প্রাত্যহিক কর্ম্মোপদেশ।

"নধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো
নচাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদাহি ধর্ম্মস্যক্রিয়ৈব শোভনা
যদা নরো মৃত্যুমুখে ভবিষ্যতি॥

মানুষের ধর্ম্মাচরণের কাল নিরূপিত নাই। মৃত্যু কাহারও প্রতীক্ষা করে না। ইহার সময় হয় নাই,এখন থাকুক, মৃত্যু এমন কোন বিবেচনা করে না। অতএব সর্ব্বদাই ধর্ম্মক্রিয়া শোভনা। মানব মাত্রকেই মৃত্যু-গ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব ইন্দ্রিয়গণ যে পর্য্যন্ত সবল আছে, সেই পর্য্যন্তই সীমা। বুদ্ধির বিকাশ হইতেই ঈশ্বর চিন্তা আরম্ভ করিতে হইবে। প্রহ্লাদ তাঁহার ভ্রাতৃ-গণকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ,
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদং।

শ্রীমদ্ভাগবত।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কৌমার বয়সেই ভাগবত

ধর্ম্মাচরণ করিবেন। অর্থাৎ ঈশ্বরচিন্তা করিবেন। মানুষ জন্ম অধ্রুব, পুনরায় এই নরজন্ম লাভ ঘটিবে কিনা, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

এই উৎকৃষ্ট নরজন্ম লাভ করিয়া যদি মানুষের মত কাজ না করিলাম, তবে পুনরায় এই জন্ম হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? অন্য জীব জন্ম হইতে মানব জন্মটী অর্থদ। যদি সাধনা করিতে পারি, তাব দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হইতে পারে। পরম পুরুষার্থরূপ যে মুক্তি, তাহা মানুষ জন্মেরই লভ্য। সনকাদি ঋষি চতুষ্টয়, নারদ এবং বৃহস্পতি প্রভৃতি সাধনগুণেই দেবপূজ্য। অতএব বাল্য বয়স বিবেচনায় সময় নষ্ট করিও না। বাল্যাদি অবস্থা ভেদ দেহের, দেহীর নয়। সাধুসঙ্গ ও ঈশ্বরের শরণাগতি দ্বারা পরম শ্রেয়ো লাভ হয়। এক জন্মে কেহ ঈশ্বরে অহেতুকী অব্যবহিতা ভক্তি লাভ করিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হয়। এ জন্মে অভ্যাস হইলে ঐ অভ্যাসই ভবিষ্য জন্মে তাহাকে উন্নতির দিকে টানিয়া লইবে।

অভ্যাস পরম হিতকারী—"পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈবহ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ॥ পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ জীব অবশ হইয়া কার্য্য করে। সুতরাং বর্ত্তমান জন্মের অভ্যাসই ভাবী জন্মের শুভফল-প্রসূ। ভগবান্ শ্রীমান অর্জ্জুনকে কহিতেছেন—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়িবুদ্ধিং নিবেশয়,
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতে মন স্থির কর। আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর! তাহা হইলে ইহার পরে আমাতেই থাকিবে, ইহাতে সংশয় নাই।

"অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়িস্থিরং।
অভ্যাস যোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥

যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে আমাকে পাইবার জন্য গুরূপদিষ্ট উপায়ে সাধনা অভ্যাস কর।

"অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্ম পরমো ভব,
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধি মবাপস্যসি।"
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যদি অভ্যাস করিতেও না পার, তবে যাহা কর, তাহা নিজের নিমিত্ত করিতেছ, এমন অহং জ্ঞান ত্যাগ করিয়া আমারই জন্য করিতেছ, এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

'অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যদি তাহাতেও অক্ষম হও, তবে একমাত্র আমার শরণাগত হওত সংযতচিত্ত হইয়া সমস্ত কর্ম্মের ফল কামনা ত্যাগ কর। অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্ম কর। ভগবান মানবের কল্যাণ সাধনার্থ এত উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু হায়! কয়জন লোকে সেই হিতগর্ভ উপদেশ গ্রহণে আগ্রহান্বিত? কামিনীকাঞ্চনের মোহিনী মায়ায় মানব আত্ম-হিত দর্শনে অন্ধ। ভোগ-লালসারূপ হুতাশন অন্তরে নিরন্তর প্রজ্জলিত, তাহাতে কামিনীকাঞ্চন ঘৃতাহুতিপ্রায়। যতই দাও, ততই দীপ্তশিখা বিস্তার পূর্ব্বক জ্বলিতে থাকিবে, কদাপি নির্ব্বাপিত হইবে না। পরকালের চিন্তা ক্ষণ তরেও মনে স্থান পায় না। তাই বিষয়-সর্ব্বস্ব মানব ভোগকর বিষয়েই নিরন্তর মগ্ন থাকে। রজস্তম গুণ রূপ ধূমে জ্ঞান দৃষ্টি নিরুদ্ধ। সত্বের আবির্ভাব ব্যতীত দৃষ্টি

প্রতিষেধক ধর্ম্মের তিরোধানের সম্ভাবনা কোথায়?

পাশ্চাত্য জগতে অর্থ চিন্তা ভিন্ন পরমার্থ চিন্তা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরকালের জন্য তাহাদের কোন ব্যাকুলতা নাই। ইহকালের সুখ চেষ্টাতেই তাহাদের চিন্তা ও শক্তির বিনিয়োগ। আবশ্যক বোধ করিলে তাহারা আত্ম বিনাশ করিতে অকুণ্ঠিত। হিন্দু শাস্ত্রমতে সহস্র পাপীর মুক্তি আছে, কিন্তু আত্মঘাতীর মুক্তি নাই। গলৎকুষ্ঠগ্রস্ত হিন্দুও আত্মহত্যা করে না। হিন্দুর বিশ্বাস এ জন্মে তো অশেষ ক্লেশ পাইতে হইতেছে, আত্ম-বিনাশ করিলে পরকালে এতদপেক্ষাও ক্লেশ পাইতে হইবে। পরকালে অবিশ্বাসীদিগের এ আশঙ্কা নাই। বিলাতে একজন ধনী ক্রমে ৭।৮টী স্ত্রী হত্যা করে। ধনী লোকের রূপ যৌবনও আছে, স্ত্রীর মৃত্যুর কারণও অপ্রকাশ; বিবাহ করিতে তাহার কোন বাধাই জন্মে নাই। শেষে তাহার প্রতি সাধারণের সন্দেহ জন্মে। তাহার এই বিষয় ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলে সে তখন পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। বিচারক জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কিরূপে এইরূপ নরহত্যা করিতে যে, দেহে একটু চিহ্ন মাত্রও থাকিত না? সে তখন একটী পিন লইয়া দেহের স্থান বিশেষে বিদ্ধ করত বিচারালয়েই মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল। ইংরেজী নভেল পড়িলে গুপ্ত হত্যা ও আত্মহত্যার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভারতে ওরূপ হত্যা কাণ্ডের শতাংশের একাংশও দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। ইহার প্রকৃত কারণই পরকালে অবিশ্বাস। পরকালে বিশ্বাস না থাকিলে কেবল রাজ-শাসন ব্যতীত আর কোন প্রতিবন্ধকই থাকে না। তাই পাশ্চাত্য অপারমার্থিক জাতি সকল আদিম আমেরিক ও আফ্রিকার কাফ্রিগণকে পশুর ন্যায় বিনাশ করিয়া সমগ্র আমেরিকা এবং আফ্রিকারও অধিকাংশ আত্মসাৎ করিয়াছে। স্বার্থের বলবতী উত্তেজনায় সুসভ্য ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর প্রতিও যেরূপ নৃশংসাচরণ চলিতেছে, পরকাল-বিশ্বাসী কোন জাতি কি ব্যক্তি ঐরূপ আচরণ করিতে পারে না।

মুসলমান শাস্ত্রে আছে, মৃত ব্যক্তির আত্মা প্রলয় পর্য্যন্ত গোর স্থানেই থাকে। প্রলয় সময়ে খোদায়তালা বিচার করিয়া যে যেরূপ দণ্ড পুরস্কারের যোগ্য, তাহার প্রতি সেইরূপ দণ্ড পুরস্কারের বিধান করেন। খ্রীষ্টানদেরও এই মত। সুতরাং মুসলমান কি খ্রীষ্টানদের মতে পাপ পুণ্যের ফল ভোগ অত্যন্ত দূর ভবিষ্যৎ গর্ভে, এরূপ স্থলে যে পাপভীতি অপেক্ষাকৃত কম হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছি, আমেরিকার যুবতীগণের আত্মহত্যার এক গুপ্ত সমিতি ছিল। হয়ত এখনও উহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে। রাজদণ্ড ভয়ে গোপনে উহার কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, ঐশ্বরিক দণ্ডের তো কোন ভয়ই নাই। সুতরাং গোপনে গোপনে বহু আত্মহত্যা ঘটিয়াছে। ভারতে এইরূপ পৈশাচিক সমিতি কল্পনাতীত ব্যাপার। আজ কাল ইউরোপে ও আমেরিকায় স্পিরিট (মৃত ব্যক্তির আত্মা) লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছে। আমেরিক পণ্ডিতগণ নাকি আত্মার ফটো পর্য্যন্ত তুলিতেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী বেদান্তদর্শন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যথেষ্ট অনুশীলন করিতেছেন। কালে হিন্দু জাতির চিরপরিচিত মহান্ সত্য সকল যে অতি ভক্তিভাবে পাশ্চাত্য জগতে পরিগৃহীত ও আচরিত হইবে, তাহার সংশয় নাই।

আজ কাল পদমর্দ্দিত ভারতবাসীর গৌরবসূর্য্য অস্তমিত। তথাপি ভারতের উপনিষদ, ভারতের ষড়দর্শন, ভারতের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সমুজ্জ্বল রত্ন সকল সমগ্র সভ্য জগতের জ্ঞানভাণ্ডাররূপে পূজিত হইতেছে। ধর্ম্ম-গৌরবে এখনও ভারত সমগ্র পৃথিবীর গুরুর গুরু স্থানীয়, তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার যো নাই। ভারতের আধ্যাত্মিক চরমোৎকর্ষের সহস্র প্রমাণ এখনও দেদীপ্যমান। ভারতের যোগশাস্ত্র এখনও বিস্ময়োৎপাদন করিয়া জ্ঞানপিপাসু পাশ্চাত্য জাতি মধ্যে নব নব সত্য প্রচার করিতেছে। আমাদেরই শিষ্যা মেডামবল্যাভিটস্কী ও কর্ণেল অলকট সাহেব যৎকিঞ্চিৎ যোগাভ্যাস করিয়া থিওসফী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া আবার আমাদেরই গুরুর আসনে বসিতে পারিয়াছিলেন।

ক্রমে বিষয়ান্তরে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণে প্রবৃত্ত হই। মৃত্যু সময়ে কর্ম্মানুসারিণী চিন্তাই যে মনুষ্যকে বিভিন্ন যোনিতে লইয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত জড়ভরতের প্রস্তাবটী বলিব।

মহারাজ ধর্ম্মাত্মা ভরত রাজ্যসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বনে কৃচ্ছ্র সাধন করিতেছেন। একদা ভরত গণ্ডকী নদীতীরে গায়ত্রী-ধ্যান-মগ্ন। এমন সময়ে সিংহনাদ-সন্ত্রস্তা জল-পানোদ্যতা পূর্ণগর্ভা হরিণী লম্ফ প্রদানে জলগর্ভে নিপতিতা। ভয়ে ও উচ্চ স্থান হইতে পতনে হরিণীর গর্ভস্রাব হইল। হরিণী নদী সন্তরণ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে নিপতিতা। গর্ভ-নিঃসৃত মৃগ শিশুকে জলে খাবি খাইতে দেখিয়া রাজা তাঁহাকে উদ্ধার পূর্ব্বক সস্নেহে পালন করিতে লাগিলেন। মৃগ-শিশুর প্রতি অত্যাসক্তি বশতঃ তাঁহার জপ তপের অন্তরায় হইতে লাগিল। প্রবল মমতা মৃত্যু সময়ে তাঁহাকে হরিণ-শিশুর চিন্তায় তন্ময় করিল। সুতরাং তিনি মৃত্যুর পর হরিণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব সুকৃতি বশতঃ তিনি জাতিস্মর হইলেন। মাতৃ জঠরে থাকিতেই তাঁহার অধোগতি বুঝিতে পারিলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি মাতৃসঙ্গ পরিত্যাগের পর আর হরিণ-সঙ্গ করিলেন না। অনন্তর পুলস্ত্য পুলহাশ্রমে তীর্থজলে অর্দ্ধ দেহ এবং স্থলে অর্দ্ধ দেহ রাখিয়া হরিণ-দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আঙ্গিরস গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণের ঔরসে অতি কদাকার দেহে জন্মিলেন। তিনি বস্তুতঃ জড় ছিলেন না, কিন্তু জড় প্রকৃতির ভাব ব্যক্ত করিতেন। অশেষ জ্ঞানের আধার হইয়াও জড়বৎ বুদ্ধিহীনতা প্রদর্শন করায় লোকে তাঁহাকে জড় বলিয়া ডাকিত। অবশেষে সিন্ধু সৌবীর পতি রহুগণ রাজার যান বাহক রূপে নীত হওয়ায় তাঁহার অন্তর্নিগূহিত প্রচ্ছন্ন জ্ঞানপ্রভা প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজাও তাঁহার প্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সংসার-কূপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে মনুষ্য যে স্থাবর বৃক্ষরূপেও পরিণত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত আছে, নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

যক্ষপতি কুবেরের নলকূবর ও মণিগ্রীব নামে পুত্রদ্বয় ঐশ্বর্য্য মদমত্ত হইয়া অপ্সরাগণ সঙ্গে উলঙ্গ দেহে গঙ্গা সলিলে জল-কেলী করিতেছিল। এমন সময়ে দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া অপ্সরাগণ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বস্ত্র পরিধান করিল, কিন্তু যক্ষ যুবকদ্বয় সেদিকে দৃক্‌পাতও করিল না। তদ্দর্শনে, দেবর্ষি উহাদের মদমত্ততা বুঝিতে পারিয়া

উহাদের ভাবী কল্যাণের জন্য অভিশাপ প্রদান করিলেন। নারদ বলিলেন যে, ধন-মদান্ধ মন্দবুদ্ধি যুবকদ্বয়! স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্যের অধিকরণক ধনেই তোমাদের এইরূপ বুদ্ধি ভ্রংশ জন্মাইয়াছে। এজন্য আমি তোমা-দিগকে অভিশম্পাত দিতেছি, যমল অর্জ্জুন বৃক্ষরূপে তোমরা এই ব্রজ ভূমিতে থাক। অবশেষে উহাদের কাকুতি মিনতিতে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, দিব্য শত বর্ষান্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণরজঃ স্পর্শে তোমাদের মুক্তি হইবে। শ্রীকৃষ্ণের শৈশব সময়ে উহারা মুক্তি লাভ করিয়া স্বস্থানে গমন করে। কর্ম্মানুসারে জীবের স্থাবর জঙ্গম, উভয় গতি হইতে পারে। উদাহৃত প্রস্তাবটী অভিশাপের ফল হইলেও,জঙ্গম জীব যে স্থাবর জীবেও পরিণত হয়, তাহার প্রমাণ বটে।

কর্ম্মই যেমন জন্ম মৃত্যুর নিদান, তেমনই কর্ম্মেরও বীজ। কর্ম্মজনিত ফল ভোগের জন্যই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু।

"ভবায় নাশায় চ কর্ম্ম কর্ত্তুং
শোকায় মোহায় সদা ভয়ায়।
সুখায় দুঃখায় চ দেহ যোগ
মব্যক্ত লিঙ্গং জনতাঙ্গ ধত্তে॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

জন্ম, মৃত্যু, কর্ম্মকরা, শোক, মোহ, ভয়, সুখ, দুঃখ প্রকৃতি ভোগের জন্যই জীবকে দেহ ধারণ করিতে হয়। বর্ত্তমান জীবনেই ভাবী জীবনের বীজ সংগৃহীত হয়। এক্ষণে দেখা কর্ত্তব্য, এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর কারণ ধ্বংস হইতে পারে কিনা? "কর্ম্মণো-জ্ঞানং জ্ঞানা মুক্তিঃ।" যে পর্য্যন্ত রজস্তমো-গুণ থাকে, সে পর্য্যন্ত আসক্তি নাশ অসম্ভব। আসক্তি থাকিলেই যশোলিপ্সা, কামিনী-কাঞ্চন ইত্যাদি কামনার বিষয় থাকিবেই। "তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি" তমঃ অজ্ঞানজ, অতএব দম্ভ, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য প্রভৃতি আত্মার বন্ধন সকল ইহাতে নিত্য বর্ত্তমান। কর্ম্ম করিতে করিতে সাধু সঙ্গ, শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ প্রভৃতির গুণে ক্রমে ক্রমে সত্বগুণ সঞ্চিত হয়।

"তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ং।
সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চাপম॥"

সত্বগুণ মালিন্য বর্জ্জিত, সুতরাং প্রকা-শক এবং অনাময়, ইহা হইতে বিশুদ্ধ সুখ এবং জ্ঞান জন্মে। মেঘরাশি বিদূরিত হইলে যেমন সূর্য্যরশ্মি প্রকাশিত হয়, অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, তেমনি, সত্বগুণ রূপ সূর্য্যের তেজে অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়। তখন দুঃখ থাকে না, কেবলি আনন্দ। সুতরাং জীবের জন্ম মরণজনিত কষ্ট আর ভুগিতে হয় না। সত্বগুণে কামনা বিনষ্ট হয়, সুতরাং মানব তখনি নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে অধিকারী হয়।

"কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্ম শুদ্ধয়ে।
যুক্তঃ কর্ম্মফলংত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলেসক্তো নিবধ্যতে॥

শরীর, মন ও বুদ্ধি দ্বারা এবং কর্ম্মাভি-নিবেশ-রহিত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যোগিগণ আত্ম-শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বথা কর্ম্মফলাসক্তি পরিহার করিয়া কর্ম্ম করেন। ব্রহ্ম যোগ-যুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিলেও ব্রহ্মনিষ্ঠা হইতে উৎপন্না শান্তি লাভ করেন। অযুক্ত ব্যক্তি কামনা-প্রবৃত্তি জন্য ফলাসক্ত হইয়া নিয়ত বন্ধন প্রাপ্ত হয়। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিবেক-যুক্ত মন দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্বার বিশিষ্ট পুরবৎ দেহে স্বয়ং কর্ম্ম না করিয়া এবং না করাইয়া সুখে বাস

করেন। ঈশ্বর জীবের কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন নাই, কর্ম্মফলও সৃষ্টি করেন নাই, এবং কর্ম্মফল সংযোগও সৃষ্টি করেন নাই। জীবের স্বভাবই কর্তৃত্বাদি রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্বভাবের ঐরূপ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে মানব জীবন পশু জীবন হইতে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারিত না। "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি, মন্যতে" অহঙ্কার-বিমূঢ় ব্যক্তি আপনাকে কর্ত্তা মনে করিয়াই বদ্ধ হয়। মানবের কর্তৃতাভিমান না থাকিলে তাহার পাপ পুণ্যও থাকে না। যশস্কর কি অযশস্কর কোন কার্য্য করিলে তাহার জন্য তাঁহার প্রশংসা কি নিন্দার কোন অপেক্ষাই থাকে না। ঈদৃশ মানব সদৃচ্ছা লাভ, সন্তুষ্ট-শীত-গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বাতীত হন। তাঁহার নিকটে সিদ্ধি অসিদ্ধি, সব সমান হইয়া যায়।

অহংজ্ঞানই অজ্ঞানতা বা মায়া। অহং জ্ঞান রূপ অজ্ঞানতা-মেঘ অন্তরিত হইলে নির্ম্মল জ্ঞান ভাস্কর প্রকাশিত হন। তখন সর্ব্বভূতই তাঁহার নিকট সমান, আত্মা হইতে অভিন্ন। বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর, বিড়াল, চণ্ডাল প্রভৃতি সবই এক। এরূপ সর্ব্বত্র সমদর্শী মানবের শোক মোহাদি থাকে না; কেবল আনন্দ, কেবল শান্তি। ইহারই নাম মুক্তাবস্থা। আত্মা সর্ব্ববিধ বন্ধন মুক্ত হইলেই জীব মুক্ত হইলেন।

"তদ্বুদ্ধয় স্তদাত্মান স্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ,
গচ্ছন্ত্য পুনরাবৃত্তিং জ্ঞান নির্ধূত কল্মষাঃ॥

সেই পরমাত্মায় যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আছে, সেই পরমাত্মায় যাঁহার চিত্ত আছে, সেই পরমাত্মায় যাঁহারা স্থিতিলাভ করিয়াছেন, সেই পরমাত্মাই যাঁহাদের পরম গতি, এবং জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের পাপ বিধৌত হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তিই মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাদিগকে আর পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ ক্লেশ পাইতে হয় না। মুক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে এত কথা আছে যে, বিস্তারিতরূপে লিখিতে গেলে তাহাতেই একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে। সংক্ষেপে মুক্তি সম্বন্ধে আরও গুটিকতক কথা বলিব।

মুক্তি চতুর্ব্বিধ, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ। শ্রীমদ্ভাগবত মতে সার্ষ্টিও একপ্রকার মুক্তি। সুতরাং উক্তমতে মুক্তি পঞ্চবিধ। সালোক্য ভগবানের সঙ্গে এক লোকে বাস, সামীপ্য তৎসমীপে বাস, সারূপ্য তদ্রূপ রূপলাভ করা। সাযুজ্য তাহাতে যুক্ত হওয়া। অর্থাৎ জলে জল মেশার ন্যায় একত্বপ্রাপ্তি। সার্ষ্টি সমান ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হওয়া। মুক্তি জ্ঞানীর বাঞ্ছনীয়, ভক্তের নয়। কর্ম্মী স্বর্গ, জ্ঞানী মুক্তি, এবং ভক্ত সেবার প্রার্থী।

"সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনামৎ সেবনং জনাঃ॥

ঈশ্বরাবতার শ্রীমৎ কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহূতিকে কহিয়াছেন—আমি ভক্তকে প্রাগুক্ত পঞ্চবিধ ভক্তি প্রদান করিলেও আমার সেবা ভিন্ন ঐ সকল মুক্তি তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় নয়। সকামকর্ম্মী স্বর্গ, রাজত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি প্রার্থনা করেন। সুতরাং তাঁহাদের আত্মার বন্ধন মোচন হয় না। কর্ম্মযোগী স্বর্গলাভান্তে পুণ্যক্ষয়ে আবার মর্ত্ত্যে অপবর্ত্তিত হয়। রাজত্ব ভোগাদিরও শেষে পুণ্যক্ষয়ে সাধারণাবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। সুতরাং এ সকল অনিত্য ফল ভক্ত বা জ্ঞানী বাঞ্ছা করেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন—

সাংখ্যযোগং পৃথগবালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলং॥

বালকগণই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ মনে করে। অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি অজ্ঞানগণই ভেদদর্শন করে। জ্ঞানিগণ দুইটীকে একই মনে করেন। একটী আশ্রয় করিলেই উভয়ের ফল লাভ হয়।

"কর্ম্মণ্য কর্ম্ময়ঃ পশ্যে দ কর্ম্মনি চ কর্ম্ময়ঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃস্ন কর্ম্মবিৎ॥

যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞান, এবং অকর্ম্মে অর্থাৎ জ্ঞানে কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান, এবং তিনিই প্রকৃত যোগী ও কর্ম্মাকর্ম্ম তত্বজ্ঞ। নিষ্কাম কর্ম্মও জ্ঞানে সমান ফল। অহং জ্ঞানশূন্য হইয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করাও যা, কর্ম্মসংন্যাস করাও তাই। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে স্বস্ব বর্ণ-শ্রমানুযায়ী নিষ্কাম কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"কাম্যানাং কর্ম্মানাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ
সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥"

পণ্ডিতেরা কাম্যকর্ম্মের যে ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ, তাহাকেই সন্ন্যাস বলেন। এবং সমস্ত কর্ম্মের যে ফল ত্যাগ, তাহাকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন। গার্হস্থাশ্রমে থাকিয়াই সন্ন্যাস হইতে পারে। কিন্তু সে বড় কঠিন সংযম। বিড়ালের সম্মুখে মাছ দুধ থাকিবে, অথচ বিড়াল তাহাতে দৃক্‌পাতও করিবে না। জনক, অম্বরীষ, ভরত, ভীষ্ম প্রভৃতি এইরূপ কর্ম্মযোগী ও কর্ম্মসন্ন্যাসী। সংসার ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহার যাজন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। চারিদিকে প্রলোভনের বস্তু অথচ প্রলুব্ধ হইতে হইবে না। "ধর্ম্মস্চার্থস্চ কামস্চ যত্র যোগো হ্যযোগিনাম্", এই ধর্ম্মে অযোগী ব্যক্তিগণেরও ধর্ম্ম অর্থ এবং কামের যোগ অবস্থিত। অন্য ত্রিবিধ আশ্রমীই সংসারী লোকের দ্বারা জীবিত থাকে। গৃহ পালিত জীবজন্তু যতি সন্ন্যাসী সকলেই গৃহীর প্রদত্ত অন্নে জীবন ধারণ করে। দান, ধ্যান, যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, ক্ষুধিতে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, পীড়িতে ঔষধ, অজ্ঞানিকে জ্ঞান গৃহীর ধর্ম্ম। সুতরাং গৃহীর কর্ত্তব্য অনেক, দায়িত্বও অনেক। অনাসক্ত চিত্তে সমস্ত কার্য্যসম্পন্ন করিতে পারিলেই তিনি মহাপুরুষ।

জ্ঞানে বা নিষ্কাম কর্ম্মসাধনে যেমন আত্মার বন্ধন মুক্ত হয়, ভক্তিতেও তেমনি। ভক্ত ভক্তিবলে সেবার অধিকারী হইয়া ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারেন। এমন কি, তাঁহার পার্ষদ পর্য্যন্ত হইবারও অধিকারী হইতে সক্ষম হন।

ভক্তই ভগবানের সমধিক কৃপাভাজন হইবার অধিকারী। উদ্ধব, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, হনুমান, জনক, অম্বরীষ, ভরত, অক্রুর, যুধিষ্ঠির, নারদ, শুকদেব, ব্যাস, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি সাধু মহাজনগণ ভক্তিবলে ভগবানকে পাইয়াছেন। ভগবানকে পাওয়াই ভক্তের লক্ষ্য। ভক্ত সাধন বলে তাঁহাকে লাভ করিয়া অনন্ত সুখশান্তি লাভ করেন। ভক্ত সাযুজ্য মুক্তিকে ঘৃণা করেন। উহা জলে জল মিশার ন্যায়, তাহাতে জীবের সুখ কি? চিনি হইলে চিনির কি সুখ? কিন্তু খাইতে পাইলে সুখ আছে। তাই ভক্ত সেই প্রাণকান্তকে পাইবার জন্য সমস্ত জীবন ব্যাকুলভাবে তাঁহার অন্বেষণ করেন। তাঁহাকে না পাইলে ভক্ত যখন আর বাঁচেন না, দিবানিশি হা হুতাশ করিয়া বেড়ান, তখন ভক্তবৎসলের কৃপা হয়। তিনি দর্শন দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। তাঁহার আব্দার পর্য্যন্তও পালন করেন। ভগবানের নিকটে ভক্তের আব্দার সরলপ্রাণ শিশুর আব্দারের ন্যায়। তাহা কেবল বিশুদ্ধ ভালবাসার আব্দার। তাঁহার সমস্ত ভালবাসা

ভগবানে নিবদ্ধ। পার্থিব সমস্ত ভালবাসাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ঐ পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন।

"মমপিতা মম মাতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহং।
এবংবিধ মমত্বং যদ্ সমোহ ইতি কথ্যতে॥

আমার পিতা, আমার মাতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তুতে যে মমত্ব, তাহাই মোহ। ভক্তের এই মমত্ব থাকে না। ভক্ত সমস্ত মমত্ব ভগবানেই অর্পণ করেন। এই মমত্বাতিশয়ে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া যান। আবার অভক্ত মমত্বাতিশয়ে মোহ-পাশ বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর বশীভূত হয়। কেবল মাত্র ভগবানের নাম জপ কীর্ত্তনেই জীবের কর্ম্মপাশ ছিন্ন হয়। ব্রহ্ম হরিদাস ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি দিবা-নিশি তন্ময়চিত্তে কৃষ্ণ নাম জপিতেন। তিন লক্ষ নাম তাঁহার দৈনিক নিয়ম ছিল। নামের সঙ্গেই তিনি বর্ত্তমান। যিনি তাঁহার নাম করেন,তিনি তাঁহার নববিধা ভক্তিই করেন। নামের মহাজন হরিদাস যেরূপে দেহত্যাগ করেন, তাহা অতি আশ্চর্য্য। তিনি জরা-জীর্ণ শরীরে নামের সংখ্যা পূরণ করিতে পারেন না, তাই দেহত্যাগে অভিলাষী। চৈতন্য প্রভু কীর্ত্তনীয়া লইয়া উপস্থিত। হরিদাস অঙ্গনে বসিয়া প্রভুর চরণযুগল বক্ষঃ-স্থলে ধারণ পূর্ব্বক অনিমেষ নয়নে তাঁহার বদন-কমলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। চারিদিকে বেড়া কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। এমন সময়ে হরিদাস আত্মাকে উৎক্রামণ করিয়া দিলেন। স্বেচ্ছানুসারে এমন ভাবে হরিদাসের মত ভক্ত ভিন্ন আর কে আত্মোৎ-ক্রামণ করিতে পারেন? ভক্তই হউন, কি জ্ঞানীই হউন, যাঁহার মায়ার বন্ধন ছিন্ন হই-য়াছে, তিনিই মুক্ত। মুক্ত ব্যক্তিকে আর জন্ম মরণ ক্লেশ ভুগিতে হয় না। আজ কাল মানবচরিত্রের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, মুক্তি কথাটা বড় কাহারও চিন্তার বিষয় নয়। কেবল বাহ্য লইয়াই সকলে ব্যস্ত, কাজেই পারমার্থিক চেষ্টা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। মানবের উন্নতি বলিলে কেহ আধ্যাত্মিক উন্নতি বুঝেনা। বাহ্যোন্নতিই এখনকার উন্নতি। এতদ্দ্বারা ধর্ম্মবলের হীনতা ও পাশববলের উৎকর্ষই সাধিত হইয়াছে।

জীব জগতে এত বৈষম্য দেখি কেন? কর্ম্মফলই কি ইহার কারণ নয়? একজন রাজা হইয়া কোটী কোটী লোকের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ কোটী কোটী লোককে সুখস্বচ্ছন্দতা দান করিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করিলে অত্যাচারে ঘোরতর উৎপীড়িতও করিতে পারেন। আমরা ৩০ কোটী ভারত-সন্তান নিয়ত অশ্রুজলে এই পুণ্যভূমিকে বিধৌত করিতেছি কেন? কেন ৩০ কোটী মানব মুষ্টিমেয় গৌরাঙ্গের ভোগ্য বস্তু মধ্যে পরিগণিত হওত শোষণ-যন্ত্রে বিশুষ্ক হইয়া হাহাকার করিতেছি? কেন গৌরাঙ্গের সবুট চরণা-ঘাতে কৃষ্ণাঙ্গের প্লীহা বিদীর্ণ হয়? কেন দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় সাধুশীল ব্যবহারাজীব হইয়াও চোর দস্যু-দিগের সহিত একত্র কারা যন্ত্রণা ভোগ করি-য়াছিলেন? হিন্দুশাস্ত্রে বলে এ সকলই কর্ম্ম-ফল। কোটী কোটী ভারত-সন্তানকে কেন এরূপ কর্ম্মফল ভুগিতে হয়? আমাদের চক্ষে যিনি পবিত্র দেবোপম-চরিত্র, স্বদেশ-হিতৈষণারূপ মহাব্রতে দীক্ষিত হইয়া যিনি দেশবাসীর ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি পাইবার যোগ্য, তিনি কেন বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছিত, অপমা-

নিত ও দণ্ডিত হইতেছেন? ইহা কিরূপ কর্ম্মফল? এ গুরুতর সমস্যার সমাধান মানব-বুদ্ধির দুর্জ্ঞেয়। তবে ইহা সত্য যে, ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব-কলঙ্ক নাই। কিরূপ কর্ম্মফলে একটা বিরাট জাতি পদমর্দ্দিত হইতেছে, তাহা অনির্দ্দেশ্য। তবে সার্ব্বজনীন কাপুরুষতা যে একটী বিকর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই।

চারিদিকেই বৈষম্যের খেলা। ব্যাঘ্র শৃগালকে, শৃগাল বিড়ালকে, বিড়াল মৎস্যাদিকে, তাহারা আবার তদপেক্ষা দুর্ব্বলকে, ধরিয়া ভক্ষণ করে। মানুষ আবার সমস্ত ইতর জীবের উপরেই প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে এবং বহুবিধ জীবের প্রাণ হনন করিয়া উদর-পূর্ত্তি করিতেছে। মানব মধ্যেও ঘোরতর বৈষম্য। কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ শূদ্র, কেহ মেথর, কেহ ধনী, কেহ পথের কাঙ্গাল, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য, কেহ রাজা, কেহ প্রজা ইত্যাদি। যাঁহারা সাম্যবাদী, তাঁহারা একবার জগতের এই বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, সাম্যই স্বাভাবিক কি বৈষম্যই স্বাভাবিক। ঈশ্বরে দয়াময়, মঙ্গলময়, সমদর্শী ইত্যাদি বিশেষণ দেই; যদি কর্ম্মফল ঠেলিয়া ফেলি, তবে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়; তিনি বিষম পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তাহা হইলে তাঁহাকে ভক্তি করিবার কিছুই থাকে না। বস্তুতঃ ঈশ্বরে ওরূপ দোষারোপ করা যাইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—
"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোহস্তিন প্রিয়ঃ
যে ভজন্তিতুমাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষু চাপ্যহং ॥

আমি সর্ব্বভূতে সমান। কেহ আমার দ্বেষ্যও নাই, কেহ প্রিয়ও নাই। যে ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাতে এবং সে আমাতে বর্ত্তমান।

তবে এ বৈষম্য কেন? এ নিজকৃত কর্ম্মফল।
"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণ দোষয়োঃ ॥"

মা যেমন পুত্র কন্যাকে পালনও করেন, দোষ দেখিলে তাড়নও করেন, নিয়ন্তা ঈশ্বরও, তেমনি, তাঁহার সন্তানগণকে গুণ দোষানুরূপ পুরস্কার ও দণ্ড দিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহার দয়া ভিন্ন পক্ষপাতিত্বের গন্ধও নাই।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কর্ম্ম ত্রিবিধ—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী। জন্মগত বৈষম্য প্রারব্ধ কর্ম্মজনিত। কেহ জন্মান্ধ, কেহ জন্ম-বধির, কেহ কুষ্ঠগ্রস্ত, কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত, কেহ বলবান, কেহ দুর্ব্বল, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ নির্ব্বোধ, এ সকলের মূলে কি সুবিচার না অবিচার? আস্তিক মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, সুবিচার! সুবিচার!

মানুষ স্ব স্ব প্রাক্‌সঞ্চিত কর্ম্মফলে যেরূপ বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, দৈহিক শক্তি প্রভৃতির বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, শিক্ষা, সঙ্গ ও কর্ম্মগুণে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। মানুষের অহং জ্ঞান (আমিত্ব বোধ) আছে। এই অহং জ্ঞানই কর্ম্ম-প্রয়োজক। যাঁহার অহং জ্ঞান নাই, তাঁহার শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি পৃথিবীর জীব হইয়াও পৃথিবীর বাহিরে। যিনি কর্ম্ম করেন, শুভাশুভ কর্ম্মজনিত উন্নতি, অবনতি, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, সমস্তের ফলই তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়। সাধনার তারতম্যানুসারেই ফলের তারতম্য। কর্ম্মের ফল কতক বর্ত্তমান জীবনেই ভোগ করিতে হয়, কতক বা আগামী জীবনে। এই কর্ম্মের বৈষম্যেই জীব জগতে বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। কর্ম্মফলে মানুষ ইতর জীব হয়, আবার ভোগান্তে

মনুষ্যত্ব লাভ করে। দেবতা হইয়া ভোগান্তে পুনর্ব্বার মনুষ্য-গতি প্রাপ্ত হয়। বিশ্ব সংসারের সমস্ত বৈষম্য ও বৈচিত্র্য এই কর্ম্মফল-মূলক।

জড়বিজ্ঞান-বাদী বলিবেন, মনুষ্য তাহার পিতামাতার বুদ্ধি, প্রকৃতি ও শক্তি লাভ করে। তাহার বৈষম্যেই মানুষের বৈষম্য হয়। তাহার পর নিজকৃত কর্ম্মানুসারে তাহাদের মধ্যে অধিকতর বৈষম্য ঘটিয়া পড়ে। সন্তান তাহার পিতা মাতার ব্যাধি প্রাপ্ত হয়, আবার ঐরূপ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে দোষ গুণেরও অংশ ভাগী হয়। ইহাতেও কর্ম্মফলের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কি প্রয়োজন? আমরা নাস্তিকের প্রশ্নোত্তর দিতে প্রয়াস পাইব না, কেননা সে বিচার স্বতন্ত্র প্রকার। যাঁহারা আস্তিক, তাঁহারা ঈশ্বরকে দয়াময়, মঙ্গলময়, ন্যায়বান ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেন। সুতরাং তিনি শ্যামার পিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে দেন না, ইহাও স্বীকার করিবেন। পিতা উপদংশাদি রোগে পীড়িত ছিলেন,পুত্র কেন বিনা দোষে জন্মকাল হইতে, পিতার পীড়ার অংশ-ভাগী হইবে? একের পাপে অন্যের দণ্ডনীয় হওয়া সুবিচার-সিদ্ধ নয়। অবশ্য বুঝিতে হইবে, পুত্রের কর্ম্ম দোষে দণ্ড ভোগের জন্যই ঐরূপ পিতার ঔরসে জন্মিতে হইয়াছে। এইরূপ সর্ব্বত্রই জন্মগত ও কর্ম্মগত বৈষম্যে জগতে ঘোরতর বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রালব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী এই ত্রিবিধ কর্ম্মফলে মানব কখনও তির্য্যগ্ জাতি, কখনও স্থাবর জীব, কখনও মনুষ্য এবং কখনও দেবতা হইতেছে।

ভোগে শক্তির খেলা। যেখানে শক্তি সাধনা নাই, সেখানে ভোগ তিষ্টিতে পারে না। লালসার আত্যন্তিকতা মানুষকে পশু হইতেও অতি নিকৃষ্ট-স্বভাব ও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলে। তাই কত চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা, সতীধর্ম্ম-নাশ প্রভৃতি পাপাচরণ হইতেছে। বলী দুর্ব্বলের উপর আধিপত্য করিতেছে, বিনাশ করিয়া তাহার দেহ ভক্ষণ করিতেছে। এখানেও ঐ কর্ম্মফলেই এক অপরের ভক্ষ্য। ভগবান্ শক্তির এই লীলা সর্ব্বভূতে নিগৃহীত করিয়া বিস্ময়কর বৈচিত্র্য উৎপাদন করত চরাচর বিশ্বের রক্ষণ পালন করিতেছেন।

আজকাল একদল লোক আছেন,যাহারা বৈষম্য রাখিতে অনিচ্ছুক। এই বৈষম্য বিনাশের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। কতকের লক্ষ্য, জাতিভেদের প্রতি। তাঁহারা ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকে এক সমান্তরালের মধ্যগত করিতে চান। তাঁহারা বলেন, বর্ণাশ্রম মানব-সৃষ্ট। মানব সকলেই সমান, এক পরম পিতার সন্তান, সুতরাং সকলেই সকল বিষয়ে তুল্যাধিকারী। কেনই বা শ্রেণী বিশেষকে ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার চরণে মস্তকাবনত করিব? কেনই বা একজনকে রাজা বলিয়া তাঁহার অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিব? আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর শৃগাল ও ব্যাঘ্রকে ভক্ষ্য ভক্ষকরূপে সৃষ্টি করিলেন কেন? এ বৈষম্যে যদি ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব থাকে, তবে ব্রাহ্মণ শূদ্র সৃষ্টিতেও তাহাই মনে করিবেন। যদি প্রাগুক্ত সৃষ্টিতে পক্ষপাতিতা না থাকে, তবে ব্রাহ্মণ শূদ্র সৃষ্টি-তেও নাই। যদি বলেন, বর্ণবিভাগ মানব-কৃত, তাহাতো ঈশ্বরকৃত নয়। মানিলাম, মানবকৃত; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।

আমিই গুণ এবং কর্ম্মবিভাগানুসারে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। ইহা যদি ঈশ্বরোক্তি না হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই।' আমাদের

বক্তব্য এই যে, বর্ণাশ্রমিক বিভাগানুসারে যে উচ্চনীচ আছে,তাহাতো ঈশ্বরের অজ্ঞাত নয়, তবে জানিয়া শুনিয়া তিনি একজনকে ব্রাহ্মণ কুলে, অন্যজনকে শূদ্রকুলে সৃষ্টি করিলেন কেন? অবশ্যই ইহার মূলে বৈষম্যের বীজ কর্ম্মফল বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ বিদ্যা ও তপো-গুণে শ্রেষ্ঠ। এখন ক্রমশঃ সেই গুণহীন হইয়া আপনা আপনি পূর্ব্বগৌরব-চ্যুত হইতে-ছেন। এক কর্ম্মফলেরই বিবিধ প্রকার লীলা খেলা। ইহাতে বৈষম্যই যে স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য, ইহা বুঝা যাইতেছে।

এক পিতার পাঁচ পুত্র পৈতৃক ধনে তুল্যা-ধিকারী হইল। কেহ সর্ব্বস্ব বিনাশ করিয়া ফেলিল, কেহবা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়া তুলিল। এরূপ ঘটনা সর্ব্বত্রই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। লাইকারগাস্ প্রজাবৃন্দের সমস্ত ধন সমভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। লৌহখণ্ড মুদ্রা রূপে ব্যবহৃত হইত; অল্পদিনে মধ্যে আবার বৈষম্য ঘটিয়া গেল।

"শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।
অথবা যোগিনা মেব কুলে ভবতি ধীমতাং।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশং॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান অর্জ্জুনকে কহি-তেছেন—কর্ম্মযোগী মরণান্তর পবিত্রচেতা ধনীর গৃহে অথবা ধীমান কর্ম্মযোগীর গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেন। মানবের ধনীর গৃহে জন্মাপেক্ষা সাধুচরিত্র যোগীর গৃহে জন্মলাভই দুর্লভ, সুতরাং সমধিক বাঞ্ছনীয়। ধনীর গৃহে জন্মিলে পুনঃ পতনের সম্ভাবনা খুব বেশী। ধর্ম্মপ্রাণ যোগীর গৃহে জন্মিলে সে আশঙ্কা থাকে না। উত্তরোত্তর তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনাই সমধিক। মনুষ্যমাত্রেরই শ্রেষ্ঠজন্ম লাভের জন্য সাধনা করা কর্ত্তব্য। সাধনার তারতম্যেই জন্মের তারতম্য। যাহারা কেবল শিশ্নোদর-পরায়ণ, কামিনী-কাঞ্চন সেবাই যাহাদের সমস্ত জীবনের কার্য্য, তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখই ভোগ করে। শুদ্ধচিত্তে ভগবদ্ভজন ও ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মদ্বারা ক্রমে কর্ম্মপাশ ছিন্ন হয়। চিত্তশুদ্ধি না হইলে পাপের বীজ নষ্ট হয় না। পাপের বীজ নষ্ট না হইলেও কর্ম্মপাশ ছিন্ন হয় না, সুতরাং পুনঃ পুনঃ গর্ভযন্ত্রণা ও দুঃখ-ভোগ অনিবার্য্য।

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, জনক, অম্বরীষ, ভরত প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণ্য কর্ম্ম-যোগিগণ কর্ম্মবলেই জ্ঞান ও ভক্তির উচ্চচূড়া লাভ করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মানুষ কর্ম্মগুণে দেবত্ব ও পশুত্ব উভয়ই প্রাপ্ত হয়। স্বর্গ ও নরক কর্ম্মেরই ফল।

হিন্দুশাস্ত্রে স্বর্গ ও নরকের ছবি চিত্রিত হইয়াছে। স্বর্গ পুণ্যাত্মার, নরক পাপীর বাস-স্থান। আমরা এই পৃথিবীতেও স্বর্গ ও নর-কের চিত্র দেখিতে পাই। তবে কি স্বতন্ত্র স্বর্গ নরক সম্ভবে না? স্বর্গ নরক কথাটা কি ভিত্তিহীন?

বিশ্ব-নিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের অনন্ত সৃষ্টিতে কত প্রকারের জীব-লোক আছে, কে বলিতে পারে? আমরা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর অতি-রিক্ত কোন জীব জগতের তত্ত্ব অবগত নহি। এমন কত কোটী কোটী জীব-জগত বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে আমাদের অপেক্ষা উন্নত ও হীন কত প্রকার জীব আছে,তাহার ইয়ত্তা করাই অসম্ভব। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁহার এক জগতের জীবকে অন্য জগতে প্রেরণ করিতে পারেন না, কি করেন না—ইহাও যুক্তিসিদ্ধ নয়। দেবতা মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব-যোনি। যে জীব-লোকে তাঁহাদের বাস, তাহাই দেবলোক বা স্বর্গ। পুণ্যাত্মাদের

সেই সুখময় স্বর্গে বাস হওয়া অসম্ভব কি? পুরাণে স্বর্গ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ বর্ণিত আছে। সমস্তই কল্পনার সৃষ্টি, এরূপ প্রগল্ভ বাক্য বলা আমাদের ন্যায় সঙ্কীর্ণ জ্ঞানীর পক্ষে বাতুলতা। রাজা দশরথ দেবদ্রোহী অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন। অর্জ্জুন ইন্দ্রের নিকটে অস্ত্র শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। নারদাদি ঋষিগণ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী হইতে স্বর্গে গতায়াত করিতেন। এরূপ ভূরি ভূরি কথা পুরাণাদিতে দৃষ্টিগোচর হয়। স্বর্গের সুখকারিতা সম্বন্ধে বহুল পরিজ্ঞাত বাক্য রামায়ণ মহাভারতাদি অতুল্য জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থে বিদ্যমান। কর্ম্মগুণে ইন্দ্র এই স্বর্গস্থ দেবগণের রাজা। স্বর্গ আবার সপ্তলোকে বিভক্ত,—ভূ, ভুব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য। ইহারই মধ্যে ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ লোক হওয়া সম্ভব। এতৎ সম্বন্ধে বাহুল্য বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক। তবে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিলে যে এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ জীব-লোক গমনের অধিকারী হইতে পারে, তাহাই মাত্র উদ্দেশ্য।

নরক ঐরূপ দুঃখ পূর্ণ কোন অপরিজ্ঞাত জীব লোক হওয়া অসম্ভব নয়। পুণ্যাত্মার জন্য সুখময় ভুবনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে পাপাত্মার জন্য দুঃখময় নরকের অস্তিত্ব অসম্ভব কি? পুরাণে চতুরশীতিঃ প্রকার নরকের ভীষণ চিত্র চিত্রিত আছে। সে যাহা হউক, এ পৃথিবী হইতে সুখময় এবং দুঃখময় ভুবন যে থাকিতে পারে, তাহা কোন মতে যুক্তিবিরুদ্ধ বলা যায় না।

পরী ও ভূত যোনির কথা সর্ব্ব দেশেই আবাহমানকাল প্রচলিত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এবিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছেন। ইহাদের ফটো পর্য্যন্ত তোলা হইতেছে। কিছু দিন হইল, পাবনার, রণজিৎ লাহিড়ী নামে একজন উকীল তাঁহার সস্ত্রীক ফটো তুলিতে তাঁহার মৃতা স্ত্রীর মূর্ত্তি ঐ সঙ্গে উঠিয়া যায়। তিনি কলিকাতায় গিয়া অনেকানেক শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ও বাঙ্গালীকে তাহা দেখাইয়াছেন। এ একটী অদ্ভুত ঘটনা। মহারাজ দশরথ সীতা দেবীর অগ্নি পরীক্ষা সময়ে দেবগণ সহ তথায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাম লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন ও রাম সীতাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এত দিন এ সকল লোকে বিশ্বাস করিত না, কিন্তু আজ কাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন জন্য আমরাও বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি। আমি স্বচক্ষে পরীর কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আক্রান্তা স্ত্রীলোকটীর মস্তক আমার জানুর উপরে। কিল, ঘুষি, চপেটাঘাত, গলা টিপিয়া ধরা ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে প্রহার চলিতেছে, শব্দ শুনিতেছি, কিন্তু প্রহর্ত্তাকে দেখিনা। এ বিবরণ সবিস্তারে লিখিতে গেলে অনেক হইয়া পড়ে, তাই ক্ষান্ত থাকিলাম। তবে এই সূক্ষ্ম শরীরী জীব-যোনি যে মানবাত্মারই বিপরিণতি, তাহার আর সন্দেহ নাই। জড় শরীরধারী মানুষ যাহা কিছু করিতে পারে, এই অশরীরী যোনিও তাহা সবই পারে। পরন্তু মনুষ্য হইতে ইহাদের শক্তি অনেক বেশী। মানুষের অনেক অসাধ্য সাধন করিতে আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাঁহার অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি-চাতুর্য্যে এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত, তাঁহার সৃষ্টি রাজ্যে কত কি অত্যদ্ভুত সৃষ্টি পদার্থ বর্ত্তমান, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তাহা নির্ণয়ে অসমর্থ। পরিমিত-বুদ্ধি মনুষ্য বিজ্ঞান বলে বস্তুতত্ত্ব অবগত হইয়া আজ কাল নিত্য নূতন আবিষ্করণ দ্বারা জগৎকে মুগ্ধ করিতেছে। যাঁর

শক্তিতে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস হইতেছে, প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে যাঁর অসীম জ্ঞান, অপরিজ্ঞেয় কৌশল ও অপার মহিমা বিরাজমান, তাঁহার সৃষ্টি-চাতুর্য্য যে কত গুরুগম্ভীর জ্ঞানের পারিচায়ক, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে ?

আমরা যে গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলাম, সুধী পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। উপসংহারে কর্ম্মফল সম্বন্ধে আরও গুটিকতক কথা বলিয়া প্রস্তাবের শেষ করিব।

প্লেগ, ম্যালেরিয়া জ্বর, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক পীড়া এবং যুদ্ধে এক যোগে বহুসংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, রাজপীড়ন প্রভৃতি আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ঘটনায় বহু লোকে ক্লিষ্ট ও মৃত্যুগ্রস্ত হয়। বহু লোকের অদৃষ্টচক্র একভাবে আবর্ত্তিত হয় কেন ? ঐ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদিত হইতে পারে। পাপ ত্রিবিধ, শারীর, মানস এবং কর্ম্মজ। দুঃখও ত্রিবিধ, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। অত্যুৎকট পাপ ও অত্যুন্নত পুণ্যের ফল ইহকালেই অনেক ফলিয়া যায়। বাকী ভবিষ্যজ্জীবনে ভোগ করিতে হয়। শারীরিক পাপগুলির ফল পীড়া ও রাজদণ্ডের দ্বারা, ও মানস পাপগুলি অনুতাপ দ্বারা ইহজীবনেই ভোগ করিতে দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপক দুঃখগুলির কারণ নির্দ্দেশ করা মানব বুদ্ধির দুরধিগম্য। ঐশ্বরিক সমস্ত কার্য্যগুলির কারণ অনুভব করিতে মানুষের সাধ্য থাকিলে মানুষ দুঃখের অস্পৃষ্ট হইত; মানুষের অপূর্ণতাও থাকিত না। যাঁহার সৃষ্ট একগাছি দুর্ব্বার রচনা-চাতুর্য্য দর্শনে বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়, তাঁহার কার্য্যকলাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তাৎপর্য্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব। জন্ম মৃত্যুর অন্তরালে ঈশ্বরের যে কি লীলা খেলা, তাহা তিনিই জানেন। মানুষের প্রতি তাঁহার অপরিসীম দয়া, অব্যভিচারিণী বিচারপদ্ধতি, অনন্ত মঙ্গলেচ্ছা প্রভৃতি দর্শনে ভক্তিরসার্দ্র চিত্তে তাঁহার অর্চ্চনা করা, তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালন করা, নির্ভয়ে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করা, তাঁহার সৃষ্ট সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা ই প্রকৃত মানবত্ব। ইহাই আত্মোন্নতি এবং মানব জীবনের চরম লক্ষ্য।

শ্রীজানকীনাথ গোস্বামী।

কমলাকান্ত।*

বহুকাল পরে কমলাকান্ত শর্ম্মা প্রসন্ন গোয়ালিনী সমভিব্যাহারে বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে নব কলেবরে অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার সেই প্রাচীন কীটদষ্ট 'দপ্তরটী' একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখার ইচ্ছা হইল। দেখি, কীটদষ্ট হইলেও, তাহার পত্রে পত্রে,

---

* এ প্রবন্ধ 'কমলাকান্তে'র সমালোচনা নহে—Dodd's Beauties of Shakespeare-প্রদর্শিত পথে 'কমলাকান্তে'র সৌন্দর্য্য-প্রদর্শনের প্রয়াস মাত্র।

ছত্রে ছত্রে, এখনও ভাবের রস উচ্ছ্বসিত হইতেছে—সে রস আস্বাদনে ভাবুক মাত্রই এখনও তন্ময় হইয়া যান।

De Quincey-শিষ্য কমলাকান্ত "আফিম-প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইয়া" কোকিলের 'কু-উ'—ধ্বনি, ভোমরার 'ভোঁ-ভোঁয়ানি', পতঙ্গের 'চোঁও—বোঁও,' বিড়ালের 'মেও-মেঁও,' প্রভৃতি অমানুষী ভাষা বুঝিতে পারেন, এবং মানুষের ভাষায় এরূপ ভাব ব্যক্ত করেন যে, তাহা 'মানুষ' মাত্রেরই মর্ম্মস্পর্শ করে। তিনি "আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে" কখন "সংসার-বৃক্ষে মায়াবৃন্তে" মানুষ-ফল ঝুলিয়া থাকিতে দেখেন, কখন সংসার-ঢেঁকিশালে নানাগুণের মনুষ্য-ঢেঁকির নানা সামগ্রী ভানিয়া বাহির করার পরিচয় দেন, কখন বা স-ভাষা উদর-দর্শন রূপ সূত্র-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ সমালোচনার মুখে কাহারও নিস্তার নাই—পুরুষ, রমণী, উকীল, হাকিম, দেশহিতৈষী, পরপ্রত্যাশী, অধ্যাপক ব্রাহ্মণ,বঙ্গীয় লেখকগণ, প্রভৃতি সকলেই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী সমালোচনার অধীন। তাঁহার বিবেচনায় বিদ্যা—তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়; এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না। স্বীয় উদ্দেশ্য-সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না।

বাঙ্গালীর বিদ্যা—স্বতঃসিদ্ধ,তজ্জন্য লেখা-পড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই,—গ্রন্থ লিখিতে, সংবাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল।

স্ত্রীলোকের বিদ্যা—কখন আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পাওয়া যায় না। নারিকেলের মালার ন্যায় তাহা বড় কাজে লাগে না।

লিপিব্যবসায়ী—তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ অন্যকে পড়িয়া শুনাইতে, বড় ভালবাসেন, আর যে ব্যক্তি তাহা বসিয়া শুনে, তাহার নিতান্তই বশীভূত হয়েন।

বঙ্গদেশের লেখকগণ—তেঁতুল-বিশেষ। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধ-কেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে অম্ল—তাও নিকৃষ্ট; একগুণ—নীরস কাষ্ঠাবতার—সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল! অমন কুসামগ্রী আর সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেশী হাকিমেরা—পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। অনেকগুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড। তবে তাহা দেশী নহে—বিলাতী কুষ্মাণ্ড। [কিন্তু সুপক্ব, কি অকাল পক্ব, তাহা চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিছু বলেন নাই।]

দেশহিতৈষীর দল—ঠিক যেন শিমুল ফুল। ফুল যখন ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা,—বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না—একটু একটু পাতাঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত। ফুলে গন্ধমাত্র নাই—কোমলতা মাত্র নাই—কেবল বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা। ফলেও বড় লাভ ঘটে না; অন্তর্লঘু ফল—রৌদ্রের তাপে ফট্ করিয়া ফাটিয়া উঠে, তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়িয়া পড়ে! তাঁহারা মনে করেন, ঘ্যানঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়া জমা করিয়া ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করিতে থাকেন।

বাহ্যসম্পদের পূজা—কল্পে তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরাজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত। Adam Smith-পুরাণ এবং Mill-তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়। এ উৎসবে ইংরেজী সংবাদপত্র সকল ঢাক-ঢোল—

বাঙ্গালা সংবাদপত্র কাঁসীদার। শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক।

আজকাল পলিটিক্সের খরস্রোতে পড়িয়া বাঙ্গালীর অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে,—Mendicant policyর নিন্দাবাদে দেশের মধ্যে বিলক্ষণ দলাদলি বাধিয়াছে;—কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বহুদিন পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে আপন মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি ঘোর Moderate—তিনি বলিয়াছেন, "আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স্—কিন্তু বোবার বাক্‌চাতুরীর কামনার মত * * * (উহা) হাস্যাস্পদ। (বাঙ্গালী জাতির) পলিটিক্স্ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!"—ইহাই তাঁহাদের পলিটিক্স্। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এদেশের মাটীতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই। * * * পলিটিক্স দুই রকমের—এক কুক্কুর জাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। অস্মদ্দেশীয়গণের মধ্যে অনেকেই কুক্কুরের দলের পলিটিক্যাল।"

Socialism নামে আর একটা কথা আজ-কাল অস্মদ্দেশে শুনা যাইতেছে। মার্জ্জার-রূপিনী Socialistএর সাহিত্য তর্ক প্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তী মহাশয়, অনেক দিন হইল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ শুনাইয়া গিয়াছেন। বিড়ালী কমলাকান্তকে বলিতেছে—

"আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান * * * দাঁত বাহির হইয়াছে, জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি—'খাইতে পাই না।' আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। * * * আমাদের কৃষ্ণচর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ ধ্বনি শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? তোমার পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে? * * * আমার মত দরিদ্রের দুঃখে কাতর কে হইবে? * * * তৈলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর। চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?" এই বিড়ালীর বিতর্কে কমলাকান্ত শর্ম্মাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইয়াছিল।

উকীল-কুলের উপর কমলাকান্তের কিছু অতিরিক্ত উগ্র দৃষ্টি। শেষ দশায়—খোসনবীশ জুনিয়ারের আমলে প্রসন্ন গোয়ালিনীর মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে আসিয়া তিনি তাহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে (পূর্ব্বপরিচিতা মার্জ্জারীর নিকটে কুশিক্ষা পাইয়াই বোধ হয়) তাঁহার একটু Socialistic ভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, "যদি সুভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। * * * সেকন্দর হইতে রণজিৎসিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of conquest যদি একটা right হয়, তবে right of theft কি একটা right নয়?"

এ সকল কথা শুনিয়া কমলাকান্তকে নিতান্ত ক্ষিপ্ত বোধ হইতে পারে, কিন্তু যখন তাঁহার মুখে শুনি—"প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। * * * অনন্তকাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক; মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ

চাই না ;"—যখন তিনি বলেন, "পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই ;"—যখন তিনি আকুল-কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না ?"—যখন তিনি উপদেশ দেন, "যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্ম প্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহ নিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জ্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্ম পরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্য জাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ। * * * যদি বিবাহ-বন্ধনে মনুষ্য চরিত্রের উৎকর্ষসাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। * * * বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতিশিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।"—তখন তাঁহাকে মানব-জগতে একজন আদর্শ পুরুষ বলিয়া বোধ হয়, মহাগুরু জ্ঞানে তাঁহার উদ্দেশে বারবার প্রণিপাত করি।

তারপর কমলাকান্তের সেই একটী মাত্র সঙ্গীত-সমালোচনা। বাঙ্গালা ভাষার সেই মোহমন্ত্র শুনিয়া ভাবুক কমলাকান্ত বলিয়াছিলেন, এই গীত "কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব না।" আজ আমরাও (বোধ হয় সমস্ত বঙ্গবাসীর সহিত এককণ্ঠে) বলিতে পারি, প্রসন্ন গোয়ালিনীকে তিনি সেই গীতের যে ব্যাখ্যা শুনাইয়া গিয়াছেন, তাহা কখন ভুলিতে পারিলাম না,—কখন ভুলিতে পারিব না। সেই বিশ্বব্যাপিনী মানব-প্রীতিই ঐ গীতের মূলসূত্র—"মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল। এক হৃদয় অন্যের হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল। সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্যজীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা—অন্য হৃদয়কামনা।' (তাই) মনুষ্য হৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে—

"এসো এসো বঁধু এসো।"

"সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাজ্ক্ষাশূন্য" কমলাকান্ত ভাবিতেছেন, "আমি কেন দিবস গণিব ?" পরক্ষণেই বলিতেছেন, "গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। * * * যেদিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে, সেইদিন হইতে দিন গণি। * * * হায়! কত গণিব? দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি কই

"অনেক দিবসে, মনের মানসে
বিধি মিলাইল, কই ?"

যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণ সেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?"

"সুখের কথায় বাঙ্গালীর অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর, যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালীর মর্ম্মোক্তি।"—তাই বাঙ্গালী কমলাকান্ত নৈরাশ্যজনিত মর্ম্মবেদনায় আক্ষেপ করিতেছেন,—"আর বঙ্গভূমি! তুমি কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না? তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম * * * তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিশরে, চীনে, দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি।"

"যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে

সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। (কিন্তু) যাহার সুখ গিয়াছে, সুখের নিদর্শনও গিয়াছে, —বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—সেই দুঃখী অনন্ত দুঃখী।" সেই অনন্ত দুঃখের আবেগে চিরদুঃখী কমলাকান্ত বলিতেছেন,—

"আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপাল দেব, লক্ষ্মণ সেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ, প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি—এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? * * * আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবন-চরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সুখ গিয়াছে, সুখ-চিহ্নও গিয়াছে?—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে? চাহিবার এক শ্মশান ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। * * * বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে আমি সেই শ্মশান-ভূমি(র) প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌত-বাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমিত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাঁহার প্রসাদী ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণ কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিনি! তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কলকল তরতর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি, তোমারই অতলগর্ভ মধ্যে সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন—বুঝি, কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়াছেন। * * * যদি গঙ্গার অতল জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?"

শেষ কথা—কমলাকান্তের "দুর্গোৎসব।" অহিফেন সেবনে বিকৃতমস্তিষ্ক কমলাকান্ত সপ্তমী পূজার দিন কুহক দেখিলেন,—তিনি দিগন্তব্যাপী কালস্রোতে নিতান্ত নিঃসহায় একা ভাসমান—ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে কাতর-কণ্ঠে ডাকিলেন,—"কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গ-ভূমি! এ ঘোর কাল সমুদ্রে কোথায় তুমি?" ভক্তবৎসলা মা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন—তাঁহাকে দেখা দিলেন। কমলাকান্ত চিনিলেন—"দিগভুজা, নানা প্রহরণ-প্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা বিজ্ঞান-মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বল-রূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ"—"এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা"—"এই আমার জন্মভূমি"—"এই সুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা!" তখন তিনি প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আবার আকুল স্বরে ডাকিলেন—"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে! শিবে! সর্ব্বার্থ-সাধিকে! * * * এসো মা, গৃহে এসো।" কিন্তু হায়! মা আর শুনিলেন না—"সেই অনন্ত কালসমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল!" তখন যুক্তকরে সজল নয়নে কমলাকান্ত আবার ডাকিতে লাগিলেন—

"উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানু-গৃহীতে! এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ মা বঙ্গজননী!"

"মা উঠিলেন না"—আবাহনের মুখেই বিসর্জ্জন ঘটিল—হায়! আর উঠিবেন না কি?

কমলাকান্ত-কাঙ্ক্ষিত এই মাতৃচরণ-দেশেই সন্তানের দল গাহিয়াছে—"বন্দেমাতরম্!" কমলাকান্ত ও সন্তানসম্প্রদায় যে এক মায়ের সন্তান—অতঃপর ইহার আর কাহাকেও পরিচয় দিতে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত গ্রন্থ নষ্ট হইলেও, এক 'কমলাকান্ত'ই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

বিধবার একাদশীর উপবাস।

জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন, মধ্যাহ্নকাল, মস্তকোপরি নিদাঘের প্রচণ্ড সূর্য্য অগ্নিকণার ন্যায় প্রখর কিরণ অজস্র বর্ষণ করিতেছে। দারুণ গ্রীষ্মে তৃষ্ণায় প্রাণ আই ঢাই করিতেছে। একাদশী তিথি, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ উপবাসী আছেন। তবে তাঁর পিপাসা শান্তির জন্য ডাবের সুশীতল জল, সুমিষ্ট তরমুজ, মিছরির সরবৎ পেয়। আর ঐ আধিব্যাধি-ক্লিষ্টা বৃদ্ধা বিধবা নিদাঘের দুর্ব্বিসহ পিপাসায় ছটফট করিয়া মরিলেও একাদশীর দিন বিন্দুমাত্র জল পাইবে না। ইহাই শুনিতে পাই শাস্ত্রের নিয়ম। তুমি পুরুষ, একাদশীর দিন যদৃচ্ছা জল পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিতে পারিবে—শাস্ত্রীয় অনুকল্পের দোহাই দিয়া লুচি, সন্দেশ, ক্ষীর, ছানা ইত্যাদি বহুবিধ রসনা-তৃপ্তিকর ভক্ষ্যদ্রব্য আকণ্ঠ উদরসাৎ করিবার কথা ছাড়িয়া দেও। আর তুমি নবমবর্ষীয়া বিধবা বালিকা, অথবা অশীতিপর বৃদ্ধা বিধবা, পিপাসায় মৃতকল্প হইলেও, বিন্দুমাত্র গঙ্গা জলে পরিশুষ্ক রসনা সরস করিতে পারিবে না!

এই দুরন্ত গ্রীষ্মের দিনে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেরই পিপাসার জল মিলিল,—মিলিল না কেবল এই হতভাগ্য বঙ্গদেশের বিধবা রমণীর ভাগ্যে। চাতকের আর্ত্তস্বরে অচেতন মেঘও বারিবর্ষণে বিরত থাকিতে পারিল না, কিন্তু হায়, বিধবার আর্ত্তস্বর ত কেহ শুনে না! হে ইন্দ্র! তোমার আকাশে বজ্রের কি এতই অভাব হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রকারগণের মস্তকের জন্য একটীও নাই? যাহারা এই নারকী শাস্ত্রের প্রণেতা, কিম্বা যাহারা শাস্ত্রের এরূপ গর্হিত অর্থ করিয়া লোকের পাপ সঞ্চয়ের সহায়তা করিতেছে, অথবা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম জানিয়া শুনিয়াও যাহারা দেশাচারের বশবর্ত্তী হইয়া এই নিষ্ঠুর নিয়মের অনুমোদন করিতেছে, সেই ভ্রান্ত, হৃদয়হীন ব্যবস্থাপকগণের মস্তক বজ্রে চূর্ণ করিয়া তোমার রাজধর্ম্মের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখ। দেব, আর ত সহে না!

আমাদের এই একটী বিষম রোগ—যে রোগ আমাদের সমস্ত অনর্থের মূল এবং ব্রাহ্মণের অধঃপতনের সুনিশ্চিত কারণ যে, বালক যেমন "জুজুর" নামে ভয়ে আতঙ্কে অজ্ঞান হয়, আমরাও তেমনি, শাস্ত্রশব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্র হতজ্ঞান হই। আমাদের বিশ্বাস, শাস্ত্র দেবতার সৃষ্ট—জগৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর সমুদয় শাস্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে; সুতরাং এই শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিলে প্রত্যবায় আছে। বাস্তবিক শাস্ত্র কি তাই? শাস্ত্র কি সত্যসত্যই দেবতার রচিত—মানুষের রচিত নহে? এই শোচনীয় অধঃপতনের দিনে কে বলিয়া দিবে—শাস্ত্র কি এবং তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই বা কি? নিজে শাস্ত্র পড়ি নাই এবং পড়িবার ক্ষমতাও রাখি না, তবে

কেমন করিয়া তত্ত্বনির্ণয় হইবে ? যে পড়িয়াছে, তাহার কথা শুন। তাও শুনিবে না ; আমি "সটীক" ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহি, এই অপরাধে আমার কথায় অনাস্থা করিবে। আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর নির্ভর করিয়া এত লাঞ্ছনা পাইতেছ, সেও তোমার ভাল হইল !! এই রোগই ত তোমার সমস্ত অনর্থের মূলীভূত কারণ। যদি বুঝাইলে বোঝ ত তোমার এত দুঃখ হইবে কেন ? বালককে শত বুঝাও যে "জুজু" অবাস্তবিক ও কাল্পনিক, ইহা হইতে ভয়ের কোন কারণ নাই, বালক কি তা শুনে ? বালক "জুজু" নাম শ্রবণ মাত্র অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

এখন দেখা যাউক, হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র বলিলে কি বুঝি। যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানের মনুষ্যত্বের সম্যক স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ হয়, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম ; আর যাহা মনুষ্যের উন্নতির প্রতিকূল—যাহাতে উন্নতি-স্রোত বাধা প্রাপ্ত হয়—তাহা অধর্ম্ম। মন্বাদি মহর্ষিগণ লোক-হিত ও সমাজ রক্ষা একমাত্র লক্ষ্য করিয়া বর্ণাশ্রমের বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। এই মহর্ষিগণোপদিষ্ট ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম ; এবং যে গ্রন্থে ইহার উপদেশ আছে, তাহাই হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র। এই স্থানে আর একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত মনে করিতেছি। শাস্ত্র যে অপরিবর্ত্তনীয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যখন দেখিতেছি, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, তত্তৎসময়ের জন্য তত্তৎশাস্ত্র উপযোগী না হওয়ায় নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইয়াছিল। যথা :—

"কৃতে তু মানবোধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং গৌতমঃস্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥"

অভিনিবেশ সহকারে ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত শাস্ত্রেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দেশের অবস্থার যে বহুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এখন আর ক্ষত্রিয়ের হস্তে রাজদণ্ড নাই ; ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় রাজার পার্শ্বে বসিয়া প্রজার মঙ্গলের পরামর্শ দেন না। রাজকার্য্য, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি নানাবিধ কর্ম্মোপলক্ষে আমরা নিত্য নানা বৈদেশিক লোকের সংমিশ্রণে আসিতেছি। পূর্ব্ব কালে বর্ণগত যে ব্যবসা-পার্থক্য ছিল, এক্ষণে আর তাহা রক্ষিত হইতেছে না। ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতেছেন। শূদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকে বিদ্যাভ্যাস করাইতেছেন। বৈদেশিকগণের সংমিশ্রণে ও পরস্পরের স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতে এবং ধর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি আমাদের যোগ্যতা ও জাতীয় জীবন রক্ষা করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমাদের সমাজনীতির ও জীবন গতির যথাসম্ভব পরিবর্ত্তন যে নিতান্ত অপরিহার্য্য, একথা কে অস্বীকার করিবে ? আজিকার দিনে যেরূপ দণ্ডবিধি প্রভৃতি আইন কানুন ব্যবস্থাপিত হয়, পুরাকালেও সেইরূপ মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজকগণ (Legislators) ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিতেন, অথবা আবশ্যক মতে প্রচলিত শাস্ত্রের পরিবর্ত্তনও করিতেন। ঋষিগণ আমাদের মত হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট মানুষ ছিলেন—দেবতাও নহেন অথবা এমনি একটা কোন উদ্ভট জীবও নহেন ; প্রতিভাশালী মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। জনসমাজের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লোকের সুবিধা

অসুবিধা, মঙ্গল অমঙ্গল পর্য্যালোচনা করতঃ বিধিনিষেধ ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। একটা উদাহরণ দিইঃ—

মনু, ৫ম অধ্যায়, ১৩০ শ্লোক,

"——শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ।"

মৃগ বিনাশকালে কুকুরের মুখ শুচি। কুকুরের মুখ সর্ব্বদা অপবিত্র, কিন্তু শিকার কালে শুচি। তবেই পাঠক দেখুন, আমি যাহা বলিতেছিলাম তাহা সত্য কিনা। শিকারের সময় কুকুর মানুষের প্রধান সহায়; কুকুরের মুখ সর্ব্বত্র অশুচি বলিলে কুকুরধৃত পশু পরিত্যাগ করিতে হয়, তাই বিধি হইল "—শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ।" নতুবা, এই নিয়মের কোন আধ্যাত্মিক ভাব নাই এবং ইহা যে মনুর প্রত্যাদেশ বা যোগবল-লব্ধ নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এইরূপ আরও ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতেও যদি তুমি না বুঝ যে শাস্ত্র আমাদের মত হস্তপদাদিবিশিষ্ট মানুষের রচিত এবং ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ সম্ভবপর, সুতরাং আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, তবে তুমি অধঃপাত যাও, আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ বা দুঃখ নাই। যে ইচ্ছায় আপন মঙ্গল ঘট চূর্ণ করিবে, তাহার উপর দেবতা ও মানুষ, সকলেই নারাজ। একি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে, অনুষ্টুপচ্ছন্দে বিরচিত সংস্কৃত শ্লোক মাত্রেই আমাদের নিকট শাস্ত্র বলিয়া সমাদৃত হয়। এবং সেই ভ্রান্ত অনুষ্টুপের উপর ভিত্তি করিয়া একবার যে দেশাচার বদ্ধমূল হইল, কার সাধ্য আর তাহা উল্লঙ্ঘন বা নস্যাৎ করে? বুঝিতে পারি না কোন্ পাপে এই হতভাগ্য দেশের লোক এত হতবুদ্ধি হইল? যদি কোন মহাপুরুষ কালিদাসের ভত্তবারের ন্যায় কায়ক্লেশে একটা অনুষ্টুপ রচনা করিয়া বলিলেন, এটা খট্টাঙ্গ পুরাণের—কি এমনি একটা কোন শাস্ত্রের বচন, তবে তাহাই আমাকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া অবনত মস্তকে মানিতে হইবে। না মানিলে আমি সমাজচ্যুত হইব—আমি অহিন্দু—নাস্তিক—শাস্ত্র-বিদ্বেষী। এইরূপে আমরা ভ্রান্ত দেশাচার ও কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মের নামে অক্ষয় পাপরাশি সঞ্চয় করিতেছি। সত্যধর্ম্ম ভুলিয়া উপধর্ম্মের যুপকাষ্ঠে, আপন সুখ, শান্তি, পারলৌকিক মঙ্গল বলি দিতেছি। দেখিতেছি না, আমাদের ও দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। অথবা দেখিয়া শুনিয়া ও জাতীয় স্বভাব বলে তৎপ্রতিবিধানে একান্ত উদাসীন।

অনেক সময় আমরা দেশাচারকে শাস্ত্র অপেক্ষা উচ্চতর স্থান প্রদান করি। কেন? দেশাচার বিষয়টা কি? আজ যে আচরণ আমাদের মধ্যে প্রচলিত হইল, দুদিন পরে তাহাই ত দেশাচার বলিয়া পরিগণিত হয়। আজ তুমি আমি দশজনে যে কার্য্য করিতে লাগিলাম, আমাদের সন্তানসন্ততিও যদি তাহার অনুষ্ঠান করিল, তবে কালক্রমে তদনুষ্ঠান দেশাচারে পরিণত হইবে। যাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট দেশাচার প্রথম প্রচলিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কি ভুল হইতে নাই? অথবা হইতে পারে, তদনুষ্ঠান তৎকালের উপযোগী ছিল; কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে যে উপযোগী হইবে, তাহার প্রমাণ কি? আর যদি না হয়, তাহা হইলেও যে তদনুষ্ঠান পালনীয়, এমন কথা ত কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না। দেশ কাল পাত্র ভেদে যে শাস্ত্রের বিভিন্নতা হয়, আমরা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি। দেশাচার "জুজুর" ভয় হইতে মুক্ত হইতে না

পারিলে আমাদের মঙ্গলের আশা অতি বিরল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শাস্ত্র সমস্ত জগৎসৃষ্টির সমকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই; প্রতিভাশালী ঋষিগণ লোকহিত ও সমাজ-রক্ষার জন্ত সময়ে সময়ে সে সকল বিধি ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাকেই আমরা শাস্ত্র বলি। যে শাস্ত্রে লোকহিতকর নহে, পরন্তু সমাজের অনিষ্টকারী এবং উন্নতির প্রতিকূল ও বিরোধী, তাহা গৃহদেবতা বধূগণের হস্ত-পরিচালিত সম্মার্জ্জনী প্রেরিতা আবর্জ্জনার ন্যায় পরিত্যাগ করিব; নতুবা উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

Sir Henry Sumner Maine তদ্বিরচিত Ancient Law নামক গ্রন্থে কি লিখিয়াছেন, তাহা একবার আপনারা দেখুন।—

"The usages which a particular community is found to have adopted in its infancy and in its primitive seats are generally those which are on the whole best suited to promote its physical and moral well-being; and, if they are retained in their integrity until new social wants have taught new practices, the upward march of society is almost certain. But unhappily there is a law of development which ever threatens to operate upon unwritten usage. The customs are of course obeyed by multitudes who are incapable of understanding the true ground of their expediency, and who are therefore inevitably to invent superstitious reasons for their permanence. A process then commences which may be shortly described by saying that usage which reasonable generates usage which is unreasonable. Analogy, the most valuable of instruments in the maturity of jurisprudence, is the most dangerous of snares in its infancy. Prohibitions and ordinances, originally confined, for good reasons to a single description of acts, are made to apply to all acts of the same class, because a man menaced with the anger of the gods for doing one thing, feels a natural terror in doing any other thing which is remotely like it. After one kind of food has been interdicted for sanitary reasons, the prohibition is extended to all food resembling it, though the resemblance occasionally depends on anologies the most fanciful. So, again a wise provision for insuring general cleanliness dictates in time long routines of ceremonial ablution; and that division into classes, which at a particular crisis of social history is necessary for the maintenance of the national existence, degenerates into the most disastrous and blighting of all human institutions—caste.

বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন, বঙ্গদেশের বায়ুমণ্ডলীতে জলীয় বাষ্পের আধিক্য হেতু ও তেজহানিকর ভাত আমাদের আহার্য্য হওয়ায় আমরা এত হীনবীর্য্য এবং কার্য্যে উদ্যমহীন ও উদ্যোগ-পরিশূন্য। মুসলমান সেনা দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, রাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডাকাইয়া গণনা করিতে বসিলেন—ব্রাহ্মণ পাঁজি পুঁথি দেখিয়া বলিলেন যে, বঙ্গে আর হিন্দুরাজ্য থাকিবে না—মুসলমান রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবে। শাস্ত্রের কথা রাজা দ্বিরুক্তি না করিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং পলায়ন করিয়া ঘৃণিত জীবনরক্ষা করিলেন। শাস্ত্রের ভয় আমাদের হাড়ে হাড়ে বসিয়াছে। রাজার অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমভাবে আধিপত্য করিতেছে। কোন শাস্ত্রীয় বিধির অযৌক্তিকতা বা অনিষ্টকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ও শাস্ত্রভয়ে একান্ত ভীত আমরা, উদ্যমশীলতা নাই বলিয়া, প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারি না। আমরা পরের

ন্যায় উদ্যম ও চেষ্টা-বিহীন। স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, কর্ম্মক্ষেত্রে যেন উদাসান দর্শক মাত্র। আমাদের ন্যায় "গোঁফখেজুরে" বোধ হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই। শবের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া খর্জ্জুর বৃক্ষের নিম্নে পড়িয়া আছি, একটী সুপক্ক খর্জ্জুর বৃক্ষচ্যুত হইয়া গুম্ফকেশে বাধিয়া রহিল, এমনি চেষ্টাশূন্য যে জিহ্বা সঞ্চালনে গোঁফের খেজুর মুখে দিই, এমন ক্ষমতা নাই। ইহা দুর্ব্বল বলিয়াই আমরা এত ভূত প্রেতে বিশ্বাস করি; কারণ অবিশ্বাস করিলে যদি সত্যসত্যই ভূত থাকে, তবে ভয়, পাছে ভূত মহাশয় রাগিয়া গলা টিপিয়া দেন। "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্" ইতি বাক্যে এতই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি যে, পুরুষকার বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা একবারও মনে স্থান দিই না। আমরা শাস্ত্র মানি—আবার মানিও না। যেখানে শাস্ত্র আমাদের এই জাতীয় দুর্ব্বলতার অনুকূল, সেখানে শাস্ত্র মানি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আমাদের উদ্যম ও চেষ্টাহীনতার জন্য যে স্বাভাবিক আত্মগ্লানি, তাহা হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস পাই। ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট একাদশীর ব্যবস্থা চাহিলে তিনি রঘুনন্দনের দোহাই দিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিবেন যে, নবম বর্ষীয়া বিধবা বালিকা হইতে অশীতিপর বৃদ্ধা পর্য্যন্ত নিতান্ত অশক্ত বা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত হইলেও একাদশীর দিন বিন্দুমাত্র গঙ্গাজলে শুষ্ককণ্ঠ আর্দ্র করিতে পারিবে না। কিন্তু তুমি পুরুষ, তোমার যত ইচ্ছা সুশীতল জল পান করিতে বাধা নাই। আমরা বাঙ্গালী—গড্ডলিকার জাতি; যাহা শাস্ত্র বলিয়া আমাদের দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপাইবে, আমরা নিঃশব্দে বহন করিব। গর্দ্দভের সহিষ্ণুতাও আমাদের কাছে হারি মানিয়াছে। ধন্য বাঙ্গালী, তুমি নিজ হস্তে স্নেহশালিনী জননী, ভক্তিমতী আত্মজা ও প্রীতিময়ী সহোদরা প্রভৃতি বধ করিতেছ! আর শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিজে সাফাই হইতেছ। স্ত্রী-হত্যা, মাতৃহত্যার ভয় উপেক্ষা করিয়া শাস্ত্র ও দেশাচারের প্রাধান্য স্বীকার করিতেছ! কেন একবার বলনা, রঘুনন্দনের (যদি রঘুনন্দনের এরূপ মত হয়) নারকীয় শাস্ত্র মানি না। রঘুনন্দন যে শাস্ত্র হইতে নিজগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, সেই সকল শাস্ত্রে কি আছে, দেখিব—দেখিয়া যাহা উচিত হয় করিব। মন্বাদি শাস্ত্র ভাসিয়া গেল, এখন রঘুনন্দন আমাদের মুণ্ডপাতের হর্ত্তাকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হইলেন।

দুঃখের কথা কি বলিব, রঘুনন্দন ত পদে আছেন। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, তবে নিতান্ত হৃদয়শূন্য লোক বলিয়া একটা কিম্ভূত-কিমাকার অমানুষিক শাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি কতদূর দোষী, তাহা পরে দেখা যাইবে। আপনারা দেবীবর ঘটকের নাম শুনিয়াছেন ত? তিনিও এই অধঃপতিত দেশের শাস্ত্রকর্ত্তা। মহারাজ বল্লালসেন কি অশুভক্ষণেই বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথার সূত্রপাত করিয়া যান। তাহা না হইলে বোধ হয় হতভাগ্য দেবীবর তদপেক্ষা হতভাগ্য বঙ্গদেশে কুলীনদিগের মেলবন্ধন ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য দুর্নীতি প্রচলিত করিয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিতে পারিতেন না। দেবীবর ঋষি নন—মুনি নন—শাস্ত্রকার নন, এমন কি সুপণ্ডিতও নন, তবে তাঁহার কথা শুনিয়া নিজের মঙ্গলঘট নিজ চরণে ঠেলিব কেন? তিনি কুলীনদিগের যে মেলবন্ধন করিয়াছেন, তাহাতে

দেশের যে ভয়ানক অমঙ্গল হইতেছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও যে আমরা তৎপ্রতিবিধানে সচেষ্ট ও যত্নবান হইতেছি না, ইহা কি সামান্য ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়? ইহা আমাদের জাতীয় উদ্যমহীনতার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ, নহিলে দেবীবরের কথায় অনিষ্ট হইলেও যে সমাজ তাহা রক্ষা করিতে বাধ্য, এমন প্রমাণ ত হিন্দুর কোন শাস্ত্রে দেখি না। বল দেখি কোন্ বেদে, কোন্ পুরাণে, কোন্ স্মৃতিতে লেখা আছে যে ফুলে, খড়দহ ইত্যাদির পরস্পর বিবাহ হইবে না? বিষ্ণু বা শ্রীধরের সন্তান তাঁহাদের পালটী ঘর ব্যতিরেকে অন্য ঘরে আদান প্রদান করিতে পারিবেন না। কৌলীন্য-বৃক্ষের বিষময় ফল ভক্ষণ করিয়া বঙ্গদেশ দিন দিন নিস্তেজ হইতেছে, তথাপি কি এই দেবীবরী ছাই পাঁশ ছাড়িতে পারিতেছি? ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় এই অনিষ্টের প্রতিবিধানের ক্ষমতা একান্তই লুপ্ত হইয়াছে। আমরা আবার মানুষ বলিয়া পরিচয় দিই, সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করি, স্বাধীন হইতে অভিলাষ করি! তোমরাই নাকি স্বায়ত্তশাসন চাও? ইংরাজের ন্যায় আপন হস্তে রাজ্য শাসনের ভার লইতে চাও? ধন্য তোমার ধৃষ্টতা! যে ভূত প্রেতের ভয়ে একান্ত অভিভূত হইয়া তাহার পূজা দেয়, মনসা, শীতলা ও ওলাদেবীকে Health officerএর পদে নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, ছেলেপিলের অমঙ্গল হইবে বলিয়া মা ষষ্ঠীর বিড়ালের হিংসা করিতে বিরত, হাঁচি, টিক্‌টিকি, শব-শিবাদি দুর্নিমিত্ত দর্শনে কার্য্য হইতে পরাঙ্মুখ, তার আবার স্বাধীন হইবার ইচ্ছা কেন? তুমি নাকি ভলন্টিয়ার হইতে চাহিয়াছিলে? ধর, ইংরাজরাজ তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। বাঙ্গালী ভলন্টিয়ার সৈনিকদল শত্রুসেনার গতিরোধ করিবার জন্য লালদিঘির রাস্তায় ব্যূহিত হইতে আদিষ্ট হইয়াছে। শত্রুসেনা একপাল বিড়াল সংগ্রহ করিয়া তোমাদের সম্মুখে রাখিয়া অনায়াসে তোমাদের বধসাধন করিবে। তোমরা মা ষষ্ঠীর ভয়ে পাছে বিড়ালের গায়ে লাগে বলিয়া বন্দুক ছুড়িতে পারিবে না।

তাই বলিতেছিলাম—শাস্ত্র যেখানে আমাদের স্বাভাবিক উদ্যমহীনতার অনুকূল, তখনি শাস্ত্র মানি; আর যখন দেখি, শাস্ত্র মানিলে স্বাভাবিক জড়তা ও উদ্যমহীনতা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিতে হইতেছে, তখন শাস্ত্র মানি না। যে শাস্ত্র "দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি" উপদেশ দেয়, সে শাস্ত্র শুনিয়াও শুনি না। কিন্তু কর্ত্তব্যবিমুখের আত্মগ্লানি অবশ্যম্ভাবী। আর এই আত্মগ্লানি হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমরা বলিয়া থাকি—শাস্ত্র আছে কি করিব, নাচার! বেশ বুঝিতেছি, একাদশীর দিন বিধবা এক গণ্ডূষ জলপান করিলে পতিত হইবে না, তথাপি এতই কুশাস্ত্র ও ভ্রান্ত দেশাচারের বশবর্ত্তী হইয়াছি যে, তাহার অন্যথাচরণ করিবার ক্ষমতা নাই।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, আজকাল আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনের চাবি হারাইয়াছেন—কেমন করিয়া শাস্ত্র পড়িতে হয়, ভুলিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, শাস্ত্রবচনের বাক্যার্থ (letter) মাত্র গ্রহণ করায় শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও মর্ম্মের (spirit) বহুদূরে থাকিতে হয়। সুতরাং শাস্ত্রপাঠের বাঞ্ছিত ফললাভ হয় না। নারিকেলের সুমধুর জল ও তদধিক উপাদেয় শস্য ভক্ষণ করিতে হইলে ছোবড়া পরিত্যাগ করিতে হয়, একথা শাস্ত্র-

ব্যবসায়ীরা বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া বেশ অনুমান হয়। শাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ঘাটনের বার্হস্পত্য সার্ব্বজনীন চাবি (Universal key) হারাইয়া যাওয়ায় নানা ধনরত্নে শাস্ত্র পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও সটীক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দারিদ্র্য-ম্লান মুখে বিরাজ করিতেছেন। বৃহস্পতি যথার্থই বলিয়াছেন :—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানী প্রজায়তে॥"

পাঠক, ক্ষমা করিবেন। দুঃখে, ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় ও মনের আবেগে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি; হয়ত এত কথা বলা আমার উচিত হয় নাই, হয়ত আমাকে সম্প্রদায় বিশেষের কাছে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া কি সত্য বলিব না?

এখন দেখা যাউক, বিধবার পক্ষে, একাদশীব্রত সম্বন্ধে মন্বাদির স্মৃতিশাস্ত্র কি ব্যবস্থা দেন।

মনু :—
"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথাতে ব্রহ্মচারিণঃ॥"

পরাশর :—
"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সামৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্য তদেন্বণারোহণং বা।"

ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ একবাক্যে বলিতেছেন, স্বামী বিয়োগান্তে স্ত্রী ব্রহ্মচারিণী হইবেন। ব্রহ্মচারিণীর পক্ষে যে একাদশী ব্রতের অনুকল্প নিষিদ্ধ, একথা মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে কোথাও দেখিতে পাই না। আর মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র যাহা অবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, তাহা যে নির্দ্দোষ ও অনুষ্ঠেয়, ইহা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব।

এখন দেখা যাউক, রঘুনন্দনের মত কি? বিধবার নিরম্বু একাদশীর ঘৃণিত নিয়মের দোষটা প্রায় সকলেই বেচারী রঘুনন্দনের স্কন্ধে চাপাইয়া থাকেন। কিন্তু আমার বেশ বিশ্বাস, স্বয়ং রঘুনন্দন এবিষয়ে নিরপরাধ। রঘুনন্দনের স্মৃতিগ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার উল্লেখ কোথাও দেখিলাম না। তবে বুঝিতে পারি না কেমন করিয়া এই হতভাগ্য দেশে এমন অশাস্ত্রীয় নিষ্ঠুর বিধি প্রচলিত হইল।

যে সকল বচন প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া রঘুনন্দন বিধবার পক্ষে একাদশী ব্রতের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তৎসমুদয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

তিথিতত্ত্বং। অথ একাদশী :—
"বিধবায়স্তু সর্ব্বথা নিত্যত্বমাহ কাত্যায়নঃ।"
"বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেৎভ্রূণহত্যা দিনে দিনে॥"

স্মৃতিঃ—
"অষ্টবর্ষাদধিকো মর্ত্ত্যো হ্যপূর্ণা শীতিবৎসরঃ।
ভুঙ্‌ক্তে যো মানবো মোহাৎ একাদশ্যাং
সপাপকৃৎ॥"

একাদশীব্রতং নিত্যং তদাহ ব্রহ্মবৈবর্ত্তঃ—
"ইতি বিজ্ঞায় কুর্ব্বীতাবশ্যমেকাদশীব্রতং।
বিশেষ নিয়মাসক্তোহহোরাত্রং ভুক্তিবর্জ্জিতং॥"

ভবিষ্যে :—
"নিত্যমেতৎ ব্রতংনাম কর্ত্তব্যং সার্ব্ববর্ণিকম্।
সর্ব্বাশ্রমাণাং সামান্যং সর্ব্ব ধর্ম্মেষ্বনুত্তমং॥
একদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥"

রঘুনন্দন প্রথমতঃ দেখাইলেন যে "একাদশীব্রতং নিত্যং কাম্যঞ্চ;" পরে দেখাইতেছেন যে "বিধবায়াস্তু সর্ব্বথা নিত্যত্বং।" একাদশীব্রত যে বিধবার পক্ষে নিত্য পালনীয়, রঘুনন্দন ইহাই এস্থলে প্রমাণ করিলেন।

এবং ইহাই যে তাঁহার উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই এবং থাকিতেও পারে না।

এখন দেখা যাউক "সর্ব্বথা নিত্যত্বং" ইতি বাক্যের তৎপর্য্য কি ? এবং স্থানান্তরে যে অনুকল্পের ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহা তাহার বাধক কিনা ? রঘুনন্দন বলিতেছেন "যদকরণে প্রত্যবায়স্তন্নিত্যমিত্যুক্তম্।"

তথাচ :—

"নিত্যং সদা যাবদায়ুর্ন কদাচিদতিক্রমেৎ
উপেত্যাতিক্রমে দোষঃ শ্রুতেরত্যাগ চোদনাৎ।
ফলাশ্রুতের্ব্বীপ্সয়াচ তন্নিত্যমিতি কীর্ত্তিতম্।"

এখন স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইবে যে, একাদশী ব্রত "বিধবায়াস্তু সর্ব্বথা নিত্যত্বং" ইতি বাক্যের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় এই যে, বিধবা যাবজ্জীবন একাদশী ব্রত পালন করিবেন, কদাচিৎ অতিক্রম করিবেন না। ইহার অর্থ, কিন্তু কোন ক্রমেই এরূপ হইতে পারে না যে, বিধবার পক্ষে একাদশী ব্রতাঙ্গভূত অনুকল্প নিষিদ্ধ। যিনি অভিনিবেশ সহকারে রঘুনন্দনের গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তিনিই স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, বিধবার পক্ষে একাদশীতে অনুকল্প রঘুনন্দনের মতের বিরোধী নহে। যদি অনুকল্প নিষেধ করা তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তবে এই নিষেধ বাক্য, বলাবাহুল্য, তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে অনুকল্প ব্যবস্থা স্থলে নিশ্চয়ই দৃষ্ট হইত।

পাঠক আরও দেখুন—রঘুনন্দন নির্দ্দিষ্ট চারিটী একাদশীতে অনুকল্প নিষেধ করিতেছেন ; তথা :—

"মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্ব পরিবর্ত্তনে।
ফলমূল জলাহারী হৃদি শল্যং মমর্পয়েৎ ॥"

এই কয় একাদশীতে অনুকল্প নিষেধ করায় স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, এতদ্ব্যতীত অন্য সকল একাদশীতে অনুকল্প নিষেধ করা রঘুনন্দনের উদ্দেশ্য নহে। যদি সকল একাদশীতেই অনুকল্প নিষেধ করা উদ্দেশ্য হইত, তবে এই বিশেষ বিধি দ্বারা চারিটী মাত্র একাদশীতে অনুকল্প নিষেধ নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক হইত।

আবার যখন দেখিতেছি, উপবাস সম্বন্ধে শাস্ত্র স্ত্রী পুরুষের কোন বিভিন্নতা করেন নাই, তখন অনুকল্প বিষয়ে কোন ইতর বিশেষ করা যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও যুক্তি-বহির্ভূত। শাস্ত্রের যে বচন প্রমাণ দ্বারা বিধবার একাদশী ব্রতের নিত্যত্ব অবধারিত হইয়াছে, সেই একই বচন পুরুষের পক্ষেও একাদশী ব্রতের কর্ত্তব্যতার প্রমাণ স্থলে গৃহীত হইয়াছে। অতএব বিধবার বেলা এক নিয়ম, আর পুরুষের বেলা অন্য নিয়ম, কোন ক্রমেই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। যদি উভয়ে একই নিয়মের অধীন হইল, আর বিধবার পক্ষে যখন নিয়মান্তর নাই, তখন পুরুষের পক্ষে অনুকল্প বৈধ হইলে বিধবার পক্ষে কখনও অবৈধ হইতে পারে না। তবে কোন্ যুক্তিবলে শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিধবার বেলা অনুকল্প নিশেষ করেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

অতএব দেখা গেল,

(১) বিধবার পক্ষে একাদশীব্রত নিত্য অর্থাৎ আজীবন অনুষ্ঠেয় ; আর

(২) এই নিত্যত্ব শাস্ত্রোক্ত অনুকল্পের বাধক নহে।

পাঠক মহাশয় এখন দেখিলেন, শাস্ত্র বলে কি, আর আমরা করি কি ! দেশাচারের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমধিক যত্নবান হইয়া শাস্ত্রের মস্তকে—হরি হরি লেখনী কলঙ্কিত

করিলাম—পদাঘাত করিতেছি। যে "স্নেহময়ী কন্যার দণ্ডেক মাত্র আহারের বিলম্ব দেখিলে পিতামাতার আর কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিত না, আজ সেই দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা ভাগ্যদোষে বিধবা হইয়া একাদশীর দিন বিন্দুমাত্র জলের জন্য প্রাণত্যাগ করিলেও তোমার প্রাণে করুণার সঞ্চার হয় না। কন্যা পিপাসায় ছটফট করিতেছে, আর তুমি আকণ্ঠ আহার করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছ! পিশাচের দেশ আর কোথায়? আমার দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে, অস্মদ্দেশের অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের দোষে বিধবার একাদশীর নিরম্বু উপবাসের নিতান্ত অশাস্ত্রীয় নারকী নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বালক টোলে গিয়া আট দশ বৎসর ধরিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য, অমরকোষ অভিধান মাত্র পাঠ করিয়া যিনি স্মৃতি পড়িবেন, তিনি রঘুনন্দনের সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠ করিলেন ও স্মার্ত্ত-চূড়ামণি উপাধি পাইয়া ব্যবস্থা দিতে লাগিলেন। কি ধৃষ্টতা! এই সংগ্রহ গ্রন্থমাত্র-সম্বল স্মার্ত্ত-চূড়ামণি ঠাকুরেরা মন্বত্রিবিষ্ণু হারীতের মূল গ্রন্থ কস্মিন্ কালেও চর্ম্মচক্ষে না দেখিয়া কেমন করিয়া স্মৃতির যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণে ও রহস্যোদ্ঘাটনে সমর্থ হইবেন? সুদীর্ঘ ফোঁটা, নামাবলী ও নস্য কৌটার আড়ম্বরে যতদূর সম্ভব, বিদ্যাশূন্যতা ঢাকিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু মূর্খতা অগ্নির ন্যায় নামাবলীতে প্রচ্ছন্ন থাকিবার নহে, কাজেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। ব্যবস্থা শাস্ত্রানুসারিণী হইল না। ফল হইল, তাঁহাদের ব্যবস্থা-বিভ্রাটে পড়িয়া দেশের এই শোচনীয় অধঃপতন ও বিবধার নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা।

রঘুনন্দন অনুকল্পের যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবনার উপসংহার করিব। পাঠকগণ অভিনিবেশ সহকারে নিম্নোদ্ধৃত বচন প্রমাণ পাঠ করিয়া দেখিবেন, বিধবার পক্ষে অনুকল্প শাস্ত্রসম্মত কি না।

একাদশী তত্ত্বম্। অথোপবাসানুকল্পঃ।

আপৎ প্রতিনিধ্যনুকল্পনাং পর্য্যায়তা কাল বিবেক ধৃত বরাহপুরাণঞ্চাশক্তৌ।

"উপাবাসাসমর্থস্তু কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং প্রয়োজয়েৎ।"

তথা একাদশীমাধিকৃত্য স্মৃতি :—

একভক্তেন নক্তেন ভর্ক্ষন্ বৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ উপবাস নিষেধা সামর্থ্যয়োর্ভক্ষ্য প্রকারমাহ।

নারদীয়ে :—

"অনুকল্পো নৃনাং প্রোক্ত ক্ষীণানাং বরবর্ণিনি।
মূলং ফলং পয়স্তোয়মুপভোগ্যং ভবেচ্ছুভং॥
ন ত্বেবং ভোজনং কৈশ্চিদেকাদশ্যাং প্রকীর্ত্তিতং।"

এবমনুকল্পাতিরিক্তং।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত :—

"উপবাসা সমর্থশ্চেদকং বিপ্রন্তু ভোজয়েৎ।
তাবদ্ধনানি বা দদ্যাৎ যদ্ভক্তাদ্দ্বিগুণং ভবেৎ॥
সহস্রসম্মিতাং দেবীং জপেদ্বা প্রাণসংযমান্।
কুর্য্যাদ্দ্বাদশ সংখ্যকান যথাশক্তিং ব্রতেনরঃ॥"

বায়ুপুরাণে :—

"উপবাস নিষেধেতু কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ।
ন দুষ্যত্যুপবাসেন উপবাসফলং লভেৎ॥
নক্ত হবিষ্যান্নমনোদনম্বা ফলংতিলাক্ষীর।
যৎপঞ্চ গব্যং যদিবাথ বায়ু প্রশস্ত মত্রোত্তর
মুত্তরঞ্চ॥"

উপবাস নিষেধস্তু অসামর্থ্যাদপীতি। তত্রাপি হবিষ্যাদিরনুকল্প :—

মার্কণ্ডেয় :—

"একভক্তেন নক্তেন তথৈবাযাচিতেন চ।
উপবাসেন দানেন নৈবাদ্বাদশিকো ভবেৎ॥"

উল্লিখিত অনুকল্প ব্যবস্থা পাঠ করিলে অনায়াসে উপলব্ধি হইবে, একাদশীতে ভোজন-নিষেধের যথার্থ তাৎপর্য্য কি? রঘুনন্দন নানা শাস্ত্র হইতে বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে, ফলমূলাদি কিঞ্চিৎ ভোজনদ্বারা একাদশীর উপবাসব্রত ভঙ্গ হয় না। উপবাসের ফল পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমে, একাদশীর দিন বিধবার পক্ষে ভোজন সাধারণতঃ নিষেধ করিয়া, পরে ব্যবস্থা করিতেছেন যে,—

"মূলং ফলং পয়স্তোয়মুপভোগ্যং ভবেচ্ছুভং।
নত্বেবং ভোজনং কৈশ্চিৎ একাদশ্যাং
প্রকীর্ত্তিতম্॥"

আর একটী কথা বলিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিব। বোধ হয়, অনেকে অবগত নহেন যে, বঙ্গদেশের অনেকস্থানে অনুকল্প প্রথা প্রচলিত আছে। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র, বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ, চাঁদপ্রতাপ এবং মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি প্রদেশে এই প্রথা বিশিষ্টরূপ প্রচলিত আছে; কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, বিক্রমপুর প্রদেশের ব্রাহ্মণেরা ভ্রষ্টাচার ও অহিন্দু; আমাদের ন্যায় নিষ্ঠাবান ও স্বধর্ম্মনিরত নহেন। তাঁহাদিগের সহিত আমাদের আদান প্রদানাদি বৈবাহিক ক্রিয়া কলাপ বিলক্ষণরূপে প্রচলিত আছে। আমি জানি, বিক্রমপুরের কোনস্থানে আমাদের দেশের কোন সম্ভ্রান্ত, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণের কন্যার বিবাহ হয়। ঐ কন্যা বিধবা হইয়া, যখন পিত্রালয়ে বাস করিতেন, তখন একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করিতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু শ্বশুরালয়ে অবস্থান কালে শাস্ত্রোক্ত অনুকল্প করিয়া একাদশীব্রত পালন করিতেন। সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশ, মাদ্রাজ, বম্বাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, উৎকল, সংক্ষেপে বঙ্গদেশের দুইটী একটী জেলা ব্যতীত অর্থাৎ নদিয়া, হুগলী, ২৪ পরগণা ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ ব্যতীত, ভারতবর্ষের অন্য কুত্রাপি এই কুপ্রথা প্রচলিত নাই। বিধবার পক্ষে জগন্নাথ-ক্ষেত্রে অবস্থান কালে একাদশীর দিন উপবাস নিষিদ্ধ। 'নিত্যত্ব' শব্দে যদি 'অনুকল্পরহিতত্ব' বুঝায়, তবে বিধবার একাদশীর নিত্যত্ব বজায় থাকে কৈ? যে নিয়মের ব্যভিচার দেশের নানাস্থানে দৃষ্ট হইতেছে এবং যখন সে সকল স্থান আমাদের সমাজের অন্তর্ভূত, তখন কেমন করিয়া বলিবে 'নিত্যত্ব' শব্দে 'অনুকল্পরহিতত্ব' বুঝাইতেছে?

পরিশেষে পাঠকগণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা যেন তাঁহারা নিজ নিজ অধিকারে এই গর্হিত নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে যত্নবান হয়েন। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দেবশর্ম্মা মৌলিক।

জয়রামপুর—নদিয়া।

গীতায় অবতারবাদ। (শেষ)

(ছ) অবতারের প্রয়োজন কি?

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে কোন্ বিশেষ কারণের জন্য অবতারের প্রয়োজন হইয়া থাকে?

অবতারের প্রয়োজন কেন হয়, সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮

গীতা—৪অঃ।

অর্থাৎ যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃজন করি। সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মধারণ করিয়া থাকি।

ইহা হইতে আমরা এইরূপ অবগত হইতেছি যে, প্রথমতঃ যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতদের বিনাশের প্রয়োজন হয় বলিয়া ভগবান অবতার হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতারের প্রয়োজন হয়। ইহা ভিন্ন অবতারের আরও একটী প্রয়োজন আছে, তাহা উপাস্য সিদ্ধির জন্য। ঈশ্বরের অধিষ্ঠিত জগতে ধর্ম্মের গ্লানি কেন হয়, তৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে নিম্নে অবতারের পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজন গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদের বিনাশ :—আমরা শাস্ত্রাদি হইতে অবগত হইয়া থাকি যে, মনুষ্য হইতে ভগবান্ পর্য্যন্ত সৃষ্টির ক্রম আছে। এই সকল সৃষ্টিকে পৌরাণিক ভাষায় যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, দেব প্রভৃতি বলে। ইঁহাদের মধ্যে সকলের প্রকৃতি সমান নয়। কেহ সৃষ্টির কল্যাণ কামনায় সাহায্য করিয়া থাকেন এবং কেহ অমঙ্গল কামনায় বাধা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। এইজন্য আমরা শাস্ত্রে প্রায় দেবাসুরসংগ্রামের কথা পাইয়া থাকি। অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অসুরগণ সময় সময় মনুষ্যের ক্ষতি করিবার জন্য এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, দেবতারাও ইঁহাদের নিকট পরাজিত হইয়া থাকেন! পুরাণে আমরা দেখিতে পাই যে, কালনেমি এবং অন্যান্য দৈত্যগণ কংশ এবং তাঁহার অনুচররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল দুষ্ট ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদের অত্যাচারে জগতের জীবকে প্রপীড়িত করেন, তখন প্রপীড়িতের ক্রন্দন-ধ্বনি বৈকুণ্ঠে পৌঁছাইলে ভগবান কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তখন তিনি অবতার গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হন এবং দুষ্কৃতদের বিনাশ করিয়া ও সাধুদের উদ্ধার করিয়া পৃথিবীতে শান্তি বিধান করিয়া থাকেন। আমরা পুরাণে এইরূপ রাবণ ও হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারের কথা দেখিতে পাই; তাঁহাদের দমনের জন্য ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সাধুদের কিরূপে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, তাহা প্রহ্লাদের জীবনী হইতে অবগত হওয়া যায়।

(২) ধর্ম্ম সংস্থাপন :—ভগবান ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এতদ্ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে' লিখিয়াছেন যে, "মনুষ্য কতকটা নিজ-রক্ষা ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়া স্বতঃই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে কর্ম্মদ্বারা সকল বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ঘটে, তাহা দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিকবৃত্তি-শূন্য; আমরা শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্ম্মের প্রধান বিঘ্ন। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত—অতিক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন

দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে। এইজন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনুষ্য কর্ম্ম জানে না; কর্ম্ম কিরূপে করিলে ধর্ম্মে পরিণত হয়, তাহা জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা। এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি?" বঙ্কিম বাবুর মতে 'ধর্ম্মসংস্থাপন' অর্থে আদর্শ (Ideal) প্রতিষ্ঠা করা। মনুষ্য যখন আদর্শকে হারাইয়া ফেলে, তখন ভগবান অবতীর্ণ হইয়া সেই আদর্শের পুনপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

(৩) উপাস্য-সিদ্ধি। ভগবান্ অনন্ত; কিন্তু সেই অনন্তকে আমরা ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি; সেই জন্য ভগবান সান্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার উপাসকের ভক্তি ও প্রেমের স্রোত শতগুণ বেগে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হয়। এইজন্য উপাসকের উপাস্য-সিদ্ধি অবতরণের অন্য কারণ। এতদ্সম্বন্ধে শ্রীমতী এনিবেসাণ্ট লিখিয়াছেন যে,—

"In order to draw out devotion then, an object which is attractive must be presented to man and we find such objects presented most completely in the revelations of the Supreme Self made through human form in the godmen who appear from time to time—the Avatars or divine incarnations. Such beings are rendered supremely attractive by the beauty of character which they manifest, by the rays of the self which shine through the human veil, imperfectly concealing their divine loveliness. When, He, who is beauty and love and bliss shows a little portion of Himself on earth enclosed in human form the weary eyes of man light up, the tired hearts of men expand with a new hope and a new vigour. They are irresistibly attracted to Him. Devotion spontaneously springs up. * * * * They render Deity attractive by softening. Its dazzling radiance into a light that human eyes can bear, as it shines through a veil of humanity. They limit the divine attributes till they become small enough for the human intelligence to grasp. These stand as objects of devotion attracting love by their perfect loveableness; they only need to be seen to be loved; when they are not loved it is merely because they are not seen."—

Theosophical Review.

আমরা পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলির সত্য মহাভারত হইতে উপলব্ধি করিয়া থাকি। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যখনই শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখনই তাঁহাদের ভক্তি ও প্রেমের স্রোত তাঁহার দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। অবতারেরা এইরূপেই উপাস্য সিদ্ধি করিয়া থাকেন। এই তিনটী কারণের জন্যই ভগবান অবতরণ করিয়া থাকেন।

ভগবানের অধিষ্ঠিত জগতে ধর্ম্মের গ্লানি কেন হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে তিনটী বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথম, আমরা অবগত আছি যে, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রলয়। যখন গুণ সকল ক্ষুভিত হয়, অর্থাৎ যখন, সেই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, তখন সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া থাকে। এই বিচ্যুতির ফলে প্রথমে রজোগুণ প্রকাশ পায়। বীজে জলসেচনের ন্যায়, রজোগুণ প্রবর্ত্তিত হইলেই সত্ত্ব ও তমঃ বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাহা হইতে ক্রমশঃ সৃষ্টি হইতে

থাকে। সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ সম্বন্ধে পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে—"প্রকাশ ক্রিয়া স্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং" পা২। সূ।১৮—অর্থাৎ সত্ত্বের স্বভাব প্রকাশ, রজের স্বভাব ক্রিয়া ও তমের স্বভাব স্থিতি; ভূতরূপে এবং ইন্দ্রিয়রূপে ইহাদের পরিণাম হয়। গুণত্রয়ের মধ্যে যখন যে গুণটী প্রধান হয়, তখন তাহারই বৃত্তি বিশেষ রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, যেমন দেবশরীর উৎপন্ন হইলে তাহাতে সত্ত্বগুণ প্রধান, রজঃ ও তমোগুণ তাহার অঙ্গ; মনুষ্য শরীরে রজোগুণ প্রধান, সত্ত্ব ও তমোগুণ তাহার অঙ্গ; পশু পক্ষীর শরীরে তমোগুণ প্রধান, সত্ত্ব ও রজঃ তাহার অঙ্গ। ব্যষ্টি সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, সমষ্টি সম্বন্ধেও তাহা উল্লিখিত হইতে পারে। এই জগতে যখন তমোগুণ বৃদ্ধি পাইয়া রজোগুণের সাহায্যে সত্ত্বকে চাপা দিয়া ফেলে অর্থাৎ যখন সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশশীল ধর্ম্মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, তখন ক্রমবিকাশ (Evolution) স্থগিত থাকিবার আশঙ্কা হইয়া থাকে। ধর্ম্মগ্লানির ইহা একটী কারণ। এই সময়েই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া শক্তির সামঞ্জস্য করিয়া ক্রমবিকাশের গতি বর্দ্ধিত করিয়া দেন। প্রকৃতির গুণ সামঞ্জস্য রক্ষা করাকে ভগবানের অবতরণের প্রথম কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ আমরা নিম্ন জৈবিক রাজত্বে দেখিতে পাই যে, উহার ক্রমবিকাশ নিয়মে আবদ্ধ। এই নিয়মের বাহিরে নিম্নশ্রেণীর জীবেরা যাইতে পারে না। এই নিয়মের বাহিরে যদি তাহারা যাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মনুষ্যের ক্রমবিকাশ এইরূপ নহে। ভগবান তাহাকে পুরুষকার (freewill) বা স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন, তাহাকে সদসৎ প্রকৃতি দিয়াছেন। সৎ অথবা অসৎ পথে যাইবার তাহার তুল্য অধিকার। সে মনে করিলে ক্রমবিকাশের গতিকে বাধা দিতে পারে, অথবা ঐ গতির অনুকূলে চলিতে পারে। অসৎপথে যাইয়া ক্রমবিকাশকে বাধা দিতে যাইলে যে তাহার ক্রমোন্নতি স্থগিত হইয়া যাইবে, ইহা সে ঘাত প্রতিঘাত পাইয়া শিক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু এক এক সময়ে এমন হইয়া থাকে যে, অনেক মনুষ্যের অসৎ ইচ্ছার সমষ্টি প্রবল শক্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যের ক্রমবিকাশকে বাধা দিবার উদ্যোগ করিয়া থাকে। এই সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়া থাকে। তখন অবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাঁহার শক্তি তখন উক্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করিয়া মনুষ্যের ক্রমবিকাশের বেগ বর্দ্ধিত করিয়া দেন।

তৃতীয়তঃ, পৃথিবী যখন পাপের ভার আর সহ্য করিতে পারেন না, যখন জীবগণ পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে, যখন ভক্তের আকুল ক্রন্দন বৈকুণ্ঠে পৌছায়, তখনই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহাকে না ডাকিলে (without call) তিনি অবতীর্ণ হন না। দেবতারা বৈকুণ্ঠে গিয়া ক্রন্দন করিয়া বলেন "হে জগদীশ! অসুরগণের হস্ত হইতে আমাদের রক্ষা করুন।" সুরও তাঁহার সৃষ্টি, অসুরও তাঁহার সৃষ্টি; দেবও তাঁহার সৃষ্টি, রাক্ষসও তাঁহার সৃষ্টি; সৎও তাঁহার সৃষ্টি, অসৎও তাঁহার সৃষ্টি; তাঁহার রাজত্বে উভয়েরই স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু যখন সৎ অসৎ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, যখন সুর অসুর কর্ত্তৃক, দেবতারা রাক্ষস কর্ত্তৃক পরাজিত হন, তখনই ধর্ম্মের

গ্লানি হয়, তখনই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী কারণে ভগবানের অধিষ্ঠিত জগতে ধর্ম্মের গ্লানি হইয়া থাকে। ধর্ম্মের গ্লানি হইলেই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আমরা লৌকিক জগতে দেখিতে পাই যে, কোন স্থানে শান্তি নষ্ট হইলে যেমন লৌকিক রাজা শান্তি সংস্থাপনের জন্য স্বয়ং মিত্রাদি সহ সেই স্থানে আবির্ভূত হয়েন, সেই প্রকার আধ্যাত্মিক জগতেও ধর্ম্মের গ্লানি প্রভৃতি হইলে ভগবান সাঙ্গপাঙ্গসহ আবির্ভূত হইয়া শান্তি সংস্থাপন করিয়া থাকেন।

(জ) অবতারের সংখ্যা।

শাস্ত্র কাহাকেই বা অবতার বলিয়াছেন এবং কাহাকেই বা অবতার বলেন নাই, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এখন অবতারের প্রকার সম্বন্ধে নিম্নে আলোচিত হইল। চৈতন্যচরিতামৃতে পাঁচ প্রকার অবতারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

"পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর।
গুণাবতার আর, মন্বন্তরাবতার আর।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার॥"

নিম্নে প্রত্যেক প্রকার অবতারের লক্ষণ উদ্ধৃত হইল।

১। পুরুষাবতার —

"সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার। * * *
সেই পুরুষ (প্রথম) বিরজাতে করেন শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগত কারণ॥
কারণাব্ধি পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোম নাহি গতি॥ * * *
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী।
সহস্র শীর্ষাদি করি বেদে যারে গায়ী॥
এই দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর।
মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়া পার॥
তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণ অবতার।
দুই অবতার ভিতর গণনা তাহার॥
বিকট ব্যষ্টি জীবের তিহোঁ অন্তর্য্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তিহোঁ পালনকর্ত্তা স্বামী॥"

২। লীলাবতার —

"মৎস্য কূর্ম্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।
বরাহাদি লেখা যার না পায় গণন॥"

৩। গুণাবতার —

"ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণ অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গী করি করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার॥"

৪। মন্বন্তর অবতার,—

"ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
চৌদ্দ অবতার তাহা করেন ঈশ্বর॥"

৫। যুগাবতার,—

"সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগের গণন।
শুক্ল কৃষ্ণ রক্ত পীত ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম॥"

৬। শক্ত্যাবেশাবতার,—

"শক্ত্যাবেশ দুইরূপে গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎ শক্ত্যো অবতার আবাস বিভূতি লেখি॥
সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম॥
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাই অন্ত॥
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি নারদে শক্তি ভক্তি।
ব্রহ্মার সৃষ্টি শক্তি অনন্তে ভূধারণ শক্তি॥
শেষে স্বসেবন শক্তি পৃথুকে পালন।
পরশুরামে দুষ্ট নাশ বীর্য্য সঞ্চারণ॥"

নিম্নলিখিত অবতার গুলিকে ভাগবত লীলাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—বরাহ, যজ্ঞ, কপিল, দত্তাত্রেয়, কুমার চতুষ্টয়, নর-নারায়ণ, ধ্রুব, পৃথু, ঋষভ, হয়গ্রীব, মৎস্য, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, হরি, বামন, হংস, ধন্বন্তরি, পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস,

বুদ্ধ এবং কল্কি। অন্যত্র নারদকেও লীলাবতারের ভিতর ধরা হইয়াছে। উক্ত পঞ্চবিংশটী অবতারকে লীলাবতার বলে।

মন্বন্তর অবতারের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত নামগুলি পাইয়া থাকি। যথা—যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষক সেন, ধর্ম্মকেতু সুধামা, যোগেশ্বর এবং বৃহদ্ভানু। পূর্ব্বে যজ্ঞ এবং বামনের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং মন্বন্তরাবতারের সংখ্যা দ্বাদশটী মাত্র।

বর্ণ এবং নাম দ্বারা হরি সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্যাম এবং কলিতে কৃষ্ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

কল্পাবতার পঁচিশটী, মন্বন্তরাবতার দ্বাদশটী এবং যুগাবতার চারিটী। সমুদায়ে এক-চত্বারিংশৎ অবতার কথিত হইয়াছেন।

অবতার সমূহকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন যে,—

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথা বিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃস্যু সহস্রশঃ॥"
১।৩।২৬

অর্থাৎ যেমন ক্ষয়শূন্য সরোবর হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নালী নির্গত হয়, সেইরূপ সত্ত্বনিধি হরি হইতেও অসংখ্য অবতার প্রাদুর্ভূত হন। বিরাট পুরুষ এই সকল অবতারের অব্যয় বীজস্বরূপ।

(ঝ) অসংখ্য অবতারের মধ্যে দশটীর নামোল্লেখের কারণ।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, অবতারের সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু সাধারণতঃ অবতার বলিলে মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ প্রভৃতি দশটী অবতারকে বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ বুঝাইবার কারণ কি? অসংখ্য অবতারের মধ্যে অবতার বলিলে দশটীকেই বা লক্ষ্য করা কেন হয়?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। শাস্ত্রে এতদ্‌সম্বন্ধে কিছু উল্লিখিত হয় নাই। শ্রীমতী এনিবেসান্টের মত এই যে—"They mark stages in the evolution of the world. They mark new departures in the growth of the devoloping life." অর্থাৎ এই দশটী অবতার পৃথিবীর ক্রমবিকাশের স্তরকে নির্দ্দেশ করিতেছেন; জীবের উন্নতির নূতন পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রবিদেরা বলেন যে, মৎস্যাদি দশটী বিষ্ণুর অবতার এবং কপিল, ঋষভ, দত্তাত্রেয়, ব্যাস, প্রভৃতি অপর সকলে সিদ্ধ নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত পুরুষ। যদি কোন কল্পে কোন জীব উপাসনা বলে অবতারের অধিকার গ্রহণ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আর দ্বিতীয় পুরুষকে অর্থাৎ বিরাট পুরুষকে (Solar Logos) অবতার গ্রহণ করিতে হয় না। কপিল, ঋষভ, দত্তাত্রেয়, ব্যাস প্রভৃতি অধিকারী পুরুষ ছিলেন বলিয়া প্রয়োজন অনুসারে তাঁহারা অবতার হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুরুষকে আর তখন স্বয়ং অবতার হইতে হয় নাই। ইহাদিগকে কলাবতার বলা হইয়া থাকে। যখন যুগধর্ম্মে ইহাদের অপেক্ষা উচ্চ অধিকারীর প্রয়োজন হয়, তখন দ্বিতীয় পুরুষ শ্বেতদ্বীপের নারায়ণের দ্বারা (through the Planetary Logos) অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তখন তাঁহাকে অংশাবতার বলা হয়। কিন্তু যখন যুগধর্ম্মের জন্য বিশেষ কোন প্রয়োজন হয়, তখন দ্বিতীয় পুরুষ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের সময় তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ অবতার বলে। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। এইজন্য অসংখ্য অবতারের মধ্যে কেবলমাত্র দশটীকে বিষ্ণুর অবতার বলা হয়।

(ঞ) অবতার বহু কেন ?

অবতারের বহুত্ব সম্বন্ধে বৈষ্ণবেরা নিম্নোক্ত প্রকারে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভগবানের রাজত্বে জীবসকল বিভিন্ন রুচির। কেহ জ্ঞান ভালবাসে, কেহ ভক্তি ভালবাসে, কেহবা বিভিন্ন প্রকার সদ্‌গুণ ভালবাসে। সুতরাং ভিন্ন রুচিসিদ্ধার্থ এবং ভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধার্থ ভগবান বহু সংখ্যায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞান ভালবাসেন, তাঁহারা দত্তাত্রেয়, ব্যাস অথবা বুদ্ধের উপাসনা করিবেন, যাঁহারা ভক্তি ভালবাসেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করিবেন, যাঁহারা পিতৃভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণের আদর্শ ভালবাসেন, তাঁহারা রামচন্দ্রকে উপাসনা করিবেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঐ সকল অবতার মূলতঃ এক। যেমন চতুর অভিনেতা বহুবিধ নৈপথ্য (parts) ধারণ করিলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ সে একই ব্যক্তি; অথবা যেমন বৈদূর্য্যমণিতে (opal) বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি সকল অংশ দেখিতে পায়, সে বুঝিতে পারে যে সকল প্রকার বর্ণ তাহাতে সমন্বিত, সেই প্রকার অবতার বহু হইলেও উঁহারা মূলতঃ এক।

(ট) অবতারের লক্ষণ।

শাস্ত্রে অবতারগণের নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা,—

"অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকাল সুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্র চক্ষুঃ শুচির্ব্বশী॥
স্থিরো দান্ত ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগত পালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধু সমাশ্রয়ঃ।
নারীগণ মনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সদাস্বরূপ সম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্য নূতনঃ॥
সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিতঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ॥
অবতারাবলীবীজং হতারি গতিদায়কঃ।
আত্মারাম গণাকর্ষী ত্যমীকৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ॥
সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্য মধুর প্রেমমণ্ডিত প্রিয়মণ্ডলঃ॥
ত্রিজগন্ মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী বিস্মাপিতচরাচরঃ॥
লীলা প্রেম্নাপ্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্য সাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং॥
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদা শ্চতুঃষষ্টি রুদাহৃতঃ॥" *

ইহার অনুবাদ অনাবশ্যক।

(ঠ) দশ অবতারের বিবরণ।

আধুনিক কালে অনেকেই অবতারবাদ মানেন না; কিন্তু যাঁহারা মানেন, তাঁহারা বঙ্কিম বাবুর সহিত বলেন যে, কেবল শ্রীকৃষ্ণই অবতার হইয়াছিলেন; মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, প্রভৃতি রূপক মাত্র। এইরূপ বলিবার কারণ আর কিছুই নয়, তাঁহারা কেবল ভাবেন যে, ভগবান কখন ঐরূপ নিকৃষ্ট জীবে অবতীর্ণ হইতে পারেন না। কিন্তু মনুষ্য অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া বিস্মৃত হইয়া যায় যে, ভগবানের নিকট সকলই সমান। সামান্য তৃণ হইতে উচ্চ দেবতা পর্য্যন্ত সকলই সেই ভগবানের বিকাশ। সুতরাং ভগবান যে কেবল এক

* শব্দকল্পদ্রুমঃ হইতে উদ্ধৃত।

জীবের আকার পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন এবং অন্য জীবের আকার পরিগ্রহ করিবেন না,ইহা ঠিক নহে। আমরা যদি অবতারের আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, ভূতত্ত্ব অনুসারে (Geologically) অবতারের প্রণালী সম্ভবপর। সৃষ্টিপর্য্যায়ের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথমে মৎস্য-যুগ (Silurian Age) ছিল। সেই সময়ে যদি কোন অবতার সম্ভব হয় তো মৎস্য অবতার। কূর্ম্ম অবতার ঐ প্রকারে Amphibian evolution এর এবং বরাহ অবতার Mammalian evolution এর পথপ্রদর্শক। পৃথিবীও ক্রমশঃ জলীয় অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থা ধারণ করিতেছিল এবং এই সময়ে Lemurian মহাদেশ আবির্ভূত হয়। তখন অর্দ্ধেক পশু এবং অর্দ্ধেক নরাকৃতি নরসিংহ অবতার আবির্ভূত হন। তার পর বিকৃত মানব মূর্ত্তি বামন অবতীর্ণ হন। তার পর Lemurian মহাদেশ ধ্বংস হইয়া Atlantic মহাদেশের আবির্ভাব হয়; তখন সৃষ্টির ক্রমবিকাশ অনুসারে আমরা পরশুরামকে মনুষ্যাকারে দেখিতে পাই বটে কিন্তু রামচন্দ্রে মনুষ্যাকারের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। তার পর Atlantic মহাদেশ ধ্বংস হইয়া যায় এবং পৃথিবী আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং ভূতত্ত্ব অনুসারে (Geologically) যে দশটী অবতার সম্ভবপর, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে। যে সময়ের যেরূপ অবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই সময়ে আমরা সেইরূপ অবতার দেখিতে পাই।

পূর্ব্বোক্ত অবতারগুলির আলোচনা করিলে আমরা আরও অবগত হই যে, যে যুগের যাহা চরম উন্নতি, তাহা সেই যুগের অবতারে কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। কবি নবীনচন্দ্র কবির ভাষায় এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—

"যুগউপযোগী
চরম উন্নতি অবতারণ যখন
ঘটিয়াছে, সে যুগের সেই অবতার।
প্রথম সলিলে, মৎস্য। এই নীতি বলে
সলিল পঙ্কিল যবে, কূর্ম্ম অবতার।
পঙ্ক দৃঢ়তর যবে, আচ্ছন্ন উদ্ভিদে,
হইল বরাহ-সৃষ্টি। প্রাণীর শৃঙ্খল
ক্রমশঃ উন্নতিচক্রে হয়ে দীর্ঘতর,
নরসিংহ অবতার। বিস্ময় মূরতি!—
অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ নর, ক্রমে পশু ভাগ
তিল তিল যুগে যুগে হইয়া অন্তর
বিকৃত মানব মূর্ত্তি জন্মিল বামন।
তিন পদ ভূমি নাহি মিলিল তাহার,—
জগৎ অরণ্যময়! হিংস্র-জন্তু-বাস!
ঘুরিল উন্নতি-চক্র,—সকুঠার কর
আসিলা পরশুরাম। বাধিল সমর
বন, বনচর সহ; নাহি শরীরেতে
পশু ভাগ, পশু বৃত্তি হৃদয়ে প্রবল,—
পশু নির্ব্বিশেষে নর! সেই পশু ভাব
যে দিন হইতে হ্রাস হইতে লাগিল,
সেই দিন জগতের যুগ বর্ত্তমান
হইল সঞ্চার। সেই দিন মহাদিন।
প্রকৃত মানব জন্ম হইল সে দিন।
অভ্রান্ত উন্নতি পক্ষে আসিল কৈশোর,
কৈশোরের রামচন্দ্র প্রীতি অবতার,—
ত্রেতায় চরমোন্নতি।"—রৈবতক, দ্বাদশ সর্গ।

এই প্রকারে আমরা দ্বাপরের চরমোন্নতি শ্রীকৃষ্ণে এবং কলির চরমোন্নতি বুদ্ধে দেখিতে পাই।

অবতারের সংখ্যা কীর্ত্তন করিতে গিয়া আমরা পূর্ব্বে যে একচত্বারিংশৎ অবতারের কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে মন্বান্তরাবতার

ও যুগাবতার ভিন্ন আর সকলেই প্রায় প্রতি কল্পেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আমরা পুরাণ হইতে অবগত হই যে, সকল কল্পই এক, তবে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় কখন বা কেহ কেহ কোন অংশে বিভিন্ন হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত দশটী অবতারের বিবরণ সকলেই অবগত আছেন, এই জন্য সংক্ষেপে তাঁহাদের বিষয় নিম্নে উল্লিখিত হইল। শাস্ত্র পাঠে আমরা অবগত হই যে, চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয়। উক্ত চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের ভিতর সায়ম্ভুব মন্বন্তরে বরাহ এবং মৎস্য অবতার হইয়াছিলেন। পরে চাক্ষুষীয় অর্থাৎ ষষ্ঠ মন্বন্তরে বরাহ ও মৎস্যের পুনরাবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে প্রতি মন্বন্তরে মৎস্যাবতারের কথা আছে। ষষ্ঠ মন্বন্তরে নৃসিংহ ও কূর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল। ষষ্ঠ মন্বন্তরে সমুদ্র মন্থনের পূর্ব্বেই নৃসিংহ অবতার হইয়াছিল; সুতরাং চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় কূর্ম্মাদি অবতারের পূর্ব্বেই নৃসিংহের অভিব্যক্তি হইয়াছিল। এখন সপ্তম মন্বন্তর অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তর চলিতেছে। এই মন্বন্তরের বাসনাদি ছয়টী অবতার। ইঁহারা যে সকলে একই চতুর্যুগে হইয়াছেন বা হইবেন, তাহা নহে। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, বামনদেব এই বৈবস্বত মন্বন্তরে দুইবার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরশুরামকে কেহ এই মন্বন্তরের সপ্তদশ চতুর্যুগের এবং কেহবা দ্বাবিংশ চতুর্যুগের অবতার বলিয়া থাকেন। কিন্তু রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধদেব এবং কল্কি বর্ত্তমান চতুর্যুগেরই অবতার।

অবতারগণের আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে বিশেষ মিল না থাকিলেও মোটামুটি হিসাবে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ সত্যযুগের অবতার, বামন, পরশুরাম ও রামচন্দ্র ত্রেতার অবতার। শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের অবতার এবং বুদ্ধ ও কল্কি কলির অবতার।

মৎস্য অবতার সম্বন্ধে ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"সেই পুরুষ চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে সমুদ্র প্লাবনে, মৎস্যরূপের আবিষ্কার পূর্ব্বক পৃথ্বীময়ী নৌকাতে ভাবী বৈবস্বত মনু রাজা সত্যব্রতকে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।" (১৩।১৫)।

কূর্ম্ম অবতার সম্বন্ধে ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"যৎকালে দেবাসুরে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন, তৎকালে ভগবান্ অজিত কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচল ধারণ করিয়াছিলেন।" (১৩.১৬)

বরাহ অবতর সম্বন্ধে ভাগবতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"এই বিশ্বের মঙ্গলার্থ রসাতল-গামিনী পৃথিবীর উদ্ধার করিবার জন্য, ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর বরাহমূর্ত্তির অবিষ্কার করিয়াছিলেন।" (১৩.৭)

নৃসিংহ অবতার সম্বন্ধে ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—ভগবান্ অত্যূর্জ্জিত নারসিংহ-বপুঃ প্রকটন পূর্ব্বক কটধারী (যে মাদুর প্রস্তুত করে) যেমন এরকাকে (তৃণবিশেষকে) বিদারিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে নিপাতিত করিয়া নখ দ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন।

বামন অবতার সম্বন্ধে ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"ভগবান্ বামনরূপ প্রকটন পূর্ব্বক স্বর্গের পুনর্গ্রহণ মানসে বলির নিকট ত্রিপদ পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিয়া তাঁহার যজ্ঞে গমন করেন।" (১.৩।১৯)।

পরশুরাম সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,— "ক্ষত্রিয়বর্গকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী জানিয়া, ভগবান্ পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া, ক্রোধভরে

একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শূন্য করিয়াছিলেন।" (ভাগবতঃ—১।৩।১০)

রামচন্দ্র সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—"ভগবান্ দেবকার্য্য-সাধনার্থ রামরূপে নরদেবত্ব প্রকটন করিয়া সমুদ্র বন্ধনাদিরূপ অসাধারণ প্রভাব দেখাইয়াছিলেন।" (ভাগবত—১।৩।২২)

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে; সুতরাং এখানে বিশেষ কিছু উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

বুদ্ধসম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। এতদ্ সম্বন্ধে শ্রীমতী এনিবেসাণ্ট বলিয়াছেন যে—

"He was the first of our own humanity who climbed upwards to that point, and there merged in the Logos and received full illumination. His was not a body taken by the Logos for the purpose of revealing Himself, but was the last of myriads of births through which he had climbed to merge in Nirvana at last That is not what is normally spoken of as an Avatar, though, you may say, the result truly is the same. But in the case of the Avatar the evolving births are in previous kalpas and the Avatar comes after the man has merged in the Logos and the body is taken for the purpose of revelation But He who is Gautama Buddha had climbed through birth after birth in our own kalpa, as well as in the kalpas that were before. * * * * Finally by his own struggles the very first of our race, He was able to reach that great function in the world * * * The previous Buddhas had been Buddhas who came from another planet. Humanity had not lived long enough here to evolve its own son to that height. Gautama Buddha was human born"—Avatar p. 86.

বৌদ্ধধর্ম্মে কি আছে এবং কি নাই, তাহা অবগত হওয়া উচিত। "বৌদ্ধধর্ম্মে আছে আত্মবল, নাই ঈশ্বর-সহকারিতা। আছে বাসনাত্যাগ, ব্রহ্মাণ্ডনাশ, আছে নির্ব্বাণ, নাই নির্ব্বাণের অবশেষ। আছে প্রকৃতির উপর কটাক্ষ, নাই পুরুষের কেবলত্ব। আছে মায়া-ত্যাগ, নাই স্বরূপাবস্থিতি। আছে পরিণাম-জ্ঞান, নাই অপরিণামী। ফল—বাসনাত্যাগ দ্বারা, ধর্ম্ম আচরণ দ্বারা ঐশ্বর্য্যলাভ ও ঊর্দ্ধলোকে গমন। কিন্তু ঊর্দ্ধাদপি ঊর্দ্ধলোক, ক্রমে ব্রহ্মলোক গমন করিয়া, ব্রহ্মলোকের বাসনা ত্যাগদ্বারা ব্রহ্মলোক হইতে মুক্ত হইলে ভবিষ্যৎ শূন্যময়। ফল, যোগমার্গের পুনরুদ্ধার, যোগের বিভূতিলাভ, পরে যোগদ্বারা নির্ব্বাণ মুক্তি। কিন্তু নিরীশ্বর ব্রহ্মজ্ঞান রহিত প্রকৃতির ক্ষণিক বিজ্ঞান দ্বারা শূন্য চিন্তক ব্যক্তির বাসনা নাশ কোথায়? কিসের জন্য বাসনা নাশ? শূন্যদর্শীর প্রয়োজনই বা কি, অপ্রয়োজনই বা কি? বাসনার মূলে কুঠারাঘাত করিলে, মনুষ্যের চরমলাভ হয় বটে, কিন্তু সে কি শূন্যলাভ? বুদ্ধদেব যদিও শূন্য বলেন নাই, তথাপি তিনি কিছুই বলেন নাই। তাঁহার ধর্ম্মে Metaphysics নাই, Absolute Reality নাই, Thing-in-itself নাই। বাসনা ত্যাগ তবে কিসের জন্য? কেবলমাত্র দুঃখনাশের জন্য; আনন্দ প্রাপ্তির জন্য নহে। দুঃখময় জীবন বরং ভাল, নাশের চিত্র ভয়ঙ্কর। নির্ব্বাণের পর বুদ্ধদেব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিলেন। তিনি পরম আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু এ কথা ত শিক্ষা দিয়া আসেন নাই। সুতরাং চিত্তের আবেগে তিনি শঙ্করাচার্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।"*

গৌতমবুদ্ধের মাহাত্ম্য অবগত হইতে হইলে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বুদ্ধ কাহার নাম নহে, উহা পদবী (title) মাত্র।

* পুরা—১০ ভাগ—৫ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ৯১।

বুদ্ধ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে বোধিসত্ত্ব কাহাকে বলে, তাহা বোঝা উচিত। বোধিসত্ত্বের দুই প্রকার বিভাগ আছে — মানবীয় ও অমানবীয়। অমানবীয় বোধিসত্ত্বগণকে ধ্যানিবোধিসত্ত্ব বলে। তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন সংশ্রব নাই। বোধিসত্ত্বের যথার্থ অর্থ হইতেছে যে, যাঁহার সত্ত্ব বোধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যিনি কোন বুদ্ধের সংশ্রবে থাকিয়া পুণ্য কর্ম্ম করিতে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, জন্মান্তরে তিনি বুদ্ধ হইবেন এবং উপস্থিত বুদ্ধ যাঁহাকে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন, তিনিই বোধিসত্ত্ব। হীনযান বৌদ্ধদিগের মতে এই সময়ে কেবল মতে একজন বোধিসত্ত্বের অস্তিত্বের স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাযান বৌদ্ধরা অনেক বোধিসত্ত্বের অস্তিত্বের স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু উভয় মতাবলম্বীরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, যিনি বুদ্ধত্বে গৌতমবুদ্ধের উত্তরাধিকারী হইবেন, তাঁহার নাম মৈত্রেয়ী। কিন্তু অনেকে বোধিসত্ত্বের জন্য চেষ্টা করিলেও, আমরা বোধিসত্ত্ব বলিলে তাঁহাকেই বুঝি, যিনি বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হইয়া পরনির্ব্বাণ লাভ করিবার পর হইতে নিজে যত দিন না বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরনির্ব্বাণ লাভ না করেন, তত দিন মহিমামণ্ডিত আধ্যাত্মিক পদে আরূঢ় থাকেন, তিনিই সেই সময়কার বোধিসত্ত্ব। এখন অনেকে বোধিসত্ত্বের বিষম ভার মস্তকে বহন করিতেছেন বটে, কিন্তু বোধিসত্ত্ব বলিলে আমরা মৈত্রেয়কেই বুঝিয়া থাকি। গৌতম এই মরজগতে ৩৪ বৎসর বিচরণ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিবার পূর্ব্বে বোধিসত্ত্ব ছিলেন। যেমন তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিলেন, অমনি তিনি বুদ্ধ হইলেন। বুদ্ধ দিপাঙ্করের নিকট যখন গৌতম প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবেন, সেই সময় হইতে বহু জন্ম ধরিয়া তিনি একজন বোধিসত্ত্ব হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর ধরিয়া (কোন্ পুরাকালে) তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধ কাশ্যপ যখন এই পৃথিবী পরিত্যাগ করেন, সেই সময় গৌতম সেই মহিমা-মণ্ডিত পদে (mighty occult office) আরূঢ় হয়েন। সেই সময় হইতে তিনি বোধিসত্ত্ব বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকেন। তখন অনেক বোধিসত্ত্ব থাকিলেও বোধিসত্ত্ব বলিলে গৌতমকেই বুঝাইত। সেইরূপ এখন অনেক বোধিসত্ত্ব থাকিলেও এই সময়ের উপযোগী বোধিসত্ত্ব হইতেছেন মৈত্রেয়। তিনি মিত্রতার দ্বারা এই পৃথিবীকে বাঁধিয়া ফেলিবেন, ভালবাসার দ্বারা জগৎ হইতে ধরা-জ্বর দূর করিবেন। চতুর্দ্দিক হইতে এইরূপ ধ্বনি উঠিতেছে যে, তাঁহার আগমনের আর বেশী দেরি নাই।

আমরা লৌকিক রাজত্বে যেমন রাজা, অমাত্য এবং অন্যান্য রাজপ্রতিনিধি কর্ম্মচারিগণকে দেখিতে পাই, সেইরূপ, আধ্যাত্মিক জগতেও একজন ধর্ম্ম নেতা (Minister of Religion) এবং তাঁহার প্রতিনিধিগণ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই অধিকারী পুরুষ; জন্মজন্মান্তর সাধনার দ্বারা অধিকার লাভ করিয়াছেন। নিজের নির্ব্বাণের ভূমা আনন্দ তুচ্ছ করিয়া নির্ম্মাণ-কায় অবলম্বন করিয়া মনুষ্যগণকে ক্রমবিকাশিত করিয়া উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন। যে সকল নির্ব্বাণ-বিমুখ সাধক মনুষ্যের উন্নতির জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়া কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই ধর্ম্মরাজ বা ধর্ম্ম নেতা। তিনি ইহলোকে বিভিন্ন প্রকার মনুষ্যের উপযোগী

বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছেন। কথন তিনি স্বয়ং আসিয়া কোন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং কথন বা তাঁহার অনুচর প্রতিনিধিগণের মধ্যেও কাহাকে পাঠাইয়া নূতন নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধেরা এই ধর্ম্ম-নেতাকে বোধিসত্ব বলেন। এবং এখন যিনি ধর্ম্মরাজ (Minister of Religion) রূপে বোধিসত্বের আসনে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই মৈত্রেয় বুদ্ধ। যিনি আধ্যাত্মিক জগতের আলোচনা করেন, তিনিই জানেন যে মৈত্রেয় বুদ্ধই,—সাধক যিশুর (Jesus) শরীর তিন বৎসর আশ্রয় করিয়া,—খ্রীষ্ট বলিয়া পরিচিত হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এবং যাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতের সংবাদ জানেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে, আর বেশী বিলম্ব নাই, মৈত্রেয় বুদ্ধ আবার এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন এবং একটী ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সাধকদের কাছেও এই কথা শুনা যাইতেছে যে, মহাপুরুষের অবতীর্ণ হইবার আর বিলম্ব নাই।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার দ্বারা বুদ্ধ ও বোধিসত্বের ভিতর কি প্রভেদ, তাহা আমরা অবগত হইলাম। যাঁহাকে আমরা গৌতম বুদ্ধ বলিয়া অবগত আছি, তিনি জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বোধিসত্বের পদে আসীন হইয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পৃথিবীস্থ জীবের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে বুদ্ধ হইয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহাকে অবতারের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে।

শেষ অবতার, কল্কি অবতার। যখন এই পৃথিবীর পাপের প্রবল স্রোত বহিবে, যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইবে, তখন কল্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের নাশ করিয়া পুণ্যের স্রোত প্রবাহিত করিবেন। তখন আবার পুণ্যময় সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে—

"সুদর্শনোঽস্যাগ্নিবর্ণ শীঘ্রস্তস্য মরুঃসুতঃ॥
যোঽসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ।
কলেরন্তে সূর্য্যবংশং নষ্টং ভাবয়িতা পুনঃ॥"
(৯—১২—৬)

সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ; অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র। শীঘ্রের পুত্র মরু। এই মরু যোগসিদ্ধ হইয়া কলাপ গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। সেইরূপ,—

"দেবাপির্যোগমাস্থায় কলাপ গ্রাম মাশ্রিতঃ
সোমবংশে কলৌ নষ্টে কৃতাদৌ স্থাপয়িষ্যতি॥"
(৯—২২—১০)

দেবাপি যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। কলিতে চন্দ্র বংশ নষ্ট হইলে, তিনি আবার সত্যযুগের প্রারম্ভে ঐ বংশের পুনরুদ্ধার করিবেন।

"দেবাপিঃ শান্তনোর্ভ্রাতা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
কলাপ গ্রাম আসাতে মহাযোগ বলান্বিতৌ॥
তাবিহেত্য কলেরন্তে বাসুদেবানু শিক্ষিতৌ।
বর্ণাশ্রমযুতং ধর্ম্মং পূর্ব্ববৎ প্রথয়িষ্যতঃ॥
(১২—২—৩৮)

অর্থাৎ, শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি এবং ইক্ষ্বাকু বংশজ মরু মহাযোগাবলম্বিত হইয়া কলাপ গ্রামে বাস করিতেছেন। স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের শিক্ষক। কলির অন্তে তাঁহারা আমাদের মধ্যে প্রকট হইয়া পূর্ব্ববৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্থাপিত করিবেন।

তাঁহাদের মধ্যেই একজন কল্কি হইয়া অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার নির্দ্দেশিত পথ অবলম্বন করিয়া জগৎ উন্নতির অভিমুখে ধাবমান হইবে। তাঁহার করুণায় এখন জগৎ ব্যাপিত রহিয়াছে।

এই সকল অবতারগণের উল্লেখ করিয়া ভাগবত কার লিখিয়াছেন যে—"এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" শ্রীধর স্বামী ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—কোন কোন অবতার পরমেশ্বরের অংশ। কোন কোন অবতার তাঁহার বিভূতি। মৎস্য আদি অবতার সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন হইলেও, তাঁহারা কেবল মাত্র আত্মকার্য্যোপযোগী জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। কুমার চতুষ্টয় এবং নারদাদির মধ্যে যিনি যেরূপ অধিকারী, তাঁহার মধ্যে সেইরূপ ঈশ্বরত্বের অংশ ও কলারূপে আবেশ। কুমার আদিতে জ্ঞানের আবেশ এবং পৃথু আদিতে শক্তির আবেশ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ। কারণ তাঁহাতে সকল শক্তিই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

সমাপ্ত।

শ্রীআশুতোষ দেব।

মানব সমাজ। (৬)

সমাজের শিক্ষা সমাজের কর্ম্মোপযোগী হওয়া আবশ্যক। সমাজের কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ। (১) অধ্যয়ন, অধ্যাপন, (২) দেশরক্ষা, (৩) কৃষি বাণিজ্য, (৪) সেবা। এই সকল কর্ম্মোপযোগী শিক্ষা না থাকিলে সমাজ টিকিতে পারে না। শিক্ষা ভাব-প্রধান ও কর্ম্মপ্রধান। এতদুভয় শ্রেণীরই উচ্চ শিক্ষা এখন আর বর্ণমালার সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। আর, উচ্চ শিক্ষাও সমাজের অতি অল্পাংশ ব্যক্তিরই আয়ত্ব।* সুতরাং বর্ণমালার সাহায্যে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ উচ্চশিক্ষা অল্পসংখ্যক ব্যক্তিগণই অনুসরণ করিবেন। অপরে কর্ম্মপ্রধান শিক্ষার যে অংশ বর্ণমালার সাহায্য গ্রহণ করে না, তাহারই অনুশীলন করিবেন। অল্পাংশের নিমিত্ত ভাবময় উচ্চশিক্ষা; অধিকাংশের সম্বন্ধে কর্ম্মপ্রধান নিম্নশিক্ষা। ইহাই সমাজ শিক্ষার প্রকৃষ্ট বিধান, আর বোধ হয়, এতদ্দেশীয় প্রাচীন বিধানও বটে। এ বিধানের অন্যথায় বর্ত্তমান যুগে জগতে যে একটা স্বেচ্ছাচালিত সার্ব্বজনীন শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার কু-ফল পাশ্চাত্য প্রদেশেও মনীষিগণ এক্ষণে উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু সংশোধন করিবার পথ পাইতেছেন না। সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া অসাধ্য; তাহাদিগকে সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক কতিপয় বিধান সকল প্রতিপালন করিতে শিখাইলেই যথেষ্ট হইল। মনোবৃত্তিতে অনুন্নত বালকগণের কথা বলিতে গিয়া সমাজতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রেণ্টুল বলিতেছেন যে "ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, এ কথা বলিয়া সমাজকে প্রতারিত করা সাধুতার পরিচায়ক নহে।"* ফলতঃ সাধারণকে উচ্চশিক্ষা তো দেওয়া যাইতেই পারে না, বর্ণমালার অধীন শিক্ষাও অধঃপতিত দেশে দেওয়া সঙ্গত হইবে না। ভাবপ্রধান ও কর্ম্মপ্রধান শিক্ষার মধ্যে সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা বর্ণমালার সাহায্য

* জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় সংখ্যা নব্যভারত ১২৮—১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* It is not honest for us to gull the public into believing that these can be really educated. They may be taught to be clean and to recognise some of the moral and social laws * * Race Culture p. 51

ব্যতীতও দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহাই প্রকৃষ্ট। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুথিগত শিক্ষা সমাজের উদ্যম ও সাহস ভাঙ্গিয়া দেয় পণ্ডিত সমাজে সাধারণে এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রচলিত হওয়া অপেক্ষা সাংঘাতিক কর্ম্ম আর কিছুই হইতে পারে না।

যাহা হউক, সমাজের অস্তিত্বই সর্ব্বাগ্রে চিন্তনীয়, উন্নতি পরের কথা। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম-মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মই সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই শ্রেণীর কর্ম্মী না থাকিলে অপর তিন শ্রেণীর কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে না। যে সমাজে দেশ-রক্ষক নাই, সে সমাজে অন্য সর্ব্ববিধ কর্ম্মই প্রতিহত হইবে, তাহাতে অণু-মাত্রও সন্দেহ নাই। জগতে এমন সময় কখন আসে নাই এবং এমন সময় কখনও আসিবেও না, যখন এক সমাজ নিঃস্বার্থভাবে অন্য সমাজের প্রকৃত উপকার সাধন করিবে। এ নিমিত্ত বিবিধ সমাজের স্বার্থ-সংঘর্ষ অনি-বার্য্য। আর এই কারণ বশতঃই দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মীও প্রত্যেক সমাজেই অত্যা-বশ্যক।

কিন্তু ইহাদিগের কর্ম্মও (অর্থাৎ দেশ-রক্ষা) এখন আর উচ্চশিক্ষা ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না। শুধু দৈহিক শক্তিতে এখন আর দেশ রক্ষা হয় না। ইহাতেও বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আশ্রয় লইতে হয়। তাই বলিয়াছি, বর্ত্তমান যুগের সামাজিক প্রাধান্যের ইতিহাস মানসিক উন্নতির ইতি-হাসের সহিত জড়িত। তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মও (অর্থাৎ কৃষি-বাণিজ্য) এক্ষণে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেশ রক্ষা ও কৃষি-বাণিজ্য, এই দুই গুরুতর কর্ম্ম উচ্চ শিক্ষার উপরেই নির্ভর করে। এই নিমিত্তই অধ্যয়ন অধ্যাপনকে সামাজিক চতু-র্ব্বিধ কর্ম্মের মধ্যে প্রথম স্থান দেওয়া হই-য়াছে। এই কর্ম্ম অল্প সংখ্যক ব্যক্তির; তাঁহারাই সমাজের চালক ও রক্ষক। তাঁহা-দিগের শিক্ষা প্রধানতঃ এই কয়েকটী বিষয়ে থাকাই চাই, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বস্তুতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব ও জীব-তত্ত্ব। * এই সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা না থাকিলে কেহই সমাজ পরি-চালকের আসন গ্রহণ করিবার যোগ্য হইবেন না। বর্ত্তমান সময়ে এ কথা স্বীকার করি-তেই হইবে।

সমাজের স্বাস্থ্যের কথা আলোচনা করিতে দেশের অবস্থা ও ব্যক্তির অবস্থা উভয়ই বিবেচনা করিতে হয়। সমাজ সুস্থ না থাকিলে কোন কর্ম্মই হইতে পারে না। কিন্তু সমাজকে অনন্তকাল সুস্থ রাখাও যায় না। ব্যক্তির যেমন একটা আয়ুষ্কাল আছে, সমা-জেরও তেমনই আছে। কেবল মনুষ্য সমা-জের নহে, জীবরাজ্যে সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন জীবিত কাল; ভিন্ন ভিন্ন জন্তু সকলেরও ভিন্ন ভিন্ন আয়ুষ্কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। মানব সমাজেরও তাহাই। মানব সমাজেরও বাল্য, যৌবন, জরা আছে। জরা নানাবিধ সামাজিক দুরাচার বশতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। এ সকলকে অনন্ত কাল প্রতিরোধ করা যায় না। কিন্তু তথা-পিও সামাজিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তি লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ দায়ী। সমাজ ধ্বংসের প্রধান কারণ পরবশতা। ইহা

* "We desire to make the chief subject of education both in school and in college a knowledge of nature as set forth in the sciences which are spoken of as physic, chemistry, geology and biology." Ray Lankester, Kingdom of Man p. 52.

হইতে মানসিক ও দৈহিক জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং কর্ম্ম প্রতিহত হয়। আর কর্ম্মের অভাবে সমাজ কখনই টিকিতে পারে না। লোক-স্থিতির এক বিশেষ অন্তরায় পীড়া। দেশব্যাপী পীড়া দমন করিবার চেষ্টা কেবল ব্যক্তিগত হইতেই পারে না। উহা দেশব্যাপী রাজশক্তির কর্ম্ম। বঙ্গীয় সমাজে বর্ত্তমান সময়ে বর্ষে বর্ষে বার লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া, কলেরা ইত্যাদি রোগে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে। ইহা প্রতিরোধ করিবার শক্তি ব্যক্তির আয়ত্ত নহে। যে শক্তি সমাজের সর্ব্বত্র অনুভূত হইতে পারে, অনায়াসে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম হয়, তাহা ভিন্ন, অর্থাৎ রাজশক্তি ভিন্ন, এরূপ দেশব্যাপী মহামারী কখনই নিবৃত্ত হইবার নহে। আর যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকিলেও এই গুরুতর কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি কোথায়ও সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। তারপর সামাজিক দুরাচার ও দুর্নীতি—এ সকলও অনেক সময়েই রাজশাসন ব্যতীত নিবৃত্ত হওয়া সহজ নহে। অবশ্য ইহা স্বীকার করি যে, জনসাধারণের সহানুভূতি না পাইলে এ সকল বিষয়ে রাজশাসন কিছুই করিতে পারে না। আর রাজশাসন দেশীয় উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানিগণের হস্তে ন্যস্ত না থাকিলে বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। এই নিমিত্তই জ্ঞানিগণ সমাজ শাসনোপযোগী স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিবেন; আর দেশ-রক্ষকগণ তদীয় বিধান সকল পরিচালন করিবেন; ইহাই এতদ্দেশীয় প্রাচীন আদর্শ। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা আর একটী গুরুতর বিষয়ের প্রতি নির্ভর করে। উহা বংশ পরম্পরা। বংশ পরম্পরাগত পীড়া দুশ্চিকিৎস্য। এই সকল স্থলে বিবাহ বিধির সংকোচ করাই একমাত্র উপায়। বংশপরম্পরাগত মারাত্মক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির বিবাহ করা অনেক সময়েই অসঙ্গত। কিন্তু তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবে কে? তাহাদিগের সৎ শিক্ষা এবং রাজবিধি—এই দুই উপায় ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সামাজিক স্বাস্থ্য জনসমাজের সৎ শিক্ষা ও রাজ বিধানের উৎকর্ষের প্রতি নির্ভর করে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুরাচার, স্থানীয় অস্বাস্থ্য, এ সকল অপেক্ষাও গুরুতর বিষয় জনন-হীনতা। সমাজ-ধ্বংসের পক্ষে ইহার ন্যায় কারণ আর নাই। আমি জননহীনতা শব্দে জন্ম মৃত্যুর অনুপাতও বোধ করিলাম। জন্ম সংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সে সমাজ টিকিবে কেমন করিয়া? জন্ম সংখ্যার নানা কারণে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় পীড়া জননশক্তির হানী করে। সুতরাং জন্ম সংখ্যারও হ্রাস করিয়া থাকে। জন্ম সংখ্যা প্রধানতঃ প্রাপ্ত বয়স্ক দম্পত্তির সংখ্যার উপর নির্ভর করে। এই শ্রেণীর দম্পত্তির দেহ ও মন সুস্থ ও প্রফুল্ল থাকা আবশ্যক। যে সমাজে সুস্থ ও প্রফুল্ল প্রাপ্ত বয়স্ক দম্পত্তির সংখ্যা কম, সে সমাজে জন্মের সংখ্যা হ্রাস হইবেই তো। জন্মের সংখ্যা কি বিজ্ঞান বলে বৃদ্ধি করা যায়? বোধ হয় যায়। জীবতত্ত্বের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে ইহা একেবারেই অসাধ্য নহে। কিন্তু লোকস্থিতির সহজতর উপায় মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করা। এই কার্য্য অতীব কঠিন নহে। ব্যক্তিগত আয়ুষ্কাল যদিও অনেকাংশ বংশপরম্পরাগত নিয়মের প্রতি নির্ভর করে, তথাপি শারীরতত্ত্বের এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়ম সকল সুপ্রতিপালিত

হইলে মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস করা অসম্ভব নহে, বরং বিশেষ সম্ভব। কেবল তাহাই নহে, বাল্য বিবাহাদি কতিপয় সামাজিক দুর্নীতি নিবৃত্ত করিলেও মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হওয়া সম্ভব। ফলতঃ সমাজ-স্থিতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল কাল স্রোতে ভাসিয়া গেলে ধ্বংসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই। মানব সমাজের সভ্যাবস্থায় অসভ্যাবস্থা অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা কমিয়া যাইবেই, কিন্তু জ্ঞানোন্নত সভ্য মানব মৃত্যু সংখ্যা কমাইতে অবশ্যই সক্ষম হইবে। এই কার্য্য গুরুতর প্রযত্ন-সাধ্য; আর সে যত্নও কেবল ব্যক্তিগত হইলে চলিবে না, সমাজব্যাপী শক্তি অর্থাৎ রাজশক্তি কর্তৃক পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক, সমাজ-স্থিতির প্রধান বিঘ্ন রাজশক্তির অভাব, ঔদাসিন্য অথবা বিকৃতাবস্থা। সমাজের সর্ব্বত্র যে ভাব স্পন্দিত হইতেছে, রাজশক্তি তাহারই বহ্য বিকাশ, আর কিছুই নহে। এই শক্তির ইত্যাকার লক্ষণ থাকিলেই সমাজের স্থায়িত্ব ও উন্নতির আশা করা যায়; নচেৎ সমাজ সহস্র খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়। ব্যক্তির যেমন জীবাত্ম-শক্তি, সমাজের তেমনই রাজ-শক্তি। এই শক্তি সম্রাট নামক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির হস্তগত হওয়াই যে আবশ্যক, তাহা নহে; কিন্তু এই শক্তি-প্রসূত মঙ্গল বিধান সকল সর্ব্বত্র পালিত হয়, এরূপ ব্যবস্থা থাকিলেই যথেষ্ট হইল। মানবসমাজ কেবল বর্ত্তমান বংশীয় ব্যক্তি সকলের সমষ্টি নহে। পূর্ব্ব পুরুষগণের জ্ঞান ও সভ্যতায় মানব সমাজ সর্ব্বদাই অনুপ্রাণিত। সেই জ্ঞান ও সভ্যতা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সামাজিক বৃত্তিতে অলঙ্কৃত করা চাই; নতুবা সমাজ রক্ষা হয় না। দেশ-হিতৈষিতা পৃথক কথা; আমি এস্থলে তাহার কথা বলিতেছি না। নির্দ্দিষ্ট সমাজস্থ ব্যক্তি-গণ সেই সমাজের গঠন, চালন, বংশপরম্পরা-গত ভাব, সেই সমাজের বিশেষত্ব, অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্নবান হওয়া চাই। এই সকল বিষয়ের প্রবল ইচ্ছাই সামাজিক বৃত্তি। সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও আসক্ত না হইলে এ বৃত্তির স্ফুরণ হয় না। আত্ম সমাজকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলে সামাজিক বৃত্তি লোপ হয়; তখন আর সমাজকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হয় না, ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। সামাজিক-বৃত্তি হইতেই সমাজনীতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ধর্ম্ম নীতির কথা পরে বলিব। সমাজ বদ্ধ জীব মাত্রেই সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করে, নচেৎ সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর হইয়া উঠে। তখনই ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয়। আর যদ্যপি এই কার্য্যের সহায়তা করিবার নিমিত্ত মূর্খতা, জড়তা, দুরাচার ও ধর্ম্ম জ্ঞানের শিথিলতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সে সমাজ অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ অবস্থা স্থায়ী হইলে সে সমাজ কখনই জীবিত থাকিতে পারে না।

শ্রীশশধর রায়।

কেন ?

১

ওগো কবি ছিয়ে ছিয়ে হা ধিক্ হা ধিক্!
আবার জাগিল ঈর্ষ্যা, ভৈরব হুঙ্কারে,
সুকোমল সাহিত্যের ললিত বিপিন,
বিকম্পিয়া, দম্ভভরে কেন দিলে সাড়া ?
'বিজয়' পশ্চাতে তব, সঙ্গে মতিমান্
বন্ধুবর্গ, প্রতিভার উজ্জ্বল অনলে
দম্ভের ইন্ধন রাশি করিয়া প্রক্ষেপ
তুলেছে করিয়া তোমা হেন আত্মহারা ?
দম্ভ অদ্রি শিরোপরি গৌরবে বসিয়া
দেখিতেছ সবে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, মলিন।
ভঙ্গিকর হাস্যকর দম্ভ বিকাশিয়া
Mathurin, Lucilius যাহা ইচ্ছা সাজি,
চিত্ত-উৎস হতে দেও ঢালি অকাতরে
অবাঞ্ছিত মধুরাশি, ভাক্ত সহৃদয়—
যাহদের মনোমাঝে, করিতে সৃজন
কাব্যের বিচিত্র লীলা, হাসি অকিঞ্চন
কল্পনার ব্যঙ্গভরা স্থূল রঙ্গরাশি।
শিখিপুচ্ছে প্রসাবিত বায়সের দল
তোমার মল্লার রাগে নাচিয়া বেড়াক।

২

নীতিভ্রষ্ট, প্রেমপুষ্ট লাঞ্ছিত রবীন্দ্রে
নাই নাই কিছু নাই শুধু দুষ্ট-প্রেম,
শুধু হাসি অভিসার চকোর চুম্বন,
বাসিমালা-কোলে-করি রজনী যাপন।
স্বর্ণথালে "নৈবেদ্যের" মন্দার মঞ্জীর,
দেবদ্যুতি বিকারিয়া ঢালিছে পীযূষ,
ঈর্ষা বিনিময়ে যদি হৃদয়-চষক,
সে অমৃত নিত ভরি, শিরায় শিরায়
প্রসন্ন সরল প্রেম বহিত মধুর।

৩

গান ছেড়ে, হাসি ছেড়ে জগতের কবি
মহিমায় মহীয়ান, বঙ্গের গৌরব
জ্যোতিষ্ক রবিরে চাও শিখাইতে রুচি !!
পাষাণে গঠিয়া বপু সগর্ব্বে সে মূসি
আপনারে দম্ভসহ করিছ প্রক্ষেপ
চূর্ণ করিবারে ওই অদ্রির শিখর।
রুচিশীলে ডাকিতেছ হইতে সহায়
দুর্নীতি কণ্টক-দলে আবিদ্ধ ভারতী,
বেদনা উঠেছে বেজে হৃদয়ে তোমার,
তাই আজি প্রিয়সখা বাঁধিয়া কোমর
কবি-বীণা দূরে ফেলি, গদাধারী হ'য়ে,
বিদ্ধ কণ্টকের দলে নির্ম্মূল করিতে
উঠিতেছ গরজিয়া, বলিহারি যাই !!

৪

ওগো কবি! প্রেম! প্রেম। চুম্বন-চয়ন!
অধরে মদিরা ঢালি, কবিতা সৃজন,
অসহ্য অশ্রাব্য, রুক্ষ, কাব্যের ভাণ্ডারে
হেন কাব্য অবশ্যই পাইবে না স্থান।
চণ্ডালের হাত দিয়া এসো 'মানসারে'
পুড়াইয়া ছাই করি, মাথাই রবিরে।
গানে প্রেম, ধ্যানে প্রেম, রূপে প্রেম-ঝরা
রবিরে এসোহে করি চির নির্ব্বাসন।
আমরা "আষাঢ়ে" নিয়ে হাসিয়া হাসিয়া
করিব গুড়ুক ফুঁকে জীবন যাপন।
হে কবি উজ্জ্বল রস রসশিখরিণী
পরশে কোকিল তার করে কুহরণ,
সমীর মলয় রূপ করিয়া ধারণ,
কলিকার বক্ষ মাঝে, সঞ্চারি যৌবন
বিলাস হিল্লোলে তারে রাখে মাতাইয়া।
হৃদয়ে বাসনা বাস, ফুলে পরিমল,
অধরে ফুটিয়া উঠে, মণিয়ার হাসি,
প্রেম-স্নাত মন সদা ধায় অভিসারে
উল্লাস চঞ্চল পদে, দুনয়ন মেলি
হেরিতে সে চারুতায়, ডুবিতে তাহার,
অতল হৃদয় তলে তুলিতে রতন।

আমরা সহায় তব, হেমেন্দ্র, রামেন্দ্র,
বিজয়, সুরেশচন্দ্র—এসো মিত্রগণ!
প্রণয় বিকীর্ণ বঙ্গ, অরুচি প্রবাহে
দেখ আজি পরিপ্লুতা। রবিচিত্ত হ'তে
প্রবাহিত হইতেছে দুর্নীতি জীবন।

ধর্ম্ম নীতি সমাজের হিতকল্পে ভাই,
সমবেত বলরাজি করিয়া প্রয়োগ,
রবি হতে রবি-দ্যুতি লইয়া ছিনায়ে
মলিন করিয়া তারে এসো সবে রাখি।
অতি দূরে দুর্গাদাস করিছে গর্জ্জন
চিতোরের শৈলে শৈলে প্রতিধ্বনি তার
চীৎকারিয়া উঠিতেছে, শুধু দীর্ণ করি
আকাশ-ইথর-ভরা গভীর পরাণ।
প্রেম আনে অবসাদ; খুব সাবধান
রবির প্রেমের আলো করিতে নির্ব্বাণ।
ভাবে ভরা শুভ্র স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য-মালায়
বিদ্বেষ তমিস্রা রাশি করিতে মিশ্রিত
এই বার ঈর্ষা তব তৃতীয় প্রকাশ।
জানি আমি বিষমিশ্র সুধা কণ্ঠে তব,
অনেকে উঠিবে মাতি, অনেকে আবার,
বিজনে বসিয়া দিবে দুই হাতে তালি,
বাখানিয়া উচ্চ-কণ্ঠে রবির লাঞ্ছনা।
নগ্নতায় অশ্লীলতা যে বলে বলুক,
নগ্নচিত্র সৌন্দর্য্যের প্রকৃত আশ্রয়
সৌন্দর্য্য কিরণবাসে, সদা প্রকাশিত।
সত্য, শিব, শ্রেয়ঃ, সবাই নগন
অশিব অসত্য চায়—শিষ্টের বসন।
কত লোকে সুরুচির মাহাত্ম্য ঘোষিতে
ক্ষুদ্র গৌতমের কার্য্য করিল জাহির,
হায় হায় কি বলিব কপালের দোষে

Such and so various are the
tastes of men.

হায় কবি রুচি তব ফণি ফণা ধরি
গরজিছে শিৎকারিছে গরল গৌরবে,
তুলাও আপন শির অদূরে রবির,
কণ্ঠ মুরলীর তান কি আলাপে শুন।

৭

ডন জোয়ানের কবি ওই দেখ শোভে
উদ্ভাসিয়া সাহিত্যের নির্ম্মল আকাশ।
গর্ব্বস্ফীত জেফেরির পেচক চীৎকার
এখন গাজে না আর সৌন্দর্য্য বিপিনে।
জেফেরির বিদ্বেষের বিষময়ী ভাষা
সুপ্ত হ'য়ে এবে যেন কোথা আছে পড়ি।

৮

স্নিগ্ধ-রশ্মি-রেখা দিয়া শরতের শশী
সাজাইবে প্রেম-মুগ্ধা কুমুদ বালায়,
বিধুরা রথাঙ্গ-বধূ, সৈকতে বসিয়া
চির নিশি মিলনের করিবে ধিয়ান;
মেঘ যে সে মেঘে চায়। শিখিনী শিখিনী,
নাহি থাকে কণ্ঠে তার কর্ম কহু তান।
রবিরে অরবি কেন করিবার তরে
ঘূর্ণিত মস্তক তব, উন্মম-পীড়িত?
দ্বিজেন দ্বিজেন রবে, রবি রবে রবি,
কেন ঈর্ষা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হে হাসির কবি!

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

তুকারাম। (শেষ)

তুকারাম শূদ্র হইয়া কথকতা এবং ধর্ম্মোপদেশ করিলেন, বেদমন্ত্র বুঝাইলেন; ব্রাহ্মণের সহিত একত্র ভোজন, পূজন ও উপবেশন করিতে সাহসী হইলেন, ধর্ম্মপ্রাণ, সরলহৃদয় সাধুলোকের প্রণাম ও নমস্কার গ্রহণ করিলেন, ইহা বড় আস্পর্দ্ধার কথা। এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং দণ্ডভোগ করিতে হইবে। বদ্ধমূল কুসংস্কার, অন্তঃসারশূন্য বৃথাভিমান, এবং প্রভুত্ব-দৃপ্ত উগ্র-ব্রাহ্মণের জ্বলন্ত হিংসা তাঁহার বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিল। দেহুর গোঁসাই ঠাকুর মম্বাজী তুকারামের প্রতিপত্তি দেখিয়া হিংসায় জ্বলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অন্তরের ক্রূরভাব বাহিরে প্রকাশ না করিয়া কপটী ব্রাহ্মণ প্রত্যহ তুকারামের ভজনে যোগদান করিত। ঠাকুর মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে তাঁহার একটী বাগান ছিল। মম্বাজী বাগানের চারিদিক কাঁটার বেড়ায় ঘিরিয়া দিয়াছিল। একবার একাদশীর পর্ব্বদিনে মন্দিরে বহুসংখ্যক যাত্রীর

সমাবেশ হইল। তুকারাম দেখিলেন, সেদিন কণ্টক বৃক্ষগুলি মন্দির পর্য্যন্ত ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং মন্দির-প্রদক্ষিণের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য করুণহৃদয় তুকা স্বহস্তে কাঁটা গাছগুলি সরাইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ইহাতে নিষ্ঠুর মম্বাজী ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সেই কাঁটাগাছের দারুণ প্রহারে তুকারামকে জর্জ্জরিত করিল। তুকারামের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল। সুখ-দুঃখ এবং নিন্দা-প্রসংশায় তুল্যভাব সাধু তুকা শারীরিক গ্লানিতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, অপমান ও নির্য্যাতন উপেক্ষা করিলেন, কুটীল হৃদয় মূর্খ মম্বাজীর প্রতি কিছুমাত্র রোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। তিনি অটল অচল হিমাচলের ন্যায় দৈনন্দিন দেবসেবা ও ভজন কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তুকা সুখে অবিকৃত-চিত্ত, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন-মন, বীতরাগ ভয়ক্রোধ, স্থিরধী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, এ তাঁহার বিশ্বাসের পরীক্ষা মাত্র—ভক্ত মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি সুখ দুঃখ, মান অপমান এবং আদর নির্য্যাতনের একমাত্র মূল কারণ হৃদয়-দেবতাকে মুক্তপ্রাণে ডাকিয়া কহিলেন :—

ন সোড়োঁ ন সোড়োঁ নসোড়োঁ,
বিঠবাচরণ নসোড়োঁ।
(ধ্রু। ভলতেঁ জড় পড়োভারী,
জীবাবরী আগোজ।)
শত খণ্ড দেহ শস্ত্রধারী,
ফরিতাঁ পরো ন ভোয়ে।
তুকাহ্মণে কেলী আধোঁ
দৃঢ়বুদ্ধী সাবধ।

ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না, বিঠবা চরণ (আমি কিছুতেই) ছাড়িব না। যতই ভারী বিপদ আসুক, জীবন সঙ্কটাপন্ন হউক, শস্ত্রধারী আমার দেহ শত খণ্ড করুক, তথাপি ভয় করিব না। কারণ তুকা বলে, আমি প্রথমেই দৃঢ়বুদ্ধি হইয়া মনকে প্রস্তুত করিয়াছি।

কি জলন্ত বিশ্বাস, কি দৃঢ় পণ, কি আশ্চর্য্য নির্ভর! এই শক্তির ছায়ামাত্র শিবাজী ও পেশবাতে সংক্রান্ত হইয়া মোগল সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করিয়াছিল। আর একজন ভক্ত কবি কহিয়াছিলেন—

যদি তুমি শিরে আঘাত অসি,
পিছু না হটিব রহিব বসি।
তব হেতু যদি মরণ হয়,
বেঁচে উঠা, সেত মরণ নয়।

এমন না হইলে কি ব্রহ্মাণ্ড-দুর্ল্লভ তুরীয় ব্রহ্মের সামীপ্য ও সাযুজ্য মধুপান করা যায়? মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রহারে জর্জ্জরিত ও রক্তাক্ত-কলেবর হইয়াও ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, আর বাষ্পগদ্‌গদ্‌-কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন—

মেরেছিস্ বেশ করেছিস্,
একবার হরি বলে নাচ ভাই।

সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া জগাই মাধাইর পাষাণ প্রাণ দ্রবীভূত হইয়াছিল, মদিরামত্ত দস্যু প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। তুকারামের অদ্ভুত ক্ষমা ও বিশ্বাসের গভীরতা দেখিয়া মম্বাজীর অভিমান ও ক্রূর প্রকৃতি পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেল। ভক্ত তুকার মধুর সৌম্য মূর্ত্তিতে গোঁসাই মম্বাজী জগন্নাথের মহিমা দেখিয়া মোহিত হইলেন—মম্বাজী তুকারামের ভক্ত হইলেন।

কিন্তু তুকারামকে কঠোরতর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। কবিজীবন কষ্টময়—নাইটিঙ্গেল কণ্টকে কণ্ঠ রাখিয়া

কাকলী ধ্বনি করে। তুকারামের ভক্তির কথা, কীর্ত্তন ভজনের কথা, কবিতাশক্তির কথা ও কথকতার কথা, দেশদেশান্তরে প্রচারিত হইতে লাগিল। নানা দূরদেশ হইতে অসংখ্য পিপাসু তীর্থ যাত্রী দেহুগ্রামে বিঠবা মন্দিরে সাধুদর্শনে সমাগত হইতে লাগিলেন। ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের প্রাণে শূদ্রের এতদূর প্রতিপত্তি সহ্য হইল না। রামের ধ্বংসের নিমিত্ত পুনরায় ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। ক্ষমতান্ধ অভিমান-দৃপ্ত 'জন্মগত' ব্রাহ্মণেরা বুঝিলেন না যে, ব্রহ্মবিদ্ কর্ম্মগত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের অপেক্ষা সর্ব্বত্র সকল যুগেই শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কোন নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ নিজবংশে আভিজাত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, তাই আজ তাঁহারা সম্মানের পাত্র।

পুণ্যা নগরীর ঈশান কোণে বাঘোলী একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম (খেড়ে)। সেই গ্রামে রামেশ্বর ভট্ট নামে একজন বিদ্বান্ এবং রাজদ্বারে সম্মানিত ব্রাহ্মণ বাস করিত। তুকারামের খ্যাতি তাহার হৃদয়ে হিংসার বিষ ঢালিয়া দিল। একজন বর্ণজ্ঞান-হীন শূদ্র দোকানীর এত যশও কি প্রাণে সয়? রামেশ্বর গ্রামাধিকের নিকট তুকারামের নানা দোষের কথা উল্লেখ করিল এবং তুকাকে দেহুগ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত ঐ গ্রামের পাটিলের নামে গ্রামাধিকের সহীযুক্ত এক আদেশ-পত্র প্রেরণ করিল। তুকারাম নিরুপায় হইয়া রামেশ্বর ভট্টের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে গেলেন। রামেশ্বর বলিল, 'তুই কথকতায় বেদ ব্যাখ্যা করিস্। শূদ্র বেদ পাঠ করিলে পাঠক এবং শ্রোতা উভয়েরই পাপ হয়। তুই কবিতা রচনা হইতে ক্ষান্ত হ।" তুকা সরল ভাবে উত্তর করিলেন, 'আমি ইচ্ছায় কিছু করি নাই। যাহা কিছু লিখিয়াছি, দেবতার (পাণ্ডুরঙ্গের) আদেশে। ব্রাহ্মণের বাক্যও অলঙ্ঘ্য। অতএব আমি আর কবিতা লিখিব না। কিন্তু যে গুলি রচনা করিয়াছি, তাহার কি হইবে· অনুমতি করুন।' দাম্ভিক রামভট্ট হুকুম করিল, "জলে ফেলিয়া দিস্।" তুকা যে আজ্ঞা চলিয়া আসিলেন। তাঁহার অপরাধ মাপ হইল। তিনি দেহুগ্রামের ঠাকুরমন্দির হইতে তাড়িত হইলেন না। তুকারাম বিঠবা ঠাকুরের চরণে সকল কথা নিবেদন করিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিলেন এবং স্বহস্তে পুথিপত্র ইন্দ্রায়নী নদীর জলে ডুবাইয়া দিলেন। দ্বিজ রামেশ্বরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

আপদের শান্তি এখানেই হইল না। গ্রামের যত 'শ্রাদ্ধানন্দের' দল তুকারামকে বিনামূল্যে সমালোচনা বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বিদ্রূপ করিতে লাগিল, "তুকা তুমি পূর্ব্বে একবার দলিল-পত্র জলে ফেলিয়া দিয়া ইহলোকের আশাভরসা নির্মূল করিয়াছিলে, এবার অভঙ্গগুলি জলে দিয়া পরলোকের আশা ভরসা হারাইলে। ধিক্, তুমি ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইলে।" এই বিদ্রূপ বাক্য তুকার প্রাণে শেলসম বাজিল। তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিঠবা মন্দিরে 'ধরণা দিয়া" পড়িয়া রহিলেন। এই ভাবে ১৩ দিন কাটিয়া গেল, তুকারামের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। তবে কি তুকারামের সত্য সত্যই সব ফুরাইল! তবে কি ভক্তবৎসল মধুসূদন আশ্রিতের আর্ত্তনাদ শুনিতে পান নাই? তবে কি সংসারে বিশ্বাসের পরাজয় এবং অবিশ্বাসেরই জয়জয়কার হইবে? না, তাহা হইলে যে দয়াময়ের

ভক্তবৎসল নামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। তুকারামের অশ্রুজল বৈকুণ্ঠের পথে বাণ ডাকিল, তুকারামের দীর্ঘশ্বাসে অলকাপুরে তুফান বহিল, তুকারামের অব্যক্ত অস্ফুট কাতর-ধ্বনিতে ব্রহ্মলোক কম্পিত হইল। ভক্তের ভগবানের ইঙ্গিতে অসম্ভব সম্ভব হইল, বিশ্বপতির অনন্ত মহিমা প্রকট হইল। চতুর্দ্দশ দিবসের দিন দয়ার সাগর হরি স্বপ্নযোগে শিশুবেশে দর্শন দিয়া ম্রিয়মান তুকারামকে সান্ত্বনা দিলেন এবং কহিলেন, 'কোন চিন্তা নাই, তোমার পুথি নদীর জলে অক্ষত ও অবিকৃত রহিয়াছে।' তুকা হাতে স্বর্গ পাইলেন —ভক্তিতে এবং কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, নয়নে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। বিশ্বাসের জয়ডঙ্কা গভীরনাদে নিনাদিত হইল।

তুকা প্রাণের দেবতাকে বিরক্ত করিয়াছেন বলিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া লিখিলেন :—

থোর অন্যায় কেলা তুঝাঅন্ত ম্যাপাহিলা,
জনাচিয়া বোলাসাটী চিত্তক্ষো ভবিলেঁ।
(ভাগবিলাসী কেলা সীণ অধম মী়র্যাতহীন,
ঝাঁকুনি লোচন দিবস তেরা রাহিলোঁ)।
অবধেঁ ঘালুনিয়াং কোড়েঁ তানভুকেচেঁ
সাঙ্কড়েঁ।
যোগক্ষেম পুটেঁ তুজ করণেঁ লাগেল।
উদকীঁ রাখিলে কাগদ চুকরিলা জনবাদ।
তুকাহ্নণে ব্রীদসাচ কেলেঁ আপুলেঁ॥

আমি বড়ই অন্যায় করিয়াছি—তোমার মহাপরীক্ষা করিয়াছি। লোকের কথায় তোমাকে বিরক্ত করিয়াছি। (আমি অধম জাতিহীন, ১৩ দিবস নয়ন মুদিয়া থাকিয়া তোমাকে অতিশয় বিরক্ত করিয়াছি।) তুমি বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে আশায় আমি উপবাসে আত্মহত্যার ভার তোমার উপর চাপাইতে গিয়াছিলাম। জলের ভিতর তুমি কাগজ রক্ষা করিলে এবং লোকাপবাদ বন্ধ করিলে। তুকা বলে, তুমি আপন ব্রত (ভক্তবৎসল নাম) রক্ষা করিলে।

আরও বলিলেন—

কাপো কোণী মাঝীমান সুখেঁ পীড়োত দুর্জ্জন।
তুজ হোয়সীণ তেঁমীন করোঁ সর্বথা।
(চুকীজালী একবেলা মজ পাসুনি চণ্ডালা।
উভেঁ করোনিয়াঁ জলা মাজীবহ্যারাখিল্যা।
নাহীঁ কেলাহা বিচার মাঝাঁকোণ অধিকার।
সমর্থাসী ভার ন কলে কৈসা ঘালাবা।

কোন দুর্জ্জন যদি আমার গলদেশও ছেদন করে এবং আমাকে যথেষ্ট পীড়ন করে, তথাপি তোমাকে আর বিরক্ত করিব না। (আমি পাষণ্ড চণ্ডাল, একবার ভুল করিয়াছি, তোমাকে জলের ভিতর অবতরণ করাইয়া বহী রক্ষা করাইয়াছি।) আমি এ বিচার করিলাম না যে আমার অধিকার কি? কিরূপে মহতের নিকট কৃপা যাচঞা করিতে হয়, তাহাও আমি কিছুমাত্র জানিতাম না।

তুকা-বিদ্বেষী রামেশ্বর ভট্ট কোথায়? তাহার দুর্দ্দশার সীমা নাই। ক্রূর-প্রকৃতি দাম্ভিক ব্রাহ্মণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে এবং ভক্তের মহিমা প্রচার করিতে নারায়ণ অধিকতর অলৌকিক দৈবশক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুণ্যা নগরীতে নাগনাথ নামে এক অতি জাগ্রত দেবতা ছিলেন। রামেশ্বর তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিত। একদিন রামেশ্বর দেবতা দর্শনে গেল। সেখানে অনঘভ নামে এক সাধু বাস করিতেন, তাঁহার ইন্দারায় রামভট্ট স্নান করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কূপ জলে স্নান করিবামাত্র তাহার সমস্ত শরীরে দাহ হইতে লাগিল। কেহ বলিল,

'সাধু কূপজল বিষাক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং তোমার এ দুর্দ্দশা।' কেহ বলিল, 'তুমি তুকারামের কবিতায় দোষারোপ করিয়াছিলে, সেই পাপে তোমার এ দুর্গতি।' রামেশ্বর উপায়ান্তর অভাবে অলকাপুরী যাইয়া জ্ঞানদেবের আরাধনা করিতে লাগিল এবং তুকারামের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে রামেশ্বরের স্বপ্নাদেশ হইল। এদিকে সলিল হইতে তুকারামের গ্রন্থোদ্ধারের অদ্ভুত কাহিনী লোক মুখে চারি দিক রাষ্ট্র হইয়া ছিল। রামেশ্বর কালবিলম্ব না করিয়া তুকারামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এক শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইল। তুকা উত্তরে লিখিলেন;—

চিত্ত শুদ্ধ তরী শত্রু মিত্র হোতী,
ব্যাঘ্র হেন খাতী সর্প তয়া।
(ধ্রু। বিষতেঁ অমৃত আঘাততেঁ হিত,
অকর্ত্তব্য নীত হোয় ত্যাসী।)
দুঃখ তেঁ দেইল সর্ব্ব সুখ ফল,
হোতীল শতিল অগ্নিজ্বালা।
আবডেল জীবাঁ জীবাচিরে পরী।
সকলাঁ অন্তরী একভাব।
তুকাঙ্গণে কৃপা কেলী নারায়ণেঁ,
জানিজেতে যেণেঁ অনুভবেঁ।

চিত্ত শুদ্ধ হইলে শত্রুও মিত্র হয়। এমন কি, ব্যাঘ্রও ভক্ষণ করে না। এবং সর্পও দংশন করে না। (বিষ অমৃত হয়, অনিষ্ট ইষ্ট হয়, অন্যায় ন্যায় হয়।) দুঃখ সুখের হয়, অগ্নিজ্বালা শীতল হয়, আত্মবৎ সর্ব্বজীবে দয়া এবং প্রেম হয়, যেহেতু সকলের অন্তরে একরূপ ভাব। তুকা বলে, "তোমাকে নারায়ণ কৃপা করিয়াছে, অনুভবে তাহা বুঝিতে পার।

এই অভ্রান্ত বৈদিক সত্যের উপর টীকা অনাবশ্যক। কথিত আছে, এই শ্লোক রামেশ্বরের সকল জ্বালা নিবারণ করিয়াছিল। এইরূপে মম্বাজী ও রামেশ্বর মহারাষ্ট্রের জগাই মাধাই ভক্ত তুকার শিষ্য হইলেন। রামেশ্বরের চক্ষের আবরণ খুলিয়া গেল—তিনি বুঝিলেন, 'বংশ কুল জন্মস্থান কিছু কিছু নয়,' তিনি বুঝিলেন, 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ,' তিনি বুঝিলেন, কেবল উপবীত ধারণ করিয়া শুকবৎ 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ইত্যাদি' আবৃত্ত করিলেই ব্রাহ্মণ হইতে পারা যায় না। বিশ্বাসের অগ্নিতে তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, বিদ্যা, সকল অভিমান ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাঁহার অবিদ্যার নাশ হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইল। তিনি জ্বলন্ত ভাষায় হরিভক্তি-মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিলেনঃ—

বৈষ্ণবাঁচী যাতাঁবাণী জো আপণ,
ভোগো তো পতন কুম্ভপাকী।
(ধ্রুঃ। ঐশী বেদ শ্রুতি বোলতী পুরাণেঁ
নাহীঁ তেঁ দূষণ হরিভক্তা।)
উঁচ নিঁচ বর্ণ ন ম্হণাবা কোণী,
জেঁ কাঁ নারায়ণীঁ প্রিয় জালেঁ।
চলুঁ বর্ণাসী হা অসে অধিকার,
করিতাঁ নমস্কার দোষ নাহীঁ।
জৈসা শালিগ্রাম ন ম্হণাবা পাষাণ,
হোয় পূজ্যমান সর্বত্রাসী।
গুরু পরব্রহ্ম দেবাচা তো দেব,
ত্যাসী তো মানব ম্হণু নয়ে।
ম্হণে রামেশ্বর নামীঁ জে রঙ্গলে,
স্বয়েঁ চি তে জালে দেবরূপ।

যে ব্যক্তি বৈষ্ণবের জাতির বিচার করে, তাহার কুম্ভীপাক নরক ভোগ হইবে। বেদশ্রুতি ও পুরাণ বলিতেছে, হরিভক্তের জাতিগত দোষ হইতে পারে না; যাঁহাকে

নারায়ণ প্রিয় বলিয়া জানেন, তাঁহার উচ্চ-নিম্নবর্ণ ভেদ করা উচিত নহে। চতুর্বর্ণেরই এইরূপ অধিকার আছে—তাঁহাকে নমস্কার করিতে কোন দোষ নাই। যেমন শাল-গ্রামকে পাষাণ বলা উচিত নয় এবং উহা সর্ব্বত্রই পূজ্য হয়, সেইরূপ এই দেবাধিদেব গুরু পরব্রহ্ম, তাঁহাকে মানব বলা উচিত নহে। রামেশ্বর বলে, যাঁহারা সর্ব্বদা (ব্রহ্ম) নামে রঞ্জিত, তাঁহারা স্বয়ং দেবত্ব প্রাপ্ত হন।

এই ঘটনার পর তুকার ভণ্ডাপবাদ দূর হইল। তাহাঁর সরল ভক্তি ও সাধুত্বের কথা দেশময় ব্যাপ্ত হইল। ছত্রপতি শিবাজী স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি রামদাস বাবাজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং সমগ্র বিজিত রাজ্য তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিয়া স্বয়ং রাজ-প্রতিনিধিরূপে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। রামদাস স্বামীর পরিধেয় গৈরিক বস্ত্র মহা-রাষ্ট্রপতাকারূপে সুবিস্তীর্ণ রাজ্যে তাঁহার সত্ব ও অধিকার ঘোষণা করিত। ভক্ত তুকার অলৌকিক সিদ্ধি কাহিনীর বীণাঝঙ্কারে রাজর্ষি শিবাজীর হৃদয়তন্ত্রী নাচিয়া উঠিল। তুকারামকে মহা সমারোহে রাজধানীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে রাজদূত প্রেরিত হইল। তুকারাম ভোগবিলাসকে আবর্জ্জনার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সমাজে উপেক্ষিত নিগৃহীত কাঙ্গাল শূদ্র 'তুকাবেণে'র নিকট ঐশ্বর্য্য ও রাজসম্মানের প্রলোভন উপস্থিত হইল। ঈশাকে শৈল-শিখর হইতে বিস্তীর্ণ রাজ্যের দৃশ্য প্রলুব্ধ করিতে পারিয়াছিল না, বিষয়-বিমুখ জ্ঞানবীর বুদ্ধকে সপ্ত দিবস সপ্ত রজনী প্রলোভনের সহিত অবিরাম সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, সাধকাগ্রগণ্য মহাপুরুষ তুকাও বিষয়ের অতীত ছিলেন। তিনি প্রলোভনের মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করিয়া রাজছত্র, দেউটী, ঘোটক, সাজ-সজ্জা ও মানদণ্ড 'শূকরাচী' বিষ্টার ন্যায় দূর হইতে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি পণ্ঢরনাথের কাতর প্রার্থনা করিলেন—

> ন করাবা সঙ্গ, বাটে দূরবাবে জগ।
> মেথাবা একান্ত, বাটে ন বোলাবী মাত।
> জন-ধন-তন, বাটে লেখাবেঁ বমন।

এবং বিনয়ের সহিত মহারাজ শিবাজীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন—

> 'বার্ত্তা হে ভেটীচী করুঁনকা।'

সাক্ষাৎ করিবার কথাটী বলিবেন না। যেহেতু—

> তুম্হাঁপাশীঁ আম্হীঁ যেউনিয়া কায়,
> বৃথাসীণ আহে চালণ্যাচা।
> (মাগাবেঁহেঁ অন্নতরী ভিক্ষা থোর,
> বস্ত্রাসীহে থার চিন্ধ্যা বিদী।)
> নিদ্রেসী আসন উত্তম পাষাণ,
> বরী আবরণ আকাশাচেঁ।

তোমার নিকট আমার যাইবার কি প্রয়োজন? কেবল পথ হাটার কষ্ট বইত নয়। আমার অন্নের প্রয়োজন হইলে ভিক্ষা করিতে পারি, বস্ত্রের জন্য যথেষ্ট চীর (ছিন্নবস্ত্র) পথে কুড়াইতে পারা যায়, নিদ্রার জন্য পাথরই উত্তম শয্যা এবং আকাশই আমার প্রশস্ত আচ্ছাদন।

গ্রীক দার্শনিকের কুটীরে হাজির হইয়া দেশপতি অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। জ্ঞানবীর তাহার সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছিলেন, 'আপনি দয়া করিয়া একটু সরিয়া যাউন, আমাকে সূর্য্যাতপ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।' নবদ্বীপের অধ্যাপক গৃহে বঙ্গাধিপ তাঁহার 'অভাবের' কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ উত্তর করিয়াছিলেন, 'তিন্তিড় বৃক্ষ থাকিতে আমার অভাব কি?' পবিত্র

আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে দিগ্বিজয়ী বীর •যবন-সম্রাট সেকেন্দর মণ্ডানিস (Mandanis) মুণ্ডিত মস্তক (?)) আচার্য্য দণ্ডমীসের (Dandamis দণ্ডী (?) * অলৌকিক যোগ-বল ও বিভূতির কথা শুনিয়া তাঁহাকে লোভ কিম্বা ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক পঞ্চনদের যবন শিবিরে লইয়া আসিবার জন্য দূত ওনেসিক্রেটিস (Onesikratis)কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দূত যথারীতি রাজাজ্ঞা নিবেদন করিলে মহাযোগী দণ্ডমীস বিজয়ী বীরের স্তোকবাক্য বা ভ্রূকুটি কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া তেজের সহিত উত্তর দিয়াছিলেন—"সেকেন্দরকে যাইয়া বল, তাহার নিকট দণ্ডীমীসের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, সুতরাং সে যাইবে না। যদি তাহার দণ্ডামীসের নিকট কোন প্রয়োজন থাকে, সে আসিতে পারে।"

ইহারই নাম ব্রহ্মতেজ। আমাদের সাধন-হীন বিলাসজীর্ণ মৃতকল্প দেশে ব্রহ্মতেজ বুঝিবার সময় কি আসিয়াছে?

তুকারাম শিবাজীর গুণরাজির স্তুতি করিলেন এবং বিনীত ভাবে নিজের বক্তব্য নিবেদন করিলেন। কিন্তু পাছে তাঁহার বিনয় ও সসম্মান ব্যবহার সম্বন্ধে শিবাজীর ভ্রান্ত ধারণা হয়, পাছে তিনি মনে করেন, মহারাজ চক্রবর্ত্তীর ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব দেখিয়া চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল বলিয়াই দরিদ্র তুকা যে আজ্ঞা হুজুরের সুর ধরিয়াছিলেন, এজন্য স্পষ্ট কথায় তুকারাম তাঁহার ভ্রমনিরাকরণ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন :—

ঐসী মাঝী বাণী দীনরূপ পাহে,
হে ত্যা করুণা আহে তদ্হৃদয়স্থাচী।
নহোঁ কীঁবিলবাণেঁ নাহীঁ আম্হীদীন,
সর্ব্বদা শরণ পাণ্ডুরঙ্গীঁ।
পাণ্ডুরঙ্গ আম্হাং পালিতাপোষিতা,
আণিকাঞ্চী কথা কায় তেথেঁ।

আমার এরূপ দীন ভাষার কারণ সর্ব্ব-হৃদয়বিহারী পরমাত্মার তোমার উপর বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া জানিবে। আমরা সর্ব্বদা পাণ্ডুরঙ্গের শরণে আছি, সুতরাং আমরা দরিদ্র বা দীনভিখারী নহি। পাণ্ডুরঙ্গই আমাদের প্রতিপালক, তিনিই আমাদের পোষণ করেন। তাঁহার নিকট অন্য কার কথা?

যথার্থ সাধু এবং ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্মোপদেষ্টা ভক্ত তুকা দলপুষ্ট করিতে এবং "কর্ত্তাভজার" সংখ্যা বাড়াইতে লালায়িত ছিলেন না। তিনি অসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজীকে একটু অম্লমধুর ভর্ৎসনা করিতেও ত্রুটী করিলেন না।

সদ্গুরু শ্রীরামদাসাচেঁ ভূষণ,
তেথেঁ ঘানোঁ মন চলোঁ নকো।
বহুতাঁ ঠাঁই বৃত্তিচাবলণীজেব্হাঁ,
রামদাস্য তেব্হাঁ ঘরে কৈসেঁ।

তুমি সদ্গুরু শ্রীরামদাস স্বামীর ভূষণ স্বরূপ। সেইখানেই মন দৃঢ় কর, চঞ্চল হইতে দিও না। অনেকের প্রতি মন ধাবিত হইলে রামদাস প্রভুর প্রতি অটল বিশ্বাস কিরূপে রহিবে?

একাগ্রচিত্ততা ও পল্লবগ্রাহিতার কত পার্থক্য, সিদ্ধ মহাপুরুষ তাহার অভ্রান্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

তুকা শিবাজীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং যাইতে অসম্মত হইলেন সত্য, কিন্তু

* Dandamis has no need of aught that is yours, and therefore will not go to you, but if you want anything from Dandamis come to him. Magasthenes, Frag, LV. B., Mc Crindle, 1877.)

স্নেহভাবে তাঁহাকে সদুপদেশ দিতে বিরত হইলেন না। অল্প কথায় সংক্ষেপে তাঁহাকে রাজধর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন এবং সুনীতির সার ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।

আতাঁ একযোগ সাধাবা হা নীট,
ভল্যাচা তো বীট মানুঁ নয়ে।
জেণেঁ যোগেঁ তুম্হা ঘড়েঁ পাহে দোষ,
ঐসা হা সায়াস কর্ম্ম নয়ে।
নিন্দক দুর্জ্জন সংগ্রহী অসতী,
ত্যাঞ্চীযুক্তী চিত্তীঁ আনুঁনকা।
পরীক্ষাবে কোণ রাজ্যাচে রক্ষক,
বিবেকাবিবেক পাহোনিয়াঁ।
সাঙ্গণে ন লগে সর্ব্বজ্ঞতুঁ রাজা,
অনাথাঞ্চ্যা কাজা সাহহ্বাবেঁ।
হেঁ চি ঐকোনিয়াঁ চিত্ত সমাধান,
আণীক দর্শনেঁ চাড় নাহীঁ।

এক্ষণ একটী যোগ ভালরূপ সাধন করিও।

১। যাহা ভাল, তাহাতে অনাগ্রহ প্রকাশ করিও না।

২। এমন কাজ কখনও করিও না, যাহাতে পরিণামে পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

৩। তোমার যদি কোন নিন্দুক এবং দুর্জ্জন কর্ম্মচারী থাকে, তাহাদের যুক্তি কদাচ মনে স্থান দিও না।

৪। কে রাজ্যের রক্ষক, তাহা ভালরূপ বিচার ও অনুধাবন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিবে।

৫। হে রাজন্! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, আমার বলা অতিরিক্ত যে অনাথের কাজে তুমি সর্ব্বদা যত্নশীল হইও।

আমি তোমার সম্বন্ধে এই সকল কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিব। শুধু দর্শন দিয়া লাভ কি?

সমগ্র রাজনীতি শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব এই পাঁচটী বাক্যমন্ত্রের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সরল, মধুর, অল্প কথায় জটিল রাজধর্ম্মের কি সুন্দর প্রাণস্পর্শী উপদেশ!

ক্ষীরোদ-সাগর মন্থন করিয়া যে অমৃত লাভ হইয়াছিল, তাহা পান করিয়া দেবতারা অমর হইয়াছিলেন। তুলসীদাস এক রাম-নামে চারিবেদ, আঠার পুরাণ শুনাইয়া দিয়াছিলেন। তুকা চারিবেদ, ষড়বেদাঙ্গ ও অষ্টাদশ পুরাণ মন্থন করিয়া শিবাজীকে ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইলেন—

ভক্তিভাব তারাভাবি কাঁসী।

ভক্তিই ভাবুকের একমাত্র মুক্তি পথ। আর একজন ভক্তও করিয়াছেলেন—

'মিঞা কহে বিনা প্রেমসে নাহিমিলে
নন্দলালা।'

ধর্ম্মবীর তুকা কর্ম্মবীর শিবাজীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন:—

তুকাম্হণে রায়া ধন্য জন্মক্ষিতী,
ত্রৈলোকীঁ হে খ্যাতি কীর্ত্তিতুঝী।

কুটীরবাসী তুকা রাজদরবারের কূট রাজনীতি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিলেন না। তাঁহার শ্রদ্ধা-প্রদত্ত উপদেশের উদ্দেশ্য পণ্ড না হইয়া যায়, এজন্য তিনি রাজমন্ত্রী ও পারিষাদবর্গকে অনুনয় বিনয় করিয়া লিখিলেন, তাঁহারা যেন কোন অংশ গোপন না করিয়া পত্রের যথার্থ মর্ম্ম মহারাজ শিবাজীকে বুঝাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান অষ্টক কে—প্রতিনিধি, মজুমদার, পেশবে, সুরনিস, চিটনিস, ডবীর, রাজাজ্ঞা, সুমন্ত, সেনাপতি, পণ্ডিতবায়, বৈদ্যরাজ—সকলকেই বন্দনা করিয়া ঈশারায় কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রদান করিলেন।

তুকাম্হণে তুম্হাং নমন অধিকাচ্যাং
সাঙ্গণেঁ তেঁ ব্বায়া পত্র মাঝেঁ। ইত্যাদি।

শিবাজী পত্র শুনিয়া মোহিত হইলেন।

তিনি তুকারাম বাবার আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ মস্তকে ধারণ করিলেন, সুরাটের ভাণ্ডার লুটিয়া যে সকল অমূল্যরত্ন সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া রত্নরাজি উপঢৌকনের জন্য সঙ্গে লইলেন এবং সাধুচরণে প্রণত হইয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতে স্বয়ং তুকা দর্শনে যাত্রা করিলেন। তুকারাম শিবাজীর মহামূল্য উপঢৌকন স্পর্শ করিলেন না, কিন্তু মহাপুরুষের চরণস্পর্শে শিবাজীর অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইল। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নির্ব্বেদ ও বিষয়-বিতৃষ্ণা এত প্রবল হইল যে, তিনি রাজ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন সাধনের জন্য বনে প্রস্থান করিলেন। শিবাজী-জননী জিজাইবাইর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এবং তুকারামের উপদেশে তিনি পুনরায় সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই প্রলোভনের পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেও তুকারামের পরীক্ষা শেষ হইল না। তাঁহার ধৈর্য্য, জিতেন্দ্রিয়তা, নামে প্রীতি, ভগবদনুরাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও চরিত্র মাধুর্য্য বারংবার পরীক্ষিত হইয়াছিল।

একটী পরমা সুন্দরী যুবতী তুকার কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহার ভাষার লালিত্যে, ব্যবহারের মাধুর্য্যে এবং দৃষ্টির প্রসন্নতায় আত্মহারা হইল। চিরদিনই প্রতিভা সৌন্দর্য্যের জন্য লালায়িত—কিন্তু রূপ প্রতিভার নিকট আত্মবিক্রীত। নষ্টা সাধুর প্রতি কলুষিত ভাব পোষণ করিতে লাগিল এবং একদিন অবসর পাইয়া তাঁহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিল। শিশুর ন্যায় সরল, জিতেন্দ্রিয় তুকার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি দুষ্টা পর-নারীর অসঙ্গত প্রস্তাব শুনিয়া বজ্রাহত হইলেন। কিন্তু তাহাকে মিষ্টভাষায় সদুপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন এবং বুঝাইয়া বলিলেন—

পরাবিয়া নারী রখুমাই সমান।

পর স্ত্রী (আমার চক্ষে) মা লক্ষ্মীর সমান।

জ়াইবো তু মাতে নাকচী সায়াস।

যাও, মা, বৃথা চেষ্টা করিও না। আমরা বৈষ্ণব, আমাদের এরূপ চরিত্র নয়।

বিশেষতঃ—নসাহাবেঁ মজ তুঝেঁ হেঁ পতন।

তোমার পতন আমার সহ্য হইবে না, ছিঃ, এরূপ কুকথা মুখে আনিও না।

নকো হেঁ বচন দুষ্ট বদোঁ।

কিন্তু মনে মনে মন্তব্য করিলেন—

জরী অগিজানা সাধু,

পরী পাবে বাধূঁ সংঘট্টণে।

অগ্নি সাধু হইলেও যাহারা সংস্পর্শে আসিবে, তাহাদিগকে দগ্ধ করিবে।

একবার কোন শিষ্যপত্নীর বিষম ষড়যন্ত্রে তুকার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ভগবৎ কৃপায় তিনি বিপন্মুক্ত হইয়া চরিত্র গুণে বিদ্বেষীকেও মুষ্টি মধ্যে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দেহুগ্রামের সন্নিকটে লোহাগাব গ্রামে তুকারাম প্রায়ই কীর্ত্তন করিতে যাইতেন। সেই গ্রামের শিবাজী কাঁসারী নিতান্ত অর্থগৃধ্নু ছিল এবং তুকারামের নিন্দা করিয়া বেড়াইত। কিন্তু কালক্রমে সে তুকারামের এরূপ ভক্ত হইয়া উঠিল যে, বিষয় কর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া যতদিন তুকা লোহাগাব থাকিতেন, মুহূর্ত্তের তরেও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিত না। শিবাজীর গৃহিণী অত্যন্ত প্রগল্‌ভা ও মুখরা ছিল। সে স্বামীর পরিবর্ত্তনে মনে মনে অত্যন্ত কুপিতা হইল। পাপীয়সী একদিন সাধুকে তাহার গৃহে মধ্যাহ্নক্রিয়া করিতে নিমন্ত্রণ করিল। তুকা

যথাসময়ে উপস্থিত হইলে নিষ্ঠুরা কাঁসারী-পত্নী উষ্ণজলে স্নান করাইয়া দিবার ছলে তাঁহার মস্তকে এক গামলা ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিল। তুকার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া গেল, তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন—

'হে কেশব! আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া গেল, শীঘ্র এস, তুমিই আমার মা বাপ।'

জলে মাঝী কায়ালাগলা বোণ বা,
ধাব রে কেশবা মায় বাপা।

তুকারামের অগ্নি পরীক্ষার ফল ফলিল। কাঁসারী-পত্নী তুকার ক্ষমা ও ভগবদ্‌ভক্তি দেখিয়া অবাক্ হইল। তাহার স্বামী তুকারামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিত্য অনুচর হইল।

সারনাথে গৌতমবুদ্ধ পঞ্চশিষ্য সমীপে যে জ্ঞানোপদেশ বলিয়াছিলেন, আজ তাহা ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে মরুসাগর তীরে ঈশা দ্বাদশ শিষ্যমণ্ডলীতে যে অপূর্ব্ব প্রেম ও বিশ্বাসের জীবন্ততত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, আজ তাহাতে কোটি প্রাণ অনুপ্রাণিত হইয়া অলৌকিক কার্য্যসাধন করিতেছে। বঙ্গজননীর দীনকুটীরে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীধর, শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতি মুষ্টিমেয় শিষ্যমণ্ডলীমাঝে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ যে দেবদুর্লভ প্রেম ও ভক্তির উন্মাদনায় সংজ্ঞাহীন হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহার তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বাসে ভারতের দূরদূরান্তর প্রান্তদেশ আত্মবিহ্বল হইয়াছে। তুকারামও ৮ জন মুখ্য শিষ্যের নিকট অভঙ্গ ছন্দে 'জীবে দয়া ও নামে রুচি প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা রামেশ্বর ভট্ট, কাণ্হোবা, গঙ্গাজী মবাল কডুস্কর, কোণ্ডোবালোহোকরে, সন্তাজী তেলী, জগ লাডে, নাবজীমালী এবং সিবাজী কাঁসারী এতদ্ব্যতীত তুকারামের বহু শিষ্য ছিলেন। শিষ্যদের মধ্যে ১৪ জন এককালে তাঁহার মহাশত্রু ছিলেন। রামেশ্বর এবং সিবাজী কাঁসারের বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রধান শিষ্যদিগের মধ্যে ৩ জন ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ছিলেন, কানাই (কল্‌হোবা) তুকার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মহাপুরুষদিগের জীবন ও প্রতিভা বুঝিবার জন্য মহাপুরুষ-কল্প ভক্তের প্রয়োজন। ইঁহারা অসাধারণ মহাপুরুষের প্রতিভা এবং লোকসাধারণের ক্ষুদ্রশক্তির সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করেন। এই জন্যই পুরাণকার রূপকভাবে বলিয়াছেন, নারায়ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলে সাঙ্গোপাঙ্গ দেবগণ সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করেন। মহাপুরুষ জীবন ঘটনা-বৈচিত্র্যময়। নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য-প্রবাহে মানবজীবনের বিকাশ হইতে পারে না। এই জন্যই বিশ্বপতির বিধান তাঁহার বিশেষ কৃপার পাত্র প্রতিভার অবতার মহাজন জীবন বিপদ ও দুঃখের ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত ও উত্তাল তরঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবে। দুঃখের ঘোরাবর্ত্ত এবং বিপদের কঠোরতা প্রতিভার অন্তর্নিহিতা সুষুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলে। ইহারই নাম জীবন-পরীক্ষা। ইহারই নাম প্রহ্লাদের বিষপান, ঈশার ক্রুশ ও কণ্টক-মুকুট, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ, সীতার অনল প্রবেশ। ইহারই নাম শিবের সাগর-মন্থন, দাতাকর্ণের নয়ন-পুত্তলি বৃষকেতু মাংসে অতিথি-সৎকার।

মহাপরীক্ষায় নকল উড়িয়া যায়, আসল ফুটিয়া উঠে; কৃত্রিম মলিন হইয়া যায়—খাটি আরো অধিক উজ্জ্বল হয়। তুকার জীবন পরীক্ষা-সমষ্টি। কয়েকটী মহাপরীক্ষার কথা

উল্লেখ করা হইয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্মবাদী বেদান্তী ব্রাহ্মণের দর্পচূর্ণ, লোহগাঁব-নিবাসী সন্ন্যাসীগণ কর্ত্তৃক মহারাজ শিবাজীর শিক্ষক দাদোজী কোণ্ডদেবের নিকট অভিযোগ আনয়ন প্রভৃতি আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষা প্রতিপদে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। পরীক্ষার অনলে দগ্ধ হইয়া তুকার যশোভাতি উজ্জল হইতে উজ্জলতর হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র গিরিকন্দর তাহার আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সে আলোকে বালবৃদ্ধবনিতা বিস্ফারিতলোচনে চাহিয়া দেখিল—তুকার ত্যাগ, তুকার বৈরাগ্য, তুকার প্রেম, তুকার ভক্তি, তুকার ক্ষমা, তুকার ধৈর্য্য, তুকার সাধনা, তুকার সিদ্ধি, তুকার সন্তোষ, তুকার সাধুতা, তুকার জিতেন্দ্রিয়তা, তুকার নির্ভীকতা, তুকার মিষ্ট অথচ স্পষ্টবাদিতা, তুকার স্বাধীনতা-প্রিয়তা, তুকার বালসুলভ সরলতা,—আর দেখিল, তুকার হিমাচলের ন্যায় অচল বিশ্বাস।

বাল্যকালে বৃদ্ধা পাগলিনীর গান শুনিয়া কি যেন এক উন্মাদ নেশায় প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছিল, আজও তাহার অস্ফুটনাদ অহঃরহ কাণে বাজিতেছে—

ঠিক রেখ মন, গুরুর চরণ,
নিরিখ ছেড় না।
নিরিখ ছাড়লে পরে, পড়বারে ফেরে,
অধরচাঁদকে পাবানা।
ওতার সাক্ষী দেখ, ভক্ত প্রহলাদ,
বিষপানেও সে ম'ল না।

তুকা 'গুরুর চরণ' ঠিক রাখিয়াছিলেন, তিলেকের তরে 'নিরিখ' ছাড়েন নাই, তাই তিনি 'অধরচাঁদ'কে পাইয়াছিলেন। এই বিশ্বাসেই প্রহলাদের বিষভাণ্ড মৃতসঞ্জীবনী সুধায় ভরিয়া গিয়াছিল। ইহাকেই বিশ্বাসীরা অলৌকিক দৈবশক্তি (Miracle) বলেন।

আবহমান কাল হইতে সিদ্ধি ও সাধনার সহিত অলৌকিক দৈবশক্তি ও যোগবল এমন অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত হইয়া আছে যে, কোথাও কোন সাধুভক্তির আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে নরনারী রোগ, শোক, তাপ, জ্বালা দুনিয়াদারীর কামনা লইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করে। অন্ধের দৃষ্টি, মূকের বাক্‌শক্তি, কুষ্ঠাতুরের রোগমুক্তি, খঞ্জের চলচ্ছক্তি, বন্ধ্যার পুত্র লাভ, মামালায় মকর্দ্দমার জয় প্রার্থনা, উমেদারের চাকরী, বন্দীর বন্ধন মোচন, দরিদ্রের ধনলাভ, ভূতভবিষ্যৎ ও মনোভাব গণনা এবং বিদ্যার্থীর পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা, আবেদন নিবেদনের দীর্ঘ তালিকায় স্থান লাভ করে। এই সকল ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধিই সাধুত্বের পরীক্ষা। ভবজ্বালা শান্তির নিমিত্ত, সৎসঙ্গ সম্ভোগের মানসে, হৃদয়ের টানে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া কয়জন সাধু সন্নিধানে যাইয়া থাকেন? ধর্ম্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও ব্যগ্রতা লইয়া বিজয়কৃষ্ণ গয়াধামে রামশিলা ও ব্রহ্মযোগী পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াছিলেন, তাই তিনি আকাশ-গঙ্গার শিলাতলে মহাপুরুষ-প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

ঈসা, মুসা, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, মহম্মদ প্রভৃতি সেকালের সাধুরা অলৌকিক যোগবল ও বিভূতির পরিচয় প্রদান করিয়া অবতারে পরিণত হইয়াছিলেন। শঙ্কর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মধ্যযুগের সাধুরা অমানুষিক শক্তির আভাস দিয়া ধর্ম্মনেতৃত্বে বরিত হইয়াছিলেন। ত্রৈলঙ্গস্বামী, গোবিন্দস্বামী, বারদির ব্রহ্মচারী, মঙ্গলনাথ বাবাজী প্রভৃতি সাধুভক্তগণ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বলিয়াই একালে 'মহাপুরুষ

বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। দেবতাদেরই পর্য্যন্ত এই মহাপরীক্ষার হস্ত হইতে নিস্তার নাই, কলির নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত কিনা, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য লোকের ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধার যোগ্য হইবার জন্য তাঁহাদিগকেও দৈবশক্তি প্রকাশ করিতে হয়। বিশেষতঃ এই ভারতে, এই দৈববাণীর দেশে, এই যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতির দেশে, এই যাদুমন্ত্র ও ইন্দ্রজালের দেশে, সাধু সাধুই নহেন, যদি তাঁহার অসম্ভব সম্ভব করিবার শক্তি না থাকে। সাধু আপনার ভাবে বিভোর থাকিলেও লোকে তাহা মানিবে কন? তাঁহার অসম্পূর্ণ বাণী, অব্যক্ত হাসি, অর্থহীন ইঙ্গিত, অনন্ত শাখা প্রশাখাযুক্ত হইয়া, নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া,নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হয়। তাঁহার অনুগত শিষ্য অনুগত শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাতে অর্থযোজনা করেন এবং দৈবশক্তি আরোপ করেন।

জীবনীকার মহীপতি গ্রন্থে তুকারামের ঐশীশক্তি সম্বন্ধে অনেকানেক অলৌকিক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। তুকার অভঙ্গ গাথায় সে সকল বিবরণের কোন সংশ্রব পরিষ্কার-ভাবে অনুসন্ধান করিতে পারা যায় না। কিন্তু দুইটী ঘটনা সম্বন্ধে তুকা স্বয়ং কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্ত তুকা বিশ্বাস করিতেন, নারায়ণের কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে।

কথিত আছে, লোহগাব গ্রামে কীর্ত্তনের সময় একদা কোন পুত্র-শোকাতুরা জননী তাহার সন্তানের মৃত দেহ বাবাজীর সম্মুখে রাখিয়া প্রাণের আবেগে কহিল, "বাবাজী তোমার যদি ভগবানে যথার্থ প্রেম ও ভক্তি থাকে, আমার সন্তানের জীবন দান কর।" বিশ্বাসী তুকা ইষ্টদেবতাকে ডাকিয়া কহিলেন—'হে নারায়ণ! নির্জীবের চেতনা আনয়ন করিতে তুমি ত অক্ষম নও।"

অশক্য তৌ তুম্হী নাহীঁ নারায়ণা,
নির্জীবা চেতনা আণোবয়া।

এবং প্রার্থনা করিলেন—'হে দেব! তোমার শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করিয়া আমাদের চক্ষু সার্থক কর।'

তুকাহ্মণে মাঝে নিববারে ডোলে,
দাচুণি সোহালে সামর্থ্যাঁচে।

মহীপতি বলেন, জনমণ্ডলী বিস্ময়ে দেখিল, ভক্তের আহ্বানে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, মৃতশিশু জননীর স্তন্যপান করিতেছে।

আর একবার চিঞ্চবড় গ্রামের চিন্তামণি দেব নামক এক অতি প্রসিদ্ধ গাণপত্য ব্রাহ্মণ তুকাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং উভয়ের ভোজনের জন্য পরিবেশন করাইলেন। মহীপতি বলেন, তুকার স্মরণে উভয়ের ইষ্টদেবতা নারায়ণ ও গণপতি আসিয়া নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করিলেন। চিন্তামণি ও তুকা স্বচক্ষে দেবলীলা দেখিয়া চরিতার্থ হইলেন। তুকা গাহিলেন—

বাঁজা গাই দুধতী, দেবা ঐশী তুম্হী খ্যাতি।

কিন্তু সমবেত জনসমূহ কিছুই বুঝিল না, কেবল দেখিল অন্নপাত্র শূন্য হইয়াছে। ধ্রুবের পদ্মপলাশলোচন ধ্রুবই দেখিতেন, অন্যে কি বুঝিবে?

তুকা লীলা করিতে আসিয়াছিলেন, অদ্ভুত লীলা সাঙ্গ করিয়া তিরোহিত হইলেন। হিমালয়-সুতা জাহ্নবী দীর্ঘপথ বহিয়া অবশেষে প্রাণের বঁধু সাগরবক্ষে আপনা ঢালিয়া দিয়া তাহার অস্তিত্বে আপন অস্তিত্ব মিশাইয়া চিরশান্তি লাভ করে। উন্মাদিনী পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া, তৃষ্ণার্ত্তকে বারিদান করিয়া, মরুস্থলকে উর্ব্বরা,

করিয়া, শুষ্ক দেশকে আর্দ্র করিয়া বুভুক্ষিতকে অন্নদান, করিয়া নীরসকে সরস করিয়া, মলিনতা আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া, চরণরেণুতে লৌহকে কাঞ্চনে পরিণত করিয়া, ক্রীড়াভূমিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করিয়া আপনার লীলা সমাপন করে। তুকার জীবন ঐ প্রকৃতিনন্দিনী কুলকুলনাদিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায়। তুকা জন্মিয়াছিলেন—দেবতা পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, গন্ধর্ব্ব দুন্দুভি বাদ্য করিল, অপ্সরা নৃত্য করিল, কিন্নর গান করিল, মলয়জ বহিল, বিহঙ্গ কলরব করিল, চন্দ্রমা হাসিল, তারা জাগিল, প্রকৃতি মধুর হাসি হাসিয়া নবসাজে সজ্জিত হইল। স্বভাবের শিশু তুকা লীলা করিলেন—নিন্দা স্তুতি হইল, অশুভ শুভ হইল, শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইল, নাস্তিক-আস্তিক হইল, রত্নাকর সাধু হইল, পাষাণ গলিয়া তরল হইল, মরুতে উৎস ছুটিল, অসম্ভব সম্ভব হইল, ভীমা ইন্দ্রায়াণী উজান বহিল, মৃত সঞ্জীবিত হইল, মহারাষ্ট্র জাতিতে জীবন সঞ্চার হইল, মহারাষ্ট্র অদ্রি গৌরবে মস্তক তুলিয়া গগনস্পর্শ করিল, প্রেম, ভক্তি, পুণ্য ও আনন্দের তরঙ্গ ছুটিল। তুকা লীলা সাঙ্গ করিলেন—আবার ত্রিদিবে দুন্দুভি বাজিল, পারিজাত বৃষ্টি হইল, বৈকুণ্ঠ হইতে রথ নামিয়া আসিল, দেবকন্যাগণ বরণডালা সাজাইয়া আনিলেন, তুকা মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে সশরীরে অন্তধামে প্রিয় সমাগমে চলিলেন, জগৎ রোদন করিল।

"তুম্ হাঁসো জগরোয়।"

পুণ্যশ্লোক হরিশ্চন্দ্র অসাধারণ ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা ও সাধনার বলে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতেছিলেন। কিন্তু অতীত সদনুষ্ঠানের গৌরব ভুলিতে পারেন নাই, আত্মপ্রসাদ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই,—এজন্য তাঁহাকে অর্দ্ধ পথে ত্রিশঙ্কুর ন্যায় অবস্থান করিতে হইল।

আর তুকা? মান অপমান, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, ব্যক্তিত্ব ও স্বতন্ত্রতা সমস্তই হৃষীকেশ চরণে সমর্পণ করিয়া তুকা, ফকীর হইয়াছিলেন। তাই তিনি দিব্যযানে আরোহণ করিয়া অলকাপুরী প্রয়াণ করিলেন। এ মহা প্রয়াণ কেহ দেখিল না। কেহ জানিলও না। নীলাম্বুধিতটে জগন্নাথক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব কেহ দেখিয়াছিলেন, নানকের সংজ্ঞাহীন দেহের তিরোধান কেহ জানিয়াছিল না, তুকারাম ও লোকচক্ষুর অগোচরে নীরবে যোগস্থ হইয়া কোথায় কি ছলে অন্তর্দ্ধান হইলেন, তাহা শরীরী মানব বুঝিল না। ভক্তমণ্ডলী ঘোষণা করিলেনঃ—

১৫৭১ শকে বিরোধী নামা বৎসরে ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণ দ্বিতীয়া তিথিতে চন্দ্রবাসরে দিবাভাগের প্রথম যামে স্বর্গ হইতে বিষ্ণুদূত অবতরণ করিয়া তুকারামকে বৈকুণ্ঠের রথে দিব্য লোকে লইয়া গেল, তিনি সশরীরে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তুকা বৈসলা বিমানীঁ সন্ত পাহাতীলোচনীঁ।
দেব ভাবাচা তুকেলা, তুকা বৈকুণ্ঠাসী বেলা।

তুকা স্বর্গীয় রথে উপবেশন করিলেন, সাধুরা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, দেবগণ ভক্তির জন্য ক্ষুধিত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন। দেহু গ্রামে সযত্নরক্ষিত হস্তলিখিত তুকাচরিতও অভঙ্গ গ্রন্থের অন্তে লিখিত আছে—

"সকেঁ ১৫৭১ বীরাধিণাং সংবছরেঃ সীমগা (ফাগুণ) বদ্য (কৃষ্ণ) দ্বীতীয়াঃ বার সোমবারঃ বে দীবসীঃ প্রাঃথ কালীঁঃ তুকোবানীঁ তীর্থাস

প্রয়াণং কেলে শুভ ভবতু: মঙ্গলং।"

তুকা তীর্থ প্রয়াণ করিয়াছিলেন। এই তীর্থপ্রয়াণই তাঁহার মহাপ্রয়াণ, যেহেতু তাঁহাকে আর কেহ কখনও দেহুগ্রামে ফিরিয়া আসিতে দেখে নাই। এইরূপে তুকার তিরোভাবের অদ্ভুত প্রহেলিকার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এইখানে তুকাজীবন-নাট্যের যবনিকা পতন হইল।

তুকার সশরীরে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি একেবারে অমূলক কল্পনা নহে। তিনি জীবনের শেষ ভাগে নির্লিপ্তভাবে ব্রহ্মপদে লীন হইয়াছিলেন। ভক্তিমার্গে সাধনা আরম্ভ করিয়া তুকা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তখন তিনি তন্ময় হইয়া পরমাত্মার সামীপ্য ও সাযুজ্য সম্ভোগ করিতেন এবং সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেন—জলে বিষ্ণু, স্থলে বিষ্ণু, বিষ্ণু সর্ব্বঠাঁই।

তুকা বলিতেছেন—

তুকহ্মণে আহ্মাঁ একান্তাকা বাস,
ব্রহ্মাঁ ব্রহ্মরস সেবুঁ সদা।
তুকা বলে মোর নির্জ্জনেতে বাস,
ব্রহ্মে ব্রহ্মরস সেবি সদা।

অন্যত্র—ধন্য তে হী ভূমী ধন্য তরুবর,
ধন্য তেঁ সরোবর তীর্থরূপ।
ধন্য তা নরনারী মুখীঁ নামধ্যান,
আনন্দে ভবন গর্জতসে।
ধন্য পশু পক্ষী কীটক পাষাণ,
অবঘা নারায়ণ অবতরলা।
তুকাহ্মণে ধন্য সংসারাস্তে আলী
হরিরঙ্গী রঙ্গলী সর্ব্বভাবেঁ। ইত্যাদি।

কথিত আছে, একদা অনন্দীরদেব-মন্দিরে অর্জ্জুনবৃক্ষতলে একদল পক্ষী তুকাকে দেখিয়া উড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে তুকার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি ভাবিলেন, 'কি আমার এখনও চিত্তশুদ্ধি হয় নাই—এখনও আমার মুধ্যে পশুপক্ষীর ভয়ের কারণ আছে?' তুকা সমাধিস্থ হইয়া বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইলেন, স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল তুকার মস্তকে পাখীরা নির্ভয়ে উড়িয়া আসিয়া বসিল। এই অবস্থাকেই আমরা সশরীরে ব্রহ্মত্বলাভ বলিতে পারি।

ইসলাম ও হিন্দুত্বের বিষম সংঘর্ষে ভারতে এক জাগরণের যুগ আসিয়াছিল। আরবের বিশ্বাসদণ্ডে ভারতের প্রেমসাগর মথিত হইয়া যে সকল মণি-মুক্তা-প্রবালের উদ্ভব হইয়াছিল, তন্মধ্যে নানক, কবির, চৈতন্য ও তুকারাম কৌস্তুভরত্ন।

তুকারাম বিঠবা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। রামানন্দ, রামানুজ, কবির, চৈতন্য, তুলসীদাস ও তুকারাম সকলেই বৈষ্ণব—কেবল ইষ্টদেবতার রূপভেদমাত্র। ত্রেতাযুগে ভক্ত গরুড়ের জন্য দেবতাকে ধনুর্ব্বাণ ছাড়িয়া শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ধারণ করিতে হইয়াছিল, দ্বাপরে ভক্তকুলনায়ক মহাবীর পবননন্দনের মনরক্ষা করিতে দেবকী-সুতকে বাঁশরী ত্যাগ করিয়া তীরধনু করে লইতে হইয়াছিল, ভক্ত তুলসীদাস বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ-মন্দিরে সীতারাম রূপ নিরীক্ষণ করিয়া নয়নের পিপাসা মিটাইয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য হরিধ্বনি শুনিয়া উন্মত্ত হইতেন, গোরা 'রা—রা' বলিয়া চেতনা হারাইতেন, তিনি আঠারো নালা হইতে জগন্নাথদেবের ধ্বজা দেখিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন, সাগরের নীলজল দেখিয়া ভাবাবেশে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার রাধা কৃষ্ণ, হরি, রাম, গোবিন্দ ব্রহ্মাণ্ডময় এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন—এজগৎ ব্রহ্মময়। তাঁহার স্বপ্নশিষ্য তুকারাম বিঠবা নাম জীবনের সার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার চিত্ত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতায় কলুষিত ছিল না। তুকা জানিতেন, তাঁহার উপাস্যদেবতা বিঠবাই পণ্ঢরনাথ এবং পাণ্ডুরঙ্গ, রামকৃষ্ণ হরি এবং গোবিন্দ নারায়ণ—পরমাত্মা পরব্রহ্ম। তাই তুকা 'হরিহরাং ভেদ নাহীঁ কারুঁনয়ে বাদ' উপদেশ দিয়াছিলেন। চিন্তামণি দেবের ইষ্টদেবতা গণপতিকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, 'বিঠবাচরণ ন সোড়ে' কহিয়া করুণ আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, 'কৃপেচা সাগর পাণ্ডুরঙ্গ' বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'কোণামুখেঁ ঐসী একেন মীমতে, চালতুজ পণ্ঢরিনাথ বোলবিতো' বলিয়া 'গোপি কাঞ্চাপতী'কে পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি রঘুনাথকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

রাম কহে সো মুখ ভলারে,

বিন রামসে বাঁধ।

এবং আরো কহিয়াছিলেন,—

কৃষ্ণ মাঝী মাতা, কৃষ্ণ মাঝা পিতা,
বহিনী বন্ধু চুলতা কৃষ্ণ মাঝা।
কৃষ্ণ মাঝা গুরু কৃষ্ণ মাঝেঁ তারু
উতরী পৈল পারু ভবনদীচী।
কৃষ্ণ মাঝেঁ মন কৃষ্ণ মাঝেঁ জন
সোইবা সজ্জন কৃষ্ণ মাঝা।

তুকা 'মেঘশ্যামবর্ণ হরি,' 'শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পুরুষোত্তম'কে স্তুতি করিয়াছিলেন এবং বাবাজীর নিকট স্বপ্নে রামকৃষ্ণ হরি ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 'গোবিন্দাচী আবড়ীজীবা গাহিয়াছিলেন, নির্জীবের চেতনা আনিতে নারায়ণের স্মরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং সদা ব্রহ্মী ব্রহ্মরস সেবন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং বিঠবা-সেবক তুকারামের সার্ব্বভৌমিক উদার ধর্ম্মমত ছিল, তিনি দেহু গ্রামের বিষ্ণু মন্দিরে সান্ত ও অনন্তের অপূর্ব্ব মিলন-মাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তুকারামের অভঙ্গ গাথা বিঠবা সম্প্রদায়ের একমাত্র কবি এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন না। ধবলগিরি ও কাঞ্চনজঙ্ঘা যেমন গৌরীশঙ্করের অস্তিত্বের আভাস দেয়, সেইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষেরা বিশেষ প্রতিভার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করেন। দ্বাদশমনু বৈবস্বত মনুর আবির্ভাব সূচনা করিয়াছিলেন, সলোমন, ডেভিড, মূসা, জন প্রভৃতি ঋষিগণ মেশিয়া ঈশার জন্মবার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন, কত সাংখ্যবাদী বুদ্ধ তীর্থঙ্কর মহাবীর ও মহাবুদ্ধের আভাস দিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও কেশব ভারতী প্রেমের হুঙ্কার করিয়া প্রতিভার পূর্ণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বপরিচয় দিয়াছিলেন। জ্ঞানদেব, নামদেব, একনাথ প্রভৃতি তুকার পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুগণও বিঠবা মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। তুকা এই সম্প্রদায়ের অত্যুজ্জলরত্ন—বিবর্ত্তনের চরম পরিণতি।

মহাপুরুষ প্রতিভার আবির্ভাব কোন যুগেই অকস্মাৎ হয় না। প্রাকৃতিক বিধান এবং বিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে স্তরে স্তরে শক্তি পুঞ্জীকৃত ও ঘনীভূত হইয়া একজন বিশিষ্ট নরপুঙ্গব ক্রমপরিণতির সীমা নির্দ্দেশ করিতে অবতীর্ণ হন। তিনিই পূর্ণশক্তি,—মানব রূপী দেব, লোকপূজ্য, লোকশিক্ষিত মহাপুরুষ। এই মহাপুরুষেরা স্থিতি সংরক্ষণ করেন, লুপ্তবেদ উদ্ধার করেন, সাধুদের পরিত্রাণ করেন, পাপাত্মাদের বিনাশ করেন, অতি মানীর দর্প খর্ব্ব করেন, দুর্নীতির বিনাশ করিয়া সুনীতি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন।

মনুর সমাজ ও ধর্ম্মনীতি লোক শাসন করে, ঈশার নবসংহিতা খ্রীষ্টবাদীদের বেদ, পরেশনাথ ও বুদ্ধের জ্ঞান উপদেশ, জৈন ও বৌদ্ধদিগের মহানির্ব্বাণতন্ত্র, মহম্মদের জলন্ত বিশ্বাসের কথা, মুসলমানের আল্ কোরাণ, নানকের অনুশাসন গ্রন্থ তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী সচন্দন পুষ্পে ভক্তিভরে অর্চ্চনা করে এবং মাদুলী করিয়া শিরে ধারণ করে। গৌরাঙ্গের প্রেম-গদ্‌গদ ভাব বৈষ্ণবের চৈতন্য-ভাগবত, এবং তুকারামের ভক্তি বিশ্বাসের অভঙ্গ গাথা বিঠবা-উপাসকদিগের ধর্ম্ম পুস্তক।

ভাবুক কবি তুকার নির্ম্মল, স্বচ্ছ, সরল, সরস, প্রাণস্পর্শী অভঙ্গ মহারাষ্ট্র জাতির আদরের ও গৌরবের সামগ্রী। সরল ভাষায়, সহজ কথায়, ভাবের অনাবিল স্বতঃপ্রবাহে তুকা প্রেমভক্তি ও বিশ্বাসের গান গাহিয়াছেন, নীতি উপদেশ করিয়াছেন, ধর্ম্মের পূর্ব্বসমস্যা মীমাংসা করিয়াছেন এবং জীবনের পরীক্ষিত সত্যের প্রমাণ দিয়াছেন। তাহাতে স্বার্থের পুতিগন্ধ নাই বা সংসারের আবিলতা নাই। সে মুক্ত প্রাণের জীবনবেদ, নিসর্গের নির্ম্মল-স্বচ্ছ-স্ফটিক উৎস, ভবতাপ শান্তি করে। তাহার ছত্রে ছত্রে ভক্ত কবির বিশুদ্ধ পুণ্য জীবন প্রতিবিম্বিত এবং শিশু-সুলভ সারল্য উদ্ভাসিত। তাহার কঠোর সত্যের অনুশাসনও কেমন এক রকম ললিত মাধুরীমাখা এবং উপাদেয়—যেন সন্তপ্ত প্রাণে নবনীত-বিনিন্দিত কোমল ও সুশীতল-করস্পর্শ। সে সহজ-সরল-সংক্ষিপ্ত-মধুর ভাষায় কেমন এক রকম টান যে, তাহা অস্থিমজ্জা ভেদ করিয়া প্রাণ মন কাড়িয়া লইয়া না জানি কি এক অজানিত নন্দনকাননে ছাড়িয়া দেয়। তাই সিন্ধিয়া ও হোলকারের রাজপ্রাসাদে, 'হরিদাসের' (কথক) বেদীতে এবং

দরিদ্রের পর্ণকুটীরে আজ মুখে মুখে তুকার অভঙ্গ গীত হইতেছে ; রামদাস ও তুকারাম স্বামী মহারাষ্ট্রদেশে দেবতার ন্যায় গৃহে গৃহে আদৃত ও পূজিত। এমন দেবতার হস্তে যে জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ভার ছিল, সে জাতির জাগরণ অলীক কল্পনা নহে।

তুকার কবিতা বিষয়-বৈচিত্র্যে গুরু—ভাষার মাধুর্য্যে গুরুতর। ভাঙ্গা সংস্কৃত ও তাঁহার নিজস্ব প্রাকৃত তুকারচিত অভঙ্গের বিশেষত্ব। বিরাণ্যা, কোড়ে, ফুগড্যা, লথোটা, হুমরী, হমামা, গাই, দলণ, ছাল, সুতুতূ, বাসুদেব, জোগী, মুঁঢ়া, মলঙ্গ, গোন্ধন, কাষিডে, বাঘা, ললিত, আশীর্ব্বাদ, দসরা, নাট, ধুর্বক, পাইক, সাথ্যা, আরতী প্রভৃতি বহু বিষয়িনী অভঙ্গ গাথা তুকার কবিত্বের পরিচয় দিতেছে এবং তাঁহার ধর্ম্মমত, নীতি উপদেশ ও সরল প্রাণের আবেগময়ী ভাষা স্তরে স্তরে ধরিয়া রাখিয়াছে। শাক্তাবর অভঙ্গে শাক্তদিগের ধর্ম্ম ও প্রাণহীন পঞ্চমকার সাধনে তীব্র কটাক্ষ আছে। এতদ্ভিন্ন ভাগীরথীর নিকট ও পণ্ঢরনাথের নিকট পত্র তুলসীদাসের বিনয় পত্রিকা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাম চরিত্র ও হনুমন্তস্তুতি তুকার রামভক্তির সঙ্গে সঙ্গে কোশল রাজকুমারের দাক্ষিণাত্যে প্রতিপত্তির আভাস দেয়। 'দরবেশ' অভঙ্গ হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ ও সম্মিলন যুগের ভাষার একটু নমুনা। 'লোহগাঁব' গ্রামে চক্রবেড়া (seize) সম্বন্ধীয় অভঙ্গের ঐতিহাসিক মূল্য তুচ্ছ করিবার নহে। ব্রহ্মচারীদিগের রাজদ্বারে অভিযোগ, মম্বাজী গোঁসাই, সদ্‌গুরু কৃপা, স্ত্রীর কর্কশ তাড়না, উষ্ণ জলে শরীরে জ্বালা, নামদেব ও পাণ্ডরঙ্গের স্বপ্নাদেশ, সাধুদিগের প্রশ্নোত্তরে নিজের বৈরাগ্যের ইতিহাস কথন, ব্রহ্মকায় লাভ, সিবাজী প্রসঙ্গ, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, অলকাপুরী, ত্রয়োদশ দিবস অনশন ও অনিদ্রা প্রভৃতি অভঙ্গে তুকার জীবন দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। তুকারামের ভাষা বিচার করিবার শক্তি আমাদের নাই। জাতীয় সাহিত্যে তাঁহার কাব্য ও ছন্দের স্থান নির্দ্দেশ করাও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। নবদ্বীপে শচীদেবীর গৃহে যে প্রেম ও ভক্তির অনল ধূমায়মান হইয়া প্রদীপ্ত হইয়াছিল, পল্লবাবৃত বঙ্গের আর্দ্র-ভূমিতে ও তৃণক্ষেত্রে তাহা জ্বলিয়া ভস্মাবশেষ হইয়া গেল। কিন্তু তাহার একটী বাত্যা-বিতাড়িত স্ফুলিঙ্গ মহারাষ্ট্রীয় পার্ব্বত্য অরণ্যে কি ভীষণ দাবানল উৎপাদন করিয়াছিল! আমরা বিস্ময়ে তাহার প্রকাশ, প্রসার ও পরিণতি অনুসরণ করিয়াছি। তুকার নৈসর্গিক ধর্ম্মবৃত্তি কিরূপে মুকুলিত ও বিকাশত হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার, ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয়। অরণ্যের ফুল আপনি ফুটিয়া সুবাস বিলাইয়াছিল। সে সৌরভে মহারাষ্ট্রের পশুপক্ষী মাতিল, বৃক্ষলতা মাতিল, অলিকুল মাতিয়া গুঞ্জন করিল। এই সেদিন দক্ষিণেশ্বরে আমাদের গৃহকোণে আর একটী বনকুসুম আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রাণ-মাতোয়ারা সৌরভ মলয়-হিল্লোল বহন করিয়া সাগর মহাসাগরের পরপারে বিলাইয়া দিয়াছিল। সে পারিজাতের আঘ্রাণ-নেশায় বিভোর হইয়া সুরপুর, নরপুর, নাগপুর এখনও বিহ্বল নৃত্য করিতেছে।

মহীপতি তুকারামের জীবনী লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা অতিরঞ্জিত ও কল্পনাদুষ্ট। দেহু গ্রামে তুকার পরিবারে তুকার জ্যেষ্ঠপুত্র মহাদেব বাবার হস্তলিখিত পুথি সযত্নে রক্ষিত আছে। বিঠবা-ভক্ত-জীবনীকার ত্রিম্বকের হস্তলিখিত পুস্তকেও তুকারামের জীবনী পাওয়া যায়। পণ্ঢরপুরেও তুকারামের চিত্র অভঙ্গগাথার হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছিল। তুকারামের অন্যতম শিষ্য গঙ্গাজী মবাল তুকার অভঙ্গ লিখিয়া রাখিতেন। মুম্বই সহর হইতে সরকার বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় "ইন্দুপ্রকাশ" মুদ্রাযন্ত্রের সত্বাধিকারী মহোদয়গণ ১৮৬৯ খ্রীঃ তুকার অভঙ্গগাথা দুইখণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। মাননীয় ব্যারণেট সার আলেক্‌জাণ্ডার গ্রাণ্ট ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসের পাক্ষিক সমালোচনী Fortnightly Review-তে তুকারাম সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় কোন জীবনীই সম্পূর্ণ অবিকৃত নহে। তুকারামের স্বরচিত অভঙ্গেই তাঁহার জীবন, নীতি ও ধর্ম্মমতের অবিকৃত চিত্র প্রচ্ছন্ন

রহিয়াছে। যে কয়েকটী অভঙ্গচরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই তুকাজীবনের আভ্যন্তরীণ স্রোতের স্পষ্ট অনুমান করিতে পারা যায়।

তুকা সংসারের খরতাপে সন্তপ্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া শান্তির আশায় বিঠবাচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। 'চুঁরত ব্যাকুল হোই'— নহিলে পরমপদ লাভ ভাগ্যে ঘটে না। বহিরঙ্গ সাধনেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পরিসমাপ্তি হয় নাই। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কেমন এক রকম বিষয়তৃষ্ণা ও নামে রুচি ছিল। ধর্ম্মের বহিরঙ্গ নির্জীব অসার বৃথা কর্ম্মকাণ্ডের অর্থহীনতা উপলব্ধি করিয়া তিনি ব্যথিত হইতেন। যোগসাধনের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে তিনি আবদ্ধ রহিলেন না, গণ্ডীবিশেষের সীমাভুক্ত রহিলেন না, শাস্ত্রোক্ত অষ্টবিধ ভাবের কোন একটীকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সাধন অনুষ্ঠান করিলেন না। প্রাণের টানে, ভগবৎ কৃপায়, বিধাতার বাণী তাঁহাকে যেরূপ চালাইল,তিনি স্বাধীনভাবে চলিলেন। ধর্ম্ম পুস্তকেব এবং সমাজ শাসনের কঠিন নিগড়ে তিনি বাঁধা পড়িলেন না,জীবন-বেদে যে সকল অমোঘ সত্য প্রকাশিত হইল, তাহা কার্য্যে প্রতিপালন করিলেন। বিনয়ে ও দীনতায় তিনি লঘু হইতেও লঘুতর হইলেন—মতের স্বাধীনতায় তিনি মহৎ হইতেও মহত্তর হইলেন। প্রতিভার অবতার তুকারাম জীবনের পরীক্ষিত সত্য প্রচার করিলেন —শূদ্র হইয়াও ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিলেন। প্রাণের আকর্ষণে প্রাণ ছুটিয়া আসিল—জীবন্ত সত্য পাষাণ ভেদ করিয়া হৃদয় দ্বারে আঘাত করিল। আভিজাত্যের আসন টলিল, বৃথাভিমানী গর্ব্বস্ফীত অন্ধ ব্রাহ্মণ, নিরক্ষর শূদ্র,তুকার উপদেশে, কথায়, জীবনে ও অভঙ্গে ঋষি-প্রচারিত বৈদিক জ্ঞান ও সত্যের প্রকাশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মানুষ্ঠান করিল। অত্যাচরে ও নির্য্যাতনে তেজস্বী তুকা দমিলেন না। তুকা 'তুকী' (পরীক্ষা) পার হইলেন। অগ্নি পরীক্ষায় তুকার প্রতিভা ও নিষ্কলঙ্ক ধর্ম্মজীবন অধিকতর উজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিল। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত,মূর্খ, আপামর সাধারণ সকলেই তুকার চরণে মস্তক অবনত করিল। নারায়ণের মহিমা দেখিয়া তুকার প্রাণ গলিয়া গেল। তুকা প্রেমোন্মত্ত হইয়া দেখিলেন, তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তিনিই বন্ধু, তিনিই সর্ব্বস্ব। তুকার ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইল, তিনি ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন। সাধনা সিদ্ধি লাভ করিল—ভক্ত তন্ময় হইয়া সচ্চিদানন্দ রূপে মজিয়া গেলেন, দ্বৈতাদ্বৈতের অপূর্ব্ব লীলা-মাধুরী সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তুকা বুঝিলেন, তাঁহাকে আর সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের ক্লেশ পাইতে হইবে না—তিনি বৈকুণ্ঠের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন—জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব ও নির্ব্বাণ লাভ করিতেছে।

ভক্তমণ্ডলীর নিকট আনন্দে বিদায় গ্রহণ করিয়া তুকাস্বামী মহাযাত্রা করিলেন— আর মর্ত্তালোকে ফিরিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত সত্য, তাঁহার রচিত অভঙ্গ গাথা, তাঁহার ধর্ম্ম ও নীতি উপদেশ, তাঁহার প্রাণশক্তি, তেজস্বিতা ও স্বাধীনতা-স্পৃহা প্রচারিত ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সমগ্র মহারাষ্ট্র জাতিতে ওতপ্রোত ভাবে আজও জীবন্ত রহিয়াছে। যতদিন জগতে ভাষা ও মানব জাতির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন ভক্তকবি তুকারাম অমর। এক তুকা সহস্র অংশে বিভক্ত হইয়া সহস্র মূর্ত্তিতে চিরজীবী রহিবেন।

সম্পূর্ণ।

শ্রীরসিকলাল রায়।

গিরিজাপ্রসন্ন। (৬)

গীতাশাস্ত্রে গিরিজাপ্রসন্নের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, তিনি গীতার অমৃতময় শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। কোন কোন দিন প্রেমাশ্রু তাঁহার গণ্ড বহিয়া ধারায় নির্গত হইতে থাকিত। এই ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহার শরীর সবল ও সুদৃঢ় করিয়াছিল, মনে তেজ জন্মাইয়া দিয়াছিল, ভগবৎ রাজ্যের প্রবেশ দ্বার তাঁহার নিকট মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়াই গিরিজাপ্রসন্ন এক স্বর্গীয় জ্যোতি লাভ করিয়াছিলেন। সে জ্যোতি দর্শন করিলে নয়ন রঞ্জিত হইত, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্লিত হইত। দর্শনের পিপাসা যেন কিছুতেই নিবৃত্তি হইতে চাহিত না। বলা বাহুল্য যে, গিরিজাপ্রসন্নের সহধর্ম্মিণী গিরিজাপ্রসন্নকে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানে সাহায্য করিতেন। গিরিজাপ্রসন্ন এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য আর একটী গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেটী প্রাচীন কালের ঋষিদের প্রতি অনুরাগ। বলিতে কি, এই ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহাকে স্বদেশ-প্রেমে উত্তেজিত করিতে ও উহা কি গুণে অপর দেশ অপেক্ষা অধিকতর পূজ্য, তাহা বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই ব্রহ্মচর্য্য পালনের সময়ই গৃহলক্ষ্মী ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়, তাই গিরিজাপ্রসন্ন উহার উপসংহারে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে বলিয়াছেন—

"—আজি আমাদিগের দেশের যেরূপ দুর্দ্দশা দেখিতেছ, পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। সে অতীত কাহিনী স্মরণ করিলে যেমন এক ভাবে আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হয়, তেমনই আবার বিষাদে অন্তর আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই কি সেই দেশ, যেখানে ব্যাস, বশিষ্ঠ, কালিদাস, ভবভূতি, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এই কি সেই দেশ, যে দেশে আপ্ত বাক্য বেদসংহিতা—মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ইতিহাস—রামায়ণ, মহাভারত, দর্শন—সাংখ্য, পাতঞ্জল? এই কি সেই দেশ, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতা শুনাইয়াছিলেন, বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে পুরাণ শুনাইয়াছিলেন? এই কি সেই দেশ, যেখানে প্রভাত প্রারম্ভে প্রান্তর কানন কম্পিত করিয়া মধুর ওঙ্কারধ্বনি লক্ষ লক্ষ ভ্রমর ঝঙ্কারবৎ দিক দিগান্তর ভাসিয়া বেড়াইত? এই কি সেই দেশ—যেখানে ভগবান শঙ্করাচার্য্য অদ্ভুত অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া জ্ঞানালোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন? এই কি সেই দেশ—যেখানে শিশু ধ্রুব মাতার নিকট মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া একাকী অরণ্য মধ্যে সেই মহাপুরুষের আরাধনা করিয়া ভক্তি বলে তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন? এই কি সেই দেশ—যেখানে পুতাত্মা প্রহ্লাদ ভক্তিভরে ভগবানকে ডাকিয়া বিবিধ বিপত্তয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন? এই কি সেই দেশ—যেখানে রামচন্দ্র পিতার প্রতিজ্ঞা পালনার্থে রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশবর্ষ বনে প্রবাস করিয়াছিলেন? এই কি সেই দেশ—যেখানে শূর সৌমিত্র সৌভ্রাত্র ভাবে সেবকের ন্যায় সহোদরের সেবা করিয়াছিলেন? এই কি সেই দেশ, যেখানে পরম জ্ঞানী সংযমী শুকদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এই কি সেই দেশ, যেখানে ঋষি বশিষ্ঠ পুত্র-হত্যা-শোক বিস্মৃত হইয়া ঋষি বিশ্বামিত্রকে ক্ষমা করতঃ জগৎবাসীকে বিস্মিত করিয়াছিলেন? এই কি সেই দেশ—যেখানে রাজা ঔশীনর আশ্রিত রক্ষার্থ স্বীয় শরীর পর্য্যন্ত শ্যেন পক্ষীকে সানন্দে সমর্পণ করিয়াছিলেন? * * সত্য সত্যই কি আমরা ভারতে আছি? তবে কেন সেই ওঙ্কার-ধ্বনী আর শুনিতে পাই না? তবে কেন লোকে এমন জরা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে?

* গৃহলক্ষ্মী ২য় ভাগ।

"ভারতের অভাব অন্তরের—বাহিরের নহে। ভারত সুখী হইবে সংযম শিখিয়া—সম্পদ পাইয়া নহে। মনের বল পাইলেই ভারত উত্থিত হইবে, শরীরের বলে তাহার কিছু হইবে না। বিদ্যা-শিক্ষায়, শাস্ত্র চর্চ্চায় মনের বল হয় না, মনের বল হয়, সংযম শিখিয়া—ধর্ম্মানুষ্ঠানে।"

গিরিজাপ্রসন্নের এই করুণ উক্তি শ্রবণ করিলে হৃদয় বড়ই ব্যথিত হয়। ইহাতে যেমন তাহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ, তেমনই অসাধারণ বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালের ঋষি-কল্পিত মহাত্মাগণ যে সব অলৌকিকত্ব দেখাইয়া আমাদিগকে মোহিত ও স্তম্ভিত করিয়াছেন, তাহার মূলে কি দেখিতে পাই?—মানসিক বল। গিরিজাপ্রসন্ন অনুভব করিয়াছিলেন, এই বল শাস্ত্রালোচনায় সঞ্চিত হইবে না,—হইবে সংযম শিখিয়া। যিনি প্রকৃত সংযমী নহেন, সংযম অভ্যাসে মনের তেজঃ কতদূর বর্দ্ধিত হয়, তদ্বিষয় নিরূপণে অনভিজ্ঞ, তিনি কি সাহস করিয়া আজকার দিনে সংযম শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে এত সার বাক্য বলিতে উত্তেজিত হইতেন? এই সংযম শিখিয়া গিরিজাপ্রসন্ন আর একটী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তাহা "যতোধর্ম্মস্ততোজয়" এই বিশ্বাস। এই ভৌতিক জগৎ যেমন কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তদ্রূপ মানবজীবন ও মানব সমাজ ধর্ম্মনিয়মে শাসিত। যিনি সেই ধর্ম্ম নিয়মাধীন হইয়া চলেন, তাঁহার জয় অনিবার্য্য। গিরিজাপ্রসন্নের এই বিশ্বাসটা যেন হাড়ে মাংসে জড়াইয়া গিয়াছিল, তাই তিনি ধর্ম্ম নিয়মের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া অনায়াসে দৈহিক সুখের লালসা বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন। এই নিয়ম রক্ষা করিয়াই আমাদের দেশের মহাপুরুষগণ প্রকৃত বীরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। গিরিজাপ্রসন্নের মানসিক তেজও এই জ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল।

যে পুস্তকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের যত দূর আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়, সেই পুস্তক শ্রেষ্ঠ লোকদের নিকট ততদূর আদরনীয়। গিরিজাপ্রসন্ন তাহার গ্রন্থাবলীতে যে এতদূর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অবতারণা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহার মূল কারণ কি ব্রহ্মচর্য্য পালনোদ্ভূত দিব্য জ্ঞান নহে? দার্শনিক পণ্ডিত ব্যাকী ঠিকই বলিয়াছেন:—True Knowledge comes from the living root of the thinking soul. অর্থাৎ চিন্তাশীল আত্মার জীবন্ত মূলদেশ হইতে দিব্যজ্ঞান বিকশিত হইয়া থাকে। এই জ্ঞান অভ্রান্ত, কোন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা ইহা বিলুপ্ত করা যায় না। গিরিজাপ্রসন্নের চিন্তাশীল আত্মার জীবন্ত মূলদেশ হইতে, এই দিব্যজ্ঞান পূর্ণ "গৃহলক্ষ্মী" ২য় ভাগ উদ্ভূত। গ্রন্থকার এই সুধার সাগর গৃহলক্ষ্মী ২য় ভাগ বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরমা সাধ্বী স্ত্রীর পাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়া কৃতকাতার্থ হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:—"সেদিন আপনার পুস্তকের কতক অংশ পাঠ করার অবকাশ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতেই যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং প্রধানতঃ যাঁহাদের পাঠের জন্য এই পুস্তক প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে উহা সবিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। ফলতঃ বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এ প্রকৃতির পুস্তক পাইলে অধিকতর উপকৃত হইতাম। তথাচ উপদেশ-গ্রহণের-সময় কখনও উত্তীর্ণ হয় না। আপনার এই গ্রন্থাশ্রিত উপদেশ-নিচয় যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনি উপাদেয়। ইহা অধ্যয়ন কালে উপদেশ-গ্রহণ-জনিত ক্লেশ কিছুমাত্র অনুভব করিতে হয় না; প্রত্যুত প্রচুর পরিমাণে চিত্তস্ফূর্ত্তি জন্মে।

"গৃহলক্ষ্মী"র অনেক গুণের মধ্যে এই গুণটী বড় কম নহে এবং আমার বিবেচনায় উহা উপদেষ্টার কেবল সুখ্যাতির কথা নহে, সবিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে, বস্তুতঃই আপনি যারপর নাই জটিল বিষয় গুলিও জলের মত তরল ও স্বচ্ছ করিয়া লোকের সম্মুখে ধরিতে সমর্থ হইয়াছেন।"

পূর্ব্ববঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন চিন্তাশীল সুলেখক শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

আপনার "গৃহলক্ষ্মী" উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

বিখ্যাত সমালোচক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আপনার পুস্তক পড়িয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহার শেষ অংশ পড়িয়া আমি কাঁদিয়াছি।............গৃহলক্ষ্মী, গৃহলক্ষ্মীগণের হস্তে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইবে।"

আরও বহু লেখকের প্রশংসা পত্র আছে, তাহা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

দুষ্টের দমন।

একবার বলিয়াছি, কেহ অন্যায় ভাবে উৎপীড়িত হইলে গিরিজাপ্রসন্ন তাহাকে রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন, গিরিজাপ্রসন্নের বাটীর বহুদক্ষিণাংশে কোন দুরাচার পাপিষ্ঠ মুসলমান বাস করিত। ঐ মুসলমানটী এতদূর পতনের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল যে, পরের অনিষ্ট করিতে গিয়া সে লোকের অভিসম্পাত কি গবর্ণমেণ্টের শাসন গ্রাহ্য করিত না। একবার ঐ মুসলমানটী কোন হিন্দু-মহিলার প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করে। গিরিজাপ্রসন্ন শান্তিরক্ষার্থ ঐ মুসলমানটীকে শাস্তি দিতে সচেষ্টিত হয়েন। এমন কি, উহার কুস্বভাবের বিষয় তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিষ সাহেবের কর্ণগোচর করেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফললাভ হয় না। ঐ মুসলমানটীর বাটীর নিকটে গিরিজাপ্রসন্নের কাছারী বাড়ী ছিল, কিন্তু সে প্রজা ছিল অপর এক ভূম্যধিকারীর। গিরিজাবাবুর সেই কাছারীতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তহশীলদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এক নিশীথে পূর্ব্বোক্ত মুসলমানটী স্বেচ্ছাচারিত্বে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া গিরিজাপ্রসন্নকে তহশীলদারের সম্মুখে বৃথা কটুক্তি প্রয়োগ করে এবং সে যথেচ্ছাচারিত্বে বাধাপ্রাপ্ত হইলে আরও ভীষণ কাণ্ড ঘটাইবে, এইরূপ আস্ফালন করে।

গিরিজাপ্রসন্ন উক্ত তহশীলদারের নিকট হইতে ঐ নীচমনা মুসলমানটীর দুরভিসন্ধির বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ একটী পিস্তল ও একটী বারুপূর্ণ কতকগুলি বারুদসহ গুলি আনিয়া তাহার নিকট সমর্পণ করেন ও বিশেষ ধমকাইয়া বলিয়া দেন যে, "ঐ মুসলমানটী যদি কোন নিরীহ লোকের প্রতি অকারণে গুরুতর অত্যাচার করে এবং তাহাতে বাধা দিলে তোমাদিগকে পুনরায় অন্যায়ভাবে অভদ্রোচিত ভাষায় গালি দেয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এই পিস্তলের গুলির আঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী করিও। এজন্য যদি আমার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়, তজ্জন্যও আমি মনঃক্ষুণ্ণ হইব না।" গিরিজাপ্রসন্নের এই তেজঃপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ মুসলমানটী আর তাঁহার কর্তৃত্ব কাল পর্য্যন্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে সাহসী হইল না।

অর্থ থাকিলেই কি মনের বল হয়? অর্থশালী লোক ত অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু অর্থশালীদের মধ্যে এরূপ তেজঃপুঞ্জ লোক আমাদের চক্ষে আর পড়িয়াছে কিনা, স্মরণ হয় না। তুমি এ জগতে ছোট হইতে কি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে, ইহা অনেকটা তোমারই উপর নির্ভর করে। যিনি আত্মার মর্য্যাদা বুঝিয়া কার্য্য করেন, আত্মার অসীমত্বে বিশ্বাসী হয়েন, তিনি যে এ জগতে উচ্চস্থান লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয় সন্দেহ কি? গিরিজাপ্রসন্নের চরিত্রের আর এক উপাদান—আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান, তাঁহার তেজের কথা যখন স্মরণ হয়, তখন মনে হয়, বিদ্যুতের নিকট খদ্যোৎ যেরূপ, আমরা তাঁহার নিকট তদ্রূপই হীনতেজ-সম্পন্ন।

আমাদের পূজনীয় পুরোহিত শ্রীযুক্ত উমাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় গিরিজাপ্রসন্নের ন্যায়পরায়ণতা ও হিন্দধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার ইচ্ছা ক্রমে নিম্নে লিখিত হইল।

"গিরিজা বাবু কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়া বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলে কেহ তাঁহাকে কোনরূপ অন্যায় অনুরোধ করিতে সাহসী হইত না। তিনি যথাপরাধের দণ্ড-দাতা ছিলেন। এমন কি, প্রজাগণের সঙ্গে যদি কোন সময় তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে মনোবাদ হইত, তাহা হইলে বিচার কালে তিনি কর্ম্মচারীর প্রতি কৃপা করিয়া প্রজাগণের বিপক্ষতাচরণ করিতে স্বীকৃত হইতেন না। বরং

প্রজারঞ্জনের জন্য তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী ও তহশীলদারগণকে যথা দণ্ড প্রদান করিতেন। আমি ও আমার কোন সরিক জ্ঞাতি পরস্পর কোন এক সময় বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই, আমার জ্ঞাতি আমার সঙ্গে বিবাদে অসমর্থ হইয়া অবশেষে গিরিজাবাবুর নিকট বিচারপ্রার্থী হয়েন। আমার ধারণা ছিল যে, আমি পুরোহিত বলিয়া অন্ততঃ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা একটু অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইব, কিন্তু গিরিজাবাবু আমার মনোগত ভাব অনুধাবন করিতে পারিয়া স্পষ্টই আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার নিকট যেরূপ আশা করিতেছ, সেরূপ আশা তোমার হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে, বিবাদের মীমাংসা করিয়া ফেল, নতুবা তুমি অপরাধী সাব্যস্ত হইলে আমি ন্যায্য পথ অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারিব না" তখন তাঁহার একজন ঘনিষ্ট আত্মীয় বলিয়াছিলেন যে, আমাদের গুরু পুরোহিত কর্ম্মচারী প্রভৃতি যদি সময় বিশেষে আমাদের দ্বারা একটু উপকৃত না হয়, তাহা হইলে উঁহারা সকল সময় আমাদিগের মঙ্গলকামনা করিতে স্বীকৃত হইবেন কেন? গিরিজাবাবু তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাহার কর্ত্তৃত্ব কালে তাহার অধীনস্থ লোক কোন সময়ের জন্য অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় পাইত না।"

স্বধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা।

"গিরিজাবাবুর স্বধর্ম্মে অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। আমি অল্প বয়সে পিতৃহীন হই, তজ্জন্য যাজনিক ব্যবসায় যথোচিত দক্ষতা লাভ করিতে পারি নাই। গিরিজাবাবুর মাতা প্রতিদিন ভোজ উৎসর্গ ও পুরোহিত ভোজন করাইতেন। আমি সেই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তখন প্রত্যহই তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইতাম। গিরিজাবাবু একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিশুদ্ধভাবে যাজনিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পার? কিরূপভাবে আচমন করিতে হয়, একবার আমাকে দেখাও। আমি যাহা জানিতাম, তাহা দেখাইলাম। তিনি তখন বলিলেন, ঠিক ওরূপ করার নিয়ম নহে, আলমারির ভিতর হইতে "বেদমাতা গায়ত্রী" খানা নিয়ে এস, আমি মন্ত্র বাহির করিয়া দিতেছি, তুমি কণ্ঠস্থ করিলেই নিয়মগুলি ক্রমশঃ অভ্যাসগত হইবে। আমি তদনুসারে তাঁহার কৃপায় আচমনের মন্ত্রটী কণ্ঠস্থ করিয়া নিয়মিতরূপ আচমন করিতে শিখিলাম। তাঁহার জীবিতাবস্থায় আমরা যাজনিক কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। আমি যাহাতে ঐ সব কার্য্যক্ষম হই, তজ্জন্য তিনি অনেক পুস্তক ক্রয় করিয়া আমাকে দিয়াছেন। গিরিজাবাবুর ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান গৃহীর পৌরোহিত্য করিতে হইলে যে সব শিক্ষার দরকার, আমার মধ্যে তাহার কিছুই ছিল না। অপরে এইরূপ স্থলে হয়ত পুরোহিত ত্যাগ করিয়া নূতন কার্য্যদক্ষ পুরোহিত নির্ব্বাচিত করেন, গিরিজা বাবুর সে স্থলে পুরোহিত-ত্যাগের সঙ্কল্প ত দূরের কথা—আমার ন্যায় একজন অশিক্ষিত অযোগ্য পুরোহিতকে পৌরোহিত্য কার্য্যের উপযোগী করার জন্য যে চেষ্টা ছিল—তাহা অত্যন্ত প্রশংসার্হ। যাহারা গুরুপুরোহিতের অযোগ্যতা দর্শন করিয়া তৎপদে নূতন লোক নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্মোন্নতি করিতে চাহেন, তাঁহারা শাস্ত্রদর্শী গিরিজা বাবুর এই দৃষ্টান্তটী দর্শন করিয়া কি কোন শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেছেন না?"

উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরও বলেন যে, গিরিজাপ্রসন্ন যখন কলিকাতা অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন কয়েক দিবস তিনিও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার সে বৎসর পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল! গিরিজাপ্রসন্ন সেই সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমার পিতার আদ্যকৃত্য করার কি সঙ্কল্প করিয়াছ? তাহাতে পুরোহিত ঠাকুর প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন,—গঙ্গায় বসিয়া তাহার কার্য্য করা চলিবে না, যেহেতু তখন তাঁহার নিকট যথোচিত অর্থ ছিল না। ধর্ম্মপ্রাণ গিরিজাপ্রসন্ন অপরের ইহজীবন ও পর জীবনের মঙ্গলকামী। তিনি নিতান্ত সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন, যে সব জিনিষ প্রয়োজন, তাহার ফর্দ্দ প্রস্তুত কর, আমিই উহার ব্যয়ভার বহন করিব। অতঃপর পুরোহিত ঠাকুরকে লইয়া তিনি কালীঘাট সমুপস্থিত হইলেন, ও আশাতীত পরিশ্রম

করিয়া পুরোহিত ঠাকুরকে তাঁহার পিতার স্বর্গীয় কার্য্যে সহায়তা করিলেন। যিনি হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন, জন্মান্তরে অবিশ্বাসী, তিনি কি পরকে শাস্ত্রীয় নিয়ম পালনে এতদূর উৎসাহ দিতে পারেন? গিরিজাপ্রসন্ন এই জন্যই গৃহলক্ষ্মীতে লিখিয়াছেনঃ—

"গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াই লোকে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পাপক্ষয় করিয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমে যে সকল কর্ত্তব্য বিহিত রহিয়াছে,—সে সকল ক্রিয়া গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম, যথা সন্ধ্যোপাসনা, পঞ্চমহাযজ্ঞ, অতিথিসেবা, পরিজন পালন ইত্যাদি। তাহাতে মনুষ্যত্ব বিকাশ পায়, এই সকল অনুসন্ধানে লোকের নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি সংযত হয়, উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি হয়, এইজন্য ইহাকে গৃহধর্ম্ম বলে।

গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মচর্য্যার জন্য,
পরোপকারের জন্য।

একদিকে এই অমৃতময় বাক্যগুলি যেমন সুন্দর, অপর দিকে এই বাক্যগুলি প্রতিপালনে গিরিজাপ্রসন্নের স্নাগ্রাহাতিশয্য তেমনি সুন্দর। এ সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিতে গেলে অনেক দার্শনিক কথা বলিতে হয়, আমাদের সে ক্ষমতা কই? তবে যদি কেহ এই কথাগুলির সঙ্গে "অনুশীলন" ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ রহিয়াছে, চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে বলিতে হইবে, ইহা দার্শনিক মতেও অধিকতর সুন্দর!!

বঙ্গোপসাগরে বিপদ।

পটুয়াখালী মহাকুমার অন্তর্গত আমড়াগাছিয়া নামক স্থানে গিরিজাপ্রসন্নদের জমিদারী আছে। বিষয়ভার গ্রহণ করিয়া ১৩০১ সালের ফাল্গুনমাসে তিনি একবার মফঃস্বল পরিদর্শনের জন্য বাহির হইলেন। ক্রমান্বয় দুই একস্থান পরিদর্শনের পর কয়েকজন কর্ম্মচারী, ভৃত্য ও পাইক সমভিব্যাহারে আমড়াগাছিয়াভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

আমড়াগাছিয়ার সন্নিকট বঙ্গোপসাগর। গিরিজাপ্রসন্ন অনন্তবিস্তারী, ভাবুকচিত্ত-প্রসাদনকারী অতলস্পর্শ বঙ্গোপসাগর দর্শন-লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি একখানি প্রকাণ্ড গ্রীন বোটারোহণে মফঃস্বল গিয়াছিলেন। ঐ বোটারোহণেই বঙ্গোপসাগরের নয়নরঞ্জন দৃশ্য দূর হইতে অবলোকন করিতে কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। সঙ্গের লোক তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া অনুগমন করিতে ইচ্ছাপরবশ হইল। সকলেই সাহস করিয়া বলিল যে, ইঁহাতে চড়িয়া তরণীগমন-সীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে কোন বিপদপাতের আশঙ্কা নাই। গিরিজাপ্রসন্নের সুবৃহৎ তরণী বিশাল নদীবক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইল। গিরিজাপ্রসন্ন প্রশান্ত নদী-হৃদয়ের বিচিত্রতা, বিস্ময়কর ফেনীল আবর্ত্তময় বারিরাশির অপূর্ব্ব সঞ্চালন, মনোরম দৃশ্যাবলীর সুচারু বিন্যাস প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। গিরিজাপ্রসন্নের বোটখানি এই প্রকার পূর্ব্বকল্পিত স্থানের সম্মুখবর্ত্তী হইল। সে স্থান হইতে বঙ্গোপসাগর দৃষ্টিপথান্তবর্ত্তী।

গিরিজাপ্রসন্ন এই সময় স্নানাদিক্রিয়া সমাপন করিয়া বিস্তৃত সাগরের মনোমোহন দৃশ্যাবলী কিছুকাল প্রাণ ভরিয়া অবলোকন করিলেন, অনন্তর নিতান্ত ভক্তিবিহ্বলচিত্তে হিন্দুধর্ম্ম-সার গীতাখানি মধুরকণ্ঠে পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে বিপদের একটা করালছায়া আসিয়া উহাদের প্রাণ-হরণে উদ্যত হইল। বোটখানিকে অপ্রতিহত জলস্রোত সাগরের ভিতর টানিয়া লইয়া চলিল। মাঝি মাল্লারা অচিন্তনীয় বিপদ সম্মুখীন দেখিয়া তাহাদের যথাশক্তি, বোট বাঁচাইবার জন্য, প্রয়োগ করিল। কিন্তু তাহাদের শক্তি তৃণবৎ সাগরের স্রোতে ভাসিয়া গেল। এখন সকলের ত্রাস হইল যে, জীবনরক্ষার বুঝি আর কোন উপায় নাই; এই অপরিচিত অদৃষ্টপূর্ব্ব উত্তালতরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ অকূল সাগরগর্ভে সকলের জীবন মুহূর্ত্ত মধ্যে অবসান হইবে। ২।৩টী লোক তাহাদের কোমলমতি অল্পবয়স্ক বালক সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, তাহারা তখন স্বীয় পুত্রগণকে নিজের বক্ষের মধ্যে ধরিয়া হৃদয়বিদারক চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পুত্র কাঁদিতে লাগিল, অতলজলে জীবন হারাইতে হইবে, এই আশঙ্কায়। পিতা কাঁদিতে লাগিল প্রাণাধিক পুত্রকে কোন

সময় কিরূপ অবস্থায় কোন্ প্রাণে চির বিদায় দিবে, এই ভাবিয়া। তখন বেলা প্রায় অবসান, কিছুকাল মধ্যেই রজনীর গাঢ় অন্ধকার, ভীষণ সাগরের ভীষণ হৃদয় ভীষণ ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে।

ধর্ম্মপ্রাণ গিরিজাপ্রসন্ন তখন প্রমাদ গণিয়া সেই বোটের এক কামরায় বসিয়া ধীর ও অবিচলিতভাবে গীতাখানি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বজ্রগম্ভীর-স্বর যেন নির্জ্জন স্থানের নির্জনতা ভেদ করিয়া কাহার কর্ণে পঁহুছাইবার জন্য দিকদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ভগবানের আরাধনায় তিনি এত তন্ময় হইলেন যে, জীবন-নাশের আশঙ্কা, সঙ্গীয় লোকের মর্ম্ম-গ্রন্থিচ্ছেদী আর্ত্তনাদ, কিছুই তাঁহার ভগবৎ-প্রেম স্ফুরিত হৃদয়ের পটাবরণ ছিন্ন করিতে পারিল না। পথহারা নাবিক যেমন ধ্রুব নক্ষত্র দেখিয়া সমুদ্রবক্ষে জাহাজ চালাইয়া লইয়া যায়, গিরিজাপ্রসন্ন তেমনি ভগবানের প্রতি অভ্রান্ত লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার জীবন-তরি ভাসাইয়া দিলেন। সে তরি লক্ষ্য-পথ-ভ্রষ্ট হইয়া অকূল ও অতল সাগর গর্ভে বিলীন হইল না! রাত্রি প্রায় ৩।৪ দণ্ডের সময় বোটখানি গিয়া সাগরের নিকটবর্ত্তী কোন এক চরে ধাক্কা লাগিল। তখন সকলের ভরসা হইল, কূল পাইয়াছি, জীবন রক্ষার বুঝি উপায় হইল। মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে পথ-হারা পথিক যেমন সৌদামিনীর ক্ষণস্থায়ী প্রভা দেখিয়া হৃদয়ে বল পায়, মুমূর্ষু যেমন সুচিকিৎসকের আশাপূর্ণ বাক্য পাইয়া শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করে, বিপদাপন্ন আরোহিগণ, তদ্রূপ, সেই অকূলপাথারে চর প্রাপ্ত হইয়া জীবনের উপর আশ্বস্ত হইল। যে স্থান হইতে ক্ষিপ্র জলস্রোত বোটখানিকে ভাসাইয়া আনিয়াছিল, সে স্থানে উপস্থিত হইতে উহাদের সাত দিন সময় লাগিয়াছিল।

সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ বিক্ষোভে বিচলিত হইয়া একদিন স্বাধীনতার উপাসক ধর্ম্মাত্মা রামমোহন রায়ও ক্ষীণকণ্ঠে গাহিয়াছিলেনঃ—

কোথায় আনিলে আমায় পথ ভুলায়ে,
আনিয়ে ভব জলধিজলে তরঙ্গে তরি ডুবালে।
চারি দিকে অন্ধকার, নয়নে না হেরি আর,
এবার বুঝি যায় গো জীবন ঘূর্ণি জলে,
কোথা র'ল পিতা মাতা,কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণপ্রিয়ে র'ল কোথা বন্ধু সকলে।

গিরিজাপ্রসন্ন সেইরূপ বিপদে অভিভূত হইয়া অবিচলিত, অবিকম্পিত, স্থির, ভগবৎ-প্রেমে তন্ময়!! প্রাণান্তকর বিপদের মধ্যে এইরূপ স্থিরভাবইত স্থিতপ্রজ্ঞ তাপসের

গিরিজাপ্রসন্ন! এই স্মরণাতঙ্ক বিপদ-রাশির মধ্যে তুমি মঙ্গলময় ভগবানের উপর যে অবিচলিত বিশ্বাস ও অচলা ভক্তির পরিচয় দিয়া একটা সুন্দর ঘটনার সৃষ্টি করিলে, তাহা ঋষিদেরও বিস্ময়কর। আমরা ক্ষুদ্র নর, তোমার ভগবৎপ্রেমের পরিমাণ করিতে পারি, এমন সাধ্য কি? তোমার পাদপদ্মে আমাদের সহস্র প্রণাম!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

স্বাবলম্বন।

সে অনেক দিনের কথা। আমার এক জন দরিদ্র বন্ধু বিদ্যালয়ে পণ্ডিতি করিতেন। স্বাবলম্বন ভিন্ন জীবনে সুখ শান্তি নাই, এই-রূপ ভাবিয়া, তিনি সাধের চাকরি পরিত্যাগ করিয়া সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। স্বাবলম্বনের জন্য আজীবন কঠোর তপস্যা এবং পরিশ্রম করিয়া জীবনে যে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন, তাহার তুলনা নাই। এখন স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন, আদর্শজীবন; বিশ্বাস ভক্তির পুণ্যময় নিকেতন।

বহুবার লিখিয়াছি, 'এদেশের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা—দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য-সমস্যার সু-

মীমাংসা না হইলে কিছুতেই এদেশের মঙ্গল নাই। এদেশের লোকের আয় গড়পড়তায় বার্ষিক ১৮৲,কেহ বলেন ২৪৲,কেহ বলেন ২৭৲, ১৮৲ই হউক, বা ২৭৲ টাকাই হউক, কোন সংখ্যাতেই গ্রাসাচ্ছাদন হয় না। ইহার উপর বিবিধ প্রকার লুণ্ঠনের তাড়না আছে। আদমসুমারী বলে পণ্ডিতেরা গণনা করিতেছেন,—এদেশের উচ্চশ্রেণী ক্রমেই ধ্বংসের পথে চলিয়াছেন,—দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। আমাদের মনে হয়, দারিদ্র্যই এই সংখ্যা হ্রাসের কারণ। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে শরীর জীর্ণ শীর্ণ হওয়ায়, রোগের আধিপত্যে, অল্পেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; জনন-শক্তি হ্রাস হওয়ায় জন্মসংখ্যা হ্রাস হইতেছে—প্রাচীন বংশ কালের করালগ্রাসে পতিত হইতেছে। মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে প্রকটিত হইতেছে।

দারিদ্র্যের মূল কারণ পরাধীনতা। পরাধীন যে, সে সর্ব্বপ্রকারে অন্যের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। এইরূপ নির্ভর করায় তাহার মনের স্ফূর্ত্তি চলিয়া যায়,—ক্রমে ক্রমে অলসতা আসিয়া সংক্রামিত হয়, ক্রমে ক্রমে বিলাসিতা আসিয়া ইন্দ্রিয়-পরিপুষ্টি সাধন করে—ক্রমে ক্রমে উঠিতে, বসিতে, খাইতে—সর্ব্বপ্রকারে সে জড়প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া উঠে;—কার্য্যকরী ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়, সে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। নিজের অকর্ম্মণ্যতা স্মরণে সে তখন পরশ্রীকাতর ও নিন্দুক হইয়া উঠে। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে, সংসারের বহু লোকের কার্য্য বিলুপ্ত হইয়া যায়—শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি সকল অন্যের হাতে যাইয়া পড়ে। যাঁহারা কার্য্য বিভাগে বড়, তাঁহারা সর্ব্ববিভাগে বড় হইয়া উঠে। আর যাহারা কার্য্যবিভাগে ছোট, তাহারা সকল বিভাগে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া নগণ্য হইতে থাকে। শেষে মৃত্যু আসিয়া সর্ব্ব দুঃখ দূর করে। কার্য্য করিতে করিতে আজ ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন; আর ভারত আজ অলস ও বিলাসী, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র, বধূর অঞ্চলাসক্ত,—ভিক্ষোপজীবী,—পরশ্রীকাতর, পরনিন্দুক;—সর্ব্বপ্রকারে পরাধীন হইয়া দুর্ব্বল হইতেও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ভারতের অবনতির আর বাকী কি আছে? Division of labour-হীনতায় আমরা ক্রমে ক্রমে সর্ব্বপ্রকারে পরাধীন হইয়া পড়িতেছি। স্ব-জন, স্ব-গৃহ, স্ব-জাতি, স্ব-দেশ, স্ব-ধর্ম্ম, স্ব-ভাব, স্ব-রূপ, স্বাধিকার, স্বরাজ—এসকলই স্বাধীনতার রাজ্যের মূল মন্ত্র। এ সকলের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, বীরের ন্যায় আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইয়া অবিশ্রান্ত খাটিতে হয়। তাহাতে শারীর শক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মনের বল আইসে। অন্যদিকে, মনের বলই শারীর বলের নিয়ামক। রাজৈশ্বর্য্য পাইলেও নিজের চেষ্টা খর্ব্ব করা উচিত নয়, অন্য-প্রদত্ত দুধভাত পরিত্যাগ করিয়া স্বোপার্জ্জিত শাকান্ন গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃত মহাপুরুষের ইহা মূল মন্ত্র। 'স্ব'—সাধন এজগতের শ্রেষ্ঠসাধন—বৈকুণ্ঠের পথ, চরমোন্নতির মুখ্য উপায়। এখন আমরা "স্ব" পরিত্যাগ করিয়া পরানুসন্ধানে ও পর-পদলেহনে নিযুক্ত, নিজের চক্ষের তৃণ কণা না ফেলিয়া অন্যের চক্ষে কেশ দেখিয়া শিহরিয়া উঠি;—নিজের যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা ভুলিয়া পরের দিকে চাহিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেছি। আমরা আত্ম-সম্মান ভুলিয়া পরদোষ কীর্ত্তন করি, পরশ্রীকাতরতার সেবা করি, পরাধীনতায় আত্মসমর্পণ করিয়া মহানন্দে বিভোর হই।

পরবশতার কি শোচনীয় ফল, পাঠক ডারুইন-প্রণীত Descent of man হইতে জাতীয় বিলোপ একবার পাঠ করিলে বুঝিবেন।

জাতীয় বিলোপের ইতিহাস এত আশ্চর্য্য প্রহেলিকা। সর্ব্বপ্রকার পরাধীনতাই জাতীয় বিলোপের প্রধান কারণ। ট্যাসম্যানিয়া, মাউরি, নিউজিলাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, স্যাণ্ডউইচ দ্বীপে যাহা ঘটিয়াছে, ভারতবর্ষেও অচিরে তাহাই ঘটিবে। "১৭৭৯ খ্রীঃ কুক স্যাণ্ডউইচ দ্বীপ আবিষ্কার করেন, তখন অধিবাসী সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ। কিন্তু ১৮২৩ খ্রীঃ যখন তাহাদিগকে গণনা করা হয়, তখন তাহারা প্রায় ১৪২,০৫০ জন মাত্র হইয়া গিয়াছিল।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের লোক গণনায় ১৩০৩১৩

১৮৩৬	১০৮,৫৭৯	১৮৫৩	৭১,০১৯
১৮৬০	৬৭,৩৮৪	১৮৬৬	৫৮,৭৫৫
		১৮৭২	৫১,৫৩১।*

* পরবশতা ২৭, ২৮, ২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

কিন্তু অধিবাসীগণের চালচলন, আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হওয়াই এই অবস্থার প্রবলতর কারণ। * * ইউরোপীয়গণের অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায়, ইহারা অল্পকাল মধ্যেই পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়াছিল এবং মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে। তাহাতেই উক্ত দ্বীপবাসীদিগের জননশক্তি হ্রাস হইবার প্রচুর কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।"

যাঁহারা নিজকে ভুলিয়া অন্যকে ভাল হইবার উপদেশ দেয়, তাহাদের অপেক্ষা মূর্খ আর কে? যাহার আত্মসম্মান বোধ নাই, সে-ই অন্যের নিন্দা করে। পরাধীন ভিন্ন পরনিন্দুক কেহ হইতে পারে না। যে অবস্থায় যে ভাবে ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া এখন পরনিন্দা এবং পরশ্রীকাতরতাকে জীবন-সর্ব্বস্ব করিয়াছে, তাহা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। নিজের অবস্থা যখন শোচনীয় হয়, তখনই অন্যের অবস্থা ভাল দেখিলে কষ্ট হয়। তখনই মানুষ পরশ্রীকাতর হয়। নিজে যে হীনতার রাজ্যে পরিভ্রমণ করে, সে-ই অন্যের দোষ কীর্ত্তনে লালায়িত। নিজের দোষ ঢাকিবার অন্য উপায় আর সে পায় না। আমরা যে এত পরনিন্দুক এবং পরশ্রীকাতর হইয়া উঠিতেছি, তাহার একমাত্র কারণ পরাধীনতা। আপনার দোষ সংশোধন লইয়া যে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে, সে আর অন্যের ছিদ্র অন্বেষণে সময় পাই না। সে আপনা লইয়া সর্ব্বক্ষণ মজিয়া থাকে। কিসে নিজে ভাল হইব, তাহার সর্ব্বক্ষণ কেবল এই চিন্তা। এদেশে এতরূপে যে অন্যের নিন্দা প্রচারিত হইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ আত্মাদরহীনতা ও পরাধীনতা।

সকল সাধনার সার সাধনা—যশ নিন্দার অতীত হওয়া। রিপু জয় করা অতি সোজা—কিন্তু মন জয় করা সোজা নয়। যশ নিন্দার অতীত কে হইতে পারে? আমি যদি বিধাতার নিকট অপরাধী হইয়া থাকি, তুমি প্রশংসা করিয়া আমাকে স্বর্গে তুলিতে পার না; আর যদি ভিতরে ভাল থাকি, তুমি আমার নিন্দা করিয়াও কোন অনিষ্ট করিতে পার না। "রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে?"—এই দেশের চির প্রবাদ। যে আত্ম-সাধনায় সিদ্ধ, কেবল সে-ই যশ নিন্দার অতীত হইতে পারে। আত্ম-জয়, আত্ম-সম্মান সাধনার মূল মন্ত্র। চিত্ত-শুদ্ধি বা আত্মজয় একই কথা। কবি বলেন,—

"ইন্দ্রিয়ের বশ যে বা বারমাস,
স্বদেশ-উদ্ধার তার কাজ নয়।"

আত্ম-শুদ্ধি ও জিতেন্দ্রিয়তা ভিন্ন কে কবে মানুষ হইতে পারিয়াছে?

সাধনার মূল বীজ আত্মার মূলে নিহিত। প্রেম বল, জ্ঞান বল, পুণ্য বল বা নীতি বল, —সকল আপনাকে লইয়া। আপনাকে জয় করিতে পারিলে, তবে পরে জগৎ জয় হয়।

সুতরাং সার কথা এই—আত্ম-সাধন, আত্মাদর ও আত্মসম্মান অর্জ্জন। আপনি মানুষ হইতে পারিলে আর কোন ভয় নাই। আপনাকে ভুলিয়া যাহারা "বিশ্ব" লইয়া প্রমত্ত হইতে চায়, তাহারা সাধনার মূলমন্ত্র কিছুই বুঝিতে পারে না। "স্ব"—সাধনই চরম সাধন।

"স্ব" কথার অপেক্ষা মিষ্ট কথা আর কি কিছু আছে। স্বদেশ, স্বজন, স্বগৃহ, স্বভাব—কি মধুর কথা। এই সকলকে জয় কর, তোমার আর কোন অভাব থাকিবে না।

আমি এই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া আমার স্বর্গগত সেই বাল্যবন্ধুর কথাই দিবারাত্রি ভাবিতেছি। "স্বাবলম্বন"—কথা বলিবার সময় তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরিত, তিনি ভাবে বিভোর হইতেন এবং বলিতেন—"স্বাবলম্বন" ভিন্ন ভারতের আর গত্যন্তর নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন—সকল চিন্তার সার চিন্তা—আত্মচিন্তা; সকল সাধনার মূল সাধনা—আত্ম-সাধন। তিনি বলিতেন, চিন্তা করিতে করিতে যে জন আত্মার মূলে ডুবিয়া যাইতে পারে, সে-ই কেবল পরমাত্মাকে চিনিতে পারে। আত্মার মূলেই পরমাত্মা।

উপনিষদকার বলেন, এক শাখায় দুই পাখী,—এক অন্যকে দিবানিশি দেখিতেছে। দেখিয়া দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া তন্ময় হইয়া যাইতেছে। শেষে—দুই মিলিয়া একাকার হইতেছে,—একের স্বভাবে অন্য অনুপ্রাণিত বা নিমজ্জিত হইতেছে। আমরা

শক্তি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইতেছে, কেবল দেবশক্তি জাগিয়া উঠিতেছে। নিরঞ্জন-তটে শাক্যসিংহ নির্ব্বাণের পথ ধরিয়া শেষে অমরত্ব লাভ করিতেছেন।

আত্ম-সাধনে সিদ্ধিলাভের পর প্রচারের ইচ্ছা অন্তরে প্রবল হয়; পরচিন্তনে ইচ্ছা হয়। আত্মাদর জন্মিলে পরকে আদর করিতে অভ্যাস হয়, যখন আত্মার মূলে পরমাত্মার সহ তাঁহার স্বজিত মানবের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন নিজ প্রতিবিম্ব বিশ্বে দেখা যায়,তখন জগৎব্যাপী ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য দ্বারেং সাধক বিচরণ করেন। বুদ্ধ তখন ভিক্ষু-বেশে দ্বারে দ্বারে বিচরণ করেন,—খ্রীষ্ট তখন নিভৃত স্থান পরিত্যাগ করিয়া নগরে নগরে প্রচারার্থ বহির্গত হন। সাধনার চরমোৎকর্ষে সাধক জগতের দ্বারে তখন আত্মবিক্রীত হন। তখন আর কেহ পর থাকে না, সব পর আপন হইয়া যায়। তখন আত্মার ভিতরে জগৎ পরিস্ফুট হয়;—তখন বিশ্বজনীন মানবপ্রেমের উদয় হইয়াছে, পরনিন্দা বা পরশ্রীকাতরতা উড়িয়া গিয়াছে—সাধক তখন জগন্ময় বিশ্বরূপ দেখিয়া একাত্মিক প্রেমে দীক্ষা লাভ করিয়াছেন৷ তখন আত্মাদর-পুরে পরের ভালবাসা জমাট বাঁধিয়াছে—তখন "স্ব"—জগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে। তখন স্বর্গ ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

মহা সাধনার মহা প্রয়োজন। সাধনা কথার কথা নয়—নিভৃতে, গভীরে ডুবিয়া যাইতে হইবে। "স্ব" সাধনে সিদ্ধিলাভ না করিতে পারিলে কিছুই হইবে না; নিশ্চয় জানিও। অতএব এস ভাই—স্বাবলম্বনের জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হই। এই পথ ধরিয়া "স্বদেশের" "স্বজনের" সেবা করিতে করিতে চরমোন্নতির পথে উন্নীত হইয়া যাই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বিদুরের ক্ষুদ।

১

(দেবি,) তোমারে বরণ করি।
এই মধু-নিশি-শেষে,
আমি ঘুমের আবেশে,
আকুল পরাণে, তোমারি সন্ধানে
এসেছি ছুটিয়া দুয়ারে তোমারি।

২

ওগো জানিনা কি আশে,
কোন্ অতৃপ্ত পিয়াসে,
মুষ্টি ভিক্ষা তরে, আসি তব দ্বারে,
ডাকিছে কাঙ্গাল, 'রাজরাজেশ্বরি'!

৩

হের নবীন পুলকে,
চারু স্নিগ্ধ উষালোকে,
তোমারি লাগিয়া, উঠেছে ফুটিয়া,
কত বনফুল,— বিচিত্র মাধুরী!

৪

ওগো বন, উপবন,
কত পুষ্পিত কানন,
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, অধীর হইয়া,
এসেছে অনিল, নিকুঞ্জবিহারী।

৫

বাহি কুসুম-সুবাস,
ফেলি সুরভি নিশ্বাস,
তোমারে খুঁজিয়া, বাউল হইয়া
তোমারি নিকুঞ্জে ভ্রমিছে গুঞ্জরি।

৬

হের গুণ্ গুণ্ করি,
কত মত্ত মধুকরী
মকরন্দ আশে তোমারি উদ্দেশে,
এসেছে উড়িয়া আপনা পাশরি।

৭

ওগো হ'য়ে উন্মাদিনী,
কত বন-বিহঙ্গিনী,

মধুর কূজনে, মোহের স্বপনে,
গাইছে কাননে বন্দনা তোমারি।

৮

আমি যে গো অতিদীন,
দুখী তাপী গৃহহীন;
নাহি ত্রিভুবনে কেহ কোন খানে
আমি যে একেলা পথের ভিখারী।

৯

ওগো এনেছি তুলিয়া,
সাধে কোঁচড় ভরিয়া,
প্রীতি-সুরভিত— চন্দন-চর্চ্চিত,
যূঁথি, সেফালিকা, চম্পক-মঞ্জরী।

১০

মোর আছে শুধু তাই
আর যে কিছুই নাই,
তাই প্রভাতে এসেছি স'পিতে,
বিদুরের ক্ষুদ চরণে তোমারি।

১১

তুমি ওঠ, খোল দ্বার,
লহ তুচ্ছ উপহার,
নলিন-নয়নে চাহ মোর পানে,
দাঁড়াও সম্মুখে তোমারে নেহারি।

১২

ওই দৃষ্টি নিরমল,
হৃদে ফুটায় কমল;
পরাণ জুড়িয়া থাকুক জাগিয়া,
পুণ্যগন্ধ তার দিবস শর্ব্বরী!
(আমি) তোমারে বরণ করি।)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

শরতে।

১

কে আজি এমন বেশে, বসেছ ধরায় এসে,
বিশ্ববিমোহিনি!
যে দিকে নয়ন যায়, তোমার রূপের ভায়
চমকি, জননি!
আকাশ গগন ঢাকি, একি মা! তোমার একি
বিরাট আসন!
মেঘলোক পরশিছে তব সিংহাসন!

বিশ্বময়, বিশ্বরাণি! স্নেহের আঁচল খানি
পাতিয়াছ তুমি;
শিরসে কুসুম-হাস, বক্ষে চারু শ্যাম-বাস,
আছে পদ চুমি'!
অনন্ত গৌরবে তুমি রাজিছ; এ বিশ্বভূমি
লুঠাইছে পায়!
কে তুমি জননি! দেবি! চিনি কি তোমায়?

৩

আজি শুধু নহে, বুঝি, কোটি জন্মে তোরে খুঁজি'
ফিরেছি মা! আমি!
অস্থির বিদ্যুৎ সম, চক্ষের সম্মুখে মম
কত দিবা, যামী,—
এসেছ, গিয়েছ সরি,' আমারে চকিত করি!'
আকুল ভাষায়—
আমি শুধু সুধায়েছি—"চিনি কি তোমায়?"

৪

ও মৌন হাসির পাছে অসীম রহস্য আছে
লুকা'য়ে গোপনে!
এ স্নিগ্ধ দৃষ্টির মাঝে অনন্ত সঙ্গীত বাজে
অধীর মূর্চ্ছনে!
চকিতে ঘুমের ঘোরে, জননি! দেখেছি তোরে!
শুনেছি সে গান!—
মুগ্ধ এ হৃদয় মা গো, মুগ্ধ এ পরাণ!

৫

অজ্ঞাতে, চকিতে, কবে, আমার হৃদয়-নভে
ধ্রুব-তারা প্রায়,
দেখা দিয়ে, সারাৎসারে! কি বলেছ, বুঝিবারে
পারিনি ত, হায়!
বুঝি, বা না বুঝি কথা, কি দুর্দ্দম অধীরতা
জেগেছে পরাণে!
উন্মাদ-আবেগে গেছি ছুটি' তোমা পানে!

৬

স্মৃতির মোহন-যন্ত্রে অযুত অধীর তন্ত্রে
উঠেছে ঝঙ্কার—
যুগ যুগান্তের কত বিস্মৃত-কাহিনী শত
তোমার আমার!
সৃষ্টির প্রথম, কবে, জননি! বিদায় যবে
লইনু চরণে,
সে দিন কি কথা ছিল পড়ে যেন মনে!

৭

কথা ছিল হে শুভদে! আবার ফিরিব পদে
সাধনার শেষে!
কই মা! ফিরিনু কই? আমি যে আমারি নই!
স্রোতে যাই ভেসে!
শত জন্ম পথ-হারা, আমি যে পাগল পারা
ছুটেছি কোথায়!
তবুও ত স্নেহময়ি! ভোলনি আমায়!

৮

ক্ষণিক পরশে তবু, যদি বা আমার, কভু,
ভাঙে ঘুম-ঘোর,
স্নেহ বশে বুঝি তাই, যত আমি দূরে যাই,
কাছে এস মোর!
আছ তুমি এত কাছে, তবু যেন মাঝে আছে,
কত ব্যবধান!
আমি যে মোহেতে অন্ধ, আমি যে অজ্ঞান!

৯

করি' বিশ্ব বিপ্লাবিত, ঢালো ঢালো উচ্ছ্বসিত
করুণার ধারা!
হে দেবি! হে স্নেহময়ি! হে জননি! হে চিন্ময়ি!
ওগো সারাৎসারা!
হ'ল না হবে না আর, আমা হ'তে মা! আমার
হবে না উদ্ধার!
তোমার করুণা শুধু ভরসা এবার!

১০

কি সুন্দর এ জগত! কি সুন্দর এ শরত!
বিচিত্র সৃজন!
কি উদার নভঃতল! কিবা স্নিগ্ধ নদী-জল,
নির্ম্মল, পাবন!
আমি কেন নাহি তৃপ্ত! এ দেহ কালিমা-লিপ্ত,
অশান্ত পরাণ!
পবিত্র জগতে কেন নাহি মোর স্থান!

১১

কে আজি মেঘের পরে বসিয়া, গভীর স্বরে
"শান্তিঃ শান্তিঃ" কয়!
কত শান্তি, নাহি জানি, ওগো অশরীরি বাণি!
তব দেশে রয়!
মা হারা হৃদয় তায় বুঝি গো ভাসিয়া যায়
শান্তির জগতে,
মায়াবী এ মরতের কারা-কক্ষ হ'তে!

১২

নীল আকাশের গায়, উড়ে উড়ে কোথা যায়
মেঘ থরে থর!
তাহার পশ্চাতে, দূরে, উদার অনন্ত পুরে
কে বেঁধেছে ঘর!
সেখানে বসিয়া, অয়ি! কে তুমি রহস্যময়ি!
বাজাইছ বীণ!
সে স্বর, অবশ প্রাণে, কত সুরে, কত তানে,
বাজে নিশি দিন!
যেন দূর স্বপ্ন-গীতি,—কোন্ যুগান্তের স্মৃতি—
মনে পড়ে যায়!—
মুগ্ধ হৃদি ছুটে যায়—কোথায়! কোথায়!

শ্রীগজেন্দ্রনাথ গুহাইত।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

২৭। ভাষা ও আদিরস এবং পরবশতা;— শ্রীশশধর রায় প্রণীত, মূল্য কাগজ ৸৹, কাপড় ১৲। ভাষা ও আদিরস ৩২ পৃষ্ঠা, পরবশতা ২১৩ পৃষ্ঠা, ডিমাই ৮ পেজি। মূল্য কত সুলভ! স্বদেশী ভাল কাগজে ছাপা। সাহিত্যকে বিজ্ঞান-মূলক করিবার জন্য গ্রন্থকার যে অদম্য চেষ্টা করিতেছেন, এই গ্রন্থ তাহার উদাহরণ। এই গ্রন্থ প্রণয়নে গ্রন্থকার যে গবেষণা ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। গ্রন্থখানি এত উপাদেয় হইয়াছে যে, বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের দিনে ইহা ঘরে ঘরে আদৃত হওয়া উচিত। "জাতীয় বিলোপ" প্রবন্ধটী সকলের পাঠের ও চিন্তার বিষয়। স্থানান্তরে উহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম। পুস্তক খানির বহুল প্রচার আমরা প্রার্থনা করি। গ্রন্থকারের লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।

২৮। রামায়ণের ছবি ও কথা। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য ।৹। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সুন্দর সুন্দর ১৬ খানি ছবি আছে। এই পুস্তকখানি এরূপ সরল, সুলিখিত, সংক্ষিপ্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে পড়িলে অবাক্ হইয়া ভাবিতে হয়, যোগীন্দ্রনাথ ৪০ পৃষ্ঠার মধ্যে সমগ্র রামায়ণ খানি কিরূপে শেষ করিলেন?

আজ কাল অনেকেই সুন্দর বাঙ্গলা লিখি-তেছেন বটে, কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের ন্যায় সুমিষ্ট বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতে অতি অল্প লোকেই পারেন। একটু স্থান উদ্ধৃত করিলাম, ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, রচনা কেমন মিষ্ট।

বালক বয়সে রাম, বিশ্বামিত্র সনে,
মুনি-যজ্ঞ-রক্ষা হেতু যান তপোবনে।
তাড়কা নামেতে পথে ছিল নিশাচরী
জীবহিংসারতা দুষ্টা, মহাভয়ঙ্করী,
শিরে তাম্র জটা তার, অস্থি-বিভূষণ,
সন্ধ্যামেঘ-সম-বর্ণ মূরতি ভীষণ।
পশুচর্ম্ম পরিধানা, বিকট-দশনা,
বিপুল-শরীরা ক্রুদ্ধ মাতঙ্গ-গমনা।
শ্রীরামে দেখিয়া ক্রোধে দুষ্টা নিশাচরী
ধাইয়া আইল দুই বাহু উর্দ্ধ করি।

এই সুন্দর পুস্তকখানি গৃহে গৃহে প্রচারিত হউক।

২৯। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত। তৎকর্ত্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে মুদ্রিত। মূল্য কাপড়ে বাঁধা ১৷৴০, কাগজের মলাট ১৶০।

যে সময়ে ঋষি রাজনারায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে দেশের উন্নতিকামী বহুলোক ছিল না। যে কয়েকজন মহাপুরু-ষের চেষ্টায় বঙ্গে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, এই মহাত্মা তাঁহাদের অন্যতর। এই আত্মচরিতখানি বঙ্গের একসময়ের ইতি-হাস বিশেষ। সরল ভাষায়, অনাড়ম্বর ভাবে এই জীবনকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পাঠ করিয়া আমরা বড়ই উপকৃত হইলাম। যিনি এই পুস্তক পাঠ করিবেন, তিনিই উপকৃত হইবেন, আমাদের বিশ্বাস।

৩০। রামানুজ-চরিত। শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ১৷০। শাস্ত্রী মহাশয়ের শঙ্করা-চার্য্যের জীবনী যেমন বঙ্গে আদৃত হইয়াছে, এই পুস্তকখানিও সেইরূপ আদরের যোগ্য। প্রাচীন কালের ইতিহাস ও কাহিনী সংগ্রহ করা বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শাস্ত্রী মহাশয় গভীর গবেষণা, প্রভূত পরিশ্রম, অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া এই সুন্দর জীবন-চরিতখানি লিখিয়া-ছেন। সংগ্রহ এত সুন্দর হইয়াছে যে, আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই বিমুগ্ধ হইবেন। বিশেষতঃ এই পুস্তকের অবতরণিকা এক অপূর্ব্ব জিনিস হইয়াছে, বৈদিক ধর্ম্মের উৎ-পত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ইহাতে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষা বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল, এবং সরল— পড়িতে বসিলে পুস্তক শেষ না করিয়া উঠা যায় না। সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ এই পুস্তকের আদর করিবেন, আমরা আশা করি।

৩১। The Sixteenth Annual Report of the Calcutta Deaf and Dumb school, Session 1908.

বোবা এবং কালা স্কুল সাধু শ্রীনাথ এবং উমেশচন্দ্রের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি:—সামান্যে ইহার আরম্ভ, অসামান্যে ইহার পরিণতি। আমরা এই কার্য্যবিবরণখানি পড়িয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। বিধাতার বিশেষ কৃপা বর্ষিত হউক।

৩২। মাধুরী। শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। সাধু-প্রতিম দেবকুমারের কথা এদেশের কে না জানে? অনিন্দিত চরিত্রের অধিকারী হইয়া এই দেবশিশু আপন প্রতিভায় দেশ মোহিত করিতে-ছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিভা আরো ফুটিয়া উঠিতেছে। এই "মাধুরী" তাহার পরিচয়। শিল্পনৈপুণ্যে এবং ভাব-সম্পদে দেবকুমার অমরত্ব লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছেন। ইচ্ছা হয়, অনেক কবিতা তুলিয়া দেই,—কিন্তু স্থান নাই, এই দুঃখ। কবির "প্রার্থনা" কবিতাটী পড়িতে পড়িতে আমরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই; বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ কবিতা আর কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মাধুরী কবিতাটী কত সুন্দর, পাঠক দেখুন,—

"গান গাহি। কেন গাহি?—গাহিবার কিছু নাহি,
আজি বিশ্বে শুধু হেরি—
"মাধুরী অপার!
তবে, বৃথা হাহাকার, কেন আর—কেন আর?
ডুবে' যা'রে এ অমৃতে
পরাণ আমার।"

অনভিজ্ঞাত কাব্য-সাহিত্য।

বাঙ্গালা "ব্যালেড্" সাহিত্য সংগ্রহকার্য্যে অনেকগুলি অচর্চ্চিত ও অননুধ্যাত কাব্য-কথা পাওয়া যাইতেছে।

কথিত আছে, প্রাচীন কালে ঘর্ষণক্লিষ্ট অরণি-কাষ্ঠ হইতে সহসা অগ্নি উদ্গীর্ণ হইয়া হোমশিখা গঠন করিত। আমাদের পল্লী-প্রান্তরের নানা কোণে কত অরণির সন্ধান আকস্মিকভাবে পাওয়া যাইতেছে, বাঙ্গালার বিপুল প্রাচীন সাহিত্য তাহার প্রমাণ —এবং ইহার শতমুখী আলোক-শিখা তাহার দৃষ্টান্ত।

ভারতের কুঙ্কুম-রক্ত প্রত্যূষ, হীরকশুভ্র দীপ্ত মধ্যাহ্ন, ধূসর-পিঙ্গল প্রদোষ, বর্ণে, গন্ধে কত গীতিকথা সৃজন করিয়াছে, অমলিন প্রকৃতির জাগ্রত হরিৎ অঞ্চলে তাহা কি প্রতিদিন শিহরিয়া উঠিতেছে না?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে শ্রেণীর সাহিত্য আলোচিত হইবে, তাহার চর্চ্চা সাময়িক সাহিত্যে হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ, এতকাল ইহা নেপথ্যে ছিল।

ইহাকে ঠিক প্রাচীন সাহিত্যও বলা যায় না, বিস্ময়ের বিষয়, ইহা প্রচলিত সাহিত্য, তবে ইহা প্রাচীনকালের ভাব, ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি সগৌরবে বহন করিয়া, সনাতন ভাবকুল্যার খরস্রোতের সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। শরতের বিপুল তুষার-শুভ্র ছিন্ন মেঘান্তরালের সীমাহীন নীলিমা-কোণে ইহা যেন ক্ষুদ্র মাল্যের স্থান অধিকার করিতে পারে।

ব্যালেড গীতির, ঠিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া বিশেষ দুষ্কর—একটা বিশেষ নিবিড় মাদকতা আছে, তাহা সেফালিকার ন্যায় নগ্নভাবে আত্ম প্রস্ফুট হয় না, তাহা বকুল-কিঞ্জল্কের আড়ালে নিহিত গন্ধের ন্যায় অন্তরালে থাকিয়া মহিমা লাভ করে।

সৌন্দর্য্য বহুকাল আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে না। এই সমস্ত ব্যালেড-গীতির ঘন আকর্ষণে প্রবল তুফানের উন্মত্ততা নাই, গ্রীষ্মের সমুদ্র-শীকর-সিক্ত মধ্যাহ্নবায়ুর স্থৈর্য্য ইহাকে অবিনশ্বরতা দান করিয়াছে। ইহাকে শ্রদ্ধা করিতেছি, কারণ মানবের হৃদয়-বীণার বিশ্বকর্ম্মা যে কয়খানি সুকুমার হেম-তার ঝুলাইয়া দিয়াছে, যাহার অঙ্গুলাগ্র-স্পৃষ্ট আলাপে তাহা নিবিড় উর্ম্মিভঙ্গে ঝঙ্কারিয়া উঠিবে, তাহারই কণ্ঠে ফুলমাল্য পড়িবে।

বাঙ্গালা দেশের ভট্টসঙ্গীত-সমূহকেও এই শ্রেণীর সাহিত্যের অন্তর্ভূত মনে করা যাইতে পারে।

এই ব্যালেড গীতিগুলি আশ্চর্য্যরূপে চিত্ত-বিমুগ্ধকর। Allan. Ramsay এর "Ever-green" কিম্বা Percy'র Reliques প্রকাশ দ্বারা একসময়ে পশ্চিম ইউরোপে যে উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল, Madame de Cherier এর গ্রীস্ প্রদেশের ব্যালেড সম্বন্ধে চেষ্টা, কিম্বা Herder Goethe বা Walter Scott একক্ষেত্রে যেরূপ উদ্যোগ প্রকাশ করে, তাহা কিরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছিল, কাহারও অজ্ঞাত নহে।

কোন অভিজ্ঞ লেখক "ব্যালেড গীতি" সম্বন্ধে বলেন :—

"A simple tale told in simple verse......The beauty of these purely popular ballads, their directness and freshness made them admired

even by the artificial critics of the most artificial periods in literature".

এজন্যই ব্যালেড গীতিগুলি কবিগুরু গেটের বড়ই প্রিয়বস্তু ছিল। তিনি স্বয়ং পাণ্ডিত্যের বোঝা স্কন্ধ হইতে নিক্ষেপ করিয়া এই শ্রেণীর সরল গ্রাম্যগীতি রচনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তাঁহার রচিত "Ballade" (বৃদ্ধ ও শিশুগণ বিষয়ক) এবং "Happy couple"বিষয়ক ব্যালেডটী বিশেষ ভাবে তাঁহার প্রিয় ছিল। শেষোক্তটী সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

"The poem of the Happy Couple is likewise rich in motives; whole landscapes and passages of human life appear in it warmed by the sunlight of a charming spring-sky which is diffused over the whole"*

বলা যাইতে পারে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে কথা সাহিত্য রচনা সর্ব্বপ্রকারে বিফল হইয়াছে। "Popular" বা লোকরঞ্জক সাধারণের পাঠ্য বা গেয় কথা সাহিত্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি-যশঃ-প্রার্থীদের লক্ষ্য সংস্কৃতজ্ঞ বা ইংরাজী অভিজ্ঞ কলেজ-ঘেঁষা যুবক—অজ্ঞ সাধারণ তাহাদের দৃষ্টিপথে পড়ে না। আমাদের দেশে আক্ষরিক শিক্ষা বিস্তৃতির অভাব সত্ত্বেও সুরসংযোগে পঠিত ভট্টগীতি, বার-মাস, বা ব্যালেড্ প্রভৃতি শ্রোতার অভাব কখনও হয় না। "মাস্" সম্বন্ধে আমরা নানা মতামত প্রকাশ করি, অথচ "মাসে"র (mass) মাঝে ভাব প্রচারের পন্থাগুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখি। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্য বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্য হইতে কয়েকটা সঙ্গীত বাদ দিলে তদ্ব্যতিরিক্ত একটা কবিতা বা গীতিও সাধারণের হৃদয়ে স্থান পায় নাই? এজন্য জাতির মাঝে একটা অস্বাভাবিক বৈষম্য সৃষ্ট হইতেছে। সরল সহজবোধ্য গ্রাম্যগীতি রচনা কি বাস্তবিক অবহেলার বিষয়? বার্ণসের গ্রাম্যগিতি ও ব্যালেডের কি তুলনা আছে?

বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 'ব্যালেড্' গুলির সহস্র সহস্র কাপি চট্টগ্রামে প্রতি বৎসর বিক্রীত ও পঠিত হয়। হিন্দু, মুসলমান, ব্যবসায়ী, দোকানদার, নৌকার 'মাঝি', হোটেলওয়ালা, মুটে মুজুর, ফিরিওয়ালা, জাহাজের খালাসী, গাড়ীওয়ালা প্রভৃতির এই শ্রেণীর রচনা বিশেষ ভোগ্য। চট্টগ্রামে ইহাকে এক বিশেষ অর্থে (Technical sense) "কবিতা" বলা হয়। তাহার ইংরাজী প্রতিশব্দ অনেকটা "ব্যালেড" বলিলে ঠিক হয়।

অতি মধুর, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল সুরে কোন সুপাঠক অধ্যয়ন করিতেছে এবং মধুলুব্ধ মক্ষিকার ন্যায় কুতূহলী, উচ্ছ্বসিত শ্রোতৃবর্গ মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট। এই দৃশ্য হাটে মাঠে দুর্লভ নহে। মনে হয় যেন রৌদ্রতপ্ত হৃদয়গুলিকে এই গ্রাম্য স্বরালাপ স্পৃষ্ট কবিতাচয় শীকরসিক্ত করিয়া তোলে; যেন দৈনন্দিন কঠোর জীবন-মরুর শুষ্কপথে মরীচিকা-গ্রস্ত গ্রাম্য হৃদয় হঠাৎ স্নিগ্ধ পল্লবকুল লাভে আকুল হইয়া উঠে।

এ শ্রেণীর ব্যালেড্ হইতে পাঠকদিগকে কয়েকটী উপহার দিতেছি। কিন্তু এই "কবিতা"গুলি চট্টগ্রামের হিন্দু মুসলমান সাধারণের সামষিক জীবনের সহিত নিবিড় ভাবে যুক্ত, এজন্য কিছু ভূমিকা সংলগ্ন করিয়া সামাজিক জীবনের কিছু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন, নচেৎ রসবোধ হইবে না।

---

* "Conversations with Eckermana." Bohn's Series.

চট্টগ্রাম সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর—আলবালের ন্যায় কর্ণফুলী নদী ইহাকে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বঙ্গোপসাগরের দিগন্ত-শায়ী সীমাহীন কলেবরের ব্যাপকতা, অনন্ত-শীর্ষা শৈলমালার কঠিন ক্রোড় এবং উচ্ছ্রিত-কেতু অর্ণবযান-জাল-জড়িত কর্ণফুলী নদীর কল্লোল, উচ্ছ্বাসের মাঝে অত্রত্য সাধারণ মানব-লিপ্ত নানা আকাঙ্ক্ষা কল্পনার মাঝে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এমন লোক পাওয়া দুষ্কর যে,এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বন্দরান্তরে পদক্ষেপ করে নাই। সাধারণ লোকের মাঝে দেশান্তরে যাওয়ার, দিকে দিকে বিস্তৃত হওয়ার অতি তীব্র পিপাসা রহিয়াছে। গৃহ-পলাতক কত তরুণ যুবক দক্ষিণ ভারতের বন্দর প্রভৃতিতে প্রস্থান করে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর লোকের মাঝে ব্রহ্ম প্রদেশের রাজধানী রেঙ্গুন বড়ই প্রিয়বস্তু। সেখানে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন সম্ভব বলিয়া নহে, স্বপ্নসুলভ ব্রহ্মদেশীয় জীবনের ঔজ্জ্বল্য, নূতনত্ব, এবং বৈচিত্র্যের মাদকতা, ইহারা কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না। তত্রত্য রমণী-সম্প্রদায়ের অবরোধ-বিহীন অবাধগতি, পুরুষদের জীবনের প্রতি সরল ঔদাস্য, এবং এতদুভয়ের রহস্যময় জীবনযাত্রা, বাঙ্গালার রুদ্ধ-বায়ু গবাক্ষকোণ হইতে আগত মানবের বড়ই অভিনব বোধ হয়। রাশি রাশি প্যাগোদার (Pagoda) ঐশ্বর্য্য, বিশ্রাম-গৃহের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মঞ্চ, বৌদ্ধ ভিক্ষুর হরিদ্রা-রঞ্জিত পরিচ্ছদ বস্তুতই নয়নাভিরাম, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত ব্যালেড্‌গুলি চট্টগ্রামের এই বহির্জীবনের সুখ দুঃখ, বিপদ ভয়,শোক তাপ প্রভৃতি অতি বিচিত্র করুণ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছে।

"আমু-কালুর কবিতা" হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

"চট্টগ্রাম সাতকানীয়া থানার অন্তর।
হওয়ালী শিক্‌দার ছিল আধু নগর ঘর॥
ধনে মানে রূপে গুণে রাজ্যের প্রধান।
একে একে পঞ্চপুত্র ঘরে ছিল তান॥"*

এই কবিতায় যে পরিবারের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা দুর্ল্ভ নহে। অনেক পরিবারের হৃদয় ইহার অঙ্কিত চিত্রের দ্বারা অকল্পিতভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। এই 'কবিতা'টী হইতে আরও কিছু উদ্ধৃত করিতেছি:—

পঞ্চপুত্রের মধ্যে তান দুই পুত্র প্রধান।
আমুমিঞা; কালুমিঞা যেন পূর্ণিমার চাঁদ॥
... ...
আমুরে করাইল বিবা বহু যত্ন করি।
যুবাদার সিকদারের মায়্যা অবলা কুমারী॥

উদ্বাহের পরই অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির তাড়নায় আমুমিঞা সমুদ্রবাহী অর্ণবযান বক্ষে রেঙ্গুন চলিয়া গেল, নববিবাহিত বধূর আকর্ষণও তাহাকে গৃহের মাঝে নোঙ্গর-বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। গৃহের সর্ব্ববিধ স্নেহরাজ্য হইতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রেঙ্গুনের বিচিত্র পরীরাজ্যে সে উপনীত হইল।

তারপর এ সমস্ত নাটকের যেরূপ অঙ্ক-চিত্র জীবনপথে ঘটে, তাহাই হইল। আমুর কনিষ্ঠ কালুও রেঙ্গুন যাইতে ছট্‌ফট্ আরম্ভ করিল, গৃহত্যাগী হইল ও জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইল।

অবশেষে উভয়ে পদ্যপাঠের "বণিকের পুত্রে"র ন্যায় গোধন বিক্রয়-ব্যবসা, আরম্ভ করিল, কিন্তু যেখানে বিধি বিরূপ, সেখানে মানবের শত কল্পনা ব্যর্থ হয় :—

* তান = তাঁহার।

"কিছু আছিল গরু ছাগল অনেক ছিল টকা,'
ব্রহ্মার ডাকাইতের হাতে মৃত্যু আছিল লেখা॥
আনুমিঞা উঠি' বলে কালুরে সোদর,
চতুরদিকে আইসেরে ঘিরি ডাকাইতের লস্কর॥
কালুমিঞা উঠি' বলে, আনুমিঞা ভাই।
হাতের হাতিয়ার লওনা, করিতাম লড়াই॥
আনু নৈল শেল বন্দুক কানু নৈল রোল্।
ব্রহ্মার ডাকাইতের সনে বড় গণ্ডগোল॥
কেহর কাটিল হস্ত পদ কেহর কাটিল মাথা।
কত জন বান্দি রাখিল কালীগিলার লতা *॥
চল্লিশজন ডাকাইতের মধ্যে ত্রিশ জন কাটিল।
আচম্বিতে ছেল আসি আনুর বুকে পৈল॥
আনুমিঞা মারা গেল, কালু একেশ্বর।
চারিদিকে আইসের ঘিরি ডাকইতের লস্কর।
... ...

এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে উভয়ই মৃত্যু-মুখে পতিত হইল, তারপর এই সংবাদ দেশে পৌঁছিলে পর—

"মায়ে কান্দে, বাপে কান্দে,কান্দে ভগ্নীপতি
দুই ভায়ের দুই বধূ কান্দে করি গলাগলি॥
ইত্যাদি।

যে প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর পঞ্চ সহস্রাধিক লোক ব্রহ্মদেশে গমন করে,সেই প্রদেশের কুটীরবাসী সাধারণ এই মুক্ত আড়ম্বরহীন গাতি-কথায় বিস্ময়জনকভাবে আকৃষ্ট হয়। নানা সুরে ইহা পঠিত হয়,উপরোক্ত ব্যালেড্-টীর ধুয়া এই :—

"নছিবরে কহি শুন গুণিগণ শুন পরস্তাপ
পুত্রশোকে মা জননী করেন্ত বিলাপরে।
হায় হায় রে ও নছিব রে॥"

দোহারেরা কবিতায় এই ধ্রুবক দ্বারা সুর রক্ষা করে।

বাণিজ্য, ব্যবসা, কৃষি, কুসীদজীবী প্রভৃতি সামাজিক নানাবিষয়িণী ব্যালেড্ আছে। সংগৃহীত কবিতা হইতে দু' একটা পাঠক-বর্গকে উপহার দিব। পাঠক গ্রাম্য কবির চিত্রাঙ্কণ-প্রতিভা দেখিয়া পুলকিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

"গোলমণি মাঝির নৌকাভাসা" নামক গীতি কথাটী বড়ই চিত্তাকর্ষক।

"বলি পরস্পরে,রাঙ্গা বালি চরে কিরূপ হইল।
সেই কথা কইতে ভাই, মনে ধন্দ হইল॥
কবু আর দেখি নাই, শুনি নাই,এমন আকার,
আগ্রাণ মাসের আট তারিখে হইল
মেউলার * সমাচার॥
পড়ে ঝড় বৃষ্টি, নাই দৃষ্টি, মন হইল হুতাস।
পূর্ব্ব কোণে হইতে জল, ছুটাইল বাতাস॥
করে হুহু শব্দ, হইল স্তব্ধ, দেখি নদির জল।
ভাবে বুঝি, এই বার রাজ্য, হবে রসাতল॥
ছারি জীবনের আশা,সকল বাসা যত লোকছিল,
জলের বলাবল,† দেখি কাঁদিয়া উঠিল।
ইত্যাদি।

এই প্রবল প্রাকৃতিক ঝটিকার মাঝে "গোলমণি মাঝির" শিরশায়ী অভিসম্পাত সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে।
... ...
"শুক্রবারে উবাযাত্রা করিয়াছেন ধারে
হারে গোলমণি মাঝি, বিধি রাজি নাই
তোমার উপর॥
ফার মার জাল, বসাইল, প্রথম শনিবার।
রবিবার উপস্থিত হল দেখা গেল মেউলার ‡
আকার॥
উত্তর কোণে পূর্ব্বভাগে হইল আন্ধার
বলে গাউর ‡ জলে,প্রাণপণে শুন মাঝি ভাই—
মাছে জালে, নৌকা সহ, চরে চলি যাই॥

* লতা বিশেষ।

* মেঘল—মেঘযুক্ত—মেঘাড়ম্বর যুক্ত।
† ক্ষীতি।
‡ মেঘল (মেঘযুক্ত) শব্দের অপভ্রংশ।
¶ গাবুর—শ্রমজীবী বলিষ্ঠ লোক।

গোলমণি বড়ই গোলে পড়িল, তাহার মৎস্য-সঞ্চয় নিষ্ফল হইল। কেহ কেহ নৌকা হইতে সঞ্চিত মৎস্যাদি নদী জলে ফেলিয়া আত্মরক্ষায় তৎপর হইল। তার পর—

"হৈল রাত্রিকাল' এই জঞ্জাল পৈল হুলস্থুল।
খরতর হইল বুঝি পবন হিল্লোল॥
ঢেউ উঠে ফুটি ফুটি,পরিপাটি,সাগর হইল ভাটা,
এইবার কালী,রক্ষা কর,দিব তোমায় পাঠা॥
মাঝিয়ে উঠিল কাঁদি,অরে বিধি,তুই হলি বিমুখ।
আর না দেখিব, আমরা চট্টগ্রামের মুখ।

তার পর এই ক্ষুদ্র নাট্যে যবনিকাপাত হইল, গোলমণি মাঝিকে আর পাওয়া গেল না।

উপরোক্ত গীতিটী সম্পৃক্ত "গোলমণি মাঝির বিলাপ" নামক আরও একটা ব্যালেড আছে। এই শ্রেণীর কবিতার মাঝে "গোলক বহরদারের যশঃকীর্ত্তি ও বাশিরাম সর্দ্দারের কবিতা" বড়ই কৌতুহলজনক, বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিতেছি না।

সামাজিক ব্যালেডের মাঝে "রেঙ্গুনের আসল কবিতা" নামক গীতিতে রেঙ্গুনের নানা বিবরণ,বিশেষতঃ নারীজাতির সৌন্দর্য্য, আকর্ষণ, প্রলোভন, ফাঁদ প্রভৃতি, বাজারের বিপণি সমূহ, ব্যবসায়ী, উকীল, সদাগর প্রভৃতির নানা বিচিত্র কথা আছে।

"সুদখোরের কবিতায়" মহাজনের প্রতি বহু ধিক্কার আছে। বিশেষতঃ মুসলমানদের প্রতি অনেক ধর্ম্ম উপদেশ দিবার প্রলোভন গ্রাম্য কবি অতিক্রম করিতে পারে নাই।

"শয়তানের ফেরেব ভারি, ইমান কাড়ি
নিবে জনে জন।
ভাবি চাহ আদমেরে করিল কেমন॥
আমরা কিবা জানি, কতগুলি নষ্ট করিয়াছে।
দিবানিশি শয়তান বসি থাকে লোকের কাছে।
ছুনিয়াই ভোজের বাজি সয়তান পাজি
জানে নানা ফন্দি।
দেখাই লাভ, কত পাব, লোক করে বন্দি।"
ইত্যাদি।

এই গীতি কথায় গ্রাম্য কবি "ছুনিয়াকে" "ভোজের বাজি" আখ্যা দিয়া দার্শনিক উপাধি লাভের প্রায় যোগ্য হইয়া উঠিয়াছেন। যাহা হউক, সুদের আত্যন্তিক ভারে প্রপীড়িত মানব ইহা পাঠ করিয়া ক্ষণিকের তরে হইলেও উৎসাহ লাভ করিবে।

কৃষিজীবীর পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য ব্যালেডও কয়েকখানি হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে "গরুর দুঃখে"র কবিতাটী বড়ই করুণ রসাত্মক এবং রাখাল হৃদয়ের প্রিয়, সন্দেহ নাই।

প্রভাত হইতেই ভূমিকর্ষণার্থ আহূত গরুর "দ্বিপ্রহর" পর্য্যন্ত লাঙ্গল বহন,বেত্রাঘাত লাভ প্রভৃতি সমাপনান্তর শৈলমূলে তৃণগুচ্ছ খাইবার জন্য কৃষক হইতে গরুটী ছুটি লাভ করে। কিন্তু নূতনতর আধিভৌতিক বিপদ ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে নিম্নলিখিত ভাবে স্তব করিতে হইল :—

"খাবি" "খাবি" ও বাঘা খাবিত আমারে।
গৃহস্থের ছাবাল পোলা ভুয়াই* মরবে মোরে॥
কোথায় লই যাই খাবি মোরে কহ
যে আমারে।

ব্যাঘ্র বলিল—

"খাব ত" "খাব ত" গরু না ভাবিও ডর।
তোরে লই যাই খাব আমি কল্লকেরা† ভিতর।

হঠাৎ এই অবিচ্ছিন্ন দুঃখ-পীড়িত গোধনের প্রতি ভগবান প্রসন্ন হইলেন, কারণ —

"হেনকালে আইল দু'জন শীকার করিবারে।
সেই জনেরে দেখি বাঘা গেল ডরে॥

* তালাস করিয়া,খুজিয়া।
† অর্থ দস্তস্ফুট হয় নাই।

এই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াও "গো" বেচারীর পরিত্রাণ নাই, গরু বলিতেছে :—

"সেখানে তুন † আইলুম খাইয়া গৃহস্তের ডরে
মোরে লই যাই বান্ধি রাখিল ঐ গোয়ালের
ভিতরে।"

তারপর এক ব্যক্তি গরুর গাড়ী হইয়া উপস্থিত। গোধন পুনরায় তথায় যুক্ত হইয়া কাঁদিয়া বলিতেছে :—

'দুঃখের উপরে দুঃখ না যায় সহন
কাটা ঘায়ের মধ্যে যেন মাখিল লবণ।'

গরুর বাগ্মিতার প্রশংসা না করিলেও হৃদয়-হীন সাধারণ লোকের গীতি শ্রবণার্থ উন্মুক্ত কর্কশতা-বিহীন চিত্ত এই ব্যালেডে কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে,এই বিশ্বাস আমার আছে।

কৃষকের ধান্য রোপণ সম্বন্ধে এক ব্যালেড পাইয়াছি। ১৩১২ বাঙ্গলায় চট্টগ্রামে প্রথমতঃ অনাবৃষ্টি, পরে অতিবৃষ্টি হইয়া কি অনর্থ ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। নানা গ্রামে অনতিদীর্ঘ ধান্যগুচ্ছাদি জল প্লাবিত হইয়া কিরূপে নষ্ট হইয়াছিল, বিশেষতঃ শরৎ বাবু নামক একব্যক্তি "দুধ কমল" নামক ধান্য রোপণে, কিরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীপুর, ফটিকছড়ি,হাটহাজারী,ইছামতী সূর্য্যখোলা, ফরফরিভলা, চরন্দীপ প্রভৃতি গ্রামে ধান্যের অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহাও গ্রাম্য কবির দৃষ্টিপথগোচর হইয়াছে। পরিশেষে কবি সাংসারিক দুঃখের অবশ্যম্ভাবিতা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন :—

"প্রতি সনে, দুঃখে বসে,জ্ঞান ধ্বংসে
রচনা না সরে
পদে পদে লোকের কষ্ট আছয় সংসারে।

† হইতে।

কবি বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন :—

"বিদ্যার সমুদ্র জলেজ্ঞান মুক্তার বাস
না মুদিন পাই মুক্তা হইয়া দিনাশ॥"

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার ভয়ে, বিশেষতঃ পাঠকের ধৈর্য্য লেখকের নিকট অপরীক্ষিত থাকাতে, আর একটী মাত্র নমুনা দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব, ওয়ালটার স্কটের—

"Merry it is in the good green wood,
When the navis and marlet are
singing".

প্রভৃতি যদি বিরক্তিজনক না হয়—তবে বাঙ্গালার নিভৃত গ্রাম্যচিত্তের আড়ালে বিকশিত এই শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ অপ্রীতিকর নাও হইতে পারে।

ব্যালেড গীতির মাঝে"বারমাস"ই লোকপ্রিয়, তন্মধ্যে "গোলজান কন্যা" ও বেন মাঝির "বারমাস" নামক কয়েকটী হস্তগত হইয়াছে। "মা বাপের বার মাস" হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি : –

"বৈশাখ মাসেতে মা বাপ হইল নিধন,
পুনর্ব্বার মা বাপের না হৈব দরশন।
নানা পুষ্প ফুটিয়াছে,গন্ধ যায় দূর।
আমারে ছাড়িয়া মা বাপ গেল স্বর্গপুর॥
স্বর্গপুরে যাইয়া মা বাপ সব পাশরিলা,
এবে সে বুঝিলাম মা বাপ নির্ম্মায়া হইলা।
জৈষ্ঠল মাসেতে মা বাপ, রবির বড় জ্বালা
মা বাপের কারণে শরীর কল্যাম কালা।

মা বাপের কর্ম্ম করতে ভাল লেখা নাই।
হেলায় হারালাম মা বাপ কাঁদিয়া না পাই॥"

অনুতপ্ত হৃদয় এইরূপে বার মাসে পিতা মাতার অভাব অনুভব করিয়া ক্রন্দন করিয়াছে।

"আষাঢ় মাসেতে মা বলে দোষ দেব কারে।
কেমনে রহিয়াছে মা বাপ আন্দার মাণ্ডপ ঘরে॥

চতুর্দ্দিকে জলস্থল প্রাণী কম্পে ডরে।
কেমতে রহিছে মা বাপ উচু পানি ঘরে॥"

অপেক্ষাকৃত প্রৌঢ়বয়সে বিদ্বানেরও পিতৃ মাতৃ বিয়োগে যখন অশ্রুসঞ্চার দেখি, তখন করুণ সুর উচ্ছ্বসিত ওই গ্রাম্য কবির হৃদয়-রাগ-রঞ্জিত কথা, পিতৃমাতৃহীনের বেদনা কিরূপ জাগ্রত ও পূর্ণ করিয়া তোলে, সহজেই কল্পনা করা যায়।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, সঙ্গীতের ন্যায় ইহার জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ সুরের সহিত যুক্ত না হইলে ইহার ভূয়িষ্ট সৌন্দর্য্য লুপ্ত হইবে—ব্যালেড্ গীতির ইহাই বিশেষত্ব।

অন্তঃসারহীন, ঝঙ্কারপুষ্ট নব্য পৌরস্ত্য কবিরা কি বার্ণসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই পথে জনসাধারণের হৃদয় মহীয়ান করিয়া তুলিতে পারে না?

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

প্রফুল্ল-প্রশস্তি।

প্রশান্ত অন্তরে বসি হে ঋষিপ্রবর,
অ ফুরন্ত ক্লান্তিহীন উন্নত উদ্যমে
কি ফুল্ল জ্ঞানের পুষ্প বিকশি সুন্দর
সে দলে অমৃত পান করিছ সংযমে।
ভোগ সুখ তুচ্ছ করি, নিত্য চিত্ত ভরি
অক্ষয় অ মূল্য রত্ন করিছ সঞ্চয়!
সে নিধি যতনে তুলি দিলে উপহার
জন্মভূমি পদে তুমি। তুমি বিশ্বময়
ঘোষিলে দেশের খ্যাতি, আলোকি কিরণে
অতীত বিস্মৃত তার গৌরব অমল।
ক্ষুদ্র এই স্তুতি-পুষ্প লবে কি চরণে?
এ নহে সুরভি-স্নাত প্রফুল্ল কমল;
কৃপা করি উপহার লইলে, বহিব
অসীম আনন্দ প্রাণে; চরণে নমিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

মানব সমাজ। (৭)

সমাজের চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম মধ্যে সেবার কথা এক্ষণে বলা আবশ্যক। কাহার সেবা? কিরূপ সেবা? সেবার অর্থ প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়তা করা; যাহাকে সেবা করি, তাহার কোন না কোন প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়তা করি। সুতরাং সামাজিক কর্ম্মের চতুর্থ বিভাগ সেবাও সমাজের সেবা, অর্থাৎ সমাজের প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়তা করা। অপর ত্রিবিধ কর্ম্ম বিভাগও তাহাই। কিন্তু আমার মনে হয় যে, উহারা যেমন উচ্চ জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সেবা তদ্রূপ নহে, সেবা অনেকাংশে ভক্তির উপর নির্ভর করে। যিনি অপর তিন কর্ম্মের অধিকারী নহেন, তিনিও এই চতুর্থ কর্ম্মের অধিকারী। সেবা বড়ই মধুর ধর্ম্ম, যিনি প্রকৃতপক্ষে সেবা করিতে জানেন, তিনি ধন্য। সমাজের সেবার ন্যায় উচ্চ ধর্ম্ম বোধ হয় আর নাই। শূদ্রকে নীচ বলিবে কে? মানব জন্মের সফলতা

সেবকের যেমন সহজ সাধ্য, অধ্যাপক, দেশ-রক্ষক, অথবা ধনোপার্জ্জক ইহাদিগের কাহারই তেমন নহে। কিন্তু সেবা প্রকৃতপক্ষেই সমাজের সেবা হওয়া চাই; তাহাতেই মানবকে ভক্তিমার্গে উন্নত করতঃ মুক্তির অধিকারী করে। সমস্ত নীতির মূলেই সামাজিকতা; সমাজ-রক্ষাই নীতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, সুতরাং যিনি সেবাব্রত সুসম্পন্ন করিতে পারিলেন, তাঁহার ন্যায় সমাজের উপকারী আর কে আছে?

এক হিসাবে দেখিতে গেলে, সকল সেবাই সমাজ সেবা। যে স্বার্থপর নিজের সেবা করিতেছে, সেও প্রকারান্তরে সমাজেরই সেবা করে। তবে তাহার কর্ম্ম মধ্যে কিয়দংশ এরূপ হইতে পারে যে, তাহা সমাজের অনিষ্টকর। সুতরাং স্বার্থ-সেবা সমাজের মঙ্গলজনক এবং অমঙ্গলজনক, উভয় প্রকারই হইতে পারে। মঙ্গলজনক সেবাকেই প্রকৃত সেবা বলিতেছি। তাহাতেই মানবকে ভক্তি পথে অগ্রসর করে এবং ক্রমে সে মানব-জন্মের পূর্ণ সফলতা লাভ করে। সফলতা কি? বন্ধ-মুক্তি। সেবা প্রকৃতই মুক্তিদাতা; কিন্তু ফল-নিরপেক্ষ সেবাই একাগ্র সেবকের প্রধান চিহ্ন। ফল যাহা হয় হউক, সেবাই আমার কর্ম্ম; আমি সেবাই করিব—এই বুদ্ধিতে যিনি সেবায় প্রবৃত্ত হন, তিনিই প্রকৃত সেবক। নিষ্ফলতা তাঁহার কর্ম্মকে রোধ করিতে তো পারেই না, বরং কর্ম্মের প্রবর্ত্তকও হইতে পারে। নিষ্ফলতা তাঁহার হৃদয়ে জড়ত্ব আনিতে পারে না; আশঙ্কা তাঁহাকে দমিত করিতে সক্ষম হয় না। কারণ তিনি কর্ম্ম করিবেনই। কর্ম্ম করাই সেবকের ধর্ম্ম, সেবাই তাঁহার উদ্দেশ্য, সুতরাং কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না, একথা সহজেই বুঝা যায়।

কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিষ্ফল কর্ম্মীর পরিণামে একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। আমি বলি, কখনই না। এক সমাজ অপর সমাজের সহিত সংশ্রব-শূন্য হইয়া বাস করা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ধ্বংস তাহার পরিণাম নহে। সে সমাজ স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই ধনে বংশে বাড়িয়া উঠে। তাহার বিপক্ষতা করিবার কেহই নাই; কেবল একমাত্র প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হওয়া সম্ভব। কিন্তু জীব মানব পদে উন্নত হওয়ার পর এবং মানব নামের যোগ্য হওয়ার পর, প্রকৃতির বিপক্ষতায় কখনও ধ্বংস হয়ও নাই, হইতে পারেও না। সে এক দিকে যেমন প্রকৃতির দাস, অন্য দিকে তেমনি প্রকৃতির প্রভু।* প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিধি মানবের নিকট ব্যর্থ হইয়াছে। যাহা হউক, প্রায় সকল মানব সমাজই অপর সমাজের সহিত সংশ্রব যুক্ত। সমাজে সমাজে সংঘর্ষ একরূপ অনিবার্য্য। তাহা হইলেও কেবল সংঘর্ষের ফলে ধ্বংস কখনই আসিতে পারে না। কোন সমাজ অপর সমাজকে টিপিয়া মারিতে পারে না। পারে কেবল পরবশতা, যদি তাহার ফলে জননহীনতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এ সকল কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং আমার নব প্রকাশিত "পরবশতা" নামক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

সমাজ সেবার যদি কোন সার্থকতা থাকে, তবে তাহার অর্থই এই কুফল নিবারণ করা। যে বনে সিংহ বাস করিতেছেন, তথায় মৃগকুল নির্ম্মূল হয় নাই, যে নদীতে কুম্ভীর বাস করিতেছে, তথায় সফরীকুল বিনষ্ট হয় নাই। কেবল বল প্রয়োগ দ্বারা এক সমাজ অপর

* Man is nature's rebel ** her insurgent son. Kingdom of man.

সমাজকে নির্ম্মূল করিতে কখনও পারে নাই। আহারের সদ্ভাব ও বংশ বিস্তৃতি, এতদুভয় থাকিলেই জীব টিকিয়া গেল; সুতরাং সেবার প্রধান লক্ষ্যই এই দুইটী। সেবাব্রতে এই দুইটী লক্ষ্য থাকিবেই।

কিন্তু সমাজের যে চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটীরই চরম উদ্দেশ্য মুক্তি। মুক্তিই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সুতরাং ধর্ম্মপথই মানবের একমাত্র অবলম্বনীয়। ধর্ম্ম শব্দ আমি প্রচলিত বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করিতেছি। ধর্ম্মহীন সমাজ টিকিতেই পারে না। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দেশরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য এবং সেবা, এ সকলই ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গ। সেবাকেও ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গরূপেই গ্রহণ করা আবশ্যক। তাহাতে হৃদয়ের বল বৃদ্ধি হয়, কর্ম্মে উৎসাহ হয়, অদম্য তেজে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়। সেবার প্রবর্ত্তক ভক্তি, তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। কিন্তু এস্থলেও জ্ঞান বিজ্ঞানের একেবারেই আবশ্যকতা নাই, এমত নহে। বিজ্ঞান বলে, সেবার পথ সহজ করিয়া লওয়া যায়। কষ্টসাধ্য সেবা অনায়াসে এবং কালব্যাপী সেবা অল্প কালেই সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং সমাজের চতুর্ব্বিধ কর্ম্মেই জ্ঞানের অনুশীলন আবশ্যক হইতেছে। সেবকেরও জ্ঞানানুশীলন কর্ত্তব্য, নতুবা ধর্ম্ম হানি হয়। তাই সমাজ রক্ষার বিঘ্ন উপস্থিত হয়।

সমাজের উৎপত্তি ও পুষ্টি ব্যক্তির সহিত তুলনীয়। ব্যক্তির দেহ ও সমাজের দেহ প্রায় একই নিয়মে পরিচালিত। ব্যক্তির বিভিন্ন দেহাংশ আপন আপন কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু সমষ্টি জীবন ব্যাপারেরও অনুকূল হইতেছে। সমাজেরও তাহাই হওয়া আবশ্যক। সমাজের প্রত্যেক অংশ আপন কর্ম্ম সম্পন্ন করুক; কিন্তু সমষ্টিতে সমাজ স্থিতির অনুকূল হওয়া চাই। নচেৎ সমাজ রক্ষা হয় না। যে সকল জীব সমাজ বদ্ধ হয় নাই, তাহারা কেবল আপনার প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য রাখে। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীবের তদ্রূপ করিলে চলেই না। পরস্পরের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই সমাজ। মানব বোধ হয় কোন দিনই সমাজ শূন্য ছিলনা। সমাজ-বন্ধন যতই শ্লথ হউক, মানব বোধ হয় কখনই অপরের প্রয়োজনের দিকে একবারে লক্ষ্যহীন ছিল না। উচ্চশ্রেণীর বানরগণের ব্যবহার হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ক্রমে মানবের প্রয়োজন যত বাড়িতে লাগিল, সমাজবন্ধনও তত দৃঢ় হইতে লাগিল। পরে অসাধারণ বংশ বৃদ্ধি হেতু এবং আহারের অসদ্ভাব বশতঃ মানব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। তখন বিভিন্ন ভূভাগের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া মানব বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়া গেল। কালক্রমে প্রত্যেক জাতি মধ্যেও বিভিন্ন সমাজ বন্ধন প্রবর্ত্তিত হইল। জীবের একটী ক্ষুদ্র বংশরক্ষক কোষ যেমন অপর বংশ-রক্ষক কোষের সহিত মিলিত হইয়া শতধা সহস্রধা বিভক্ত হয় এবং ক্রমে জীব দেহ গঠিত করেন, ঐ জীব দেহ যেমন নানা অংশে বিভক্ত হইয়া নানা কর্ম্ম সম্পন্ন করে, সমাজও তাহাই। কিন্তু যত দিন দেহ জীবিত থাকে, তত দিন সেই সকল অংশ পরস্পরের সহায়তা করে। আর, দেহ যখন মরিয়া যায়, তখন সেই পূর্ণগঠিত দেহ পচিয়া যেমন নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়, সমাজও তাহাই। সমাজ দেহ পূর্ণ গঠিত হইলে যত দিন সজীব থাকে, তত দিন তাহারও প্রত্যেক অংশই সমাজ স্থিতির অনুকূল, কিন্তু

সমাজ জীবন শূন্য হইলে এরূপ ভাবে খণ্ড খণ্ড ও বিভক্ত হইয়া যায় যে, কোন অংশ অপর অংশের অনুকূল হয় না। ভিন্ন ভিন্ন অংশের অনুকূলতা রক্ষা হইলেই সমাজের জীবন রক্ষা হইল; নচেৎ সমাজ ধ্বংস মুখে পতিত হয়। এই অনুকূলতা রক্ষা করাই প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য এড়াইবার উপায় নাই। এই কর্ত্তব্য সাধনের মূল মন্ত্রই, ত্যাগ। ত্যাগেই সমাজের প্রতিষ্ঠা, ত্যাগেই তাহার পুষ্টি, ত্যাগেই তাহার রক্ষা। যে জীব সমাজবদ্ধ নহে, সে আপনার ইচ্ছা-মত সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে। কিন্তু সমাজবদ্ধ জীব পরার্থ সাধনের নিমিত্ত সেই স্বাধীনতা অল্লাধিক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহারই নাম ত্যাগ, ইহারই নাম সংযম। ইহাই সকল ধর্ম্মের মূল, ইহাই সমাজ সেবার আদি, মধ্য ও শেষ।

সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। এক মতে মানব পূর্ণ সভ্যাবস্থায় সৃষ্ট হইয়াছে; অন্যমতে মানবের প্রথমাবস্থা অসভ্যাবস্থা। প্রথম মতকে অবনতিবাদ এবং দ্বিতীয় মতকে উন্নতিবাদ বলা যাইতে পারে। মানব-তত্ত্ব শাস্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থায় অবনতিবাদ স্বীকার করা যায় না। মানব অনুন্নত অবস্থা হইতে কালসহকারে উন্নত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তই এক্ষণে প্রকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। বিবর্ত্তনবাদ উন্নতিবাদেরই নামান্তর। নিম্ন প্রাণী হইতে বিবর্ত্তিত হইয়া মানবের আবির্ভাব। উহা এক স্থানে অথবা একাধিক স্থানে হইয়া থাকুক, মানব প্রথমতঃ পশুভাবাপন্নই ছিল। অপর পশুর মৃত দেহে তাহার দেহ পোষণ হইত। কখনও বা মৃগয়ালব্ধ জীব-দেহ অপক্ক অবস্থাতেই আহার করিত। এই সময়কে মৃগয়া-যুগ বলা যাইতে পারে। মৃগয়ার নিমিত্ত একাধিক ব্যক্তি মিলিত হইয়া ঐ বর্ব্বর অবস্থাতেও একটা মোটামুটী সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিল। মৃগয়া-কালে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব দেখাইতে পারিতেন, তিনি ঐ সমাজের অধিপতি হইতেন; অন্তেরা তাঁহার অনুগত থাকিত। সে সময়ে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন সমাজ মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত না হইত, এমত নহে। এই সংঘর্ষের ফলে অনেক সময় উভয় সমাজ একীভূত হইয়া যাইত। তাহাতেও বীরত্ব ও কৌশল অনুসারে আধিপত্য স্থাপিত হইত। অধিপতি দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রাধান্ত বশতঃ স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। কিন্তু মানসিক শক্তি অপেক্ষা দৈহিক শক্তিরই অধিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। সুতরাং ঐ সমাজে তাহারই আদর অধিক হইত। অদ্যাপিও বীরের আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সমাজ অতীব জ্ঞানোন্নত না হইলে মানসিক শক্তির আদর হয় না। এই যুগে মৃগয়াই দেহ ধারণের উপায় ছিল। কিন্তু এই উপায় অতি অনিশ্চিত। সুতরাং কালক্রমে ভূমি-কর্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করার প্রথা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইল। এই সময়কে কৃষি-যুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে মানব সভ্যতায় অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছিল। এবং বিভিন্ন সমাজে বংশ বৃদ্ধি হওয়াতে মানব সমাজ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া আপনাপন সুবিধা মত সমাজ পরিচালিত করিয়াছে। এই সময়ে সমাজে অল্লাধিক শান্তি স্থাপিত হইয়াছে; এবং সভ্যতায় উন্নতি সহকারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। জ্ঞান চর্চ্চাও এই সময়েই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি মধ্যে ও সমাজ মধ্যে অভাব

পূরণার্থ যে বিনিময়-প্রথা প্রচলিত হয়, তাহাতে আর সামাজিক প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় না। সুতরাং মুদ্রা প্রচলিত হয়। কৃষিজাত দ্রব্যাদি আবশ্যকের অতিরিক্ত পরিমাণ উৎপন্ন হওয়ায় ক্রমে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়কে বাণিজ্য-যুগ বলা যাইতে পারে। উপরে যেরূপ ত্রিবিধ যুগ-বিভাগ করা হইল, তাহা ক্রমোন্নতিবাদের পরিচয়-সূচক। তাহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, পূর্ব্বোক্ত যুগের অবসান হইবার পর শেষোক্ত যুগ প্রবর্ত্তিত হয়, কারণ পর যুগেও পূর্ব্ব যুগের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। বর্ত্তমান সময়কে বাণিজ্য-যুগ বলা যাইতে পারে; কিন্তু এক্ষণেও কৃষি এবং মৃগয়া পূর্ণ ভাবেই চলিতেছে। বাণিজ্য যুগের ইতিহাস এক দিকে যেমন সভ্যতার পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনি বর্ব্বরতার পরিচায়ক। এ যুগে বিভিন্ন সমাজের সংঘর্ষ প্রধানতঃ বাণিজ্য উপলক্ষেই হইয়া থাকে। অতিরিক্ত বাণিজ্যলিপ্সা সংঘর্ষ-জনিত লোকক্ষয় করিতেছে; আবার বাণিজ্যে অতিমাত্রায় লিপ্ত হইলে যে সামাজিক চঞ্চলতা উপস্থিত হয়, তাহাতে জননহীনতা উৎপন্ন করে। এই হেতু সমাজ ধ্বংস মুখে পতিত হয়। অতিরিক্ত বাণিজ্যে ধর্ম্মহীনতা আনয়ন করে, সুতরাং সমাজ টিকিতে পারে না।

শ্রীশশধর রায়।

ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য।

ভূমিকা।

যে ভগবান স্বীয় মঙ্গল করুণাবর্ষণে মূককেও বাচাল করিয়া তুলেন, সেই ভগবানই আমাকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য লিপিবদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাই এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, নতুবা এবিষয়ে আমার অক্ষমতার গভীরতা আমি যতদূর জানি, তত আর কে জানিবে? আজ প্রায় পনেরো বৎসরের উর্দ্ধকাল হইবে, আমি যখন আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক পদে অধিরূঢ় ছিলাম, সেই সময়ে এই ইতিহাস লিখিবার সংকল্প হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল। সেই সময়ে যে কয়েকখানি গ্রন্থ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস নামের গর্ব্বিত অধিকার বিন্দুমাত্র দাবী করিতে পারিত, সেই গুলির প্রত্যেকটীই বলিতে গেলে ইতিহাসের ইতিহাসত্ব-নাশক ঘোর পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট। সহসা নিরপেক্ষভাবে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যবিবরণ লিখিবার জন্য ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইলাম।

ব্রাহ্মসমাজ এখনও শতাব্দী পার হয় নাই, ইহার মধ্যে আবার তাহার ইতিহাস কি? অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্মসমাজ-সমূহের সহিত বয়স তুলনা করিলে ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত শিশু বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের পরিমাপ করিলে তাহা অন্যান্য যে কোন ধর্ম্মসমাজের সহিত সমান দাঁড়াইতে পারিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গের এবং সুতরাং সমগ্র ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রত্যেক অংশের মূলে যে ব্রাহ্মসমাজ, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, বোধ হয়। এই কারণে ব্রাহ্মসমাজ তাহার কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করাইবার অধিকার প্রার্থনা করিতে পারে।

আদেশ প্রাপ্তির কালেই আমি এই সুবৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম এবং অচিরে ইতিহাসের একটী কঙ্কাল রচনা করিয়া পিতামহ দেবকে শুনাইয়াছিলাম। তিনিও তাহা অনুমোদন করিলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে তাহা সবেমাত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে ভগবানের হস্ত নানা ঘটনা উপলক্ষে তৎপ্রকাশ বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মঙ্গলহস্তের স্পর্শ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কিছু দুঃখিত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, তাহা প্রকাশ হইলে পক্ষপাত-দোষ অতিক্রম করিতে পারিত না। তাহার পর এই ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে লিখনবিষয়ে সময়ে সময়ে ভগবান আমাকে যেরূপে পরিচালিত করিয়াছেন, আমি সেই ভাবেই তাঁহারই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সাধ্যমত নিরপেক্ষভাবে এই ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আমার এই প্রবন্ধে নিঃসঙ্কোচে আমার হৃদয়ের কথা বলিয়া গিয়াছি, তজ্জন্য যাহা কিছু ত্রুটী বলিয়া বিবেচিত হইবে, আশা করি, পাঠকবর্গ সেগুলি ক্ষমা করিবেন। ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদিগের মধ্যে অনেকেই আমার আত্মীয় বা বন্ধু। তাঁহাদিগের কার্য্য সম্বন্ধে যদি প্রশংসা বা নিন্দা করিয়া কোন কথা বলি, আশা করি, তাঁহারা তাহা ব্যক্তিগত ভাবে গ্রহণ করিবেন না। আমি নিজেকে জনসাধারণের একজন এবং তাঁহাদিগকে আত্মীয়তা ও বন্ধুতার বহিঃস্থিত সাধারণের মানুষ ধরিয়া তাঁহাদের কার্য্যের আলোচনা করিয়াছি। এবিষয়ে আমার মন্ত্র :—

"ওঁ ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু
বক্তারং বক্তারমবতু মাং।"

অবশেষে সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট বিনীত প্রার্থনা যে, যদি আমার প্রবন্ধসমূহে কোন ভুলভ্রান্তি দৃষ্ট হয়, তাহা তাঁহারা যেন অবিলম্বে পৃথক্ পত্রের দ্বারা অথবা এই পত্রিকা-সাহায্যে সেই ভ্রম প্রদর্শন করেন। তাহাতে যে তাঁহাদের নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব, তাহা বলা বাহুল্য।

প্রবন্ধগুলির কয়েকটী মাত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু পাঠকবর্গের নিকট গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ আকারে ধারণ করিবার জন্য আমরা সেগুলিও পুনরায় প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিব না।

মুখবন্ধ।

প্রথম অধ্যায়—রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা।
রক্ষণশীলতা—উন্নতিশীলতা—সামঞ্জস্য।

রক্ষণশীলতা।

সাধারণ মানবের স্বভাবই এই যে পুরাতন কোন কিছুর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখিলেই তাহারা অস্থিরতা প্রকাশ করে। পরিবর্ত্তনটা ভাল কি মন্দ, তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজনই অনুভব করে না। পরিবর্ত্তন মাত্রকেই প্রথম হইতেই মন্দ বলিয়া সাধারণ লোকে ধারণা করে। এমন কি, মন্দ অভ্যাসও কালক্রমে চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় হইয়া উঠে—তখন যাহারা তাহার কুফল ভোগ করে, তাহারাই তদ্বিরুদ্ধে পরিবর্ত্তন সংঘটনের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠে। এই রক্ষণশীলতা অবশ্য ভগবানের সৃষ্টির রক্ষার এক অপূর্ব্ব কৌশল। ইহার অভাবে সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইত। মনুষ্য-সমাজে এই নিয়ম কার্য্য করিতে বিরত থাকিলে মানবের সমাজরক্ষণ এবং তৎসঙ্গে সামাজিক উন্নতি প্রভৃতি কিছুরই সম্ভাবনা থাকিত না, প্রত্যুত মানবকুলের অস্তিত্বই দেখিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ।

রক্ষণশীলতা একদিকে জড়েরও স্বাভাবিক ধর্ম্ম, অপরদিকে ইহা জীবদিগেরও জীবনরক্ষার এক প্রধান সহায়। ইহারই ফলে যখন কেহ আমাকে সজোরে আঘাত করে, আঘাতকারীও তখন আমার নিকট হইতে ঠিক তত জোরে প্রতিঘাত পাইয়া থাকে। এই রক্ষণশীলতার গুণেই আমাদের জীবনের প্রতি এত মায়ামমতা ও মৃত্যুর প্রতি এত গুরুতর ভয়।

এই রক্ষণশীলতা ও প্রত্যেক জীবজন্তুর কর্ম্মবেষ্টনের মধ্যে একটা সীমা আছে। মনুষ্যও এই নিয়মের ব্যতিরেক-স্থান নহে। রক্ষণশীলতার সেই সীমা অতিক্রম করিলেই মনুষ্য নির্জ্জীব জড়পদার্থে পরিণত হয় বলিলেও চলে। এই প্রকার নির্জ্জীব মানব নিজের মনুষ্যত্বের কেন্দ্রভূমি হারাইয়া পরিধিচক্রে হাতড়াইতে থাকে। সে নিজের মঙ্গলামঙ্গল স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারে না, নিজের উন্নতি কিসে হয়, জানে না, কেবল অপর পাঁচ জনের মুখাপেক্ষা করিয়া সুখে দেহযাত্রা নিষ্পন্ন করিতে পারিলেই কৃতার্থ হয়। এই সকল মানবের মূলমন্ত্র "আপনারা পাঁচজনে যাহা করেন।" এই সকল অতি-রক্ষণশীল ব্যক্তি মানব নামের অনুপযুক্ত সামাজিক জীবমাত্র। মোটের উপর দেখা যায় যে, যাহারা যত রক্ষণশীল, তাহারা ততটা অপর পাঁচজনের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, ততটা সামাজিকতার বশীভূত হইয়া পড়ে। তাহার কারণ এই যে, নিজেকে কোন বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে হইবে, ইহা ভাবিলেই তাহারা মুহ্যমান হইয়া পড়ে। এই কারণে সামাজিকতা বা অপর পাঁচজনের অনুষ্ঠিত বা উপদিষ্ট আচার-ব্যবহার রক্ষা করিবার অপর নামই রক্ষণশীলতা। এই প্রকার সামাজিকতায় যে যথেষ্ট দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়, তাহা বলা বাহুল্য।

অতিরিক্ত সামাজিকতার ফলের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আমাদের এই ভারতবর্ষ। যে স্বাধীনতার বলে প্রাচীন ভারত উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই স্বাধীনতা হারাইয়া শত শত বৎসর পরাধীনতার পেষণ-যন্ত্রের নিম্নে পড়িয়া ভারতবাসী এরূপ নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন তাহাদিগকে জড় সমাজিক জীব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ভারতে ইংরাজ অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ভারতবাসীগণ, বিশেষত বঙ্গবাসীগণ, এই জড়ত্বের চরম সীমায় উঠিয়াছিল—তখন তাহারা নিজের মঙ্গলামঙ্গল, জগতের হিতাহিত চিন্তা করিয়া কার্য্য করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কথায় কথায় পিতৃ পিতামহ ও অপর পাঁচজনের দোহাই দিয়া গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় চিরপ্রচলিত আচার ব্যবহার, কার্য্যকলাপ, ভাল হউক মন্দ হউক, অনুষ্ঠান করিয়া নিজেকে সুখী বোধ করিত। ঈশ্বরের নিয়মে মানব রাজ্য যেমন স্বেচ্ছাচার চিরাধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, সেইরূপ চিরজড়ত্বও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। মঙ্গলময় পরমেশ্বর মনুষ্যকে কেবল জড় পদার্থ করিয়াই গড়েন নাই যে, সে কেবল রক্ষণশীল ও সামাজিক জীবমাত্র হইয়া স্থির থাকিবে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে আজ মানব জাতি সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইত না—বদ্ধ পুষ্করিণীর জলের ন্যায় সেই রক্ষণশীলতা ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর হইয়া মানবকুলের ধ্বংস সাধন করিত। যখন ভারতবাসীগণ জড়ত্বের চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে ভারতের পূর্ব্ব গগনে জড়ত্ব নাশের দুন্দুভি বাজিয়া

উঠিল—শুভক্ষণে ইংরাজজাতি ভারতে, রাজ পদে অভিষিক্ত হইলেন—স্বাধীনতার, আত্ম-নির্ভরের অন্তর্হিত স্রোত কোথা হইতে আসিয়া পুনঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। কোথা হইতে এক দরিদ্র বঙ্গবাসী রাজা রাম-মোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই নূতন প্রবাহিত স্বাধীনতার জয়কেতু-রূপে ভারতবাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন।

উন্নতিশীলতা।

রক্ষণশীলতার বিপরীত হইল উন্নতি-শীলতা। উন্নতিশীল ব্যক্তি অপর পাঁচজনের কথার উপর নির্ভর না করিয়া আপনার উপর নির্ভর করত নিত্য নূতন বিষয়ের প্রতি ধাব-মান হয়। প্রাচীনের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা নবীনের আসক্তিই তাহাকে অধিকার করিয়া থাকে। সে নিজে যাহা ভাল মনে করে, তাহাই সম্পন্ন করিবার চেষ্টা পায়। আত্মনির্ভরশীল বলিয়া সে সামাজিকতার অপেক্ষা রাখে না। উন্নতিশীলতার সর্ব্ব প্রধান অঙ্গই হইল আত্মনির্ভর। কিন্তু রক্ষণশীলতার ন্যায় উন্নতিশীলতারও একটী সীমা আছে। সেই সীমার বাহিরেই স্বেচ্ছা-চার। অতিরিক্ত সামাজিকতা বা রক্ষণ-শীলতায় যেমন দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়, সেই-রূপ অতিরিক্ত উন্নতিশীলতায় স্বেচ্ছাচার আসিয়া পড়ে। সীমার ভিতরে আত্মনির্ভরের ভাব হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বল প্রদান করিয়া থাকে, এই বল প্রভাবেই উপনিষদ্‌কার ঋষিরা ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন।

অতিরিক্ত উন্নতিশীলতার ফলের জাজ্বল্য-মান দৃষ্টান্ত ফরাসিবিপ্লবের সময় ফ্রান্সের অবস্থা। সেই এক কাল, যখন ফ্রান্সের অধিবাসীগণ সকলেই সামাজিকতার বাঁধ সম্পূর্ণ তিরোহিত করিয়া একেবারেই উন্নতির চরম শিখরে অধিরোহণ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। ফলে দাঁড়াইল, অশ্রুতপূর্ব্ব স্বেচ্ছাচর। ভগবানের রাজ্যে সেরূপ ভীষণ স্বেচ্ছাচার চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ইহার প্রতিবিধানের সূত্র ধরিয়া রক্ষণশীলতা আসিয়া সামঞ্জস্যের পথ দেখাইয়াছিল। স্বেচ্ছা-চারী ফ্রান্স বলিয়াছিল, "ধর্ম্ম চাহি না," কিন্তু সেই ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে ফ্রান্স স্বেচ্ছাচারের হস্ত হইতে বহুল পরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

সামঞ্জস্য।

রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার সামঞ্জস্য-পথই প্রকৃত উন্নতির পথ, প্রকৃত মঙ্গলের পথ। উপযুক্ত কাল ও ক্ষেত্র বুঝিয়া যিনি এই সামঞ্জস্য দেখাইতে পারেন, তিনিই জগ-তের প্রকৃত উপকারক। যাঁহারা রক্ষণ-শীলতার মোহে পড়িয়া আত্মার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া বিলাস মোহে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকেন, অথবা যাঁহারা উন্নতিশীলতার দোহাই দিয়া স্বেচ্ছাচারকে বন্ধু বোধে আলি-ঙ্গন করেন, তাঁহাদের কেহই এই সামঞ্জস্য পথের আবিষ্কারে সমর্থ হয়েন না। যে সকল মহাপুরুষ রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতা, উভয়-কেই আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, উভ-য়েরই মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া-ছেন, তাঁহারাই এই সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম এবং ইহাতেই তাঁহাদের মহাপুরুষত্ব। তাঁহারা নিজের সুখকে গণনার মধ্যে আনেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে পরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না, প্রতি কথায় সামাজি-কতার নিকট অবনত-মস্তক হইয়া চলিতে হয় না। তাঁহারা পুরাতন প্রথা প্রভৃতির

মধ্যে ভাবটুকু রক্ষা করিয়া নূতন যাহা কিছু ভাল, যাহাও বিচার পূর্ব্বক অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। তাঁহারা যেমন একদিকে রক্ষণশীল, অপরদিকে সেইরূপ আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীনতার মূর্ত্তিমান অবতার।

মহাপুরুষগণ মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিলে ক্রমে জনসাধারণ তাহা ধীরে ধীরে গ্রহণ করিতে থাকে। সাধারণত এক একটী মহা পুরুষের এক একটী মূলভাব থাকে; সেই মূল ভাব যখন অপর কোন ব্যক্তির হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি সেই মহাপুরুষের পথাবলম্বী হয়। এইরূপে যখন অনেক গুলি ব্যক্তি কোন মহাপুরুষের মতানুসারী হয়, তখন সেই মহাপুরুষের পরিধিস্বরূপে একটী সমাজ গঠিত হইল বলা হইয়া থাকে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী প্রভৃতি সকল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহারা যেমন ন্যূনাধিক পরিমাণে সূর্য্যের সহিত সমধর্ম্মী, সেইরূপ যখন মহাপুরুষের ভাবকেন্দ্র হইতে ভাবকণা যাইয়া তাঁহার সমাজস্থ ব্যক্তিগণের ভাব সকল গঠিত করিয়া দেয়, জীবনকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নবতর শক্তি প্রদান করে, তখন বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক সমাজ তাহার কেন্দ্রস্থল মহাপুরুষের সহিত ন্যূনাধিক পরিমাণে সমধর্ম্মী হইবে।

রাজা রামমোহন রায় একজন মহাপুরুষ, কারণ তিনি রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার মধ্যে সামঞ্জস্যের পথ আবিষ্কার করিয়া জনসাধারণের জন্য তাহা উপযুক্ত করিতে পারিয়াছেন। এই সামঞ্জস্যই হইল তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের মূলপ্রাণ। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে তাঁহারই মতানুসরণ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। রাজা রামমোহন রায় হইতেই ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি, সুতরাং সাধারণত ব্রাহ্মসমাজ মাত্রেই তাঁহার ভাবচ্ছায়া প্রভাব বিস্তার করিবেই। কেবল রামমোহন রায় কেন, যে সকল মহাপুরুষের অভ্যুদয়ে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি ও স্থিতি, তাঁহাদের সকলেরই ভাবচ্ছায়া ব্রাহ্মসমাজকে গঠিত করিয়াছে এবং করিবে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লিখিতে গেলে এই সকল মহাপুরুষগণের ভাবকেন্দ্রে যাইয়া দেখিতে হইবে যে, তাঁহাদের জীবন কি ভাবে গঠিত; তবে তাঁহাদের পরিধিস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ এবং তাহার উন্নতি ও অবনতির কারণ বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা থাকে। ইতি—প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিন্দুধর্ম্মের সমন্বয় ভাব।

হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা, অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়। সুতরাং হিন্দুধর্ম্মে বিরোধের ভাবছাড়া আর কি থাকিতে পারে? ইহাই হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকের বদ্ধমূল ধারণা। এই ধারণাটী দূর করিতেই যে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধটীর অবতারণা করিতেছি, তাহা ইহার নামকরণের দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে।

আমরা যে হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতার উল্লেখ করিতেছি—অনেকে বেদেই তাহার মূল দেখিতে পান—সুতরাং বেদ হইতেই যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভিন্ন মতের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে। বেদের পর স্মৃতিতেও সেই ভিন্ন মতেরই প্রতিধ্বনি—তৎপন্ন ঋষিদিগের মুখেও তাহারই অনুবাদ। এই

সমস্ত প্রকাশ করিবারই জন্য নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ বাক্যটীর প্রচার হইয়াছে—

"বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।"

সুতরাং ঋষিগণ যে পুরাকালেই বিরোধের ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহাতে একটী সামঞ্জস্যের ভাব আনয়ন করিবার জন্য ইঁহাদিগকে প্রথম হইতেই বিশেষ চেষ্টান্বিত দেখিতে পাই। এই চেষ্টা কোন্ পথ অনুসরণ করিয়াছিল, এখানে আমরা তাহা প্রদর্শন করিবারই প্রয়াস পাইব।

বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি বহু দেবতাই পূজিত হইয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে কাহাকে প্রাধান্য দিতে হইবে, এই সন্দেহ স্বতঃই আমাদের মনকে আন্দোলিত করিতে পারে। মহর্ষিগণ তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া তাহার নিরাকরণ করিয়া গিয়াছেন। যে বেদে পূর্ব্বোক্ত দেবতা সকল ভিন্ন ভিন্ন ঋষি দ্বারা স্বস্ব ইষ্টদেবরূপে পূজিত হইয়াছেন, সেই বেদেরই মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যের মধ্যে সাম্য বিধান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিয়াছেন :—

"একং সৎবিপ্রা বহুধা বদন্তি ইন্দ্রং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥" ঋগ্বেদ। বস্তুতঃ বেদের প্রকৃত মর্ম্মানুধাবন করিলে বেদে বহুত্ববাদ নির্দ্দেশিত হইয়াছে বলিয়া কখনও ধারণা হইবে না, বরঞ্চ একত্ববাদ নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই নিশ্চিত ধারণা জন্মিবে। পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্য মোক্ষমূলর বেদের এই মূল তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়াই ইহাকে Henotheism অর্থাৎ বহুত্বসংসৃষ্ট একত্ববাদ, এই নামে বিশেষিত করিয়াছেন। তিনি ইহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন,তাহার সংক্ষেপার্থ এই যে, বেদে বহু দেব স্তুত হইলেও, যখন যে দেবতা স্তুত হইয়াছেন,তিনি পরম দেবতা স্বরূপে স্তুত হইয়াছেন—পরম দেবতার সমস্ত মাহাত্ম্যই তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং নামতঃ ভিন্ন হইলেও মূলতঃ তাঁহাদের কোন ভেদই নাই। গ্রীসের বহু দেববাদে এই সাম্যভাব না থাকায় তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে—বেদের বহুদেববাদ এই সাম্য ভাবের দ্বারা এখনও জীবিত রহিয়াছে।

বেদের পর উপনিষদে এই একত্ববাদ আরও পরিস্ফুট। বেদে যে একত্ববাদ স্থল বিশেষে মাত্র ব্যক্ত, উপনিষদে তাহা সর্ব্বত্রই পরিব্যক্ত। বেদে যে একত্ববাদ বিক্ষিপ্ত, উপনিষদে তাহাই একত্রভূত। বেদে যে একত্ববাদের মাত্র প্রসঙ্গ—উপনিষদে তাহাই প্রধান প্রতিপাদ্য। বেদের সত্যকে বিশদ করিয়া উপনিষদ পুনঃ পুনঃ জগৎ সমক্ষে অমূল্য অপূর্ব্ব এই সার সিদ্ধান্তের ঘোষণা করিয়াছেন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটী মাত্র তত্ত্ব ব্যতীত আর তত্ত্বান্তর নাই। এই তত্ত্বটী কি, তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য ঋষিরা দৃঢ়তাসহকারে জ্ঞাপন করিয়াছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই সমস্তই ব্রহ্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই।' বেদান্তদর্শনে উচ্চবিচার প্রণালীতে উপনিষদেরই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মুক্তিই হিন্দুর দর্শন সকলের প্রধান লক্ষ্য। বেদের মতবাদই যে দর্শন সকলের অবলম্বন—বেদের প্রামাণ্য স্বীকার দ্বারাই তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। বেদের অবিরোধিভাবে দর্শন সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে বলিয়াই সমস্ত হিন্দুধর্ম্মে দর্শন সকলের প্রভাব এরূপ বিস্তৃত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত এই

জন্য দর্শন মত সকল সম্পূর্ণরূপে অনুস্যূত হইয়াছে। দার্শনিক সামঞ্জস্য আমাদের উপাসনার ঐক্যভাবেরই অনুকূল বলিয়াই অনেক সময় দার্শনিক সংজ্ঞার সহিত আমাদের ইষ্টদেবতার অভেদ দেখিতে পাই—যথা বেদান্তের 'ব্রহ্ম,' 'মায়া' আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের "পরব্রহ্ম," "মহামায়া"—সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ—আমাদের পার্ব্বতী, পরমেশ্বর, শিব ও শক্তি, এবং ন্যায়ের পরমাত্মা আমাদের 'পরমেশ্বরের' সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন।

পুরাণে 'ব্রহ্মা,' 'বিষ্ণু' 'মহেশ্বরই' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের মধ্যে যেন আমরা সমস্ত দেবভাবেরই বিশ্লেষণ প্রাপ্ত হই। তাহাতেই ইঁহারা "ত্রিমূর্ত্তি" বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। তিনের নামের দ্বারা যেন ইঁহাদের অভেদভাবই প্রখ্যাপিত হইতেছে—ইঁহারা তিনই এক এবং একই তিন। বস্তুতঃ পুরাণে এই অভেদবাদ প্রতিপাদিত করিবার বহুল প্রয়াসই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত তিন দেবতার উপাসকদিগকে পুরাণে আমরা তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত দেখিতে পাই এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে ইঁহাদের মধ্যে ঘোরতর বিরোধের ভাবও বর্ত্তমান দেখিতে পাই। "লিঙ্গ" ও "শিবপুরাণ" পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে "ব্রহ্মবাদী" ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এক সময়ে প্রাধান্য লইয়া বিষম শত্রুভাব উপস্থিত হয় এবং বিরোধ মীমাংসার জন্য তাঁহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়, কিন্তু এই সময়ে শৈবধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তন্মধ্যবর্ত্তিতায় যুদ্ধের নিবৃত্তি হয়। এখানে আমরা শিবপুরাণ হইতে একটু বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

এবমেব বিবাদোঽভূদ্ ব্রহ্মবিষ্ণোঃ পরস্পরম্।
অভবচ্চ মহাযুদ্ধং ভৈরবং রোমহর্ষণম্ ॥৩১
মুষ্টিভির্নিঘ্নতোস্তীব্রং রজসা বদ্ধবৈরয়োঃ।
তয়োর্দর্পাপহারায় প্রবোধায় চ দেবয়োঃ ॥ ৩২
মধ্যে সমাবিরভবল্লিঙ্গ মৈশ্বরমদ্ভুতম্।
জ্বালামালা সহস্রাঢ্যম প্রমেয় মনোপমম ॥ ৩৩
শিবপুরাণ বায়বীয় সংহিতা উত্তরভাগ ২৭শ অধ্যায়।

বৈদিক ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াই ব্রহ্মবাদী ও বৈষ্ণবগণ সাম্প্রদায়িক বিরোধে মত্ত হইয়াছিলেন, একণে শৈবধর্ম্ম আসিয়া বৈদিকধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া দিলে উভয় সম্প্রদায়ই আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, ধর্ম্মের উদারভাব উপলব্ধি করতঃ বিবাদ হইতে নিরস্ত হইলেন। শিবপুরাণের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে ইহা আরও স্পষ্টীকৃত হইবে :—

"তয়োস্তত্র প্রবোধায় তমোঽপনয়নায় চ।
লিঙ্গেঽপিমুদ্রিতং সর্ব্বং যথাবেদৈ রুদাহৃতম ॥২৬
তদ্দৃষ্ট্বা মুদ্রিতং প্রসাদাম্নিশিনস্তদা।
প্রশান্ততমসৌ দেবৌ প্রবুদ্ধৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ২৭
শিবপুরাণ বায়বীয় সংহিতা উত্তর ভাগ,২৭ অঃ।

কালে বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিষম বিরোধ সংঘটিত হয়। বিরোধমূলে পূর্ব্ববৎই উভয়পক্ষ সংগ্রামের দ্বারায় পরস্পরনিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। এখানে ব্রহ্মবাদীরা মধ্যস্থ হইয়া শৈব ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিরোধ-ভঞ্জন করিয়া দেন। হরিবংশের অনিরুদ্ধ ও উষা সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের শোণিতপুরে বাণ-নির্য্যাতন-যাত্রায় বাণের পক্ষাবলম্বী শিবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেই পূর্ব্বোক্ত বিরোধ ও তদ্ভঞ্জনের বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে কিরূপ উদার ও স্পষ্টভাবে প্রাগুক্ত তিনটী ধর্ম্মমতের সাম্যবাদ প্রদিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা হরিবংশের ঐ স্থলটী উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিতেছি :—"মার্কণ্ডেয় বলিলেন, শিব বিষ্ণুরূপ এবং বিষ্ণু শিবরূপ, আমি ইঁহাদের

কোন বিশেষ দেখিতে পাই না।**যিনি বিষ্ণু তিনিই রুদ্র, এবং যিনি রুদ্র তিনিই পিতামহ, বিষ্ণু, রুদ্র ও পিতামহ, এই তিন দেবই এক মূর্ত্তি।" বিষ্ণুপর্ব্ব ১৮১ অধ্যায় বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

এখানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শৈব ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ধর্ম্মের সারতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া বিকৃতভাবাপন্ন হওয়াতেই তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়, তাহাতেই উভয়-ধর্ম্মই যে বৈদিক ধর্ম্মেরই শাখামাত্র, তাহা বৈদিক-ধর্ম্মের উদার মতের ব্যাখ্যাদ্বারা এখানে বুঝান আবশ্যক হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্মের মূলদেবতা ব্রহ্মই এখানে মধ্যস্থ মার্কণ্ডেয়, তাঁহারই উক্তি প্রদান করিয়াছেন। এই উদারভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই বঙ্কবৈর উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

কেবল যে শাস্ত্রগ্রন্থেই এই সাম্যভাব নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু শিব ও বিষ্ণুর বিগ্রহে পর্য্যন্ত ইহা প্রকাশিত হইয়া প্রকৃত কার্য্যানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। উভয়ের রূপ একই মূর্ত্তিতে অঙ্কিত হইয়া এক নব-রূপের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাই "হরিহর" মূর্ত্তি। এই মিলন ভাবটী এমনই অন্তরঙ্গ মিলনভাব যে "হরিহরাত্মা" ঘনিষ্ঠতম সৌহার্দ্দের প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছে। যে শ্রীক্ষেত্র বৃন্দাবনের পরই বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ স্থান, সেখানেই এই অপূর্ব্ব মিলন সঙ্ঘটিত হইয়াছে। তথাকার সুপ্রসিদ্ধ 'ভুবনেশ্বর' বিগ্রহ এই পুণ্যতম মিলনস্মৃতি এখনও বহন করিতেছে। আমরা ব্রহ্মপুরাণ হইতে ইহার অপূর্ব্ব ইতিহাস কথা সঙ্কলন করিয়া দিলাম:—

"এবমেবমহং নাথ ইচ্ছেয়ং ত্বৎপ্রসাদতঃ।
লোকানাঞ্চ হিতার্থায় নানা প্রশান্তয়ে॥ ৬৩
শৈবভাগবতানাঞ্চ বাদার্থ প্রতিষেধকম্।
অস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে নির্ম্মলে পুরুষোত্তমে॥৬৪
শিবস্যায়তনং দেব করোমি পরমং মহৎ।
প্রতিষ্ঠেয়ং তথা তত্রতবস্থানেচ শঙ্করম্॥ ৬৫
ততোজ্ঞাস্যতি লোকেঽস্মিন্নেকমূর্ত্তী হরীশ্বরৌ।
প্রত্যুবাচ জগন্নাথঃ সপুনস্তং মহামুনিম্॥ ৬৬
শ্রীভগবানুবাচ যদেতৎপরমংদেবং কারণং ভুবনেশ্বরম্।
লিঙ্গমারাধনার্থায় নানাভাব প্রশান্তয়ে॥ ৬৭
মনাদিষ্টেন বিপ্রেন্দ্র কুরুশীঘ্রং শিবালয়ম্।
তৎপ্রভাবাস্থিব লোকে তিষ্ঠত্বঞ্চ তথাক্ষয়ম্॥ ৬৮
শিবে সংস্থাপিতে বিপ্র মমসংস্থাপনং ভবেৎ।
নাবয়োরন্তরং কিঞ্চিদেকভাবৌ দ্বিধাকৃতৌ॥৬৯
যোরুদ্রঃ স্বয়ং বিষ্ণুর্যোবিষ্ণু সমহেশ্বরঃ।
উভয়োরন্তরং নাস্তি পবনাকাশয়োরিব॥ ৭০
৫৬ অধ্যায়।

"হে নাথ! তোমার প্রসাদে লোকের হিত ও নানাভাব (বহুত্বভাব) প্রশমনের জন্য এই পুণ্য-নির্ম্মল পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শৈব ও ভাগবতদিগের বিবাদ প্রতিষেধক একটী শিবায়তন নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই ভবদীয় ক্ষেত্রে শঙ্করমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে লোক সকল তখন জানিতে পারিবে যে 'হরি-হর' ভিন্ন নহেন, উহারা উভয়েই এক মূর্ত্তি। তখন জগন্নাথ, মুনি মার্কণ্ডেয়কে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "হে বিপ্র! আমার আদেশক্রমে নানাভাব প্রশমন ও আরাধনার জন্য পরম কারণ ভুবনেশ্বর দেবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া সত্বর শিবালয় নির্ম্মাণ কর। হে বিপ্র! শিবকে সংস্থাপন করিলে আমাকেও স্থাপন করা হইবে। হরি ও হর উভয়ের কোনই পার্থক্য নাই, আমরা একই মূর্ত্তি দ্বিধাকৃত হইয়াছি। যিনি রুদ্র, তিনিই স্বয়ং বিষ্ণু, আর যিনি বিষ্ণু তিনিই মহেশ্বর। পবন ও আকাশের ন্যায় উভয়ের কোনই ভেদ নাই॥"

বঙ্গদেশে যে এই উদার সাম্যভাব প্রকৃত

ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত প্রথম সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদেশও গৌরবান্বিত হইয়াছে।

উপরে আমরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের একত্ব প্রতিপাদক প্রমাণ সকলের আলোচনা করিয়াছি—এখানে আমরা তিনেরই অভেদ বিষয়ক যে একটী সুন্দর শাস্ত্রোক্তি এক স্থানে পাওয়া যায়, তাহাই উদ্ধৃত করিব :—

"ন ব্রহ্মাভবতোভিন্ন ন শম্ভুর্ব্রহ্মণস্তথা।
নচাহং যুবয়োভিন্নোহ্য ভিন্নত্বং সনাতনম্॥
একত্বং ব্রহ্মবৈকুণ্ঠ শম্ভুনাং অপাতং কুরু।
শিরোদগ্রীবাদিভেদেন যথৈবৈকস্য ধর্ম্মিণঃ॥
অঙ্গানি যেতথৈকস্য ভাগত্রয়মিদংহর।
যজ্জ্যোতিরগ্র্যং স্বপরপ্রকাশং কূটস্থমব্যক্ত মনন্ত রূপম্॥
নিত্যঞ্চ দীর্ঘাদি বিশেষণাদ্যৈর্হীনং পরং তচ্চ বয়ং নভিন্নাঃ॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত কালিকা পুরাণে ১১শ অঃ

'ব্রহ্মা ভব (মহাদেব) হইতে ভিন্ন নহেন—শম্ভু তদ্রূপ ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন নহেন। আমিও তোমাদের উভয় হইতে ভিন্ন নহি। আমাদের অভেদভাব নিত্য। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের একত্বভাব হৃদয়ঙ্গম কর। মস্তক গ্রীবাদিভেদে যেমন একজনেরই অঙ্গ সকল হইয়া থাকে, তদ্রূপ হে হর! আমার একেরই এই তিন ভাগ। যে জ্যোতিঃ প্রথমভূত, আত্মপ্রকাশশীল, কূটস্থ (নির্ব্বিকার) অব্যক্ত, অনন্ত (বিশ্ব) রূপে, নিত্য, দীর্ঘাদি বিশেষণরহিত (অনির্ব্বচনীয়), সেই পরম জ্যোতিঃও আমাদের মধ্যেও, কোন ভেদ নাই।"

এখানে কেবল যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যেই অভেদভাব উক্ত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু সৃষ্টির অতীত পরব্রহ্মের সহিতও ইঁহাদের ঐক্য উক্ত হইয়াছে।

শৈব ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আমরা যেরূপ সম্মিলনের ভাব দেখিয়াছি, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও তদ্রূপ সম্মিলনের ভাবই দেখিতে পাই। 'হরিহর' মূর্ত্তিতে যেমন আমরা শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একান্ত সদ্ভাব সংস্থাপিত হইতে দেখি—তেমনই শৈবশাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে তদপেক্ষাও আন্তরিক সদ্ভাব স্থাপনের প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই। তাহা 'হরগৌরী' মূর্ত্তিতে প্রকৃতভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। "হরিহরে" বন্ধুজনের পরস্পর আত্মীয়তার প্রীতি কিন্তু "হর-গৌরীতে স্বামিস্ত্রীর অভিন্ন হৃদয়ের প্রীতি। 'শক্তির' সহিত যে কেবল শিবেরই নির্ব্বিরোধ ভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার সহিত বিষ্ণুর নির্ব্বিরোধ ভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। 'শক্তি' প্রকৃতপক্ষে শিবেরই বলিয়া 'শিবা' নামে সর্ব্বদাই অভিহিতা হইলেও তিনি শিবরূপী বিষ্ণুরও শক্তি বলিয়া 'নারায়ণী' নামেও পরিচিতা হইয়াছেন—এই জন্যই 'হরগৌরীরূপে যেমন তিনি হরের সহিত নিত্য সংযুক্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার নিজের নমস্কার মন্ত্রেও তিনি বিষ্ণুর সহিত নিত্যসংযুক্ত রহিয়াছেন, যথা—

"সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমস্তুতে॥"

হরিহর এবং গৌরী ও শ্রীর পরস্পর অভেদভাব শাস্ত্রে কেমন পরিষ্কার ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা দুইটী পুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিতেছি :—

"অয়ং নারায়ণো গৌরী জগন্মাতা সনাতনঃ।
বিভজ্য সংস্থিতো দেবঃ স্বাত্মানং বহুধৈশ্বর॥
নমে বিদুঃ পরং তত্ত্বং দেবাদ্যা ন মহর্ষয়ঃ।
একোহয়ং দেবদেবস্তো ভবানী বিষ্ণুরেবচ॥
অহংহি নিষ্ক্রিয়ঃ শান্তঃ কেবলো নিষ্পরিগ্রহঃ।
মামেব কেশবং দেব মাহুর্দ্দেবীমথাম্বিকাম্॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত কূর্ম্মপুরাণম্ ১৪শ অধ্যায়ঃ।

"বিষ্ণুরুদ্রান্তরং ব্রূয়াৎ যঃ শ্রীগৌর্য্যন্তরং তথা।
তদ্‌ভ্রান্তিকঃ স মূর্খস্তু বাক্যং শাস্ত্রবিগর্হিতম্॥"

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসুর 'হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত স্কন্দপুরাণ কাশী খণ্ড, পূর্ব্বভাগ ২৭অং ১৮১ শ্লোক।

'যাহারা বিষ্ণু ও রুদ্রের এবং শ্রী ও গৌরীর প্রভেদ জ্ঞান করে, তাহারা নিতান্ত মূর্খ, তাহাদের বাক্য সর্ব্বদা শাস্ত্র বিগর্হিত।'

"দুর্গা" দেবীতেই শক্তিরূপের পূর্ণবিকাশ। সুতরাং এই মূর্ত্তিতেই আমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এই তিন রূপেরই পূর্ণ সম্মিলন দেখিতে পাই। ইহা যে বহু পূর্ব্বেই স্বীকৃত বিষয়, তাহা শাস্ত্রকার ইঁহার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়, যথাঃ—

'কাত্যায়ন্যাঃ প্রবক্ষ্যামি রূপং দশভুজং তথা।
ত্রয়াণামপি দেবানামনুকারানুকারিণীম্॥"

ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত মৎস্য পুরাণ বচনম্।

শাক্ত ও শৈবদিগের মধ্যে ঐক্য বন্ধনের চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মোৎপত্তির সঙ্গেই দেখা যায়—তাহাতেই গোকুলে শ্রীকৃষ্ণকে কালীরূপ ধারণ করিতে দেখিতে পাই। শাস্ত্রেও এতৎসম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, যথা—

"স্বয়ং ভগবতী কালী কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
স্বয়ঞ্চ ভগবান্ কৃষ্ণঃ কালীরূপো ভবেৎব্রজে।"

ইতি মুণ্ডমালা-তন্ত্রম্।

শ্রীরাধা শক্তিরূপা দুর্গারই বিকাশ—তজ্জন্যই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ দুর্গা ও রাধিকার একত্ব প্রতিপাদক বর্ণনা আছে—যথা—

শঙ্করং প্রতি পার্ব্বতীবাক্যম্—বৈকুণ্ঠেঽহং
মহালক্ষ্মীর্গোলোকেরাধিকা স্বয়ম্॥"

অপরঞ্চ কৃষ্ণং প্রতি পার্ব্বতী বাক্যম্—
"একাহং রাধিকারূপা গোলোকে রাসমণ্ডলে।

শব্দকল্পদ্রুম ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

বৌদ্ধধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম কিরূপে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে, আলোচনা করিলে হিন্দু ধর্ম্মের অদ্ভুত সমীকরণ-শক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের দুইটী প্রধান সম্প্রদায়। একটীর নাম 'মহাযান'—অপরটীর নাম 'হীনযান'। আমরা দেখিতে পাই যে, তান্ত্রিক ধর্ম্ম মহাযানে সংক্রান্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম 'হীনযানে' সংক্রান্ত হইয়া উভয়কে আপনাদের প্রকৃতিতে এরূপই সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিয়াছিল যে, ইহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব ভারতবর্ষ হইতে একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে। 'বুদ্ধদেবকে' অবতারের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া, হিন্দুগণ তাঁহাকে আপনাদের উচ্চতম আরাধ্য দেবতার অসান প্রদান করিয়াছেন। জগন্নাথ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের দারুব্রহ্মরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা বিধান ও অপরবিধ বৌদ্ধাচারের প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হিন্দুগণ অকুণ্ঠিত চিত্তেই স্বীকার করিয়াছেন। উৎকলে দারুব্রহ্ম সম্বন্ধে যে গাঁথা প্রচলিত আছে, তাহা বুদ্ধদেবই যে তদ্রূপ পরিগ্রহ করেন, তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট কিম্বদন্তীর প্রমাণ দিয়া থাকে :—

"দেখিলে সিংহাসনোপরে। বিজয় বউদ্ধ রূপরে।
পদ অঙ্গুলি নাহি হাত। শ্রীদারুব্রহ্ম জগন্নাথ॥

দারুব্রহ্ম—৫ম অ ৩২।৩৩ শ্লোক।*

আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরোধিভাব সম্বন্ধে যথাসাধ্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, এক্ষণে এতৎ সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ নিদর্শন রহিয়াছে, তাহারও উল্লেখ করিব। জগন্নাথক্ষেত্রে যে জগন্নাথাদি বিগ্রহের সন্নিকটেই 'ভুবনেশ্বর' শিব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান তীর্থ

* শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহের "শ্রীদারুব্রহ্ম।"

স্থান বারাণসীতে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের প্রভাব সমানভাবে বিরাজমান। দশাশ্বমেধ ঘাট প্রভৃতির সহিত এখনও বৈদিক স্মৃতি বিজড়িত। গয়া হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের তুল্যরূপ প্রসিদ্ধ তীর্থ। কাশীর পার্শ্বেই সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থ 'সারনাথ।'

হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানে শিবাদি পঞ্চদেবতার পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত আছে। এই শিবাদি পঞ্চদেবতা যথা—"গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাং। দেবষ্টকং চ সম্পূজ্য ইত্যাদি॥"

'গণেশ সহ এই ছয়টী দেবতা সর্ব্বকার্য্যেই সর্ব্বাগ্রে সকলেরই পূজার্হ, যথা, গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শিবা। এইখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি, কিরূপে উদার শাস্ত্রকার বৈদিক (অগ্ন্যুপাসক) শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, প্রভৃতি সর্ব্বসম্প্রদায়ের অভীষ্ট দেবতাকেই তুল্যরূপে সকলের পূজার পাত্র করিয়া সম্প্রদায় বিরোধ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিবার উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন। এই উদার ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হওয়াতেই আমরা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষেই প্রধান প্রধান ধর্ম্মকার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রশস্ত ব্যবস্থা দেখিতে পাই,যেমন শাক্ত দোলোৎসব করিয়া থাকেন, আবার বৈষ্ণবও তেমনই দুর্গোৎসব করেন। শাক্ত দেবতার অর্চ্চনার সময়ও যে হিন্দুগণ 'দুর্গাপ্রীতে বল হরিবল' বলিয়া 'হরিধ্বনি করেন, তাহা শাক্ত ও বৈষ্ণবের মিলনেরই ফল।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য শ্রীরাধিকাভাবের মধ্য দিয়াই শ্রীকৃষ্ণ সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি রাধিকা সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নায়কভাবে আরাধনা করিতেন। সুতরাং রাধিকারূপে শক্তি যোগেই তিনি চৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণকে আকৃষ্ট ও লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা শাক্ত ও বৈষ্ণব ভাবেরই মিলন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় যে সুন্দর মন্তব্য তদীয় ধর্ম্মানন্দ গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা এখানে উদ্ধৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি,—"বাঙ্গালী বৈষ্ণবের আরাধ্য "শ্রীচৈতন্য", আর বাঙ্গালী শাক্তের আরাধ্য "শক্তি," কিন্তু হে শাক্ত ও বৈষ্ণবমণ্ডলি! আপনারা কি জানেন না, শক্তি না হইলে চৈতন্য নাই এবং চৈতন্য না হইলে শক্তি নাই।"

বৈষ্ণবগীতি সঙ্গীতের প্রধান কবি গোবিন্দ অধিকারী আপনার "শুক সারিসংবাদে" এই মিলনভাবটী কেমন মধুর করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন—

"শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল,
সারি বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নইলে পার্ব্বে কেন?

হিন্দু এই সাম্যভাব শিক্ষার ফলে তাহার আত্মার এমনই প্রশস্ততা অর্জ্জিত হয় যে, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। ভক্তের আদর্শ দেবর্ষি নারদের প্রকৃতিতে এই সাম্যভাব কিরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল, সাধকবর মহাত্মা রামকৃষ্ণের সরল বর্ণনায় তাহা প্রকাশিত হইবে, যথা—"অন্তর শাক্ত, বাহির শৈব, মুখে হরি হরি"নারদের এই ভাব ছিল।" 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস "(জীবনী ও উপদেশ) শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত।

সাধক রামপ্রসাদ এই সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াই 'কালী ও কৃষ্ণ প্রভেদ নাই' তাঁহার অমর সঙ্গীতে গাইয়াছেনঃ—

নাচ দেখি শ্যামা ।
তেম্নি, তেম্নি, তেম্নি ক'রে,
নাচ দেখি শ্যামা।
ব্রজে যেমন নেচেছিলে
হয়ে বনমালী,
যশোদা নাচাত তোমায় দিয়ে করতালি
নাচ দেখি শ্যামা ॥"

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস এই গানটী গাইতেন।

ভক্তপ্রবর কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রের একত্বভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুর সমস্ত দেবতার মধ্যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে, কিরূপে একই মহাতত্ত্বের বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা তদীয় উদার সঙ্গীতের বর্ণে বর্ণে প্রতিধ্বনি হইতেছেঃ—

"জাননারে মন, পরম কারণ,
শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেয়ের বরণ,করিয়ে ধারণ,
কখন কখন পুরুষ হয়।
বৃন্দাবনে তিনি হন বনমালী,
আয়ানের ঘরে হন কৃষ্ণকালী,
নদীয়াতে আদি হরি হরি বলি
গৌরাঙ্গ নামেতে বিখ্যাত হয়।
কখনও বৈষ্ণব, কখনও শাক্ত,
কখনও সৌর, কখনও গাণপত্য,
কে বুঝবে তাহার মহত্ত্ব তত্ত্ব,
মূর্খেতে কেবল প্রভেদ কয় ॥"

এই একত্ব ভাব সিদ্ধিধারা জাতি ধর্ম্মের ভেদ তিরোহিত হইয়া সার্ব্বভৌমিক উদার-ভাব বিকশিত হওয়ায় যে সাধকের দিব্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়, আধুনিক হিন্দু সাধকের * সঙ্গীতেও তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা :—

"জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি।
তোমায় যেভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজি ॥
মগে বলে ফারাতারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা।
বদর বলে তোমায় যত নায়ের মাঝি ॥

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে মন আমার হয়েছে পাজি ॥

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

"নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা এবং বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব।" †

(চৈতন্য লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশনে "বিশ্বম্ভর-সেন পদক" প্রাপ্ত রচনা)।

প্রথম অধ্যায়।

অবকাশরঞ্জিনী।

কবিবর নবীনচন্দ্র কাব্য জগতের কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছেন? তাঁহার স্থান কোন্ কবি অপেক্ষা কত দূর উচ্চে বা নিম্নে, আমরা প্রথমে তাহা প্রদর্শন করিতে আদৌ চেষ্টা করিব না। প্রথমে আমরা তাঁহার কবিতা ও কবিত্ব বিষয়ে আলোচনা করিব। আশা করি, তাহাতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার স্থান, অধিকার বা স্বত্ব প্রকাশিত হইবে। আমরা মনে করি যে, কোন্ ব্যক্তি গুণে কত বড়, তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা-পেক্ষা তাহার দোষ ও গুণ সর্ব্ব সমক্ষে উপ-

* মহাত্মা রামদুলাল মুন্সী।

† প্রথম পুরস্কার পদক ইঁহার প্রাপ্য।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ২০।৫।১।০৯।

স্থাপিত করিলে স্বতঃই তাঁহার প্রভাব ও স্থান প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

অবকাশরঞ্জিনী কাব্য কবির চতুঃষষ্টি সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন কবিতা সমবায়ে গঠিত। ইহাতে বঙ্গসাহিত্য-কানন-জাত নবীন পিকের নবীন মধুর উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হইয়াছে। কবি বাল্যকালে যখন যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই কবিতা-হারে সজ্জিত করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে উপহার দিয়াছেন। কখন তিনি জন্মভূমির দুর্দ্দশা দেখিয়া বিলাপ করিয়াছেন, কখন বা বালবিধবার নিরাশবদন দেখিয়া হৃদয়ের গভীরতম উচ্ছ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। কখন স্বদেশবাসীর সুগুণ দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছেন। কখন বা স্বদেশবাসীর ভীরুতা ও ব্যসন দেখিয়া ঘৃণা ও লজ্জায় হতাশ-উচ্ছ্বাস ছাড়িয়াছেন।

কবির সেই বাল্য তরল হৃদয়ে যখন যাহা পড়িয়াছে, তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে, তখন তাহার ভাবের গাঢ়ত্ব না হইলেও তাহার কোন কবিতারই কবিত্বের অভাব লক্ষিত হয় না। তিনি কোথাও দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, কখন শোকসন্তপ্ত হৃদয় দেখিয়া নিজে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন। কখন জন্মভূমির ও স্বজাতির দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হইয়াছে এবং শোকের উচ্ছ্বাস ছাড়িয়া নিজ হৃদয়ের গভীরতম সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং বঙ্গবাসী সমক্ষে তাহা অত্যন্ত জ্বলন্তভাবে প্রকটিত করিয়াছেন।

অর্থলোভে লোভী পিতার অপাত্রে কন্যা দান দেখিয়া তাঁহার বাল্যহৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছে, সেই জন্যই তিনি আবেগে গাইয়াছেন :—

কুৎসিত উদ্বাহ দোষে শতেক যুবতী,
মুকুতা যৌবন ধন, করিয়াছে সমর্পণ,
অযোগ্য পাত্রের করে—নিষ্ঠুর নিয়তি!
পবিত্র উদ্বাহ-সূত্র হয়েছে এখন,
অর্থগ্রাহী পিতৃ দোষে বিষের বন্ধন।

তাঁহার হৃদয় দেশ ও দেশবাসীর দশা দেখিয়া কাঁদিয়াছে, সেই জন্য তিনি সেকাল ও একালে তুলনা করিয়া নিরাশ হৃদয়ে কাঁদিয়াছেন। তাঁহার সেই বাল্য-হৃদয়ের অগ্নিবর্ষী হুঙ্কার শুনুনঃ—

না, না—এ যে অসম্ভব!
অসম্ভব,—এই সেই আর্য্যাবর্ত্ত নহে,
কুরুক্ষেত্রে মহারণ,
হ'ল যথা সংঘটন,
সেই আর্য্যাবর্ত্ত—কেন করিব প্রত্যয়—
একটি ইংরাজ ভয়ে কম্পিত হৃদয়।

অন্যত্র :—

সৌভাগ্যের উচ্চতম রত্ন সিংহাসন,
বিরাজি বীরদর্পে তব পুত্রগণ,
আমরা অভাগাগণ, হারাইয়া সিংহাসন,
হারাইয়া নৈসর্গিক স্বাধীনতা ধন,
কাঁদিতেছি অনিবার বিদেশি চরণে।

বাঙ্গালীর দুরবস্থা দেখিয়া কবির হৃদয় কাঁদিয়াছে, তাই তিনি দুঃখ-মিশ্রিত শ্লেষে বলিয়াছেন :—

বাঙ্গালীর বীর মূর্ত্তি থাকিবে তাহাতে।
হংসপুচ্ছ রাইফল,
জিহ্বাতে দুর্জ্জয় বল,
কামান "সংবাদপত্র"—শত্রু গ্রন্থকার,
যুগল চরণে পাশ-মন্ত্র ঝনৎকার!

বারাণসীতে "বুড়ামঙ্গলের" জল-বিহার দেখিয়া, জলোৎসবে বিজয়নগরের মহারাজের সেই তামসিক বিলাসে বিভোর দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণের ন্যায় কি গভীর উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত হইয়াছে ;—

ছি ছি মহারাজ, কি বর্ণিব হায়!
খেদে এই বুক বিদরিয়া যায়,
তোমাকে নৃপতি কিসে শোভা পায়,
এসব আমোদ, বলনা আমায়?

ও পাষাণ মুখে হাসিছ কেমনে
সহিছ কেমনে ও পাষাণ মনে ?

যাহার প্রথম হৃদয় যৌবনে ব্যসনের তরঙ্গ ও কর্ত্তব্যের অবহেলায় এরূপ বিচলিত হয়, তাঁহার হৃদয় কত মহান।

প্রেমের চক্ষে সমস্তই কি যেন এক মধুর সৌন্দর্য্য পূর্ণ বলিয়া বোধ জন্মে। সেই জন্যই স্কটলণ্ডের মহাকবি Scott সেই পার্ব্বতীয় স্কটলণ্ডেকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

Oh Caledonea ! stern and wild,
Meet nurse for a poetic child.

আবার আমাদের নবীন কবিও চট্টগ্রামে পাহাড়, বাড়বানল, পার্ব্বতীয় নদী ও সমুদ্র-তরঙ্গ-বিধৌত উপকূল দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়াছেন ও আপ্লুত হৃদয়ে গাইয়াছেন :—

বাড়বেতে হুহুঙ্কার,
'লবণাখ্যে' মহামার,
সীতাকুণ্ডে গিরি, বারি, অনল সকল,
কত সবে, প্রভু রমণী দুর্ব্বল ?

"অবকাশ-রঞ্জিনী" মহাকবির কবিত্বের প্রথম ঝঙ্কার এবং মহাকবিত্বের প্রাথমিক বা ভবিষ্যৎ পূর্ণ ভাতি। এই কবিতার পর কবিত্বে ও ভাবে জড়িত "পলাসীর যুদ্ধের" আবির্ভাব ও শেষে কবিত্ব ভাবের পূর্ণ উচ্ছ্বাস "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পলাশীর যুদ্ধ ও রঙ্গমতী।

"অবকাশ-রঞ্জিনীতে" আমরা নক্ষত্রের ক্ষীণ স্নিগ্ধ রশ্মিবৎ মধুর কবিত্বের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাই। আর "পলাশীর যুদ্ধে" কবিত্ব চন্দ্রের প্রাথমিক ভাতি অনুভব করি। বাস্তবিক পলাসী কাব্যেই নবীন কবির নবীন প্রভা প্রকাশিত।

এই কাব্য অনতিদীর্ঘ পাঁচটী সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গ হইতে কবির গাম্ভীর্য্য ও রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন গাম্ভীর্য্যময়ী রচনা বাঙ্গালায় বড় দুর্লভ। এক মেঘনাদবধ কাব্য ভিন্ন আর কোথায়ও এমন গম্ভীর ভাব দৃষ্ট হয় না। অন্ধকারময়ী রজনীর কি ভয়ঙ্কর ভীতি-উৎপাদক অথচ বিস্ময়কর বর্ণনা করিয়াছেন :—

ভয়ানক অন্ধকার ব্যাপ্ত দিগন্তর,
তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল।
বিনাশিয়া যেন এই বিশ্ব চরাচর,
অবিবাদে, অন্ধকার বিরাজে কেবল।
কত বিভীষিকা মূর্ত্তি হয় দরশন ;—
সমাধি করিয়া যেন বদন ব্যাদান
নির্গত করিছ সব বিকট দশন ;
বারেক খুলিবে নেত্র ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
ধরা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড শ্মশান,
নাচিছে ডাকিনী করে উলঙ্গ-কৃপাণ।

এইরূপ স্থলে বঙ্গের অন্য প্রসিদ্ধ কবি গাইয়াছেন :—

সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে। বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে।
চমকিল ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশ,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা দানে !
কড় কড় করে বজ্র পাড়ল ভূতলে
মুহুর্ম্মুহুঃ ! বাহু বলে উপাড়িল তরু
প্রভঞ্জন ! দাবানল পশিল কাননে।

প্রত্যেক কাব্যই কোন না কোন বিশেষ ঘটনাসূত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হয়, তাহাতে নায়ক থাকে, নায়িকা থাকে। তাহাদের প্রেম থাকে, বিচ্ছেদ থাকে, সুখের হাসি থাকে, দুঃখের নিঃশ্বাস থাকে, নয়নের কটাক্ষ থাকে, আরও কত কি থাকে; অর্থাৎ একদেশীয় লোকের রুচির অনুরূপ সমস্ত উপকরণই থাকে। "পলাশীর যুদ্ধে" তাহার কিছুই নাই, কিন্তু যেন এক অদ্ভুত মাদকতা শক্তি আছে যে, পাঠক একবার এই কাব্য

পড়িতে আরম্ভ কর, উহা শেষ না করিয়া যেন হৃদয় শান্ত হইবে না। অদৃষ্টের অদ্ভুত বিচিত্রতা, পাপের ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি ও তাহার ভীষণতর পরিণাম দর্শনে পাঠক-হৃদয়ে কি যেন এক অপার্থিব সৌদামিনী চমকাইয়া যায় এবং তাহার কি যেন একটী লহরী-লীলা হৃদয়ে রাখিয়া যায়।

প্রায় অধিকাংশ কাব্যেই কবি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রতিভাশালী কবির কোন না কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া নূতন নূতন পুষ্প-মালে উহা সুশোভিত করিয়া থাকেন, সেই জন্যই কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস রঘুবংশ রচনার প্রাক্-কালে কবিকণ্ঠে গাইয়াছেন :—

অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেহস্মিন্ পূর্ব্ব সুরিভি।
মনৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্তে বাস্তি মে গতিঃ॥

আমাদের নবীন বাবু "পলাশীর যুদ্ধ" রচনা কালে কোন রত্ন বা মণিবেধ যন্ত্র পান নাই। তিনি নিজেই শুক্তি হইতে মুক্তা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং স্বহস্তে রন্ধ্রকারী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া মণিবেধ পূর্ব্বক রত্নহার রচিয়া মাতৃকণ্ঠ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার আবেগময়ী অভিমান দর্শনে মন বিচলিত হয় না, বরং তিনি এইরূপ অভিমানের অধিকারী বলিয়াই বোধ হয়। কবিত্ব হিসাবে তাঁহার এই অভিমান রূপ দোষ, গুণে পরিণত হইয়াছে :—

কোন পুণ্য বলে সেই খনির ভিতরে।
প্রবেশি, গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে
দোলাইব মাতৃভাষা কম কলেবরে,—
সুকবি সুকরে গাঁথা মহাবাক্য ধনে
সজ্জিত সে বরবপু! কিবা অসম্ভব
নহে কিছু, হে দুরাশে! তোমার মায়ায়,
কত ক্ষুদ্র নর, ধরি পদছায়া তব,
লভিয়াছে অমরতা এমর ধরায়।

পলাশী কাব্যের সূচনা অতিশয় গাম্ভীর্য্যময়ী ও মনমুগ্ধকারিণী, এক মাইকেলের মেঘনাদ বধের সূচনা ভিন্ন বাঙ্গালার অন্য কোন কাব্যের প্রথম ভাগেই এরূপ গাম্ভীর্য্য ও মনোহারিত্বের সমাবেশ দৃষ্ট হয় না। আমরা এই স্থল হইতে পাঠকদের কয়েকটী কবিতা উপহার দিব :—

দেখিতে বঙ্গের দশা সুরবালাগণ,
গগন গবাক্ষ যেন চকিতে খুলিয়া
অমনি সিরাজ ভয়ে করিতে বন্ধন
চমকিছে রূপ জ্যোতি; নয়ন ধাঁধিয়া।
মুহূর্ত্তেক হাসাইয়া গগন প্রাঙ্গণ,
সভয়ে চপলা মেঘে পশি যে তখন।

*   *   *   *

ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল নিশীথিনী,
নীরবে নবাব ভয়ে করিছে রোদন;
নীরবে কাঁদিছে আহা! বঙ্গ বিনাদিনী,
নীহার নয়ন জলে ভিতিছে বসন।
নীরব ঝিল্লির রব, স্তব্ধ সমীরণ,
মাতৃবুকে শিশুগণ, দম্পতি শয্যায়,
পতি প্রাণ ভয়ে, সতী সতীত্ব কারণ,
ভাবিছে অনন্য মনে কি হবে উপায়।
বিরামদায়িনী নিদ্রা ছাড়ি বঙ্গালয়
কোথায় গিয়াছে ডরি, নবাব নিদয়।

এমন অল্প কথায় অথচ হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তাৎকালীন কথিত বঙ্গের অবস্থার বর্ণনা অতি সুন্দর হইয়াছে, এরূপ বর্ণনা অতি উচ্চ কবিরও প্রশংসার কথা। এমন কবিত্ব ও গাম্ভীর্য্যময়ী ভাবের সুন্দর সমাবেশ বাঙ্গালা ভাষায় কচিৎ দৃষ্ট হয়। বর্ণনাটী পাঠ করিলেই যেন মনে একটী ভীষণ চিত্রের সমাবেশ হয়। তাহা নিবিষ্ট-চিত্ত পাঠক ভিন্ন অন্যের অনুভবনীয় নহে।

ইহার পরই বঙ্গপ্রথিত শেঠ ভুবনের মন্ত্রণা-গৃহের বর্ণনা। এই স্থলে মন্ত্রণার অধিনায়কদের যেরূপ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক ও উপাদেয়। প্রথমেই খর্ব্ব মীরজাফরের উক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। মীর-

জাফর কেবল নিজ স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজিয়া- ছেন ? তিনি বিষকুম্ভ পয়মুখবৎ প্রথমে ধার্ম্মি- কতার ভাণ ও কৃতজ্ঞতার প্রকটন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থের বিকট বিকাশও গোপন করিতে পারেন নাই :—

যেই তরু ছায়া তলে জুড়াই জীবন,
কেমনে সে তরুমূল কাটিব আবার ?
অথবা নিষ্ঠুর মনে, ভুজঙ্গ যেমন,
কোন্ প্রাণে, যে গাভীর করি স্তন্য পান,
দুগ্ধ বিনিময়ে তারে করি বিষ দান ?

* * * *

কৃতঘ্ন হৃদয় আহা ! নরক সমান !
সামান্য যে উপকারী, তার অপকার
করিলে পাপেতে আত্মা হয় কলুষিত !
একে রাজদ্রোহী তাহে মন্ত্রী হয়ে তার,
কেমনে কুমন্ত্রে তার করিব অহিত ?

ইহার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন স্বার্থপরতার আভাস প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে ?

একে রাজ-বিদ্রোহিতা ! তাহে অনিশ্চিত
এই পাপ পরিণাম—হিতে, বিপরীত !

তাহার পর অপরের প্রতি অত্যাচার ভুলিয়া যাইয়া নিজ ভাগ্যের প্রশংসা :—

রাজপদে, মন্ত্রী পদে, আছি বিরাজিত,
অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দাও সমুচিত।

তাহার পরই যখন রাজা রাজবল্লভ মির- জাফরকে নবাব পদে বরণ করার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, অমনি বিশ্বাসঘাতক, খল জাফর আলীর সমস্ত পূর্ব্ব কথিত সাধুবাদ কোথায় উড়িয়া গেল, অমনি তাঁহার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া নাচিয়া উঠিল : —

সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে,
সমর্পি এরাজ্য ভার। তা হ'লে নিশ্চয়
নিদ্রা যাবে বঙ্গবাসী নির্ভয় অন্তরে ;
হইবে সমস্ত রাজ্য শান্তি সুধাময় !
নীরবিলা নৃপমণি উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করি মিরজাফরের হিয়া।

এমন এক কথায় মিরজাফরের পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে।

তাহার পরই জগৎশেঠের সেই অগ্নিস্পর্শী বাক্যাবলী, শেঠবরের হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছে, জীঘাংসার অমানুষিক বিষে তিনি উত্তেজিত। তাঁহার সেই বাক্যাবলী অগ্নি- বর্ষী গিরির ন্যায় ভয়ানক, উহাতে তীব্র শ্লেষ ও ভয়ানক মনোবেদনা প্রকাশিত হইয়াছে :—

কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম—সমস্ত পৃথিবী
সিরাজদ্দৌলার যদি অনুকূল ;
অথবা মানুষ ছার তুচ্ছ ক্ষীণজীবী,
করেন অভয় দান যদি দেবকুল,
তথাপি—তথাপি এই কলঙ্কের কালী
সিরাজদ্দৌলার রক্তে ধুইব নিশ্চয়।
সম্ভব হইবে লুপ্ত শারদ চন্দ্রিমা,
অসম্ভব হবে লুপ্ত শেঠের গরিমা।

* * * *

সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল !
যদি পাপিষ্ঠের হয় সহস্র পরাণ,
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্রাণ।

তাহার পরই রাজা রাজবল্লভের উক্তি। তিনি যেমন সন্দিগ্ধ-হৃদয় ও স্বার্থপর, তাঁহার বাক্যাবলীও সেই প্রকার। তিনি যেন, যাহা- দের সহিত এই গুপ্তমন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত, তাহাদেরও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। অপরের প্রতি যে অত্যাচার হইতেছে,সেজন্য তিনি তত চঞ্চল নহেন, কিন্তু নিজের প্রতি অত্যাচার জন্যই তিনি ব্যস্ত :—

কলিকাতা জয় কালে যদিও পামর,
পেয়ে গ্রাসে ছাড়িয়াছে পুত্র কৃষ্ণদাস,
যেদিন হইবে পাপী নির্ভয় অন্তর,
সেদিন আমার হ'বে সবংশে বিনাশ।

ইহার পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন। তাঁহার বাক্য স্থির অথচ গম্ভীর। তিনি নিজের প্রতি অত্যাচারের কথা বড় তুলেন নাই। তিনি যেন পরদুঃখে কাতর, আবার আলিবর্দ্দির প্রতি কৃতজ্ঞতায় এখনও তাঁহার হৃদয় প্রণত। সকলেরই মতিভ্রম আছে।

সেই জন্য তিনিও ইংরাজ সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার করিতে সম্মতি প্রদান করিলেন। ভারতের জন্য নূতন পিঞ্জরের বায়না-নামা লিপিবদ্ধ হইল। কৃষ্ণচন্দ্র কূটনীতিপরায়ণ নহেন, স্পষ্টবাদী, তাঁহার বাক্যে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। শেষে তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর মত জিজ্ঞাসা করিয়া নিজ বক্তব্য শেষ করিয়াছেন।

পলাশী কাব্যে পরম পূজ্যা রাণী ভবানীর উক্তির ন্যায় উপাদেয় অংশ আর নাই। সেই স্বর্গীয় রাণী-কথিত বাক্যগুলির কবি গ্রথিত কবিতাগুলি স্বর্ণাক্ষরে সমস্ত বঙ্গবাসী হৃদয়ে বিরাজিত রাখিবার যোগ্য। যিনি সেই দেবীর উক্তি পাঠ করিবেন, তিনি নবীন বাবুর হৃদয়, আশা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অনুভব করিয়া কবিবরকে সর্ব্বান্তঃকরণে সাধুবাদ দিবেন। এইরূপ উক্তি বাঙ্গালী কবিদের লেখনী হইতে এই নূতন নিঃসৃত হইয়াছে। কবির কবিত্ব, ভূয়োদর্শন ও স্বদেশ-বাৎসল্য একাধারে বিরাজিত। পাঠক মহারাণী নাটরেশ্বরীর বাক্যগুলি পাঠ করুন, আর মুক্তহৃদয়ে নবীন বাবুর কবিত্বশক্তির জন্য সাধুবাদ করিতে থাকুন। মহারাণীর বাক্যাবলী পাঠ করিলেই চিরপরাধীন বাঙ্গালী হৃদয়ও যেন কি এক অদ্ভুত আশায় নৃত্য করিতে থাকে, কি এক ভবিষ্যৎ দর্শনে উৎফুল্ল হয় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় রাণী ও নবীন বাবুর চরণে প্রণত হইতে যেন স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। কবিকৃত বঙ্গমাতা ভবানীর বর্ণনা পড়িলেই যেন কি একপ্রকার মাতৃপ্রেমে শরীর অবশীকৃত হইয়া উঠে :—

একটী রমণী মূর্ত্তি বসিয়া নীরবে,
গৌরাঙ্গিনী দীর্ঘগ্রীবা, আকর্ণ নয়ন,
শুকতারা শোভে যেন আকাশের পটে,
শোভিছে উজলি জ্ঞান-গর্ব্বিত বদন।
আবার পলকে সেই নয়ন চপল
স্নেহের সলিলে হয় কোমলতা ময়;
এই বর্ষিতেছে ক্রোধ গরিমা গরল,
অমনি দয়াতে পুনঃ দ্রবীভূত হয়!
বিশ্বব্যাপী সেই দয়া, জাহ্নবী যেমন,
সমস্ত বঙ্গেতে করে সুধা বরিষণ।

মহারাণী সকলের মন্ত্রণায় সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই। এই কাপুরুষোচিত মন্ত্রণায় তাঁহার মনে ঘৃণা ও ক্ষোভের উদয় হইয়াছিল, সেই জন্যই তিনি মনের আবেগে বলিতেছেন :—

কাপুরুষ যোগ্য এই হীন মন্ত্রণায়
কেমনে দিলেন সায় এক বাক্যে সবে,
বুঝিতে পারি না আমি।

লক্ষ্মণ সেনের সেই কাপুরুষতায়
সহি এত ক্লেশ। তবে জানিলে কেমনে
তোমাদের ঘৃণাস্পদ এই মন্ত্রণায়
ফলিবে কি ফল পরে? ভেবে দেখ মনে,
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি এতাধিক হন অত্যাচারী,
ইংরাজ সহায় তাঁর,—কি করিবে তবে?
বঙ্গভাগ্যে এ নীরবে ফলিবে তখন,
দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্ব স্থাপন।

তাহার পর মহারাণীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচয় কেমন স্বাভাবিক ও অল্প কথায় প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালার অতুলনীয় দেবী কন্যার সহিত বঙ্গকবির হৃদয় যেন একাধারে সুচিত্রিত। এমন নিপুণ চিত্রকরের চিত্র পাঠক নিজে না বুঝিলে আমাদের বুঝাইবার শক্তি নাই।

মহারাজ একবার মানস-নয়নে
ভারতের চারিদিকে কর দরশন,
মোগল-গৌরব রবি আরঙ্গজেব সনে
অস্তমিত; নহে দূর দিল্লীর পতন।

* * সিরাজদ্দৌলার
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ।

বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায়
সেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন,
থামিবে না এইখানে, হবে উগ্রতর,
শোণিতের স্বাদে-মত্ত, শার্দ্দুল যেমন
প্রবেশিবে মহারাষ্ট্র সৈন্যের ভিতর।
হ'বে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে
কি ভীষণ ! ভেবে মম শরীর শিহরে।

*   *   *

জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্ন জাতি, তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ, এই দীর্ঘকাল
একত্র বসতি হেতু, হয়ে বিদুরিত
জেতাজিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয়, প্রণয় স্থাপিত
নাহি বৃথা দ্বন্দ জাতি-ধর্ম্মের কারণে।

আবার :—

আমাদের করে রাজ্য-শাসনের ভার !
কিবা সৈন্য, রাজকোষ, রাজ্য মন্ত্রণায়,
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে শিবিরে, হিন্দু প্রধান সহায় !
অচিরে যবন রাজ্য টলিবে নিশ্চয় ;
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার সময়।

আবার ইংরাজ সম্বন্ধে রাণীর উক্তি অতি বিজ্ঞোচিত ও স্বাভাবিক :—

ইংরাজেরা নব্য পরিচিত ;
ইহাদের রীতি নীতি আচার বিচার
অনুমাত্র নাহি জানি।

তাহার পর রাণীর শ্রীমুখ হইতে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্লভ। বাঙ্গালীর হৃদয়ে ইহা বেদ বাক্যের ন্যায় প্রতিধ্বনিত হউক, বাঙ্গালী মানুষ হউক, মাতার বাক্যে পুত্র উদ্বোধিত হউক। আহা ! তখন যদি বঙ্গের কৃতি-সন্তানগণ মাতার বাক্য অবহেলা না করিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, ভারতের অদৃষ্টাকাশে এইরূপ ঘন মেঘের আবির্ভাব হইত না। হয়তঃ ভারতবর্ষে অন্য প্রকার অভিনয় দর্শন করিতাম।

আমার কি মত ? তবে শুন, মহারাজ !
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখ রণে ; যেন পূর্ণ শশী
বঙ্গ স্বাধীনতা ধ্বজা বঙ্গের আকাশে—
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
হাসুক উজলি বঙ্গ। এই অভিলাষে
কোন্ বঙ্গবাসী রক্ত ধমনী ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর ? আমি যে রমণী,
বহিছে বিদ্যুৎ বেগে আমার ধমনী।

ইহার পরই বঙ্গজননীর হৃদয়ের যে গভীর উচ্ছ্বাস বহির্গত হইয়াছে, তাহা সমস্ত বঙ্গবাসীর গৌরবের অপূর্ব্ব সামগ্রী, এই বাক্য বঙ্গবালার, না রাজপুত-রমণীর, না গ্রীক রোমীয় ললনার ?

ইচ্ছা করে, এই দণ্ডে ভীমা অসি করে,
নাচিতে চামুণ্ডা রূপে সমর ভিতর।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে,
সহি কিসে মাতৃ-দুঃখ ?

এই-অগ্নি উদ্গারিণী বাক্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গেই কবি মাতৃবাক্য অবহেলার যে কি বিষময় পরিণাম, তাহা যেন জলদ অক্ষরে প্রদর্শন করাইতেছেন।

আবার মোহনলালের বাক্যেও কবি কেমন ভবিষ্যৎ জ্ঞান ফুটাইয়াছেন। সেই বৈরাগ্য-মিশ্রিত আক্ষেপোক্তি স্বর্ণাক্ষরে বাঙ্গালী-হৃদয়ে লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য :—

অদৃষ্টচক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি।
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবর্ত্তন।
কাহার উন্নতি হবে, কার অনবতি,
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে আহা বলে কোন্ জন !
কালি যেই স্থান ছিল বৈজয়ন্ত ধাম,
আজি দেখি সেই স্থান বিজন কানন।

আবার :—

সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়,
ভারত অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত।
এই রবি শীঘ্র অস্ত হইবার নয়,
কখনো হইবে কি না, জানে ভবিষ্যৎ।

অন্যত্র :—

এই নহে ভারতের রোদনের শেষ
পলাশী যুদ্ধের নহে এই পরিণাম,
যেই শক্তি স্রোতস্বতী ভেদি বঙ্গদেশ
নির্গত হইল আজি, অবিশ্রাম
হিমালয় হতে বেগে করিবে গমন
কুমারিকা লঙ্কাদ্বীপে লঙ্ঘি পারাবার।

পলাশীর যুদ্ধের যে প্রধান বা একমাত্র অভিনেতা, সেই ক্লাইবকে কবি কেমন কৌশলে কাটোয়া শিবিরে তরুতলে হঠাৎ বাহির করিয়াছেন, কেমন সামান্য কথায় বিনা আড়ম্বরে তাঁহার চরিত্র চিত্রন করিয়াছেন। যে কবির লিখনী হইতে এমন স্বাভাবিক ভাবে ও অল্প কথায় কাহারও হৃদয়ের গভীরতম রহস্য প্রকাশিত হয়, তিনি কি দরের কবি, তাহা পাঠকই একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

শিবির অনতিদূরে বসি তরুতলে
নীরবে ক্লাইব মগ্ন গভীর চিন্তায়।
* * * প্রশস্ত ললাট
বীরত্বের রঙ্গভূমি, জ্ঞানের আধার।
বক্ষঃস্থল যেন যমপুরির কপাট,
প্রশস্ত, সুদৃঢ়, বহে তাহার ভিতর
দুরাকাঙ্ক্ষা; দুঃসাহস স্রোত ভয়ঙ্কর।

আবার কবিতাচ্ছলে মহাকবি কতদিন ইংরাজ রাজ্য দৃঢ়তর থাকিবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যবন রাজ্য পতনের কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

ধর বৎস? এই ন্যায়পরতা দর্পণ
বিধিকৃত, বৃটিশের রাজ্যে নিদর্শন!
যতদিন পূর্ব্ব রাজ্যে বৃটিশ শাসন
থাকিবে অপক্ষপাতী বিশদ এমন,
ততদিন এই রাজ্য হইবে অক্ষয়।
এই মহারাজ নীতি মোহান্ধ যবন
ভুলিয়াছে, এই পাপে ঘটিছে প্রলয়।

বিলাসিতা জাতীয় ধ্বংসের প্রধান কারণ, এই বিলাসিতার জন্যই যবন রাজ্যধ্বংস হইয়াছে। সেইজন্য নাদেরসাহ একদিন দিল্লীর বাদসাহের বিলাসের পূর্ণাহুতি-স্বরূপ উপাদেয় খাদ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্দ্ধসিদ্ধ মেষমাংস অতি আহ্লাদের সহিত ভক্ষণ করিয়াছিলেন। কবি দেখাইয়াছেন, সে সময় যবনেরা বিলাসের তরঙ্গে দেহ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা বিলাসের আবর্ত্তে মোহিত ছিলেন। সেইজন্য বীরবাঞ্ছিত যুদ্ধক্ষেত্রেও নর্ত্তকীর বিলাস কটাক্ষ। যেখানে বিলাস, সেখানেই কাপুরুষতা। আবার নিষ্ঠুরতা কাপুরুষতার প্রসূতি। যে কাপুরুষ, সেই নিষ্ঠুর। বীরহৃদয় নিষ্ঠুরতা-বিবর্জ্জিত। সিরাজ কাপুরুষ, সে নিষ্ঠুর। সেই জন্যই পলাশীক্ষেত্রে আমরা নবাবশিবিরে বীরত্বের ধ্বনি স্থলে বিলাসিতার বিপুল তরঙ্গ দেখিতে পাই। কিন্তু সে বিলাসে সুখ নাই। সেইজন্যই কবি দেখাইয়াছেন যে, এই বিলাস-তরঙ্গ মধ্যেও সিরাজ সুখী নহে।

আমি ত সমরক্ষেত্রে, প্রাণান্তে আমার,
যাইব না, পশিব না বিষম সংগ্রামে,
অরিবৃন্দ নখাগ্রেও দেখিবে না যার
কেমনে অলক্ষ্যে তারে বধিবে পরাণে?
তবে যদি শুনি রণে হারিব নিশ্চয়,
রাজদুর্গে একেবারে লইব আশ্রয়।

যে মুসলমানের প্রতাপে পূর্ব্বে বঙ্গসাগর ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরভূমি পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল, একি তাহাদেরই বংশধর? ধন্য বিলাসিতা, তোমার প্রতাপে সিংহ-শাবকও মেষশাবকে পরিণত হয়। তোমার মত জাতি-উচ্ছেদক ব্যাধি ইহসংসারে আর নাই। কবি যেন বাঙ্গালী জাতিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ দেখাইতেছেন, আর বলিতেছেন, হে বাঙ্গালী সন্তানগণ, বিলাসিতার পরিণামফল অবলোকন কর, আর শিক্ষা কর যে, তোমরা দিনে দিনে যেমন বিলাসতরঙ্গে গা ঢালিয়া দিতেছ,

তাহার পরিণাম কি ভীষণ! এই বিলাসিতার জন্যই তোমরা পর-পদ-দলিত। এই বিলাসিতা পরিত্যাগ কর,দেখিবে,তোমরা যে অবনতির নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছ, অচিরে তোমাদের উর্দ্ধগতি হইবে। তোমরাও আবার জগতের মধ্যে একটী গণনীয় জাতিরূপে পরিণত হইবে। হায়! কবির এই নীরব ইঙ্গিত কি বাঙ্গালী-হৃদয়ে স্থান পাইবে?

পাপী যখন পাপের নিম্নতম সোপানে উপনীত হয়, তখন তাহার জ্ঞানচক্ষু শেষবার ফুটে, কিন্তু তখন নিয়তির ফলে তিনি আবদ্ধ, সেইজন্যই কবি সিরাজের মুখ হইতে শুনাইয়াছেন :—

পাপপুণ্য কার্য্যকালে সমান সরল,
অনুশোচনাই মাত্র পরিচয় স্থল।

কবি সিরাজ-পত্নীর যে চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়, নরকের নিকট এমন স্বর্গীয় অনুপম সৌন্দর্য্য, অমার পার্শ্বে এমন চন্দ্রিমার অনুপম কৌমুদী খেলা দেখিয়া পাঠকের হৃদয়ে কি অনুপম ভাবের উদয় হয়,তাহা অবর্ণনীয়।

'মানব-চরিত্রের কি বিমোহন গতি, কল্য যে মহারাজ,আজ সে পথের ভিখারী! আবার কল্য যে পথের ভিখারী, আজ সে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি। সিরাজউদ্দৌলার পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্ব পরের অবস্থার তুলনা কর, জাগতিক নিয়মের কি ভীষণ নিয়তি! কবি তাহা অতি বিশদভাবে আমাদের উপহার দিয়াছেন।

দুই দিন আগে এই দুর্দ্দান্ত সিরাজ,
চাহিত না মুখ তুলি যেই অনুচরে;
আজি সে নবাব আহা! বিধির কি কাজ?
কাঁদিয়াছে চরণে তার জীবনের তরে!
শত নরপতি পড়ি যাহার চরণে
কাঁদিত,—অদৃষ্ট আহা কে দেখে কখন।

অনেকে বলেন যে, কবি এই পলাশীর যুদ্ধের ন্যায় জাতীয় 'কলঙ্কের ঘটনা কাব্যাকারে সাহিত্য-ভাণ্ডারে চিরতরে স্থাপিত করিলেন কেন? এই কলঙ্ক যে কোন কালেই আর বিধৌত হইবে না। আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি কবি এই কাব্য না লিখিতেন,তাহা হইলেই কি এ কলঙ্ক লোপ পাইত? সেই শ্বেত সিংহ হস্তে— এ চিত্র যে ভাবে চত্রিত হইয়াছে, তাহা কি ভাগীরথীর সমস্ত জলেও কোন কালে বিধৌত হইবে? তাহার পর পলাশীক্ষেত্র ভারত অঙ্গের একটী চিরস্থায়ী ক্ষত চিহ্ন।' এই চিহ্ন বিলোপের আশা সুদূরপরাহত। এক দিন ভারতভূমির সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হওয়া সম্ভবপর, কিন্তু এ চিহ্ন সাত সমুদ্র তেরনদীর পরপারে জলদাক্ষরে বিরাজিত থাকিবে। পলাশীর অভিনয় যদি না হইত, তবে হয় ত আমরা এই ভারতকে অন্য প্রকার দেখিতে পাইতাম। হয়ত ভারতের অপূর্ব্ব সুবাস লইয়া গন্ধবহ ভারতভূমে আবার নির্ভয়ে নৃত্য করার অবকাশ পাইত, কিন্তু বিধির বিধান অন্য প্রকার। যে পলাশীর জন্য ত্রিশ কোটী মানবের ভাগ্য অন্য পথে প্রবাহিত, সে পলাশীর কালিমা কি এই কাব্য না লিখিলে অস্তমিত হইত?

বিপথগামী মানবকে দুই প্রকারে সৎপথে আনয়ন করা যায়। একপ্রকার সৎ কার্য্যের পুরস্কার বা সুফল দেখাইয়া, আর এক প্রকার অসৎ কার্য্যের দণ্ড বা কুফল প্রদর্শন করাইয়া? প্রথম প্রকার পথই আমাদের মতে সমীচিন। কিন্তু যখন প্রথম প্রকার পথ দেখাইবার উপায় নাই, তখন শেষ পথ অবলম্বনই প্রকৃষ্ট উপায়, সেই জন্যই আমাদের পুরাণকারেরা নরক বর্ণনা করিয়াছেন। সেই জন্যই মাইকেল মেঘনাদ বধে এই চিত্রের

একবার আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন এবং এই জন্যই কবিবর হেমচন্দ্র ছায়াময়ী লিখিয়াছেন। কিন্তু সে সকল গুলিই কাল্পনিক, কবিবর নীবনচন্দ্র সেই জন্যই কথামালার গল্পবৎ কাল্পনিক পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্য ঐতিহাসিক পথ অবলম্বন করিয়াছেন, এবং ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হওয়া কেমন অবিবেচকের কার্য্য, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাপ কার্য্যে কেহই সুখী হইতে পারে না। পাপে ইহকাল ও পরকালের কি ভীষণ অবনতি। তাহার পর বিলাসিতার কি ভয়ানক ক্ষমতা। মানব জাতির এমন সাঙ্ঘাতিক পীড়া আর নাই। হিন্দু বল, গ্রিকবল, রোমক বল, আর নৈশরী বল, সকলেই এই বিলাসিতা রূপ ভীষণ পীড়ায় কেহ মৃত, কেহ মৃতবৎ। একজন বাঙ্গালীরও যদি এই কাব্য পড়িয়া পাপ ও বিলাসিতার প্রতি ঘৃণা জন্মে, তাহা হইলেই বলিব, কবির লিখনী ধারণ সফল হইয়াছে। একাধারে অপূর্ব্ব কবিতা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোক শিক্ষা। ইহা মানবের দুর্লভ প্রতিভা। আমরা বলিব, কবির পলাশী কাব্য লিখা সফল হইয়াছে। বিনা উপকরণে এমন নৈবিগ্ন নীবন বাবু ভিন্ন অন্য কেহ এপর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। এ বিষয়ে নবীন বাবুর সিংহাসন সমস্ত কবির শীর্ষস্থানীয়।

রঙ্গমতী।

রঙ্গমতীকে আমরা এক প্রকার বিয়োগান্ত কাব্য মধ্যেই—(Tragedy) গণনা করি, কারণ যদিও—বীরেন্দ্রের সহিত কুসুমিকার মিলন শেষে সংঘটিত হইয়াছে, সে কিন্তু মৃত্যু সময়ে। দুইটী কুসুম এক বৃন্তে মুকুলিত, একের গন্ধে অন্য মুগ্ধ, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে, যখন উভয় কুসুম প্রস্ফুটিত, তখনই স্থানান্তরিত। কিন্তু কি এক চুম্বক আকর্ষণে পরস্পর বাঁধা যে, মিলনের জন্য উভয়েই চেষ্টিত, কিন্তু নিয়তি চক্রের ফেরে, শেষে উভয়ের যেই মিলন, অমনি উভয় কুসুম বৃন্তচ্যুত।

ইহারই নাম প্রেম। ইহা জগতে বড়ই দুর্লভ—এ প্রেম স্বর্গীয়। ইহা এই মর জগতের উভযোগী নহে। কবি এই জন্য এই পৃথিবীতে তাহাদের মিলন সংঘটন করিলেন না। এই মর জগতে কিছু অক্ষুণ্ণ নহে, কাজেই এ মর জগতে এই পতি-পত্নী-প্রেম থাকা অসম্ভব। সেই জন্য কবি এই প্রেমিক প্রেমিকার মিলন—যেখানে কুসুমে কীট নাই, অমৃতে মাদকতা শক্তি নাই, আলোকে দাহিকা শক্তি তাই,—তথায় সংঘটন করিয়া কবিত্বের চরম আদর্শ প্রদর্শন করাইয়াছেন।

রঙ্গমতীতে কবির ভূয়োদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সুদূর মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে সাগর উর্ম্মি-সেবিত চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত অনেক স্থানের সুন্দর চিত্র পাঠক সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। এমন প্রকৃতির সুন্দর সৌন্দর্য্য-বর্ণন বাঙ্গালা কাব্যে অতি বিরল। সেই জন্যই বলি, রঙ্গমতীর ন্যায় কাব্য বাঙ্গালায় এই নূতন। হেম বাবু যে উদ্দেশ্যে বীরবাহু কাব্য লিখিয়াছেন, নবীন বাবুও সেই উদ্দেশ্যে রঙ্গমতী লিখিয়াছেন। ইহার মধ্যে কে অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করার ভার আমরা পাঠকের উপরই অর্পণ করিলাম।

রঙ্গমতীর শঙ্কর এক অপূর্ব্ব সারল্যপূর্ণ বিশ্বাসী সেবকের চিত্র। এমন সরলতাপূর্ণ বাৎসল্য ভাব অতি মধুর। সেই ঘোর ঝটিকা পূর্ণ নদী-তরঙ্গে তাহার নিজ জীবনের ভয় নাই। এক চিন্তা বীরেন্দ্র। সেই সঙ্গে

সঙ্গে বীরেন্দ্র মাতার সেই শেষ বিদায় স্মরণ পথে উদিত হওয়ায় তাহার সেই কাতর-ভাব বড়ই মধুর হইয়াছে। সেই স্থান উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না :—

কাঁদিল জননী তোর! কাঁদিলি আপনি।
সেই দিন হতে তোরে, কত যত্নে, কত
কষ্টে পালিয়াছি আমি, দেশ দেশান্তরে,
দেখিতে কি এই দশা এ বৃদ্ধ বয়সে?
অভাগিনী মাতা তোর ফিরিল না ঘরে,
বুকের বাছনী আর, লইল না বুকে!

শঙ্করের স্নেহ যেমন, বীরেন্দ্রের ভালবাসাও তেমনি। সে ভালবাসায় প্রাণের মমতা বিস্মৃত। শঙ্কর জলমগ্ন প্রায়, তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বীরেন্দ্র নিজের বস্ত্রার্দ্ধ দ্বারা তাহাকে বন্ধন করিয়া সন্তরণ করিতেছেন। নিজের প্রাণের প্রতি লক্ষ্য নাই। শঙ্করের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা :—

দেখিলা বীরেন্দ্র, মৃত্যুর বক্ষেতে শঙ্কর,
নক্রবেগে সাঁতারিয়া ধরিলা তাহারে।
'ছাড় ছাড়'—উচ্চৈঃস্বরে বলিল শঙ্কর,
"না না"—বলিল বীরেন্দ্র। আবার ভাসিয়া
উঠিল তরঙ্গ শিরে মুহূর্ত্তেক পরে।

শঙ্কর যুবকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিল, শঙ্কর দেখিল, দুই জনকে লইতে হইলে বীরেন্দ্রের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা,সেই জন্য হস্তের বস্ত্রের বন্ধন খুলিয়া নিজ জীবন জল মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া বীরেন্দ্রকে রক্ষা করিলেন; এ কিরূপ স্বার্থ ত্যাগ, এ যে দেবতার কার্য্য। যিনি এরূপ চরিত্র চিত্রন করিতে পারেন, তাঁহার কাব্য কত উচ্চ ও মহান।

"রঙ্গমতীকাব্য" পতি-পত্নী প্রেমের অক্ষয় খনি। একস্থানে কবি বলিয়াছেন :—

পত্নী-মৃত দেহ-শিরে,
উন্নত উমেশ হায়! ভ্রমিতে লাগিলা
পতিপরায়ণা পত্নী বিরহে বিহ্বল।
মরি কি পবিত্র চিত্র! হেন পতি ভক্তি,
পত্নীপ্রেম, সতীত্বের আদর্শ দুর্ল্লভ,
আছে কি জগতে! কোথা সুসভ্য ব্রীটন।

প্রকৃত প্রেমিকার কয়েকটী উচ্ছ্বাস এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই কাব্য সমালোচনা শেষ করিব।

নাহি হইতাম যদি ঐশ্বর্য্য আকর,
বিদীর্ণ হতনা আজি হৃদয় আমার।
কিন্তু পিতৃ ধনে মম নাহি আকিঞ্চন,
জগতের যত রত্ন, যত সুখ আশা,
সকলি চরণে ঠেলি, পাই যদি দেবি,
আমার হৃদয়-রত্ন, হৃদয়ে আমার।
এমন দুস্তর স্থান নাহি এই বনে,
যথা নাহি কুসুমিকা ভুঞ্জিবে ত্রিদিব
সেই রত্ন লয়ে বুকে।

পাপের ভয়ানক পরিণাম। তাহা কবি মর্কট রায়ের শেষ অঙ্কে প্রদর্শন করাইয়াছেন। তপস্বিনীর অসি ফলকে তাহার পাপ হৃদয় বিদীর্ণ এবং দস্যু কর্ত্তৃক সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত। কবির ইচ্ছা পাপীর পরিণাম দর্শনে পাপীর হৃদয় কম্পিত হইবে এবং বীরেন্দ্র ও কুসুমিকার পদানুসরণ করিয়া আমাদের যুবক যুবতীরা স্বর্গীয় প্রেম, ভক্তি, বীরত্ব ও সতীত্ব প্রভৃতি সৎগুণ শিক্ষা করিবে।

শ্রীরতিনাথ মজুমদার।

নিরানন্দে।

নিম্নলিখিত কবিতাটী আমার জ্যেষ্ঠতাত সুপ্রসিদ্ধ সাবিত্রী লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্তের একমাত্র পুত্র ধ্রুবলাল দত্তের মাত্র ২০ বৎসর বয়সে অকাল বিয়োগে লিখিত। দাদা আমার গত বৎসর (১৩১৫ সালের) ১০ই জ্যৈষ্ঠ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন ও দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কবিতাটী গত বৎসর শ্রাবণ মাসে লিখিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, পবিত্র শোকগাথার পূতভাব লোকচক্ষুর গোচর করিলে ইহার গাম্ভীর্য্যে, ইহার নির্ম্মলতায় আঘাত লাগিবে। তাই এত দিন সাধারণে প্রকাশ করি নাই। কিন্তু যিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিলে কেবল প্রাতঃস্মরণীয় অক্রূর দত্ত মহাশয়ের বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন হইতেন না, বঙ্গসমাজেরও একটী উজ্জ্বল রত্ন হইতেন, তাঁহার শোকগীতিতে সাধারণেরও দাবী আছে। তাঁহার "নিদ্রাভঙ্গে" কবিতার মত-প্রকৃত, প্রশান্ত স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা অল্পই প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি কবির প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়, সে কবিত্বশক্তি, সে প্রতিভা মকুলিত না হইতেই ঝরিয়া পড়িল! তিনি ১২ বৎসর হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; গত সালের আষাঢ়ের "জাহ্নবী" পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার "আনত-আননা" কবিতা পড়িলেই বুঝা যায়, তাঁহার মধ্যে কি মহাশক্তি নিহিত ছিল। সুন্দর গদ্যও তিনি লিখিতে পারিতেন; একখানি উপন্যাসও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধ্রুবলালের চরিত্রের বিশেষত্ব তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতায়; নামেও তিনি ধ্রুব ছিলেন, কাজেও সেই পৌরাণিক ধ্রুব ছিলেন,—আচারে, অনুষ্ঠানে, দৈনিক প্রতিকার্য্যে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, তাঁহার নিষ্ঠা সকলকে মোহিত ও স্তম্ভিত করিত। ১০ বৎসর বয়স হইতে তিনি পূজাহ্নিক আরম্ভ করিয়াছিলেন। মনে পড়ে, শিবপূজার উপকরণাদির অঙ্গহানি হওয়াতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন; তাঁহার নয়ন হইতে যেন স্বর্গের মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। পূজার সময় তাঁহার স্তবপাঠ শুনিলে নাস্তিকেরও চিত্ত ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হইয়া যাইত, দূর হইতে বোধ হইত যেন সামাধ্যায়ী সামবেদগান করিতেছেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ পণ্ডিতগণকেও বিস্মিত করিত। দত্তবংশে গায়ক বড় একটা জন্মেন নাই; বিনা শিক্ষায় তিনি সুকণ্ঠ ও সুগায়ক ছিলেন; দাদা আমার রূপে গুণে অতুলনীয় ছিলেন। সব জিনিষ সুন্দর সাজাইতে, নিজে সুন্দর সাজিতে, অশনে, বসনে, উপবেশনে সকল বিষয়ে সুন্দর ছিলেন; তাঁহার মত সৌন্দর্য্যের উপাসক অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি কবি ছিলেন, গায়ক ছিলেন, সকল বিষয়ে সুন্দর ছিলেন, অথচ এমন পবিত্র, নির্ম্মল স্বভাব সংসারে কয়টী মিলিবে? জমীদার পিতার একমাত্র বংশধর (চলিত ভাষায় যাহাকে আদুরে ছেলে বলে) হইয়াও তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ধর্ম্ম সকলের আদর্শ ছিল। তাঁহার অমায়িকতা, তাঁহার সরলতা, তাঁহার মিষ্টভাষিতা, তাঁহার শিষ্টাচারিতা সমস্ত আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব, কুটুম্বদিগকে মন্ত্রবৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; তাঁহার বিয়োগে বিশেষ পরিতপ্ত হন নাই, এমন কেহ পরিচিত নাই। দাদা ধ্রুবলালের বিয়োগে সংসার হইতে একটী অমূল্য রত্ন অপহৃত হইয়াছে।

(১)

আজি যে হয়েছে ধরা সকলি আঁধার,
মোর প্রাণে জাগিতেছে শুধু হাহাকার!
চারিধারে হা হুতাশ, বহে শুধু তপ্ত শ্বাস,
তোমার বিহনে দাদা শূন্য ঘর দ্বার!
দিলে কি অনুজে নিত্য বেদনের ভার!!

(২)

এক বৃন্তে দুটী ফুল ছিনু মোরা ফুটে,
কালের পরশে তুমি কোথা গেলে টুটে?
তোমাহারা হ'য়ে প্রাণ, মোর সদা ম্রিয়মাণ;
ভাবি রাতি দিন মান তুমি যে নিকটে,
কিন্তু হায় তব মুখ না পাই দেখিতে!!

(৩)

ধরা মাঝে তুমি সখা ছিলে প্রাণসম,
একাধারে ভ্রাতা বন্ধু কোথা তোমা সম!
আর কি গো এ সংসারে সাথীহারা পারাবারে
মিলিবে মিলিবে দাদা তোমার মতন!
জীবন-সর্ব্বস্ব-দেব ত্রিদিব-রতন!!

(৪)

তোমাহারা ধরণীতে হ'য়ে আজি একা,
তোমাহারা গৃহ দ্বার সকলি যে ফাঁকা;
তোমা হারা জন-সঙ্ঘ সে শুধু শূন্যের অঙ্গ!
(বসুন্ধরা) মম আত্মা-চাতকীর মরুভূমি প্রায়!
'বারিদে' 'বারিদে' বলি বৃথা ডাকি হায়

(৫)

তোমার মূরতিখানি হৃদে আঁকা আছে,
অশ্রু-আবরণে ঢাকা ম্লান হয় পাছে;
বসা'য়ে হৃদয়াসনে পূজা করি সযতনে
নিত্য প্রীতি-অর্ঘ্য দানি ভক্তিপুষ্প সাজে;
স্নেহভরে লয়ো দাদা অনুজ সকাশে।

(৬)

পিতামাতা জীবনের তুমি ধ্রুবতারা,
আছিলে গো এ ভুবনে নয়নের তারা;
হৃদয়-আকাশ হ'তে, সে তারা খসিয়া গেছে!
সে যুগ্ম হৃদয় এবে অন্ধকারে হারা!
নন্দন কানন হায় শ্মশানের পারা!!

(৭)

কত যে বাসেন ভাল পিতা মাতা তব,
লেখনী অক্ষম দাদা, বর্ণিতে সে সব!
ত্যজি গেছ এ ধরণী, মনে তাহা নাহি গণি,
সাজাইয়ে থালাখানি উদ্দেশে গো তব
দেন ধরি;—মনে করি খাবে চাঁদ ধ্রুব॥

(৮)

পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি তরে ধন্য এ ধরায়,
নহ তুমি সুস্থ দাদা গিয়ে অমরায়।
কায়াহীন, ছায়াহীন তবু এস প্রতিদিন,
নৈবেদ্যে রাখিতে চিহ্ন, জনক হিয়ায়
দিতে শান্তি; নাস্তিকেরে ভক্তি দিতে হায়!!

(৯)

মুখ্য হোতা ছিলে ভাই নব কর্ম্মযাগে,
কামনা-সাধনা-ধন লক্ষ্মী মহাভাগে;
বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, সিদ্ধযাগে দেয় সাক্ষী;
কুহকী ছলনে তাহা ভয় মনে লাগে!
সুসজ্জিত অর্হণার দশা হেরি বাজে!!

(১০)

নবীন পল্লবা-নবমঞ্জরী ভূষিতা
আছিল লতিকা আহা তোমারি আশ্রিতা!
সংসার-কাননে সুখে হাসি-বিকশিত মুখে,
লজ্জানম্র লতাবধূ এবে সে লুটিতা!
কালের কুঠারে ছিন্ন হয়ে মুকুলিতা!!

(১১)

প্রাণ না জুড়াবে আর সুললিত তানে,
গৃহ যে ঝঙ্কৃত সদা হ'ত তব গানে;
থেমে গেছে সে ঝঙ্কার, ছিঁড়েছে সুরের তার,
পশিবে না ভেরী সম "নিদ্রাভঙ্গে" কাণে;
পিতে কাব্য-সুধা-ধারা বিধির-বিধানে।

(১২)

নিরাশা হ'ল গো সাথী এবে অনুখন,
তুজনার মাঝে ছিলে চুম্বকাকর্ষণ;
আকর্ষণ গেছে সরে, নিরাশারে বুকে ধরে,
তুমি নাই বলে (যে গো)নিরানন্দ প্রতিধ্বন
হাহাকার ভরা শুধু হল (মোর)এ জীবন!

(১৩)

অচলা ভকতি ছিল তব বিভুপদে,
তাই যে লভেছ স্থান পুণ্য সত্যপদে;
স্বরগ মরত মাঝ সন্ধিসূত্র সম আছ;
স্বর্বার্ত্তা বহ ভাই বাস যথা বাসদে;
মন্দাকিনী দেবারণ্যজাত পারিজাতে॥

(১৪)

শয়নে স্বপনে অশনে বা জাগরণে
সম সুরে তুটী প্রাণ বাজিত ভুবনে;
শুধু দেহে ছিল ভেদ, মনে প্রাণে নাহি ভেদ;
মিলন প্রভাতে (হায়) ভেদনিশা আগমনে
থেমে গেল মর্ম্মকথা সজল নয়নে!!

(১৫)

বড় সাধ ছিল মনে র'ব চির তোমাসনে!
করে কর বেঁধে দোঁহে উজলি ভবনে!
সাধ না পূরিল হায় কেঁদে মোর দিন যায়!
মরণ না পরশিবে ভেবেছিনু মনে;
চলে গিয়ে ভেঙ্গে দিলে সুখের স্বপনে॥

(১৬)

নিয়তির পাশে বাঁধা মানব জীবন,
সহিতে বহিতে হ'বে বিধির শাসন;
জ্ঞানহীন, স্পন্দহীন, অভিযোগ বাক্যহীন,
জীবন রহিল শুধু মুছিতে নয়ন;
কর্ম্মফলগতি কেবা করে নিরূপণ?

(১৭)

জন্মান্তরে পাপবৃক্ষ রোপিনু অজ্ঞানে
এ জনমে ফল তার এঁড়াব কেমনে!
জনক গাণ্ডীবধারী, মাতুল যে চক্রধারী,
অভিমন্যু ত্যজে প্রাণ সমর অধর্ম্মে
কৃষ্ণসখা পুত্রহারা আপন করমে !!

(১৮)

কি ছার মানব মোরা ভুঞ্জিব না ফল!
ফলভোগ তরে শুধু আসি ধরাতল;
রোধিতে প্রলয়বাত অক্ষম মানবহাত;
ঋষির পুরুষকার মোরা যে দুর্ব্বল
কোথা পাব? লভিতে গো সেই তপোবল?

(১৯)

কবে গো করমফল হবে অবসান!
মিশে যাব তাঁর দেহে লভিয়া নির্ব্বাণ?
কিছুই না জানি তাঁর ঘুচাইতে জন্মান্তর!
তাঁহারি চরণে শুধু সঁপি মনপ্রাণ,
ফলাফল নাহি ভাব কর্ম্মে আগুয়ান॥

(২০)

বায়ুর হিল্লোলে তব স্মৃতি বিজড়িত,
প্রতি ঘরে ভ্রমে সদা ভাবি বিরাজিত;
সেই বায়ু সেই ঘর, সমুখেতে নিরন্তর,
কর্পূর চেয়ে ত্বরা পলকে অন্তর্হিত?
প্রাণহীন নিরানন্দ সব অনুমিত!!

(২১)

বুকফাটা তব দুখে যাপিব জীবন,
জীবন্মৃত হ'য়ে দিব সুখ বিসর্জ্জন;
কত মনে উচ্চ আশা, সাধতে ছিল গো আশা
মিলে দুটী ভাই মোরা করেছিনু পণ,
ভাঙ্গাবুকে সেই পণে রাখিব কেমন?

(২২)

হে মহান, হে তাপস, হে গুরু আমার!
তব তরে করিয়াছি আঁখি জলসার!
ভুঞ্জি দাদা স্বর্গসুখ হও পুনঃ ধরামুখ;
তোমা ছাড়া দাদা ধরা আঁধার আঁধার!
মিহির যে জ্যোতিহীন অভাবে তোমার!

শ্রীমিহিরলাল দত্ত বর্ম্মা।

পুরাতত্ত্ব। (২)

বা আশ্বিন কার্ত্তিকের "আষাঢ়ে" গল্প।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় আশ্বিন মাসের "দেবালয়ে" লিখিয়াছেন যে, অন্যূন লক্ষ বৎসর হইল সামবেদের উৎপত্তি হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় যাহা হউক লক্ষ বৎসরের মধ্যেই নির্ব্বাহ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কার্ত্তিকের "সুপ্রভাতে" শ্রীযুক্ত সত্যবন্ধু দাস রামায়ণ রচনার কালই পোনের লক্ষ সতের হাজার দশ বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য মহর্ষি বাল্মীকি যখন ত্রেতার মধ্যখানে জন্মিয়াছিলেন, তখন ত্রেতার অর্দ্ধেক সাড়ে ছ লক্ষ বৎসর ও সত্যের আরও কয়েক লক্ষ যোগ করিয়া তবে ভারতীয় সভ্যতার কাল নির্ণয় করিতে হইবে। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!! এই বিংশ শতাব্দীতেও মানুষ গম্ভীরভাবে সত্যের নামে এমন আষাঢ়ে গল্পের অবতারণা করিতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্য! ইঁহারা কেহই মূর্খ নহেন। ইঁহাদের লেখা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন কোন বিষয়ে ইঁহাদের অগাধ পাণ্ডিত্য রহিয়াছে। তবে কেন ইঁহারা এরূপ হাস্যজনক কথার অবতারণা করিয়াছেন? ইঁহাদের উদ্দেশ্য হিন্দুসভ্যতার গৌরব বর্দ্ধন। উদ্দেশ্য মহৎ, সন্দেহ নাই। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কথায় ইঁহাদের মনে হইয়াছে যে, তাঁহারা ভারতের গৌরব খর্ব্ব করিবার জন্য ব্যস্ত। এই জন্য ঐ গৌরব রক্ষা

বিষয়ে ইঁহাদের উৎসাহও অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। উৎসাহ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, গৌরব রক্ষা করিতে যাইয়া গৌরব নষ্ট হইতেছে কি না, তাহাও ইঁহারা দেখিবার অবসর পাইতেছেন না। উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু উৎসাহের আবেগে গড়িতে যাইয়া ইঁহারা ভাঙ্গিতেছেন মাত্র। অন্ততঃ শিব গড়িতে বানর গড়িয়া ফেলিয়াছেন। শতাব্দীকে সহস্রাব্দী বা লক্ষাব্দীতে পরিণত করিলেই হইল না, সময়ের অনুপাতে কার্য্যের হিসাব দিতে হইবে, নতুবা জগতের পাঠশালায় "গাধার টুপী" মাথায় দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে কাজের হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাই আর্য্যগণ বেদের মন্ত্র রচনা করিতেই ২৫ হাজার বৎসর কাটাইয়াছেন! কথাটাতে কি আর্য্যজাতির খুব গৌরব হইল? ভারতেরই যেন ইতিহাস নাই? জগতের তো আছে। ইতিহাস নাই বলিয়া কি, ইতিহাসের মাল মস্‌লাও নাই, মাল মস্‌লা ভারতে যেমন আছে, পৃথিবীর আর কোথায়ও তেমন আছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য গ্রীশ ছাড়া। সুতরাং বর্ত্তমান বিবর্ত্তনবাদের যুগে যা তা বলিলে গৌরব বৃদ্ধি পাইবে না। ভারতে একটা সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, আকাশ হইতে পড়ে নাই, ভারতের জল মাটীতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে জিনিষটা কি, তাহা আমরা ভারতের আবাহমান-প্রচলিত সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত হই। ক্রম-বিকাশের নিয়ম অনুসারে সেটা বিকশিত হইতে কত সময় লাগিবার কথা, তাহা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিতে সমর্থ। সুতরাং যেখানে হিসাবে হাজার পাওয়া যায়, সেখানে বার শত হইলে কিছু মারাত্মক হয় না। কিন্তু লক্ষ বলিলে নিতান্তই হাস্যাস্পদ হইতে হয় এবং গৌরবের হানি হয়। বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র যাহা এক বৎসরে শিখে, আর এক জনের সম্বন্ধে যদি বলা যায় যে, সে উহা এক শত বৎসরে শিখিয়াছিল, তাহা হইলে পশ্চাদুক্ত ব্যক্তির যেমন গৌরব করা হয়, দশ লক্ষ বিশ লক্ষ বৎসরের আম্‌দানি করিয়া ভারতেরও সেইরূপ গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা না বুঝিতে পারিয়া আমরা প্রাচীন আর্য্যজাতির গৌরবের হানি করিতেছি।

ভারতের ইতিহাস সঙ্কলনের উপকরণের অভাব নাই। তবে ইতিহাস হয় নাই কেন? ইতিহাস সঙ্কলন করিতে গেলেই আষাঢ়ে-গল্প-প্রসিদ্ধ লক্ষাব্দ কোট্যব্দের সঙ্কোচন করিতে হয়। অথচ এই লক্ষাব্দ কোট্যব্দের বহ্বারম্ভ দ্বারাই অজ্ঞলোকের বিস্ময় উৎপাদন করতঃ জীবিকা অর্জ্জন যাহাদের ব্যবসায়, তাহাদেরই হাতে ইতিহাস লিখিবার ভার ছিল। তাই ভারতে ইহিতাস হইল না। কিন্তু উপকরণ সঞ্চিতই রহিয়াছে। এই উপকরণের সাহায্যেই বিজ্ঞান আমাদিগকে বলিয়া দিবে, ভারতীয় সভ্যতার গড়ন বা ভাঙ্গনে কত সময় লাগিবার কথা। বিজ্ঞান কাহারও জীবিকার দিকে তাকাইবে না। আর এক কথা এই যে, কেবল ভারতেই সভ্যতার বিকাশ হয় নাই, জগতের আরও নানা দেশে সভ্যতা সূর্য্যের আবির্ভাব হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে একটী গ্রীক্ সভ্যতা—প্রাখর্য্যে কোনও ক্রমেই হিন্দু সভ্যতা অপেক্ষা হীনপ্রভ নহে। সভ্যতা সকলকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয় করিবার যে প্রথা (Historico-comparative" method) আছে, তাহার সাহায্যেও এখন সত্য নির্ণয় করা যাইতে পারিবে।

তদুদ্দেশ্যে আমরা আজ হিন্দু সভ্যতাকে গ্রীক্ সভ্যতার সহিত তুলনা করিয়া হিন্দু সভ্যতার কাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা পাইব।

সভ্যতার বিকাশে সব দেশেই কতকগুলি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তরগুলিকে যুগ শব্দে অভিহিত করা হয়। হিন্দু সভ্যতারও এই যুগ বিভাগ আছে, গ্রীক্ সভ্যতারও এই যুগ বিভাগ আছে। এই সব যুগে কে কি কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহা তাহাদের যুগ সাহিত্যে অক্ষয় অক্ষরে খোদিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা অনুমান করিতে হইবে না। যাহার দৃষ্টি আছে, তিনিই তাহা দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ। অব্দ ধরিয়া ভারতে এই যুগ নির্ণয় হয় না, কেন না, ভারতে ইতিহাস নাই। কিন্তু গ্রীশে ইতিহাস আছে। সুতরাং গ্রীক্ ও হিন্দুর কার্য্য-কারিতার পরিমাণ তুলনা করিয়া ভারতের কোন্ যুগ গঠনে কত কাল লাগিয়াছিল, তাহার মোটামুটি হিসাব বাহির করিতে কোনই কষ্ট হইবে না।

ভারতের ইতিহাসে বৈদিক যুগ বলিয়া একটী যুগ আমরা দেখিতে পাই। আর্য্যগণের ভারত প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধদেবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত কালকে বৈদিক যুগ বলা যাইতে পারে। তারপর বৌদ্ধযুগ বা উপনিষদ্ যুগ, কেন না, উভয়েরই উৎপত্তি বৈদিক যাগযজ্ঞের প্রতিবাদ করিয়া। এই বৈদিক যুগেই আর্য্যগণ একটা সভ্যতার বিকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিস্তারত্ন মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে, আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন, তাঁহারা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ভারতে উলঙ্গ অবস্থায় প্রবেশ করেন নাই, সঙ্গে করিয়া সামবেদ লইয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং ভারত প্রবেশ কালে তাঁহারা অসভ্য বর্ব্বর ছিলেন না। আমাদেরও ইহাই বিশ্বাস এবং বেদাদি গ্রন্থে আর্য্যগণের কালা আদ্‌মিদের সঙ্গে যে সব লড়াইয়ের বর্ণনা আছে, তাহা যে কেবল ভারতেরই কথা, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। তাঁহারা কোন দূর দেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং পথে কত উপনিবেশ গড়িয়াছিলেন এবং কত দস্যুকর্তৃক উপদ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা কে নির্ণয় করিবে? কিন্তু ভারতে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা স্থায়ী বাসভূমি পাইয়াছিলেন এবং বিশ্রাম করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাই এইখানেই তাঁহাদের সভ্যতা পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের আর এক শাখা তেমনই গ্রীসে যাইয়া সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। ঐতিহাসিক-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে এই ভারত প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। এই বৈদিক-যুগের সভ্যতার বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগে যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাই বিচার করিতে হইবে। বেদের মন্ত্র রচনা করিতে যদি ২৫ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়া থাকে, তবে "ব্রাহ্মণা"-দিতে তাহার ব্যাখ্যায় আর কত হাজার বৎসর লাগিল, তাহা কে বলিয়া দিবে? তা যাই হোক্, এই সময় মধ্যে ভারতীয় আর্য্যগণ আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞানধর্ম্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য-বিজ্ঞানে যে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, সামাজিক রীতি নীতি, বিধিব্যবস্থা, আচার ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, আহার-বিহার, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া যে সভ্যতার বিকাশ করিয়াছিলেন, যাহার জ্বলন্ত প্রমাণ বেদমন্ত্রে ও "ব্রাহ্মণ" ভাগে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আর্য্যজাতির আর এক শাখা হিন্দুর

সহোদর ভ্রাতা গ্রীকগণের হোমরযুগের সভ্যতা অপেক্ষা কদাচিৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অথচ এই Homeric age-এর পরিমাণ কিঞ্চিদধিক পাঁচ শত বৎসর। যেমন আর্য্যগণের ভারত প্রবেশ হইতে বুদ্ধদেব পর্য্যন্ত বৈদিকযুগ, তেমনই হোমার হইতে এথেন্সের প্রাদুর্ভাব কাল অর্থাৎ য়্যাটিক (Attic) বা ক্লাসিকাল (Classical) যুগ পর্য্যন্ত হোমরযুগ—খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১০০০ হাজার হইতে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫০০ পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত। এখন বিচার্য্য এই যে, হিন্দুর বৈদিকযুগের পরিমাণ কত? গ্রীকের যেখানে ৫০০ বৎসর লাগিয়াছে, হিন্দুর না হয় ৭০০ বৎসর লাগুক—অবশ্য যদি বেশীর দিকে ঝোঁক থাকে, বিজ্ঞান-সম্মত কল্পনা ইহার বেশী উঠিতে পারে না। আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া কি করিতেছিলেন? বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করতঃ যথেষ্ট পরিমাণ গব্যঘৃতের সাহায্যে যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন এবং বৈদিক মন্ত্র সকলের চুলচেরা অর্থ করিয়া "ব্রাহ্মণ" সকল রচনা করিতেছিলেন, আর মুখস্থ করিতেছিলেন এবং জাতিভেদটাকে এমন পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন, যাহার চাপে দেশ "ত্রাহি মধুসূদন" বলিয়া ডাক ছাড়িয়াছিল। তাই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইলেন। এই মহাকার্য্য সাধনের জন্য আর্য্যজাতির মত একটী মনস্বী জাতির পাঁচ শত বৎসরের বেশী কিছুতেই লাগিতে পারে না। ইহার বেশী লাগিয়া থাকিলে আর্য্যজাতির আর্য্যত্বের গৌরব নষ্ট হইবে। কেন না, মন্ত্রে ও "ব্রাহ্মণে" যে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় আছে, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হয় এবং আর্য্যজাতির আর এক শাখা গ্রীসময়ের মধ্যেই এই কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। আজগুবি গল্প ছাড়িয়া যদি আর্য্যগণের ভারত প্রবেশের প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাহা আছে, তাহার দিকে দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলেও বুঝা যায় যে, তাঁহাদের ভারত প্রবেশ কাল খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর ওপারে যাইবে না। প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক অনুমান যখন একই কথা বলে, তখন তাহা অগ্রাহ্য করিয়া গৌরবের হানিকর কোনও আষাঢ়ে সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য নই। তার পর, সমগ্র গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে সমগ্র হিন্দু সভ্যতার তুলনা করিলেও এ কথা প্রমাণিত হইতে পারে। কোন কোন বিষয়ে হিন্দু সভ্যতা গ্রীক সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একথা যেমন ঠিক, আবার এমন কোন কোন বিষয় আছে, যাহাতে গ্রীক সভ্যতা হিন্দু সভ্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথাও তেমনই ঠিক। মোটের উপর উভয়কে সম শ্রেণীর ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যদিও জগতের পক্ষে উপকারিতা ও কার্য্যকারিতায় গ্রীকো-রোমান সভ্যতা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, ইহাই পণ্ডিতগণের মীমাংসা। আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত গ্রীকো-রোমাণ সভ্যতার পূর্ণপরিণতিতে ন্যূনাধিক বার শত বৎসরের বেশী লাগে নাই; আর হিন্দুর লাগিল কত? শতকে লক্ষে নিলেও কুলায় না। সত্যবন্ধু বাবুর কথা ছাড়িয়া দিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা ধরিলেও লক্ষের কাছাকাছি। যাঁহারা এইরূপ ভাবে হিন্দুর গৌরব রক্ষা করিতে ব্যস্ত, তাঁহারা হয় মনে করেন, আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া পঞ্চনদকূলে নিশ্চিন্ত মনে ভেরেণ্ডা ভাজিতেছিলেন, মাঝে মাঝে এক আধটা খই বা মুড়ী ভাজিয়া উঠিতেছিল, যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাই কুড়াইয়া তাঁহারা একখানা সভ্যতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন; না হয় ভাবেন, হিন্দুরা কুম্ভকর্ণের জাত, ইহাদের ছ মাসে একদিন, তাই এত সময় লাগিয়াছে,

নতুবা বলিতে হয়, গ্রীকের তুলনায় হিন্দুর মস্তিষ্ক অতি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক! তাই গ্রীকের যেখানে লাগিল পাঁচ শত, হিন্দুর লাগিল পাঁচ হাজার, দশহাজার, বিশ হাজার, পাঁচ লক্ষ, দশ লক্ষ, বিশ লক্ষ!! হিন্দুসভ্যতার বয়স বৃদ্ধির চেষ্টা-রূপ সমুদ্র মন্থনে ইহাই হিন্দুর পুরস্কার! "O Lord! Save us from our friends."

উপরে যে বিচার-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে একটা আপত্তি এই উঠিতে পারে যে, হিন্দুগণ গ্রীশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রীক হিন্দুর পুত্র, তাই তাহার উন্নতি তাড়াতাড়ি হইয়াছে—বাপকে যাহা অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল, পুত্র তাহা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়া সত্বর কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। প্রমাণের ভার আপত্তিকারীর উপর যে, গ্রীশ হিন্দু উপনিবেশ। অবশ্য বিদ্বৎমণ্ডলীর মধ্যে এ মত কখনও গৃহীত হয়ও নাই, হইবার সম্ভাবনাও কম। কেন না, কোন দিক হইতেই ইহার কোন প্রমাণ নাই। বিনা প্রমাণে একটা কথা কখনও গ্রাহ্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ লক্ষ লক্ষ বৎসরের যে লম্বা চৌড়া ফর্দ বাহির করা হয়, তাহার দোষ ইহাতেও স্খলিত হইবার নহে। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লক্ষ বৎসরের ফর্দ্দই বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ, তাহাও সত্যবন্ধু-সমুদ্রের এক কণিকা-মাত্র। তা যাক, গ্রীশ যে হিন্দু উপনিবেশ, সেই সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্। এ মতের সপক্ষে তো প্রমাণাভাব, কিন্তু বিপক্ষে অনুমান প্রমাণের অসদ্ভাব নাই। হিন্দুগণ কবে গিয়াছিলেন? যাইবার সময় কোন্ ভাষা লইয়া গিয়াছিলেন? সে সময়ে লিখন-প্রণালীর আবিষ্কার হইয়াছিল কি? অবশ্য সংস্কৃত ভাষাই লইয়া গিয়াছিলেন এবং লিখন প্রণালীও লইয়া গিয়াছিলেন। তবে সংস্কৃত ও গ্রীকে এত বিভিন্নতা কেন? যখন কোন সভ্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহার ভাষা কখনও এত বিভিন্ন হইতে পারেনা, প্রাচীন গ্রীক্ ও সংস্কৃতে যে বিভিন্নতা। গ্রীকেরাও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদের ভাষা গ্রীক্, ইংরেজও উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে, তাহাদের ভাষা ইংরাজী। পরিবর্ত্তন অতি সামান্য। "গ্রীশ যদি হিন্দুর উপনিবেশ হইত, তবে গ্রীক্‌ভাষার অস্থি মজ্জায় সংস্কৃতের ছাপ থাকিত, প্রাচীন গ্রীক্ সংস্কৃতের একটা প্রাদেশিক ভাষা হওয়া উচিত ছিল। তাহাতো নয়ই, বরং সাদৃশ্য যাহা, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। সংস্কৃতের সঙ্গে জেন্দের (পারসীক ভাষা) যে সম্বন্ধ, গ্রীকের সঙ্গে তাহা হইতেও দূরতর। সাদৃশ্য উল্টা দিকে ইহাই প্রমাণ করে যে, গ্রীক্ ও সংস্কৃত উভয়ে কোনও প্রাচীন ভাষার বিভিন্ন শাখা। পূর্ব্বে আর্য্যগণ সেই ভাষায় কথা বলিতেন। পরে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন ও ভাষা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উৎপত্তি স্থান এক বলিয়া কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে। গ্রীকগণ পৃথক হইবার পরে পারসিকগণ পৃথক হইয়াছেন, তাই জেন্দের সঙ্গে সংস্কৃতের সম্বন্ধ বেশী, কিন্তু তখনও সংস্কৃত জন্মে নাই এবং লিখন প্রণালীর আবিষ্কার হয় নাই। যাহা হউক, ভাষার দিক্ দিয়া বিচার করিলে গ্রীশ হিন্দুর উপনিবেশ, এ সিদ্ধান্ত কিছুতেই পাওয়া যায় না। বরং এই সিদ্ধান্তই হয় যে, উভয়ে এক আর্য্য শাখাভুক্ত, বহু প্রাচীন কালে বিভক্ত কিন্তু এক জন আর এক জন হইতে উৎপন্ন নহে। ভাই ভাই সম্বন্ধ, পিতা পুত্র সম্বন্ধ নহে। জোর করিয়া বলিলে চলিবে না: যে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যাইয়া হিন্দুরা উপ-

নিবেশ করিয়াছিল, কেন না, তোমার "যেন" ছ মাসে দিন, গ্রীসের যে ইতিহাস আছে। তারপর, উপনিবেশে যে সভ্যতা বিস্তারিত হয়,তার একটা প্রণালী আছে; সে প্রণালীর সঙ্গেও মিলিতেছে না। গ্রীশও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। গ্রীশের গৌরব-মুকুটের অনেক মণি উপনিবেশ হইতেই সংগৃহীত। য়ুরোপীয়গণ উপনিবেশ করিতেছেন। কিন্তু তাহারা দেশ ছাড়িয়া গিয়া অর্ব্বাচীনের মত উপনিবেশে সভ্যতা গড়িয়া তুলিতেছে না। যাইবার সময় বেকন বা ডেকার্ট, গ্যালিলিও বা কোপার্ণিকাশ্, কেপ্লার বা নিউটন পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে না। যাহা দেশ হইতে লইয়া গিয়াছে, তাহাই মূলধন করিয়া অগ্রসর হইতেছে—যুবক যেমন এক হিন্দু হইতে গৃহান্তরে যাইয়া বাস করে, তেমনি করিতেছে, শিশুর মতন বাড়িতেছে না। তাই ইংলণ্ডে কেল্‌ভিন আর আমেরিকায় এডিসন্। তাই ইংলণ্ডে সলি, ষ্টাউট্ আর আমেরিকায় জেমস্ ল্যাড্ (Sally, Stout, James Ladd)। ভারতেও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের উপনিবেশ হইয়াছে, ফল—জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র। কিন্তু গ্রীশে হিন্দু উপনিবেশের তো এরূপ কোন চিহ্ন দেখি না। প্রৌঢ় যাইয়া পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া ঘরকন্না করিতেছে, তাহাতো নহেই। বরং দেখি শিশু খেলনা লইয়া খেলা করিতে করিতেই অগ্রসর হইতেছে। অর্থাৎ ভারতেও যেমন সভ্যতায় ক খ হইতে আরম্ভ হইয়া হ ক্ষ হইয়াছে, গ্রীশেও তাই, গ্রীশেও সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে, ভারতবৃক্ষের ফল সেখানে ঝরিয়া পড়ে নাই বা কলমের গাছে এক বছরেই ফল ফলে নাই। গ্রীশ ভারতের উপনিবেশ হইলে গ্রীক্ দর্শন থেলিস্ (Thales) হইতে আরব্ধ হইয়া সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া নব প্লেতনীয়া মতে আসিয়া পরিণত হইত না, কিন্তু প্লতিনাস্ (Plotinus) বা ফাইলো (Philo) হইতেই আরম্ভ হইত—হিন্দুর নাটক যেমন প্রথম হইতেই পূর্ণাঙ্গ হইয়া আরম্ভ হইয়াছে, ফাইলো-প্লতিনাস্ দর্শন খ্রীষ্টোত্তর শতাব্দীতে গ্রীকোপনিবেশ আলোকজান্ড্রিয়াতে উৎপন্ন না হইয়া খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব সহস্রাব্দে হিন্দু উপনিবেশ (!!!) গ্রীশে আভির্ভূত হইত। ইতিহাসের এই সামান্য হের ফের যদি অধিগম্য না হয়, তবে বিচার পণ্ডশ্রম মাত্র। যদি কেহ একথা বলেন যে, হিন্দুগণ ভারতে মরিয়া গ্রীশে যাইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন এবং পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার বলে শীগ্‌গির শাগ্‌গির সভ্যতার সৃষ্টি করিতেন, তবে আমরা হার মানিয়া বিচার খতম করিলাম, যেহেতু আষাঢ়ে কল্পনার পশ্চাতে উড়িবার শক্তি আমাদের নাই। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

পৃথিবী।

'হে ধরণি সর্ব্বসহা—হে শ্যামসুন্দরি !
মানবের তুমি চির আকাঙ্ক্ষার স্থল !
তব আলো—অন্ধকার, দিবা বিভাবরী,
কঠোর সমস্যাপূর্ণ—রহস্য কেবল !

সুনীল সাগরাম্বরা দীপ্ত তারাকেশ ;
চিরদিন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি অভিনব,
পলে পলে বেড়ে শোভা চারু অঙ্গদেশ,
তৃণ, তরু, লতা, গুল্মে কামরূপী ভব !

আমারে বেরিয়ে আছ হে সুরসুন্দরি,
তব তনু বিস্থড়িত সৌন্দর্য্য-বেষ্টনে ;
তারা, শশী, ফুল, ফল হেরি মনে করি,
সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সার এ মরু জীবনে।
হেরি মহানীল-সিন্ধু—বাড়ব অনল,
বিশাল অরণ্য, মরু, উত্তুঙ্গ অচল ! (১)

আজি বহু বর্ষ গত এ নর-জীবনে,
মজিয়া তোমার তত্বে আছি অচেতন ;
আলোকে আঁধারে কিম্বা শয়নে, স্বপনে ;
চিরমুগ্ধ হেরি তব শ্যামল বরণ ;
যায় যত মাস বর্ষ, তত মনে হয়,
শোভার উপরে শোভা ঘনাইয়ে রবে ;
কুসুম-কুন্তলা তব রূপ মধুময় !
চিরদিন ভাবুকের প্রাণ কাড়ি লবে।
এমনি রবে গো তুমি অনন্ত-যৌবনা,
সুধা ভরা কবিত্বের চিরপূর্ণ খনি,
এমনি মধুর ভাবে রবে গো মগনা,
বিশ্বের ললাটে স্নিগ্ধ তারারূপ মণি !
তোমার দুর্ভেদ্য দৃঢ় মোহের বন্ধন,
খুলিতে দুর্ব্বল জীব অন্ধ অচেতন। (২)

সেই কোন্ গতযুগে—নহি জাতিস্মর,
অঙ্কুরিত নররূপে অজ্ঞান জীবন ;
যুগ যুগান্তর গত জন্মজন্মান্তর,
কোথা অতীতের স্মৃতি চির সুশোভন !
নিঃশব্দে নিশীথে মৃদু শিশির বর্ষণে,
প্রভাতে পাষাণ বুক হয় সুশীতল !
অলক্ষ্যে সঞ্চরে তব দেহরস বনে,
যে অমৃতে বাঁচে এই মর্ত্ত্য-জীবদল !
কোথা সে লুকান মর্ম্মস্পর্শী শক্তিকণা,
পর্ব্বত পাষাণে হয় ঘন ভূকম্পন !
নিশ্চল শবের সম বিগত চেতনা,
লভে কোন্ অনুভূতি—নব জাগরণ !
রসরক্ত প্রবাহিত অস্থি মজ্জা মেদে,
ও জড় মৃত্তিকা বাঁধি আছ কি অভেদে ! (৩)

বিলোল লহরীময় সিন্ধু বিলোড়িয়া,
উর্দ্ধে তুঙ্গ শৃঙ্গ তুলি উঠে শৈলরাজ ;
সে জড় চৈতন্যরূপী অনন্ত মথিয়া ;
ভ্রূভঙ্গে গণিছে নিত্য জ্যোতিষ্ক সমাজ !
ভেদী স্বচ্ছ সরবক্ষ নধর মৃণালে,
মৃদুল সমীর স্পর্শে দোলে শতদল ;
কি ক্ষিপ্র তড়িত-লতা সৌন্দর্য্যের জালে,
আলোকে উজল করে বিমান অঞ্চল !
তারকা সুদূর নভে বিতরি কিরণ,
শোভে দীপ্তরত্ন রূপে সন্ধ্যার কুন্তলে ;
লইয়ে অরুণকান্তি—বাস বিমোহন,—
গোলাপ কমল কত ফোটে দলে দলে।
সূর্য্যের কিরণ যথা ব্রহ্মাণ্ড কায়ায়,
তেমতি সৌন্দর্য্য-জাল বেষ্টিত তোমায় ! (৪)

জীবন্ত সৌন্দর্য্য কত—সংখ্যা নাহি তার,
সময়ে সকলি ভবে হয় জ্যোতিষ্মান !
সুন্দর সে প্রজাপতি—ইন্দ্রধনু হার,
শ্বাপদ বিহগ দেহ সবি দীপ্তিমান্ !
প্রান্তরে শ্যামল শষ্প বন গুল্মদল,
মরি কি সৌন্দর্য্যে ভাসে হয়ে শ্যামময় !
ত্যজি গর্ভবাস বিশ্বে রহি এক পল,
মোহি আঁখি কীট কত হয়ে যায় লয় !
দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা লয়ে মর্ত্ত্য-জীবগণ,
মৃত্যুহরী সঞ্জীবনী লভিতে উন্মাদ ;
অনন্ত জড়ের রাজ্যে গিরি নদী বন ;
সৌন্দর্য্য ধরিতে বুকে গণিছে প্রমাদ !
সুবর্ণ ধূলির মত দেহরেণু ভার,
দিতেছে ছড়ায়ে সবে অন্তে আপনার। (৫)

অসীম শকতি তব হিয়া কেন্দ্র হ'তে,
উচ্ছ্বসিত শতধারে জীবের হিয়ায়,
প্রতি দেহে প্রতি রূপে কতশত মতে,
প্রজ্জ্বলিত তেজবহ্নি মহা-আকাঙ্ক্ষায় !
নাহি বিশ্বে অবসাদ—শুধু কর্ম্মরত,
বিধির বিশাল সৃষ্টি নিজ মহিমায় ;
কেন তবে মম হৃদি চিরসংজ্ঞাহত !
আমি কি কোথাও গো হ ত্যজিয়ে তোমায় ?—
কোথায় আছিনু—কিছু নাহি নিদর্শন,
লুপ্ত স্মৃতি অতীতের বিস্মৃত আঁধারে ;
আছে কি লুকান কোন নিভৃত ভুবন,
শৃঙ্খলিত জীব-আত্মা রুদ্ধ-কারাগারে ;
চূর্ণ বক্ষ, চূর্ণ স্মৃতি, অজ্ঞাত চিন্তায়,
কি সংযোগ লয়ে আছি তোমায় আমায় ! (৬)

কোথা উষা কোথা সন্ধ্যা কোথা দিন পল,
পৃথিবী ! আমার কোথা চিন্তার বিরাম !
সতত চিন্তার তাপে মরম বিকল,
চিন্তায় ডুবেছে মোর স্মৃতি অভিরাম !
কেমনে চিন্তার চিতা হবে গো নির্ব্বাণ,
চিন্তায় বিশুষ্ক বুক—মহা মরুময় ;
ধরেছি দুর্ব্বল হৃদে কি মহাশ্মশান,

জীবন, যৌবন, মন সবি ভস্মময় ;
বুঝাও আমারে তব নিগূঢ় প্রকৃতি।
অপূর্ব্ব মানবতত্ত্ব রহস্য-জড়িত ;
ঐহিক সুখের তৃষ্ণা—মর্ত্ত্যবাস-স্মৃতি,
নশ্বর জীবনে চির বদ্ধ, আলি-স্থিত !
পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, হর্ষ ও বিষাদ,
নির্ণয় করিতে সদা গণি যে প্রমাদ ! (৭)

ও তব প্রভাত নাহি হেরিলে নয়ন,
খুলি শত রুদ্ধ উৎস চিন্না উচ্ছ্বসিত !
হে শ্যামাঙ্গ, শ্যামকান্তি নেত্র-বিমোহন !
জুড়ায় জীবন তাপ—এ ব্যথিত চিত।
মোর পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি সমুজ্জ্বল,
রয়েছে জড়িত তব মধুর অধরে ;
শোভিছে সরসে কিবা নলিনী কোমল
চিবুক চ—কিবা কান্তি কদম্ব-কেশরে !
যেন কোন মধ্য বিশ্ব বক্ষ বিদারিয়া,
কক্ষ-ভ্রষ্ট তারা কোন অব্যর্থ সন্ধানে,
লইয়ে বিদগ্ধ তৃষা পড়ে আছাড়িয়া ;
তেমতি ছুটেছে প্রাণ চাহি তব পানে ;
কোন দ্রাক্ষাচ্যুত রস—এ তীব্র মদিরা !
মানব অধীর চির—মানবী অধীরা ! (৮)

যথা বৃক্ষে তন্তুজালে গুটিকার গতি,
লভিয়ে চেতনা পুনঃ রুদ্ধ হয়ে ক্ষণ,
বাহিরায় নববেশে হ'য়ে প্রজাপতি,
তেমতি কি লোকান্তরে মানব জীবন।
আবার কি ধরামুখ হেরিবে নয়ন,
আবার ফুটিবে কি এ স্মৃতি-শতদল !
আবার কি স্মৃতিভরা হেরিব স্বপন !
বহাইয়ে উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ চঞ্চল !
জীবন কি জন্মমৃত্যু ঋতু আবর্ত্তন !
কর্ম্মগুণে সুখে দুঃখে আলোকে ছায়ায় !
মর্ত্ত্যপথ পান্থশালে আগম নির্গম,
কেন হায় নিরন্তর লয়ে জড়কায় !
হে বরমোহিনী কোন্ মোহমন্ত্র বলে,
ভুলায়ে রেখেছ এই মানব মণ্ডলে ! (৯)

তুমি যাদুকরী আমি ক্রীড়ার পুত্তলী,
যা' ইচ্ছা কর গো মোরে ধরি' অবহেলে ;
মম আত্মা-মীন কালতড়াগে কেবলি,
ও সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে অবিরাম খেলে ;
কি ছিনু কোথায় আছি ভাবিয়া না পাই,
ভ্রমি শুধু অন্ধকারে লয়ে এ জীবন ;
উত্তাল জ্ঞানের সিন্ধু আদি অন্ত নাই,
তরঙ্গে যেতেছি ভেসে তৃণের মতন।
ধরণি ! ধরেছ মোরে, নাহি দাও ধরা,
দেছ শুধু বিষভরা মরম বেদন ;
করেছ সাথের সাথী আধি ব্যাধি জরা,
নিবিড় আঁধারে ভরি' আত্মা-নিকেতন !
শ্মশানসৈকতে শেষে মোর ভস্মস্তূপে,
কি শক্তি বিকাশ নব হবে কোন্ রূপে ! (১০)

আশার জীবন-সরে সোণার নলিনী ;
দীপ্ত-রৌদ্র করে ম্লান মাধুর্য্য বিমল,
কভু দেবীরূপা কভু কাল চণ্ডালিনী,
কভু সুধামৃত লভি কভু হলাহল !
কভু বরষার নীল ঘন ঘোরঘটা,
কভু শরতের হাসি—জ্যোৎস্না সুন্দর ;
বসন্তের স্বর্ণপত্রে সিন্দুরের ছটা,
সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ কান্তি আনন্দ লহর !
কত স্মৃতি বিজড়িত তোমার মাঝারে,
রহিল আমার এই নশ্বর জীবনে ;
রব যবে অতীতের বিস্মৃতি আঁধারে !
হেরিব প্রেমেতে তোমা তৃষিত নয়নে !
বুকভরা প্রাণভরা এত ভালবাসা,
লভেছি তোমাতে বাঁধি দু'দিনের বাসা ! (১১)

আমি ভুলিবনা কভু থাকিতে জীবন ;
ও দীপ্ত অরুণরাগ করুণ অধরে ;
লতাপুষ্পপত্রজালে অঞ্চল শোভন !
তারকা হীরকদাম সুনীল অম্বরে !
কানন কুসুম মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
নির্ম্মলা নদীর গতি মন্থর গমনে ;
জীবনে মরণে আমি কত ভালবাসি
পিককণ্ঠে মধুগীতি প্রভাত কূজনে !
রেখো স্মৃতি সৌন্দর্য্যের মেদিনী সুন্দরি !
রেখো প্রেমসুধা বুকে চির নিরমল ;
রেখো দীপ্তি জ্যোতির্ম্ময়ি ! দিবা বিভাবরী,
জন্মে জন্মে জীববুকে আশার সম্বল !
ধরিত্রি ! বিশ্বের শক্তি তব মৃত্তিকায়,
নশ্বর জীবন-স্মৃতি জাগ্রত আত্মায় ! (১২)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

বঙ্গের গৌরব ও অনভিষিক্ত

নেতা রমেশচন্দ্র।

আগমন—কলিকাতা, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ই আগষ্ট।

দুর্ভিক্ষ-সেবা—১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, নদীয়ার ভীষণ দুর্ভিক্ষ।

প্লাবন-সেবা—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, বরিশালের অন্তর্গত দক্ষিণ সাহাবাজপুর।

তিরোধান—বরোদা, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ, ২৯শে নবেম্বর।

কেহ আসেন হাসিতে ও হাসাইতে, কেহ আসেন কাঁদিতে ও কাঁদাইতে, কেহ আসেন চলিতে ও চালাইতে এবং এই জগতে কেহ আসেন উঠিতে এবং উঠাইতে। জগতে যাহা, ভারতেও তাহার আভাস পাওয়া যায় এবং ভারতে যাহা সম্ভব, এই বঙ্গে তাহারই প্রদীপ্তি। জগতে এবং ভারতে চিরকালই মহাপুরুষের অভ্যুত্থান হইয়াছে। এবং এই বঙ্গে? শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামমোহন কি যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ নহেন? আবার বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ? ইতিহাস এ কথার প্রকৃত উত্তর রচনা করিতেছে।

বঙ্গের যে যুগ-প্রবাহ আমাদের চক্ষের সম্মুখ দিয়া চমকিয়া চলিয়া গেল, এ যুগ-প্রবাহ সামান্য নহে। এই বঙ্গে এমন সব মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন, যাঁহারা আজীবন নিজকে, দেশকে ও দশকে উঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জীবিতদের কথা বাদ দিলেও, যে যুগে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র মহাকবি; দীনেশচরণ, নিত্যকৃষ্ণ ও বিহারীলাল গীতি-কবি; রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক; রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ ভক্ত ও সাধক; রসিককৃষ্ণ, রামতনু ও রাজনারায়ণ সমাজ-সংস্কারক; বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য-লেখক; দীনবন্ধু, রাজকৃষ্ণ, উপেন্দ্রনাথ নাট্য-লেখক; রাজকৃষ্ণ, রাজেন্দ্রলাল, রামদাস ঐতিহাসিক; স্বর্ণময়ী, বিদ্যাসাগর, তারক-প্রামাণিক দাতা; রামগোপাল, হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণদাস রাজনীতিজ্ঞ; আনন্দমোহন, উমেশচন্দ্র, মনোমোহন স্বদেশ-সেবক; কালীচরণ, প্রতাপচন্দ্র ও লালমোহন বক্তা; শম্ভুচন্দ্র, লালবিহারী, নগেন্দ্রনাথ ইংরাজি-লেখক; সে যুগ অসামান্য নয় কি? বঙ্গের উপর দিয়া যে যুগ-প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে, সত্যই তাহার তুলনা নাই।

আমরা ভাবিতেছিলাম—তিনের মিলন, তিনের কাহিনী, তিনের অনিন্দিত বাল্য-চরিত্রের কথা। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া তিনের কথা ভাবাই এদেশের চিরন্তন প্রথা। তিন তিন করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বঙ্গের আর তিনে আমরা উপনীত হইলাম। এক পথে তিন পথিক, এক শাখায় তিন পাখী, এক রথে তিন সারথী, এক ক্ষেত্রে তিন কৃষক। পাখীরা অপূর্ব্ব সঙ্গীত গাহিল, সারথীরা অপূর্ব্ব ভাবে রথ চালাইলেন, কৃষকেরা কর্ম্মক্ষেত্রে অপূর্ব্ব কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বঙ্গ এবং সেই সঙ্গে ভারত নব-সঙ্গীতে মাতিয়া উঠিল, নূতন

সোপান প্রচণ্ড হইলে, বঙ্গ ও ভারত ধনধান্যে শোভিত হইয়া উঠিল। তিনের একজন Judas Iscariotএর ন্যায় Lost Prophet, কিন্তু আর দুইজন মহামহিমান্বিত স্বরে "মাতৃ" নাম উচ্চারণ করিলেন, আর দেশ জাগিয়া উঠিল। সে স্বর শুনিয়া আমরাও ঘুমের ঘোর হইতে জাগিয়া উঠিলাম,—চাহিয়া দেখি, তাঁহাদের একজন "স্বর্গে"—প্রয়াণ করিতেছেন! কি জানি কেন, আমাদের দুনয়নে ধারা বহিতে লাগিল। হায় বিধাতঃ, এ কি হইল!

সেই একজন কে? লিখিতে চাই, কিন্তু আজ আর লেখনী সরে না। তিনি এমন একজন, যাঁহার তুলনা এ বঙ্গের কুত্রাপি একাধারে মিলে নাই। তিনি এক কথায় এদেশের সকল নেতার সার-চুম্বক, তিনি বাঙ্গালীর গৌরব, মাতৃসেবার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট, অনভিষিক্ত নেতা রমেশচন্দ্র।

বরোদা ভারতের সুখ-স্বপ্ন। মল্হার রাও গুইকোয়াড় যখন নির্ব্বাসিত হইলেন, ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর লোক সাশ্রুনেত্রে বিধাতার দিকে চাহিয়া প্রার্থনার লিপি প্রেরণ করিল। সেই অগণিত এবং অলিখিত প্রার্থনার ফলে এক অজানিত শিশুর পরিণতিতে দেবতার আবির্ভাব হইল। রাজার বেশ ঠেলিয়া ফেলিয়া সে স্বদেশ প্রেম ভূষণে ভূষিত হইল। সে কি বলে, কি করে, ভারত আজ দিবারাত্রি তাহাই জানিবার জন্য লালায়িত। আর অন্যেরা? তাহারা নাকি কত কি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে! দেখিতেছে, দেখুক,—দেখিতে দেও।

বরোদা—ভারতের নব আশা। সেই আশা বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিতেছিলেন, অসেচনক রমেশচন্দ্র! হায়, তাঁহার তিরোধানে আজ যে 'বঙ্গে', শুধু বঙ্গ কেন, ভারতে যে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইবে, কিছুই বিচিত্র নয়। ভারতের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—তাহা কখনও নিরাকৃত হইবার নয়।

রমেশচন্দ্র কে ছিলেন এবং কি ছিলেন, নানা জনে, নানা কথায়, নানা ভাষায়, নানা গাথায় তাহা ঘোষণা করিতেছে। ভারতের কত জাতি, কত জাতির কত ভাষা—সব জাতির সব ভাষা আজ হাহাকারে পূর্ণ! ভারতের বহু ঘটনার সহিত যে জীবনা বিজড়িত, সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তাহা নিবদ্ধ হইবার নহে, কালে তাহা অভিব্যক্ত হইবে। রমেশচন্দ্রের বাহিরের পোষাক দেখিয়া ইংরাজ ভ্রমে পড়িয়া ভাবিত—তিনি বুঝি তাহাদেরই সহচর—গোলাম, পদলেহক। ভাবিত এবং উৎফুল্ল হইত! কিন্তু কর্জ্জন বুঝিয়া গেলেন—এ সামান্য বিষধর নয়—এ বৈরী অসাধারণ! ইংরাজগণ বুঝিয়া শেষে গাহিলেন—"Mr. Romesh Chandra Dutt belonged to the best type of the Indian gentleman, steadfast in loyal service to the State,—giving freely of his best both to the Government to which he owed so much, and to his race of which he was so proud." I. D. Dec., 1909.

রমেশচন্দ্রের বাহিরের পোষাকের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, এমন একখানি খাঁটী স্বদেশ-প্রেম-পূর্ণ হৃদয়, যাহা নিত্য স্বদেশের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা চিন্তনে ম্রিয়মাণ থাকিত। তিনি মৈমনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট—ষ্টীমারে উঠিয়া এক মুন্সেফ সহযাত্রী পাইলেন। মুন্সেফ বাবু ইংরাজীতে কথা বলিতে লাগিলেন—রমেশ বাবু বলিলেন—"দেখুন—আমরা বাঙ্গালী, আমাদের একটা ভাষা আছে, আফিসে ইংরাজি বলিতে হয় বাধ্য হইয়া, ঘরে, পথে, বাজারে কেন আমরা ইংরাজী বলিব?" মুন্সেফ

বাবু সে কথা শুনিয়া অবাক্। চাহিয়া দেখিলেন, রমেশ বাবুর চক্ষু জলে ভাসিয়া গিয়াছে। বুঝিলেন—স্বদেশ এবং স্বজাতি-প্রেম দেহ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট। তিনি মোহিত হইলেন; মুখে আর কথা সরিল না, লজ্জায় মৃতবৎ হইলেন। ইহা ত একটী সামান্য ঘটনা। এইরূপ কত ঘটনা জানি। কিন্তু সে সকল লিখিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে বা ব্যক্তিত্ব-জড়িত-সম্বন্ধ প্রচার করিতে ইচ্ছা করি না। ঐ একটী ঘটনায় প্রকাশিত হয়—তাঁহার স্বদেশ-প্রেম কত গভীর, কত দুরবগাহ। এই স্বদেশপ্রেমেই রমেশচন্দ্র বাঙ্গালার গৌরব।

বাস্তবিকই রমেশ চরিত্র—প্রহেলিকাময়—দুরবগাহ। কোন্ কার্য্য কি জন্য করিয়াছেন, তাহা কখনও ব্যাখ্যা করেন নাই—শুধু করিয়াই গিয়াছেন। উল্লম্ফন বা উৎকম্পন তদীয় জীবনে কেহ কখনও দেখে নাই—যেন অবাত-কম্পিত প্রদীপ। এক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ করিতেই ভালবাসিতেন। সমুদ্র-যাত্রার সপক্ষে মত প্রচার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে অনন্য-সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, ঘোর প্রতিবাদ আন্দোলন সত্ত্বেও, ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়া রমেশচন্দ্র, তেমনি, জলন্ত তেজস্ফুরিত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি যেন অবাত-কম্পিত প্রদীপবৎ ছিলেন। তিনি আদর্শ সমাজ-সংস্কারক—এই কার্য্যে তিনি কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। তিনি কায়স্থ হইয়াও একটী মেয়েকে বৈদ্যের সহিত ও আর একটীকে জনৈক আসামী ভদ্রলোকের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে পুত্রের বিবাহ দিয়া, এই গুণের চরম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

দয়ায় তিনি ছিলেন যেন দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর। বড় ঘরের ছেলে, বড় চাকরী করেন, তবুও গরীব কাঙ্গালের জন্য ব্যথিত, চিন্তিত। কোথায় কোন্ লোক জলে ভাসিয়া যাইতেছে, রমেশচন্দ্র রক্ষার জন্য ছুটিতেছেন; কোথায় কোন্ লোক দুর্ভিক্ষে প্রাণ দিতেছে, রমেশচন্দ্র ধাবিত হইয়া সেখানে যাইতেছেন। আমরা মনুষ্যত্বের প্রধান নিদর্শন মনে করি, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি। এই এক গুণে বিবেকানন্দ এদেশে অমর হইয়াছেন। তিনি বলিতেন, "তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সব তুচ্ছ, যদি দরিদ্র কাঙ্গালদের জন্য তোমাদের প্রাণ না কাঁদে।" দরিদ্র কাঙ্গালগণ যে বিশ্বপতির নিভৃত কক্ষের একমাত্র সান্ত্বনা। খ্রীষ্ট বলিতেন, সূচী-ছিদ্রের ভিতর দিয়া উষ্ট্রের গমন সম্ভব, কিন্তু ধনীদের স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নয়। খ্রীষ্ট ছিলেন কাঙ্গাল-সখা, চৈতন্য ছিলেন দরিদ্র-বন্ধু, এবং বিবেকানন্দ ছিলেন, কাঙ্গালের ভাই। আমরা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় আরামে দিন কাটাই, আর কত কত দরিদ্র অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করে! এদেশে কয়জন দরিদ্রের বন্ধু পাওয়া যায়? অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, ভারতের জর্জমূলার সাধু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত * স্বর্গে গিয়াছেন, অনাথগণ আজ কাঁদিয়া বক্ষ ভাসাইতেছে, কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? ভারতের বার্ণারডো, আতুরাশ্রমের সাধু আনন্দ মোহন বিশ্বাস শিশুদের ক্রন্দনে কর্ণপাত করুন। যেখানে সম্মান ও যশের কুহক, সেখানে অনেক লোক ছুটিয়া থাকে, কিন্তু কাঙ্গালগণ চির অস্পৃশ্য, সদা ঘৃণ্য, নিত্য-পরিত্যক্ত! রমেশচন্দ্র এদেশের দারিদ্র্য সমস্যা.

* আগমন—দরজিপাড়া, ১৮৫১ খ্রীঃ, ফেব্রুয়ারি, তিরোধান—অনাথাশ্রম, ২৬শে নবেম্বর, শুক্রবার, ১৯০৯।

মীমাংসার জন্য আজীবন খাটিয়াছিলেন; দরিদ্রদের রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন,* এই জন্য আজ আমরা তাঁহার তিরোধানে চক্ষের জল ফেলিতেছি। রমেশচন্দ্র দয়ার প্রকট মূর্ত্তি—যেন দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর এবং বিবেকানন্দ। এই জন্যই, বুঝিবা, তিনি বরোদার দেওয়ানী লইয়াছিলেন।

গ্রন্থকার রূপে রমেশচন্দ্রের যে প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছে, তাহাও তুলনা রহিত। তুলনা-রহিত এই জন্য যে, তিনি একাধারে বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষার সুলেখক। তাঁহার ন্যায় অধ্যয়নশীল লেখক এদেশে আর অভ্যুদিত হয় নাই। তুলনা-রহিত এই জন্য যে,তিনি ব্যবসার খাতিরে সাহিত্যের পরিচর্য্যা করেন নাই,দেশকে তুলিবার জন্য সাহিত্য-সেবা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা সাহিত্যকে অর্থাগমের উপায় স্বরূপ অবলম্বন করেন, তাঁহারা চুট্‌কী সাহিত্যের চর্চ্চা করেন, স্কুল-পাঠ্য পুস্তক লেখেন,লোক-সাধারণ যে পথে যাইয়া মরিতেছে,সেই পথেই তাহাদিগকে চালিত করেন, চতুর্দ্দিকে বাহাবা পড়িয়া যায়—গ্রন্থকারের বাক্স অর্থে পূর্ণ হয়। তিনি ভারতবর্ষের স্কুলপাঠ্য একখানি ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রম বুঝিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। "শতবর্ষ"—তাঁহার বুকের রক্ত দ্বারা রচিত,—উঠিতে বসিতে শুইতে তিনি যে চিন্তা করিতেন, উহার পত্রে পত্রে তাহার প্রতি-ছায়া। আর Ancient India? আর Economic History of India? আর History of Bengalee Literature? আর The slave girl of Agra. এসকলই তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের অনন্ত কীর্ত্তি। এদেশ কি আর জাগিবে না? পূর্ব্ব কথা স্মৃতি-পথে তুলিলে যদি কুম্ভকর্ণের জাতির নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই জন্য কত পরিশ্রম ও কত যত্নে প্রাচীন কথা লিপিবদ্ধ করিলেন। কি গভীর গবেষণা—যেন দ্বিতীয় রামমোহন। কিন্তু পড়িল কয়জন? পড়ুক বা না পড়ুক—সাধকের সাধনার পথ পরিবর্ত্তিত হইল না। জেতা-জিতের সম্বন্ধকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে নিয়ত সচেষ্ট রহিলেন। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে অকাট্য যুক্তিতে যে সকল প্রস্তাব লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতের উদ্ধারের কথাতে তাহা পরিপূর্ণ। সে সকল পড়িতে বসিলে মনে হয়—এদেশে এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতার আর অভ্যুদয় হয় নাই। কৃষ্ণদাস, রামগোপাল, হরিশ্চন্দ্র—সকলকে তিনি পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে সকল বিস্তৃত কথার স্থান এ নহে।

ইংরাজ জানিতেন, রমেশচন্দ্র বিপক্ষে থাকিতে আর স্বেচ্ছা-সাধনের উপায় নাই। উপাধি বর্ষণ দ্বারাও যখন তিনি হস্তগত হইলেন না, তখন ইংরাজ বিলাতে মহা সম্মানের কাজ দিলেন; কিন্তু সিংহ-শিশু তাহাতেও বাঁধা পড়িল না। ফিরিয়া আসিয়া আবার ভারতের উদ্ধারের চিন্তায় জীবন ঢালিয়া দিলেন। ভাবিলেন, একটা দেশও যদি দেশের মত হয়, ভারতের জাগরণের পথ খুলিয়া যাইবে। ভাবিলেন, একটা দেশের প্রজাকুলেরও যদি দারিদ্র্য ঘুচে,দৃষ্টান্তের দ্বারা দেশ জাগিবে। ভাবিয়া আবার বরোদায় গেলেন। কিন্তু হায় বরোদা, হায় ভারতবর্ষ—তোমাদের চিন্তা-জ্বরে পীড়িত হইয়া মহা-সারথী আজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন! আর গুই-কোয়াড়?—ভারতের আশার স্বপ্ন, নিভৃতের

* In his earlier years in his well-known book "The peasantry of Bengal," Mr. Dutt had taken up the cause of the ryot of Bengal, and the introduction of the Bengal Tenancy Act of 1885, is ascribed to the cogency with which he set forth the necessity of giving the tenant protection against the cupidity of the Zeminder. U.M. 5th Dec, 1909.

চিন্তা, সকল দৃষ্টির সার দৃষ্টি—রমেশচন্দ্রের কল্প-বৃক্ষের অমৃত ফল আজ কি অবস্থায় রহিয়াছেন? চক্ষের জল-পূত-বিশালব্যাপী নীরবতা আজ সে কথার উত্তর দিক্।

তিনি কঙ্গ্রেসের সভাপতিরূপে যে সুবিস্তৃত বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এদেশের আদর্শ বক্তাদেরও তাহা অযোগ্য নয়। তবে একথা ঠিক যে, কেশবচন্দ্র, লালমোহন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তাদের সমতুল্য যশ তিনি পান নাই। কিন্তু গবেষণায় তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ।

আর একটী কথা বলিবার আছে—এই নিদারুণ শোকের দিনে, আপাততঃ তবেই আমাদের সকল কথা শেষ হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি যে আজীবন খাটিলেন, তাঁহার সম্বল ছিল কি? ইংরাজের ভ্রুকুটীকে তিনি যে অগ্রাহ্য করিলেন, তাহার সহায় ছিল কি? লোকেরা বলে, সহায় ছিল সাহস। আমরা বলি, সহায় ছিল তদীয় পূত চরিত্র। বিশ্বাস-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া তিনি যে অনিন্দিত চরিত্র-রত্ন পাইয়াছিলেন, সেই চরিত্র বলে তিনি, রামমোহনের ন্যায়, অভিভাবকের অমতে, দেশত্যাগ করিয়াছিলেন—চরিত্রই তাহাকে প্যারিসে রক্ষা করিয়াছিল, এই চরিত্রগুণেই তিনি পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতীত্ব দেখাইয়াছিলেন, এই চরিত্রগুণেই তিনি কর্ম্মক্ষেত্রের জটিল পথে, অশেষ বাধা বিঘ্নের মধ্যও, অটলভাবে সাধন করিতে পারিয়াছিলেন,—চিরকাল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চলিয়াও রাজসম্মান এবং জীবনের শেষে—সমগ্র ভারতের অনভিষিক্ত নেতৃত্ব পদ পাইয়াছিলেন। রাজার এমন সুহৃদ্ এবং প্রজার এমন বন্ধু—এদেশে আর কোন্ চরিত্রবান? আমাদের মনে হয়, এমন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এদেশের নেতাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই পাইয়াছেন। এমন মিষ্টভাষিতা, এমন অমায়িকতা, এমন নিরহঙ্কার মূর্ত্তি, এমন সরলতা যোগীজন-যোগ্য। তদীয় দেবোপম পূত চরিত্রই তাঁহাকে নির্ভীক করিয়াছিল, চরিত্রই তাঁহাকে বিঘ্নসঙ্কুল সংসারে রক্ষা করিয়াছিল এবং এই এক চরিত্রই তাঁহাকে ভারতের অগণিত, অজ্ঞানিত প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ের রাজা করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার দেহ গিয়াছে, কিন্তু স্মৃতি যাইবে না;—তাঁহার হৃদ্-স্পন্দন থামিয়াছে, কিন্তু কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগণ্য মানস-পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে;—এক কথায় চিরদিনের জন্য তিনি এদেশে অমর হইয়াছেন। ভারতের জাগরণের ইতিহাসে রমেশচন্দ্রের দেবচরিত্র চিরকাল সম্পূজিত হইবে, ইহাই আমাদিগের একমাত্র সান্ত্বনা। আজ এই নিদারুণ শোকের দিনে, দেবলোকের দেব-চরিত্রের পূত স্মৃতি ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া, সকলে একবার গগন কাঁপাইয়া বল, বন্দে মাতরম্।

রমেশচন্দ্র।

বঙ্গের গৌরব-রবি ভারত অম্বরে
সহসা পড়িল ঢলি, অস্তাচলে গেল চলি,
বিষাদ-কালিমা ঢালি দিগ্‌দিগন্তরে!
রক্তিম মহিমা-রেখা গগনে রহিল লেখা,

ধবল প্রভিভা-রাগে উদ্দীপ্ত ভুবন;
কীর্ত্তিমান্, জ্যোতিষ্মান্, নিজ তেজে দীপ্তিমান্,
বিদ্যা-অর্থ-যশোভাগ্যে নরে অতুলন।
প্রতিভা-মনীষালোকে আলোকিয়া ধরালোকে,

সবার অন্তর-খনি পশিয়াছে চিনে ;
ন্যায়-হিত-আচরণে, মিষ্ট শিষ্ট আলাপনে,
বঙ্গের হৃদয়-রাজ্য লইয়াছে কিনে ।
বঙ্গের গৌরব-রবি অস্ত এত দিনে !

অহো কি দুর্দ্দিন হেরি ভারত-মাতার,—
তাঁর পুত্র প্রিয়তম, কর্ম্মে গুণে অনুপম,
একে একে গত হায়, জগৎ আঁধার !
উমেশ আনন্দ ছুটি, মনো-লাল ভাই দুটী,
যতীন-নগেন, আদি কর্ম্মবীরগণ
কালের করাল গ্রাসে পশিয়াছে কালবশে,
জনে জনে মাতৃ-বক্ষ করি বিদারণ !
এবে পুনঃ অকস্মাৎ মাতৃ-হৃদে বজ্রাঘাত
করিয়া রমেশ-চন্দ্র পলাইয়া যায় ,—
রোগ-শোক-জরা-জীর্ণা,অত্যাচারে অতি শীর্ণা
কাঁদিছে ভারত-মাতা শোকে মৃত-প্রায় !
অস্ত গেল বঙ্গ-রবি এত দিনে হায় !!

ভারতীর প্রিয় পুত্র ভারত ভিতরে
সাহিত্য-উদ্যানে পশি, কল্পতরু-মূলে বসি
রচিলা অপূর্ব্ব-মালা,গন্ধে প্রাণ হরে ।
সমাজ-সংসার দুটী সমাজে সংসারে ফুটি
শোভিছে, মোহিছে বঙ্গ মাধবী-কঙ্কণ ;
যে বঙ্গ-বিজেতা তাঁর, বর্ণনায় চমৎকার,
জীবন-প্রভাত-সন্ধ্যা স্মৃতি-সংরক্ষণ ।
বাঙ্গালায় ঋগ্বেদ বাঙ্গালীর নাশে খেদ ;
ইতিহাস, রামায়ণ অপূর্ব্ব রচন !
তুষ্ট করি জনে জনে, আজি কর্ম্ম-সমাপনে,
হাসিতে হাসিতে গেল ভারতী সদন !!
অমর বাণীর পুত্র,—তবু পোড়ে মন !!!

রাজনীতি-খনি-মধ্যে উজ্জ্বল-রতন !
যাহার আলোকে হায়,অন্য-দীপ্তি লোপ পায়,
থাকুক অন্যের কথা বিজিত কর্জ্জন !
কি শাসনে, কি বিচারে,সবাই প্রশংসে যাঁরে,
রাজা-প্রজা তুষ্ট সবে ন্যায়-আচরণে ;—
কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর, সুধী, জ্ঞানী, স্থির, ধীর,
কি করিতে পারে তাঁরে শমনে মরণে !
লেখক,ভাবুক,কবি, বঙ্গের গৌরব-রবি,
সেবক,সাধক,বক্তা, পুরুষ-প্রধান
অগাধ পাণ্ডিত্য-প্রভা,গম্ভীর প্রতিভা আভা,
প্রভূত প্রভুত্ব ত্যজি সন্ন্যাসী সমান
অনায়াসে গেল চলি ভারত-সন্তান !

ভারত, বাঙ্গালা তাই শোকেতে আকুল ;
প্রথম বনৃগ-বাসী শোক-স্রোতে যায় ভাসি ;
শোকেতে বরোদা-রাজ্য কাঁদিয়া ব্যাকুল !
বরিশাল, মালদহ, কাঁদে তারা অহরহ,
চাটিগাঁ, ময়মনসিং শোকেতে বিহ্বল,
প্রেসিডেন্সি, বর্দ্ধমান মহাশোকে মুহ্যমান,
বিহার, পাবনা, ঢাকা, নদীয়া,উৎকল !
অই শুন কাঁদে চাষা, কাঁদিছে বাঙ্গালা ভাষা,
কাঁদে শিশু, কাঁদে বৃদ্ধ, যুবক-প্রবীণ ;
শোকাতুর পরিষৎ, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—
সন্তান কাঁদিবে কত তরুণ নবীন !
পঞ্জাব, বোম্বাই, বঙ্গ ভারতের জন-সঙ্ঘ,
সুরেন,বিহারী আদি বাল্যবন্ধুগণ,
বাঙ্গালী, মুসলমান শোকে মগ্ন খ্রীষ্টিয়ান্ ;
গায় তব শোক-গাঁথা ইংলণ্ড—লণ্ডন !
ধন্য তুমি বঙ্গ-সুত, ভারত-ভূষণ !!

যাও এবে নররাজ যাও স্বর্গধাম !
স্বর্গের দেবতা তুমি, এসেছিলে মর্ত্তভূমি
বিধির বিধানে, লভ অনন্ত বিরাম !
ভুলে যাও ভুল ভ্রান্তি, সংসারের ক্লেশ ক্লান্তি
ভুঞ্জ সুখ, ভুঞ্জ শান্তি—অনন্ত জীবন ।
রমেশ, রমেশ-সঙ্গে বিহর বৈকুণ্ঠে রঙ্গে ;
হউক পরম ব্রহ্মে আত্ম সম্মিলন !
পবিত্র ভারতভূমি, তোমারি আদর্শ তুমি,
আদর্শ পুরুষ-সিংহ, পান্থ মহাজন,
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি একাধারে সর্ব্বশক্তি,
বঙ্গের অমূল্য ধন, অমূল্য রতন,
পূরিবে না হায় তব অভাব কখন !
তাই স্মরি অশ্রু ফেলে দীন অকিঞ্চন !
কবি কহে মৃত্যু নহে—অনন্ত জীবন !!

শ্রীকেশবলাল দাস ।

দেশীয় শিক্ষা-প্রণালী।

গত বৎসরের নওগাঁ জিলা সমিতির অধিবেশনে শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মঠ স্থাপনের যে প্রস্তাব আমি উপস্থিত করিয়াছিলাম, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের অনুগ্রহে তাহা নব্যভারতে মুদ্রিত ও সাধারণের গোচরে উপস্থিত করা হইয়াছিল। প্রস্তাবটীর গুরুত্ব সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস; এবং এ প্রস্তাবটী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষ বিবেচনার বিষয়। তজ্জন্যই ঐ বিষয়টীর পুনরালোচনা করা আবশ্যক মনে করিয়া পুনরায় ইহা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম।

আমি যাহা বলিতে চাই, তাহা এই:—লোক-শিক্ষাই সভ্যতা-সোপানে অগ্রসর হইবার সর্ব্ব প্রথম উপায়। আমার মনে হয়, ভগবান ভগবদ্গীতায় গুণকর্ম্ম বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সভ্যসমাজ মাত্রেই প্রযুজ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে সভ্য সমাজকে বিভাগ করিতে হইলে প্রথমতঃ চারি ভাগ দেখিতে পাই—দাস-ব্যবসায়ী অথবা শূদ্র, ধনোপার্জ্জন অথবা কৃষিজীবী ও ব্যবসায়জীবী, ধনরক্ষক অথবা ক্ষত্রিয় এবং সংযমী-পরহিতব্রত-লোক-শিক্ষা-নিরত আত্মত্যাগী শিক্ষক বা ধর্ম্মযাজক অথবা ব্রাহ্মণ। যাঁহারা এই চারি জাতির শীর্ষ স্থানে থাকিয়া, সকলের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া, সকল শ্রেণীর লোককে শিক্ষিত, দীক্ষিত ও উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত করিবেন, অথচ নিজেরা নির্লোভী, পরন্ত সংযমী ও পরহিতে রত থাকিবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। যাঁহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া প্রাচীন ও সভ্যতম জাতির বংশজাত বলিয়া আত্ম-গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, অথচ দৈনন্দিন কার্য্যে লোভ-পরায়ণতা, দাস-বৃত্তিতে ঐকান্তিকতা প্রভৃতি অধম কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহাদিগের সহিত আমার কোন বিবাদ নাই, কিন্তু তাঁহাদিগকে ভারতের আদর্শ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এইরূপ ব্রাহ্মণত্বাভিমানীরা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার এই উক্তিতে তাঁহাদের জাতি যাইবে না বা থাকিবে না; কিন্তু যে বংশে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বজন-পূজিত প্রাচীন আদর্শের কতটুকু তাঁহারা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাদের প্রাচীন গৌরব তাঁহারা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে অক্ষম হইবেন, তাহা তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখেন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

জনশ্রুতি আছে, কৃষ্ণনগরের মহারাজা তাৎকালিক নবদ্বীপের সর্ব্ব প্রধান নৈয়ায়িককে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "গুরুদেব! আপনার অভাব কি?" তিনি অম্লানবদনে উত্তর করিলেন "মহারাজ! আমার ত কোন অভাব দেখিতে পাই না, শাস্ত্রার্থের সুন্দর মীমাংসা হইয়া যায়।"—অর্থাৎ তিনি আর্থিক অভাবের কথা লক্ষ্যই করিতে পারিলেন না। মহারাজ দেখিলেন, গুরুপত্নীকে জিজ্ঞাসা না করিলে ইহার উত্তর পাইবেন না। গুরুপত্নীর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! আপনার অভাব

কি ?” তিনিও সহাস্তে উত্তর করিলেন “বাবা। আমার এই লোহার খাড়ু গাছা থাকিতে আমার অভাব হইবে কেন ?” মহারাজ তাড়াতাড়ি বলিলেন “আমি আর্থিক অভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।”তিনি ঠিক সেই ভাবে উত্তর করিলেন “না, কৃষ্ণচন্দ্র,আমি যে চাউল পাই এবং বাড়ীতে যে তেঁতুল গাছ আছে,তাহাতেই চলে, ছাত্রদিগকে খাওয়াইয়া আমি পরিতোষ পূর্ব্বক তাঁহার প্রসাদ পাইয়া থাকি,আমার কোন অভাব নাই,বাবা !” মহারাজ দেখিলেন,উভয়েই সমান। পুনরায় গুরুদেবের নিকট যাইয়া বলিলেন “আমি আপনাকে কিছু ভূমি সম্পত্তি দিতে চাই।” সহাস্তে তিনি উত্তর করিলেন “না মহারাজ, আমাকে সঞ্চয়ী করাইয়া আমার পরলোক নষ্ট করিবেন না; আর কয়টা দিন বাঁকী আছে, স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যাইবে।” এই আদর্শ ত্যাগীই প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন।

উচ্চপদস্থ জনৈক রাজকর্ম্মচারীর নিকট শুনিয়াছি,স্বাধীন ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজার পিতামহ বা প্রপিতামহ অত্যন্ত ঋণী হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন কি, মান সম্ভ্রম রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার গুরুদেব রাজবাটীতেই থাকিতেন। তিনি গৃহী ছিলেন না। মহারাজা প্রতিদিন তাঁহার চরণ পূজার সময়ে একটী স্বর্ণ মোহর দিয়া প্রণাম করিতেন। গুরুদেব ঠাকুর ইচ্ছামত তাহা গরীব দুঃখীর অভাব মোচনে ব্যয় করিতেন; সঞ্চয়ের তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। সকলেরই তিনি বিপদের বন্ধু ছিলেন, সকলেই গুরুর স্তায় তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। এক দিন তিনি মহারাজাকে বলিলেন “মহারাজ, আমাকে স্বর্ণ মোহর দিলে হইবে না, আমি অন্য কিছু চাই।” মহারাজ জানিতেন,কিছুতেই তিনি আসক্ত নহেন। সুতরাং তাঁহাকে অদেয় কিছুই ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন “আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন,তাহাই দিব।” গুরুদেব বলিলেন “আমি আপনার সমস্ত সম্পত্তি চাই।” মহারাজা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন “আমি কোথায় যাইব ?” গুরুদেব বলিলেন “তুমি আমার প্রসাদভোজী হইয়া রাজবাটীতেই থাকিবে।” মহারাজ দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব দান করিলেন। গুরুদেব বলিলেন “তুমি এদানের বিষয় এখন কাহাকেও কিছু বলিতে পারিবে না; কেবল আদেশ কর যে সমস্ত কার্য্য আমারই হুকুম অনুসারে হইবে।” মহারাজা তাহাই করিলেন। গুরুদেব ঠাকুর সদর দরজার পার্শ্বে নিজের বসিবার স্থান করিলেন। যাহার যে কার্য্য, যে দরবার, তাহা নিজে শুনিয়া সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং প্রার্থীদের নিকট মহারাজার জন্য যথেষ্ট নজর উপঢৌকন সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আরও তিনি প্রজার ঘরে ঘরে যাইয়া মহারাজার দায় জানাইয়া তাহাদের ইচ্ছামত সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রজারা তাঁহাকে পিতার স্তায় দেখিত; সন্তুষ্টচিত্তে সাধ্যমত সকলেই যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল। সর্ব্বদাই বলিতেন “আমার * * * অত্যন্ত ঋণী হইয়াছে,তাহার ঋণ শোধ করিয়া দিয়া তোমরা তাহাকে রক্ষা কর, আমি কৃতার্থ হইব।” অনেক সময় তিনি এই সকল কথা বলিতে বলিতে নয়নজলে ভাসিয়া যাইতেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া সকলে অধীর হইত এবং অকাতরে সাধ্যমত অর্থ দানে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিত। এইরূপ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া গুরুদেব ঠাকুর,অল্পসময়ের মধ্যে সমস্ত দেনা শোধ করিয়া রাজকোষে প্রচুর অর্থ

সঙ্কল্প করিলেন এবং একদিন রিবপত্রে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আশীর্ব্বাদ স্বরূপ দান লিখিয়া মহারাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহারাজা বলিলেন "আমি দত্তাপহারী ও গুরুর-সম্পত্তি হরণকারী হইতে পারি না।" গুরুদেব বলিলেন "তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণে অসম্মত হইতে পার না। ইহাতে কোন পাপ নাই; তুমিই আমার সর্ব্বস্ব,তোমার সম্পত্তি নিজের জন্য লই নাই; এখন আমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ ধর্ম্মপথে থাকিয়া রাজধর্ম্ম পরিচালন কর।" ইহাই ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ। পুনরায় সেই পরহিত-ব্রত স্বার্থত্যাগী ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ব্রাহ্মণকুলের আবির্ভাব করান আবশ্যক হইয়াছে। যাঁহারা অনাসক্ত, স্বার্থশূন্য, এমন ব্রহ্মচারীর আবশ্যক হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় চিরকুমার সেবাব্রতধারীর অভাবে দেশ নিদ্রিত রহিয়াছে। প্রতি পল্লীতে এই শ্রেণীর সেবকের অভাব অনুভূত হইতেছে। লোকশিক্ষার প্রথম স্থান পল্লীগ্রাম। প্রতি জেলায় অন্যূন পাঁচ হাজার পল্লীগ্রাম থাকা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রতি দশ গ্রামের জন্য অন্ততঃ একজন এইরূপ শিক্ষকের প্রয়োজন; সুতরাং প্রতি জেলার জন্য গড়ে পাঁচ শত জন শিক্ষকের আবশ্যক। আমার মনে হয়, ভিক্ষাজীবী এক একজন চিরকুমার ব্রহ্মচারী এইরূপ এক এক কেন্দ্রে স্থায়ী হইয়া নিজ জীবনের জলন্ত আদর্শদ্বারা লোকশিক্ষা বা চরিত্র গঠনে নিযুক্ত থাকা আবশ্যক হইয়াছে। ইঁহারা বালক বালিকাদিগের নিজ নিজ ব্যবসায় ও অবস্থার উপযোগী শিক্ষকতা করিবেন; রোগীর চিকিৎসা ও সুশ্রুষা করিবেন; সংসারীদিগের আপদ বিপদে বন্ধুতার কার্য্য ও সৎপরামর্শ দান করিবেন; কৃষিজীবীদিগের কৃষি শিক্ষা ও গবাদি পালনের উপদেশ দান, স্বাস্থ্যরক্ষা ও নানারূপ হিতজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন; বিবাদ বিসম্বাদ আপোষে মীমাংসা করিয়া দিবেন। আরও এইরূপ বিবিধ লোকহিতকর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবেন। তবেই দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। জাতীয় শিক্ষা-সমিতির নিকট আমার এই প্রার্থনা, তাঁহারা এইরূপ শিক্ষক উপস্থিত করিয়া পল্লীতে পল্লীতে প্রেরণ করেন। বহুলক্ষ লোকের মধ্যে দাসত্বজীবী দুই চারি শত লোকের জন্য ব্যস্ত হওয়া অনাবশ্যক। যাহাদিগকে মানুষ করিতে পারিলে আমরা মানুষ হইতে পারিব, তাহারই চেষ্টায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হউন। সংসার-ত্যাগী চরিত্রবান শিক্ষক পাইলে আমাদের জড়তা দূর হইবে।

পল্লীতে পল্লীতে সেই শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন করিতে না পারিলে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা হইবে না। মানুষ মানুষের মত চিন্তা করিতে শিখিলে নিজের প্রকৃত অভাব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। দেশকালের যোগ্য ভাব জন্মাইতে পারিলেই মানুষ আপনার পথ আপনিই দেখিয়া লইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না, ইহাই আমার দৃঢ়বিশ্বাস। শিক্ষার মূল চরিত্রগঠন এবং চরিত্রগঠনের মূল আদর্শ চরিত্রের দৃষ্টান্ত। জাতীয় ভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। প্রাচীনকালে মুনিঋষিদিগের এইরূপই ছিল; তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া সর্ব্বময় নেতা ও উপদেষ্টা ছিলেন; সকল বিষয়েই শিক্ষা দিতেন, অথচ কোন বিষয়েই লিপ্ত হইতেন না। বৌদ্ধযুগে শ্রমণেরা সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নৈতিক অবনতির সুযোগে শঙ্করাচার্য্য মঠ স্থাপন করিয়া চরিত্রবান ত্যাগী অথচ কর্ম্মীর

সাহায্যে পুনরায় হিন্দু-যুগের অবতারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গদেবের আখড়া এই নিয়মেই প্রবর্ত্তিত। কিন্তু পরে স্ত্রীলোক-সংসর্গে ইহা কলুষিত হইয়া সমাজের নানারূপ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। ইউরোপে ধর্ম্ম-যাজকেরা এই স্থান অধিকার করিয়া দেশের প্রকৃত নেতৃত্ব পদ লাভ করিতেছেন। সভ্য জগতের এই আদর্শ হারাইয়া আমরা পথহারা হইয়াছি, অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া আছি। বর্ত্তমান সময়েও সকলেই একপ্রাণ হইয়া এই সাধনায় কৃতসঙ্কল্প হইলেই আবার আমরা মানুষ হইয়া সভ্যজগতে স্থান লাভ করিতে পারি, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীকিশোরীমোহন শর্ম্মা।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

৩৩। কুঙ্কুম। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস প্রণীত, তৃতীয় সংস্করণ। এই সুন্দর পুস্তকখানি বহুদিন অমুদ্রিত অবস্থায় ছিল। সম্প্রতি তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। গোবিন্দ দাসের কবিতা ঘরে ঘরে আদৃত হইবার যোগ্য।

৩৪। বিদ্যাসাগর। শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ৩৲।

এই পুস্তকখানির পূর্ব্ব সংস্করণ বহুদিন পূর্ব্বে নিঃশেষিত হইয়াছিল; নানা ঘটনায় সুদীর্ঘকাল বাজারে এই পুস্তক পাওয়া যাইত না, এজন্য কত লোককে কত আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। এত দিন পরে ইহার তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

নগেন্দ্রনাথ রামমোহনের ও যোগীন্দ্রনাথ যেমন মাইকেলের জীবনচরিত লিখিয়া অমর হইয়াছেন, চণ্ডীচরণ, সেইরূপ, বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত লিখিয়া অমর হইয়াছেন। চণ্ডীচরণের কৃতীত্বের কথা নিত্য স্মরণের বিষয়—কেন না, তিনি বঙ্গের উন্নতির আদি যুগের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তির কাহিনী ঘরে ঘরে প্রচার করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় সহোদর শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ভ্রম-নিরাস নামক এক পুস্তক লিখিয়া চণ্ডীবাবুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। উক্ত কার্য্য পূতচরিত্র বিদ্যাসাগরের ভ্রাতার যোগ্য হয় নাই। চণ্ডী বাবু তাহা ক্ষমার চক্ষে দেখিয়াছেন, ইহাতে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। বিদ্যাসাগরের জীবনী যে ভাষায় চণ্ডী বাবু লিখিয়াছেন, তাহা এদেশের বর্ত্তমান ভাষার আদর্শ, যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি বিশুদ্ধ; যেমন সরস, তেমনি ভাবপূর্ণ। নিখুঁত জীবনের এই নিখুঁত জীবনালেখ্য যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন। যে দিন এই জীবনী ঘরে ঘরে অর্চ্চিত ও পূজিত হইবে, সেই দিন বুঝিব, ভারতের দিন ফিরিয়াছে। তাহা কি হইবে না?

৩৫। ভারতে অলকসন্দর। শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ১৷৹। সচিত্র। পুস্তকের নামকরণ সম্বন্ধে গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"আমাদের সম্রাট অশোক, এই নাম যে ভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং পর্ব্বতগাত্রে যে ভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই অনুকরণ করিয়া, আমাদের চিরাভ্যস্ত আলেকজাণ্ডার এই নামের পরিবর্ত্তে অলিকসন্দর নাম ব্যবহার করিলাম।"

নামে কিছু আসিয়া যায় না—বিষয় বিবৃতির পারিপাট্য, সত্যানুসন্ধিৎসা ও গবেষণাই ইতিহাসের প্রাণ। শাস্ত্রী মহাশয় অনিন্দিত ভাষায় সত্যকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন কোন প্রকার পক্ষপাতীত্বের পরিচয় এ পুস্তকে পাওয়া যায় না। আমাদের বিশ্বাস, শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় ইহাও বিশেষরূপ আদৃত হইবে। কিন্তু লিখিতে লজ্জা হয়—পুস্তকখানি বিলাতী কাগজে ছাপা।

৩৬। আর্য্যনারী। দ্বিতীয় ভাগ (ঐতিহাসিক) শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত, মূল্য ১৷০। উভয় গ্রন্থকারই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। যা তা না লিখিয়া এখন ইঁহারা প্রকৃত আদর্শ ধরিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ভাষা এবং লিপিচাতুর্য্য অতি প্রশংসার্হ। ২৪ জন আদর্শ মহিলার কথা ইহাতে আছে। পুস্তকখানা সকলের চিত্ত হরণ করিবে। বিলাতী কাগজে ছাপা।

৩৭। গাথা। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল প্রণীত, মূল্য ৸৹। অবিনাশ বাবু আদর্শ গদ্য-লেখক; কিন্তু তাঁহার পদ্য লেখাও অগ্রাহ্যের যোগ্য নয়। স্থানে স্থানে স্পষ্ট অনুকরণ-ছটা থাকিলেও পুস্তক খানা বড়ই সুমিষ্ট হইয়াছে।

৩৮। সাবিত্রী। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত, বি-এ প্রণীত মূল্য ।৶৹। সুন্দর বিলাতী কাগজে, বিলাতী কালীতে ছাপা। ৫ খানি কাল্পনিক ছবি আছে। পুস্তক খানি শোভা সৌন্দর্য্যে সকলের প্রাণ হরণ করিবে, একটুও সন্দেহ নাই। ব্যবসার খাতিরে এরূপ কাল্পনিক ছবি প্রচার করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। ইহাতে মিথ্যা প্রশ্রয় পায়। অতি অল্প কথায়, কেবল ৪১টী ক্ষুদ্র পৃষ্ঠায়, বড় বড় অক্ষরে, সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। মনোযোগসহ পড়িলাম, কিন্তু এত অল্প কথা পড়িয়া সুখী হইতে পারিলাম না। ভাল জিনিসকে এরূপে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য মোটেই বুঝিলাম না। পদ্য হইলে বরং ক্ষমার যোগ্য ছিল, গদ্য লেখা এত সংক্ষিপ্ত? লেখা ভাল হইলেও, আবার বলিতেছি, আমরা সুখী হইতে পারি নাই। সাহিত্য লইয়া ব্যবসাদারী করিতে কার্ত্তিক বাবুর ন্যায় সাধু লোককে দেখিলে বড় ক্লেশ পাই।

৩৯। ফরিদপুরের ইতিহাস। ১ম খণ্ড—ভৌগোলিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত। শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। একখানি ম্যাপ ও একখানি ছবি আছে। আমরা বহুদিন এই গ্রন্থের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। যদিও কতকাংশ পাইলাম বটে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত বলিয়া তৃষ্ণা মিটিল না। গ্রন্থকারের গবেষণা অসাধারণ। তাঁহার লেখা,—বারভূঞার কথা চুরি করিয়া আজ কাল কত লেখক প্রত্নতত্ত্ববিৎ হইয়া উঠিয়াছেন। সে কথা থাকুক। আনন্দনাথের বাঙ্গালা প্রাঞ্জল। আশা করি, ফরিদপুরের প্রতি হিতৈষীর নিকট এই পুস্তক বিশেষ আদর পাইবে। স্বদেশী মিলের কাগজে ছাপা।

৪০। কেশব-জ্যোতি। শ্রীনিস্তারিণী দেবী। বিলাতী কাগজে, বিলাতী কালীতে ছাপা। আমরা দেখিতেছি, স্বদেশী আন্দোলনটা কেবল বাক্য-কণ্ডূয়নের ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। যাহার দিকে তাহাই, সে-ই বিলাতী কাগজ ব্যবহার করিতেছে। তবে আর "স্বদেশী" আন্দোলনের জয়যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? ছি, এমন করিয়া কি লোক হাসাইতে হয়? গ্রন্থকারগণই দেশের আদর্শ নেতা, তাঁহারাও কি একটু সতর্ক হইবেন না? বড় ক্ষোভে এই অপ্রিয় কথা লিখিলাম। লেখা মোটের উপর বেশ।

৪১। সপ্তপর্ণী। শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।৶৹। দেশী মিলের কাগজে ছাপা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প। ইন্দুপ্রকাশের লিখিবার প্রণালী অতি সুন্দর। সংক্ষিপ্ত অথচ মিষ্ট ভাষায় গল্পগুলি বেশ ফুটিয়াছে।

৪২। ব্রহ্ম-প্রবাসীর পত্র। শ্রীকালাচাঁদ দালাল প্রণীত। মূল্য ॥৹। ব্রহ্মপ্রদেশের অনেক জ্ঞাতব্য কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কয়েকখানি ছবিও আছে। লেখাও সুন্দর। কিন্তু ইহাও বিলাতী কাগজে ছাপা!

৪৩। সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস বি-এ সঙ্কলিত। ছাত্রগণের জন্য লিখিত। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধও এ পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন। বিলাতী কাগজে ছাপা না হইলে আমরা খুব সুখী হইতাম।

৪৪। দনুজদলন। শ্রীউমেশচন্দ্র বসু মজুমদার প্রণীত, মূল্য ॥৹। চণ্ডীকাব্য অবলম্বনে লিখিত। মিত্রামিত্রাক্ষর উভয় ছন্দে রচিত। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা বিমল আনন্দ পাইলাম। ভেদ-জ্ঞানের চরম অবস্থায় এই কয়েকটী কথা আমাদের প্রাণে শান্তি-ধারা ঢালিল। গ্রন্থকারের লেখনীধারণ সার্থক হইয়াছে। একটু উদ্ধৃত করিলাম—

"স্নেহের মূরতি মাতা স্থাপি প্রতি ঘরে,
মাতৃধর্ম্ম শিক্ষা দেই দেবাসুর নরে,
দেবও অসুর হয় আমার নয়নে,
মানব দানব সত্য নিজ আচরণে।
আত্মপর করিওনা কভু ভেদজ্ঞান,
ধরামাঝে হের সবে আপন সমান;
পরহিতে সদা সবে হও ধাবমান,
পরহিত মহাযজ্ঞ আমার বিধান।,
বিশ্ব-প্রেমে হ'য়ে সবে নিত্য আত্মহারা,
ভাসাও প্রেমের স্রোতে এ বিশাল ধরা;
স্বার্থ বলি দিয়া, চাও জ্ঞান-আঁখি মেলি,
দ্বৈতবাদ নাশি লও সবে কোলে তুলি;
নিস্বার্থ উদার প্রেমে দীক্ষা দেও সবে,
নামিয়া আসিবে স্বর্গ অবশ্যই ভবে।

৪৫। চিকিৎসক। (আদর্শ হোমিও-প্যাথিক গ্রন্থ) ডাক্তার এ, সি, মজুমদার, এল-এম-এস প্রণীত, মূল্য ২৲। সুবিখ্যাত বিচক্ষণ ডাক্তারের চিকিৎসার ফল এই গ্রন্থে সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হোমিও-প্যাথিক-চিকিৎসা-প্রণালী এখন এদেশে বিশেষ রূপে আদৃত হইয়াছে। এই সুন্দর পুস্তক খানি, গৃহপঞ্জিকার ন্যায়, ঘরে ঘরে রাখা উচিত।

৪৬। হাত-দেখা। শ্রীপরেশনাথ মহলা-নবীস প্রণীত, মূল্য ১৲। সামুদ্রিক শাস্ত্রানু-সারে এই পুস্তকখানি সরল পদ্যে সুলিখিত। সামুদ্রিক শাস্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে প্রভূত উপকার পাইবেন। প্রণিধানের বিষয়।

৪৭। বৈদ্যনাথ-কথা। মূল্য ৵১০। বৈদ্য-নাথ তীর্থের যাবতীয় জ্ঞাতব্য কথার বিবৃতি। সুলিখিত।

৪৮। শিশু-সখা। ১ম ভাগ। সচিত্র। শ্রীমতী সরলা দেবী প্রণীত, মূল্য ৴০। প্রথম পাঠ্য পুস্তক। লেখা মন্দ নহে।

৪৯। স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থা-বলী। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী কর্তৃক ভূমিকা লিখিত। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি-কৃতি সম্বলিত; মূল্য ৫৲।

আমরা এই পুস্তকখানি উপহার পাইয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি। পড়িয়া যারপর নাই সুখী হইলাম।

ঠাকুর পরিবার বাঙ্গালার গৌরব—বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য এই পরিবার যাহা করিয়াছেন, জাতীয় ইতিহাসে তাহা অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত থাকিবে। ৺বলেন্দ্র নাথ দেব-পরিবারের দেব-দূত। তিনি আজী-বন বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যা করিয়া গিয়া-ছেন। হায়, এমন প্রতিভাশালী ব্যক্তির অকাল-তিরোধান বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

আমাদের বড় দুঃখ যে আমরা সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতে বাধ্য;—কেন না, বড়ই স্থানাভাব। বলেন্দ্রনাথের প্রতিভা-স্ফুরণ এই পুস্তকের পত্রে পত্রে,ছত্রে ছত্রে;-সংক্ষেপে তাহা ব্যক্ত করিতে পারে,সে সাধ্য কাহার আছে? অশেষ গুণালঙ্কৃত রামেন্দ্র সুন্দর লিখিয়াছেন যে,—"তাহার রচনায় যে কোমল, স্নিগ্ধ, প্রশস্ত শ্রী ছিল, তাঁহার চোখে ও কথা-বার্ত্তায় তাহা আরও স্পষ্ট দেখা যাইত। এখানে যেন তাহা সমস্ত তারল্য ও চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া আরও ঘনাইয়া আসিয়াছিল।" এই পুস্তকখানি বলেন্দ্রনাথের জীবন-ব্যাপী সাধনার অমৃত ফল। আমরা পড়িয়া উপকৃত হইলাম, আশা করি, যিনি পড়িবেন, তিনিই উপকৃত হইবেন। কারু-শিল্পের এরূপ উজ্জ্বল চিত্র অতি অল্প স্থলেই দেখা যায়। ধন্য ঠাকুর পরিবার, ধন্য বলেন্দ্রনাথ। এই গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার অক্ষয় স্মৃতি-মন্দিরে স্থান লাভ করুক।

৫০। চটুল বিলাপম। সাহিত্যাচার্য্য শ্রীরজনীকান্ত কাব্যতীর্থ কৃতম্। ৺ নবীনচন্দ্র সেনের উদ্দেশে তাঁহার কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়া চট্টলজননীর ক্রন্দন। বাঙ্গালা অনু-বাদ সহ। কবিতাগুলি হৃদয়স্পর্শী।

৫১। ভারত-শিল্প। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত,মূল্য ॥০। গ্রন্থকার বলেন "সূর্য্য যে কি পদার্থ, তাহা দেখিতে পূর্ব্বমুখ হউন। যে শিল্প-সূর্য্য সমস্ত প্রাচ্যজগৎ সৌন্দর্য্য-কিরণে ডুবাইয়া পশ্চিম সাগরে এক দিন অস্ত গিয়া-ছেন, আবার নিশ্চয়ই কোন সুপ্রভাতে তাঁহার দর্শন পাইবেন।" শিল্প সম্বন্ধে অব-নীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত ও সুলিখিত কথা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।

৫২। জাতীয়-মঙ্গল। মহম্মদ মোজাম্মেল হক প্রণীত, মূল্য ।৵০। এই নূতন শিল্পী কে, আমরা জানি না। এই পুস্তক খানি স্বজাতি-প্রেমের অপূর্ব্ব নিদর্শন। একটী কবিতা তুলিয়া দিলাম—ইহাতেই পাঠক তাঁহাকে চিনিতে পারিবেন; বুঝিতে পারিবেন, মুসলমান-ভ্রাতৃগণ আজ কাল কেমন সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতেছেন। পুস্তকখানি বিলাতী কাগজ ও কালীতে যদি ছাপা না হইত, স্বদেশ-প্রেমের অমৃত ফল ফলিত।

কর্ম্মের যুগে তুমিই একা
প্রেম-গীতি আর গেয়োনা,
অমন করে' পরের দ্বারে
'দাও' বলে হাত পেতোনা!

বহুদিন ত এম্‌নি করে
মান সম্ভ্রম রেখে' ওরে,
পরের দ্বারে গিয়ে গিয়ে
পাচ্ছ কত লাঞ্ছনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

মর্‌বে মর ক্ষুধার জ্বালায়,
একটি প্রাণও কাঁদ্‌বে না তায়!
অলস বাঁচা বেঁচে থাকায়
লাভ হ'বে কি বল না?
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

মর্‌রে তুমি দুঃখ কি তায়,
দুঃখ কেবল হস্তপাতায়,
অমন করে নিজের গৌরব
ধ্বংস তুমি করোনা।
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

জন্ম তোমার উচ্চ ঘরে,
কেবল আপন দোষের তরে
ভবের মাঝে তুচ্ছ হ'য়ে
স'চ্ছ কত গঞ্জনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

একদিন তব অতুল তেজে
দীপ্ত ছিল ধরা এ যে,
সকল বিশ্ব সন্ধ্যা সকাল
কর্‌তো তোমায় বন্দনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

বিশ্বে ছিলে শিক্ষাদাতা,
সবাই তখন রাখ্‌তো মাথা
হর্ষে তোমার চরণ তলে,
কর্‌তো তোমার অর্চ্চনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য, নীতি,
খগোল, ভূগোল, ত্রিকোণ-মিতি,
জ্যোতিষ, দর্শন—ভবের সার
'সবি তোমার রচনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

তোমার বিশাল পণ্য-তরী
ঘুর্‌তো সাগর বক্ষোপরি,
তোমার সাথে বাণিজ্যেতে
কা'র হ'ত আর তুলনা?
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

নিত্য নব দেশের ভূমি
হাস্‌তো তোমার চরণ-চুমি'!
ধরণীময় অতুল নাম
নিত্য হ'ত ঘোষণা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

রত্ন-মাণিক তুল্‌বে বলে'
ডুব্‌তে জান্‌তে সাগর-জলে,
সাগর, গিরি, আকাশভরে
ছিল তোমার সাধনা!
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

চারু শিল্পে তোমার মত
বিশ্বের কোন শিল্পী, অত
সফল হ'তে জগত-মাঝে
স্বপ্নেও করতো কল্পনা?
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

বিশ্বপৃষ্ঠে আজো কত
নিদর্শন তার আছে শত—
'জুম্মা-মসজিদ্, 'আল্‌হাম্ব্রা', 'তাজ'
কে করে তার গণনা?
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

জন্ম লভে' অমন কুলে,
গিয়েছ আজ সকল ভুলে'!
গর্ব্বে নিতে তোমায় ধরা

হয় না কেন ত্ু'খানা ?
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

বেঁচে তোমার ফল্ কি আছে ?
মানুষ যারা মরে বাঁচে;
তোমার মত 'কাঠের পুতুল'
আর আছে ভাই ক'জনা ?
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

আজ হ'তে ভাই কর এ পণ,
মরো যেন দশের মতন—
অধম লোকের মরায় যে হায়
হয় না কারো বেদনা।
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

নিজের পায়ে দাঁড়াও নিজে,—
রোদে পুড়ে', জলে ভিজে,
আপন আহার আপনি খোঁজ,
পরের দ্বারে যেয়োনা।
'দাও' বলে হাত পেতোনা।

৫৩। চিত্র-শিল্প সোপান। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র দেব-বর্ম্ম-প্রণীত। যে রাজ্যের রাজভাষা বাঙ্গালা, সেই রাজ্যের নবীন রাজার নামে গ্রন্থখানি উৎসৃষ্ট হইয়াছে। ড্রয়িং, ওয়াটার কলার-পেন্টিং, অয়েল পেন্টিং শিক্ষা-প্রণালী পুস্তক। সরল বাঙ্গালায় সুলিখিত পুস্তক। এই পুস্তকখানির দ্বারা একবিভাগের বিশেষ অভাব বিদূরিত হইল। গ্রন্থকারকে আমরা এজন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

৫৪। চাক্‌মাজাতি। জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। এই গ্রন্থকার চাকমাজাতির ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এই সকল আদি নিবাসীদিগের বিবরণ না জানার দরুণ ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিবার বা ভাবিবাব সময় আমাদিগকে বিশেষ কষ্টে পড়িতে হয়। সরলতা এবং স্বাভাবিকতা আদিমজাতি সকলের নিজস্ব ধন। জুমিয়া কাহিনী লিখিবার সময় কবিবর নবীনচন্দ্র ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। গ্রন্থকার বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই সুবিস্তৃত পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। এই সুন্দর গ্রন্থখানির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ এক অভাব পূর্ণ হইল। পূর্ব্ববঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার কৃতী লেখক-সংখ্যা বড়ই অল্প। পূর্ব্ব বাঙ্গালার অধিকাংশ লোক কেবল খায় আর বেড়ায়, আর মামলা মকদ্দমা করে, দেশের ঋণ পরিশোধের একতম উপায় জাতীয় ভাষার পরিচর্য্যা করে না! এজন্য আমরা বড়ই দুঃখিত। বিধাতা এই অভাব দূর করুন। দুঃখের বিষয়, এই পুস্তকখানিও বিলাতী কাগজে ছাপা।

৫৫। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম। দ্বিতীয় খণ্ড, সুরমা উপত্যকা ও পার্ব্বত্য প্রদেশ বিভাগ। শ্রীকৃষ্ণমোহন ধর বিরচিত, মূল্য ১৲। শ্রীহট্ট ও আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহের যাবতীয় বিবরণ বিস্তৃত ভাবে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সংগ্রহ মোটের উপর বেশ হইয়াছে। লুসাইদিগের এবং কামরূপ জেলার বিবরণ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। অনেক জ্ঞাতব্য কথায় গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, আশা করি।

৫৬। বিক্রমপুরের ইতিহাস। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ২৷৷০। প্রাচীন ও বর্ত্তমান বিক্রমপুরের দুই খানি ম্যাপ, এবং আরো ৪০ খানি ছবি [illegible] কান ছবিই কাল্পনিক নহে, প্রতিকৃ[illegible] সংগৃহীত। ইতিহাস বিভাগ খুব বিস্তৃত নহে, সাহিত্য-সেবী এবং সুবিখ্যাত ব্যক্তিগণের জীবন-বিবৃতি খুব বিস্তৃত। বিক্রমপুর পূর্ব্ব বাঙ্গালার গৌরব, যে সকল মহাজন এই বিস্তৃত প্রদেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা, শুধু বঙ্গ নহে, ভারতের আদর্শ। এই সকল ব্যক্তির জীবনী প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। নিরপেক্ষ ভাবে পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। বিক্রমপুরের ইতিহাস বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায় বিশেষ। গভীর গবেষণা ভিন্ন এ কার্য্যে কাহারও কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান পুস্তকখানি "খসড়া" রূপে গৃহীত হইতে পারে—কালে এই ইতিহাসে অনেক বিষয় সংযুক্ত হইলে ইহা একখানি আদর্শ ছবি বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। মহা ব্যাপারের এই প্রারম্ভিক সূচনার জন্য আমরা গ্রন্থকারকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

তৃতীয় পর্য্যায়।

২৯। উভয়ের একদেশলব্ধ উপরাগ হইতেও এ ব্যবস্থা হয় না। (এ ব্যবস্থা = মোক্ষ ব্যবস্থা)।

একাত্মবাদীর মতে আত্মা সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং তাঁহার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ নিত্য। তাহা হইলে সেই সম্বন্ধজ বাসনা নিত্য হয়; তাহা হইলে আত্মার বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা থাকে না। যে মুক্ত হয়, সে আবার বদ্ধ হয়। নানাত্মবাদেও আত্মা বিভু বলিয়া সকল আত্মার সহিত সকল বিষয়ের সম্বন্ধ থাকায়, এই বন্ধন মোক্ষ ব্যবস্থা হয় না।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, বিষয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ হয়—ইন্দ্রিয়াদি করণ দ্বারা। ইন্দ্রিয় বিষয়ে যুক্ত হয়। বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দ্বারা উহা গ্রহণ করে,—বুদ্ধি বিষয়াকার হয়। সেই বিষয়াকার বুদ্ধির প্রতিবিম্ব আত্মায় পড়িলে, আত্মা বিষয় গ্রহণ করে, সুতরাং আত্মা ও বিষয় একদেশ স্থিত নহে।

কোন কোন মতে আত্মা বিষয়দেশে গমন করিয়া বিষয়ে সংযুক্ত হন। ইহা এস্থলে আলোচ্য নহে।

উভয়—অর্থাৎ বদ্ধ ও মুক্ত উভয় আত্মা। উভয় আত্মার এক বিষয় দেশে উপরাগ হইলে বদ্ধ মুক্ত অবস্থা থাকিত না। মুক্ত আত্মাও আবার বদ্ধ হইত।

৩০। যদি বলা যায় যে, অদৃষ্ট বশে ইহা সিদ্ধ হয়। (অর্থাৎ অদৃষ্ট বশে কেবল বদ্ধ আত্মারই বিষয়ে উপরাগ হয়।)

যাহার অদৃষ্ট যে জ্ঞানের উৎপাদক, সেই অদৃষ্টই সেই জ্ঞানের কারণ। অদৃষ্ট অভাবে মুক্ত আত্মার বাসনা থাকে না। ইহা বলা যায়।

এক দেশ সম্বন্ধ জন্য সকল আত্মার বিষয় সংযোগ সমান হইলেও, অদৃষ্ট বশতঃ বদ্ধ আত্মারই বিষয়ে উপরাগ হয়, যদি ইহা বলা যায়। (বিঃ ভিঃ)

৩১। (তাহা বলা যায় না;—কারণ) উভয়ের এক কালে যোগ না হওয়ায়. উভয়ের মধ্যে উপকারী উপকারক ভাব হইতে পারে না।

বিষয়ের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে, কর্ত্তা ও ভোক্তা উভয়ের এক কালে বিদ্যমানতা সম্ভব হয় না। ক্ষণিকবাদ মতে পদার্থ ক্ষণেক্ষণে অন্যথা হয়। সুতরাং অদৃষ্ট বশতঃ আত্মার বিষয়ানুরাগ সম্ভবে না। কর্ত্তৃ-নিষ্ঠ অদৃষ্টের দ্বারা ভোক্তৃনিষ্ঠ বিষয়োপরাগ সম্ভব নহে। (বৌদ্ধ মতে আত্মাও ক্ষণিক বিজ্ঞান মাত্র। (বিঃ ভিঃ) যে ক্ষণে আত্মা কর্ম্ম করিয়া অদৃষ্ট সঞ্চয় করিল, পরক্ষণে আর সে কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য থাকে না। অন্য আত্মা তাহা ভোগ করে। সুতরাং একের অদৃষ্ট অন্যকে বদ্ধ করে।

ক্ষণিকবাদ স্বীকারে এই সিদ্ধান্ত হয়।

৩২। যদি পুত্র কর্ম্মের ন্যায় ইহা হয়,—

পিতৃনিষ্ঠ পুত্র কর্ম্ম দ্বারা পুত্রের উপকার হয়. পুত্রের জন্য পিতা পুত্রেষ্টি যাগ গর্ভাধা-

নাদি সংস্কার কর্ম্ম করিয়া পুত্রের উপকার করেন। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ মতে সেইরূপ পূর্ব্বক্ষণের আত্মাকৃত কর্ম্ম দ্বারা পরক্ষণের আত্মা উপকৃত হন। অতএব পিতা গর্ভাধানাদি যে কার্য্য করেন, তাহা দ্বারা যদি পুত্র সংস্কৃত হইতে পারে, তবে এক আত্মা যাহা করে, পরক্ষণের আত্মা তাহা ভোগ করিবে না কেন?

৩৩। (তাহাও হয় না। যেহেতু এই মতে) স্থির এক আত্মা নাই, যে গর্ভাধানাদি কর্ম্মের দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারে।

(সাংখ্য মতে আত্মা অনাদি নিত্য স্থির। সেই জন্য পুত্রেষ্টি কর্ম্মে সন্তানের উপকার হইতে পারে। কিন্তু ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ মতে, এরূপ এক স্থির আত্মা নাই। সুতরাং এই মতে, গর্ভাধান হইতে জন্ম পর্য্যন্ত স্থায়ী এক আত্মা নাই—যে পুত্রেষ্টি প্রভৃতি দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারে। গর্ভাধান কর্ম্মে যে আত্মা সংস্কৃত হয়, জন্মকালে আর সে আত্মা না থাকায় জন্মকালীন আত্মা তাহার ফল ভোগ করিতে পারে না।

৩৪। কার্য্যের স্থিরত্ব সিদ্ধি নাই, এহেতু ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত হয়। তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে।

যখন কার্য্য মাত্রেই ক্ষণিক, তাহার স্থিরতা নাই, তখন বন্ধনও ক্ষণিক। তবে তাহাদের অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে। [সূত্রের এই শেষ অংশ বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্যে নাই]। ইহার অর্থ—কার্য্য ক্ষণিক হইলেও দীপশিখার ন্যায় প্রবাহরূপে ইহার ব্যবহার সিদ্ধ।

৩৫। তাহাও নহে। কেন না তাহাতে প্রত্যভিজ্ঞার বাধা শূন্য হয়।

জীবের প্রত্যভিজ্ঞা উল্লিখিত সিদ্ধান্তকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করে। প্রথমোৎপন্ন যথার্থ জ্ঞান = অভিজ্ঞ। তাহা পরে জ্ঞানগোচর হইলে তাহার প্রত্যভিজ্ঞতা হয়। কাল যে দেবদত্তকে দেখিয়াছি, এক্ষণে ওই সেই দেবদত্ত—ইহা প্রত্যভিজ্ঞা। ইহার অবাধিত অর্থ—সত্য। ইহার অধিকরণ স্থায়ী না হইলে এই প্রত্যভিজ্ঞা হইল না। সুতরাং ক্ষণিক বিজ্ঞান প্রবাহ আত্মবাদ প্রমাণ বিরুদ্ধ।

ঘটাদিও ক্ষণিক নহে। তাহা হইলে যে ঘট কাল দেখিয়াছি—সেই ঘট আজ স্পর্শ করিতেছি—এরূপ জ্ঞান হইত না। যাহা আমি দেখিয়াছিলাম, তাহাই স্পর্শ করিতেছি—এই জ্ঞানও প্রত্যভিজ্ঞা। ইহাতে কার্য্যের স্থিরত্ব সিদ্ধ হয়। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেক কালের সম্যক্ বোধ হইতে পারে না। এজন্য দীর্প শিখার ক্ষণিকত্বও ভ্রম। এজন্য বন্ধনও ক্ষণিক নহে। * (বিঃ ভিঃ)

৩৬। তাহা শ্রুতি ও ন্যায়ের বিরোধী।

শ্রুতি মতে জন্মান্তর ফলভোক্তা পুরুষ আছে। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" "তম এবেদমগ্র আসীৎ" ইতি শ্রুতিঃ। ইহার দ্বারা ও যুক্তিদ্বারা কার্য্যকারণাত্মক এই প্রপঞ্চ জগতের ক্ষণিকত্ব অনুমানের বিরোধ হয়। ক্ষণিক হইলে, সৃষ্টির পূর্ব্বে ও সৃষ্টির সময়ে পূর্ব্ব পদার্থের উল্লেখ সম্ভাবনা থাকিত না।

৩৭। তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারাও সিদ্ধ হয় না।

* অভিজ্ঞা = cognition। আর প্রত্যভিজ্ঞা = recognition, apperception. ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ স্বীকার করিলে, যাহা cognition হয়, পর মুহূর্ত্তে তাহার ধ্বংস হওয়ায় তাহার recognition হইতে পারিত না।

ক্ষণিকত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। এজন্য তাহার দৃষ্টান্ত নাই। দৃষ্টান্ত না থাকায় তাহার অনুমান হয় না। ক্ষণিক হইলে অর্থ ক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই।

প্রদীপের শিখাও ক্ষণিকত্বের দৃষ্টান্ত নহে। (বিঃ ভিঃ)

৩৮। যাহারা যুগপৎ জন্মে, তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব নাই।

বস্তু ক্ষণিক হইলে অর্থক্রিয়া বা ব্যবহার চলে না। সকল বস্তু ক্ষণিক হইলে সকলেই এককালে উৎপন্ন। পরবর্ত্তী ক্ষণে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণের সমুদায় ধ্বংস হইয়া যায়, আবার সকল উৎপন্ন হয়। এইরূপে প্রতি মুহূর্ত্তে যাহারা যুগপৎ উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তাহা না থাকিলে উৎপত্তি বিনাশ উৎপন্ন হয় না। যদি একদাই দুই পদার্থ উৎপন্ন হয়, তবে কে কাহার কারণ হইবে ?

৩৯। আর পূর্ব্ববর্ত্তী দ্রব্য ধ্বংস হইলে পরবর্ত্তী দ্রব্যের সহিত তাহার যোগ হইতে পারে না।

যাহা কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা সে কার্য্যের কারণ। পূর্ব্ব সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা এক সময়ে জন্মে, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বাপরীভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কার্য্যকারণভাব থাকিতে পারে না। এস্থলে প্রশ্ন হয় যে, ক্রমোৎপন্ন পদার্থ মধ্যে কার্য্য কারণ ভাবত থাকিতে পারে। কিন্তু ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ মতে যাহা পূর্ব্বক্ষণের দ্রব্য, তাহা নষ্ট হইয়া তবে পরক্ষণের দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং যাহা নষ্ট হইল, তাহার সহিত পরক্ষণের দ্রব্যের আর সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সেই সম্বন্ধ বা সংযোগ না থাকায় তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

কার্য্যমাত্রেই উপাদান কারণের অনুগত। তাহা পূর্ব্বে বর্ত্তমান না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না।

৪০। তাহার (পূর্ব্ববর্ত্তীর) ভাবে (বা বিদ্যমান কালে) তাহার (বা পরবর্ত্তীর) যোগ না হওয়ায়, এবং উভয়ের ব্যভিচার হওয়ায়, কার্য্যকারণ ভাব থাকিত না।

তাহার ভাবে—কারণের অস্তিত্ব কালে, তাহার = পরবর্ত্তী কার্য্যের। উভয়ের কার্য্য কারণ এ উভয়ের (অনিঃ) অন্বয় ব্যতিরেক, এ উভয়ের (বিঃ ভিঃ)

যোগ—কার্য্যের সহিত কারণের যোগ। যখন কারণ থাকে, তখন কার্য্য থাকে না। যখন কার্য্য থাকে, তখন কারণ থাকে না। কাজেই কার্য্যকারণের অর্থক্রিয়াকারিত্ব থাকে না। কার্য্য কারণ ব্যবহার নিরর্থক হয়।

যেহেতু পূর্ব্বোৎপন্ন পদার্থের ভাব কালে, উত্তরকালীন পদার্থের সম্বন্ধ হয় না, সেই জন্য কার্য্য কারণ ভাব সম্ভব নহে। অন্বয় ব্যতিরেক এ উভয়ের ব্যভিচার হইলেও এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। উপাদেয় = কার্য্য ; উপাদান কারণ। উপাদান থাকিলে উপাদেয় হয়, উপাদান না থাকিলে উপাদেয় হয় না। কাজেই অন্বয় ব্যতিরেক অনুসারে, উপাদান উপাদেয় মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। যদি উপাদেয় উৎপত্তি কালে উপাদান নষ্ট হয়, তবে এ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না।

৪১। কেবল পূর্ব্বে থাকিলেই যে কারণ হইবে, এমন নিয়ম নাই।

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ বলেন, পূর্ব্বক্ষণের পদার্থ ধ্বংস হউক, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী থাকাতেই কারণ হইতে পারে। এ সিদ্ধান্তও সঙ্গত নহে।

একজন বাণ নিক্ষেপ করিয়াই মরিয়া গেল, তাহার পরক্ষণে অন্যে বাণ বিদ্ধ হইল, ও তাহার পর সেই সরসিত ব্যক্তিও মরিয়া গেল। এস্থলেও পূর্ব্বে কারণের ধ্বংস হয় নাই।

নিমিত্ত কারণ সম্বন্ধে এই নিয়ম হইতে পারে না! হইলে, উপাদান ও নিমিত্ত কারণে প্রভেদ থাকে না। (বিঃ ভিঃ)

৪২। বাহ্য বিষয়ের প্রতীতি হয়, এজন্য বিজ্ঞান মাত্র তত্ত্ব নহে।

জগৎ কেবল বিজ্ঞান মাত্র নহে। স্বপ্নে যেমন বিষয়ের বিজ্ঞান মাত্র সত্য, বিষয় মিথ্যা; সেইরূপ জাগ্রতেও বাহ্য বিজ্ঞান মাত্র সত্য, বাহ্য বিষয় মিথ্যা, ইহা বলা যায় না। তাহা হইলে "আমি ঘট" এই প্রতীতি হইত, 'ইহা ঘট" এরূপ প্রতীতি হইত না। বাসনা হেতু এরূপ হয়, তাহা বলা যায় না। বাহ্য ঘট অভাবে ঘটবাসনাই হইতে পারে না। অবয়বী না থাকিলে বাহ্যার্থ থাকিতে পারে না, অবয়ব থাকে না! অবয়বী না থাকিলেও বাহ্য পদার্থের অপলাপ করা যায় না। অবয়বী ও অবয়ব এক নহে।

অন্তরস্থ বিজ্ঞান ব্যতীত বাহিরেও বিজ্ঞেয় থাকা অনুভূত হয়। (বিঃ ভিঃ)

বহির্বস্তু অন্তরস্থ বিজ্ঞানের আলম্বন, বা বিষয়। এজন্য তাহারা বিজ্ঞেয়। বিজ্ঞেয় ও বিজ্ঞান এক নহে।

এই মতে যখন অন্তরস্থ বিজ্ঞান ব্যতীত কোন পদার্থ নাই, তখন বন্ধন বা আত্মার বন্ধন-অবস্থা জ্ঞানও বিজ্ঞান মাত্র; অতএব তাহা মিথ্যা ও অকারণ। এ কথা বলা যায় না। কেন না বিজ্ঞানবাদ মিথ্যা।

৪৩। যাহার (অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের) অভাব হইলে, তাহারও (অর্থাৎ বিজ্ঞানের) অভাব হয়। তাহাতে শূন্যবাদ আসে।

যদি স্বপ্নের দ্বারা বাহ্য বিষয়ের বাধ হয়, বলা যায়, যদি শ্রুতি স্মৃতি অনুসারে এই সমুদায় চিন্ময়, বিজ্ঞানই সত্য, এ প্রপঞ্চ মিথ্যা—ইহা সিদ্ধান্ত হয়, তবে বিজ্ঞানই সত্য ইহা স্বীকার করিতে হয় বটে।

কিন্তু জাগ্রত বাহ্য অবস্থায় বাহ্য বিষয়ের এরূপ বাধ হয় না! যাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহার অপলাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাকে স্বপ্নবৎ অসত্য বলা যায় না। আর বাহ্য অসত্য হইলে, শূন্যবৎ সিদ্ধ হয়, বিজ্ঞানবাদ সিদ্ধ হয় না। তাহাতে বিজ্ঞান প্রতীতি অবস্তু বিষয়ক হয়, তাহার প্রামাণ্য থাকে না। যে প্রমাণ দ্বারা বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে হয়, তাহাও বাহ্য। তাহাও অস্বীকার করিতে হয়। যদি বিজ্ঞান অনুভব সিদ্ধ হইত, তবে সর্ব্বত্র ইহা সিদ্ধ হইত; শূন্যবাদী তাহাতে আপত্তি করিত না। কাজেই ইহাকে প্রমাণসিদ্ধ বলিতে হয়। অসৎ প্রমাণ কার্য্য সাধক নহে। আর প্রমাণের ও বাহ্য বিষয়ের ব্যবহারিক সত্ত্বা স্বীকার করিলে, আর শূন্যবাদ থাকে না,—বিজ্ঞানবাদও থাকে না। কোন বিজ্ঞানবাদ সিদ্ধ হয় না।

আধুনিক বৈদান্তিকও বিজ্ঞানবাদী। তবে তাঁহারা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী নহেন, নিত্য বিজ্ঞানবাদী। এতদ্দ্বারা সে মতও খণ্ডিত হইল। শ্রুতি স্মৃতিতে যে বিজ্ঞান মাত্রের সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া বাহ্য পদার্থের অসত্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে বাহ্য পদার্থ কূটস্থ পরমাত্মার ন্যায় সত্য নহে। তাহা পরিণামী, ব্যবহারিক ভাবে সত্য। তাহা ঈশ্বরের সংকল্প রচিত।

৪৪। যদি বল শূন্যই তত্ত্ব; কেন, না, যাহা ভাব পদার্থ তাহার বিনাশ হয়—কারণ বিনাশই বস্তুর ধর্ম্ম!

ভাব বা যাহা এখন আছে, পরে তাহার অভাব হইবে। অতএব বিনাশই বস্তুর স্বধর্ম্ম। বস্তু যেমন আদিতে শূন্য ছিল, তেমনই শেষেও শূন্য হইবে। কেবল মধ্য কিয়ৎকাল থাকে।

অতএব বিনাশের পর আর বন্ধন থাকে না। শূন্য হয়,—মুক্তি হয়।

অতএব বন্ধনকারণও শূন্য।

ভাবরূপ তত্ত্ব হইলে তাহার নাশে তত্ত্বনাশ হইবে বলিতে হয়। (অবিঃ)

৪৫। ইহা অল্পবুদ্ধিদের অপবাদ মাত্র।

ভাব অসৎ হয়, ইহা কথার কথা। যাহা আগে ছিল না, তাহা পরে নাশ হইল, এইরূপ দেখা যায় বটে। কিন্তু সৎকার্য্যবাদ মতে ভাব অবিনাশী। নাশের অর্থ তিরোভাব মাত্র। প্রকৃতি পুরুষ অবিনাশী। প্রশ্ন এই যে যখন অভাবই নাই, তখন নাশ চিন্তার কি প্রয়োজন? মৃত্তিকার ঘট অবস্থা হয়। মৃত্তিকা ঘটবান হয়। সেই ঘট নাশের কেবল মৃত্তিকা জ্ঞান থাকে। ঘট জ্ঞানের অভাব হয়। ঘটবান মৃত্তিকা এই জ্ঞান ব্যবহারিক। কেবল মৃত্তিকা জ্ঞান—এক। বিষয় বৈলক্ষণ্যে বিজ্ঞান বৈলক্ষণ্য হয় না। তথাপি প্রশ্ন হয় যে, যদি ভাব ও অভাব মধ্যে সম্বন্ধ না থাকে, তবে কিরূপে অভাব জ্ঞান হয়? ইহার উত্তর এই যে অভাব জ্ঞানও সকারণ।

ভাব পদার্থে যে বিনাশী, ইহা মূর্খদিগের প্রলাপ। কোন কার্য্যেরই বিনাশ নাই, তাহার অতীত অবস্থাই প্রসিদ্ধ। তাহাই অব্যক্তাবস্থা। (বিঃ ভিঃ)

কেহ কেহ এই সূত্রের অর্থ করেন—শূন্যই তত্ত্ব ইহা মূর্খের প্রলাপ। কারণ ইহার কোন যুক্তি নাই। ইহাতে প্রমাণকেও শূন্য বলিতে হয়। না বলিলে শূন্যবাদে দোষ হয়।

অর্থ শূন্যং নিরালম্বং স্বরূপং যত্র চিন্ত্যতে।
অভাব যোগঃ স প্রোক্তো যেনাত্মনং প্রপশ্যতি॥

ইহা শূন্যবাদ নহে। ইহাতে পরমাত্মাই তত্ত্বরূপে গৃহীত।

"ত্রৈলোক্যং গগনাকারং নভঃস্থলা বপুঃ স্বকং
বিয়ৎগামী মনোধ্যায়ন্ যোগী ব্রহ্মৈব গীয়তে॥

এস্থলে আকাশ ও শূন্য একার্থক।

৪৬। উক্ত উভয়পক্ষ নিরাশের যুক্তি দ্বারা এই শূন্যবাদও নিরাশ করা যায়।

উভয়পক্ষ = ক্ষণিক পক্ষ ও বিজ্ঞান পক্ষ। যে যুক্তিতে ক্ষণিকবাদ ও বিজ্ঞানবাদ নিরাকৃত হইয়াছে, সেই যুক্তিতেই শূন্যবাদ নিরাকৃত হয়। প্রত্যক্ষ ও প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা ক্ষণিকবাদ নিরাকৃত হইয়াছে, ও বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ দ্বারা বিজ্ঞানবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। সেইরূপ প্রত্যক্ষাদি দ্বারাই শূন্যবাদ নিরাকৃত হয়।

৪৭। উভয়রূপে তাহার অপুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

শূন্য তত্ত্ব হইলে কে আপনার অভাব জন্য যত্ন করিত? তাহা হইলে মোক্ষ অপুরুষার্থ হইত। শূন্য—সৎ অসৎ ব্যতিরিক্ত বলিলে, ইহার উত্তর এই যে এরূপ তত্ত্ব নাই।

শূন্যতা স্বতঃ পরতঃ পুরুষার্থ নহে। সর্ব্ব শূন্য হইলে, দুঃখও শূন্য হয়। তাহা হইলে দুঃখ নিবৃত্তি পুরুষার্থ হয় না।

৪৮। গতি বিশেষ হইতেও, তাহা সিদ্ধ হয় না।

গতি দেখা যায়, শূন্য—গতি নহে। সুতরাং শূন্য—তত্ত্ব নহে। "পুণ্যেন ব্রহ্মলোকং যাতি" "পাপেন নরকং যাতি"—ইত্যাদি শ্রুতি এই গতি বিষয়ক।

শরীর প্রবেশাদি গতি দ্বারা পুরুষ বদ্ধ হয় না। (বিঃ ভিঃ)

দেহ পরিণাম আত্মা—ইহা ক্ষপণক মত। এস্থলে ইহা নিরাকৃত হইয়াছে। (অনিঃ)

৪৯। যে নিষ্ক্রিয়, তাহার গতি অসম্ভব।

পুরুষ—সর্ব্বব্যাপী; বিভু বলিয়া তাহার গতি অসম্ভব। পুরুষ ক্রিয়াহীন বলিয়া, তাহার শরীর প্রবেশাদি গতি অসম্ভব।

৫০। তাহা ঘটাদির ন্যায় মূর্ত্ত হইলে তাহার ঘটাদির সমান ধর্ম্মের আপত্তি হয়; ইহা অপসিদ্ধান্ত

ঘটাদি ক্রিয়াবান, বিনাশশীল। আত্মা সেইরূপ মূর্ত্ত হইলে বিনাশী হইত। আত্মা কৃমি হস্তী প্রকৃতি দেহ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আত্মা কোন দেহের পরিমাণ যুক্ত নহে। শ্রুতিতে আছে, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষোরন্তরাত্মাঃ।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আত্মা স্থূল শরীরের পরিমাণ যুক্ত নহেন। অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ লিঙ্গ দেহবদ্ধ আত্মা।

৫১। তবে আকাশের ন্যায় আত্মার উপাধিযোগে গতির কথা শ্রুতিতে আছে।

ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ পরিমাণযুক্ত ও ঘটের গমনে গমন করে বোধ হয়। ইহা ঔপাধিক। সেইরূপ সূক্ষ্ম শরীর অবস্থিত আত্মার গতিও শ্রুতিতে উক্ত আছে, তাহাও ঔপাধিক।

"ঘটসং বৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা।
ঘটো নয়েতমাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ॥"

বুদ্ধি বা আত্মার গুণে অতি সূক্ষ্ম আত্মাকে স্থূল বোধ হয়। আত্মা—"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ।" ইতি গীতা। অতএব আত্মা বিভু। তাহার মধ্যম বা অণু পরিমাণ হইতে পারে না।

৫২। কর্ম্ম দ্বারাও আত্মা বদ্ধ হন না। কারণ কর্ম্ম অন্যের ধর্ম্ম।

আত্মার কোন ধর্ম্ম নাই। বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা, বা তজ্জনিত অদৃষ্ট দ্বারা পুরুষ বদ্ধ হয় না। (পূর্ব্বে ১৬ সূত্রে, কর্ম্ম দ্বারা আত্মার বন্ধন হয় না, ইহা বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান সূত্রে কর্ম্ম অর্থ—কর্ম্মজনিত অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম। সুতরাং পুনরুক্তি নাই।

৫৩। অন্যের ধর্ম্ম দ্বারা আত্মার বন্ধন হয় বলিলে, অতি প্রসঙ্গ দোষ হয়।

তাহা হইলে মুক্ত আত্মারও বন্ধন সম্ভাবনা থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্ম—চিত্তের। তাহা সাক্ষাৎ আত্মার বন্ধন কারণ নহে।

৫৪। আর পুরুষ নির্গুণ ইত্যাদি শ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ হয়।

"অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ" "সাক্ষী চেতা কেবল নির্গুণশ্চ"—ইত্যাদি শ্রুতি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

বঙ্গের উপজাতি-সঙ্কট।

মানব-সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন প্রসূতিকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যখন প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, তখন মানুষ বেদনার কথা ভুলিয়া সোৎসুকনেত্রে সন্তানের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। কিরূপ সন্তান জন্মিবে, সেজন্য যে মন চিন্তা-ভারাক্রান্ত না হয়, তাহা নহে, অনিশ্চয়তার জন্য মন যে সন্দেহে দোলায়মান হয় না,তাহা নহে, কিন্তু নূতন কিছু আসিতেছে,এজন্য মন আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং সুসন্তান জন্মিবে, এই আশাই সকলের মনে জাগিতে থাকে। এই কথা কেবল ব্যক্তির নহে, জাতির সম্বন্ধেও খাটে। জাতীয় জীবনেও যখন কোনও নূতন তত্ত্বের আবির্ভাব হয়, তাহার জন্যও এই প্রসব বেদনার আবশ্যক হয়। যখন কোন নূতন আদর্শ আসিয়া পুরাতনকে পিটিয়া নূতন করিয়া গড়ে, তখন কিছু দিন জাতীয় জীবনকে এক কণ্টক যাতনাময় পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিতে হয়। নূতন আদর্শ পুরাতনকে স্বস্থানে থাকিতে দিতে চায় না, অথচ পুরাতনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলে যে স্থান পাওয়া যাইবে,তাহা শান্তির হইবে কি অশান্তির হইবে,এই চিন্তা জীবনকে অস্থির করিয়া তুলে। নূতন পুরাতনকে স্বস্থানচ্যুত করিবার জন্য স্ববলে সম্মুখের দিকে টানিতে থাকে, পুরাতনও অতি স্বাভাবিক নিয়মেই আপনার স্থান ছাড়িতে চায় না। নূতনের মধ্যে যদি উচ্চ ও মহৎ এমন কিছু থাকে,যাহা পুরাতনেরই পরিণতি, পূর্ণ বিকশিত নহে, কিন্তু বিকাশোন্মুখ, তাহা হইলে, পুরাতনের এই নূতন ভাবে জন্মগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। নূতন ও পুরাতনের মধ্যে যে এই টানাটানি, ইহাই জাতীয় জীবনের প্রসব বেদনা। এই বেদনা সময়ে সময়ে অতি গুরুতর আকার ধারণ করে, এমন কি, সময়ে সময়ে অস্ত্র প্রয়োগও প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু নূতনের জন্ম ঠেকাইয়া রাখা মানব সাধ্যের অতীত। নূতন কিছুর দিকে মন ধাবিত হইলে মানবসমাজে যে যন্ত্রণার আবির্ভাব হয়, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। আমরা নূতনকে কায়মনোবাক্যে ধরিতেও সমর্থ হইতেছি না,আপ্রাণ চেষ্টায় তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও আগ্রহ দেখাইতেছি না। কেমন একটা সংশয়াচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে পতিত রহিয়াছি। কিন্তু নূতনের মধ্যে এমন একটা শক্তি দেখা যাইতেছে, যাহাতে মনে হয়,সে স্ববলেই সকলকে টানিয়া লইয়া যাইবে, পুরাতনকে তাহার কাছে মাথা হেট করিতে হইতেছে। ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের উপজাতি (caste) সকলের অভ্যুত্থান তাহার দৃষ্টান্ত। যে সমস্ত উপজাতি লইয়া মহা হিন্দুজাতির পত্তন, তাহারা সকলেই এমন ভাবে অঙ্গ সঞ্চালন করিতেছে, যাহাতে সমগ্র জাতির জীবনে এক প্রবল আলোড়ন সমুত্থিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজ এত দিন যাহাকে যে স্থানে রাখিয়াছিলেন, সে আর সে স্থানে থাকিতে রাজী হইতেছে না। এই আলোড়ন উচ্চ নিম্ন সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই এই

সঞ্চালন বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই, কেন না, "যেখানে অস্ত্রের লেখা, ব্যথাও তথায়।" তাহারা নিম্ন শ্রেণীর, এই অপবাদ যুগ যুগান্ত ধরিয়া অম্লানবদনে বহন করিয়া আসিলেও আজ নূতনের আহ্বানে তাহা তাহাদের কাছে অসহ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহারা ইহার প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে—তাহাদিগকে যে স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা সে স্থানে আর থাকিবে না। অন্য দিকে আবার যিনি অতি উচ্চ—

সহস্রমিচ্ছতি শতী সহস্রী লক্ষমিহতে।
লক্ষাধিপো ততো রাজ্যং রাজ্যস্থঃ স্বর্গমিহতে॥—

এই নিয়মানুসারে আরও উচ্চে আপনার লক্ষ্য স্থাপন করিতেছেন। বঙ্গের জাতি বিভাগে কায়স্থের স্থান সর্ব্বোচ্চ বলিলেই হয়। কেন না, একজন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত কায়স্থের ও একজন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সম্মান শিক্ষিত সাধারণের কাছে একই। * তবুও কায়স্থ কি এ আলোড়ন পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যদিও কায়স্থ ব্রাহ্মণে বিভিন্নতা এই যে, একজন এক দিন আপনাকে শূদ্র মনে করিয়া আসিয়াছে, এই মাত্র। এখন কায়স্থ এই মনে করার হস্ত হইতেও উদ্ধার পাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আর উপরে উঠিয়া বসিবার স্থান নাই, আর জয় করিবার পৃথিবী নাই, কি করা যায়? তাই তিনি জিত পৃথিবীর মধ্যে অঙ্গ সঞ্চালন করিতেছেন। আলোড়ন এমনই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হইয়াছে। ব্রাহ্মণও নিশ্চিন্ত নহেন, তিনিও ভাবিতেছেন, এখন কি কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে, যাহাদিগকে নিম্নশ্রেণী বলিয়া এত দিন চাপিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহারাও যখন ঐ একই নবাভ্যুদিত শিক্ষা দীক্ষায় অভ্যস্ত হইয়াছে, তখন তাহারা কেন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? এরূপ আশা করাই বিড়ম্বনা। তাহাতে আবার পশুবলে চাপিয়া রাখিয়া দিবার অধিকার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই বিপুল আলোড়নে সমাজ-অঙ্গ আলোড়িত হইতেছে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা সকল হৃদয়েই জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই চাহিতেছেন, আবার নূতন করিয়া শ্রেণী বন্ধন করা হউক। এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটুও কৃত্রিমতা নাই, একটুও অস্বাভাবিকতা নাই। যাহা যুগ পরিবর্ত্তনের সময় সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে হইয়াছে, তাহাই এদেশে ও একালে অভিনীত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ইংলণ্ডের যে (civil war) আত্মকলহ ও ফ্রান্সের যে মহাবিপ্লব, (French revolution) তাহারও মূলে এই যুগ পরিবর্ত্তনের অভিনয়। এই সকল বিপ্লবের কেবল রাষ্ট্রীয় দিকই আমাদের চক্ষে পড়ে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ সকলের মূল উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাদ। যখন নিম্নশ্রেণী আপনাদের অবস্থার শোচনীয়তা অনুভব করিয়া পরিবর্ত্তন আকাঙ্ক্ষা করে, তখন উচ্চশ্রেণী সেই আকাঙ্ক্ষায় বাধা দেয়, সুতরাং বিপ্লব সংঘটিত হয়। বিপ্লববিহীন পরিবর্ত্তন সংশোধন করিতে হইলে উপর হইতে চাপ তুলিয়া লইতে হয় এবং নিম্ন

---

* অবশ্য আমার জানা আছে যে, শিক্ষিতাভিমানী এমন অ-ব্রাহ্মণ এখনও দেশে আছেন, যিনি শূদ্রের বাড়ী আহার করি না বলিয়া অহঙ্কার করেন এবং নাসিকা কুঞ্চন করতঃ কায়স্থের নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন।

হইতে উপরে উঠিবার রাস্তা অবাধ করিয়া দিতে হয়। ইতিহাস শিক্ষা দিতেছে, ইহার অন্যথা হইলেই বিপ্লব ঘটে। কেন না, ইতিহাসে দেখা যায়, নিম্নশ্রেণী যখন জাগ্রত হইয়াছে, তখন কেহই তাহাদের পথ রোধ করিতে এ পর্য্যন্ত সমর্থ হয় নাই। বাধা যতই শক্ত হয়, বিপ্লব কেবল ততই গুরুতর আকার ধারণ করে। ফরাসী-বিপ্লবে ব্যক্তি সকল অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের দেশের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের এই বিভিন্নতা যে, আমাদের দেশে জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে উপজাতি রহিয়াছে। সুতরাং এখানে উপজাতিরই অভ্যুত্থান হইয়াছে, বাধা পাইলে ফরাসী বিপ্লব অপেক্ষাও গুরুতর বিপ্লবের সম্ভাবনা। এই ইতিহাসের শিক্ষা শিরোধার্য্য করিয়া আমাদের দেশের নেতা ও সমাজপতিগণকে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা বিপ্লব অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে এরূপ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, সমাজের নেতৃবর্গের বুদ্ধিমত্ততায় বিপ্লব ঘটে নাই। গুণকর্ম্ম বিভাগে অবস্থার পরিবর্ত্তনে আবেষ্টনের নিষ্পেষণে কত উচ্চ নীচ হইয়া গিয়াছে। আবার অবস্থার আনুকূল্যে শিক্ষা দীক্ষার সহায়তায় কত নীচ অতি সহজে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। যাহারা আজ বঙ্গদেশে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছেন, তাহাদের কাহারও কাহারও ইতিহাস নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিলে ইহার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় যে জাতিভেদের তালিকা আছে, তাহাতে "কায়স্থ" জাতির কোনই উল্লেখ নাই। কিন্তু একস্থানে এরূপ কথিত আছে যে, রাজা চোর ডাকাতের হস্ত হইতে যেমন প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন, কায়স্থের হস্ত হইতেও তেমনই রক্ষা করিবেন। বরং কায়স্থের হস্ত হইতে বিশেষভাবে রক্ষা করিবেন*। ইহাতে বুঝা যায়, সে সময়ে কায়স্থ জাতির সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু "কায়স্থ" নামধেয় একদল প্রতাপশালী রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, যাঁহারা সময়ে অসময়ে প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতেন। তাহাদের সাহায্য রাজার পক্ষে এমন প্রয়োজনীয় ছিল যে, তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাজকার্য্য চালান অসম্ভব হইত। তাই তাহাদের উপর বিশেষ নজর রাখিবার জন্য শাস্ত্রকার রাজার উপর আদেশ জারি করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সময়েও মিলিয়া যাইবে। পুলীশ ছাড়া রাজকার্য্য চলে না, ইহা সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু সময়ে সময়ে ঘটনা বিশেষের দ্বারা উত্যক্ত হইয়া আমরাও কি বলিয়া উঠিতে বাধ্য হই না যে, চোর ডাকাত অপেক্ষা পুলীশের হস্ত হইতে প্রজাকুলকে রক্ষা করা সরকার বাহাদুরের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য? অবশ্য এটা মনে রাখিতে হইবে, ব্যক্তি বিশেষের দোষের জন্য সকলকে দোষী করা যায় না। কিন্তু এমন সময় কি উপস্থিত হয় না, যখন মনে হইতে পারে যে, দোষটা সাম্প্রদায়িক, ব্যক্তিগত নহে। যখন বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন কি ইহা মনে হইল না যে, যদিও পুলীশ দেশের লোক, তবুও তাহারা দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে আপনাদের শক্তি নিযুক্ত করিতেছে এবং উহা পুলীশের সম্প্রদায়গত দোষ দাঁড়াইয়াছে, ব্যক্তিগত নহে। তখন কি অনেকে রাগের মাথায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন না যে, পুলীশকে সামাজিকভাবে বন্ধ কর এবং পুলীশ ডিপার্টমেণ্ট বয়কট কর। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে পুলীশকে বাধ্য

* চাটু তস্কর দুর্ব্বৃত্তমহাসাহসিকাদি ভিঃ।
পীড্যমানাপ্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥
যাজ্ঞ, ১।৩৩৬।

হইয়া কি আপনাদের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে সকলকেই এক সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে হইত না? এবং গবর্ণমেণ্টকে কি বাধ্য হইয়া পুলীশের পুত্র পুলীশ, এই নিয়ম অবলম্বন করিতে হইত না? ইহা দ্বারা কি পুলীশ একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইত না? সুতরাং যাহারা একদল রাজকর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন, তাহাদিগকে সমাজে একটী স্বতন্ত্র উপজাতিতে পরিণত হইতে হইত। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, প্রথম প্রথম এই নবজাতি অত্যন্ত হেয় বলিয়াই পরিগণিত হইত। কায়স্থ সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। "কায়স্থ যখন" জাতিতে পরিণত হইয়াছে, তখন তাহাকে অতি হেয় অন্ত্যজ জাতি বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় কায়স্থের নাম আছে, কিন্তু কায়স্থ জাতি নাই। ব্যাসসংহিতায় কায়স্থ জাতির নাম আছে, তবে তাহাকে গোখাদক অন্ত্যজ জাতি সকলের সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে।* ক্রমে ক্রমে কায়স্থ যে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা এখন সকলের চোখে সম্মুখেই দীপ্যমান। রাজকর্ম্মচারিত্ব হইতে কায়স্থ যে জাতিতে পরিণত হইয়াছে, ইহা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে। দুইজন কায়স্থ কুলগৌরব এইরূপ ভাবের মত প্রকাশ করিয়াছেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন, হয়তো কায়স্থগণ এসেসরদের মত একদল রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। জষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র বঙ্গীয় ও পশ্চিমাঞ্চলস্থ কায়স্থগণের মধ্যে যাহাতে আদান প্রদান প্রচলিত হয়, এইমত সমর্থন করিয়া গত সেপ্টেম্বর মাসের Hindustan Reviewতে যে ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে একস্থানে লিখিয়াছেন—

"The true origin of the Indian caste system has frequently been discussed and no final conclusion has been arrived at. One of the theories (and I need hardly add there are stray passages in our ancient texts to support this theory) is that profession originally gave birth to the caste system .....Those who performed clerical, financial and ministerial duties of courts were the kayasthas. In course of time, offices and names became hereditary, as is common in india.

এই দিক্ হইতে বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীর মধ্যে অবশ্যই সত্য আছে। অনেকে হয়তো ব্রাহ্মণত্বেরও দাবী করিতে সমর্থ। কেননা, ও সকল কার্য্যে যে ব্রাহ্মণ একেবারে নিযুক্ত হইবে না, তাহা বলিতে পারা যায় না। আবার অনেক আছেন, যাহাদের কোন দাবীই নাই। কেবল কায়স্থগণের উপাধি গ্রহণ করিয়া কায়স্থত্ব লাভ করিয়াছেন এবং এক দপ্তরে কাজ করিতেন বলিয়া কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, কায়স্থ জাতির উন্নয়নে আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি, কিরূপে ধীরে ধীরে জাতি উঠিয়া যায়। বৈদ্যগণের ইতিহাস হইতেও, বোধ হয়, আমরা এ শিক্ষাই লাভ করিব। চিকিৎসা ব্যবসায়ীকে শাস্ত্রে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষেই দেখা হইয়াছে।* মহাভারতে বৈদ্যকে চণ্ডালের সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত দেখিতে

* বণিক কিরাতকায়স্থ মালাকারকুটুম্বিনঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাসনাঃ॥
ব্যাস ১।১২

* চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রূরস্যোচ্ছিষ্ট ভোজিনঃ।
... ...
বিষদন্নং নগর্য্যন্নং পতিতান্নমবক্ষুতম্॥
মনু। ৪।২১২ এবং যাজ্ঞ,১।১৬২

পাওয়া যায় †। অথচ সংখ্যায় অত্যন্ত কম হইলেও বৈশ্যগণও বঙ্গসমাজে শীর্ষস্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, একবার যিনি যে স্থানে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাকে যে সেই স্থানেই চিরদিনই থাকিতে হইবে, তাহা নহে, গুণ কর্ম্মানুসারে তাহার উপরে উঠা ইতিহাস একাধিক স্থলে স্পষ্টভাবে সমর্থন করিতেছে। অন্যদিকে আবার ইহাও বিবেচ্য। যে নীচ হইতে যখন উপরে উঠা হইয়াছে, তখন উপর হইতেও অনেককে নীচে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। উত্থান ও পতন জগতের নিয়ম। সুতরাং আজ যাহাদিগকে নিম্নশ্রেণী বলা হইতেছে, তাহাদের মধ্যে হয়তো কত অবনীত উচ্চশ্রেণী রহিয়াছে, অবস্থা বৈগুণ্যে তাহাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। এখন তাহাদিগের উর্দ্ধগমনে বাধা দিলে সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না। একদিকে যেমন চিরপ্রচলিত প্রথার (Tradition) বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে, অন্যদিকে সময়ের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া সমাজকে বিপদাপন্ন করা হইবে। যাহার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আসে, তাহাকে কখনও নীচু করিয়া রাখা যায় না। বঙ্গের উপজাতি সকলের মধ্যে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কোনও চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই বলিতে পারেন না, যে যে যেখানে আছে, তাহাকে আর সেইখানে রাখা যাইতে পারে। অন্য কোনও বিচার নিরপেক্ষ হইয়াই ইহাদের পথ খুলিয়া দিতে হইবে। অপরপক্ষে জাতীয় জীবনের দিক হইতে বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্ত জাতীয় জীবনে আজ যে সমস্যা আসিয়াছে, তাহার পূরণের জন্যও সকলকে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। আপেক্ষিক ও নিরপেক্ষ উভয় বিচার যেখানে এক পথ নির্দ্দেশ করিতেছে, সে পথে না যাইয়া অন্য পথে যাইতে চাহিলে যে বিপ্লবকেই ডাকিয়া আনা হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং নূতন করিয়া শ্রেণীবন্ধন এখন অবশ্য কর্ত্তব্য।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, নূতন অবস্থায় নূতন সমস্যায় নূতন করিয়া শ্রেণীবন্ধন যুগে যুগে হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের সমস্যা পূর্ব্বকার কোনও যুগের সমস্যা অপেক্ষা জাতীয় জীবনের পক্ষে কম প্রয়োজনীয় নহে। প্রথম সমস্যা উপস্থিত হয়, যখন আর্য্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া অনার্য্যগণকে বশীভূত করতঃ সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। এরূপক্ষেত্রে এখনও যাহা ঘটিয়া থাকে, তখনও তাহাই ঘটিয়াছিল। আর্য্যগণ সংখ্যায় অল্প ছিলেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া দস্যুগণকে আপনাদের সেবায় নিযুক্ত করিলেন। আর্য্যসমাজে তাহাদের অন্য অধিকার রহিল না, কেবল সেবার অধিকার। একজন সেবা করিবে, অন্য জন সেবা গ্রহণ করিবে, উভয়ের মধ্যে এইমাত্র সম্বন্ধ। এখনও তাহাই হয়। এদেশবাসী শ্বেতকায়গণ সেবা গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনও সম্বন্ধে দেশীয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হইতে প্রস্তুত নহেন। আমেরিকায় শ্বেতকৃষ্ণের ভেদও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কৃষ্ণকায়ের সেবা ছাড়া জীবন ধারণ সম্ভব নহে, কিন্তু সেজন্য তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। কৃতজ্ঞ হওয়া দূরের কথা, উহাকে মানুষ বলিয়াই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। অতি সামান্য দোষেই বিনা বিচারে প্রাণদণ্ড। একটা মহা ভয়ের

† চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদেহৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।
বৈশ্যায়াংশ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেহপসদাস্ত্রয়ঃ॥
অনুশাসন ৪৮।১০।

উপর সকল আইন কানুন প্রস্তুত হইয়াছিল; যদি অনার্য্য সংমিশ্রণে আর্য্যের অবনতি ঘটে। ইহাই বৈদিকযুগের সমস্যা—দ্বিজ ও দাসের মধ্যে রেখা টানিয়া এ সমস্যার পূরণ হইল। দস্যুগণ সমতল ছাড়িয়া পর্ব্বতে আশ্রয় লইল। ফল ভাল হইল না, তাহারা এখনও সেই বর্ব্বরই রহিয়াছে। অনেকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দাসত্ব গ্রহণ করিয়া সমতলেই রহিল এবং আর্য্যসংস্পর্শে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া দ্বিজশূদ্রের মধ্যাস্থিত বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলেন। সব একাকার হইয়া গেল। আর্য্য অনার্য্য মিলিয়া এক মহা জাতির সূচনা হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম পাঁচ শত বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে ভারতে রাজত্ব করিল। তারপর ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম মস্তক তুলিতে লাগিল—প্রধূমিত বহ্নি ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিল। আবার নূতন করিয়া শ্রেণীবন্ধনের প্রয়োজন হইল। এবার আর দ্বিজশূদ্রের ভেদ নহে, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদই মূলমন্ত্র। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্য হইতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য যেন মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইয়াছে। আর কোথায়ও না হউক, বঙ্গদেশে সে চেষ্টা সফল হইল। বঙ্গদেশেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিস্তারিত হইয়াছিল এবং অধিক দিন স্থায়ী হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণের ক্রোধ বঙ্গদেশের উপর যে অধিক মাত্রায় পতিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ সময়ে যে শাস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মণের ক্ষমতাকে সর্ব্বতোমুখী করিবার চেষ্টা হইয়াছে! বৌদ্ধপ্রভাবে শূদ্র যে দ্বিজজাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ এ আক্রোশে জ্বলিয়া মরিতেছিলেন,] এখন প্রতিশোধ লইবার সময় আসিল। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা তো আর 'প্রতিরোধ করা যায় না।' কিন্তু কুকর্ম্মকারীদিগকে (lynch) লিঞ্চ করা গেল না বটে, তাহাদের বংশধরগণের উপর যত চোট পড়িল। প্রতিলোম বিবাহোৎপন্ন জাতি সকলকে বাছিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে হেয় ঘৃণিত করিয়া দেওয়া হইল। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, বঙ্গদেশ এতই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ হইল। সুতরাং বিদেশ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রবাদ রচিত হইল। এ প্রবাদ সত্য কি মিথ্যা, সে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়াও এ কথা বেশ বুঝা যায় যে, বঙ্গের নূতন শ্রেণীবন্ধনে ব্রাহ্মণের ক্ষমতাই অপ্রতিহতরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, কাহারও পূর্ব্বেতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা হইল না। কায়স্থগণের উন্নয়নের প্রবাদও এই কথারই সাক্ষ্য দিতেছে। যিনি নিঃসঙ্কোচে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, আর যিনি তাহা করিলেন না, তিনি নিকৃষ্ট। বঙ্গদেশও তো হিন্দুদেশ? তবে এখানে ক্ষত্রিয় বৈশ্য একেবারেই নাই কেন? নব শ্রেণীবন্ধনে ব্রাহ্মণ স্বীয় প্রাধান্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিবার জন্য যজ্ঞসূত্র কেবল নিজের জন্য রাখিয়া আর সকলকে একেবারে শূদ্রত্বে নামাইয়া দিয়াছিলেন। যাহারা প্রাধান্য স্বীকার করিল, তাহাদের তো এই দশা, যাহারা স্বীকার করিল না, তাহাদের কি দশা হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ক্ষত্রিয় সহজেই স্বাধীনচেতা, বৈশ্যেরও জীবিকা স্বাধীন বলিয়া সে সহজেই দাসত্ব স্বীকার করে নাই। এইজন্য বৌদ্ধবিপ্লবের পরে যে সমাজ হইল, তাহা হইতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য একেবারে লোপ পাইল। ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে হাতে না পাইয়া রাজার সাহায্যে ইহাদের উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন—ইহাদিগকে

সমাজে অতি নীচ করিয়া দিলেন। পরে যখন ইহারা ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্বীকার করিলেন, তখন নীচত্ব আর গেল না। প্রথম প্রথম martyr-গণের যে সম্মান হয়, পরে আর তা হয় না, আমরা তো ইহা স্বচক্ষেই দেখিতেছি। প্রথমে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিলে হয়তো যাহারা অতি উচ্চস্থান পাইতেন, তাহারাই অবস্থার বৈগুণ্যে নীচ জাতি বলিয়া ঘৃণিত হইতেছেন। সুতরাং আবার নূতন অবস্থা আজি যাহারা ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব দাবী করিতেছেন, তাহাদের সে দাবী উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। সময়ের চিত্র দেখিয়া মনে হইতেছে, আবার নূতন বন্ধনে সমাজকে বাঁধিতে হইবে, প্রাচীন বন্ধন আর কেহ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। জাতিভেদ সংস্কারের প্রথম উদ্যমে যাঁহারা পশ্চাৎ ফিরিয়াছিলেন, এখন দেখা যাইতেছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া সোজাভাবে না হউক, বক্রভাবে তাঁহারা আবার এই দিকেই আসিতেছেন। জষ্টিশ মিত্রের প্রস্তাব ইহারই ফল। বঙ্গের কায়স্থের সঙ্গে এক নাম সাদৃশ্য ছাড়া পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের আর সাদৃশ্য কোথায়? বঙ্গের উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে সাদৃশ্য কি ইহা অপেক্ষা শত গুণ বেশী নহে? দেশের এক অংশে বাসহেতু একই আচার পদ্ধতির অধীন বলিয়া এবং একই শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে বঙ্গের উচ্চশ্রেণী মধ্যে পার্থক্য একেবারেই চলিয়া গিয়াছে। আদান প্রদান ইহাদেরই মধ্যে কি সর্ব্বাগ্রে প্রচলিত হওয়া অধিকতর সমীচিন নহে? জাতিভেদের যাহা বিষদন্ত, তাহা তো ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাহাদিগকে নিম্নশ্রেণী বলা হয়, তাহারাও যে আপনাদিগকে নীচ মনে করিত, ইহাই ছিল জাতিভেদের বিষদন্ত। যখন তাহারা আর আপনাদিগকে নীচ মনে করে না, উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে সমান আসন পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে একাসনে বসিবার যে ধর্ম্মভয় রূপ বাধা ছিল, তাহা যখন দূরে পরিহার করিতেছে, তখন জাতিভেদের ভিত্তিভূমি একেবারেই আলগা হইয়া গিয়াছে। এখন উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর দিকে ঐ ভাবে তাকাইলেই হয়। তাহা হইতেও বেশী দেরী লাগিবে না। এক শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া, এক আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধরিয়া, এক সাধনায় যাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন আর একজনকে অধিক দিন নীচ মনে করিয়া থাকিতে পারিবেন না, সমান বিদ্যা বুদ্ধিসম্পন্ন স্বীয় উপজাতির মধ্যে সমান সম্ভ্রান্ত দুই জন জজ যখন একাসনে বসিয়া সর্ব্বসাধারণের কাছে একই সমান লাভ করেন, তখন তাঁহারা আর বেশী দিন আপনাদিগকে উচ্চ নীচ ভাবিতে পারিবেন না। সুতরাং অচিরে নূতন আদর্শে নূতন শ্রেণী বন্ধন অবশ্য প্রয়োজন হইবে। ইহার মূল ভিত্তি কি হইবে? বৈদিক যুগের শ্রেণীবন্ধনের মূল ভিত্তি দ্বিজ শূদ্রের ভেদ, শ্বেত কৃষ্ণের মধ্যে প্রাচীর তুলিয়া পরস্পরকে ভাগ করিয়া রাখা হইয়াছিল। যাহারা সকল লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া রহিল, তাহারা আর্য্য সংস্পর্শে মনুষ্যত্ব লাভ করিল, আর যাহারা রহিল না, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জঙ্গলে গেল। তাঁহারা আজও পশুত্ব অতিক্রম করিতে পারে নাই। বৌদ্ধযুগের পরে যে সমাজের পত্তন হইল, তাহার মূল মন্ত্র সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, যে সে প্রাধান্য স্বীকার করিয়া "দাস" আখ্যা গ্রহণ করিল, সে শুদ্ধ হইল, নীচ হইলেও উচ্চতা লাভ করিল। যে স্বাধীনতার গৌরবে

ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিল না, স্বতন্ত্র রহিল, ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নি তাহাকে ভস্মীভূত করিল। সে কোপে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাধম হইয়া গেল। তবে এখন এ যুগের সূত্র কি হইবে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া উচ্চ নীচের ভেদ কল্পনা করা যাইবে? এ যুগের সূত্রে সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ থাকিবে না। এ যুগে স্বদেশ নামক একটা বস্তু আমাদের দৃষ্টিপথান্তর্ব্বর্ত্তী হইয়াছে। এ বস্তুটী যে আমরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা নহে, আয়ত্ত হইয়া থাকিলে আজ "স্বদেশী" অন্য আকার ধারণ করিত—কিন্তু সে বস্তু যে দৃষ্টিরেখার মধ্যে আসিয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পূর্ণিমোজ্জ্বল নির্ম্মল আকাশে তাকাইয়া থাকিলে যেমন অতি দূরে পাখীর ক্রীড়া দেখা যায়, পাখী কখনও বা দৃষ্টিপথে পড়ে, কখনও বা অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে হয়, দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ আধুনিক শিক্ষা-বিধৌত ভারতের নির্ম্মল আকাশে "স্বদেশ"-পাখী উড়িয়া বেড়াইতেছে, কখনও চোখে পড়ে, কখনও বা পড়ে না! কিন্তু পাখী যে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। পাখী ধরা দিবে বলিয়াই আসিয়াছে! তবে সময়ে সময়ে আমাদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পালাইয়া যায়, আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু পাখীর সুমধুর সঙ্গীত আমাদের কর্ণকুহরে ইতিপূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছে। এমন দিন দূরে নয়, যেদিন পাখীর সুস্বর-লহরীতে আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিবে। স্বদেশ পাখী আমাদিগকে ধরা দিবার জন্যই আসিয়াছে। এই স্বদেশের মঙ্গল চিন্তাই এযুগের মহত্ত্ব লাভের সোপান স্বরূপ হইবে। এ যুগের শ্রেণীবন্ধনের ভিত্তিমূলে থাকিবে শিক্ষা ও স্বদেশ-সেবা। যিনি এ কার্য্যে যত অগ্রসর, তিনি তত বেশী মহত্ত্ব লাভ করিবেন। যে ব্যক্তি বা যে সম্প্রদায় স্বদেশের মঙ্গল কার্য্য যত বেশী আত্মোৎসর্গ করিবেন, তিনি তত বেশী উচ্চাসন লাভ করিবেন। এ যুগে অন্য সকল কৃত্রিম ভেদ বিলুপ্ত হইবে। এক মাত্র ভেদ থাকিবে, স্বদেশ-সেবা ও স্বদেশ-দ্রোহের মধ্যে। যিনি ব্যক্তিগত বা উপজাতিগত স্বার্থের জন্য জাতীয় স্বার্থের বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন, তাহাকে এ যুগের "পারিয়া" সাজিতে হইবে—তিনি ব্রাহ্মণই হউন আর চণ্ডালই হউন। নব যুগের নব ধর্ম্মশাস্ত্র স্বদেশ-পুরাণে লিখিত হইবে—

'চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ দেশভক্তি-পরায়ণঃ।
দেশচর্য্যাবিহীনস্তু দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ ॥'

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

প্রতাপাদিত্য।

(ভবানন্দের প্রতি প্রতাপাদিত্যের উক্তি)

কি দেখিছ দ্বিজবর, লোহার পিঞ্জরে
বন্দী সে পারীন্দ্র যবে, কৃতার্থ হৃদয়ে
আসে যথা নেহারিতে নিষাদ কৌশলী!
প্রতাপের রক্তে স্নানি যাও ত্বরা করি
লইবারে রাজটীকা—বাঞ্ছিত গৌরব।
লুটিয়া ম্লেচ্ছের পদে দিও উপহার
প্রতাপের ছিন্ন শির—কভু যাহা নত
হয় নাহি দেশ অরি যবন-চরণে।
"জননী জনম ভূমি" শিখিনু কৈশোরে
মহামন্ত্র, দেহ প্রাণ সঁপিনু অমনি
মাতৃ পদে; দেখিয়াছে আকাশে দেবতা,
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ—দেখিয়াছে ভবে
নর নারী; মানবের যা'কিছু সম্বল
ভক্তি, শক্তি, ইচ্ছা, সাধ সঁপিনু সকলি।
একই কামনা চিতে, একই সাধনা,
তাড়াইয়া সিন্ধু পারে অধর্ম্মী যবনে
ঘুচায়ে বন্ধন দশা সাজাব আবার
রাজ রাজেশ্বরী মা'রে! হইবে সহায়
ভ্রাতৃ ভাবে হিন্দু যত, সহধর্ম্মী মম।
তখন জানিনা হায়, ক্ষত্র কুলাঙ্গার
মানসিংহ-অর্থ লোভী স্বার্থপরতায়
বিক্রীত ম্লেচ্ছের পদে! নাহি বহে আর
ক্ষত্র রক্ত দেহে তার—তা'হলে কি কভু
রাণা প্রতাপের বাণী—দৈববাণী সম,
—কহিলা যা' রাজরথী মুমূর্ষু দশায়
উদ্দেশি ক্ষত্রিয়গণে, জলন্ত সে স্বর,
সেই কথা, নরাধম পারিত ভুলিতে?
কহিলেন মহারাণা "চিতোর আমার
পূজনীয়া, বরণীয়া, দেবতা, জননী।
তাহারি উদ্ধার তরে পথের কাঙাল
সাজিয়াছি, অনশনে পুত্র কন্যা জায়া
কত দিন মৃত প্রায় দেখেছি নয়নে!
দেব-আশীর্ব্বাদ সম বরিয়াছি সদা
নিদারুণ দরিদ্রতা—মাতৃ-সেবা-কালে
কোন্ ক্ষোভ দুঃখে ক্লান্ত সন্তানের হিয়া
তোমরা রহিলে আজি—বিধির আদেশে
চলিনু অভাগা আমি—চিতোর আমার
রহিল বন্দিনী হয়ে ম্লেচ্ছ-কারাগারে!
বীর-কুলে জন্মিয়াছ ক্ষত্রিয় তনয়
তোমরা, স্মরিও সবে শেষ ভিক্ষা মম।—
উদ্ধারিতে মাতৃভূমি (ভোগ সুখ ছাড়ি)
দিও ঢালি তনুমন; কুমারে আমার
শুনাইও, জাগাইও, এ অবনী-তলে
চলে যেন অনুসরি পিতৃ পথ তার;
যেখানে যে হিন্দু আছ করিও স্মরণ,
জননী জনমভূমি পর-পদানতা,
যত দিন নাহি হয় তাঁহার উদ্ধার
তত দিন ধিক্কারিত সন্তান-জীবন;
একতা শক্তির বলে অবশ্য পারিবে
বিচূর্ণিতে দস্যুদলে, পূর্ণ সাধনায়!"
হায়, নীচ স্বার্থপর বিস্মৃতি সাগরে
ডুবাইল সে নিদেশ!—স্বদেশ-সেবক
আমারে বধিতে, মূঢ় তোমার সহায়ে
আসিল নিভৃত দেশে, মরণ যেমতি
সঙ্করে রোগের সাথে মানব-শরীরে।
যা' ছিল শকতি মম বুঝিনু সমরে
ম্লেচ্ছ সেনাপতি সহ—হায়রে নিয়তি!
মৃগেন্দ্র পিঞ্জরে বন্দী জম্বুক কৌশলে!

ভাবিছ, প্রসন্ন মুখে দিবে উপহার
জীবন্ত প্রতাপে লয়ে যবন সকাশে।—
কভু নহে! মৃত দেহ লয়ে যাবে দেহি
গৃধিনী কুক্কুর শিবা শকুনির সম!
প্রতাপ নিধনে দোঁহে পাবে পুরস্কার
জাহাঙ্গীর সন্নিধানে, সেই ধন মান
ভুঞ্জিবে সহস্র বর্ষ পুত্র পৌত্র সহ।
রবি শশী যত দিন রহিবে জগতে—
সমস্ত জগত ভরি জাগিবে কাহিনী।
নাহি ধিক্কারিব আমি, ধিক্কৃত যেজন
চরাচরে, তারে কিবা কহিব কুবাণী?
এই ক্ষোভ—এত তৃষ্ণা যদি ছিল মনে,
ভবানন্দ! মনানন্দে না মাগিলে কেন
মম সহ রণ, হয়ে যবনের দাস
কেন প্রবেশিলে হেন কাপুরুষ রূপে?
ভারতের ইতিহাস কলঙ্কিত করি
লিখিলে যে পাপ নাম চিরকাল তরে,
যমুনা জাহ্নবী পদ্মা সব বারি দিলে
সে কলঙ্ক-পঙ্ক তবু নারিবে ধুইতে!
জননী জনমভূমি যশোহর মম!
নাজানি কে ভাগ্যবান্ কোন সুপ্রভাতে
খুলিয়া বন্ধন তব, রাজ-রাজেন্দ্রাণী
সাজাইবে, মধু যথা সাজায় যতনে
হিমানীর জরাজীর্ণ বসুধা জননী।
কতই রহিল আশা—পাবক যেমতি
আগ্নেয় গিরির বক্ষে; অলক্ষ্যে দেখিছে
মহাশক্তি মহাকালী অভীষ্ট দেবতা।
অকপট ভক্ত আমি, সমস্ত জীবন,
জীবনের যাহা কিছু সঁপেছি তোমারে!
আজি সে আশার সনে ত্যজিনু—দেবতা!
সাক্ষী তুমি, সাক্ষী হও রবি, শশী, তারা,
অনল, অনিল, ব্যোম, দিকপালগণ,
সাক্ষী এই প্রতাপের উদ্দাম হৃদয়,
আজি সে আশার সনে ত্যজিনু সকল
জীবনের প্রয়োজন—প্রিয় যত ভাব।
উন্নতি কামনা-ভস্ম মাখিয়া পরাণে
ত্যজিলাম অন্নজল পার্থিব বাসনা!*
এখন কোথায় তুমি প্রাণ প্রিয়তম!
হে মরণ! ত্বরা আসি বাঁচাও প্রতাপে।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী

ভ্রান্ত ধারণা

বর্ত্তমান বর্ষের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের নব্যভারতের ৬০ পৃষ্ঠায় "প্রকৃতির পরিশোধ" নামক প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, ক্ষত্রিয়াচার গৃহীত কায়স্থ সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত প্রবন্ধের ফুট-নোটে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে নব্যভারতের পাঠকবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। সেই ক্ষুদ্র মন্তব্যটী এই—

"বঙ্গদেশে এক দল ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহাদের মনের ভাব এই যে, তাঁহারা নিতান্তই ক্ষত্রিয়, তবে গায়ের জোরে অন্যেরা তাঁহাদিগকে শূদ্র করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং কলমের জোরে শূদ্রত্ব ঘুচাইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন করিতে হইবে। যাঁহারা এক দিন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া দাস আখ্যা গ্রহণ করতঃ শূদ্রত্ব বরণ করিয়াছিলেন,কেবল বরণ করিয়াছিলেন,এমত নহে,

---

* প্রতাপ-আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।
পথেতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে॥
ভারতচন্দ্র।

কিন্তু লজ্জা-শূন্য হইয়া সেই দাসত্বকেই কৌলীন্য রূপ স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি বানাইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইলে চলিবে কেন? বরং যিনি প্রকৃত ক্ষত্রতেজ দেখাইয়া মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন,—দত্ত ভৃত্য নহে সঙ্গে এসেছে—তাহাকে ত সমাজে হীন করিয়া রাখা হইয়াছে; যাহা কর্ম্ম দোষে গিয়াছে, তাহা গুণকর্ম্ম বলে লাভ করিতে হইবে। নতুবা গলায় একটা দড়ী ঝুলাইলে ফল কি? ফল সময় বিশেষে দরকার হইলে কেবল কলসীতেই চলিবে।"

এই মন্তব্যটী আদ্যোপান্ত অসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ইহার ভাষা গ্রাম্য ও অভদ্রোচিত। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির লেখনী এই প্রকার ভাষায় কলঙ্কিত হইতে পারে, আগে আমরা জানিতাম না। যদি জনসমাজে আদরনীয় নব্যভারতের ন্যায় পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত না হইত, তবে আমরা ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারিতাম। বিষয়ান্তর আলোচনার সময়ে হঠাৎ নিষ্কারণে অপ্রাসঙ্গিক রূপে কতকগুলি ত্যাগশীল সমাজ-সংস্কারকদিগকে এই প্রকার আক্রমণ করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত, তাহার মীমাংসার ভার কৃতবিদ্য ধীরেন্দ্র বাবুর হস্তেই অর্পণ করিলাম।

আজ সপ্তবর্ষব্যাপী যে আন্দোলন-তরঙ্গ বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজকে আলোড়িত করিতেছে, তৎপ্রতি প্রবন্ধ-লেখক যে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই, এরূপ হইতে পারে না; তবে উক্ত আন্দোলনের "প্রয়োজনাভিধেয় সম্বন্ধাঃ' তিনি শ্রবণ মননাদি দ্বারা বিশেষ রূপে অবগত হন নাই। কায়স্থ সমাজের শ্রেণী চতুষ্টয়ের বীজপুরুষগণ কোন্ সময়ে কি ভাবে বঙ্গে আগমন করিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস তিনি নিশ্চয়ই অধ্যয়ন করেন নাই, নচেৎ আদিশূরের সভায় বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় বীজপুরুষগণের যে পরিচয় হইয়াছিল, তাহার প্রায় ৪ শত বৎসর পরে বল্লালী কুলবন্ধনকে সমসাময়িক সূত্রে সংযুক্ত করিয়া ধীরেন্দ্র বাবু একটী অদ্ভুত মীমাংসায় উপনীত হইবেন কেন? ঔপনিবেশিক কায়স্থদিগের ইতিহাস কুলাচার্য্যগণের লিখিত ভিন্ন ভিন্ন কুলপঞ্জিকায় বিবৃত হইয়াছে। কায়স্থ বীজপুরুষগণের অনুক্রম নামা ১ম আদিশূরের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজন্যক কর্তৃক বৈদিকাচার প্রবর্ত্তন ও যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে গৌড় বঙ্গে আনীত হন। তৎপূর্ব্বে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের শ্রীগৌড় শাখার আদিম মৌলিক কায়স্থগণ বঙ্গে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। ধীরেন্দ্র বাবু যদি এই সমস্ত ইতিহাস মনোনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেন, তবে তিনি জানিতে পারিতেন যে, তাঁহার মন্তব্যটী সমগ্র বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের ঘোর অপবাদ ঘোষণা করিতেছে। অবশ্য আমি এ কথা বলি না যে, তিনি জ্ঞাতসারে এই অপবাদ (Libel) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন মানসে আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটীর অবতারণা করিতে বাধ্য হইলাম।

কায়স্থ একটী যুগান্তরীয় অভিশপ্ত জাতি। পৌরাণিক যুগে এই জাতির, অন্ততঃ "চিত্রগুপ্ত বংশ্যানাং ব্রাহ্মণত্বমাপদন্তে" ভবিষ্য পুরাণে আমরা পাঠ করিয়া থাকি। কালনেমীর পরিবর্ত্তনে কায়স্থ ব্রাহ্মণত্ব হইতে শূদ্রত্বে পতিত হইয়াছেন। আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি। এই যুগে, মহাজাগরণের যুগে, আমরা কি একবার উঠিবার চেষ্টাও করিব না? আমাদিগের জাতীয় ধর্ম্ম ও অধিকার পুনঃগ্রহণ করিতে একবার চেষ্টাও করিব না? যদি উচ্চ জাতির উচ্চ আদর্শ (ideals) হয়, তবে প্রকৃতির ক্রমবিকাশানুসারে নীচস্তরের জাতিব্যূহ উর্দ্ধে উঠিতে না পারিলে অবনতির দিকেই প্রধাবিত হয়। হয় উন্নতি, না হয় অবনতি, এই সংসারের নিয়ম। কিছুই স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাবে থাকে না। সেই নিয়মানুসারে বঙ্গের সমস্ত জাতি আজ বহুকাল সংস্কারাভাবে শূদ্রত্বের দিকেই ধাবিত হইতেছে। শূদ্রত্ব শব্দের অর্থ যাহাই হউক না কেন, আচার্য্যগণ অধমত্ব শব্দের পরিবর্ত্তে উহা সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভগবান্ মনুর নিম্নলিখিত শাসন বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, হলায়ুধ তদীয় ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে লিখিয়াছেন—

যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥
২ অঃ ১৬৮।

ইতি বদতা মনুনা বেদোহধ্যেতর্ব্য ইত্যনেন বেদার্থ জ্ঞান পরাঙ্মুখ ব্রাহ্মণস্য শূদ্রত্বমেব প্রতিপাদিতম্॥

অর্থাৎ যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্রান্তর অধ্যয়ন করেন, তিনি জীবদ্দশাতেই সবংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। মনুর এই শাসনানুসারে ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন করিতেই হইবে, অতএব বেদার্থ জ্ঞানবিহীন ব্রাহ্মণদিগের শূদ্রত্ব প্রমাণিত হইল। এই হিসাবে বঙ্গের ৸৶১৫ আনা ব্রাহ্মণই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের রাজা, তাঁহার হস্তে শাস্ত্র, তিনি উহাতে যথেপ্সিত পরিবর্ত্তন উৎক্ষিপ্ত এবং প্রক্ষিপ্তাদি করিতেছেন। কায়স্থ রাজা প্রতাপাদিত্যের তিরোভাবে ব্রাহ্মণ ভবানন্দ নবদ্বীপের সিংহাসন অধিকার করিলেন। সময় পাইয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শিরোমণি তার স্বরে ঘোষণা করিলেন—

"যুগেহন্যে দ্বৈজাতি ব্রাহ্মণঃশূদ্র এবচ।"

অর্থাৎ নিকৃষ্ট কলিযুগে ২টী মাত্র জাতি আছে, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, বঙ্গে ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য জাতি নাই। এখন ধীরেন্দ্র বাবু দেখিবেন, কলমের জোরে কায়স্থ শূদ্র হইল, না কায়স্থ শূদ্রত্ব ঘুচাইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব স্থাপন করিল, ইহার কোন্‌টী সত্য। যেমন রাজনৈতিক বিভাগে কলমের জোর লর্ড মরলী ও মিণ্টোর হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ হিন্দুদিগের সামাজিক ক্ষেত্রে কলম ত ব্রাহ্মণের হাতেই রহিয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে সাত হাজার কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিল, ইহা কি কলমের জোরে না গুণ বিভাগে? বঙ্গে ব্রাহ্মণ দ্বিজাচারী, আমি জিজ্ঞাসা করি, কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ হইতে কোন্ বিষয়ে হীন বা অবনত যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় দ্বিজত্ব অধিকার করিতে পারিবেন না? আজ যদি গুণ কর্ম্ম অধিকারে ভারতে দ্বিজত্ব বিতরিত হয়, তবে আমার বোধ হয়, ব্রাহ্মণ ও অসিজীবী ক্ষত্রিয়ের সহিত কায়স্থের দাবি অগ্রণী হয়। প্রজ্ঞাদিত্য হইতে উৎপলাপীড় পর্য্যন্ত বার জন কায়স্থ নৃপতি ২৬১ বৎসর পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী মহাপরাক্রান্ত গোনন্দ বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা বালাদিত্য তাঁহার একমাত্র কন্যা অনঙ্গলেখাকে অশ্বঘোষ বংশীয় কায়স্থ দুর্লভ বর্দ্ধনের সহিত বিবাহ দেন। কেন না দুর্লভ বর্দ্ধন সকল বিষয়ে বালাদিত্যের সমকক্ষ ছিলেন—

'হেতুং স্বরূপতামাত্রং কৃত্বা জামাতরং নৃপঃ।
অথাশ্বঘোষ কায়স্থকুক্রে দুর্লভ বর্দ্ধনম্॥
প্রজ্ঞয়া দ্যোতমানতং প্রজ্ঞাদিত্য ইতি প্রথান্।
রাজতরঙ্গিণী।

আবুল ফজেল, সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বের কায়স্থ সমাজের যে চিত্র তাঁহার 'আইনি আকবরি' গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা জানিতে পারি—

"The Zemmindars are mostly Kayasthas, their troops number 23330 cavalry, 801159 infantry, 1170 elephants and 4260 boats" (Col. Jarrets Ani-in-akbari, Asiatic Societys' Edition, Vol II, page 129).

অর্থাৎ—তাৎকালিক ভূম্যধিকারীরা প্রায় সকলেই কায়স্থ। তাঁহাদিগের সৈন্য সংখ্যা ২৩৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১১৫৯ পদাতিক, ১১৭০টী হস্তী, এবং ৪২৬০ নৌকা। যাঁহাদিগের ৮ লক্ষ সৈন্য ছিল, সেই জাতির দুর্দ্দশা আজ এতাদৃশ কেন? যে মসীজীবী জাতি গৌড়বঙ্গে প্রধান অসিজীবীর আসন গ্রহণ করিয়াছিল * তাহার শক্তি লোপের প্রধান কারণ, ধর্ম্মের গ্লানি, ভ্রষ্টাচার, হেতু

* আইনি-আকবরিতে লিখিত আছে যে, কায়স্থ ভোজ বংশজাত ৯ জন, নৃপতি ৫২০ বৎসর বঙ্গদেশে রাজত্ব করিবার পর অম্বষ্ঠ কুলজাত কায়স্থ জয়ন্তপুর, যাঁহাকে আদিশূর বলিত, তদ্বংশীয় ১১ জন নৃপতি ৭১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর পাল বংশীয় ভূপাল রাজা হইতে দশ জন নৃপতি ৬৯৮ বৎসর রাজত্ব করেন। পাল বংশীয় নৃপতিগণের অবর্কাশে কায়স্থ ওকাসন হইতে সেনবংশীয় ৭ জন নৃপতি ১০৬ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে মোট ২০২৮ বৎসর বঙ্গদেশে, কায়স্থ রাজাদিগের শাসনাধীন ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ দ্বাদশ ভৌমিকের (১২ভূঁইয়ারা) শাসনাধীন ছিল, তন্মধ্যে প্রতাপাদিত্য-প্রমুখ ৬ জন কায়স্থ রাজা ছিলেন।

একতার অভাব, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, পরশ্রীকাতরতা ও বিদ্বেষ বুদ্ধি। কায়স্থ ভারতে প্রায় অর্দ্ধ কোটী,যিনি সামান্ত ভাবে কায়স্থ জাতির বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনি দেখিবেন, বঙ্গীয় দশলক্ষ কায়স্থ ব্যতীত আর চল্লিশ লক্ষ কায়স্থ দ্বিজাচারী। যজ্ঞোপবীত গ্রহণ না করিলে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী দায়াদগণ সহ আমরা মিশ্রিত হইতে পারিতেছি না। আমরা এক পিতার সন্তান হইয়াও আর কত কাল ধর্ম্মভেদে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া রহিব? আমাদের মিলনের দিন প্রত্যাসন্ন। যজ্ঞোপবীত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ না করিলে আমাদের মিলন অসম্ভব। বঙ্গীয় শ্রেণী চতুষ্টয়ের মধ্যে সমীকরণের একমাত্র উপায় যজ্ঞোপবীত গ্রহণ। যিনি চক্ষুষ্মান্ হইয়াও অন্ধ থাকিতে ভালবাসেন, তাঁহাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? ভারতীয় সূর্য্য বংশীয় মসীজীবী কায়স্থ ক্ষত্রিয় বঙ্গে আসিয়া শূদ্রাচারী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বধর্ম্মের সহিত জাতীয় সমস্ত গৌরব অন্তর্হিত হইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ প্রকার জাতীয় অধঃপতন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন—

"বরং স্বধর্ম্মোবিগুণঃ ন পারক্য স্বনুষ্ঠিতঃ।
পর ধর্ম্মেণ জীবনহি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥

অর্থাৎ—অন্য বর্ণের ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও অঙ্গহীন স্ববর্ণোচিত ধর্ম্ম পালন করিবে, কেননা পরবর্ণের ধর্ম্মানুষ্ঠানে সল্পকাল মধ্যেই জাতি-পাত অবশ্যম্ভাবী। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোহবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

অর্থাৎ—স্ববর্ণোচিত ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত পরবর্ণের ধর্ম্ম হইতে শ্রেয়। নিজবর্ণ ধর্ম্ম পালনে মৃত্যুও বাঞ্ছনীয়, কেননা পর ধর্ম্ম ভয়ানক। এই সকল আপ্ত বাক্য আর্য্যগণ চরম সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপ্ত অর্থে ভ্রম প্রমাদাদি পরিশূন্য পুরুষ, যাঁহারা অপূর্ব্ব ধীশক্তি বলে চরম সত্যগুলি অবলোকন করিতেন। পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে জাতি বিশেষের কত দূর অনিষ্ট হয়, তাহা বঙ্গীয় কায়স্থ জাতিতে বিদ্যমান। কায়স্থ ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ উৎপাতে যজ্ঞসূত্রাদি ত্যাগ করিয়া কি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিলেন, তাহা ধ্রুবানন্দ মিশ্র তদীয় বঙ্গজ কুলপঞ্জিকায় এইরূপে চিত্রিত করিয়াছেন :—

গৃহীত্বাধ্যাত্মকং জ্ঞানং কায়স্থাবিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষার্থে কায়স্থগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ যজ্ঞসূত্র ও গায়ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ রাজার অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ও ব্রাহ্মণ সমাজের মান রক্ষার্থে অতি মন্দক্ষণে কায়স্থ বীজ পুরুষগণ ক্রমে ক্রমে যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। আজ সময় পাইয়া অনুকূল রাজ্য শাসনে যখন কায়স্থগণ তাঁহাদিগের লুপ্ত গৌরব ও জাতীয় চিহ্ন উদ্ধার করিতেছেন, তখন সেই ব্রাহ্মণ সমাজ, যাঁহাদিগের মঙ্গলার্থে উহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কায়স্থের প্রতি খড়্গহস্ত! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে!!

এইক্ষণে, ৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে আদিশূর রাজার সভায়, বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় বীজ পুরুষগণ, পঞ্চ ব্রাহ্মণের যে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার একটী চিত্র পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিতেছি। এতৎ সম্বন্ধে ধীরেন্দ্র বাবুর উক্তি—"যাহারা এক দিন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া দাস আখ্যা গ্রহণ করতঃ শূদ্রত্ব বরণ করিতেছিলেন, কেবল বরণ করিয়াছিলেন, এমত নহে, কিন্তু লজ্জাশূন্য হইয়া সেই দাসত্বকেই কৌলীন্য রূপ স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি বানাইয়াছিলেন, তাঁহারা এখন অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইলে চলিবে কেন? বরং যিনি প্রকৃত ক্ষত্র তেজ দেখাইয়া মনুষ্যত্ব রক্ষায় রাখিয়াছিলেন—দত্ত ভৃত্য নহে সঙ্গে এসেছে—তাহাকে ত সমাজে হীন করিয়া রাখা হইয়াছে; যাহা কর্ম্ম দোষে গিয়াছে, তাহা গুণকর্ম্ম বলে লাভ করিতে হইবে।"

ইংরেজ কবি পোপ বলিয়াছেন—Little learning is a dangerous thing. অর্থাৎ অল্প বিদ্যা প্রলয়ঙ্করী। ধীরেন্দ্র বাবু পৃথক্ পৃথক্ তিনটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছেন, ১ম স্বেচ্ছায় দাসাখ্যা গ্রহণ, ২য় শূদ্রত্ব

গ্রহণ, তৃতীয় দাসত্ব রূপ সোপান দ্বারা কৌলীন্য রূপ স্বর্গে আরোহণ। তাঁহার ধারণা এই যে, কায়স্থ বীজপুরুষগণ দাসাখ্যা গ্রহণ করতঃ শূদ্রত্ব বরণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ উভয় ঘটনা সমসাময়িক ও কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে সমাবদ্ধ এবং কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইবার জন্যই দাসাখ্যা গ্রহণ ও শূদ্রত্ব বরণ করিয়াছিলেন। যিনি সামান্য ভাবে কায়স্থেতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, এই সমস্ত বিবরণ ধীরেন্দ্র বাবুর কল্পনা প্রসূত। এবং ইহার সহিত সত্য ঘটনার কোন সংশ্রব নাই। দাসাখ্যা গ্রহণ, ২য় আদিশূর (বিজয় সেনের) সময় হয়; কায়স্থ বীজ পুরুষগণ, কি তাঁহাদিগের বংশধরগণ কেহই কোন কালে শূদ্রত্ব গ্রহণ করেন নাই। যিনি এই প্রকার কায়স্থ সমাজের অপবাদ ঘোষণা করিতে পারেন, তাঁহার বিরুদ্ধে আইনতঃ লাইবেলের অভিযোগ হইতে পারে। যাঁহারা দাসত্ব কি শূদ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, বল্লালের কুলবন্ধনে কৌলীন্য মর্য্যাদার অতিদূরে তাঁহাদিগকে রাখা হইয়াছিল। ফলতঃ বল্লালের কুলবন্ধন গুণ কর্ম্ম বিভাগে সম্পাদিত হইয়াছিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার।

মহাপ্রয়াণ।

১

যে জন কাঁদিয়া গেল এই মর্ত্ত্যবাসে,
আপনার কেহ যার কাঁদিবার নাই,
আজি তার জন্মশোধ অন্তশয্যা পাশে,
নীরবে দাঁড়ায়ে তুমি কে পথিক ভাই ?

২

সুধাই তোমারে ভদ্র, আজি নিরালায়,
সেকি গো একেলা হেথা বিজন কান্তারে ?
ভবিষ্য সর্গের এই পূত ভূমিকায়,
নাই কি গো কেহ কোথা সম্ভাষে তাহারে ?

৩

এই পুণ্য জাহ্নবীর করুণ কল্লোল,
কুসুম-নিশ্বাস-বাহী আকুল সমীর,
কলকণ্ঠ বিনিস্থত বিষাদ-হিল্লোল,
যামিনীর জ্যোৎস্না-সিক্ত শিশিরাশ্রুনীর,

৪

হরিৎ বিটপি-লক্ষ্মী স্নিগ্ধ পুষ্পাসার,
মাধবী-মাধুরী-ভরা শ্যামলা ধরণী,—
এরা যে করিছে সবে অন্ত্যেষ্টি সৎকার !
মরণ হয়েছে তার বিশল্যকরণী !

৫

এই পূত-তীরোত্থিত যুগান্তর কত,
তপোবন-উচ্ছ্বসিত শুভ্র সামগান,
কোটী মুক্ত-আত্মা সহ হ'য়ে একত্রিত,
করেনি কি আজি এই শয্যা তীর্থস্থান ?

৬

অতীতেরা ফেলেছিল তপ্তদীর্ঘশ্বাস,
আজি কে জেগেছে সবে শীতল বীজনে !
এ নহে কি তবে তার ফুলশয্যাবাস ?
সে যে গো সুষুপ্তিকোলে রম্য জাগরণে !

৭

সংসারের প্রেম ছিল স্বার্থাধানময়,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছিল কত ব্যবধান—
মরণ-সমাধি-গর্ভে পেয়েছে বিলয়,
সকল দুঃখের আজি হয়েছে নির্ব্বাণ।

৮

অনাবিল, মুক্ত প্রেম হ'য়ে আগুয়ান,
সম্ভাষিয়া উথলিছে আজি চারিভিতে ;
অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য রাশি করিছে আহ্বান
মরতের 'নীলকণ্ঠে' প্রীতি-সিক্ত গীতে !

৯

যাও ভদ্র, গৃহে ফিরে ; বলিও সবারে—
নিবেদিয়া অশ্রু-অর্ঘ্য বিভুর চরণে,
আর্ত্ত, শ্রাদ্ধ-বিবর্জ্জিত, মৃত্যু-পর-পারে,
চলে' গেছে দিব্যধামে প্রেম-নিমন্ত্রণে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন—ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা, ব্রাহ্মসমাজের মূল প্রতিষ্ঠা)

ঈশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম যে, কোন কিছুর তীব্র প্রয়োজন পড়িলেই তাহার সৃষ্টিও হয়, বিনা প্রয়োজনে কিছুরই সৃষ্টি হয় না—অনেক সময়ে আমরা সেই প্রয়োজন উপলব্ধি নাও করিতে পারি। ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন পড়িয়াছিল,ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হইল। যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি, সে সময়ে ভারতের প্রশান্ত গগন মসীলিপ্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইতেছিল এবং সত্বরেই নানা ঝঞ্ঝাবাতের সম্ভাবনা ছিল। একদিকে প্রাচীন পন্থার ব্যক্তিগণ প্রাচীন প্রথা সকল, ভাল হউক বা মন্দ হউক, আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে দিবেন না; অপরদিকে পলাশি যুদ্ধের পর অবধি নবীন আশায় উৎফুল্ল, নূতন রাজকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত ইংরাজজাতির সংস্পর্শে আসিয়া অনেক নবীন যুবকের হৃদয় নূতন নূতন ভাবে আলোড়িত হইতেছিল, তাঁহারা বিকৃত প্রাচীন প্রথার দুর্গন্ধরাশির মধ্যে বাস করা বড়ই কষ্টকর বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা সামাজিকতার বাঁধ ভাঙ্গিতে পারেন নাই। সেই এককাল গিয়াছে,যখন বহুবিবাহ ও সতীদাহ,এই উভয়ের মধ্যে কে দেশের অধিকতর সর্ব্বনাশ সাধন করিত, তাহা বলা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। কোথায় এক কুলীন পাষণ্ড বিভিন্ন গ্রামে শতাধিক বিবাহ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, আর শতাধিক গ্রামে সতীদাহের আসুরিক আয়োজন হইল এবং শতাধিক গ্রামে সতীগণের মর্ম্মভেদী অভিশাপ তপ্ত অশ্রুজলের আকারে স্বদেশের উপরে নিপতিত হইল। অথচ বহুকাল অবধি চলিয়া আসিতেছিল বলিয়া প্রাচীনপন্থীগণ প্রাণপণে এই সকল কুপ্রথা রক্ষা করিবার যত্ন করিলেন, অপরদিকে ধর্ম্মপ্রাণ ইংরাজ-জাতির সংস্পর্শপ্রাপ্ত অনেক নবীন যুবকের হৃদয় এই নিষ্ঠুরতা দেখিয়া প্রাচীন প্রথাসমূহ ভাঙ্গিয়া ঘোরতর সামাজিক বিপ্লব আনয়নে সমুৎসুক হইয়াছিল।

এইরূপ নানা বিষয়ে তখন প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে এক তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বিপ্লব-বন্যা আসিয়া ঋষি-সেবিত এই ভারতবর্ষের কতকগুলি অনিষ্টকর প্রাচীন প্রথার সঙ্গে মঙ্গলজনক অনেক প্রাচীনতর প্রথাসমূহও ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। এই বিপ্লবের পরিবর্ত্তে প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করিয়া ভারতগগনে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক হইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলময় পরমেশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে সেই সামঞ্জস্য সাধনের উপায় করিয়া পাঠাইলেন। বাধা না পাইলে কোন প্রকার স্রোতেরই বল অনুভূত হয় না। ঈশ্বরের প্রেরিত ব্রাহ্মসমাজ যে কি ঐশরিক বল লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রতি পদে বাধা পাওয়াতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। মহাত্মা ব্যক্তিগণ বিলাসিতায় মগ্ন থাকিয়া সহসা

যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়, কঠোর তপস্যা অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহাদিগকে অলস রক্ষণশীলদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট বিদ্রূপ অত্যাচার প্রভৃতি সহ্য করিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবিচলিতচিত্তে স্বীয় কর্তব্যপথে অগ্রসর হয়েন।

প্রধানত ব্রাহ্মসমাজেরই কল্যাণে ইংরাজশাসন ও শিক্ষাবিস্তারের ফলে কোন প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া উন্নতিসাধন করিতে গেলে সেকালে যে কি ভয়ানক অত্যাচার লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা বর্তমানে কল্পনাতেও আনিতে পারি না; ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণের উপর সেকালের অত্যাচার সমূহ উপন্যাসের মত বোধ হয়। এইরূপ অত্যাচার নির্য্যাতন প্রভৃতির দূরীকরণও ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের অন্যতর প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণের নির্য্যাতন প্রাপ্তি কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তখনও ইংরাজ রাজত্ব ভারতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তখনও অনেক বিষয়ে সসঙ্কোচে চলিতেছিলেন, দেশীয়দিগের উপর অনেক সাহায্যের প্রত্যাশা রাখিতেন।* তখন চারিদিকেই কুসংস্কারের রাজত্ব; কেবল দলাদলি ও গালাগালি।

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্ব্বে
দেশের অবস্থা।

সেই সময়ে এখানকার কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা তাঁহারই এক অনুগত শিষ্য সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা নানা পুস্তকে উদ্ধৃত হইলেও এখানে উদ্ধৃত করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

"রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল; বেদের যে সকল কর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদে যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর ও রথযাত্রার গোল,এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে মনের আনন্দে কাল হরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়,পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থিরবিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটীও কথা বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের কাষ্ঠাভাব ছিল, অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতায় বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরাজদিগের অধীনে বিষয়কর্ম্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছ সংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যা পূজাঙ্গ শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে যাইবার রাতারাতি বড়লোক হয়েন না; তাঁহাদিগকে

* Human sacrifices in India by John Poynder Esq., London, J. Hatchard & son. 1827.

পূর্ব্বে সন্ধ্যাপূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন; তাহাতেই তাঁহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক পূরণ করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশাকুশী হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশবিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকারই সংবাদ প্রচার করিতেন। বিশেষত কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত দান করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিতেন এবং ধনী দাতাদিগের যশ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংসা লাভের আশ্বাসে, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র ধনীদের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্যচিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে নগরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ন্যায় শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে যাঁহার যত জ্ঞান ও অনুশীলনা থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন; কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতিদিন তিনবার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কি না সন্দেহ। বিষয়ী ধনীদের মধ্যে তো কোন প্রকারই বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গালা ভাষারও ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক, কাহারো কাহারো বর্ণশুদ্ধিজ্ঞান ছিল না। বিষয় কর্ম্মের উপযোগী পত্র লেখা ও অঙ্কষা জানা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পারশী পড়িতে ও ইংরাজী অক্ষর ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন, তাঁহারা বিদ্যার গরিমা আর মনে ধারণ করিতে পারিতেন না। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে কেবল চৈতন্যচরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রসিদ্ধ। এ সকলই পদ্যে লিখিত, গদ্যের গ্রন্থ তখন এক খানিও ছিল না। বুলবুলি ও ঘুড়ির খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বীণসেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবকদিগের আমোদ ছিল এবং তাঁহারা দোলের আবীর খেলার ন্যায় নন্দোৎসবে গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকীপ্রসূতি প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তিপূর্ব্বক খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এই ছিল যে, তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপ দেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই। তখন তাঁহারা বড় বড় পূজাতে ইংরাজদিগকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন বটে, কিন্তু আপনারা সেই আহারে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতেন না।"*

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা চতুষ্টয়।

গীতা বলিয়াছেন—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

সামঞ্জস্যই যোগ। উপরে সে কালের যেরূপ অবস্থা বর্ণিত দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয় যেন তখন আলস্য ও কপটতার রাজ্য ছিল। লোকের মনে যাহাই কেন থাক, বাহিরে

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৮৭ শক, শ্রাবণ।

ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিলেই তাহার সমস্ত অপরাধের মার্জ্জনা হইত। আশ্চর্য্য এই যে, জনসাধারণ এইরূপ কপটাতার রাজ্যে কিরূপে সন্তোষের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তবে বোধ হয় যে ভাবুক ও চিন্তাশীল লোকের একেবারে অভাব হয় নাই এবং তাঁহাদের প্রাণ, কপটতা ও আলস্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক প্রকৃত ধর্ম্মের মর্য্যাদা ঘোষণা করিবার জন্য অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের প্রাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ সকল বঙ্গদেশের আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই আন্দোলনের ফলে বিশ্রাম ও কার্য্যের, প্রাচীন প্রথা ও নবীন সংঘর্ষের এবং ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইল। ব্রাহ্মসমাজের মূল প্রতিষ্ঠাতা বীর চতুষ্টয় রাজা রামমোহন রায়, স্বনাম-প্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর, সুবিখ্যাত স্মার্ত্তচূড়ামণি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুটা তত্ত্বকথা।

(যোগ বা আত্মবিজ্ঞান)

ইদানীং চারিদিকে শ্রীমদ্ভগবদগীতা সম্বন্ধে যেমন একটা হৈ চৈ শুনিতে পাওয়া যায়, "যোগ" "যোগ" বলিয়াও তদ্রূপ হুজুকের অভাব দেখা যায় না। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কত রকম যোগের গুরু আবির্ভূত হইয়াছেন ও যোগের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা গণনা দ্বারা ঠিক করা কঠিন। কেবল যে আমরাই যোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আলোচনায় প্রবৃত্ত, এমন নহে;—ভারতের হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ত আছেনই; ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেরও বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সম্যক গবেষণা ও চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বকার কথা স্মরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সে সময়ে আমাদের মধ্যেকার "শিক্ষিত" ইংরাজীনবিশগণ গীতা পাঠ ও যোগশিক্ষা নিতান্ত মূঢ় অপদার্থ লোকের কাজ বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। পঁচিশ বৎসরের উপর হইল ব্রাহ্মসমাজের নববিধান শাখায় আচার্য্য মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত ইংরাজী ভাষায় "যোগ"* নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথমে উহা আমেরিকার লোকদিগকে উপদেশ দিবার জন্য তথাকার "New York Independent" নামক পত্রিকায় বাহির হয়; তৎপরে এদেশে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া আমাদের হস্তগত হয়। কেশব তখন স্বর্গে।

ব্রাহ্মসমাজের নিকট আমরা বহু বিষয়ে বিশেষ ঋণী; সুতরাং তথায় আমরা কিরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে দুই এক কথা এখানে বলিলে দোষের হইবে না। জীবনের শেষ ভাগে কেশবচন্দ্র তাঁহার প্রচারক শিষ্যদিগকে যোগ সম্বন্ধে ও ভক্তি বিষয়ে যে সকল মৌখিক উপদেশ প্রদান করেন, তাহা 'ব্রাহ্মগীতোপনিষৎ" নামে পুস্তকাকারে বাহির

* Yoga: Objective and Subjective.

হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে সংযম, স্থৈর্য্য সাধন, বৈরাগ্য প্রভৃতি নানাবিষয়ে অনেক উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও উক্ত ব্যাখ্যাদিতে যোগের বিজ্ঞানাংশ সম্বন্ধীয় কোন কথা পাওয়া যায় না, অর্থাৎ মানবাত্মা কি? মন কি পদার্থ? চিচ্ছক্তি কি প্রণালীতে কার্য্য করিয়া থাকে? ইত্যাদি গূঢ়তত্ত্বের মীমাংসক কোন কথা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু মোটামুটি চিত্ত স্থির করিবার ব্যবস্থা বেশ বিবৃত। ব্রাহ্মসমাজের গ্রন্থাদির মধ্যে উহা যে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই অমূল্য উপদেশাবলী প্রচারের পূর্ব্বে সাধনমার্গের কথাবার্ত্তা ব্রাহ্মসমাজে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বোধোদয়ে" পড়িয়াছিলাম "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ," "ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্ম সম্বন্ধে কেবল মাত্র ঐ কয়টী কথা উপনিষদের ব্যাখ্যার সাহায্যে ডালপালা দিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের "শিশুশিক্ষায়" উপদিষ্ট হইয়াছিলাম, "মিথ্যা কথা কহিও না" "চুরি করিও না" "কাণাকে কাণা বলিও না" ইত্যাদি। ব্রাহ্মসমাজ অবতীর্ণ হইয়া ঐ সকল নীতি বাক্যই সালঙ্কারে সুললিত ভাষায় শুনাইলেন মাত্র। চুরি করা কেন উচিত নয়? মিথ্যা বলা কেন অকর্ত্তব্য? যদি এরূপ কার্য্যসমূহ ন্যায়ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয়, তবে আবহমানকাল এই সকল পাপ সংসারে কি প্রকারে চলিয়া আসিতেছে? পাপ পুণ্যই বা কি? যদি ঈশ্বর পুণ্যময় হ'ন, তবে পাপের জন্মই বা কি প্রকারে হইল? ইত্যাদি প্রশ্নের কোনরূপ সমীচীন বৈজ্ঞানিক উত্তর ব্রাহ্মসমাজের নিকট পাওয়া যায় নাই। চিত্তের অবিকশিত অবস্থায় আদিম মানুষ ঘোর স্বার্থপরতায় বশীভূত হইয়া নানাবিধ অন্যায় অত্যাচার করিবেই; উহা তাহার ব্যক্তিত্ব * গঠনের প্রথমাবস্থায় নিতান্তই আবশ্যক। শুদ্ধত্বের প্রাক্কালে জীব সর্ব্বথা আপনার ষোল-আনা বুঝিয়া লইতে চেষ্টা ত করিবেই, তদ্ব্যতিরিক্ত পরের সম্পত্তিও যথাসম্ভব নিজের কোলে টানিয়া আনিতে সম্যক প্রয়াস পাইবে; আপনার বিষয়াদি দ্বারা সর্ব্বদা সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগে তৎপর ত থাকিবেই, উপরন্তু সুখপ্রদ যাহা কিছু যেখানে দেখিবে, তাহা যেন তেন প্রকারেণ নিজের আয়ত্তাধীনে আনিবার যত্নে ত্রুটি করিবে না। তদবস্থায় আমিত্ব গড়িবার উহা এক মাত্র উপায়। জীব এইরূপ পথে চলিতে চলিতে জন্মজন্মান্তরের প্রীতিকর অপ্রীতিকর উভয়বিধ অভিজ্ঞতাসমূহ দ্বারা নানাপ্রকার শিক্ষা লাভ করতঃ বিবর্ত্তসোপানে † ক্রমে প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। মানুষকে যে 'ক্ষুদ্রবিশ্ব' ‡ বলা হয়, তাহা শুধু কথার কথা নয়। গর্ভ মধ্যে ভ্রূণের আবির্ভাব অবধি দেহান্ত পর্য্যন্ত মানুষ যে যে অবস্থার ভিতর দিয়া গমন করে, তদ্দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাদির দশা হইতে দেবত্বের নিকট উপনীত হইবার ক্রমবিকাশ-পথটাই প্রদর্শিত হয়। সুতরাং উন্নত মানবের শিশু ও প্রৌঢ়াবস্থায় অসভ্য বর্ব্বর একই প্রকৃতি বিশিষ্ট জানিতে হইবে, মানবের আদিম, অর্ব্বাচীনতা আমাদের শৈশবে পুনঃপ্রকটিত হইয়া থাকে। § এই নিমিত্ত প্রাথমিক ¶ অবস্থাতে অনুন্নত মানুষ যেমন কেবল আপনার গণ্ডা

* Individuality.
† Ladder of evolution.
‡ Microcosm.
§ Repetition of the process of evolution.
¶ Primitive.

ব্যতীত আর কিছু বুঝে না, এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য যথাশক্তি উপায় অবলম্বনে পরাঙ্মুখ হয় না. আধুনিক সভ্যতার মধ্যে লালিত শিশুকেও তদ্রূপই করিতে দেখা যায়। তার পর পাপ পুণ্য সম্বন্ধীয় গুরুতর প্রশ্নের কথা। শুভাশুভ, উত্তমাধম, সদসৎ, উচিতানুচিত প্রভৃতি বাক্য দ্বারা যাহা যাহা বুঝায়, সে সকল কি আপেক্ষিক নহে ?* ঐ সকল কি সংসারে বাস্তবিক চিরনির্দ্দিষ্ট ?† অবস্থাভেদে কি একের উপাধি অপরের প্রতি প্রযুক্ত হয় না ? যাহা কোন ব্যক্তির পক্ষে এক সময়ে উচিত, উহাই আবার তাহারই পক্ষে অন্য সময়ে অনুচিত ; একজনের পক্ষে যাহা ভাল, অপরের পক্ষে তাহা মন্দ † ; এরূপ বলিলে কি দোষের হয় ? প্রকৃত প্রস্তাবে জগতে নির্ভেজ মন্দ বলিয়া কিছুই নাই, যাহা আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে আপাততঃ ঐরূপ বলিয়া বোধ হয়, তাহা বিকাশোন্মুখ ভাল বৈ আর কিছু নয়।§ শীত উষ্ণ, দিবা রজনী, আলোক অন্ধকার, সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন পদার্থগুলি লইয়াই জগতের ব্যক্তাবস্থা ; এই দ্বন্দ্ব ভাবই সৃষ্টির ভিত্তি ; এবম্বিধ অনুকূল প্রতিকূলের জোড়া জোড়া না থাকিলে বিশ্বের অস্তিত্ব থাকিত না ; দেবাসুরের সংগ্রাম অর্থাৎ বিপক্ষ বা প্রতিকূলের বাধা ভিন্ন সংসারের বিকাশ বা উন্নতি অসম্ভব। ‡ এই শ্রেণীর গূঢ়তত্ত্ব বিষয়ক কথাবার্ত্তা ব্রাহ্মসমাজে কখন শুনা যায় নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, কর্ম্মশাস্ত্র ও জন্মজন্মান্তরবাদ তথায় আদৌ গ্রাহ্য হইত না। চতুর্ব্বর্গ কিছুই নয়, মানুষের কল্পনামাত্র ; সমস্ত জীব প্রথম এইবার সংসারে আসিয়াছে ; খামখেয়ালী ঘটনাচক্রে জীবের জন্ম এবং উন্নতি অবনতি এবম্প্রকার মত পোষণ করিলে মানব জীবনের বিজ্ঞানাংশের দিকে মোটেই দৃষ্টি পতিত হয় না। পৃথিবীর নিরাকার জীব সমূহের মধ্যে ভয়ানক বৈষম্য দেখিয়াও যাঁহারা জন্মজন্মান্তরের পথে মানুষের ক্রমবিকাশ মানিতে চাহেন না, তাঁহাদিগকে বিশ্বরহস্য বুঝাইবার কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

কেশবচন্দ্র প্রণীত উল্লিখিত যোগের পুস্তকখানি প্রকাশ হইবামাত্র আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করি, কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ কথাবার্ত্তা পাই নাই, কারণ তখন যোগ শব্দে মোটামুটি যাহা বুঝিতাম, তাহার মত কিছু ঐ গ্রন্থে দেখি নাই। কেশবের মতে যোগের অর্থ পুনর্মিলন,—সৃষ্ট জীবাত্মা স্রষ্টা পরমাত্মা হইতে পৃথক ও দূরস্থ হইয়া ইহ সংসারে পাপময় জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে, সেই জন্য পুনর্মিলন আবশ্যক—পুনর্মিলন অপেক্ষা কিছু বেশী মধুরভাবে যুক্ত হওয়া আবশ্যক। * এই মত প্রকাশ করিয়া

* Relative.

† "Two things" says the memorable Kant, deepest and most logical of metaphysical thinkers. "Two things strike me dumb: the infinite Starry Heaven and the sense of Right and Wrong in man." Visible Infinities, both ; say nothing of them, don't try to account for them, for you can say nothing wise ·—Thomas Carlyle.

† What we speak of as evil in one place may be not evil in another ; for evolution implies this changing character, and what is good at one stage may be evil at another.—Annie Besant.

§ Evil is good in evolution ; what we call evil is often only a veil of evil and beneath it a future good.—Ibid.

‡ For the development of all positive qualities it is necessary that they should be exercised against opposition. Without opposition no development is possible ; without opposition no growth is possible. All growth and development result from the exercise of energy against something which opposes.—Ibid.

* The created soul, in its worldly and

গ্রন্থকার বলিতেছেন, উহাকে আধ্যাত্মিক একীকরণ বলিতে হয়;—দুইয়ের সম্বিৎ একেতে, একত্বে দ্বৈতাবস্থা। * অতঃপর একথাও দেখিতে পাওয়া যায়:—দার্শনিক ও চিন্তাশীল হিন্দুর মতে উহাই সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ, অন্য প্রকার মুক্তির জন্য তিনি লালায়িত নন; বিচ্ছেদ, বিয়োগ, দূরতা, ভেদ জ্ঞান, দ্বৈতভাব, অহঙ্কার তাঁহার পক্ষে সর্ব্ববিধ পাপ ও দুঃখের মূলীভূত কারণ; তদ্ধেতু ঈশ্বরের সহিত সজ্ঞানাবস্থায় যুক্ত বা একীভূত হওয়া তাঁহার একমাত্র প্রার্থনীয় স্বর্গ। † স্রষ্টার সহিত সৃষ্ট পদার্থের যোগকে পুনর্মিলন বলা যায় কিরূপে?

এখন দেখা যাউক "সৃষ্ট জীবাত্মার" কথা হিন্দু শাস্ত্রের অনুমোদিত কি না, আমাদের দার্শনিক বুধগণ কোথাও এবম্বিধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন কিনা। আর্য্য ঋষিদের দ্বারা প্রচারিত গ্রন্থাদিতে এমন কথা পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না যে, জীবাত্মা পূর্ব্বে আদৌ ছিল না, পরমাত্মা কর্ত্তৃক কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৃষ্ট হয়। বিশ্ব বা জড়চৈতন্যময় এই জগৎ সম্বন্ধে "সৃষ্টি" শব্দ যে কোন প্রাচীন পণ্ডিত ব্যবহার করিয়াছেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ; অবশ্য এখানে সৃষ্টি অর্থে বুঝিতে হইবে—সম্যক অভাবের ভিতর হইতে সত্তার সৃজন। ‡ গীতাবাক্য এরূপ কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ করে:—

"না সতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" যাহা কখন ছিল না, তাহা কখন হয় না; যাহা বিদ্যমান, তাহার কখন অভাব হয় না।

বিশ্বের প্রকাশ ‡ সম্বন্ধেও শ্রুতিতে উক্ত

" * * * * যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।"

অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় এবারও জগৎ কল্পিত বা রচিত হইল।

অনাদিকাল হইতে এই সংসার-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, অনন্তকাল এইরূপে চলিবে; ইহার আরম্ভ বা শেষ কল্পনাতেও ভাবা যায় না। লীলার সময় হরি লীলা ব্যতীত থাকিবেন কি প্রকারে? তিনি নিজে যেমন অনাদ্যনন্ত, তাঁহার লীলাকেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। সুদূর ভূতে, যখন কোথাও কিছু ছিল না, হঠাৎ তিনি একদিন সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিলেন, আবার কোন সুদূর ভবিষ্যতে পাঁজিপুঁথি গুটাইয়া সৃষ্টি লোপ করতঃ চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিবেন, ইহা সুস্থ মস্তিষ্কে কিছুতেই আনা যায় না। তবে কল্পান্তে প্রলয়, পুনরায় যথাসময়ে নূতন কল্পের আরম্ভ, এই ভাবে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে ও চিরকাল চলিবে।

এক কল্পের অবসানে প্রলয়াবস্থা, কিছুকাল পরে আর এক কল্পের পত্তন, ইহা কিরূপ

---

sinful condition, lives separate and estranged from the Supreme Soul. A reconciliation is needed, nay, more than mere reconciliation. A harmonious union is sought and realized."

* It is spiritual unification; it is a consciousness of two in one; duality in unity.

† To the philosophical and thoughtful Hindu, this is the highest heaven. He pants for no other salvation he seeks no other *mukti* or deliverance. Separation, disunion, estrangement, a sense of distinction, duality, the pride of ego, this is to him the root of all sin and suffering and the only *heaven* he aspires to is conscious union and oneness with Deity. বোধ হয় ইংরাজী ভাষায় শব্দের অভাব জন্য লেখক এস্থলে heaven কথাটী ব্যবহার করিয়াছেন, heaven এখানে স্বর্গ নয়, কারণ স্বর্গ ত ক্ষয়িষ্ণু ব্যাপার "ক্ষীণে পুণ্যে" আবার সেখান হইতে মর্ত্ত্যলোকে নামিতে হয়।

† ইংরাজীতে যাহাকে out of nothing (Ex-nihilo) বলে।

‡ Manifestation.

ব্যাপার, তাহা একটা সাধারণ স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। মফঃস্বল-জেলার কাছারীর কাণ্ডটা একটু অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে কতকটা ভাব পাওয়া যাইতে পারে। নগরের বাহিরে লোকালয় হইতে দূরে একটা বিশাল প্রান্তর মধ্যে কতকগুলি বড় বড় অট্টালিকা। প্রাতঃকালে দেখিলে বোধ হয় যেন সম্পন্ন ব্যক্তিগণের আবাস ছিল, অল্প দিন হইল তাঁহারা স্থান ত্যাগ করিয়াছেন, তাই পরিত্যক্ত জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে দুই এক জন করিয়া লোক জমিতে লাগিল। শেষে দিবা দুই প্রহরের পূর্ব্বেই ইন্দ্রজালের ন্যায় একটা বিরাট ব্যাপারের বিচিত্র অভিনয়। হর্ম্ম্যগুলির নানা প্রকোষ্ঠে জমকাল এজ্‌লাসে শ্বেত-কৃষ্ণ-ধূসর বিবিধবর্ণের হাকিম পুঙ্গবেরা ধর্ম্মাবতারের আসনে সমাসীন, কখন সবাক্, নির্ব্বাক্, কখন কখন তুষ্ট, কখন রুষ্ট; তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান উকীল মোক্তার ধুরন্ধরেরা আপনাপন পক্ষসমর্থনার্থ বহুপ্রকার অঙ্গভঙ্গি সহকারে বাক্‌যুদ্ধ দ্বারা বিচারকের জ্ঞান হরণ কার্য্যে প্রাণ ঢালিয়া দিতেছেন; বাহিরে সুসজ্জিত পেয়াদাগণ পঞ্চস্বরে অর্থী, প্রত্যর্থী, সাক্ষী প্রভৃতিকে আহ্বান করিতেছে; মাঠে গাছতলায় কত রকম আহারীয় এবং অন্যবিধ দ্রব্য সামগ্রীর হাটবাজার বসিয়া গিয়াছে; যে সকল বাদী প্রতিবাদীর মোকদ্দমা আরম্ভ হয় নাই, তাহারা হয় ওকালতখানায় উকীল বাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছে, না হয় বৃক্ষতলে বসিয়া মোক্তার মহাশয়দের সাহায্যে সাক্ষী তালিম করিতেছে; দালালেরা কাক চিলের মত মক্কেলদের পশ্চাতে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে; বহুজনের কোলাহলে চতুর্দ্দিক মুখরিত, যেদিকে তাকাও, একটা জমজমাট কারখানা। এই মহাতীর্থের যাহারা যাত্রী, যাহাদের জন্য এই বিশাল আয়োজন, একমাত্র যাহাদের রুধিরে এই ভোজবাজীর সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত, যাহাদের দ্বারা মঠধারীবর্গ তাঁহাদের সহচর অনুচরগণ পাণ্ডাসমূহ প্রভৃতি সকলের উদর পূর্ত্তি হইতেছে, তাঁহাদের কাহারও পৌষ মাস আসিতেছে, কাহারও সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, কেহ জাল-ফেরেব্ দ্বারা মোকদ্দমা জিতিয়া হঠাৎ বিপুল ধনের অধিকারী হইলেন, কেহ ঘোর অবিচারে ন্যায্য দাবী হারিয়া পথের কাঙ্গাল হইলেন; এক জনের আনন্দের সীমা নাই, দুই হাতে বক্‌শিশ্ বিতরণ করিতে করিতে সহাস্যবদনে বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া যানারোহণে গৃহে ফিরিতেছেন; অপর ব্যক্তি একাকী মলিনমুখে হেঁটমুণ্ডে পদব্রজে, মৃদুমন্দগতিতে শ্মশান-ফেরতের ন্যায় হায় হায়! করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থানোদ্যত। ক্রমে দিবাবসানের সঙ্গে আপনাপন দৈনিক কার্য্য কতক শেষ করিয়া কতক বাকী রাখিয়া হাকিম আম্‌লা ব্যবহারাজীব, মক্কেল, ক্রেতা, বিক্রেতা প্রভৃতি যাঁহারা কায়মনোবাক্যে এতক্ষণ এখানকার ব্যাপারে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন, সবাই তিরোহিত হইয়া অন্যত্র সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত; অথচ আদালতের সূত্র তাঁহাদিগকে অলক্ষিত ভাবে বাঁধিয়া রাখিতে ছাড়ে নাই, যথাকালে আবার সেখানে লইয়া গিয়া নাচাইবে। এদিকে নিশাগমে কাছারি-প্রান্তর কর্ত্তৃক পুনরায় উজাড় মূর্ত্তি পরিগৃহীত;—গৃহাদি রুদ্ধ, কোথাও একটী মানুষ নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই, বাহিরে যেমন অন্ধকার, ঘরগুলির ভিতরে ততোধিক। যেন বাজীকর তাঁহার শক্তি সংহার করতঃ স্থানান্তরে গমন করায় সমস্ত কারখানা অন্তর্হিত, কেবল ঠাট মাত্র

পুড়িয়া রহিয়াছে, আর কথন যেন এ স্থানে ওরূপ ভেল্কি দেখা যাইবে না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, গৃহাবলীর অভ্যন্তরে যে সকল অচেতন কাগজপত্র সযত্নে রক্ষিত, তাহাতে এমন এক অনিবার্য্য মায়াশক্তি সঞ্চারিত,যাহা পরদিন ঠিক ঐরূপ অভিনয়ের জন্য সব লোককে টানিয়া আনিবে, যথা সময়ে পুনরায় যে যা'র তান্‌তোব্‌ড়া লইয়া সাগ্রহে অবিকল পূর্ব্ব দিনের ন্যায় কাছারিতে হাজির হইয়া নানামূর্ত্তিতে নানাভঙ্গিতে নানাপ্রকার রঙ্গ দেখাইতে ত্রুটি করিবে না। এই লোক-সমাগম ও নৃত্যকুর্দ্দনের আবির্ভাব তিরোভাব যেমন প্রত্যহ নূতন সৃষ্টি নহে, পূর্ব্বদিনের কর্ম্মসূত্র দ্বারা পরদিন রঙ্গভূমিতে পুনরাকৃষ্ট হইয়া সকলে প্রাচীন প্রথায় অভিনয় কার্য্য আবার সম্পাদন করিতেছে মাত্র, ঠিক তদ্রূপ এক কল্পের পর প্রলয়ান্তে আর এক কল্প অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; কারণ কর্ম্ম অনাদ্যনন্ত, কর্ম্মসূত্রের কোথাও আরম্ভ নাই, কোথাও শেষ নাই, কর্ম্মের বিধিব্যবস্থা ঈশ্বরত্বের অভিব্যক্তি মাত্র। বিধাতা ও তাঁহার বিধানে কোনই পার্থক্য লক্ষিত হয় না, সুতরাং ঈশ্বর যেমন অসীম, কর্ম্মেরও তেমনি অগ্রপশ্চাতে সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। এই নিমিত্তই বৌদ্ধ দর্শনে ঈশ্বরের কথা উল্লেখ না করিয়া কেবল "স্কন্ধ" বা কর্ম্মেরই মাহাত্ম্য বর্ণিত * হইয়াছে; এবং তৎসঙ্গে বিশ্বের "মঙ্গলময় বিধান" পূজ্য বলিয়া প্রচারিত। আমাদের শাস্ত্রাদিতেও অনেক স্থানে "ফলপ্রদ কর্ম্মঃ ফলপ্রদোজঃ ?" প্রশ্নের উত্তরে জীব বা ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে কর্ম্মকেই ফলদাতা বলা হইয়াছে। কোন দার্শনিক সম্প্রদায় কর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতঃ অবশেষে "কর্ম্মেভ্যো নমঃ" বলিয়া কর্ম্মকে বারম্বার নমস্কার করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মপ্রধান কেশবচন্দ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তৎসঙ্গে জীবাত্মার সৃজনও তাঁহাকে মানিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের মতে—

"না ছিল এসব কিছু,
"আঁধার ছিল অতি
"ঘোর দিগন্ত প্রসারি।
"ইচ্ছা হইল তব,
"ভানু বিরাজিল
"জয়! জয়! মহিমা তোমারি।
"গ্রহ চন্দ্র পরে,
"জ্যোতি তোমার হে,
"আদি জ্যোতি কল্যাণ!"

এই প্রকারে পরিদৃশ্যমান জগতের আরম্ভ, তৎপূর্ব্বে কথন কিছু ছিল না। এই মত খ্রীষ্টানী মতের ছায়া মাত্র! ইংরাজী সুতরাং খ্রীষ্টানী শিক্ষা হইতে যখন ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি, খ্রীষ্টানী গির্জায় হুবহু নকল যখন ব্রাহ্ম-ভজনালয়, তখন কতকটা খ্রীষ্টানী মত বিশ্বাস যে ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? পরন্তু এবম্প্রকার মতে আস্থা স্থাপন করিবার পূর্ব্বে যদি একটু ভাবিয়া দেখা যায় যে, এবারকার এই বিশ্বের আরম্ভ যদি প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহার পূর্ব্বে অনাদিকাল পর্য্যন্ত দিগন্তব্যাপী প্রগাঢ় অন্ধকার ব্যতীত কখন কোথাও কিছু ছিল না, যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে অনাদ্যনন্ত সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের সম্পূর্ণত্বাতে বিলক্ষণ দোষ স্পর্শে। কল্পনাতীত সুদীর্ঘকাল চুপ্‌ করিয়া বসিয়াছিলেন, হঠাৎ এক দিন জগৎ সৃজনের ইচ্ছা হইল; তৎপূর্ব্বে

* Good Law.

জ্ঞানই ছিল না যে তাঁহার সৃষ্টিশক্তি আছে, কারণ সেরূপ জ্ঞানের উদয় হইবামাত্র সৃষ্টির ইচ্ছা আসিবেই। এবারকার লাপ্লাকে প্রথম সৃষ্টি বলিলে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া উপায় নাই, সুতরাং বিশ্বেশ্বরকে আমাদের মত অসম্পূর্ণ করিয়া ফেলিতে হয়, কারণ ইচ্ছা অভাবেই পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব; ইহা নাই, ইহা করিতে হইবে বা পাইতে হইবে, মনের এই অবস্থাকেই ইচ্ছা বলে; ইচ্ছার উদয় যেথানে অভাব অসম্পূর্ণতা, সেখানে অবশ্য বিদ্যমান ইহা মানিতেই হইবে।

পূর্ব্বে কোথাও কিছু ছিল না, দিগন্তব্যাপী রিক্ত অন্ধকার রাশির ভিতর হইতে হঠাৎ এই জগৎ সৃষ্ট হইল, এ কথা যেমন সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, তেমনি শূন্য হইতে কোন প্রকার উপাদান বিনা, ঈশ্বর একটা গোটা জীবাত্মা সৃজন করতঃ পূর্ব্বগঠিত মানবদেহে প্রবিষ্ট করিলেন, এই মতকেই বা সমীচীন বলি কি প্রকারে? যেরূপ ক্রমবিকাশের * প্রণালীতে উদ্ভিদাদি চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণান্তর বর্ত্তমান মানবদেহ পাওয়া গিয়াছে, সেইরূপে আমরা যাহাকে সাধারণতঃ জীবাত্মা বলিয়া থাকি, অর্থাৎ সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলভোগী ভিতরকার মানুষ †—যে ব্যক্তি জন্মজন্মান্তরের চক্রে ঘুরিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে—তাহাও এক প্রকার সংজ্ঞাহীন অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে বিকাশ প্রাপ্ত, জানিতে হইবে। বন্য বা তৎপূর্ব্বভাব হইতে যুগযুগান্তরের কর্ম্মফলে এতদূর আসিয়া পঁহুছিয়াছে; কিন্তু এখনও বিস্তর পথ বাকী, যে হেতুক ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি ভিন্ন তাহার মুক্তি নাই। সেই জরাব্যাধিমরণসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম, দুরন্ত পথে ছুটাছুটি যাহাতে শীঘ্র সমাধা হয়, তাহারই প্রকৃষ্ট উপায়ের নাম যোগ। আমরা ত এইরূপ বুঝি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কোথাও জীবাত্মা পরমাত্মায় প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না, একমাত্র আত্মা শব্দই প্রায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত। সেই আত্মা কেমন?

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃস্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।" —নিত্য স্থিরস্বভাব, অচল ও অনাদি। এই আত্মা পরব্রহ্ম* হইতে চরাচরের সমস্ত পদার্থে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান, অণু পরমাণু বা তদপেক্ষা সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতর অবস্থায় যাহা কিছু স্বতন্ত্র ভাবে তিষ্ঠিতে পারে, তাহাতে যে প্রকারে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতেও ঠিক সেইরূপে বিরাজিত। প্রস্তরে দেখিয়া প্রস্তরাত্মা, উদ্ভিদে উদ্ভিদাত্মা, নিকৃষ্ট জীবে নিকৃষ্ট জীবাত্মা, উৎকৃষ্ট জীবে উৎকৃষ্ট জীবাত্মা, দেবতায় দেবাত্মা, ব্রহ্মে ব্রহ্মাত্মা, পরব্রহ্মে পরমাত্মা, ইত্যাদি নাম দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আসলে জিনিস এক। এবম্বিধ আত্মা, যাহা দ্বারা সকল পদার্থের সঙ্গে আমরাও অনুপ্রাণিত, তাঁহাকে সম্যক উপলব্ধি করতঃ সৎসহ একত্ব সম্পাদন যোগের চরম ফল। ইহা কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না, জানি না।

পঞ্চকোষের শেষ কোষে যে 'আমি,' সেই

* Evolution.

§ Inner man or permanent ego.

* ইহার সম্বন্ধে যোগমার্গে অগ্রসর কোন মহাত্মা প্রকাশ করিয়াছেন:—

It is an eternal principle known only through its effects. No words can describe it, for words imply discrimination, and this is All. We murmur, Absolute, Infinite, Unconditioned—but the words mean naught * * Space is the only conception that can even faintly mirror it without preposterous distortion, but silence least offends in these regions where the wings of thought beat faintly, and lips can only falter, not pronounce."

"তৎসৎ" বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত।

আমিই প্রকৃত আমি; অন্যান্য কোষস্থ ছোট বড় আমি গুলি সবাই নশ্বর, সুতরাং আমি নামের যোগ্য নহে। এই সত্যের শুধু বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি হইলে চলিবে না, প্রকৃতরূপে উঁহাকে প্রাণগত করা চাই। এই সুকঠিন ব্যাপার যোগ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে সম্ভবে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

যোগ।

এইতো জীবন! হায়, এইতো চরম পরিণতি!
দু'দণ্ডের দীপ্তি শুধু! ক্ষণপরে জীবনের জ্যোতি
সহসা ডুবিয়া যায় ঘন অন্ধকারে! তার পর,
পঞ্চভূতে লীন হয় এই দর্পী দেহ, বিনশ্বর!
তবে, আর কেন ওগো, কেন এই দীপ্ত কোলাহল?
কেন তবে এত হিংসা, এই দ্বেষ-দ্বন্দ্ব,—এ সকল
জীবনের অনর্থ বিক্ষেপ? কেন সবে শুধু হায়,
আনন্দে সম্পূর্ণ রহি', নিরন্তর নাহি হাসে গায়;
—ভালবাসে পরস্পরে অনিবার? আত্ম-পর ভুলি
কেন নাহি স্নেহ প্রেমে করে নিত্য শুদ্ধ কোলাকুলি?
অমৃত-পাথারে সদা কেন নাহি হিয়া মজি'রয়?
কেন নাহি করে প্রাণ অনন্তের মাঝারে বিলয়?
বিশ্বময় প্রকৃতির উচ্ছ্বসিছে আকুল আহ্বান;
আপনা বিস্মরি' তাহে চল মন কর যোগদান!

শ্রীদেবকুমার রায়

দেশ ভ্রমণ ও তীর্থ পরিদর্শন।

মান্দ্রাজের পথে।

ইষ্ট-কোষ্ট-রেলপথ খুলিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা হইতে মান্দ্রাজ যাইতে হইলে হয় সমুদ্র পথে, অথবা রেলপথে প্রায় অর্দ্ধভারত প্রদক্ষিণ করিয়া মনমার ও রাইচুর হইয়া যাইতে হইত, আমি দুইবার মান্দ্রাজ যাই, প্রথম বার, তখনও ইষ্টকোষ্ট রেলপথ খোলে নাই, আমি অন্যান্য কংগ্রেস-যাত্রিগণের সঙ্গে কলিকাতা হইতে সমুদ্রপথে মান্দ্রাজ রওয়ানা হই। বাঙ্গালী, তাহাতে বাঙ্গালার একটী নিভৃত ক্ষুদ্র পল্লীবাসী, আমার মনে সমুদ্রযাত্রার নামে ভয় হইবার কথা বটে; কিন্তু অনেকে এক সঙ্গে থাকায় অথবা যে কারণেই হউক, ভয়ের পরিবর্ত্তে এক অনির্ব্বচনীয় উৎসাহ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। কলিকাতা হইতে সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় তীর এতই দৃশ্যবৈচিত্র্য পরিপূর্ণ যে, দেখিতে দেখিতে মন আত্মহারা হইয়া পড়ে। যতই সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইতেছিলাম, ততই গঙ্গাবক্ষের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ও আনন্দে প্রসারিত হইতেছিল। গঙ্গা ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের অপূর্ব্ব দৃশ্য শ্বেত-সলিলা গঙ্গার সহিত নীলাম্বু-স্বামীর সঙ্গমের ক্রমবিকাশ ও তদুপরি সেই সময় অস্তগামী সূর্য্যের লোহিত কিরণ সম্পাত ও সম্মুখে সমাগত সান্ধ্যছায়া, ধূসর সাগর দ্বীপের বেলাভূমি ও তন্মধ্যস্থ হরিৎঘন বনভূমির অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলীর বর্ণনা আমার সাধ্যাতীত। উহা মানব বর্ণিত ভাষার বহু উচ্চে অবস্থিত। সমুদ্রের দৃশ্য মহত্ত্বাব-ব্যঞ্জক। সেই সীমাশূন্য অনন্ত প্রসারণ, উর্দ্ধে খণ্ড খণ্ড মেঘমালা-শোভিত নীলাম্বর, নিম্নে তরঙ্গোচ্ছাসপূর্ণ শ্বেত ফেণপুঞ্জ-বিক্ষিপ্ত নীলাম্বুরাশি, চারিদিকে দৃষ্টিরেখার শেষ সীমা পর্য্যন্ত নীলাম্বুচুম্বিত নীল নভোমণ্ডল। এদৃশ্যে মন এক অপূর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ হয়, আর এই অনন্তের সৃষ্টিকর্ত্তা মহান্ জগদী-

শ্বরের সত্তা হৃদয়ে অনুভূত হয়। স্থলপথে ভ্রমণে যেরূপ দৃশ্যবৈচিত্র্যে মন আকর্ষিত হয়, সমুদ্রে সেপ্রকার বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। কেবল চারিদিকে সীমাশূন্য অনন্ত জলরাশি শুধু এক অবিশ্রান্ত মহান্ জলকল্লোল নিয়ত দর্শন ও শ্রবণ পথে পতিত হয়। প্রথম প্রথম দুই একদিন সমুদ্রের এই মহান্ দৃশ্যে মন বড়ই আকর্ষিত হয় বটে,কিন্তু পরে আর ভাল লাগে না। জাহাজে যদি অন্যপ্রকারে আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত না থাকিত, তাহা হইলে দীর্ঘকাল জলপথ ভ্রমণ অত্যন্ত কষ্টকর হইত। আমরা চারিদিন মাত্র সমুদ্রমধ্যে তিলাম,গান, বাজনা, খেলা প্রভৃতি নানাপ্রকার আমোদে দিন কর্ত্তন করিয়াছি; সমুদ্রে একপ্রকার সামুদ্রিক পীড়া হয়, তাহাতে সর্ব্বদা গা বমি বমি করে,মাথা ঘোরে,খাইতে ভাল লাগে না। আমাদের সহযাত্রিগণের অনেকে এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, আমার কোন অসুখ উপলব্ধি হয় নাই। বরং দোলায়মান জাহাজের আন্দোলনে আমার বড়ই আরাম বোধ হইত। সমুদ্রের আর একটী প্রধান দৃশ্য সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত। সেই উদয় ও অস্তকালীন তপনের তপ্তকাঞ্চনাভ লোহিত রাগের যে অপূর্ব্ব আলোকচ্ছটা সুনীল নভোমণ্ডল ও জলরাশির উপর বিকীরণ করে, তাহার অনির্ব্বচনীয় সুষমা বর্ণনাতীত। সে বারে আমরা কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া চারিদিনে মান্দ্রাজে উপস্থিত হই। দ্বিতীয় বার আমরা ইষ্ট-কোষ্ট রেলওয়ে মাদ্রাজ যাই। কলিকাতা হইতে সন্ধ্যার পর মান্দ্রাজ মেল ছাড়ে, তৎপর দিবস সমস্ত দিবারাত্রি রাস্তায় থাকিতে হয়,তৃতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে মান্দ্রাজ পৌছে। কোথাও না নামিয়া বরাবর যাইতে গেলে,যাহাদের কেলনারের হোটেলে থাইতে আপত্তি নাই,তাহাদের কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু আমাদের মত কুসংস্কারাপন্ন পল্লীবাসীর পক্ষে বড়ই কষ্টকর। মান্দ্রাজের দাক্ষিণ ভারত-রেল পথের বড় বড় ষ্টেসনে যে প্রকার হিন্দুদের জন্য ভোজনাগার প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছি, দুঃখের বিষয়, ইষ্ট-কোষ্ট রেল পথে সে প্রকার বন্দোবস্ত পাই নাই। এজন্য আমরা মধ্যে ভুবনেশ্বরে অবতরণ করি। কলিকাতা হইতে সে সময় রাত্রে রওয়ানা হইলে পর দিবস প্রত্যূষে ভুবনেশ্বর পৌছা যায়। আমরা এক দিবস ভুবনেশ্বরে থাকিয়া তৎপর দিবস প্রত্যূষে মান্দ্রাজ অভিমুখ রহনা হইলাম। উড়িষ্যার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিমালার সন্নিবেশ থাকায় দৃশ্য বৈচিত্র্যের অভাব নাই। আমরা ক্রমে ক্রমে চিল্কা হ্রদের সমীপবর্ত্তী হইলাম।

চিল্কা।

চিল্কা হ্রদ উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের গঞ্জাম জেলার মধ্যবর্ত্তী, ইহা দৈর্ঘ্যে পঞ্চাশ মাইল, প্রস্থে গড়ে বিশ মাইল। মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপগুলি এক একটী দেশীয় রাজার রাজ্য। অনেক রাজা আমাদের দেশে একটী ক্ষুদ্র জমীদারের চেয়েও ছোট; তথাপি তাহারা অর্দ্ধ স্বাধীন বা করদ রাজা। এই হ্রদটী একসময় সমুদ্রের অংশ বিশেষ ছিল, পরে সম্মুখে চড়া পড়িয়া হ্রদে পরিণত হইয়াছে। জল কৃষ্ণাভ ঘোর লবণাক্ত। রেল লাইন বরাবর হ্রদের ধার দিয়া গিয়াছে। চলন্ত রেলগাড়ী হইতে হ্রদের দৃশ্য পরম রমণীয় দেখায়। ঈষৎ বাত্যান্দোলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালা-শোভিত বিস্তীর্ণ কৃষ্ণ জলরাশি ঠিক যেন উড্ডায়মান বিহঙ্গকুল-সমাকুল নীল নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে। ইহার ধারে রম্ভা একটী প্রধান ষ্টেশন। সেই স্থানে হ্রদের দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। রেলের একধারে পর্ব্বতমালা, অপর ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচমালা-শোভিত প্রশস্ত জলরাশি। এখানে হ্রদের জল পর্ব্বতের ছায়া সম্পাতে আরও কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে। হ্রদের উপরে অসংখ্য জলচর পক্ষী রেলের শব্দে উড্ডীয়মান হইয়া বিচিত্র কলরবে স্থানটী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। হ্রদের ঘাটে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোট বাঁধা আছে দেখিলাম; যাহারা চিল্কা ভ্রমণে আনন্দ উপভোগ করিতে চান, তাহাদের এইখানে নামা উচিত। অনেকে এইস্থানে আসিয়া হ্রদে ভ্রমণ ও পক্ষী শিকার করিয়া থাকেন।

আমরা দেখিতে দেখিতে চিল্কার সহিত

উড়িষ্যার শেষ সীমা ছাড়াইয়া গঞ্জাম জেলায় প্রবেশ করিলাম। গঞ্জাম জেলার লোক- ও বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য করিলে উড়িয়া হইতে মান্দ্রাজীর ক্রমপরিবর্ত্তনের লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে থাকে। এখানকার অধিবাসীগণ অর্দ্ধেক উড়িয়া, অর্দ্ধেক মান্দ্রাজী। বেরহামপুর গঞ্জামের বর্ত্তমান সদর স্থান। বেলা ১২ টার সময় গাড়ী ঐ স্থানে পৌঁছিল। আমরা ভুবনেশ্বর হইতে রওয়ানা হইয়া এক রসগোল্লা ব্যতীত আর কোথাও বাঙ্গালীর খাবার উপযুক্ত কিছুই পাই নাই। মনে করিয়াছিলাম, বেরহামপুরে অবশ্য লুচি তরকারি পাওয়া যাইবে। কিন্তু খাবার মধ্যে ও বরফি মাত্র দেখিলাম। আমাদের সহযাত্রিগণ মধ্যে অনেক বাঙ্গালী ইউরোপীয় ভোজনাগারে প্রবেশ করিতে লজ্জাবোধ করিলেন না, কিন্তু আমরা অনন্যোপায় হইয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন কদলী সংযোগে ভোজন করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবারণে বাধ্য হইলাম। ইহার পরে গঞ্জাম ষ্টেশনে মেল ধরে। তথায়,সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ গোকুলপিষ্টকের ন্যায় ক্ষীরের পিষ্টক বিক্রয় হইতে দেখিলাম। তাহার স্বাদও আমাদের সেই রসনা-তৃপ্তিকর চিরপরিচিত পিষ্টকের ন্যায়। লেখা বাহুল্য, সেটুকু কসুর ছিল. তাহা ইহাতেই পূর্ণ করা গেল।

একদিকে পূর্ব্বঘাটের গিরিমালা, অপর দিকে সমুদ্র, ইহার মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া রেলপথ ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। স্থানে স্থানে দৃশ্য-বৈচিত্র্যের অভাব নাই,কোথাও শস্য-শ্যামল সমতলক্ষেত্র, কোথাও তরঙ্গায়িত গৈরিক প্রান্তর। কোথাও অনতি-উচ্চ পর্ব্বতমালা, কোথাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শস্যক্ষেত্র-পরিবেষ্টিত মৃন্ময় প্রাচীরাভ্যন্তরে তৃণাচ্ছাদিত কুটীর বিশিষ্ট কৃষকপল্লী। ক্বচিৎ তরুচ্ছায়া অন্তরালে উচ্চ সৌধ-শির পরিদৃশ্যমানা সমৃদ্ধিশালী নগরী, রঙ্গালয়ের দৃশ্য পরিবর্ত্তনের ন্যায় যুগপৎ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। আমরা রাত্রি ৮ টার সময় ওয়ালটায়ারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ওয়ালটায়ার বেঙ্গল নাগপুর রেলের টার্মিনাস্ ষ্টেশন। এস্থান হইতে মান্দ্রাজ ইষ্ট-কোষ্ট-রেলওয়ে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের ওয়ালটায়ারে নামিয়া বিশ্রাম করিবার কথা ছিল। কিন্তু গাড়ী আসিতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় ও বিজিগাপত্তন না গেলে বাঙ্গালী হিন্দুর উপযুক্ত বাসস্থান পাওয়া কঠিন শুনিয়া, এ সময়ে ওয়াল্টায়ার দর্শন বাসনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। আশ্চর্যের বিষয়, এখানেও লুচি তরকারি পাওয়া গেল না। পর দিবস ব্যাপাটিনা ষ্টেশনে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলাম,বেশ রৌদ্র উটিয়াছে, আজ আর আমরা পাহাড়ের রাজ্যে নাই, রেলের উভয় পার্শ্বে অবলোকনে বোধ হইতেছে যেন আমরা বাঙ্গলা দেশেই চলিয়াছি। সেই চিরপরিচিত ধান্য ক্ষেত্র, কোথাও হরিদ্রা, অড়হর বা ইক্ষু ক্ষেত্র, সর্ব্বত্রই কৃষিপূর্ণ সমতল-ভূমি। আমরা রাত্রেই গোদাবরী ও কৃষ্ণা পার হইয়া আসিয়াছি। দেখিতে দেখিতে বেজওয়াডা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এখানে সাহেবেরা খানা খাইয়া থাকেন। কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দুর জন্য সেই মিষ্ট আর কদলী ভিন্ন আর কিছুই নাই। এখানে নারিকেল অতি সস্তা। মাথা ছাড়ান জলপূর্ণ কচি নারিকেল এক পয়সায় একটী বা দুইটী ষ্টেশনে বিক্রয় হইতে দেখিলাম। আমার সঙ্গে চিঁড়া ছিল, আজ নারিকেলউদকে চিঁড়া ভিজাইয়া,কচি নারিকেল, কদলী ও মিষ্ট সংযোগে ঐ চিঁড়া ফলাহারে পরিতৃপ্ত হওয়া গেল। বাটী হইতে চিঁড়া আনিবার সময় আমার একজন সঙ্গী কিছু বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনিও ঐ চিঁড়ার সঙ্গে বিদ্রূপ পর্য্যন্ত পরিপাক করিয়া লইলেন! আমরা ক্রমেই সমুদ্রের অতি নিকট দিয়া চলিতেছি। সমুদ্র উপকূলস্থিত তাল তমাল নারিকেল বৃক্ষের ব্যবচ্ছেদে সুনীল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের ঝলক দর্শনে আমরা সেই অমর কবি কালিদাসের—

> "দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী
> তমালতালী বনরাজী নীলা।
> আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশি,
> র্ধারা-নিবদ্ধেব কলঙ্ক রেখা॥"

অপূর্ব্ব বর্ণনার সার্থকতা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

আমাদের মধ্যে অনেকেই সমুদ্র কখন দেখেন নাই। আমাদের বড় বাবু প্রথম সমুদ্র দর্শনে আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভক্তিভরে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আমরা দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমুদ্রের তীরে বিচ্ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

মান্দ্রাজ।

মান্দ্রাজ, মান্দ্রাজ বিভাগের রাজধানী। ইংরেজেরা ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগিরির রাজা শ্রীরঙ্গ রায়ের নিকট এই স্থান ক্রয় করিয়া প্রথমে কুঠী স্থাপন করেন। এবং ১৭৫৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত এইস্থান ইংরাজদের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র থাকে। তখন বাঙ্গালা, বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানের কুঠী সকল মান্দ্রাজের অধীন ছিল। বঙ্গবিজয়ের পর হইতে কলিকাতা তাৎকালীন ইংরেজাধিকৃত সমস্ত ভারতের রাজধানী হয়।

মান্দ্রাজ কলিকাতার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী বা সুদৃশ্য সৌধমালা-পূর্ণ নহে। অথবা কলিকাতার চৌরঙ্গীর ন্যায় সুন্দর স্থানও মান্দ্রাজে বিরল। কিন্তু সমুদ্রের ধারে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে অবস্থিত বলিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্যে ইহা কলিকাতা অপেক্ষা অনেক গুণে সৌন্দর্য্য-গৌরবে গৌরবান্বিত। মান্দ্রাজও কলিকাতার ন্যায় দুই অংশে বিভক্ত। যে অংশে দেশীয় লোকের বাস, তাহাকে ব্ল্যাক্ টাউন বলে। ব্ল্যাক টাউন ঘন বসতিপূর্ণ ও উহার রাস্তা গুলিও কলিকাতার উত্তরাংশের ন্যায় অল্প পরিসর-বিশিষ্ট। ইংরেজ কোয়াটার কলিকাতার চৌরঙ্গীর মতন সুন্দর ও শোভা-সম্পন্ন নহে।

মান্দ্রাজের দ্রষ্টব্য স্থান গুলির মধ্যে পোতাধিষ্ঠান, দুর্গ, হাইকোর্ট, জেনারাল পোষ্টাফিস, অবজারভেটারি, লাইট হাউজ, সেণ্ট্রাল ষ্টেশন, পিপল্‌স্ পার্ক, মিউজিয়ম ও মিউনিসিপ্যাল মার্কেট প্রধান।

১। মান্দ্রাজের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি তাহার পোতাধিষ্ঠান। বোম্বাইয়ের ন্যায় মান্দ্রাজ স্বভাবজাত বন্দর নহে। বোম্বাই একটী দ্বীপ, তাহার পার্শ্বে আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই সকল দ্বীপ ও ভারতের মূলভূমির (mainland) মধ্যে গভীর সমুদ্র থাকায় অবলীলাক্রমে জাহাজ নোঙ্গর করিয়া থাকিতে পারে ও মুক্ত সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে বা প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে বিশেষ ক্ষতি জন্মাইতে পারে না। কিন্তু মান্দ্রাজের সম্মুখে তেমন কোন দ্বীপ নাই, ও জলও অগভীর, এই জন্য তীর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে জাহাজের নোঙ্গর করিতে হইত। মুক্ত সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের হাত হইতে রক্ষা পাইবার অন্য উপায় ছিল না। আমি যে বার সমুদ্র-পথে মান্দ্রাজ যাই, তখন এই পোতাধিষ্ঠানের বাঁধ-নির্ম্মাণ শেষ হয় নাই। আমাদের জাহাজ তীর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে নোঙ্গর করিল। তথা হইতে বোটে তীরে নামিতে হইয়াছিল। জাহাজ হইতে একটী সিঁড়ি নামাইয়া দিলে আমরা সেই সিঁড়ির সাহায্যে বোটে অবতরণ করিলাম। সেই সময় সমুদ্র অতি স্থির ছিল, তথাপি বোট খানি ঢেউয়ের সঙ্গে এক একবার ১০।১২ হাত নীচে নামিতে উঠিতে লাগিল। এই প্রকার নৃত্যশীল বোটের উপর সিঁড়ি হইতে আমাদের মত দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক বাঙ্গালীর পক্ষে নামা যে কতদূর সুখকর, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এখন আর জাহাজ হইতে অবতরণ করার সে অসুবিধা নাই। এক মাইল সমুদ্র ব্যাপিয়া, সমুদ্রের মধ্যে পোতাধিষ্ঠানের জন্য অপূর্ব্ব শিল্পকৌশলে বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এইক্ষণ সেই বাঁধের মধ্যে নিরাপদে জাহাজ আসিয়া নোঙ্গর করিয়া থাকিতে পারে। এবং আরোহীগণও নির্ব্বিঘ্নে জাহাজ হইতে বাঁধের উপরে নামিতে পারে। আমরা এবারে সেই বাঁধের উপরে বেড়াইয়া আসিলাম, বাঁধের উপর হইতে একদিকে অনন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের অপূর্ব্ব শোভায় ও অন্য দিকে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি সৌধমালা শোভিত নগরের দৃশ্যে মন এক অননুভূত আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। আমরা সেই বাঁধের উপর হইতে উন্মুক্ত সমুদ্রের প্রবল বাত্যাতাড়িত বিরাট তরঙ্গোচ্ছ্বাস, ও বাঁধের মধ্যস্থিত ধীর সমুদ্রের মৃদুমন্দ বাত্যান্দোলিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

বীচিমালা, এক দিকে মহোর্ম্মির বিশাল বিরাট তাণ্ডব আস্ফালন, ও অন্য দিকে পিঞ্জরাবদ্ধা সাগর-বালার ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার নয়নাভিরাম আন্দোলন, এই রৌদ্র ও মধুরের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে দেখিতে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। চন্দ্রালোকে সন্ধ্যার পর এই স্থানে আসিলে চন্দ্রালোক-প্রতিফলিত নীল সমুদ্রের মনোহারী দৃশ্যে আরও অধিকতর বিমোহিত হইতে হয়। কিন্তু নবাগতের পক্ষে সন্ধ্যার পর সেখানে একাকী যাওয়া নিরাপদ নহে। এখানে প্রলোভনের দালাল নূতন লোক দেখিলে ঠিক চিনিয়া ধরিবে ও নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। সেই প্রলোভনের মোহে আকৃষ্ট হইলে পরিশেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতে হয়।

২। অবজারভেটরি ও লাইট হাউস্—দেখিবার উপযুক্ত, আমরা অবজারভেটরির সর্ব্বোচ্চ তলে উঠিয়া একদিকে নিম্নের চিত্রবৎ নগরী এবং অপর দিকে মহান সমুদ্রের অপরূপ দৃশ্যে মোহিত হইয়াছিলাম। লাইট হাউজের পরিবর্ত্তনশীল(Revolving)আলো সমুদ্রের মধ্যে ২০ মাইল দূর হইতে দেখা যায়।

৩। ফোর্ট-সেণ্ট্‌জর্জ্জ,—ভারতবর্ষে ইংরাজ-নির্ম্মিত প্রথম দুর্গ। ইহা সমুদ্রের উপর এরূপ ভাবে অবস্থিত যে, ইহার এক দিকের ভিত্তিমূল সমুদ্র-তরঙ্গে প্রতিহত হইতেছে, দুর্গের সুদৃঢ়তার সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছু নাই। তবে ইহা কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম অপেক্ষা অনেক ছোট বলিয়া বোধ হইল এবং টিপু সুলতানের কয়েকটী কামান ব্যতীত আর দেখিবার নূতন কিছু নাই।

৪। হাইকোর্ট, পোষ্ট আফিস, সমস্তই সমুদ্রের ধারে অবস্থিত ও দেখিতে সুন্দর কিন্তু ইহার একটীও তুলনায় কলিকাতার, সমকক্ষ হইতে পারে না।

৫। কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের ন্যায় এখানে পিপলস্ পার্ক অবস্থিত। এখানে নানা দেশের নানা প্রকার বৃক্ষ লতাদি আছে। ইহা কলিকাতার ইডেন গার্ডেনের ন্যায় সুন্দর ও অপেক্ষাকৃত বড় বলিয়া বোধ হইল।

৬। মিউজিয়ম ও লাইব্রেরী সহরের মধ্যে অবস্থিত। মিউজিয়মটী ছোট হইলেও দেখিবার উপযুক্ত, এখানে নানাবিধ প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র ও প্রাচীন শিল্প কলা দেখিলাম। নানাবিধ জীবজন্তুর শারীরিক তত্ত্ব শিখিবার আদর্শ (comparative anatomical model) ও বিবিধ খনিজ ও বৃক্ষজ সংগ্রহ রক্ষিত আছে। মিউজিয়মের পার্শ্বে লাইব্রেরী অবস্থিত। এখানে পাঠকগণ বিনামূল্যে বসিয়া পড়িতে পারেন।

৭। মান্দ্রাজ নূতন সহর বলিয়া এখানে প্রাচীন হিন্দু কীর্ত্তি তেমন নাই। নূতন কীর্ত্তির মধ্যে ত্রিলিকোণে পার্থ সারথির মন্দির ও মাইলাপুরে ঈশ্বর স্বামীর মন্দির সর্ব্ব প্রধান। উভয় মন্দিরই প্রায় এক রকমের, উভয়ের সম্মুখেই পুষ্করিণী আছে। প্রথমোক্তটী বিষ্ণু মন্দির ও শেষোক্তটী শিবের মন্দির।

৮। এখানে একটী কৃষি বিদ্যালয় ও মডেল ফার্ম্ম আছে; আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বড়দিনের ছুটীতে বন্ধ থাকায় দেখিতে পারি নাই।

৯। মান্দ্রাজের ছয় মাইল দূরে আধিয়ার নামক স্থানে থিয়সপিকাল সোসাইটীর প্রধান আড্ডা। আধিয়ার নামক একটী নদীর উপর অবস্থিত। নদীর সেতুপার হইয়া সম্মুখের একটী প্রকাণ্ড উদ্যানে মধ্যস্থিত গুপ্ত অট্টালিকা থিয়সপিকাল সোসাইটীর প্রধান কার্য্যালয়। এস্থানে কর্ণেল অলকট সাহেব বাস করিতেন। এই স্থানের লাইব্রেরীতে বিস্তর সংস্কৃত ও পালি ভাষার হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ আছে।

উত্তর ভারত ও বাঙ্গালা দেশ বহুকাল অবধি মুসলমানের অধীন থাকায় অপর খাঁটি প্রাচীন আর্য্যভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে গত ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজয়নগরের রাজবংশের পতনের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মুসলমান সেরকম প্রবেশাধিকার পায় নাই এবং বিজয়নগরের পতনের পর বিজাপুর, আমেদনগর প্রভৃতি ৫টী মুসলমান

রাজ্য স্থাপিত হইলেও সেই সকল রাজ্যে হিন্দু-প্রাধান্য লোপ হইয়াছিল না। পরন্তু প্রায় ১০০বৎসরের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রবল হইয়া উঠায় পুনরায় হিন্দু-প্রাধান্য জাগ্রত হইয়া উঠে। এই জন্য দাক্ষিণাত্যে এপর্য্যন্ত প্রাচীন আর্য্য আচার পদ্ধতি যাবনিক মিশ্রণে বিশেষ রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে পারে নাই।

মান্দ্রাজে মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এমন অনেক স্থান আছে, যেস্থানে আদৌ মুসলমানের বাস নাই। মান্দ্রাজে হিন্দুরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, আর্য্য Ayar ও নার্য্য Nayar। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন কালে উত্তর ভারত হইতে যে সকল আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পন্ন করেন, তাহাদের সন্ততিগণ আর্য্য নামে এবং তদ্দেশ-বাসী আদিম অধিবাসীগণ নার্য্য নামে পরিচিত ছিল। পরে কালক্রমে অনেক শঙ্কর জাতি নার্য্য নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে ও বিশুদ্ধ আদিম অধিবাসীগণ আমাদের দেশের কোল ভীল সাঁওতালের ন্যায় পেরিয়া প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মান্দ্রাজে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাবে শৈব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। আযাগণের অধিকাংশ শৈব। কিন্তু শেঠী (আর্য্যবৈশ্য) ও নার্য্য (নায়ার)গণের অধিকাংশ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। প্রত্যেক বড় বড় নগরে শিবের ও বিষ্ণুর মন্দির দেখা যায়। তবে শৈব মন্দিরের সংখ্যাই বেশী। মান্দ্রাজের শৈবগণ শাক্ত ও লিঙ্গায়ৎ প্রভৃতি নানাশ্রেণীতে ও বৈষ্ণবগণ রামানুজ মাধ্ব প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। আমাদের বাঙ্গালা দেশেও শাক্ত বৈষ্ণবের শ্রেণীভেদ আছে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে আহার বিবাহাদির বাধা নাই; মান্দ্রাজে শৈব ও বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহ দূরে থাকুক, কেহ কাহারও অন্ন গ্রহণ করিতে পারে না। আমাদের দেশে রাঢ়ি বারেন্দ্রের মধ্যে বিবাহ হয় না বটে, কিন্তু পরস্পরের হাতে খাওয়ার বাধা নাই। মান্দ্রাজে কোন সম্প্রদায়ের হাতে অপর সম্প্রদায় খাইতে প্রস্তুত নহে।

মান্দ্রাজ হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রীজাতির অবরোধ প্রচলিত নাই। সেখানে সধবা ও কুমারীগণ মস্তকে অবগুণ্ঠন দেয় না। কেবল মাত্র বিধবারা অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের বিধবারা অধিকন্তু কেশ পর্য্যন্ত মুণ্ডন করে। আমাদের দেশের সধবারা যেমন হাতে লৌহ শাঁখা ও কপালে সিন্দুর ধারণ করে, সেখানে সধবার লক্ষণ স্বরূপ গলায় তালিবন্ধন ও পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে রৌপ্য বা পিত্তল নির্ম্মিত কড়া ধারণ ও কপালে কুঙ্কুমের টীপ পরিয়া থাকে। গলায় তালিবন্ধনে সধবা ও কুমারীর প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। বিবাহের সময় স্বামী কর্ত্তৃক অবস্থা বিশেষে স্বর্ণ রৌপ্য বা পিত্তল নির্ম্মিত হরতনের টেক্কার আকারে একখানা কবচ, স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত চেইন অথবা সূত্রদ্বারা গলদেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাকে তালী বলিয়া থাকে। উহাই সধবার চিহ্ন। বিধবা হইলে ঐ তালী ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হয়। এখানে বালিকা বিবাহের প্রচলন নাই। বাগ্দান ক্রিয়া অল্প বয়সেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু অনেক সময় ঋতুমতী না হইলে বিবাহ হয় না। সম্প্রদায় বিশেষে বালিকাবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও, যে পর্য্যন্ত বালিকা ঋতুমতী না হয়, সে পর্য্যন্ত সে ভর্ত্তৃগৃহে যাইতে পারে না। গর্ভধারণ সংস্কার বালিকার পিতৃগৃহে সম্পন্ন হইলে স্বামী স্ত্রীকে স্বীয় গৃহে লইতে পারেন। এই ব্যবস্থা অতি সুন্দর। বাঙ্গলাদেশে এই প্রথা প্রচলিত হইলে আর বাঙ্গালী বালিকাগণের অপরিপক্ব অবস্থায় গর্ভধারণ করিয়া অল্পবয়সে বৃদ্ধা সাজিতে হয় না। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, আজকাল শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশ হইতেও বালিকা বিবাহ উঠিয়া যাইতেছে। এদেশে স্ত্রীলোকদিগের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। রাস্তাঘাটে, দোকানে বাজারে, রাজপথে বা দেবমন্দিরে সর্ব্বত্রই ভদ্রসিমন্তিনীগণ নির্ব্বিবাদে নিঃশঙ্কোচে যাতায়াত করিয়া থাকেন। সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে সদর ও অন্দর বলিয়া দুইটী মহল থাকে না। প্রত্যেক গৃহে গৃহস্বামীগণই সর্ব্বে সর্ব্বা। পুরুষগণ জীবনোপায় আহরণে নিযুক্ত, তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত কার্য্য গৃহললনাগণকে সম্পন্ন

করিতে হয়। কোন গৃহদ্বারে গেলে দেখিতে পাইবে যে, দ্বারের সম্মুখে লেপন ও তদুপরি আলিপনা দিয়া সযত্নে কয়েকটী পুষ্প ও ধান্য রক্ষিত হইয়াছে। প্রতিদিন গৃহে মঙ্গলের শুভাগমন জন্য প্রত্যেক গৃহদ্বারে এই মাঙ্গলিক সজ্জা অত্যাবশ্যক মনে করে। মান্দ্রাজী স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, বিশেষ ধনবানের গৃহ ব্যতীত দাসদাসীর ব্যবহার নাই। ব্রাহ্মণ গৃহে দাসদাসীর কার্য্য বেশী থাকে না, কারণ তাহারা অন্য কোন জাতির স্পৃশ্য কোন দ্রব্য ব্যবহার করে না। এমন কি, ধোপা বাড়ীর কাপড় পর্য্যন্ত জলে না ধুইয়া ছুঁইতে নাই। নাপিত স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। এইজন্য ব্রাহ্মণ কন্যাগণের, গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্য, এমন কি, তৈজস পত্রাদি ও পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত নিজেদের পরিষ্কার করিতে হয়। ইহা ছাড়া রন্ধনাদি সমাপন, ও পরিবারের সমস্ত লোকের পরিবেশন, ললনাগণের নিত্য অবশ্যকর্ত্তব্য। আবার প্রত্যেক কুলকামিনীর, কি বালিকা, কি যুবতী, কি প্রৌঢ়া, প্রতিদিন সায়াহ্নে বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া গ্রামে বা নগরে দেবমন্দিরে দেবদর্শনে যাওয়া নিত্যপ্রতিপাল্য ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এদেশে অবরোধ প্রথা প্রচলিত নাই। প্রাচীন আর্য্য-রমণীগণ যে প্রকার স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন, এখনও এখানে সে প্রকার স্ত্রী স্বাধীনতা বর্ত্তমান আছে। আর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় মহম্মদীয় প্রথা আমাদের সনাতন আর্য্য-প্রথাকে দূরীভূত করিতে পারে নাই। এইজন্য এদেশে হাটে, ঘাটে, বাজারে, দেবমন্দিরে ভদ্রকুলকামিনীগণ, পুরুষ অভিভাবক ব্যতীত, নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে কুলকামিনীগণ তীর্থ স্থানে বা দেবমন্দিরে অনেকটা স্বাধীনতা উপভোগ করে, কিন্তু সেই স্বাধীনতার মধ্যেও শৈশবাভ্যস্ত অবরোধজনিত সঙ্কোচ ও কুণ্ঠার ভাব স্পষ্ট বিদ্যমান দেখা যায়। এই উভয় দেশে রমণীগণের চাল চলন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে বঙ্গ রমণীর স্নিগ্ধ মাধুরী পূর্ণ রমণীয় কান্তি—আর মদ্রবালার দীপ্ত তেজপূর্ণ মহিমাময় শ্রী; একজনের লাজনম্র সচঞ্চল কোমল নয়ন, অপরের শঙ্কাশূন্য উজ্জ্বল ঢল ঢল লোচন; একের অর্দ্ধাবৃত লাজজড়িত অমিয় সুন্দর বদনমণ্ডল, অপরের অনাবৃত হাস্য মধুর প্রফুল্ল আনন; কেমন একটী পার্থক্যের সুস্পষ্ট সুন্দর ছায়া হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত করে। প্রভাত-শিশির-সিক্ত কুসুমের ও মধ্যাহ্ন রবিকরদীপ্ত প্রসূনে যে প্রভেদ, বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজী রমণীতে সেই প্রভেদ। এক কামিনী সেফালিকা, অপর চম্পক চন্দ্রমল্লিকা। উভয়েরই সৌন্দর্য্য নয়ন-তৃপ্তিকর, সুগন্ধে প্রাণ প্রফুল্ল করে; কিন্তু একজন প্রভাত সমীরণের সুকোমল স্পর্শে ঝরিয়া পড়ে, অপর মুক্ত বাতাসের কোলে হেলিয়া দুলিয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য অধিকতর বিকাশ করে।

মান্দ্রাজ রমণীগণের পোষাক পরিচ্ছদও বঙ্গ কামিনীগণের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করি। আমি অবশ্য আমাদের দেশের নব্য-শিক্ষিতা বা আলোকপ্রাপ্তা রমণীগণের পোষাকের সহিত তুলনা করিতেছি না, আমাদের দেশের পল্লীবাসিনী নিরক্ষরা রমণীগণের সহিত মান্দ্রাজের সমাবস্থাপন্না পল্লীবাসিনীদের বেশভূষার তুলনা করিলে, মান্দ্রাজ রমণীগণকে এ বিষয়ে অনেক উচ্চে অবস্থিতা বলিয়া বিশ্বাস হয়। বাঙ্গালী পল্লীবাসিনী রমনীগণের ন্যায় নগ্ন গাত্র—অর্দ্ধাবৃত দেহ বা অতিসূক্ষ্ম-বস্ত্র-পরিহিতা কোন রমণী মান্দ্রাজের কোথাও আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই। এদেশে অতি দীনা কুলি-রমণীও গায়ে অঙ্গরাখা পরিধান না করিয়া কখনও বাহিরে যাইবে না। অথচ মান্দ্রাজ বাঙ্গালা অপেক্ষা উষ্ণপ্রধান দেশ। মান্দ্রাজী রমণীগণ কেহ মহারাষ্ট্রীয়দের মত কাছা দিয়া, কেহবা পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় ফেরতা দিয়া সাটী পড়িয়া থাকে। ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র সচরাচর বার হাতের নীচে হয় না এবং নিতান্ত সূক্ষ্ম নহে। যাহারা কিছু অবস্থাপন্ন, তাহারা নানাবর্ণের রেশম-নির্ম্মিত, যাহারা অপেক্ষাকৃত দুঃস্থ, তাহারা রেশম ও সূত্র মিশ্রিত ও নিতান্ত নিঃস্ব রমণীগণ মোটা

সূতায় রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। প্রায় সকলেই কটিদেশে সাটীর উপরে একটী বেষ্টনী পরিধান করিয়া থাকে। সেই বেষ্টনী অবস্থানুসারে স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল বা সূত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঐরূপ বেষ্টনী পরিধানের ফলে ক্ষীণ কটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কটিদেশ হইতে বসন স্খলিত হইবার আশঙ্কা দূরীভূত করে। মান্দ্রাজী রমণীগণের অলঙ্কার-প্রিয়তা আমাদের দেশের রমণীগণের অপেক্ষা অনেক কম বোধ হইল। সৌভাগ্য-ক্রমে, পরিদর্শনীর জন্য, আমাদের অনেক বড় ঘরের মেয়েদের দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, বঙ্গ রমণীগণের ন্যায় অলঙ্কার-পারিপাট্য তাহাদের নাই। তবে তাহাদের কবরী-ভূষণের বৈচিত্র্য আছে। সকল রমণীই সচরাচর দীর্ঘকেশী; সেই কেশ নানা ভাবে বিন্যস্ত করিয়া কবরীবন্ধন ও তাহাতে নানাবিধ অলঙ্কার ধারণ যেন তাহারা সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা মনে করে। আমাদের দেশে অবগুণ্ঠন প্রচলিত থাকায় অনাবৃত মস্তকে বাহিরে যাইবার প্রথা নাই বলিয়াই, বোধ হয়, অতদূর কবরী ভূষণের পারিপাট্য প্রয়োজন হয় না।

শিক্ষা বিষয়েও মান্দ্রাজী রমণীগণকে তাহাদের বঙ্গ ভগিনীগণের নীচে অবস্থিতা বলিয়া মনে করি না। তথাকার ব্রাহ্মণ কুমারীগণের অন্ততঃ কিছু লেখাপড়া ও সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হয়। তাহা না হইলে ভাল সম্বন্ধ হয় না। অনেকে একটু সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, মান্দ্রাজে অনেক ব্রাহ্মণ কুমারী সমগ্র গীতা খানি মুখস্থ বলিতে পারে। আমরা কুম্ভকোনমে অবস্থিতি কালে একটী ভদ্র পরিবারের মেয়েদিগকে শিক্ষকের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে দেখিয়াছি। সেখানে মেয়েদের জন্য একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী আছে। শুনিলাম, তাহাতে প্রায় শতাধিক কুমারী সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া থাকে।

মান্দ্রাজে স্ত্রীলোকদের বেশভূষা যেরূপ সুন্দর ও সুরুচিসঙ্গত, পুরুষদের বেশভূষা তেমন নহে। অনেকে কাছা দিয়া কাপড় পরে না। এক খণ্ড বস্ত্র বহির্ব্বাসের ন্যায় কোমরে জড়াইয়া রাখে। অনেক শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবকও পায়ে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করে না। আমি অনেক অফিসারকে নগ্ন পায়ে কোর্টে যাইতে দেখিয়াছি। শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় সকল মান্দ্রাজী মস্তকে লম্বা চুল রাখে, ও পশ্চাৎদিকে একটী স্থূল বেণীর আকারে জড়াইয়া বাঁধে।

মান্দ্রাজে সামাজিক আচার ব্যবহারে বাঙ্গালা হইতে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এদেশে মামা ভাগিনেয়ী বিবাহ হইয়া থাকে। আমরা প্রথমে যেবার মান্দ্রাজে যাই, সেবারে এই প্রকার একটা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। মান্দ্রাজের মালাবার প্রদেশে আরও অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। তথায় নোম্বুত্রী ব্রাহ্মণ বলিয়া এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ আছে। তাহাদের মধ্যে মাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রের শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইয়া থাকে, অন্যান্য পুত্র বিবাহ করিতে পারে না। তাহারা নার্য্য রমণীদের সহিত গান্ধর্ব্ব বিবাহে আবদ্ধ হইয়া দিন যাপন করে। তাহাদের ঔরসজাত পুত্রও উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না। এইজন্য ঐ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও বহু রমণীকে চিরকুমারী অবস্থায় অতিবাহিত করিতে হয়। মালাবার দেশের নায়ার (নার্য্য) দিগের বিবাহ প্রথা আরও অদ্ভুত। তাহাদের কন্যাগণ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই উক্ত নোম্বুত্রীর ব্রাহ্মণ অথবা স্বজাতির উচ্চ-শ্রেণীর যুবকের সহিত তালীবন্ধন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও তিন দিবস একত্রে বাস করিয়া চতুর্থ দিবসে তালীবন্ধন ছিন্নকরতঃ বিবাহসম্বন্ধ পরিত্যাগ করে। উক্ত যুবকবর কিছু পণ গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া যায়। তদবধি কন্যা পিতৃগৃহে বাস করে ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নিজ পছন্দ মত যুবকের সহিত গন্ধর্ব্ব বিবাহে আবদ্ধ হইয়া পিত্রালয়ে বাস করিতে থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র দোষ বা লজ্জার কারণ মনে করে না। যতদিন উভয়ের মনের মিল থাকে, ততদিন উভয়ে একত্রে সুখে বাস করে। যুবকটী কন্যাগৃহে আসিয়া রাত্রি যাপন করে,

যুবক ব্রাহ্মণ হইলে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করে না আর স্বজাতীয় হইলে রাত্রে কন্যার গৃহে সময় সময় আহার করিয়া থাকে। যুবক যতদিন বাস করে, ততদিন কন্যাকে পরিধেয় বস্ত্রাদি ও অবস্থা ভাল হইলে অলঙ্কারাদিও প্রদান করিয়া থাকে। যুবতীর মনের অমিল হইলে সহজেই সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া অন্য পুরুষের সহিত ঐ প্রকারে বাস করিতে পারে, তাহাতে সমাজে কোনরূপ নিন্দার কারণ হয় না। পূর্ব্বে একই সময়ে বহুজনের সহিত বাস করিলে দোষের বলিয়া গণ্য হইত না; কিন্তু আজ কাল শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে পদ্ধতি উঠিয়া যাইতেছে। এক্ষণে একজনের সহিত বসবাস কালে অন্য পুরুষের সঙ্গ করিলে নিন্দনীয় হইতে হয়। নায়ার রমণীগণের গর্ভজাত সন্তান মাতুলের উত্তরাধিকারিণী হয়। অনেক সময় তাহাদের পিতৃনিরূপণ অসম্ভব বলিয়া তাহারা পিতৃপরিচয়ে পরিচিত না হইয়া মাতুলের পরিচয়ে পরিচিত হয়। এইজন্য মালাবারের আইন স্বতন্ত্র। আজকাল অনেক উচ্চশিক্ষিত নায়ারগণ এই আইন পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

মালাবারে থিওর বলিয়া একজাতি আছে, তাহাদের মধ্যে তিব্বতদেশের ন্যায় সকল ভ্রাতা মিলিয়া এক পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে। এজন্য তাহাদের মধ্যে অনেক কন্যা অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়। সেই সকল অবিবাহিতা কন্যাগণ পিতৃগৃহে বাস করিয়া স্বেচ্ছামত ভিন্ন জাতীয় বা ভিন্ন দেশীয় পুরুষের সহিত বসবাস করিতে পারে, তাহাতে সমাজে নিন্দনীয়া হয় না। তাহাদের পুত্রগণও তাহাদের মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বহুকাল হইতে ইউরোপিয়াগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে মালাবার দেশে বাসকালে থিওর উপপত্নী গ্রহণ করিয়া থাকিত; সেইজন্য আজকাল মালাবার দেশে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা থিওরদের মধ্যে অধিকাংশ রমণী ইউরোপীয় শঙ্কর জন্য দেখিতে পরমা সুন্দরী। আমি ইতিপূর্ব্বে মান্দ্রাজী রমণীগণের বেশভূষার প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু মালাবার প্রদেশে সকলই অদ্ভুত। এদেশে থিওর প্রভৃতি রমণীগণ বক্ষাবরণ ব্যবহার করে না। তবে রাস্তায় চলিতে আজ কাল একখানি রুমাল কণ্ঠদেশে ঝুলাইয়া রাখে। মান্দ্রাজ যাত্রা কালে রেলে গাড়ীতে জনৈক প্রাচীন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক মাদুরা দেবমন্দিরে এইরূপ অনাবৃত বক্ষ ললনাগণের সাক্ষাৎকারের আশঙ্কা আমাদের মনে জন্মাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যের বিষয়, বলিতে পারি না, মাদুরায় কামাখ্যা দেবীর এইরূপ স্বভাবের নগ্ন দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তবে মালাবার প্রদেশের অনেক স্থানে, বিশেষত ত্রিবাঙ্কুর ও কোচীনে এইরূপ নগ্ন দৃশ্য সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় ও শুনিয়াছি, কন্যা-কুমারীতে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে। মালাবারে এরূপ অনেক নীচ জাতি আছে, যাহাদের স্পর্শেও উচ্চগণ অশুচি মনে করে, এইজন্য তাহাদের রাস্তার মধ্য দিয়া চলা নিষেধ। তাহাদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ঐরূপ ঘৃণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। বোধ হয়, এইজন্যই মালাবার প্রদেশে অনেক দেশী খ্রীষ্টানের বাস।

মান্দ্রাজে তামিল, তেলুগু, কানারী ও মালয়ালম্, এই চারিটী ভাষা প্রচলিত। ঐ ভাষা চতুষ্টয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে, সকলগুলিই মূল তামিল হইতে উৎপন্ন, যেমন বাঙ্গালা ভাষার সহিত আমাদের ও উড়িয়া প্রভৃতির বিভিন্নতা, ইহাদের মধ্যেও প্রায় ঐরূপ তারতম্য লক্ষিত হয়। মান্দ্রাজের অনেকেই তামিল ভাষা বুঝিতে পারে। বাঙ্গালা, হিন্দী, মারহাট্টী, গুজরাটী, প্রভৃতি যেমন সংস্কৃত-মূলক, তামিল বা তেলুগু ঠিক্ সেরূপ নহে, কিন্তু তাই বলিয়া যে সংস্কৃত ভাষা একেবারে প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই, এরূপ কথা বলা যাইতে পারে না। নিম্নে কতকগুলি তামিল শব্দ ও তাহার প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইল।

তামিল			বাংলা
আরিসি	...	...	চাউল
আন্নেই	...	...	তৈল

পগ্নপু	... ...	ডাইল
তান্নি / নিলু	... ...	জল
তায়ের	... ...	দধি
বিটেল	... ...	পান
মনিষান	... ...	মানুষ
ভাণ্ডি	... ...	গাড়ী
কক্কুশ	... ...	পায়খানা
ইল্লে	... ...	না।
সেই	... ...	কর।
লেই	... ...	ঘৃত
ভালুইপালম্	... ...	কলা
উপ্পু	... ...	লবণ
পালু	... ...	দুগ্ধ
পক্কু	... ...	সুপারি
পোয়লে	... ...	তামাক
মানুষী	... ...	স্ত্রীলোক
ভাণ্ডিকোরম্	... ...	গাড়োয়ান
অম্	... ...	হাঁ
পো	... ...	যাও
অন্নু	... ...	এক
রণ্ড	... ...	দুই
লালু	... ...	চারি
আরু	... ...	ছয়
এটু	... ...	আট
পাথু	... ...	দশ
মন্নু	... ...	তিন
আই	... ...	পাঁচ
ইয়ালু	... ...	সাত
অম্বু	... ...	নয়

মান্দ্রাজ অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গেলে হিন্দি জানিলে চলে না। তবে অনেকটা ইংরাজীতে কাজ চলে। বড় বড় নগরে মুটীয়া মজুর গাড়োয়ান পর্য্যন্ত ইংরাজী কথা বুঝিতে পারে। তবে নিতান্ত পল্লীগ্রামে তামিল বা তেলুগু ভিন্ন কোন কথা বুঝাইবার উপায় নাই।

বাঙ্গালা অপেক্ষা মান্দ্রাজে শীত কম। শীত কালে রাত্রে একখানি মোটা চাদর বা আলোয়ান গায় দিয়া থাকা যায়। গ্রীষ্মকালে গরম কিছু বেশী হয়, তবে সমুদ্র তটবর্ত্তী স্থানগুলি প্রায়ই নাতি শীতোষ্ণ। এদেশে মধ্যে মধ্যে শীতকালে বৃষ্টি হইয়া থাকে। গত ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মান্দ্রাজ কংগ্রেসের সময় যে প্রকার তিন দিন ব্যাপী অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টি হয়, সেরূপ বৃষ্টি বাঙ্গালা দেশে বর্ষা কালেও কদাচিৎ দেখা গিয়া থাকে। আমরা বৃষ্টি ধরিয়া গেলে অপরাহ্নে বাহির হইয়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। সমস্ত রাজপথ তখনও নদীর আকার ধারণ করিয়াছিল। দেখিলাম, রাস্তার উভয় পার্শ্বে নিম্নতলার দোকান ও ঘরের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে। রাস্তার উপর নৌকা চলিতেছে। ২।৪ খানা গাড়ীর ঘোড়া আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া যেন সাঁতার দিয়া যাইতেছে। বৃষ্টি বন্ধ হইবার প্রায় ২।৪ ঘণ্টা পরে আমরা নগর দেখিতে যাই। তখনও মান্দ্রাজের মত সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানের এই দশা।

এই অতি বৃষ্টি নিবন্ধন দক্ষিণ ভাগ রেল পথ অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; আমরা পর দিবস প্রাতে ত্রিচিনপল্লী যাইবার উদ্দেশ্যে এগনোর ষ্টেশনে গিয়া শুনিলাম যে, চিংড়িপট্ট পর্য্যন্ত মাত্র গাড়ী যাতায়াত করিতেছে। তাহার পরে ৩।৪ স্থানে রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় রেল চলাচল বন্ধ হইয়াছে। তবে মান্দ্রাজ রেলপথে ইরোড্ জংসন হইয়া ঘুরিয়া গেলে ত্রিচিনপল্লী বা তাহার দক্ষিণে সর্ব্বত্র যাওয়া যায়। কারণ সেদিকে বৃষ্টি হয় নাই। আমাদের প্রথমে এই পথে মহীশূর দেখিয়া যাইবার কল্পনা ছিল, কিন্তু প্লেগের ভয়ে মহীশূর না গিয়া, বাধ্য হইয়া এই রাস্তার অনেক ঘুরিয়া, সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইতে হইয়াছিল।

শ্রীকুঞ্জলাল সাহা।

মা।

তুষার-ঢাকা তুঙ্গ পাহাড়
মুকুটরূপে মাথায় যার,
বক্ষে স্তন্য ব্রহ্মপুত্র,
মন্দাকিনী সুধার ধার;
উপরে যাহার স্বর্ণ ফলে,
মাটীর তলে হীরার খনি,
কেবলি নহে ভারতবাসীর;—
বিশ্ব ধরার মাথার মণি;
শৈল-পাদুকা চুমিয়া যার,
চরণ-ধূলি সাগর বহে,
রাজার রাজা সে মায়ে মোর
দীন দরিদ্র কে আজ কহে?
জননি মোর, দেবতা মোর,
গর্ব্ব আমার সার্থকতা,
পাগলে কত কি(ই) না বলে,
কে শোনে মা তাদের কথা?

বুকের রক্তে পুত্র যাহার
করেছে সিক্ত শ্যামল বুক,
বুকের রক্তে পুত্র আবার
করবে যাহার উজল মুখ;
লক্ষ অসি যাহার তরে
উঠেছে নাচি' লক্ষ বার;
তীর ধনুকে মুক্তি-মন্ত্র
কামান ভজন গাইল যার;
যাহার তরে মরণ নিয়া
নিত্য লুফালুফি চলে,
শক্তি রূপা সে মায়ে মোর
শক্তিহীনা কে আজ বলে?
জননি মোর, দেবতা মোর,
গর্ব্ব আমার সার্থকতা,
পাগলে কত কি(ই) না বলে,
কে শোনে মা তাদের কথা?

শিবজী প্রতাপ পুত্র যাহার,
পুত্র যাহার রণজিৎ,
ভক্তি ধর্ম্মে স্থাপিত যার
শক্তি-সৌধের অচল ভিৎ;
যাহার শৈল রন্ধ্রে রন্ধ্রে
লুপ্ত অযুত থার্মপেলি,
লক্ষ 'ওয়াটার্লু' যাহার
কক্ষে কক্ষে রক্ত কেলি;
মোগল পাঠান বাদসা যাহার
স্নিগ্ধ চরণ ধূলায় সাজি,
পূজ্য আমার জন্মভূমি
কেবলে তারে তুচ্ছ আজি?
জননি মোর, দেবতা মোর,
গর্ব্ব আমার সার্থকতা,
পাগলে কত কি(ই) না বলে
কে শোনে মা তাদের কথা?

শঙ্কা কি মা, লজ্জা কি মা!
দেখমা চেয়ে নয়ন মেলি',
উঠেছে তোর পুত্র আবার
দু দণ্ডের এ আঁধার ঠেলি'।
ভবিষ্যতের বিপুল পক্ষে
শোন্ মা শত ঝনৎকার,
উর্ব্বরা তোরে করবে আবার
তপ্ত তরল হৃদয়-ধার।
জলের তিলক সূর্য্য ভালে
ক' দণ্ডই বা বল্‌না থাকে,
জ্যোতির্ম্ময়ী মায়েরে মোর,
মৃত্যুমলিন কে আজ ডাকে?
জননি মোর, দেবতা, মোর
গর্ব্ব আমার সার্থকতা,
পাগলে কত কি(ই) না বলে
কে শোনে মা তাদের কথা?

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

সংসার ও সন্ন্যাস

জগৎপিতা জগদীশ্বরের এই জগৎরূপ গৃহে যে সকল গৃহকর্ম্ম লইয়া আমরা গৃহী হইয়াছি, তাহা আমাদের অবশ্য সম্পাদনীয়; কোন প্রকারে কখন তাহাতে অবহেলা করা স্বাভাবিক বা সম্ভবপর নহে; কিন্তু উহাতে আমাদের স্বামিত্ব বা কৃতিত্ব না থাকায় কর্ম্ম-ফলেও কোন অধিকার নাই; যেহেতু আমরা উহা সম্পাদনে উপলক্ষ্য মাত্র, কর্ম্ম-শক্তি সেই সর্ব্বশক্তিমান কর্ম্মকর্ত্তা হইতেই বিকীর্ণ হইয়া আমাদের পরিচালন করিতেছে। এই আভ্যন্তর কর্ম্মাচরণের মূলে ধারণা বদ্ধ থাকিলে কোন প্রকারে তাহা স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত বা সেই কর্ম্মনিয়ন্তার নিয়োগের অপব্যবহার করা হয় না। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ অজ্ঞানতা বা অবিদ্যার কুহকে মহাভ্রমে পতিত হইয়া, সেই কর্ত্তব্য পালনে আমরা কর্ম্মকর্ত্তা বা নিয়ন্তাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার অনন্ত শক্তি পরিচালনের অনুভব-জ্ঞান হারাইয়া, স্বীয় স্বামিত্ব ও কৃতিত্ব কল্পনায় কর্ম্মফল স্বীয় ভোগ্য, এইরূপ ধারণা পোষণ করিয়া বিপরীত পথগামী হইয়া থাকি; সুতরাং ঐ প্রকারের কর্ম্মাচরণ সকাম ভাবাপন্ন হইয়া তাহা হইতে নিষ্কাম কর্ম্ম স্বতই পৃথক হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই পার্থক্যই সংসার ও সন্ন্যাসের ব্যুৎপত্তি সাধন করিতেছে।

সাধারণতঃ লোক সমাজে এইরূপ ধারণা আছে যে, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদি রূপ কর্ম্মাংশী-বেষ্টিত হইয়া যিনি লোকালয়ে বাস পূর্ব্বক কর্ম্মাচরণ করেন, তিনি সংসারী; আর যিনি সেরূপ কর্ম্মাংশী ও কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক গৈরিক বসন ও জটাভার ইত্যাদি ঔদাসিন্য-প্রকাশক বেশ ধারণ করিয়া লোকালয়ের বহির্ভূত স্থানে অবস্থান করেন, তিনি সন্ন্যাসী। সুতরাং সংসার ও সন্ন্যাস বিচার এক প্রকার বাহ্য দর্শন দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ সংসার বা সন্ন্যাস যে বাহ্য দর্শন দ্বারা আদৌ নিষ্পন্ন হয় না, উহা সম্পূর্ণরূপে আভ্যন্তরিক বা আন্তরিক ভাবে নিহিত, তাহা আমরা চিন্তা করিয়া দেখিতে প্রায়ই প্রস্তুত হই না এবং কিরূপ লোক বিশেষকে সংসারী অথবা সন্ন্যাসী বলা যায়, তাহাও স্থির সিদ্ধান্ত হয় না। এইরূপ স্থলে হয় ত প্রকৃত সন্ন্যাসীকে ঘোর সংসারী এবং ঘোর সংসারীকে সন্ন্যাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। একজন পরম সন্ন্যাসী, যিনি পরিবার রূপ কর্ম্মাংশী বেষ্টিত হইয়া নিষ্কামভাবে এই জগৎ গৃহের গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহাকে ঘোর সংসারী ব্যতীত সন্ন্যাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কখনই প্রস্তুত হই না। এবং একজন ঘোর সংসারী, অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে সংসার সম্পূর্ণরূপে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তাঁহাকে নির্জ্জন বাস ও বাহ্য কর্ম্মের আংশিক ত্যাগ হেতু নির্লিপ্ত স্থির পূর্ব্বক পরম সন্ন্যাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি; কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার কর্ত্তব্যে অবহেলা বা সেই সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়োগের অপব্যবহার সংসাধিত হইতেছে এবং সেরূপ স্থলে সন্ন্যাসাচরণ আদৌ সম্পাদ্য নহে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। বস্তুতঃ সংসার ও সন্ন্যাস, এই দুইটী বিষয়ের পার্থক্য মীমাংসা করিতে হইলে, প্রথমেই আচার্য্য কর্ম্মের রূপ বা প্রকার ও

তাহার বিচার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং উভয়ের পার্থক্য মীমাংসায় আনয়ন পূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিলে, বিচার ও নির্দ্দেশ সহজসাধ্য হইতে পারে।

কর্ম্মই দেহীর ধর্ম্ম, কর্ম্মাচরণই দেহীর একমাত্র কর্ত্তব্য এবং কর্ম্মাচরণ জন্যই দেহাশ্রয়; সুতরাং কর্ম্ম সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত দেহের অস্তিত্ব এবং কর্ম্মক্ষয়েই দেহান্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। দেহী মুহূর্ত্তকালও কর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না; জাগরণেই হউক বা নিদ্রাবস্থায়ই হউক, বিচরণেই হউক বা স্থির ভাবে অবস্থানাবস্থায়ই হউক, অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা হউক বা অঙ্গাদির নিশ্চলাবস্থায়ই হউক, কেহ কখনই কর্ম্মশূন্য হইতে পারে না। যদি কখন কাহাকে বাহে কোন কর্ম্মে লিপ্ত থাকা লক্ষিত না হয়, সে নিশ্চিতই কোন না কোন আভ্যন্তরিক কর্ম্মে লিপ্ত থাকিবেই থাকিবে, যেহেতু কর্ম্ম দুই প্রকার, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক। বাহ্য অবয়ব অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যাঙ্গাদির দ্বারা যে সকল কর্ম্ম সাধিত হয়, তাহাকে বাহ্যিক কর্ম্ম এবং যে সকল কর্ম্ম মনে মনে বা চিন্তার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাকে আভ্যন্তরিক কর্ম্ম বলে।

এস্থলে এ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি কেহ ক্ষণমাত্রও কর্ম্মশূন্য হইতে না পারে, তবে এ জগতে কাহাকেও সন্ন্যাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না, যেহেতু সন্ন্যাসী অর্থ ত্যাগী; যদি কাহারও কর্ম্মত্যাগ সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে দেহত্যাগী হইল না, সুতরাং তাহাকে কিরূপে সন্ন্যাসী বলা যাইতে পারে? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কর্ম্মই দেহীর ধর্ম্ম, সুতরাং ধর্ম্মত্যাগ কাহারও পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে; কারণ ধর্ম্মের দ্বারাই বস্তুর বস্তুত্ব প্রমাণিত হয়। ধর্ম্মের সাধারণ নাম গুণ, গুণই বস্তুর বস্তুত্ব প্রতিপাদক; যাহার গুণ অন্তর্হিত হয়, তাহাতে আর বস্তুত্ব থাকে না। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম তাপ প্রকাশ, তাহার দ্বারা নিয়তই তাপ প্রকাশ সম্পাদিত হইতেছে, তাপ প্রকাশ রহিত হইলে অগ্নিরও অস্তিত্ব রহিত হয়। সুতরাং কর্ম্মই যখন দেহীর ধর্ম্ম, তখন কর্ম্মশূন্য হইলে দেহীরও অস্তিত্ব রহিত হয়।

সংসার বা সন্ন্যাস, এ দুইটী কর্ম্মের রূপ বা প্রকার মাত্র এবং দেহীর অবশ্য আচার্য্য। তবে কিরূপ কর্ম্মাচরণ সংসার-বোধক বা কিরূপ কর্ম্মাচরণ করিলে দেহীকে সংসারী বলা যায় এবং কিরূপ কর্ম্মাচরণ সন্ন্যাস-বোধক বা কিরূপ কর্ম্মাচারীকে সন্ন্যাসী বলা যায়, ইহাই এস্থলে সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়োজন হইতেছে।

সাধারণ অর্থে সংসার দ্বারা ভোগ এবং সন্ন্যাস দ্বারা ত্যাগ বুঝায়; অর্থাৎ যে কর্ম্মাচরণের মূলে ভোগাকাঙ্ক্ষা বদ্ধমূল থাকে, তাহাই সংসার-বোধক সকাম কর্ম্ম এবং সেইরূপ কর্ম্মাচারীকে সংসারী কহে। আর যে কর্ম্মাচরণের মূলে ভোগাকাঙ্ক্ষা আদৌ থাকে না, তাহাই সন্ন্যাস-বোধক নিষ্কাম কর্ম্ম এবং সেইরূপ কর্ম্মাচারীই সন্ন্যাসী। সুতরাং সন্ন্যাস অর্থে কর্ম্মত্যাগ না বুঝিয়া কর্ম্মফল ভোগ বা ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ বুঝিতে হইবে। এ স্থলে সংসার ও সন্ন্যাসের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতেছে।

যে কর্ম্মে আমি বা আমিত্ব বদ্ধমূল থাকে এবং যাহা ভোগাকাঙ্ক্ষা সহ আচরিত হয়, তাহাকে সকাম এবং যে কর্ম্মে আমি বা আমিত্বের কোন সংস্রবই নাই এবং যাহার আচরণের মূলে ভোগাকাঙ্ক্ষা আদৌ থাকে

না, তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম কহে। আমি কর্ত্তা, আমি ভর্ত্তা, আমি পিতা বা আমি পালক; আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার পরিজন, আমার বাটী ইত্যাদি; যাহা হইয়াছে, যাহা হইবে, সে সমস্ত আমার কর্ম্ম এবং আমার রাজ্য, আমার ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি বোধক ধারণাকে আমিত্ব কহে। আর সুন্দর ভবনে বাস, ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি, সুখাদ্য ভোজন, সুযশ লাভ, অতুল কীর্ত্তি স্থাপন ইত্যাদি মূলক বিবিধ আকাঙ্ক্ষা ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রতিপদক এবং এইরূপ ধারণা-সঙ্কুল কর্ম্মই সকাম কর্ম্ম; অর্থাৎ কোন না কোন প্রকারে স্বীয় স্বামিত্ব বা কৃতিত্ব থাকা জ্ঞানে কর্ম্মফল কামনা পূর্ব্বক এ কর্ম্ম আচরিত হয়। আর সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বরের কর্ম্ম এবং তাঁহারই নিয়োগে ও শক্তিতে সম্পাদিত হইতেছে,এইরূপ ধারণা পূর্ণভাবে যে কর্ম্মাচরণের মূলে জাগরুক থাকে এবং যাহাতে আমি কর্ত্তা বা আমার কোন কৃতিত্ব আছে, এরূপ ধারণা আদৌ উদিত না হয়,তাহাই আমি বা আমিত্ব-শূন্য কর্ম্ম এবং যাহার ফল ভোগে আদৌ আকাঙ্ক্ষা না থাকে, অর্থাৎ যে কর্ম্ম আত্মসুখ ভোগার্থ, আত্মশক্তি প্রকাশার্থ বা আত্মকীর্ত্তি স্থাপনার্থ, এ ধারণা বর্জ্জিত ভাবে কেবল ভগবানেই তাহার ফল অর্পণ পূর্ব্বক আচরিত হয়, তাহাকেই ভোগাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত কর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্ম নহে। কারণ এরূপ কর্ম্মাচরণের মূলে কোন প্রকার কামনাই থাকে না। সুতরাং সংসার ও সন্ন্যাস কর্ম্মের রূপ বা প্রকার মাত্র এবং কর্ম্মাচরণেই তাহাদের বিচার মীমাংসা সাধ্য।

এ কর্ম্মময় জগতের যেদিকে নয়নপাত করা যায়, যে সকল কর্ম্মাচরণ চতুর্দ্দিকে পরিলক্ষিত হয় এবং সর্ব্বক্ষণ যাহার বিষয় আলোচনা ও বিচার করা যায়, সে সমস্তই প্রায় সংসার ভাবাপন্ন। সংসার সহজেই উপলব্ধি করা যায়, সংসার-বোধক কর্ম্মের অনায়াসেই সিদ্ধান্ত হয় এবং সংসারীর পরিচয়ের জন্য কোন প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হয় না; কিন্তু সন্ন্যাস বা সন্ন্যাসবোধক কর্ম্ম সংসারময় জগৎ হইতে বাছিয়া লওয়া একপ্রকার মানব জ্ঞানের সাধ্যাতীত বলিলে অসঙ্গত হয় না।

আমরা সচরাচর যে সকল দীর্ঘ জটা ও কৌপীনধারী স্ত্রীপুত্রাদি-শূন্য ব্যক্তিদিগকে সন্ন্যাসী কহি, তাঁহারা সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন করা দূরে থাকুক, বরং বাহ্যে বা বাহ্যভাবে কর্ম্মত্যাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্ন্যাস প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া সেই কর্ম্মনিয়ন্তার উদ্দেশ্য বিস্মৃত ও তাঁহার মহাশক্তি-বিকিরণ-জ্ঞানহারা হইয়া দেহীর একমাত্র কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হন। তাঁহারা আপনাদিগকে সংসারাতীত প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া বরং ঘোর সংসারী বলিয়াই প্রমাণিত করেন; যেহেতু এরূপ বাহ্যভাব প্রদর্শনের মূলে ঘোর স্বার্থ বা ভোগাকাঙ্ক্ষা নিহিত থাকা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তাঁহারা সন্ন্যাসী না হইয়া বরং সংসারীরও অধমতর শ্রেণীতে উপনীত হইয়া থাকেন; কারণ প্রকৃত সংসারীরা সংসারী নহেন,ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, কখন তাঁহাদের সেরূপ ধারণাও উদয় হয় না। কিন্তু ইহারা ঘোর সংসারী হইয়া কোন কামনাবশে লোক সমাজে আপনাদিগকে সন্ন্যাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর লোক দুই একটী দুঃসাধ্য কর্ম্মে বিশেষ শিক্ষা দ্বারা ক্ষমতা লাভ করিয়া সমাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক মহত্ত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করেন এবং আমরাও সেই আপাত

প্রতিভা-সম্পন্ন কার্য্য দেখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া প্রকৃত তথ্য বিস্মরণ পূর্ব্বক অনায়াসেই সেই সকল ব্যক্তিকে পবিত্র সন্ন্যাসাসন দান করিয়া থাকি। বস্তুতঃ যে মহাজন সন্ন্যাসী বা যাঁহার প্রকৃত সন্ন্যাস লাভ সংঘটন হইয়াছে, তিনি লোকসমাজে সম্পূর্ণভাবে অপরিচিতই থাকিয়া যান; কারণ আত্মপ্রকাশ তাঁহার সম্পূর্ণরূপে স্বভাব বা সংস্কার বহির্ভূত। সুতরাং সন্ন্যাসীর প্রতিভা বহির্জগতে আদৌ প্রতিভাত হয় না, বা প্রতিভাত হইলেও তাহা সংকীর্ণহৃদয় স্থূলদর্শী সংসারীর জ্ঞানগোচর হইতে পারে না।

সংসার ভাবের তিরোধানে সন্ন্যাস ভাবের আবির্ভাব বাহ্যজগতের গোচরীভূত হওয়া সুকঠিন; ইহা অন্তর্জগতে আবির্ভূত হইয়া অজ্ঞাতভাবে সংসারাবদ্ধ ও অভ্যাস-সাধ্য হইয়া সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মের অবলম্বনস্বরূপ হইয়া থাকে। ইহা লাভ করিবার জন্য কোন স্থান বিশেষ বা কোন বেশভূষা বিশেষের প্রয়োজন হয় না। ইহা লাভ করিবার জন্য যে সাধনা বা শক্তির প্রয়োজন, তাহার প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক্, বাহ্য জগতের সহিত তাহার কোন প্রকার সম্বন্ধই নাই; অন্তর্জগতের ছায়া বাহ্যে প্রতিভাত হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া কিছু কিছু বাহ্যজগতে প্রকাশ হইলেও তাহা প্রায়ই জ্ঞানগোচর হইতে পারে না এবং ইহার উদয় ও অবস্থান সম্পূর্ণরূপে অন্তর্জগতেরই ব্যাপার বলিতে হইবে। সুতরাং অন্তর্জগতের বিশেষ জ্ঞানলাভের শক্তি থাকা ব্যতীত কর্ম্মের নিষ্কামত্ব কিছুতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না। এইরূপে নিষ্কাম কর্ম্ম বিচার একপ্রকার অসাধ্য হইলেও সকাম কর্ম্মচারীর পক্ষে আপন কর্ম্মের সকামত্ব অজ্ঞাত থাকে না; নিষ্কাম কর্ম্মচারীর স্বকর্ম্মের নিষ্কামত্ব কখনই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। যেহেতু স্বকৃত কর্ম্ম যদি নিষ্কাম বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা হইলে কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বতই মনে উদয় হইয়া আমি শ্রেষ্ঠকর্ম্ম করিতেছি; এ ধারণার উৎপত্তি স্বাভাবিক বিধায় তাহার নিষ্কামত্ব দূর হয়, কারণ স্বকর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান আমিত্বপূর্ণ বা আমার দ্বারা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম সাধিত হইতেছে, এই ভাব-জ্ঞাপক; সুতরাং তাহা নিষ্কাম হইতে পারে না, কারণ সেরূপ হইলে কর্ম্মফল কামনা অজ্ঞাতসারে তাহার মূলদেশ অধিকার করিবেই করিবে।

সন্ন্যাস কর্ম্মচারীর স্বানুষ্ঠিত কর্ম্মের রূপ বা প্রকার জ্ঞান হওয়া দূরে থাকুক, তাহার বিচারেও কখন ধারণা উৎপন্ন হয় না, সে কেবল কলচালিত পুত্তলিকার মত সংস্কারবশে কর্ম্ম করিতে থাকে। সংসার কর্ম্মের ন্যায় উহাতে কোন কামনা থাকেই না, কেবল সর্ব্বদা নিষ্কামভাবে সম্পূর্ণরূপে সমস্ত ফল সেই কর্ম্মকর্ত্তাতে অর্পিত হইয়া সাধিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ কর্ম্মের প্রকৃত তথ্য যাঁহার সংস্কারাবদ্ধ থাকিয়া সর্ব্বদা কর্ম্মাচরণের আশ্রয়ীভূত হয়, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যিনি তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া ফলভোগ কামনামূলক কর্ম্মাচরণ করেন, তিনিই সংসারী।

সংসারের যে দেহের ভোগের জন্য কর্ম্মফল কামনা করা হয়, সে দেহ আশ্রয়ের প্রকৃত তথ্য এবং তাহার অনিত্যত্ব জ্ঞানগত থাকিয়াও গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের অস্তিত্ব জ্ঞান নয়নান্তরালে অবস্থান হেতু যেমন পরিস্ফুট থাকে না, সেইরূপ অজ্ঞানতা হেতু, বা অবিদ্যার বশে হৃদয়পটে পরিস্ফুট হইতে পারে না; সুতরাং কর্ম্মফল স্বভোগার্থ, এই ভ্রমমূলক কামনাবশে কর্ম্ম আচরিত হয়। কিন্তু দেহের অনিত্যত্ব ও দেহ আশ্রয়ের প্রকৃত তথ্য

ধারণাগত করিতে পারিলে হৃদয়ে ইহা নিশ্চিতই জাগরূক থাকে যে, এই জগৎ সম্পূর্ণরূপে যাঁহার অন্তর্ভূত, সেই কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্ম লইয়াই দেহাশ্রয় এবং সেই কর্ম্মনিয়ন্তার কর্ম্মশক্তির পরিচালনে উপলক্ষ্য স্বরূপে দেহীর কর্ম্মাচরণ এবং কর্ম্মের ফল সেই ইচ্ছাময়ের কোন অপূর্ব্ব ইচ্ছা পূরণার্থে উৎপাদিত হইয়া তাঁহারই কর্ম্ম নিষ্পন্ন ও প্রতিপাদন করে; উহা দেহীর অবিদ্যা-প্রদত্ত, কোন কামনাজাত কোন প্রকার ভোগার্থে নহে। দেহী কর্ম্মাচরণার্থে নিযুক্ত, সে আচরণই করিবে, কর্ম্মফলে তাহার কোন অধিকার নাই; ইহা বিস্মৃত হইয়া এই অনধিকার বস্তু লাভার্থে অনর্থক প্রয়াস পাইলে দিন দিন ঘোর সংসারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে হয়।

পরিবাররূপ কর্ম্মাংশীগণে বেষ্টিত হইয়া কর্ত্তব্য ও আচরণীয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকা যখন সেই ইচ্ছাময় কর্ম্মনিয়ন্তার ইচ্ছা বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে, তখন সংসার বা সন্ন্যাস, এ উভয়ই সেই কর্ম্মাচরণে নিহিত আছে, ইহাতে কর্ম্মত্যাগ কোন প্রকারে সম্ভবপর বা কর্ত্তব্য নহে এবং কর্ম্মত্যাগে সংসার ত্যাগ বা সন্ন্যাস প্রাপ্তি হয় না; কেবল কর্ম্মের সকামত্ব ও নিষ্কামত্বই সংসার ও সন্ন্যাস-জ্ঞাপক, ইহা কোনপ্রকার বেশভূষা বা বাহ্যভাবে প্রতিপন্ন করা যায় না।

সন্ন্যাস সুগভীর খনি-গর্ভস্থ বিশুদ্ধ মণির উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ প্রভা সদৃশ, ইহা সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজগতে গুহ্য ও অননুমেয় রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, অনুপমেয় অলৌকিক আলোকে অন্তর্জগৎ আলোকিত করে। ইহা যাহা হইতে নির্গত হয়, তাহাতেই প্রতিভাত হয়, তাহারই আশ্রয়ীভূত থাকিয়া গুহ্যভাবে তাহাকেই আলোকিত করে, তাহারই শোভা বর্দ্ধন করে, তাহারই পবিত্রতা সংরক্ষণ করিয়া দিন দিন তাহাকে উন্নত হইতে উন্নততর মার্গে আনয়ন করে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী।

নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা। (২

তৃতীয় অধ্যায়।

অমিতাভ, খ্রীষ্ট, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

"অমিতাভ

অমিতাভ ভগবানের নবম অবতার বুদ্ধদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী। এই কাব্যে উনিশটী বিভিন্ন অমৃতবর্ষী কবিতা আছে। বুদ্ধদেব আমাদের ভগবানের নবম অবতার। যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ছায়া আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও হৃদয়ে ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত, তাঁহাকে আমরা চিনিনা। তাঁহার প্রতিভা আমরা জানি না। সেই জন্য কবি তরল কবিতায় বুদ্ধদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গালী বুদ্ধদেবকে চিনিবে, সেই মহাপাদবের আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং সেই মহাদেবের পদে ভক্তি ভাবে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

বাঙ্গালায় বুদ্ধদেবের আরও ২।৩ খানা জীবনী বাহির হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি গদ্যে। সম্প্রদায় বিশেষ ভিন্ন প্রায় অপর সাধারণ সমস্ত বাঙ্গালী ঐ গুলি পাঠ করেন না।

বিশেষ আমাদের সমস্ত ধর্ম্ম গ্রন্থই পদ্যাকারে গ্রথিত, সেই জন্যই গুপ্ত কাব্যে সাধারণ বঙ্গবাসীর হৃদয়ে যেন উক্তির উদয় হয় না। আমাদের কবি সে অভাব দূর করিয়াছেন। এখন কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারতের ন্যায় এই 'অমিতাভ'ও অনেক স্থলে সাধারণ লোক মধ্যে ধর্ম্ম গ্রন্থের আসন গ্রহণ করিতেছে। এবং লোকে বুদ্ধের নিঃস্বার্থ ভাব ও স্বার্থত্যাগের মহা উদাহরণ দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তির সহিত প্রণিপাত করিতেছে। পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক যাঁহার অমৃত-নিঃসরিণী ধর্ম্মোপদেশ লাভে কৃতার্থ, আর আমরা, যে হতভাগ্যদের দেশে সেই মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল—তাঁহার সেই বৈজয়ন্তী সুধা-পানে বঞ্চিত থাকিব, ইহা অপেক্ষা আর আমাদের দুর্ভাগ্যের নিদর্শন কি আছে?

মহামায়ার মৃত্যুতে যে অমিয় উৎসব নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা কোন বাঙ্গালীর আকাঙ্ক্ষিত বা হৃদয়গত বাসনা নহে:—

যাও মা করুণাময়ী, জরা-মৃত্যু দুঃখ ভরা
এজগত নহে তব স্থান,
আছে মানবের আশা, আবার আসিবে তুমি
নর দুঃখে কাঁদিলে পরাণ।

অঙ্কুরেই বৃক্ষটী কি প্রকার হইবে, তাঁহার আভাস পাওয়া যায়। যে মহাপুরুষ মানবের হিতার্থে বিস্তৃত রাজ্য, দেব দেবী সম পিতা মাতা, গুণ ও রূপবতী স্ত্রী, অতুল ঐশ্বর্য্য অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারই শিশু-হৃদয় একটী আহত হংস দেখিয়া কিরূপ কাঁদিয়াছিল,—

আঘাতের ব্যথা ভাই, আজি বুঝিয়াছি আমি
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল।
তোমারোত আছে প্রাণ, পাখাটীর ক্ষুদ্র প্রাণে
বুঝ না কি, যে ব্যথা পেয়েছে বিষম।

অন্যত্র কবি বিরাগের কি মনোহর মালা গাঁথিয়া আমাদের উপহার দিয়াছেন:—

অনন্ত মানব জাতি, জন্ম জন্মান্তরে
সবে জরা-মরণের দুঃখ ঘোরতর
কেমনে সহিব বল? নাহি অন্বেষিয়া
নরের উদ্ধার পথ, পুড়িব স্বজন
জ্বালি বিলাসের বহ্নি এত নহে প্রেম?
প্রেম শিব, প্রেম শান্তি, প্রেম নিবারণ।

আহা! ইহা যদি আমরা বুঝি, তবে কি এমন বিলাসমগ্ন হইয়া আমাদের এত অধঃপতন হয়!

কে বল কখন কাম্য বস্তু উপভোগে,—
কামিনী কাঞ্চনে, রাজ্য-তৃপ্তি-কামনায়
পাইয়াছে এ জগতে হায়? এ সম্ভোগে
মৃগ-তৃষ্ণিকার মত বাড়ায় পিপাসা
অতৃপ্ত কামনানলে দহে নিরবধি।

প্রকৃত কবি ভিন্ন এমন সরল হৃদয়গ্রাহী কবিতার সমাবেশ কি সম্ভবপর? গৌতমী যখন গোপার সন্ন্যাস অবলম্বনে বাধা দিতেছিলেন, তখনকার গোপার উত্তর অতুলনীয়। প্রকৃত আর্য্যনারী ভিন্ন অন্যত্র ইহা অসম্ভব:—

বনে বনে কিবা কঠোর সন্ন্যাস
সাধিবেন মম স্বামী।
বিলাস ভবনে এই বেদীমূলে
সাধিব সন্যাস আমি।

বুদ্ধদেবের উপদেশের ২।১ স্থল হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না:—

সুধা যদি ফলে গৃহ সাথে,
কে যায় খুঁজিতে তাহা বন বনান্তরে।
নাহি কামে সুখ ভূপ! বৃক্ষফল মত
হয় কাম বৃন্তচ্যুত, অস্পৃশ্য, গন্ধিত।
উড়াইয়া মানবের পরম মঙ্গল—
ঝটিকার মত কাম যায় মিশাইয়া,
করি দেহ জরাজীর্ণ, মৃত্যু কবলিত!

অন্যত্র—

কর্ম্মফলে জন্ম,

' কর্ম্ম ফল নাশের জন্ম ক্লেশ হবে দূর
জীবন সমুদ্র পার হবে ধর্ম্ম বলে।

যিনি বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক বলেন, তিনি ইহা গীতার কর্ম্মবাদের সহিত মিলাইয়া দেখুন, যে ভগবানের গীতোক্ত ধর্ম্ম ও গৌতমের ধর্ম্ম এক কিনা। কবিও প্রকারান্তরে দেখাইয়াছেন যে, গীতোক্ত ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের পার্থক্য অতি সামান্য। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে উহাতে বাহ্ স্বাতন্ত্র্য মাত্র ধারণ করিয়াছে।

আমাদের কবির হৃদয় অতি মহান। তিনি জগতে বিভিন্ন ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ঐশ্বরিক বিভূতি ভিন্ন কেহই নূতন ধর্ম্ম বিস্তার করিয়া জরা-জীর্ণ-গ্রস্ত মানব-হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিতে সমর্থ নহেন। সেই জন্য আমাদের উদার-হৃদয় নবীন কবি গাইয়াছেন :—

এসেছিলা তুমি
একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী,—
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল কঠোর।
আসিলে আবার তুমি কপিল নগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্যপাদ মূলে
দেখিয়াছি সেই লীলা আত্ম বিসর্জ্জন,—
রাজপুত্র মহাযোগী। আসিলে আবার
সরল মানব শিশু জর্দ্দানের তীরে,—
দেখিয়াছি সেই লীলা আত্ম-বলিদান।
আরবের মরুভূমে,অমৃত-নিঝর
আবার আসিলে তুমি * *
* * * আসিলে আবার
পতিতপাবনী তীরে পতিতপাবন
পাষাণ করিলে দ্রব প্রেম অশ্রু-জলে।

খ্রীষ্ট।

যদিও অজন্মা আমি অব্যয়াত্মা, সর্ব্বেশ্বর,
আপন্ মায়ার জন্ম আপন প্রকৃতি পর
যখন যখন ঘটে ভারত! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি।

যখন যেখানে ধর্ম্মে গ্লানি, তখন সেখানেই ভগবান কোন না কোন রূপে তাহার প্রতি-বিধান বা পুনঃধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ কবি সেই জন্যও খ্রীষ্ট জীবনী কাব্যাকারে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ,খ্রীষ্ট ও মহম্মদ, একই অভিপ্রায়ে জগতের বিভিন্ন দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া কাল ও পাত্রানুসারে বিভিন্ন উপায়ে ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছেন। সঙ্কীর্ণ-হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট জগতে বিভিন্ন ধর্ম্ম ; কিন্তু উদার বিশ্ব-জনীন ব্যক্তির নিকট জগতে একই ধর্ম্ম। ভগবানের একই শক্তি, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। কাজেই তাহার নিকট কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ ও মহম্মদ, একই ঐশ্বরিক শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। যাহাতে ভগবানের এই অবতারের ক্রিয়া ও কার্য্য বঙ্গ সন্তান সম্যকরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, কবিবর নবীনচন্দ্র সেই জন্যই খ্রীষ্টকাব্য লিখিয়া বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়াছেন এবং তাঁহার অনুগ্রহেই বঙ্গ সন্তান খ্রীষ্ট-চরিত পাঠ করিবার সহজ উপায় প্রাপ্ত হইয়াছে।

খ্রীষ্ট-কাব্য পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে খ্রীষ্টের উপদেশাবলী কি প্রকার সরল ও স্বাভাবিক ভাবে কবি বাঙ্গালা কবিতায় সন্নিবেশ করিয়াছেন, উহা ২।১ স্থল হইতে দেখাইয়া আমরা এই কাব্যের উপসংহার করিব।

না হ'লে তোমরা ক্ষুদ্র শিশুর মতন,
স্বর্গ রাজ্যে পারিবেনা পশিতে কখন।
যে হবে বিনীত এই শিশুর মতন,
সেই জন স্বর্গ রাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠতম।"
এরূপ একটী শিশু যে করে গ্রহণ
মম নামে, আমাকেও পাবে সেই জন।

আহা! যিনি মানব সন্তান শত্রুকর্তৃক শূলে আরোপিত হইয়াও ভগবানের নিকট, নিজ যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া গিয়া সেই অজ্ঞানদের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন, তিনি দেবতা নহেন তবে দেবতা কে?

দক্ষিণে ও বামে তাঁর তস্কর যুগল
দিল শূলে সেই সঙ্গে। নেত্র ছল ছল
"ক্ষমা কর" কহে চিত্ত চাহি উৰ্দ্ধ পানে
"কি করে ইঁহারা পিতঃ! কিছুই না জানে।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ভগবানের শ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত গীতার পরিচয় দিতে আমরা অসমর্থ। তবে ইহা বলিতে পারি যে, গীতার ন্যায় সর্ব্বকালের সার্ব্বজনীন বিজ্ঞানসম্মত ধর্ম্মপুস্তক আর দ্বিতীয় নাই। গীতা কোন সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নহে। চন্দ্র সূর্য্যাদির ন্যায় গীতাও সর্ব্বকালে সকল মানবের উপভোগ্য ও পালনীয়। কুরুক্ষেত্র রূপ সমুদ্রমন্থনের এই অমিয়ময় ফল। বৌদ্ধ বল, খ্রীষ্টান বল বা মুসলমান বল, ঐ সকলের ধর্ম্ম গীতোক্ত ধর্ম্মের অবান্তর মাত্র। ধর্ম্মও পাত্রানুসারে ইহাতে কিছু কিছু বিকৃতভাব ধারণ করিয়াছে, মাত্র। ভারতে গীতা প্রচারিত হওয়ার পর আর ভগবানের অবতারের আবশ্যক ছিল না। দুর্ভাগ্য ক্রমে ভারতবাসী গীতোক্ত ধর্ম্ম ভুলিয়া গেল। বৃথা যাগ যজ্ঞরূপ যন্ত্রে অবিরত হত্যাকার্য্য চলিতে লাগিল। সেই জন্যই ভগবানের বুদ্ধ অবতার। প্রকারান্তরে আবার গীতার প্রচার এবং মানব উদ্ধারের আবার পুরাতন পথের সংস্কার, কিন্তু জগতের কি নিয়তি। এখানে ধর্ম্মের পঙ্কিলতার অভাব হয় না। সেইজন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন মত শুনিতে পাই।

ভারতে এখন আর সংস্কৃতের সেরূপ আদর নাই। অনেকের নিকটই সংস্কৃত শ্লোক বুঝা সহজ নহে, অথচ গীতা সেই দেব ভাষায় গ্রথিত। সাধারণ লোকে কি সেই স্বর্গীয় বিমলসুধা পান করিবে না? কবির হৃদয় সেই জন্যই কাঁদিয়াছে; তিনি সেই জন্যই সাধারণের উপযোগী করিয়া অতি প্রাঞ্জল ও বিশদ কবিতায় গীতা প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ লোকে এখন গীতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে, আর হাত তুলিয়া ভগবানের নিকট অমর কবির আত্মার মঙ্গল জন্য প্রার্থনা করিবে। গীতা ইতঃপূর্ব্বে কয়েক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি গদ্যে ও এমন জটিল যে, সংস্কৃত অপেক্ষা কোন অংশে সরল নহে। কবি গীতা পদ্যাকারে অনুবাদ করিয়া সাধারণের যে উপকার করিয়াছেন, সে উপকার লোক-সাধারণ কখন ভুলিতে পারিবে না।

ভক্তপ্রাণ বাঙ্গালী এখন গীতা পড়িয়া প্রকৃত আর্য্যধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে ও উপধর্ম্ম সকল আপনা আপনি বিলুপ্ত হইবে, অপর সাধারণ প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসীও নিষ্কাম হইবে।

কোন মূল সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সাহিত্যকানন শোভিত করা অপেক্ষা অনুবাদ করাও কম আয়াসসাধ্য নহে। আর অনুবাদের অর্থের ও ভাবের কি যেন একটী দোষ থাকিয়া যায়। নবীন বাবুর অনুবাদে আমরা সে দোষ দেখিতে পাই না। ইহার অনেক স্থল পড়িতে পড়িতে মূল কি অনুবাদ পাঠ করিতেছি, তাহা অনেক সময় যেন বুঝিয়া উঠা যায় না। আমরা কয়েক স্থল উদ্ধৃত করতঃ পাঠককে উপহার দিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয় উপসংহার করিব।

অকূল পবিত্র, স্থির, অচঞ্চল,
সমুদ্র সলিল প্রবেশে যেমন ;
তেমতি কামনা প্রবেশে যাহাতে,
সেই পায় শান্তি, নহে কামী জন।

* * *

কিন্তু আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্তি যার,
আত্মাতে সন্তুষ্ট সদা, তার কার্য্য নাহি আর।

* *

সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিতে সাধন
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি
যুগে যুগে জনম গ্রহণ।

* * *

সাঙ্খ্যে পায় যেই স্থান, যোগেও সেখানে যায়,
অভিন্ন সাঙ্খ্য ও যোগ, যে দেখে সে দেখে তায়।

* * *

ব্রহ্মে সমর্পিয়া কর্ম্ম, নিষ্কাম যে কর্ম্ম রত ;
না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্ম পত্রে জল মত।

* * *

তোমার সহস্র করি নমস্কার
পুনঃ নমস্কার করি বহু বার
সম্মুখে পশ্চাতে করি নমস্কার,
সর্ব্ব দিকে, সর্ব্ব প্রণাম আবার।

শ্রীরন্তিনাথ মজুমদার।

প্রতিবিম্ব।

নিম্নশ্রেণীর প্রতি সমবেদনার কথা আজ কাল চতুর্দ্দিকে শুনা যাইতেছে। এই সমবেদনাটাকে একবার ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়। বিধাতা সহায় হউন।

এক সময়ে আমরা, ভারত-সভার একজন প্রতিনিধির সহিত মিলিত হইয়া, ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ সভায় যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সকল কথা শুনিয়া অতি দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—"এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে আমরা যদি মানুষ বলিয়া জানিতাম, তবে আমরা তাঁহাদের উপকার করিতে পারিতাম—কিন্তু আমরা ত তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া মনে করি না, আমরা তাহাদিগকে পশুর ন্যায় মনে করিয়া থাকি, মানুষের দ্বারা পশুর উন্নতি হইতে পারে কি?" এই কথা বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, দুনয়ন হইতে জলধারা বহিতেছিল, সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, দরিদ্রের প্রতি কি সমবেদনা! হায়, সেরূপ সমবেদনা এই বঙ্গে আর কুত্রাপিও দেখিতে পাই নাই!!

সেদিন একজন মহারাজা উপাধিধারী মাননীয় লোককে সালিস বরণ করার প্রস্তাব হইতেছিল, তিনি একজন মধ্যবর্ত্তী লোকের কথা শুনিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিলেন "যে জমিদার নয়, তাহার সহিত কিরূপে একাসনে বসিব?" কয়েকদিন পূর্ব্বে একজন কৃতবিদ্য ধনী ব্যারিষ্টার দরিদ্র

সুশিক্ষিত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "ঐ মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর লোকেরা ত পাখাটানা কুলী, তাঁহাদের কথা কে শুনিবে?" আর কিছুদিন পূর্ব্বে একজন লেখক গর্ব্ব করিয়া বলিতেছিলেন,—"ঐ সব লোকের কথা ছাড়িয়া দেও,তাহারা মাঠে ঘাস কাটুক—তাহারা আমাদের সম-আসনে কিরূপে বসিবে?" এইরূপ কত কত অহঙ্কারের কথা অলিতে গলিতে সর্ব্বত্রই শুনা গিয়া থাকে! দুই দশ দিনের জন্যই ভবলীলা—কিন্তু তারই মধ্যে মানুষের এত অহঙ্কার!! অবস্থাগত, জাতিগত, এবং জন্মগত আভিজাত্য এখন চতুর্দ্দিকে সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে। সেদিন, একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি একজন অনরেবল ব্যক্তির নিকট দুর্ভিক্ষের সাহায্য চাহিতে যাইয়া যেরূপে অপমানিত হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে হৃদকম্প উপস্থিত হয়। কত স্থানে কত জনের এইরূপ অপমানিত হওয়ার কথা শুনিয়াছি। মনে হয় যেন, এ যুগ কেবল অহঙ্কারের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে! ধনী নির্ধনকে, রাজা প্রজাকে, জ্ঞানী মূর্খকে, কৃতবিদ্য অশিক্ষিতকে,বুদ্ধিমান বোকাকে প্রতিনিয়ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন! নিম্নশ্রেণীর প্রতি সমবেদনা এযুগে কোথায় আশা করিবে? এযুগ আভিজাত্যের যুগ,--ডিমোক্রেসি রসাতলে চিরনিমগ্ন হইয়াছে। চির-স্বাধীনতার উপাসক ইংলণ্ডও আজ আভিজাত্যের পরিপোষক, তাই আজ লর্ডসভার দিগ্বিজয়ী প্রতাপ,—চাহিয়া দেখ, গ্লাডোষ্টোনের দিগ্বিজয়ী চেলা মর্লিও আজ আভিজাত্যের দাসানুদাস; নচেৎ ভারতসংস্কার-আইনে জমীদারশ্রেণীর প্রতি এত সানুগ্রহ-দৃষ্টি থাকিত না। দুগ্ধপোষ্য শিশুও আজ কাল অনরেবল! ইংলণ্ডে আভিজাত্যের জয়,ভারতেও আভিজাত্যের জয়,এদেশ, সে দেশ, রুসিয়া, জর্ম্মণী, আমেরিকা, জাপান সর্ব্বত্রই শ্রীবস্থাপন্নের জয় জয়কার! চতুর্দ্দিকে ঘন-রব কেবল টাকা,টাকা, টাকা! লাট বেলাটের সকল আফিস ও সকল কাউন্সিলেই এখন আভিজাত্যের কোলাকুলি, অথবা পা-চাটার দলের জয় জয়কার! এহেন যুগেও যে নিম্ন শ্রেণীর প্রতি সমবেদনার কথা শুনিতেছি, উহা কিরূপ? কথাটা বাতুলের প্রলাপ নয় ত?

মধ্যে মধ্যে শুনিয়া থাকি, অমুক ব্যক্তি বড় দয়ালু। দয়া শব্দ যখন ভগবানে প্রযুজ্য, তখন উহা স্বর্গের মন্দাকিনী; যখন মানবে প্রযুজ্য, তখন দানব-লীলার ভ্রুকুটী! দয়াময় কেবল বিধাতা, মানবে ঐ কথা শোভা পায় না। মানবে প্রযুজ্য দয়া শব্দটা শুনিতে যত মিষ্ট, কাজে কিছুতেই তত মিষ্ট নয়। মানব সকলেই সমাবস্থাপন্ন; সৃষ্টির বৈচিত্র্য কেবল নয়নের ভেল্‌কি, বড় ছোট সব সমান, কেহ এক বিষয়ে বড়, কেহ অন্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। মোটের উপর—সব সমান। সমান আবার সমানকে কি দয়া করিবে? দয়ার মধ্যে সর্ব্বদা একটু বাহাদুরী-বিষ লুক্কায়িত থাকে, সে যেন লুকাইয়া লুকাইয়া অহঙ্কারকে সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করে। সে বলে "দেখ, আমার কত প্রজা, আমি কতজনকে খাইতে দেই, কত মানুষকে রক্ষা করি। ইত্যাদি ইত্যাদি!!!" তুমি যত বড় দরিদ্রের সেবকই হও না কেন, তুমি দয়ার কথা ভুলিয়া কখনও কর্ত্তব্যের কথা ভাবিতে পারিয়াছি কি? কখনও দয়ার অতীত রাজ্যে উঠিতে পারিয়াছ কি? তিনি, তিনি ধনী লোক, যদি দরিদ্রের সহিত কথা বলেন, বা সম আসনে বসেন, বা একদিনও দরিদ্রকে খাইতে দেন, তিনি ভাবেন এবং লোকেরা বলে, তাঁহার কত দয়া গো! তিনি,

তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি, একদিনও যদি কাঙ্গাল-দিগকে একটু শিক্ষা দেন, কত প্রকারে তাঁহার দয়ার কথা, তাহার নিজের বা তাহার দলের লোকের দ্বারা, সংবাদ পত্রে ঘোষিত হয়! অথবা তিনি, তিনি ধর্ম্মপ্রচারক, তিনি যদি দরিদ্রের গৃহে গমন করিয়া একটু ধর্ম্মোপদেশ দেন, কত রূপে তাঁহার সম্মান চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। এই জগৎটা যেন "পরময়"—পরের উপকার মহা ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত। তাঁহারা বলেন, পরের উপকার সাধন দয়ার প্রকট মূর্ত্তি। কিন্তু দয়ার ভিতরে লুক্কায়িত কি, জান কি? উহার ভিতরে লুক্কায়িত অহঙ্কারের সুষুপ্ত মূর্ত্তি। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীতে যত কথাই শুন না কেন, দয়ার মত আর মিষ্ট কথা শুনিতে পাইবে না। কিন্তু ৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "শরচ্চন্দ্রে"র বিন্ধ্য-বাসিনী ও নীরদার কথা পাঠক একবার মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

"বিন্ধ্যবাসিনী বলিলেন, নীর! তুমি কাকে অধিক ভালবাস?

নীরদা। আমার হৃদয়কে।

বিন্ধ্যবাসিনী। তবে তুমি স্বার্থপর ব্রত অবলম্বন করিয়াছ; এ সংসারে পরকে যে মন না দিল, তার আবার ভালবাসা কি?

নীরদা। তুমি পরোপকারের কথা বলি-তেছ? আমি পর কি, তাহা জানি না, পরের উপকার আবার কি? আমি জানি, বিশ্বাস করি, আমার যাহা, তাহাতেই আমার মমতা, তাহাতেই আমার ভালবাসা। আমার ঈশ্বর, আমার হৃদয়, আমার জগৎ, আমার সকল। আমার যাহা, তাহাকেই ভালবাসি; আর যাহা পর, তাহাকে হৃদয়েও স্থান দেই না।

বিন্ধ্যবাসিনী।—আপনার জন্য সমস্ত সংসা-রই ব্যস্ত, যদি পরের উপকার না করিলে, তবে তুমি আর মানুষ কি? তবে তুমি স্বার্থ-পর—পশু।

নীরদা। বল না চারু! কিন্তু ভেবে দেখত কে স্বার্থপরের ন্যায় কথা বলিতেছে? তুমি 'অন্যকে পর ভাবিয়া উপকার করিতে' বল, আমি আপনার ভাবিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে চাই। এ সংসারে সকল মমতাই আপনার জন্য। যাহারা পর পর করিয়া অস্থির, তাহারা মনের সহিত কাহারও উপকার করে না, তবে যশোলিপ্সা, আত্ম-গৌরব ও সম্মান প্রাপ্তির আশায় পরোপকার ব্রত গ্রহণ করে।" ইত্যাদি।

যাহারা পর ভাবিয়া জগতের সেবা করিতে যান, নীরদা বলেন, তাহারা যশোলিপ্সার দ্বারা চালিত। কথাটা এই সুদীর্ঘকাল পরেও প্রণিধানের যোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। মনে হইতেছে—জগতের সহিত আমি যদি একাত্মক না হইতে পারি, জগতের সেবা আমার পক্ষে যশোমন্দিরে যাওয়ার সোপান মাত্র। আমি ও জীবপ্রবাহ কি একাত্মক হইতে পারিব না? আমি কি জগতে ডুবিতে পারিব না?

এই ভারতে ত্রিশকোটী লোকের বাস, তন্মধ্যে ২০ কোটী হিন্দু। এই ২০ কোটী লোকের মধ্যে ৫॥ কোটী অস্পৃশ্য! মানুষ মানুষকে স্পর্শ করিলে জাতি যায়, এরূপ কথা পৃথিবীর আর কোথাও শুনা যায় না!! এই অস্পৃশ্য শ্রেণীকে তুলিতে এপর্য্যন্ত কেবল খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা এপর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। কিন্তু আমরা শিক্ষিত শ্রেণী, শিক্ষার আলোক পাইয়াও তাহাদের প্রতি চির উদাসীন। প্রকারান্তরে তাহাদিগকে নিপীড়ন করিতে একদিনের জন্যও ছাড়ি না! এই ত দেশের অবস্থা। তাহারা না জাগিলেও

দেশে জাগিবে, যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কি ভ্রান্ত! সর্ব্বপ্রকার আভিজাত্যের নিষ্পেষণে, হায়, তাহারা চিরমৃতবৎ!!

সাধকেরা বলেন, মানবের কর্ত্তব্য ত্রিবিধ,—ঈশ্বরের প্রতি, নিজের প্রতি, জগতের প্রতি? আমরা বলি, কর্ত্তব্য একবিধ। মানবের কর্ত্তব্য সকল ঘনীভূত কেবল—নিজত্বে। আমার অস্তিত্ব ভিন্ন সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা প্রকৃতির অস্তিত্ব কোথায়? আমার নিজত্ব ভিন্ন—ঈশ্বরের অস্তিত্বের বা পরিচয় কোথায়? আমিই তাঁহার প্রত্যক্ষ মন্দির,—আত্মার মূলে পরমাত্মা। আমার আমিত্ব ভিন্ন পৃথক জগতের অস্তিত্ব আর কোথায়? আমিই পরমাত্মার সার-চুম্বক, আমিই জগতের সার-চুম্বক। তাঁহার প্রতিবিম্ব আমাতে, আমার প্রতিবিম্ব জগতে—অথবা জল-স্থলময় জগৎ ব্যাপিয়া কেবল একেরই লীলা! এক ভিন্ন দুই যে কল্পনা করে, সে সাধনার রাজ্য হইতে এখনও বহু দূরে অবস্থিত,—সে দর্শন বিজ্ঞানের সার জ্ঞানে এখনও দীক্ষিত হইতে পারে নাই। বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে যে "একতা" না দেখিতে পায়, তাহার সাধনা মহা ভণ্ডামী। অনন্তরূপিণী অনন্ত প্রকৃতিতে প্রস্ফুটিতা। অথবা সুজলা-সুফল-শস্যশ্যামলা প্রকৃতি তাঁহারই রূপান্তর; আর এই যে ধরার নরনারী, অথবা জীব-প্রবাহ, ইহাও সেই অনন্ত রূপেরই বিবৃতি। দৈব দানব, যক্ষ রক্ষ, কীট পতঙ্গ, পশু পক্ষী—সকল ব্যাপিয়া একই শক্তি। মূলাধার, সূক্ষ্মাধার রূপে সকল ব্যাপিয়া কেবল এক মহাশক্তির প্রবাহ। এমারসন কার্লাইল বলেন, ফোর্স, স্পেন্সার বলেন, দুজ্ঞেয় শক্তি; বার্কলি বলেন, মায়া; পাতঞ্জল বলেন—লীলযোগ; বাইবেল বলেন, প্রতিবিম্ব; গীতা বলেন, চিদাভাস; বেদান্ত বলেন, কূটস্থছায়া; তন্ত্র বলেন, সর্ব্বভূতাত্মা,—কত শাস্ত্রে কত ব্যাখ্যা, কত পণ্ডিতের কত কথা;—কিন্তু সব মিলিয়া গিয়াছে—ত্রিবেণীতে,—যেখানে এক বস্তু ভিন্ন দুই নাই। একের লীলা, একের খেলা, একের রাজ্য, একের ধাম,—সব মিলিয়া সেই একই। তুমি যত বড় পণ্ডিতই হওনা কেন, এক ভিন্ন দুই কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারিবে না। সেই এক—সচ্চিদানন্দময় মহাশক্তি। সেই মহাশক্তি, সেই আদ্যাশক্তিকে কোটী কোটী প্রণাম।

এখন, এই বার্দ্ধক্যে যাই কোথায় এবং করি কি? এখন সকল স্থান ও কাল এবং সকল কাজ সংক্ষিপ্ত হইয়া আত্মার মূলে ঘনীভূত হইতেছে। কে যেন বলিতেছে,—"তস্মিন প্রীতি এবং তস্য প্রিয় কার্য্য॥" অথবা "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথাকরোমি"। সব ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া এক সীমায় উপনীত—কেবল তাঁহার সেবা!! দয়া বুঝি না, ধর্ম্ম বুঝি না, নীতি বুঝি না, সেবা বুঝি না, বুঝি কেবল তাঁহার আদেশ পালন ও তাঁহার সেবা।

তাঁহার সেবা?—কিন্তু কোথায় তিনি? তিনি আত্মাময়, তিনি জগন্ময়। আত্মার মূলে, প্রকৃতির মূলে, এবং জগতের মূলে তাঁহাকে দেখ, এবং তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া নিষ্কামভাবে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই—দয়া নাই, মায়া নাই, সুখ শান্তি নাই, গতি নাই, মুক্তি নাই। তাঁহাতে ডুবিয়া মজিয়া যাও, সকল দয়া ও সেবা-ধর্ম্ম মিলিয়া তোমাকে এক অহেতুকী কর্ত্তব্যের পথে চালিত করিবে। দেখিবে—এ রাজ্যে বড় ছোট, ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, এরূপ কোন ভেদ নাই—সকলের

অন্তরাত্মারূপে কেবল তিনিই বিদ্যমান। অনন্তরূপ, বিশেষত্বময় অনন্ত প্রকৃতিতে প্রস্ফুট। তখন পরশ্রীকাতরতা বিলুপ্ত হইবে, তখন অন্যের উন্নতিতে চিত্তে বিমল আনন্দ পাইবে, অন্যের বিপদে ও দুঃখে প্রাণ অস্থির হইবে। তখন বুঝিতে পারিবে—তুমি সকলের অঙ্গীভূত হইয়াছ—সব পরিবার যেন তোমার পরিবার। তাঁহার সূর্য্য যেমন সকলের ঘরে কিরণ দেয়, তাঁহার জল যেমন অবিভেদে সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি, তিনি সকলের অন্তরাত্মা হইয়া বিদ্যমান। সর্ব্ব ঘটে তাঁহাকে যদি দেখিতে পাও, তবে কাহারও প্রতি একটু দয়া করিয়াছ বলিয়া তোমার আর অভিমান হইবে না, বুঝিবে, যাহা কর্ত্তব্য, যাহা তাঁহার আদেশ, কেবল তাহাই করিয়াছ; আর কিছুই নয়। তখন বুঝিবে, তুমিও যাঁহার, ঐ অস্পৃশ্য পেরিয়া ও চণ্ডালও তাঁহারই, অতএব তখন আর ঘৃণা বিদ্বেষ থাকিবে না। তখন সর্ব্বঘটে এক জাগরিত মহাশক্তি দেখিয়া মোহিত হইবে। অথবা তখন বুঝিবে, তোমারও আর পৃথক অস্তিত্ব নাই—তাহা অনন্ত জন-সঙ্ঘে একীভূত হইয়া গিয়াছে—তুমি ও জগৎ একাত্মক হইয়া গিয়াছ। দ্বৈতাদ্বৈত একাকার। এই নির্ব্বিকল্প সাধন ভিন্ন জীবের কিছুতেই মুক্তি নাই।

তুমি কি ছাই আয়োজন করিয়াছ?—দিন ত যাইতেছে—অবিরত যাইতেছে,কোন বাধা মানিতেছে না। আত্মন, তোমাকে সানুনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি আয়োজন করিয়াছ? মনে হইতেছে,এতদিনের সকল আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, কেননা, আত্মজ্ঞানের মূলে যে চিন্ময় জ্ঞান,জগতের জ্ঞানের মূলে যে চিদাভাস—সেই জ্ঞান এবং সেই চিদাভাসের গাম্ভীর্য্য এখনও তোমার তাদৃশ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। পরসেবা ভগবানেরই সেবা, পরসেবা আপনারই সেবা,এই সংজ্ঞানে দীক্ষালাভ না হইলে কিছুতেই কিছু হইল না, মনে রাখিবে। যদি নব জন্ম পাইতাম, তবে আজ হইতে জগন্ময়-ব্যাপ্ত শক্তির সেবায় প্রবৃত্ত হইতাম; কিন্তু এখন যে যাওয়ার দিন নিকটবর্ত্তী! হায়, এখন করি কি?

এখন ইচ্ছা হয় যে, একবার জগতে ডুবিয়া যাই;—আত্মপর-ভেদ-রহিত যে অহেতুকী চিন্ময়রাজ্য—সেই রাজ্যে প্রবেশ করি। কিন্তু কে জানে কবে তাহা সম্ভব হইবে?

পরোপকারের কথা, এখন নীরদার ন্যায় আর আমাদের ভাল লাগে না। তাঁহার প্রতিবিম্ব সর্ব্বঘটে, তাহা দেখিয়া যদি আমরা কাঙ্গাল ভাইদের প্রাণে মিলিতে না পারিলাম, তবে আর কি হইল? বৃথা ভণ্ডামীর কথা ভাই তুমি আর আমাকে বুক ফুলাইয়া বলিও না। তোমার ঐ সমবেদনা, ঐ দয়া কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দেও। গরীব কাঙ্গালগণ চির উপেক্ষিত ও চির নিষ্পেষিত হইয়াই চলিতে থাকুক। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, একদিন এমন আসিবে, যেদিন ঐ ঘৃণিত ভ্রাতারাও তোমাদিগের উপরে উঠিতে পারিবেন; এমন দিন আসিবে, যে দিন সকল আভিজাত্যের পরাজয় হইবে—এবং সর্ব্ব ঘটে তাঁহারই অপ্রতিদ্বন্দ্বী "প্রতিবিম্ব" জাগিয়া উঠিবে। মানুষ তখন বড় ছোট সব ভাই একাত্মক হইয়া গাইবে—জয় বিশ্বপতির জয়। তখন জাতীয় একতা স্বর্গ হইতে অবতরণ করিবে—অহংকারের রাজত্ব ধ্বংস হইবে—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা জয়যুক্ত হইবে। সেই দিনের অপেক্ষায়ই জীবন ধারণ করিতেছি।

২৩শে পৌষ, ১৩১৬।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৫৭। কনক-কুসুম। শ্রীপ্রভাবতী সেন কর্ত্তৃক প্রণীত, ঢাকা গেণ্ডারিয়া প্রেস। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৪৯ কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সুমিষ্ট পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইলাম;—একটু নমুনা দিলাম—

কুসুমটিরে হৃদে ধরি
চেয়ে থাকি চাঁদের পানে
তুলনা করি সুনীলাকাশে
চাঁদের সাথে আপন প্রাণে।
কোন্ মুখটি মধুর বেশী
কোন্ মুখ-কমল হাসি ভরা।
কোন হাসিতে প্রাণটি ভাসে,
কোন হাসি মোর হৃদয় হরা।

বিশেষ গুণ এই—স্বদেশী কাগজে ছাপা। স্ত্রীশিক্ষার উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে দেখিয়া ধন্য হইলাম।

৫৮। সারস্বত-কুঞ্জ। গদ্য সাহিত্য। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, এম-আর-এ-এস। দ্বিজেন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু, ভূদেব, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, প্যারীচাঁদ, ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি অমর লেখকগণের প্রতিমূর্ত্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর সমালোচনা। পুস্তকখানি সুন্দর ও সুমিষ্ট হইয়াছে।

৫৯। রূপ-সনাতন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি-এ, এল-এম-এস প্রণীত, মূল্য ১৷৷০। থিয়েটারি বাঙ্গালায় নাটকাকারে লিখিত। এরূপ ভাষার আমরা পক্ষপাতী নহি,—তদুপরি বিলাতী কাগজে ছাপা। সুরেন্দ্র বাবুর ন্যায় সুশিক্ষিত, সাধু ভক্তের হাতে যেরূপ আশা করা যায়, সেরূপ জিনিস না পাইয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

৬০। উপসর্গ। গ্রন্থকারের নাম নাই, মূল্য ৷৷০। সমাজের কয়েকটী উপসর্গের কথা সরল ভাষায় নিরপেক্ষ ভাবে লিখিত। লেখক চিন্তাশীল এবং সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ। এ পুস্তকের আদর হইলে আমরা সুখী হইব। বিলাতী কাগজে ছাপা না হইলে কত সুন্দর হইত!

৬১। রমাবতী। বিয়োগান্ত নাটক। শ্রীমহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ৷৷৵০। বড় ঘরের ছেলে এমন সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতে পারেন, কল্পনাও করিতে পারি নাই। গ্রন্থকার আপন হৃদয়ের সুন্দর ছবিখানি এই পুস্তকে ঢালিয়া দিয়াছেন। শান্তশীলের আদর্শ চিত্র—পড়িতে পড়িতে ভক্তিভরে প্রাণ পূর্ণ হয়। রমাবতী হিন্দুরাণীর আদর্শস্থানীয়া; দীনুর চরিত্রও সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকের গানগুলি বড়ই সুমিষ্ট। পুস্তকের ভাষা অতি সুন্দর। পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তি পাইলাম।

৬২। গুরুগোবিন্দ সিংহ। শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৵০। শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনবৃত্তান্ত। ভারতবর্ষের অমূল্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা। যদি এ ভারত কখনও জাগে, তবে এইরূপ জীবনের আদর্শেই জাগিবে। গ্রন্থকার এই সুন্দর জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। ভাষা ও বর্ণন-প্রণালী বিশেষ মনোযোগের বিষয়। পুস্তকখানি ঘরে ঘরে আদৃত হউক।

৬৩। Keshab Chandra Sen on British rule in India. মহাজনের অমূল্য উপদেশ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই উপদেশ অনুসারে চলা সঙ্গত কিনা, বিশেষ চিন্তার বিষয়। রাজা অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ হইলে তাহা সংশোধনের উপায় কি? সংশোধন অসম্ভব হইলে কি কর্ত্তব্য? এ সকল বিষয় সম্বন্ধে কোন মীমাংসা এই পুস্তকে নাই, কেবল dogmatical কথার অভিব্যক্তি।

৬৪। শিবাজী ও মারাঠা জাতি। শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত, মূল্য ॥০। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সহিত। এই পুস্তকের ভূমিকা লেখার কোন প্রয়োজন ছিল না,—যাঁহারা এইরূপ ভূমিকা লেখান তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভাল নয়, যাঁহারা লেখেন, তাঁহাদেরও রুচি মার্জ্জিত নয়। এই পুস্তকখানি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ইহাতে যে বিষয় বিবৃত হইয়াছে,তাহা এ জাতির পক্ষে কখনই উপহাসের যোগ্য নয়। বর্গীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা এদেশের প্রতিজনের কর্ত্তব্য বলিয়া এদেশে পরিকীর্ত্তিত। এই ঘৃণা পরিহারের একমাত্র উপায় মারাঠা জাতির মহত্ব কীর্ত্তন। গ্রন্থকার এই কার্য্য করিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। স্বদেশী কাগজে পুস্তকখানি মুদ্রিত। পুস্তকখানি সুলিখিত।

৬৫। কাব্য-কণা। শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত,মূল্য ॥০। নানা বিষয়ক কবিতা পুস্তক। সকলগুলি সুন্দর না হইলেও একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মধ্যে মধ্যে এক একটী কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছে। কয়েকটী কবিতা বাদ দিলেই ভাল হইত।

৬৬। কল্প-কথা। শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মূল্য ॥০। জাপানী গল্পের ভাব লইয়া লিখিত। ক্ষুদ্র২ গল্প। বৈরাগ্য, এত অল্পকথায়, এরূপ গভীর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, পড়িয়া অবাক্ হইতে হয়। মণিলাল বাবুর লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে। সুন্দর সুন্দর কথা,সুললিত ভাষায় লিখিত।

৬৭। A Manual of Bengali Composition and model essays: রচনাপদ্ধতি। As. 12, by Joy Gopal Kaviratna.

পদ প্রকরণ,বাক্য প্রকরণ,অনুচ্ছেদ,প্রবন্ধমালা, ইতিবৃত্ত, পর্য্যালোচনা প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। পাঠার্থীগণের বিশেষ উপকারে আসিবে বলিয়া মনে করি। পাকা হাতের পাকা লেখা। সুমিষ্ট এবং সুলিখিত। রুচি মার্জ্জিত। স্বদেশী কাগজ।

৬৮। প্রভাবতী। কবিরাজ শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায় প্রণীত। মূল্য ৵০। সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। সংক্ষিপ্ত কথায় প্রভাবতীর জীবন সুন্দর ফুটিয়াছে। পড়িয়া বড় ক্লেশ পাইলাম। স্বদেশী কাগজ।

৬৯। চিন্তালহরী। শ্রীহরিদাস বসু প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ⁄০। ১৫টী ক্ষুদ্র২ কবিতা। সচরাচর যেরূপ লেখা বাহির হইয়া থাকে, ইহাও সেই প্রকার। কোন বিশেষত্ব নাই। স্বদেশী কাগজ।

৭০। তমালী। মহাভারত-নাট্যকাব্য-প্রণেতা ৺প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত। মূল্য ১৲। পৌরাণিক নাটক গদ্য ও পদ্যে লিখিত। স্বর্গীয় মহাজনের অক্ষয়কীর্ত্তি। এই পুস্তক বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিবে। স্বদেশী কাগজ।

৭১। জামাই জাঙ্গাল। শ্রীযোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় বিরচিত, মূল্য ৸০। ৬টী ছোট ছোট গল্প। পাকা হাতের পাকা বিবৃতি, সরল এবং মিষ্ট ভাষায় গল্প কয়েকটী বেশ। স্বদেশী কাগজ।

মৌনীবাবা।*

(পরিশিষ্ট)

আমরা ইতিপূর্ব্বে মৌনীবাবার জীবন আলোচনা করিয়া ইহাই বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি দীন এবং শান্ত সাধক ছিলেন; উৎসাহী ও উদ্যমশীল প্রচারক ছিলেন না। আত্মগোপনই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, আত্মপ্রকাশে তিনি সর্ব্বদা সঙ্কুচিত ছিলেন। আপনার ক্ষমতা ও গৌরব যে কিছু আছে, তাহা তিনি জানিতেনই না। আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও হীন জ্ঞান করিতেন, অপরকে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেন। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে প্রচারোৎসাহ স্বাভাবিক নহে।

সচরাচর দুই শ্রেণীর লোককে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইতে দেখা যায়। কতিপয় ক্ষণজন্মা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি, ঈশ্বরের আদেশ লাভ করিয়া মানব-সেবায় জীবন অর্পণ করেন, নিজের ইচ্ছা কিছুই রাখেন না; আর এক শ্রেণীর উৎসাহী ও আত্মপ্রভাবশীল লোক, যাঁহারা সংসারের লোকের পাপ ভ্রষ্টাচার দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন না, স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্যকে তাহাদের উদ্ধার সাধনে নিযুক্ত করেন। দেব-প্রসাদই প্রথম শ্রেণীর সম্বল, দ্বিতীয় শ্রেণী আত্মপ্রভাবকে প্রধান রূপে অবলম্বন করেন। ইঁহারাও ঈশ্বরবিশ্বাসী ও সরলচিত্ত,তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু কার্য্যগত জীবনে উভয় শ্রেণীর পার্থক্য প্রকাশ হইয়া পড়ে ও এই পার্থক্যের উপর ফলাফল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এ সত্য সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যায়।

মৌনীবাবার আত্মপ্রভাব মাত্রও ছিল না। তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার দ্বারা তাঁহার প্রভু কি কার্য্য করাইয়া লইতেছেন। ভগবানের হস্তের যন্ত্রের ন্যায় চিরদিনই চলিয়াছেন। যাঁহারা অনেক বলিলেন, তাঁহাদের অনেক কথাই যেন নিষ্ফল হইয়া গেল, যিনি মৌনী রহিলেন, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য অসম্ভব জনতা হইল! মৌনীবাবার জীবন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে—কথা না বলার কি মহতী শক্তি! আমরা আত্মার শক্তিতে বেশী আস্থা স্থাপন করিতে শিখি নাই বলিয়াই, বোধ হয়, বাক্যের শক্তির উপর বেশী নির্ভর করিতে যাই—তাই অনেক সময় বৃথা বাক্যব্যয় মাত্র হইয়া যায়। ওঁকারনাথে প্রতিদিন অপরাহ্ণে মৌনীবাবার দর্শনার্থী বহু লোক সমবেত হইতেন, প্রতি একাদশী তিথিতে অপরাহ্ণে সহরের অধিকাংশ লোক মৌনীবাবাকে দর্শন করিয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন, পর্ব্বোপলক্ষে সহস্রলোক—মহারাজা হইতে দীনতম ভিখারী পর্য্যন্ত—তাঁহার দর্শনাশায় উপস্থিত থাকিতেন। ইহা নীরব প্রচার—জীবন দ্বারা প্রচার। মৌনীবাবার

* ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় সংখ্যার নব্যভারতে মৌনীবাবার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইবার পর কতিপয় বন্ধুর নিকট হইতে তাঁহার জীবনের কয়েকটী ঘটনা জ্ঞাত হইয়াছি। এবার আমার একজন আত্মীয়ের পুরাতন চিঠির ফাইলে মৌনীবাবার কনিষ্ঠের নিকট লিখিত একখানি সুদীর্ঘ পত্র এবং একখানি পত্রাংশ ও একখানি কার্ড পাইয়াছি। সেই সকল অবলম্বন করিয়া পরিশিষ্ট লিখিত হইল।

জীবনের চিত্র আমরা ভাল করিয়া আঁকিতে পারি নাই। কিন্তু সেই অসম্পূর্ণ চিত্র নব্য-ভারতে প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল যে, বৃদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্ম, প্রবীণ ব্রাহ্ম সাধক, অনেক ধর্ম্মপ্রাণ যুবক ব্রাহ্ম তাহা পড়িয়া উৎসাহিত ও উপকৃত হইয়াছেন। অনেক পূজনীয় সাধুর আশীর্ব্বাদ প্রসাদে লেখিকা কৃতার্থ হইয়াছে।

শুধু কি ব্রাহ্মেরাই মৌনীবাবাকে গ্রহণ করিয়াছেন? তাহা নহে। মৌনীবাবা শেষ অবস্থায় সকল গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিয়া মুক্ত ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সকলকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিতে পারিয়া-ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিয়া অনেক ভক্ত হিন্দুর হৃদয়ও উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কতজন তাঁহার বিস্তৃত জীবনী গ্রন্থকারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। একজন হিন্দু সাধু বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মসমাজ বাবুদের সমাজ বলিয়া লোকে অযথা নিন্দা করিয়া থাকে; যে সমাজ মৌনীবাবার ন্যায় সাধু পুরুষকে প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে, সে সমাজ ধন্য! মৌনীবাবার জীবন পড়িয়া আমি ব্রাহ্ম-সমাজকে সমধিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখিলাম।"

আমরা ইহাকেই মৌনীবাবার নীরব প্রচারের ফল বলিয়া গণনা করিতেছি। সংসারী মানুষ সংসারাতীত কিছু দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে। আর সকলকে বিষয়ীর চক্ষু উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু যখন দেখে যে তাহাদেরই মত একজন বিষয়কে পায়ে ঠেলিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অপরিচিত ব্রহ্ম-প্রেমে মগ্ন হইলেন, তখন ক্ষণকালের জন্যও

সকল দেশে ও সকল কালে এইরূপ ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মৌনীবাবার জীব-নেও তাহাই দেখিতেছি।

উত্তরবঙ্গে বাসকালে বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর পাইলেই মৌনীবাবা ঐ প্রদেশের ব্রাহ্মপরিবার ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর সঙ্গে আগ্রহের সহিত মিলিত হইতেন। বগুড়ায় কোন পরিবারে আকস্মিক বিপদপাত হইয়াছে, মৌনীবাবা তথায় উপস্থিত; রংপুরে কোন বন্ধু বিশেষ পরীক্ষায় পতিত, মৌনীবাবা তাঁহার পার্শ্বে; উৎসবে, অনুষ্ঠানে সকল বন্ধুই মৌনীবাবাকে আগ্রহের সহিত চাহি-তেন। তিনিও তাঁহাদের সহিত মিলিবার জন্য সময় করিয়া লইতেন। তাঁহার সঙ্গ-লাভের জন্য উত্তরবঙ্গের ব্রাহ্মগণ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গের প্রভাব তাঁহারা এখনও স্বীকার করেন।

মৌনীবাবা রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ী, সৈদপুর, নিলফামারী, শিলি-গুড়ী, কুড়িগ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গমন করিতেন। তিনি যে শুধু মুখে উপদেশ দিতেন, তাহা নহে, বিপদে, দুঃখে, শোকে আত্মীয়ের ন্যায় সকলের সহিত ব্যবহার করি-তেন। একবার ছয় মাসের অবসর লইয়া ব্রাহ্মপ্রচারক পূজনীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত তিনি কাশী অঞ্চলে গমন করেন। এই সময়েই গোস্বামীদেবের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল।

বাগআঁচড়ায় ধর্ম্মপ্রচারার্থ লোক পাওয়া যাইতেছে না, ইহা কাগজে পড়িয়া মৌনীবাবা কার্য্য হইতে বিদায় লইয়া ৫।৬ মাসের জন্য সেখানে গমন করেন। দুঃস্থ পরিবারের শিক্ষাবঞ্চিত বালক বালিকাদের জন্য তিনি

ছিলেন; পল্লীতে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেখানে সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। এখনও বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা ভক্তির সহিত তাঁহাকে স্মরণ করেন।

কিন্তু এইরূপ প্রচারে তাঁহার আত্মা পরিতৃপ্ত হইল না। অনুক্ষণ ভগবৎ সঙ্গলাভের জন্ত তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল এবং এইরূপ নিত্যযুক্ত অবস্থালাভের পূর্ব্বে প্রচার করাকে তিনি গুরুতর আত্মবিনাশের কার্য্য বলিয়া অনুভব করিলেন। তিনি বলিতেন—"আগে অধিকারী হই।"

সম্প্রতি গয়ায় এক সিদ্ধ পুরুষকে দর্শন করিতে যাইয়া তাঁহার নিকটেও এইরূপ কথাই শুনিয়াছি। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বলিলেন, পূর্ব্ব দিন তাঁহার নিকটে ৪ জন ইউরোপীয় থিয়সফিষ্ট আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন গয়াতে বক্তৃতা দান করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া সিদ্ধপুরুষ বলিলেন, "আপনি ভাল কাজ করেন নাই। এই বক্তৃতা দ্বারা আপনার এবং শ্রোতাদের অনিষ্ট করা হইয়াছে।" বক্তা মহাশয় সঙ্কুচিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন এরূপ বলিতেছেন?" সিদ্ধপুরুষ উত্তর করিলেন—"আপনি এখনও অনধিকারী। অনধিকারীর পক্ষে উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করা বিপজ্জনক। জ্ঞানলাভ করিয়া উপদেশ দিলে লোকের উপকার হইবে, আপনারও উপকার হইবে।" মৌনীবাবাও তাঁহার কনিষ্ঠের প্রচারব্রত গ্রহণের সংবাদ পাইয়া এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন।

মৌনীবাবার একজন বিশেষ বন্ধু নব্যভারতে বাবার জীবনচরিত প্রকাশিত হইবার পরে এই ঘটনাটী আমাদিগকে জানাইয়াছেন। মৌনীবাবার সঙ্গলাভের জন্ত তিনি কিছু দিন সপ্তপুষ্করিণীতে মৌনীবাবার গৃহে বাস করিয়াছিলেন। মৌনীবাবা প্রতিদিন প্রাতে নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া দন্ত ধাবন করিতেন। এক দিন ডাল ভাঙ্গিতে গিয়া আর ডাল ভাঙ্গা হইল না। ইহা দেখিয়া বন্ধু তাঁহার এরূপ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, সব দিন তো মন জাগ্রত থাকে না—আজ তিনি বৃক্ষের মধ্যে আত্ম-রক্ষণ-চেষ্টা দেখিতে পাইয়াছেন। তাহাতেও চৈতন্ত আছে; প্রতি দিন যে তিনি নধর ডালখানি ভাঙ্গিয়া লন, ইহাতে সে বেদনা বোধ করে। সেই হইতে মৌনীবাবা আর দাঁতন ব্যবহার করেন নাই।

তপস্যায় যাত্রার পূর্ব্বে তিনি কিছুকাল নলহাটিতে ভ্রাতৃগৃহে বাস করিয়াছিলেন। যাত্রার দিন বাড়ীর ময়লা পরিষ্কারকারিণী (মেথরাণী) যখন ময়লা পরিষ্কার করিতে আসিল, মৌনীবাবা ধীরে ধীরে তাহাকে ডাকিলেন। মেথরাণী নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন,—"তুমি আমার মা। শিশুকালে মা স্বহস্তে মল মূত্র পরিষ্কার করিতেন; এত দিন তুমি আমার সেই কার্য্য করিলে—তুমি আমার মা। আমি তপস্যায় যাইতেছি—তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন সিদ্ধিলাভ করিতে পারি। তোমার আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আমার সাধনা সফল হইবে না।" এই বলিয়া তাহাকে শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিলেন। মৌনীবাবা কোন্ জগতের লোক ছিলেন, এই একমাত্র ঘটনা হইতেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

মৌনীবাবার একজন একান্ত অনুরক্ত ভক্ত তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"মৌনীবাবা সত্যকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। আমরা যাহা কল্পনা বা অনুমান বা অনুভব করিয়া থাকি, অথবা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি, মৌনীবাবা দিবালোকে

তাহা দর্শন করিতেন। এইজন্যই বোধ হয় সাধনার চরমাবস্থায় তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "প্রচার, তপস্যা বা সাধনার অঙ্গ নহে, ইহাকে তপস্যা বা সাধনার ফল বলিতে হয় বল।" সত্যদর্শী সিদ্ধপুরুষ যাঁহারা, তাঁহারা লোকালয়েই থাকুন বা লোকসঙ্গ ত্যাগই করুন, বাক্যদ্বারা উপদেশ প্রদান করুন বা মৌন অবলম্বন করুন, তিনি ইচ্ছা করুন বা না করুন, তাঁহার অর্জ্জিত সত্য, তাঁহার সাধনার ধন জগতের ধর্ম্মভাণ্ডারে মুমুক্ষু ও ব্যাকুলাত্মাদিগের জন্য সঞ্চিত রহিয়া গেল। যিনি চাহিবেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ত কত মহৎ উপদেশ শ্রবণ করি এবং কত মহৎ সঙ্গ লাভ করি, কিন্তু তাহা সব সময় কি সার্থক হয়? সরলভাবে স্বীকার করিতেই হইবে, অনেক সদুপদেশ ও সাধুসঙ্গ জীবনে ব্যর্থ হইয়া থাকে। কেন এরূপ হয়? হয়, উপদেষ্টা সাধু ব্যক্তি তেমনভাবে স্বয়ং সত্যদর্শন করেন নাই, শেখা কথা বলিয়াছেন মাত্র; না হয়, শ্রোতা উন্মুখ নহেন, অর্থাৎ অনধিকারী। মৌনীবাবা এই কারণেই বারবার বলিতেন, এ দেশের লোকের নিকট প্রচারের এ প্রণালী সফল হইবে না। চতুর ব্যক্তিরা যেমন স্বল্পপুঁজী ফিরিওয়ালাদের নিকট হইতে সহজে সহজে কোন বস্তু ক্রয় করেন না, তাহারা ভেল জিনিস দিয়া অধিক মূল্য আদায় করিবে বলিয়া ভয় করেন, এ দেশের ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ, সেইরূপ, ভ্রমণশীল উপদেষ্টাদিগের নিকট হইতে সহজপ্রাপ্য সত্য সকল সমধিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেন কি না, গভীর সন্দেহের বিষয়। যেখানে মহাজনেরা বিরাট দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন, একদরে খাঁটি জিনিস সেখানে মিলিবে বলিয়া লোকেরা বিশ্বাস করেন। সাধক মহাজন—যাঁহারা পবিত্র তপঃক্ষেত্রে সত্যধন লাভ করিয়া বসিয়া আছেন, ভারতীয় মুমুক্ষুব্যক্তিগণ সহজে সেখানে যান এবং বিশ্বাস ভক্তি সহকারে সেখান হইতে সত্যলাভ করেন। এই সমস্ত সিদ্ধাত্মাগণ লোকের দ্বারে দ্বারে মুক্তি বিতরণ করিয়া বেড়ান নাই, কিন্তু লোকে মুক্তির সমাচার চিরদিন এই শ্রেণীর ধর্ম্মাত্মা লোকের নিকট হইতেই সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল চিন্তা মৌনীবাবার হৃদয়কে এমন সজোরে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল যে, প্রচারের বর্ত্তমান সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া ঋষিজনোচিত তপোবনের আশ্রয় লইতে ও মুনিজনোচিত মৌনব্রত অবলম্বন করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। গভীর আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সাধনা ভারতের তপোবনেই হইয়াছিল। জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্যযোগ শিক্ষার জন্য আমাদিগকে ভারতবর্ষের ঋষিদিগের দিকে চাহিতে হইবে এবং যথাসম্ভব তাঁহাদের পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে—মৌনীবাবার মত এই প্রকার ছিল। পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ, প্রধানতঃ ধনোপাসক; সাংসারিক সুখের উন্নতির সাধনায় তাঁহারা সিদ্ধ। তাঁহাদের অনুসরণে ধনলাভ হইতে পারে, বিলাসবিভবের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, বাহিক চাকচিক্যময়ী 'সভ্যতা' লাভও হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ধর্ম্মলাভ হইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। অথচ ব্রাহ্মসমাজ, ধর্ম্মসাধন ও প্রচার বিষয়েও সেই একান্ত বহির্ম্মুখীন বণিকজাতিরই অনুকরণ করিয়াছেন। প্রচারক ও প্রচারপ্রণালী পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা। দেশবাসীগণ সেইজন্য বোধ করি, ব্রাহ্মসমাজকে তেমন প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেছেন না এবং আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিতেছেন না। মৌনীবাবা ইহা তীব্ররূপে অনুভব করিতেন। ব্রাহ্মসমাজে বহির্ম্মুখীন ভাব ও বিকট বিলাসিতার প্রাবল্য দর্শন করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগী হৃদয় একেবারে

আহত ও আকুল হইয়া উঠিল। লোক-শিক্ষার জন্যই হয় ত ভগবান তাঁহাকে তীব্র বৈরাগ্যব্রত সাধনে নিযুক্ত করিলেন। আমাদিগের জন্য মৌনীবাবা কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। আমি খুব আশা করি, তাঁহার তপস্যা বৃথা হয় নাই।

"তপস্যার প্রারম্ভে মৌনীবাবার মনে কিছু আত্মপ্রভাব ছিল, কারণ তপস্যায় গমন কালে বলিয়াছিলেন "বস্তুলাভ হইলে ভাই ভগ্নীকে তাহা দিবার জন্য আবার আসিব।" কিন্তু চরমাবস্থায় স্পষ্ট লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমি ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি যে সকল মিথ্যা উপাধি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা সমূলে বিনাশ করিয়া (পিতা) আমাকে তাঁহার কচি খোকা করিয়াছেন।"কচি খোকা লাভলোকসানের ধার ধারে না। এই জন্যই সর্ব্বত্যাগী হওয়া—এইজন্যই মৌনী হওয়া। মৌনীবাবার জীবন এই আত্মিকধর্ম্ম বজ্র-গম্ভীর স্বরে প্রচার করিতেছে। নর্ম্মদার পবিত্রপুলিনে যে পবিত্র দেহ সমাধিস্থ হইয়াছে, তাহা এত দিনে মৃত্তিকায় মিলাইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার অমরাত্মা ভারত-সন্তানদিগকে আত্মবলিদান করিতে আহ্বান করিতেছেন। এইরূপ আত্মবলিদান দ্বারা এ ভারত উদ্ধার পাইবে। ইহাই আমারবিশ্বাস।

"সমবেত সামাজিক উপাসনা সম্বন্ধে ক্রমশঃ মৌনীবাবার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তপস্যায় যাত্রার দিন পর্য্যন্ত তিনি পারিবারিক উপাসনায় খুব ভাবের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। বেশী কথা বলিয়া উপাসনা করিতেন না। ঘণ্টাব্যাপী উপাসনার মধ্যে তাঁহাকে দুচারিটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ করিতে শুনা যাইত; কিন্তু তাঁহাতে কত ভাব,কত গভীরতা,কত ভক্তিব্যাকুলতা! সে ভাব উপস্থিত সকলকে স্পর্শ করিত। তিনি বলিতেন; বেশী কথা বলিয়া উপাসনা করাতে অসত্য কথা আসিতে পারে। ঠিক যতটুকু প্রাণে পাও, কথা তাহা অপেক্ষা কম হউক। বেশী হইলেই অসত্য হয়। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, উপাসনা প্রাণের বস্তু। অতি সঙ্গোপনে অন্তরে উপাসনা সাধন করিতে হয়। লোক-চক্ষুর অগোচরে সত্য উপাসনা সম্ভব হয়। আপনাকেও ভুলিলে তবে উপাসনা সার্থক হয়। এমন বস্তুকে ব্রাহ্মগণ প্রকাশ্য মন্দিরে সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রদর্শনের বস্তু করিয়া বোধ হয় খুবই ভুল করিয়াছেন। ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, প্রকাশ্য উপাসনা লোকশিক্ষা বা প্রচারের জন্য। মৌনীবাবা একথাকে নিতান্ত মারাত্মক মনে করিতেন। বলিতেন, "আগুন নিয়ে খেলা" ইহা শক্ত অপরাধ। উপাসনাকে বাহিরে প্রদর্শনের বস্তু করাতে যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার ফল আমরা ভুগিতেছি। আসল স্থানে এই প্রকার ভাব প্রবেশ করাতে উপাসনা বহির্ম্মুখীন হইয়া যাইতেছে। তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মের সবকাজে বহির্ম্মুখীনতা প্রবেশ করিয়াছে। বাক্যে, কার্য্যে, চিন্তায়, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সব বিষয়ে যেন হালকা বহির্ম্মুখীন ভাব! উপাসনাকে প্রচারের বস্তু করাতেই এই সাজা!! তিনি বলিতেন, মন্দিরে উপাসক অপেক্ষা দর্শক এবং সমালোচক অধিক হইবার কথা। তাঁহাদিগকে বেশ করিয়া কীর্ত্তন শুনাও, সুকণ্ঠ পাঠকগণের দ্বারা সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ বা প্রবন্ধ পড়াইয়া শুনাও, সুবক্তা দ্বারা ভাল উপদেশ শুনাও—তদতিরিক্ত করাতে বিপদ আছে। খুব সমভাবাপন্ন ব্যাকুলাত্মা কতিপয় ব্যক্তির সম্মিলনে ভাল ভাব আসিতে পারে; ভক্ত সঙ্গে মিলিয়া গভীর উপাসনার মধ্যে ডুবিয়া যাওয়া খুব স্বাভাবিক। এরূপ উপাসনা রুদ্ধদ্বারে বা সঙ্গোপনেই সাধন হয়। এইজন্য মৌনীবাবা উপাসনার অসত্যাচরণ সম্বন্ধে বার বার আমাদিগকে সাবধান করিতেন। ধর্ম্ম সম্পূর্ণ নিজস্ব। একাকী নির্জ্জনে যে সাধন তাহাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ সাধন বলিতেন। মৌনীবাবার এই সকল গভীর কথা ব্রাহ্মসমাজে ভাল

করিয়া আলোচনা করার সময় আসিয়াছে। পরিত্রাণ দেওয়া অপেক্ষা পরিত্রাণ পাওয়ার দিকে বেশী চক্ষু পতিত হউক। মৌনীবাবার মুক্তাত্মা আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।"

মৌনীবাবার হস্তলিখিত একখানি সুদীর্ঘ পত্র, একখানি কার্ড ও একটী পত্রাংশ পাইয়াছি। পত্রখানি তপস্যাযাত্রার এক বৎসর পরে চিত্রকূট হইতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন। কার্ডখানি যাত্রার দুই বৎসর পূর্ব্বে সপ্তপুষ্করিণী হইতে তাঁহার সোদরোপম বন্ধুর নিকটে লিখিত। এই দুইখানি প্রকাশিত হইল—

ওঁ

প্রিয় তারক,

তোমার কার্ডখানি পাইয়া সুখী হইলাম, কিন্তু ভাই, তোমার একটি কার্য্যে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি তোমার সহোদর ভায়ের নিকট হইতে একটা জিনিস লইতে, তাহা হইলে কি তাঁহার প্রতিশোধের জন্য আবার তাঁহার বাক্সের মধ্যে সেইরূপ একটা বস্তু রাখিয়া আসিতে? বোধ হয় কখনই পারিতে না। যাহা হউক, ভাই! আমার হৃদয়ে বড় আঘাত দিয়াছ। আমি কখন রংপুর যাইব বলিতে পারি না। আমাদিগকে গালাগালি দিয়াছে, তাহাতে দুঃখের বিষয় কিছুই নাই, কিন্তু দেশের লোকের অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হয়। আমাদের স্কুলের গোলমালের কিছুই নিষ্পত্তি হয় নাই। কি হইবে, তাহা দয়াময়ই জানেন। আমার মানসিক অবস্থা বড় শোচনীয়। শীঘ্র সংসার ছাড়িতে পারিলেই যেন বাঁচি। মনটা বড় কাঁপরে পড়িয়াছে।

স্নেহের—প্যারীলাল।

ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং।

১৮।১১।৮৯

প্রাণের ভাই,

আইস তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করি। দেখিতেছি, পিতা আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। আমাদের সমস্ত পরিবারকে অতি শীঘ্র প্রেমে মাতাইবেন। ধন্য পিতা! আর কি, আমাদের সকলকে একেবারে তোমার করিয়া লও। অতক্ত অবিশ্বাসী আমি, তত্রাচ তুমি আমার প্রতি প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছ, না জানি বিশ্বাসী ভক্ত হইতে পারিলে কত উপকার হইত। হয়ত এত দিন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে।

প্রাণের ভাই, তুমি কোন অপরাধ কর নাই। পিতা থাকতে এত দুঃখ কিসের জন্য? আশান্বিত হও, অতি শীঘ্র পিতা আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। নীলকান্ত টাকা পাঠায় নাই, সে পিতারই ইচ্ছা। পিতা তোমাদের টাকা বন্ধ রাখিয়া আমাকে অপূর্ব্ব লীলা দেখাইয়াছেন। তুমি যে সময়ে বাড়ীতে গিয়াছিলে, সে সময়ে নীলকান্ত আমাকে ৫৲ টাকা পাঠায় এবং বামন তাহার ২।৩ দিন পরেই ৫৲ টাকা দেয়। এই সময়ে একজন বৃদ্ধ সাধু পদদেশে ভয়ানক ক্ষত হওয়ায় পীড়িত হইয়া পড়েন। পিতা আমাকে লইয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি ক্রমাগত ২।৩ মাস পিতার কৃপায় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। ২৪শে আগষ্ট আমাদের আহারীয় দ্রব্য ফুরাইয়া যায়। ২৫শে আমি কাহারও নিকট ঋণ করিব না, অথবা চাহিব না বলিয়া নিশ্চয় করিয়া পিতৃচরণসেবায় নিযুক্ত থাকি। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ নিকটবর্ত্তী সাধকদিগের আলয়ে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া অভাব জানিতে পারিয়া

তাঁহাকে একজনের উপযুক্ত কিছু আহারীয় দ্রব্য দান করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ তাহাই আনিয় আমাকে রুটি প্রস্তুত করিতে দিলেন। সেই রুটিতে আমাদের আধপেটা করিয়া খাওয়া হইল। ভোজনান্তে আমি বৃদ্ধকে বলিলাম আমার একটী ছাতা আছে, কোন সাধুর নিকট বিক্রয় করিয়া অথবা রাখিয়া টাকা আনিয়া দিলে আমি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতে পারি। বৃদ্ধ বলিল,আজ প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, কল্য দেখা যাইবে। ইহার প্রায় ৫।৬ মিনিট পরেই উপর হইতে একটী লোক আসিল এবং কিঞ্চিৎকাল কথা-বার্ত্তার পরেই বৃদ্ধের হস্তে দুটী টাকা দিল। এই লোকটী চিত্রকূটের নহে, অন্যস্থান হইতে নবাগত। সে আমাদের অভাব কিছুই জানে না এবং কথাবার্ত্তায়ও এরূপ কিছু প্রকাশ পায় নাই। এখন দেখ, কোন্ শক্তিদ্বারা চালিত হইয়া সেই লোকটী আসিয়াছিল। আরও কি তাপসমালার অলৌকিকরূপে খাদ্য যোটার বিষয়ে অবিশ্বাস করিতে চাও? আরও শুন, ঐ খাদ্য যেই ফুরাইয়া আসিয়াছে, আর এক ব্যক্তি একদিন আসিয়া একটাকা দিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, সাধকসংখ্যা অধিক হওয়াতে এখানে এরূপ টাকা যোটা এক প্রকার অসম্ভব। ভিক্ষাই যোটে না। তার পর ঠিক খাদ্য ফুরাইবার সময় বৃদ্ধের সন্তান ৬৲ টাকা পাঠাইয়াছিল। তাহার সে টাকা থাকিতে থাকিতে নীলকান্ত ২৲ টাকা দেয়। তাহার পর ত রীতিমত টাকা আসিতেছে। এবার ঠিক যেদিন খাদ্য ফুরাইয়াছে, পোষ্ট আফিসে যাইয়া দেখি, টাকা উপস্থিত। এই প্রকারে অবিশ্বাসীদের সহিত পিতা অপূর্ব্ব লীলা খেলাইতেছেন। এখন আর অবিশ্বাস করিতে পারি না? খাদ্য ফুরাইলে সেইদিনই খাদ্য আসিবে, এ বিষয়ে পিতা এক প্রকার নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। যীশুর ৫ রুটিদ্বারা বহুসংখ্যক লোকের আহারে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করিতেছি।

এ ত গেল খাদ্য সম্বন্ধে। পিতা আমার আসিবার পূর্ব্বেই এখানে সুন্দর বাসস্থান অতি সুন্দর স্থানে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার আভাস আমার ডায়ারীতে জানিতে পারিবে। না দেখিলে বুঝিতে পারিবে না।

কিঞ্চিদধিক এক বৎসরের পর আমি পিতার অপার কৃপায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছি। তখন একবার আহার করি, একবার স্নান করি। * * * । শরীরও ক্রমে পিতার সেবায় নিয়মিত হইতেছে। আমার আলস্য সত্বেও পিতা ঠিক করিয়া লইতেছেন। এই পীড়াতে পিতার পূর্ণ মঙ্গলময় ভাব খুব প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং প্রার্থনার আশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। যে পত্রে তোমাদিগকে প্রার্থনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলাম, তাহার পর দুই পালা অতি অল্পমাত্র জ্বর হইয়াছিল। তোমাদের অবশ্য কেহ আমার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। এক বৎসরেরও অধিক পীড়িত ছিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পিতা আমাকে একবার ২।১ দিন ভিন্ন অন্যের অধীন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। প্রায় ১০০ হাত নীচ হইতে কলসিতে জল আনিয়া স্বহস্তে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া পিতার চরণে বসিয়া আনন্দে আহার করিয়াছি। মুখের রুচি এবং আহারের প্রবৃত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ সকলই পিতার কার্য্য। আমার শরীর রক্ষার্থে তিনি নিজে সমস্ত করিতেন, আমি উপলক্ষ মাত্র। তাহার পর দুরন্ত নরক যন্ত্রণায় আমার আত্মহত্যা করিবার

প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইত। হয় ত এক-দিন জরের সময় /৫ কি /১ ছাতুই খাইয়া বসিলাম, কিম্বা /। কি /॥ তেঁতুলই খাইলাম, অথবা অধিক পরিমাণে গুড়ই খাইলাম এই অবস্থায় যেরূপ বিপদ হওয়া উচিত, আমার তাহার কিছুই হইত না। বরং জরান্তে নব আশায় আশান্বিত হইয়া নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিতাম। এ সকল লীলা আমাকে কে চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছেন? পিতা আমার অবিশ্বাসের দন্তপাটি উৎপাটন এবং তাঁহার অপার কৃপা দেখাইবার জন্য করিয়াছেন। পাপমন ইহাতেও গলিল না। আরও এই এক শিক্ষা পাইয়াছি যে,পীড়াকে আর এখন ভয় করি না। এরূপ চিকিৎসক এবং সেবক আর কোথায় পাইব। গৃহে থাকিলে এই শিক্ষা লাভ করিতে পারিতাম না। পাপ জীবনের জন্য এত নিরাশ হই-য়াছ কেন? এমন পিতা থাকিতে আর নিরাশ হইও না। আমাকে যদি বিশ্বাস কর, তবে শুন, "দিবা রাত্রি প্রার্থনা করিতে থাক, নিশ্চয় উদ্ধার পাইবে।" পিতা বলিয়া-ছেন যে, সম্পূর্ণরূপে যে আমার উপর আত্ম সমর্পণ করে, আমি তাহার নীচ প্রবৃত্তি বশীভূত করিয়া দি। কেবল পাপ তাড়াইতে চাহিলে হইবে না। পিতাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইতে সাধনা কর। সাধনা করিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে বল এবং কৃপা ভিক্ষা কর। তিনি নিজে সমস্ত করিবেন। মানুষের নিকট ছুটাছুটি করিবার ভার যতদিন থাকিবে, এবং যতদিন নিজের উপর নির্ভর রাখিবে ও সম্পূর্ণরূপ আত্মবিনাশ করিতে শিখিবে না, ততদিন এ সকল সত্য অনুভব অথবা সম্ভোগ করিবার ক্ষমতা হইবে না। আত্মবিনাশপ্রাপ্ত হইলে পিতাকে দেখিতে পাইবে না। আত্মবিনাশের জন্য পিতা আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন এবং নিজে তাহা সাধনা করাইতেছেন। সেটী এই—নিজকে, নরনারীকে, জগৎকে ব্রহ্ম-কৃপা রূপে অনুভব করা। এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলে অনেক শত্রু এক বাণে বিনাশ হইবে। যে সর্ব্বদাই অনুভব করে; আমার শক্তির মূলে ব্রহ্মকৃপা, জ্ঞানের মূলে ব্রহ্মকৃপা, প্রাণের মূলে ব্রহ্মকৃপা, এক কথায় সকলের মূলেই ব্রহ্মকৃপা, তাহার নিকট সাধনার মহাশত্রু অহঙ্কার স্থান পায় না। নরনারী এবং জগৎকে এইরূপে দেখিতে শিক্ষা করিলে অপবিত্রতা চলিয়া যাইবে এবং প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। এই কৃপাতে সিদ্ধিলাভ করিলে কোন আর অভাব থাকিবে না, তখন কেবল এক ব্রাহ্মকৃপা-ছটা তোমার চতুর্দ্দিকে, আত্মাতে, প্রতি রক্তবিন্দুতে এবং প্রত্যেক তৃণগাছিতে দেখিবে। তখন তৃণের চেয়ে নীচ হইবে,আর কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারিবে না। এই কৃপা সাধনায় আমি এখন বিশেষভাবে পিতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছি।

পীড়িত অবস্থায় লালসা প্রভৃতি কতক-গুলি রিপু মাথা উঠাইয়াছিল। সেগুলি পিতা আবার ক্রমে বশীভূত করিয়া দিতেছেন। এখন দিন এক প্রকারে যাইতেছে। প্রাতে উঠিয়া কিছুকাল পিতৃচরণ মস্তকে ধারণ করিয়া ব্যায়াম করি। তাহার পর মুখ ধুইয়া পিতার চরণতলে বসি। অধিকাংশ সময়ই কৃপা স্মরণ এবং বিশেষ প্রকারে উপ-লব্ধি করিতে চেষ্টা করি। পিতার কৃপায় অনেক সময়ই সফল হই। সময়ে সময়ে পিতার মহত্বে ডুব দিয়া নিজের ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া পরম সুখী হই। সময়ে সময়ে পিতার কৃপা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাদানে নিযুক্ত

থাকি। সময়ে সময়ে পিতা কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার স্বরূপ কথঞ্চিৎরূপ অনুভব করান। মধ্যে মধ্যে খাবার চিন্তা এবং বাহিরের চিন্তাও স্থান পায়, কিন্তু তাহাদের অবস্থা পিতার কৃপায় ক্রমে শোচনীয় ভাব ধারণ করিতেছে। এই প্রকারে প্রায় দুই প্রহর কাটিয়া যায়। তাহার পর কিঞ্চিৎকাল পাঠে রত হই। কখন কখন মোহ আসিয়া এরূপ করিয়া ধরে যে, আমি এ সকল হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকি। কখন কখন আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দেয়, কিন্তু ইহারাও ক্রমে বলহীন হইতেছে। তাহার পর আহারাদি নিত্যকার্য্যে ব্যাপৃত হই। রান্না করিয়া আচ্ছা করিয়া আহার করি। প্রায় এই সকল দ্রব্যই অধিক আহার করিয়া থাকি, যথা—

আটা (উত্তম গমের)	৴ ।৴ ০
আতপায়	৴১০
ডাইল (মুগ কিম্বা অড়হর,ছোলা)	৴১০
	৴॥

টিনের ছোট চামচের এক চামচ ঘৃতও তাহার সহিত সংযুক্ত থাকে। কখন কখন তরকারি টক প্রভৃতিও হয়, কিন্তু তাহা কদাচিৎ। তৎপর কিছুকাল পিতাকে স্মরণ করিতে করিতে গড়াগুড়ি দিয়া, কিঞ্চিৎকাল পিতার চরণতলে বসিয়া, পাত্রাদি পরিষ্কার করিয়াও কোন কোন দিন পিতার চরণতলে বসিবার সময় থাকে, কচিৎ দুই একদিন থাকে না। সন্ধ্যার সময় একটু গৃহের উপর ভ্রমণ করিয়া এবং ব্যায়াম করিয়া পিতার চরণামৃত পান করিবার জন্য বসি। কোন কোন দিন ২।১ ঘণ্টা পিতা বসাইয়া রাখেন, কোন কোন দিন শীঘ্রই শুইয়া পড়ি। কোন কোন দিন শুইয়া শুইয়া পিতার স্মরণ মনন ইত্যাদিতে অনেক সময় পিতা যাপন করান। তাহারপর ২।৩ ঘণ্টা ঘুমাই, পরেই আবার উঠাইয়া দেন। তাহার পর আর বড় ঘুম হয় না। এইরূপ দিন গত হইতেছে। ক্রমেই আশা বৃদ্ধি পাইতেছে, নিরাশা অন্তর্ধান হইতেছে। এই প্রকার সর্ব্বশক্তিমান পরম দয়ালু পিতা যাহার, তাহার আবার মুক্তির জন্য চিন্তা? পাপচিন্তা, নরকভোগ যদিও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, তত্রাচ তাহাদের শক্তি যে খর্ব্ব হইয়াছে, তাহা বুঝিতেছি। পিতা শীঘ্রই আমাদের জন্য উপায় করিবেন। বাহির হইতে সাধন ভজন সম্বন্ধে কোন উপকার প্রাপ্ত হই, এরূপ কোন সঙ্গী এখানে নাই। কেবলমাত্র পিতা আছেন। আমি আর অন্য সঙ্গী চাই না। পিতা ভিন্ন অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেই আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। সর্ব্বসাক্ষী জাগ্রত জীবন্ত দেবতা আমার গুরু, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু হইয়া আছেন। তবে আর অভাব কি। আমি তাঁহার সঙ্গেই কথা বলি, তাঁহার নিকট হইতেই অব্যর্থ উপদেশ পাই। তিনিই আবার দয়া করিয়া আমাকে ঘাড়ে ধরিয়া সেই সকল সাধনায় নিযুক্ত করেন। যখন আমাকে দেখি না, তখন তাঁহাকে দেখি এবং যখন আমাকে দেখিতে পাই, তখনই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, আর পিতাকে দেখি না। পরম দয়ালু পিতা শক্তিরূপে, জ্ঞানরূপেই বিশেষভাবে আমার নিকট প্রত্যক্ষ হন। আমার নরকভোগ তাঁহারই ইচ্ছা। আমার অহঙ্কারের দন্তপাটি উৎপাটন করিতেছেন এবং আমার মধ্যে যে কিছু নাই, তাহাই চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন। পূর্ণ মঙ্গলময় শীঘ্র আমাকে মুক্ত করিয়া লইবেন। আমি আর কিছু চাই

না, কেবল তাঁহার অভয় চরণ পূজা করিবার অধিকার চাই। পিতা অনেক শিখাইয়াছেন—এই প্রকার চলিলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। পিতার প্রতি যদি প্রেম না হয়, সংসার ছাড়িয়া বনে গেলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই। তুমি কৃপাসাধনের দ্বারা প্রেম লাভ করিতে থাক। পিতা নিশ্চয়ই তোমাকে কৃতার্থ করিবেন। আর একটী দ্রব্য চাই—ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা। পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া যে প্রার্থনা পূর্ণ হইবার জন্য অপেক্ষা না করে, সে কখনই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ-অধিকার পাইবে না। ধৈর্য্যশীল এবং সহিষ্ণু হইয়া পিতার চরণে পড়িয়া থাকিলে তিনি উদ্ধার করিবেনই। আর কি? আর একটী কথা—সত্যবাদী হইতে শিক্ষা কর। ব্রাহ্মসমাজে এইটীর বড় অভাব। তাহারা আগুন লইয়া খেলা করিতেছে। উপাসনা, গান প্রভৃতি মৌখিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অপরাধে অনেকে পুড়িয়া মরিতেছে। সাবধান যেন তোমাদের পরিবার মধ্যে বৃথা পিতার নাম উচ্চারিত না হয়। ভাবের সহিত যতটুকু হয়, সেই টুকুই ভাল। ছোট ছোট শিশু যেন উচ্চ উচ্চ গান করিয়া পিতার অবমাননা না করেন। তাহাদিগকে কেবল সরলভাবে এই শিক্ষা দাও—ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহাকে খুব ভালবাস। যদি তাহারা ইঁচড়ে পাকা হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। নিশ্চয়ই তাহারা অভক্ত নাস্তিক হইয়া ব্রহ্মসমাজকে কলঙ্কিত করিবে। কিছুই একদিনে হয় না। বালক ধ্রুবকেও ১২ বৎসর কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। অস্থির হইও না। স্থির ভাবে সাধনায় নিযুক্ত হও। মাসে ২ খানা পত্র দিয়া কি করিবে? পিতা এই পত্রে যাহা লিখাইলেন, এই সাধনায় সিদ্ধ হইয়া আর কিছু চাহিও। Bible, তাপসমালা, Pilgrim's Progress এবং অন্যান্য সাধুদের জীবনী খুব ভক্তির সহিত পাঠ করিবে। যীশু নরশ্রেষ্ঠ। তাহার কথায় অবিশ্বাস করিও না। তাপসমালার আওল হোসেন খিকানীর জীবনচরিত বেশ করিয়া পাঠ করিবে।

*　　*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*　　*

তোমাদের মধ্যে সাধন ভজন কি প্রকার চলিতেছে, আমাকে জানাইবে এবং আমার পত্র সকলকে পড়িয়া শুনাইবে।

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা না করিলে সাধনার একটী অঙ্গহীন থাকে। এই অভাব আমি বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছি। তুমি সর্ব্বদা চিঠিদ্বারা এবং টাকাকড়ি দ্বারা তাঁহাদের অভাব মোচন করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবে। যদি পিতা দিন দেন, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিব।

*　　*　　*　　*

তোমাদের প্রত্যেকের সংবাদ চাই। আর কি লিখিব?

উপাসনাদি করিতে থাক। প্রাণের দেবতাকে প্রাণে রাখিও, বাহির করিয়া দিও না, যখনই কোন কুপ্রবৃত্তিকে উপস্থিত হইতে দেখিবে, তখনই প্রার্থনা আশ্রয় করিয়া উপবাস দিবে, ইহাতে পিতার অনুগ্রহ প্রচুর পাইবে। রাত্রি জাগিয়া পিতৃপদ মস্তকে করিয়া, প্রেমের আলো জ্বালিয়া, ব্রহ্মকৃপারূপ শাণিত অসিধারণ করিয়া এবং উপবাসাদি ব্রত নিয়ম পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হও, নিশ্চয় সফল হইবে। তবে এখন বিদায়।

তোমার দাদা—

অনুসন্ধানে মৌনীবাবা সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলাম। ভগবানের ইচ্ছা হইলে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সাধকদিগের অনুজ্ঞা এবং অনুরোধ পালন করিব। যদি কেহ মৌনীবাবা সম্বন্ধে কোন বিষয় আমাকে দয়া করিয়া জানান, আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা গ্রহণ করিব ও তাঁহার জীবনীমধ্যে সন্নিবেশিত করিব।

বিষণপুর
সীতামারি পোঃ,
মজঃফরপুর। } শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

শ্রীমান্ সুপ্রসন্ন ও কুমারী সান্ত্বনার শুভবিবাহের উপদেশ।

৩০শে মাঘ, শনিবার, ১৩১৬।

মা সান্ত্বনা, বাবা সুপ্রসন্ন—তোমরা আজ বিশ্বারাধ্য বিশ্বপতির নাম স্মরণ পূর্ব্বক,দ্যুলোক ভূ-লোকবাসী গুরুজন এবং সাধুভক্তদিগের পদপ্রান্তে বসিয়া মহামিলন মন্ত্র উচ্চারণ করিলে—"তোমার হৃদয় আমার হউক"—এ মন্ত্র অতি পবিত্র এবং অতি গভীর, সকল সাধনার ঘনীভূত সার এই মন্ত্রে নিবদ্ধ। আমি সুদীর্ঘকাল সংসার-কাননে পরিভ্রমণ করিয়া, স্বার্থ এবং পরার্থের যে অনাবিল মিলন-স্থান লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা অহেতুকী প্রেম-মন্ত্র। যাহা দেখিয়াছি এবং যাহা করিয়াছি, যাহা পাইয়াছি এবং যাহা পাইবার প্রত্যাশী হইয়া আছি,—তাহা কেবলই প্রেম-মন্ত্র-পূত। আমি সে দিন বলিতেছিলাম, যে বিধাতার প্রত্যক্ষ ও প্রকট ছবি এই জগৎকে ভালবাসিল না, সে ভক্তি বা বিশ্বাসের বিজয়-ধামে কখনও পৌঁছিতে পারিবে না। ভালবাসার মূল-মন্ত্র—স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগ, অহঙ্কার বা আত্মাভিমান বিনাশ। আত্মত্যাগও যাহা, অহঙ্কারের বিনাশও তাহাই। সংযম এই মন্ত্রসাধনের প্রধান সহায়;—নিবৃত্তি-মার্গ-সাধনা ভিন্ন কেহ এই পবিত্র জিতেন্দ্রিয়িদের আনন্দময় ধামে পৌঁছিতে পারে না। নিবৃত্তি-মার্গসাধনে যে কখনও প্রবৃত্ত হয় নাই, কৈবল্য সাধন কি বস্তু, সে কখনও তাহা বুঝিতে পারে না। যে সুখান্বেষণে জগতে বিচরণ করে, মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতারিতের ন্যায় সে চিরদিনই দুঃখ বিপদ-তৃষ্ণায় ছটফট করে। আর যে চিদানন্দের প্রেম লহরী, এই প্রকট মর্ত্ত্য-লীলা রাজ্যের প্রতি অণু পরমাণুতে দর্শন করে,সে সুখ দুঃখ-সম জ্ঞানে আত্মহারা, দুনয়নে তাহার প্রেম ধারা, সে কৈবল্য সাধন বলে জরা-মরণের অতীতে বিলীন,—যে সংসারকে শিক্ষাস্থান মনে করে বটে, কিন্তু লক্ষ্য মনে করে না, তাহার লক্ষ্য অতীন্দ্রিয়ে নিবদ্ধ, তাহার গতি দুর্নিরীক্ষ্য অহেতুকী সচ্চিদানন্দ-ময় ধাম,—সে প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত সংসার-নিরপেক্ষ এবং আত্মপর-ভেদ-বিরহিত হইয়া গভীর সাধনার মধ্যে নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে চলিয়া যায়। এই সংসারের কোন সুখ-স্পৃহাই তাহার চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। সুগভীর-

শক্তি তাহাকে নিত্য-নিরঞ্জন-ধামের অচ্যুত বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখেন।

আজ এই পবিত্র শুভ মুহূর্ত্তে যদি তোমরা প্রেম-যজ্ঞের মহা মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা এই মন্ত্র সাধনে সিদ্ধ হও, আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সংসারের লাভ-লোকসান-গণনার অতীত কৈবল্যে মিশিয়া যাও। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, আত্মত্যাগই এই যজ্ঞের একমাত্র ইন্ধন—মহাযজ্ঞে আত্ম এবং স্বার্থকে ভস্ম করিয়া—সেই ভস্ম প্রেম-ঘৃতে মিশাইয়া অঞ্জনরূপে নয়নে লেপন করিয়া জগতের দিকে চাহিয়া দেখ—বুঝিতে পারিবে সবই জ্যোতি-ঘনের প্রেম-ঘন মূর্ত্তি; কেহ আর সংসারে পর নাই—সবই আপনার। দেখ, স্বার্থ এবং পরার্থ;—চিৎপদ্মাতে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে;—যাহা ছিল প্রেম-গঙ্গা, তাহা মিলিয়াছে জ্ঞান-ব্রহ্মপুত্রে—দুই মিলিয়া মিশিয়া দরিদ্র ফরিদপুরকে এবং তথা হইতে সমস্ত মাতৃভূমিকে সুশীতল করিতে, উর্ব্বরা করিতে, অথবা সঞ্জীবিত করিতে ছুটিয়াছে। হায়, আমার এ কি আশার স্বপ্ন? সগর বংশকে উদ্ধার করিতে যদি ভাগীরথী প্রবাহিত হইয়াছিল, ফরিদপুরের অগণ্য মুমূর্ষু বংশকে উদ্ধার করিতে এই প্রেম-পদ্মা কি প্রবাহিত হইবে না? বিপিন বিহারী যাহা করিতে আজীবন চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া শুধু চক্ষের জল উহাতে মিশাইয়া গিয়াছেন, এত দিনে, তাহা যদি জমাট হইয়া প্রেম-ঘন মূর্ত্তি ধারণ করিল, তবে আমার আশা ব্যর্থ হইবার নয় যে, এই মহামিলনে অসাধ্য সাধিত হইবে;—দরিদ্র ফরিদপুর এবং তাহা হইতে সমস্ত মাতৃভূমি উদ্ধার হইয়া যাইবে। তবে যাও, আজ উভয়ে মিলিয়া ভিখারী ভিখারিণীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পতিত দেশকে উদ্ধার করিতে ধাবিত হও। বিধাতার মহান ইচ্ছা তোমাদের জীবনে পূর্ণ হউক।

মা সান্ত্বনা, তোমার জীবনের এই বিশেষ দিনে বিশেষ করিয়া তোমাকে বলিতেছি, তোমাকে এই কয়দিন যে সকল উপদেশ দিয়াছি, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে প্রতিপালন করিবে। ভক্ত কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম-মতকে যেমন তাঁহার সাধ্বী কন্যাগণ হৃদয়ে ধারণ ও প্রতিপালন করিতেছেন, আমার জীবনের ধর্ম্মবিশ্বাসকেও, সেইরূপ, তুমি হৃদয়ে সর্ব্বদা ধারণ করিবে। আমার বিশেষত্ব তুমি বিশেষ রূপে জান, আমার জীবনধারণ কেবল দরিদ্র কাঙ্গাল ভাইদের জন্য, তাহা তুমি বিশেষ ভাবে জান। আমি না খাইয়াও অন্যকে খাওয়াইতে পারিলে সুখী হই, না পরিয়া অন্যকে পরাইতে পারিলে আনন্দিত হই; তাহা তুমি জান। আমি মনে করি, বিশ্বাধিপের প্রকটলীলা এই মর্ত্ত্যের নরনারী। তাঁহাদিগের সেবা, তাঁহারই সেবা। সকলকে আপন করিতে পারিলেই তিনি আপন হন। এই গুণে আমার প্রিয়বন্ধু স্বর্গত বিপিন বিহারী আমার প্রাণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমি চিরদিনই তাঁহার অনুগত ছিলাম। তিনি মানব সমাজের কল্যাণের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর, এই কয়েক বৎসর যে বেদনা হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, তাহা একমাত্র বিধাতাই জানেন। তাঁহার সৎগুণ-রাশিকে রক্ষা করিবার ভার তুমি পাইলে, দেখিও, আত্ম-সুখান্বেষণে মত্ত হইয়া, কাহারও সুখ শান্তির অন্তরায় হইও না, কখনও কাহারও প্রতি বিমুখ হইও না—কখনও কাহাকেও পর ভাবিও না।

সকলেই তোমার হিতকাঙ্ক্ষী,ইহা মনে রাখিয় সকলের সেবা ও পরিচর্য্যা করিবে। দেখিও কেহ যেন কথনও তোমার ব্যবহারে ব্যথিত না হন, দেখিও কেহ যেন কথনও তোমার গৃহ হইতে অভুক্ত অবস্থায় না যায়। সুপ্রসন্ন তাহার পিতৃদেবের দয়ার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, ইহা সর্ব্বদা অন্তরে রাখিয়া তাহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে আদর ও যত্ন করিবে এবং তাহার সহিত মিলিত হইয়া প্রতিদিন উপাসনা-পূত হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবে। তোমার মূর্ত্তি প্রেমে গঠিত—অহেতুকী প্রেমই যেন তোমার চির লক্ষ্য থাকে।

স্বদেশী মন্ত্র, এই দরিদ্র দেশের একমাত্র উদ্ধারের মন্ত্র, এই কথা মনে রাখিয়া এই পতিত দেশের উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। তোমার জীবন আদর্শ জীবন হউক, তোমার দ্বারা তোমার পিতামাতার কুল এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হউক। তোমার জীবন দেশের জন্য পাত হইলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে।

বাবা সুপ্রসন্ন, আমি আদর করিয়া তোমার নাম সুপ্রসন্ন রাখিয়াছিলাম, তোমার জীবনে ঐ কথার মর্য্যাদা সুরক্ষিত হইলে আমি বিশেষ আনন্দিত হইব। তুমি দ্যুলোকবাসী ভূলোকবাসী সকলের প্রতি সুপ্রসন্ন হও, ইহাই তোমার নিকট প্রার্থনা। তোমার জীবন দুঃখপূর্ণ,—অতি শৈশবে তোমার মাতৃদেবী স্বর্গে গিয়াছেন, তোমার বাল্যেই তোমার পিতৃদেব স্বর্গত হইয়াছেন। দুঃখে তোমার জীবন আরম্ভ, দুঃখেই সংবর্দ্ধিত। তুমি আজ এই বিশেষ দিনে তোমার পিতৃদেব এবং মাতৃদেবীকে বিশেষভাবে স্মরণ কর, যে ব্রহ্মকৃপা তোমাকে এতদিন রক্ষা করিয়াছে, তাহা আজ অনুধ্যান কর।

অপরাজিতার স্বর্গারোহণের পর আমরা যখন দারুণ শোকে অস্থির হইয়াছিলাম, তখন বিশ্বজননী আমাদের দুঃখ অপনোদনের জন্য সান্ত্বনাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই আদেশে সান্ত্বনা তোমার সহচরী হইতে চলিল। আমাদিগের দারুণ শোকের দিনের সান্ত্বনা যদি তোমার সুখের কারণ হয়, আমাদের আনন্দের সীমা থাকিবে না।

সান্ত্বনা তোমার যোগ্য কিনা, তাহা একমাত্র বিধাতাই জানেন। সান্ত্বনা বিধাতার অহেতুকী প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিতা—ভালবাসাই তাহার স্বভাব, ভালবাসাই তাহার জীবনের লক্ষ্য। এতাবৎ কাল সে যাহাকে পাইয়াছে, তাহাকেই ভালবাসায় মুগ্ধ করিয়াছে। তুমি যদি তাহার এই অহেতুকী প্রেম-যজ্ঞ সাধনের সহায় হও, তবে তাঁহার আদর্শ প্রেমমূর্ত্তি জগৎকে মোহিত করিতে পারিবে।

তুমি সাধু বিপিনবিহারীর বংশধর—আমরা তোমাকে তাঁহার গুণধর বলিয়াও বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি,তুমি তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-সংরক্ষণের একমাত্র কারণ। তাঁহার জীবনের আদর্শ যদি তোমাতে সংরক্ষিত হয়, তবেই আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। তিনি মনে করিতেন, প্রতি পয়সা বিধাতার দরিদ্র সন্তানদের সেবার জন্য তিনি প্রাপ্ত হন; এইজন্য, তিনি প্রতি পয়সা দরিদ্রদের সেবার জন্য ব্যয় করিতে ভালবাসিতেন। নিজের সুখের জন্য যে বিধাতার দানের অপব্যবহার করে, তাহার ঘরে অযাচিত দান বহুদিন অবতরণ করে না,একদিন তাহাকে এজন্য কাঁদিতে হইবেই হইবে। তিনি ছিলেন জনক ঋষীর ন্যায়—ধনী হইয়াও অনাসক্ত যোগী, দরিদ্রের বন্ধু, দরিদ্রের সহচর। তোমার পিতার এই পুণ্যকীর্ত্তি তুমি কি রক্ষা করিবে না? এই

ব্রত পালনে সান্ত্বনা: তোমার সহচরী হইতে পারিবে বলিয়া আশা করিতেছি। বিধাতা আমাদের সেই আশাকে পূর্ণ করুন।

পবিত্র গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র মিলিয়া কোন্ একটী দরিদ্র দেশকে উর্ব্বরা করিতেছে, তাহা জান কি? সে দেশ—অতি দরিদ্র ফরিদপুর। তোমাদের মিলনকে আমি পতিত দেশের উদ্ধারের কারণ মনে করিতেছি। দেখিও, সুপ্রসন্ন, আমার মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়, তোমাদের মিলনে বংশের, দেশের এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখ যেন উজ্জ্বল হয়।

এই জীবন পথের সহায় কি, তাহা জান কি? একমাত্র সহায়—ব্রহ্মকৃপা। ঐ কৃপা তোমাকে অশেষ দুঃখ বিপদে রক্ষা করিয়াছে, আমি বিশ্বাস করি, ঐ কৃপাই তোমাকে ভবিষ্যতেও রক্ষা করিবে। তুমি শয়নে স্বপনে ব্রহ্মকৃপা অবলম্বন করিয়া চলিবে, আমার একান্ত অনুরোধ। তোমাদের দাম্পত্য জীবনে তাঁহার অজস্র কৃপা বর্ষিত হউক।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

ঐ বিবাহের উপহার।

(১)

বিবাহ প্রণয় নহে—শুভ পরিণয়,
তপস্যা সাধনা যোগ, এ মিলনে উপভোগ,
কেবল কামনা-শূন্য কৈবল্য তন্ময়!
নহে মোক্ষ নহে স্বর্গ, ধর্ম্ম অর্থ চতুর্ব্বর্গ,
শুধু পূজা শুধু অর্ঘ্য ধ্যানে আত্ম লয়,
প্রকৃত হিন্দুর বিয়া কেবল আত্মস্থ ক্রিয়া,
সমুজ্জ্বল প্রজ্ঞা-নেত্রে কাম ভস্ম হয়!
যোগ সদা মূর্ত্তি ধরি, মিলে তাহে হরগৌরী
আজিও সে কথা স্মরি স্তব্ধ হিমালয়!
বিবাহ প্রণয় নহে—কৈবল্য তন্ময়!

বিবাহ প্রণয় নহে, পুত্র প্রয়োজন;
পুত্রও পিতের জন্য, উদ্দেশ্য নাহিক অন্য,
স্বজাতি স্বগোত্র বংশ রক্ষার কারণ!
যখন অসুর দলে, পরাজিয়ে পশু বলে
লইল অমর রাজ্য রাজ-সিংহাসন—
দেবতার উপবাস! দেবের মুখের গ্রাস—
দেবতার অন্ন পিণ্ড করিল লুণ্ঠন,—
দেবের নরকে গতি, কি দুর্গতি! কি দুর্গতি!
অমরের অপমৃত্যু—কি অধঃপতন!

(তখন)

দেবের উদ্ধার তরে পরিণয় উমা-হরে,
জাতি গোত্র বংশ পিণ্ড রক্ষা প্রয়োজন—
কুমারের জন্ম তাই, অপর উদ্দেশ্য নাই,
তোমরা দম্পতি তাহা রাখিও স্মরণ,
ভগবান্ পুরিবেন আশা আকিঞ্চন!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

---

(২)

ঐ বিবাহের আশীর্ব্বাদ।

"জগতের যত হাসি, জগতের যত সুখ
হোক্ তোমাদের হোক্" সকলে ফুটিয়া মুখ
বলিল যখন, সেই পূর্ণ সভা-গৃহ-তলে
"সুখে যেন থাকিয়োনা," আমি উঠিলাম ব'লে!
অভিশাপ মনে করি, শিহরি' চাহিল সবে
অবজ্ঞায় বার বার, মোর সেই কণ্ঠ রবে।
উপহার, আধ পাই, আনে নাই শুভ দিনে—
তার পরে অভিশাপ? মিলি জন দুই তিনে
আমারে টানিয়া ল'য়ে উত্তম মধ্যম কিছু
দিতে প্রায় অগ্রসর, এমন সময় পিছু
দাঁড়ালেন একজন, নাহি ভুল, নাহি ভুল—
প্রশান্ত আনন তাঁর, নেত্র অশ্রু-সমাকুল!
তিনি অর্থ বুঝিলেন, শুনিলেন মোর বাণী,
পৌরজন তাই দেখি আরম্ভিল কাণাকাণি।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩)

খুকীমা সান্ত্বনা,

খেলা ঘরে নিতি নিতি মিছে গৃহস্থালী
অনেক করিলি মাগো, সাধ কি মিটেনা!
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি জ্ঞান, ধূলা সারা গায়,
করিছ এ ছুটাছুটি ভাল গিন্নিপনা।

এস মাগো এস এবে সমাপ্ত এলীলা—
কত ধূলা অঙ্গে আহা লেগেছে তোমার!
গৃহস্থালী সাধ তোর পূরাব গো আজি,—
পাবে মাগো কাজ কর্ম্ম সত্য ঘর দ্বার।

নারী জীবনের পথে স্বর্ণ তোরণ
খুলিয়াছে, ওই তোমা করিছে আহ্বান।
ওরি পরে হবে তব সুখ-বাস-ভূমি,
প্রণয়ের ওই চির রম্য লীলা-স্থান।

কুসুম ভূষণে সাজি নেহার দাঁড়ায়ে
তোরণ দুয়ারে ওই দেখ চাহি তায়!
জীবন-পথের তিনি চির সাথী তোর,
মিলিবেন তোমাসনে চির একতায়॥

মিলন-সঙ্গীত ওই উঠিল বাজিয়া,
দাঁড়াও তাঁহার পাশে ধর ওই কর।
শিখাবেন তোমা কত জ্ঞান ধর্ম্মকথা
সাথে সাথে রহি তব চির সহচর॥

যেরূপ খেলার ঘর ছাড়ি সত্য ঘরে,
নব প্রেমে গাঁথা দুটি জীবন্ত প্রসূন,
পশিলে, আসিয়া সেই পথ অনুসারে
প্রেমময় পদে প্রেম করিবে অর্পণ।

(বাবা) সুপ্রসন্নে অপ্রসন্ন দেখিবে যখন,
ছায়ার মতন তার সাথে সাথে থাকি,
(মা) সান্ত্বনা করিবে দিয়ে আশ্বাস বচন;
দেখে চিরদিন যেন মোরা সুখে থাকি।

কত মণি মুক্তা তুমি পাবে উপহার,
ভিখারী কোথায় তাহা খুঁজিয়ে পাইবে,
ধর আশীর্ব্বাদ শুধু ধান্য ও দুর্ব্বার,
বন মাঝে অনায়াসে তাহা পাওয়া যাবে।

সদ্য মাতৃহারা আমি খুঁজিয়ে বেড়াই,
কোথা গেলে মা ও ছেলের হইবে মিলন,
"আনন্দ-আশ্রমে" আজি দেখিবারে পাই;
কে মা তোর? সান্ত্বনাই প্রশ্নের পূরণ।

যাও মা বাসর ঘরে লওগে বিশ্রাম,
বিশ্বময় সন্তানের মাতৃরূপ ধরি,
গর্ভে থেকে অভিমন্যু ব্যূহের নির্গম
শিখেছিল, সেইরূপ শিক্ষা দাও করি।

সীমাবদ্ধ একটুকু সংসার দেখিয়া—
বিশ্ব সংসারের কথা মনে যেন হয়,
সকলের পতি যিনি তাঁহাকে স্মরিয়া—
অসীম সংসার যেন সোণা হয়ে যায়।

আপনি না খেয়ে ক্ষুধাতুরে অন্ন দান,—
আছে তব পিতৃ-ধর্ম্ম করিও গ্রহণ,
সে ধর্ম্মে তোমার অংশ আছে বিদ্যমান,
স্মরি সুখে, দুঃখে, ব্রত করিও পালন।

সংযম শিক্ষার সেই আদর্শ দেবতা,
ভীষণ দুর্ভিক্ষ সহ সংগ্রাম করিতে,
অভ্যস্ত সে দেব, দেখে অন্নহীন ভ্রাতা
আপনি গলিয়া পরে পরের দুঃখেতে॥

তোমরা তাঁহার পথ ধরিয়া ধরিয়া,
যদি কাটাইতে পার জীবন-সংগ্রামে;
সুখী হব চির দিন তোদেরে দেখিয়া—
এই আশীর্ব্বাদ স্মরি পরমেশ-নামে।

শ্রীমনোমোহন দাসগুপ্ত।

(৪)

সান্ত্বনা।

আঁখি মুছে, দেখ চাহি',—
মহিমার সীমা নাহি
এই বিশ্ব তলে!
ক্ষুদ্র গণ্ডী চিন্তা তুলি'
দেখো ভাবি' নেত্র তুলি'—
কি শান্তিতে চলে
এ নিখিল চরাচর!
কি বিস্ময় মনোহর
জাগেরে তখন—
সঙ্কীর্ণতা বিস্মরিয়া,
করি যবে আত্মা দিয়া
বিরাট দর্শন!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

---

(৫)

সান্ত্বনা!

সঞ্চিত হৃদয়-কুঞ্জে—
মধুর সুরভি রাশি,
কল্যাণী, আনন্দময়ী,
চির মৃদু মধু হাসি;
লয়ে যাও আজি, প্রিয়,
তব আনন্দ ভবনে,
করিতে জীবন দান
নব-সুপ্তি-জাগরণে।
হেথা আঁখি ছল, ছল,
সেথা আবাহন গীতি
রচিছে জগত নব
লইয়ে তোমারি প্রীতি।
নারীর সে গৃহ, বোন!
আকাঙ্ক্ষিত, চিরপ্রিয়,
আপনারে তুচ্ছ করি
সেবাব্রত করে নিয়ো।
আর্ত্তেরে সান্ত্বনা বল,
ক্ষুধিতেরে অন্নদান
দিতে যদি পার, তবে
ধন্য হবে মন প্রাণ।
যে শিক্ষা পেয়েছে, ভগ্নি,
পূত পিতৃ পরিবারে।
যতনে স্থাপিও তাহা
তব নূতন সংসারে।
দীনে দয়া, স্বার্থে বলি,
নারী ধর্ম্ম পতি-ব্রত
সুখের সোপান, বোন,
তুমি স্মরিও নিয়ত।

তোমার সরলা দিদি।

ঐ বিবাহের সঙ্গীত।

১

সাহানা—ঝাঁপতাল।

অনন্তের অন্তঃপুরে উঠিছে গভীর সুর,
মিলে যাও, লয় হও, থেকনা থেকনা দূর
কে কোথায় আছ বিন্দু, ওই শুন ডাকে সিন্ধু,
পূরাও সৃষ্টির লক্ষ্য, দেখ প্রেম কি মধুর।
কত আর রাখ ধরে, আপনাতে আপনারে?
তুমি ত তোমার নও, তুমি যে সে অনন্তের;
সে সুখে বিভোর হয়ে, আছে বিশ্ব হারাইয়ে,
(এস) ডুবিয়া হারায়ে যাই মহা প্রেমে সে সিন্ধুর।

(২)

সিন্ধু—কাওয়ালি।

সাজায়ে প্রেমের ডালি জগত এসেছে দ্বারে,
সাধ তার প্রাণে ধরে, বরণ করে তোমারে।
তুমি হে প্রেমের সিন্ধু, মিলনের মধ্যবিন্দু,
তোমাকে না প্রাণ দিলে, প্রাণ কি বাঁচিতে পারে!
(ঐ) প্রেম-দৃষ্টি যথা তব, স্বর্গ-সৃষ্টি তথা নব;
মর্ত্ত্যকে করিতে স্বর্গ যাচ প্রেম বারে বারে
দুটি নব-ব্রত-ধারী ওই প্রেমের ভিখারী;
দাও দীক্ষা মহামন্ত্রে পরশিয়া দুজনারে

(৩)

বেহাগ—একতালা।

থাক্ বাঁধা থাক্। (এরা)
জীবনে জীবনে, তোমারি চরণে,
(চির) মুগ্ধ, বিহ্বল, অবাক।
নূতন করহে ছুটির নয়ন,
নূতন কর হে নিখিল ভবন,
অসীম ও প্রেম-রহস্য মাঝারে
দুইটি হৃদয় ডুবিয়া যাক।
যে রূপে ভুলালে জগতের প্রাণ,
যার তরে ভবে এত আত্মদান;
(এরা) সে রূপ মাধুরী প্রাণে প্রাণে হেরি
নিত্য নব স্বর্গ দেখিতে পা'ক;
মধুর মধুর হউক জীবন,
মধুর মধুর এ প্রেম-বন্ধন;
হ'য়ে মধুময় দুইটি হৃদয়
আপনা হারায়ে তোমাতে মিলাবে।

(৫)

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রসন্নময়ী জননি, শুন শুন প্রার্থনা।
পুরাও প্রেমের ব্রত, কর সিদ্ধ সাধনা।
তোমারি ছুটি হৃদয় হ'ক মহা প্রেমে লয়;
আর যেন নাহি রয় "আমি আমি" ভাবনা।
যে প্রেম জানে না ভেদ, জানে না স্বার্থ বিচ্ছেদ,
হউক ছুটি জীবন সে প্রেমের আরাধনা।
হও মা প্রসন্ন হও, দুয়ে এক হ'য়ে রও;
চরণে প্রণত, মাগো, সুপ্রসন্ন সান্ত্বনা।

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

(৬)

বেহাগ—কাওয়ালি।

গাও রে শুভ দিনে শুভকরে।
পরম পুরুষ পরমেশ্বরে।
চিদানন্দ-ঘন মোহন মুরতি
নিরখি যেরূপ নয়ন ঝরে,
আনন্দ-সাগর উথলে হৃদে,
তৃষিত মন প্রাণ শীতল করে।
গাও বদন ভরি যজ্ঞেশ্বর হরি,
সিদ্ধিদাতা সেই মঙ্গলাকরে রে;
জীবন সফল কররে মানস,
গাও যতনে তাঁরে প্রেম ভরে।

শ্রীরাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামায়ণে বিশ্বামিত্র।

যাঁহার বিশ্বগ্রাসী তেজ অদৃষ্টকারের ঘোর আবর্ত্তের মধ্যে পুরুষকারের বৈজয়ন্তী পতাকা উড্ডীন করতঃ এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়াছে, যাঁহার ক্ষত্রোচিত ওজস্বিতা ব্রাহ্মণোচিত সৌম্যতার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আর্য্যকাব্য গ্রন্থে অপূর্ব্ব প্রয়াগ সঙ্গম ঘটাইয়াছে, বাঙ্গালীর বড় কবি সেই তপঃপ্রভাবপূর্ণ ত্রিকালদর্শী ব্রাজর্ষিকে কি অপরূপ পদার্থে পরিণত করিয়াছেন, কিরূপ নিসর্গের উচ্চস্তর হইতে অস্বাভাবিকতার আবর্জ্জনাযুক্ত স্তরে অবনমিত করিয়া পৌরাণিকতাগ্রস্ত বাঙ্গালীর মনস্তুষ্টি বিধানের প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

বিশ্বামিত্র বা বশিষ্ঠ ব্যক্তি বিশেষের নাম কি পরিবার বিশেষের উপাধি, বেদজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ তাঁহার বিচার করিবেন। ঋষিদ্বয়ের বৈরিতার উপাখ্যানে কতটুকু ঐতিহাসিক

সত্য নিহিত আছে, তাহাও আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা অমর কবি বাল্মীকির নিকট এই তেজস্বী ঋষির যে চিত্রটী উপহার পাইয়াছি, তাহা গৃহে আনিয়া কতদূর পরিষ্কৃত ও অবিকৃত রাখিতে পারিয়াছি, তাহাই একবার দেখিব।

যজ্ঞ-রক্ষার জন্য রামচন্দ্রকে রাক্ষসবধের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া বিশ্বামিত্র তাঁহাকে সঙ্গে লইবার জন্য অযোধ্যাপুরীতে পদার্পণ করেন। এই উপলক্ষেই রামায়ণে বিশ্বামিত্রের সহিত আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। বাল্মীকির দশরথ এই পদার্পণে হৃষ্টান্তঃকরণে মুনির প্রত্যুদ্গমন করতঃ নানা শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহার অভিলষিত কার্য্য করিয়া কৃতার্থ হইবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। কৃত্তিবাসের দশরথ বিশ্বামিত্রের নাম শুনিবামাত্র সন্দিগ্ধ ও চিন্তিত; শিষ্টাচার ও চাটুবাক্যের অভাব হইল না। কিন্তু অন্তঃকরণে ভাব রহিল "এ বালাই না আসিলেই ভাল হইত।" বিশ্বামিত্র যথাসময়ে রাক্ষস বিনাশের জন্য রামচন্দ্রকে চাহিয়া বসিলেন। দশরথ অবশ্যই বিকটাকার পরাক্রান্ত রাক্ষসদিগের সম্মুখে কিশোরবয়স্ক প্রিয়তম পুত্রকে প্রেরণ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু বাল্মীকির দশরথ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া সরল ভাবে আপনার আপত্তি জানাইলেন এবং মুনি কিছুতেই পশ্চাৎপদ না হইলে স্বয়ং সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বাল্মীকির বিশ্বামিত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, রাজাকে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনরূপ গর্হিতাচরণ স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং প্রতিজ্ঞাচ্যুত দশরথকে অযোধ্যায় রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ দশরথকে প্রতিজ্ঞাচ্যুতির অবৈধতা এবং বিশ্বামিত্রের আশ্রয়ে রামচন্দ্রের নিরাপদতা প্রদর্শন করতঃ দশরথের সম্মতি জন্মাইলেন। রাজা রাম ও লক্ষ্মণকে প্রফুল্লমুখে আহ্বানকরতঃ বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কৃত্তিবাসের বিশ্বামিত্র বাক্যবীর ও অভিশাপ প্রদানে ক্ষিপ্রহস্ত। তিনি দশরথের রামচন্দ্রকে প্রেরণে অনিচ্ছাদর্শনে কেবল ক্রুদ্ধ হইলেন না, সূর্য্যবংশ বিনাশ করিবার ভয় দেখাইলেন। দশরথ অগত্যা চাতুরীর আশ্রয় লইলেন, রাম ও লক্ষ্মণকে না পাঠাইয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে পাঠাইলেন। পাঠক দেখিবেন, দেশীয় চরিত্রের নীচতা কেবল সেকলের ইতিহাসেই বর্ণিত হয় নাই। যাহা হউক, কৃত্তিবাসের বিশ্বামিত্র রাস্তায় যাইতে যাইতে এ চাতুরী ভেদ করিলেন। তখন বিষমকাণ্ড বাধিল। বিশ্বামিত্র ফিরিলেন, তাঁহার নেত্র হইতে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, অযোধ্যাবাসী প্রজার ঘর দ্বার সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। প্রজারা রামচন্দ্রের শরণাগত হইল, ভক্তবৎসল রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের চরণে ধরিয়া মিনতি করিলেন, মুনি প্রসন্ন হইলেন, এবার অযোধ্যাপুরীর দিকে অমৃত নয়নে চাহিলেন, অযোধ্যাপুরী যেমন ছিল, আবার তেমন হইল। বাঙ্গালীর কাব্যে ইহার পর ক্রন্দনের পালা উপযুক্তরূপে অভিনীত হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যের এ অভাবটী কৃত্তিবাস সুদসমেত পূরণ করিয়া লইয়াছেন।

রাম ও লক্ষ্মণ মুনির সঙ্গে চলিতে লাগিলেন, ক্রমে তাড়কা রাক্ষসীর বন আসিল। বাল্মীকির বিশ্বামিত্র বালক রামচন্দ্রকে তাড়কা বধে উত্তেজিত করিলেন, এতৎপক্ষে স্ত্রীবধে

দোষ নাই, উপদেশ ও মহাজনগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিলেন। কৃত্তিবাসের বিশ্বামিত্র, যিনি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নেত্রাগ্নি দ্বারা অযোধ্যাপুরী ভস্মীভূত করিতেছিলেন, তাড়কার নামে একেবারে কম্পিত-কলেবর। বালক রামচন্দ্র তাঁহাকে বুঝাইলেন, রাক্ষসী খাইতে আসিলে তাহাকে মারিতে দোষ নাই, স্পর্দ্ধা করিয়া বলিলেন, রাক্ষসীকে মারিতে তৃতীয় বাণ নিক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। যখন তাড়কা রামচন্দ্রের প্রতি গর্জ্জন করিতে করিতে ধাবমান, তখন বাল্মীকির বিশ্বামিত্র হুঙ্কার করতঃ তাহাকে ভর্ৎসনা এবং রাম ও লক্ষ্মণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন; আর কৃত্তিবাসের বিশ্বামিত্র?

"উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর,
দূর হৈতে দেখালেন তাড়কার ঘর॥
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া।
অতি ত্রাসে মুনিরাজ গেল পলাইয়া॥
শ্রীরাম বলেন ভাই মুনির সহিত।
শীঘ্র যাহ গুরু একা যান অনুচিত॥"

তাড়কা মরিবার সময়ে যে বিকট শব্দ করিল, তাহাতে কৃত্তিবাসের

"বিশ্বামিত্র মুনির হইল হতজ্ঞান।"

জীবিতাবস্থায় তাড়কাকে দেখিতে মুনির সাহসে কুলাইয়াছিল না, তিনি তাড়কার মৃত দেহ দেখিতে গেলেন, কিন্তু তখনও

"মরেছে তাড়কা তবু মুনি কম্পমান।

বাল্মীকির বিশ্বামিত্র তাড়কাবধে সন্তুষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে বিবিধ অস্ত্র প্রদান করিলেন, তাঁহার সামরিক বল বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

যখন ভারত পৃথিবীর গৌরবস্থল ছিল, তখন ব্রাহ্মণেরা কেবল দেবপূজক ছিলেন না, তাঁহারা মানবের শিক্ষা-গুরু ছিলেন, কেবল শাস্ত্রশিক্ষা নহে, ক্ষত্রিয়কে শাস্ত্রশিক্ষা প্রদানও তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

যে ঋষির প্রথম জীবন সমরক্ষেত্রের বিভীষিকা তুচ্ছ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল, যিনি পুরুষকার বৃদ্ধির দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় রাজ সম্পদ তুচ্ছ করিয়া অরণ্যের দুর্গম প্রদেশে তপোবলে সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাঁহার ন্যায় শস্ত্র শিক্ষার উপযুক্ত গুরু কে?

কৈবর্ত্তের নৌকা যে সুবর্ণে পরিণত হইল, এ কাহিনীটী বাল্মীকির রামায়ণে পাই না। কৃত্তিবাসের কৈবর্ত্ত পাষাণ-রূপিণী অহল্যার মানবী হইবার কথা শুনিয়াছিল; সে পোষ্য বৃদ্ধির ও গৃহিণার গালাগালির ভয়ে নৌকা খানি লইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু বাঙ্গালী কবির বিশ্বামিত্র এরূপ স্থলে সম্বল শূন্য নহেন।

"কৈবর্ত্তকে ডাকিয়া বলেন তপোধন।
না আসিলে ভস্ম আমি করিব এখন॥"

তাড়কাকে ভস্ম করিতে না পারিলেও কৈবর্ত্তকে ভস্ম করার স্পর্দ্ধাটা বাঙ্গালী চরিত্রেরই অনুরূপ, জনকরাজার পুরোহিত রাম লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিবৃত করিবার সময়ে আমরা যে সাহস, যে তেজ, যে অধ্যবসায় এবং যে সচেষ্টতার পরিচয় পাই, পৌরাণিকতা ও অলৌকিকতার আবরণ উন্মুক্ত করিলে তাহাতে ভারতের এক গৌরবময় যুগেরই প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত হয়। বাঙ্গালী কবির বিশ্বামিত্র চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিয়া কোথাও আমরা বাল্মীকির এই বিশ্বামিত্রকে খুঁজিয়া পাই না। তাহার পরিবর্ত্তে পাই, একটী কৌপীন তিলকধারী বাক্যবীর ভীরু দুর্ব্বল কোপনস্বভাব

দশকর্ম্মান্বিত পুরোহিত। যখন জাতীয় চরিত্র অবনত হয়, তখন পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষ বা দেবতারাও নিষ্কৃতি পান না। দোষ ঠিক কৃত্তিবাসের নহে; মুসলমান আমলের পৌরাণিকতা-পরিপ্লুত দেশের।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা ও বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভানুমতী ও প্রবাসের পত্র।

ভানুমতী।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যাঁহারা সুন্দর কবিতা লেখেন, তাঁহারা ভাল গদ্য লিখিতে পারেন না। উদাহরণ স্থলে বাঙ্গালার প্রধান দুই কবির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে; কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহারা উভয়েই কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ও প্রথিতযশাঃ, কিন্তু গদ্য লিখিতে যাইয়া কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহারা যে গদ্য লিখিয়াছেন, তাহা চন্দ্রিমা হৃদয়ের কালিমা। উহা না লিখিলেই যেন ভাল হইত। নবীন বাবুর বেলায় আমরা ইহার অন্যতর ভাব দেখিতে পাই। নবীন বাবুর ভানুমতী, পদ্য গদ্য মিশ্রিত পুস্তক। পদ্য ভাগের পরিচয় দেওয়া তত আবশ্যক মনে করি না। কারণ কোকিলের সুস্বরের পরিচয় দেওয়া বৃথা চেষ্টা। ইহার গদ্যাংশ প্রাঞ্জল ও মধুর, কেমন যেন তর তর ভাবে হৃদয়-তন্ত্রীর সহ ইহা এক সূত্রে চমকিয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ভানুমতীর প্রথম হইতেই কয়েক পংক্তি তুলিয়া পাঠকদের উপহার দিলাম :—

"শরৎকাল। প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল প্রাতঃসূর্য্যের মৃদুল কিরণে হাসিতেছিল। পশ্চিমে অনন্ত সাগরের লীলারাশি, পূর্ব্বে বৃক্ষপল্লব-সমাচ্ছন্ন শ্যামল পর্ব্বত-মালা। উভয়ের মধ্যে নাতিবিস্তৃত দীর্ঘায়ত হরিৎ শস্যক্ষেত্র-খচিত তটভূমি। তাহার স্থানে স্থানে নিবিড় তরু কানন শোভিত, ছনুয়া, বড ঘোলা, বড় বাকিয়া, পেকুয়া প্রভৃতি গ্রামাবলীর বর্ষা-বিধৌত শ্যামকান্তি। উত্তরে বর্ষায় পর্ব্বত প্রবাহে পূর্ণকলেবর শঙ্খনদের ও দক্ষিণে মাতামুহুরী নদীর বিশাল রজত-ধারা। বাল সূর্য্যের তরল সুবর্ণকর-মণ্ডিত হইয়া এই দৃশ্যাবলী যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা কবির বর্ণনাতীত।"

অনেকে বলেন, ভানুমতী চরিত্র কিছু অতিরঞ্জিত; কিন্তু অনুশীলন প্রভাবে মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বৃত্তির স্ফুরণ হয়। তখন তাহারা এমন সকল কার্য্য করিতে সমর্থ হয় যে, সাধারণ লোকে তাহাকে অতিপ্রাকৃত মনে করিতে পারে। সেই জন্যই আমরা পূর্ব্বকালীন অনেক ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত মনে কুটিল কটাক্ষে অবলোকন করিয়া থাকি। আবার পাশ্চাত্য ব্যক্তিদের সেই প্রকার কার্য্য দেখিয়া অনেক সময় তাহাদের প্রশংসা করিতে থাকি। অনুশীলন প্রভাবে সন্তরণ দ্বারা অনতিদীর্ঘ সাগর শাখা অতিক্রম করা একেবারে অমানুষিক নহে।

তিনি প্রকৃত ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তিনি প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার সহিত ভগবানের বা ভগবতীর বিভিন্ন মূর্ত্তি দর্শন করেন। সেই জন্যই সেই কিশোরী, শান্ত, বিনম্র, গম্ভীর অথচ

উদার কণ্ঠে দিগ্মণ্ডল কি এক গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ করিয়া গাইতেছে ;—

দুই করে লয়, দুই বরাভয়,
লয় বিনা সৃষ্টি-স্থিতি নাহি হয়,
সদা শিব ঊর্দ্ধগ্রীব,
দেব ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃত ঈশ্বর-ভক্ত প্রতি কার্য্যেই কেবল ভগবানের খেলা অবলোকন করেন। তাহা একস্থল হইতে দেখাইতেছি :—

"একি ঘটনা। শ্রীভগবানের মূর্ত্তি দর্শনের জন্য ভক্তিতে অধীরা হইয়া যদি একটী কিশোরী এরূপ ভাবে একজন অজ্ঞাত পুরুষের গলায় পড়িতে পারে, তবে ব্রজকিশোরীরা অদ্ভুতকর্ম্মা ও দৈবশক্তি-সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া সেই সজল-জলদ-স্নিগ্ধ কান্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রাসের শেষে ভক্তিতে, ভক্তির চরম প্রেমে অধীর হইয়া তাঁহারা শ্রীঅঙ্গ আলিঙ্গন করিবে, তাঁহার মুখ চুম্বন করিবে, তাহাতে নিন্দার বিষয় কি ?"

অন্যত্র :—

"তখন আমার মনে হইল যে, একটী মূর্খ কিশোর সন্ন্যাসীকে লইয়া যখন ইঁহারা এরূপ করিতেছে, তখন স্বয়ং ভগবান নবীন কিশোর শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে ইহারা কি করিবে ?"

ভানুমতী গ্রন্থে ভানুমতী ও অনাদিনাথ দুইটী অনুপম চিত্র বা গীতোক্ত ধর্ম্মের সাকার প্রতিমূর্ত্তি। যিনি এরূপ আলেখ্য সম্মুখে ধরিতে পারেন, তাঁহার শক্তি ও কবিত্ব কতদূর, তাহা চিন্তার বিষয় বটে।

প্রবাসের পত্র।

কবিবর ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ সময়ে যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থলের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত তাঁহার পত্নীর নিকট পত্রাকারে লিখিয়াছিলেন। তাহাই প্রবাসের পত্র আখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজীতে মহামতি Cowper সাহেবের পত্রগুলি ছাত্রদের পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের মতে নবীন বাবুর পত্রগুলিও আমাদের ছাত্রদের স্কুল-পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে ছাত্রগণ একাধারে আনন্দের সহিত সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। পত্রগুলি যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি তরল ও হৃদয়স্পর্শী। আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের প্রধান ঐতিহাসিক স্থলগুলি প্রায়ই তিনি দর্শন করিয়াছেন এবং তাহাদের অতীত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সকল স্থানের অবস্থার, বর্ত্তমানের সহিত অতীতের তুলনা করিয়া ব্যথিত হৃদয়ের যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার স্বদেশবাৎসল্যের পূর্ণ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আহা !, সেই চিতোর, সেই পুনা, সেই অমৃতসর কি ছিল, আর কি হইয়াছে ?

তাহার "ভারতরমণী চিত্র" বাস্তবিক পড়িবার জিনিষ, এমন সরল ও স্বাভাবিক ভাবে ভারত-ললনার বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালার অন্য কোন লেখকের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয় নাই। আমরা অনুরোধ করি, কেহই এই প্রবন্ধটী পাঠের সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না। কিন্তু এতদ্দেশের রমণীরত্ন দেখিয়াও কবি বঙ্গ রমণীর মধুমাখা ভাব ভুলিতে পারেন নাই। সেই জন্য কবি আবার ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইয়াই তাহার বন্ধু হেম বাবুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া গাইয়া উঠিলেন :—

কে চায় খাইতে মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে ?
কোথা হেন শতদল,
বুকে করি পরিমল,
থাকে পতি মুখ চেয়ে মধুমাখা শরমে।
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

আমরা এই পত্রগুলি পড়িয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছি যে, ইহার কয়েকটী স্থল পাঠককে উপহার না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না :—

ভারতে যেমতি পুরাকালে হায়!
শোভিত আসর আলোক-মালায়,
যেমতি গাইত গীত গায়কায়,
পুরিয়া যামিনী সঙ্গীত সুধায়।
সেই নৃত্যগীত রয়েছে সকল,
কিন্তু কোথা গেল সেই বীর্য্যবল?"

সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া ত তাঁহার জন্যে কোন পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি নাই, গোদাবরিতে ডুবিয়া কি পারিব?

আবার :—

"বিংশতি কোটী নরাধমে আজ ভারত মাতার বক্ষ গুরুভারে পীড়িত না করিয়া, যদি এরূপ একটী নারী, একটী দুর্গাব্রতী থাকিত, জননীর কি দুর্গোৎসবই না হইত। হায়! হায়! দুর্গাব্রতীর কি চিরদিনের জন্যে বিজয়া হইল! আবার কি তাহার বোধন হইবে না?"

অন্যত্র :—

"যে পর্য্যন্ত রমণীর হাসিতে আলোকিত না হইয়াছিল, জগৎ অরণ্য ছিল।" কথাটা বড় গভীর। আমাদের বঙ্গসমাজ রমণীর হাসি শূন্য, আমাদের জীবন তাই এত উৎসাহ-হীন, এত আনন্দ-শূন্য।

পাঠক এ পর্য্যন্ত কোন কবিতা-লেখকের করনিঃসৃত এমন গভীর ভাবপূর্ণ প্রাঞ্জল হৃদয়-স্পর্শী গদ্য প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন কি? আমরা বলিব, এবিষয়ে নবীন বাবু সমস্ত বাঙ্গালা কবিতা-লেখকের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস।

এক্ষণে আমরা কবিকৃত "রৈবতক" "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" এই কাব্য ত্রয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বাস্তবিক এই তিন খানা একই মহাকাব্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র। রৈবতক ইহার আদি কাণ্ড, কুরুক্ষেত্র ইহার মধ্য কাণ্ড ও প্রভাস ইহার উত্তর কাণ্ড। সুতরাং এই তিনখানা গ্রন্থ আমরা একখানা মনে করিয়াই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই তিনখানা গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন এক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের ভিতর হৈ চৈ পড়িয়া যায়। কেহ বলিলেন, আমাদের ধর্ম্ম গেল; কেহ বলিলেন, এত দিন পর মহর্ষির মহাভারত রসাতলে গেল; কেহ বা এই মহাকাব্যকে "ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন মহাভারত" আখ্যা দিয়া অদ্ভুত সমালোচনার এক প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া একদেশ-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন না যে, কবির বিচরণ-ক্ষেত্র অনন্ত। কবির আদর্শ এই অনন্ত-বিস্তৃত বিশ্বমণ্ডল। কবির উদার হৃদয় কখন ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। কবির চিত্ত কি এক অদ্ভুত রাগে রঞ্জিত থাকে। তাহা সর্ব্বদাই সত্য, নূতন ও সঙ্কীর্ণতা-পরিশূন্য। এই সুধা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নহে, ইহা সর্ব্বকালে সর্ব্বলোকের উপভোগ্য ও অমৃত সঞ্চারিণী।

মহাভারতের অংশ বিশেষ লইয়া এই কাব্য ত্রয়ের সৃষ্টি। রৈবতকে সুভদ্রার বিবাহ, কুরুক্ষেত্রে সপ্তরথি-বেষ্টিত অভিমন্যু-বধ, আর প্রভাস, যদুবংশের সেই অমানুষিক আত্মহত্যা অবলম্বনে লিখিত। তিন কাব্যেই কবির অদ্ভুত কবিত্ব ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় ছত্রে ছত্রে প্রকটিত হইতেছে। কবির প্রত্যেক চিত্র অতি ভাস্বর ও কি যেন একটী অপার্থিব রসে রঞ্জিত।

পাঠক তুমি, যদি একাধারে নিঃস্বার্থ ভালবাসা, অনন্ত প্রেম, মানবাতীত বীরত্ব, অতুল প্রতিহিংসা, সর্ব্বভূতে সমবেদনা ও কর্ম্মের অনন্ত প্রভাব ও অপরিহার্য্য ফল, অপার্থিব বিশ্বজনীন উপচিকীর্ষা বৃত্তি ও মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বা দেবত্ব-প্রাপ্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই কাব্যত্রয় পাঠ করুন। তাহা হইলে, কখন বিস্ময়ে অভিভূত, কখন শোকে দ্রবীভূত, কখন প্রতিহিংসায় উত্তেজিত, কখন নিষ্কাম ধর্ম্মের পবিত্র অনন্ত উৎসের সুধা পানে মোহিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মহাকাব্যের নায়ক নায়িকার চিত্রগুলির কতকগুলি পৌরাণিক, কতকগুলি কবির নূতন সৃষ্টি—শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভদ্রা, অভিমন্যু, উত্তরা, ব্যাস, দুর্ব্বাসা, সাত্যকী, সত্যভামা, রুক্মিণী, বলরাম, কর্ণ ও ভীষ্ম প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্র। জরৎকারু ও বাসুকী পৌরাণিক চিত্র হইলেও কবির হস্তে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত। শৈল ও সুলোচনা কবির নূতন সৃষ্টি। চরিত্র চিত্রনেই কবির কবিত্ব। এখন আমরা দেখিব, কবি এই সকল চরিত্র চিত্রনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে কবির আসন কোথায় স্থাপিত হইবার যোগ্য।

আমরা প্রায় অধিকাংশ শাস্ত্র গ্রন্থেতেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা, শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব দেখিতে পাই। সকল গ্রন্থেতেই শ্রীকৃষ্ণ এক বাক্যে ভগবানের অবতার, কিন্তু অনেক স্থলেই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র আবিলতায় পূর্ণ, সেই আবিলতায় সেই বিশ্বপূজ্য শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে নানা কুৎক্রিয় কার্য্য, আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু কবি কেমন স্বাভাবিক ভাবে সেই আবিলতার ঘন জাল বিদূরিত করিয়া ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের কেমন স্বাভাবিক দেব ভাব প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার এই কাব্যত্রয় মধ্যে এমন একটী কথা নাই, যাহাতে দেবত্ব বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কার্য্যই জগতের হিতার্থ নিয়োজিত। তিনি দেখিলেন, ভারতের রাজগণ পরস্পর পরস্পরের হিংসায় পরিপূর্ণ। ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। অধার্ম্মিক অহঙ্কারী ক্ষত্রিয় রাজগণ নিয়ত কেবল পরস্পর আত্ম কলহে নিমগ্ন। নিষ্কাম ধর্ম্ম ভারত হইতে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইয়াছে। সকাম ধর্ম্মের লীলা খেলা সর্ব্বত্র প্রবল বেগে চলিতেছে। আড়ম্বরপূর্ণ যাগ যজ্ঞে কেবল পশু হিংসার স্রোত প্রবাহিত। তাই তিনি বেদব্যাস ও অর্জ্জুনের দ্বারা এই দুর্নীতির অবসান সাধন করিতে নিযুক্ত। ভারতকে এক ধর্ম্ম রাজ্যের শীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করিয়া অমূল্য নিষ্কাম ধর্ম্মের বীজ উপ্ত করাই তাঁহার এক মাত্র উদ্দেশ্য। সেই সময়ের ধর্ম্মের আবিলতা জড় উপাসনার প্রাবল্য দৃষ্টে কবি শ্রীকৃষ্ণ মুখে অর্জ্জুনকে শুনাইতেছেন :—

"মানব চেতনা যুক্ত, বিবেকী, স্বাধীন,
জড় ওই সূর্য্য হ'তে কত শ্রেষ্ঠতর!
মানব! উৎকৃষ্ট সৃষ্ট। যে অনন্ত জ্ঞানে
সৃজিত, চালিত এই বিশ্ব চরাচর,
পড়েছে সে জ্ঞান ছায়া হৃদয়ে যাঁহার!
ছাড়ি সে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শকতি,
সে কেন পূজিবে অন্ধ জড় প্রভাকর!"

আবার ভারতে অবস্থা দেখিয়া ভগবানের হৃদয় কিরূপ উদ্বেলিত হইয়াছে, তাহা কবি সুন্দর ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন ;—

"শুধু হস্তিনায় নহে। এই হিংসা-বিষ
সমস্ত ভারত বর্ষে, পশ্যে দেখিতে

হইতেছে বিধূমিত। প্রত্যেক নৃপতি,
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দুল মত, রয়েছে চাহিয়া
নিজ প্রতিবাসী পানে। ভাবিছে সুযোগ
বজ্র লম্ফে পৃষ্ঠে তার পড়িবে কেমনে।"

তাহার পর যদুনাথ এই মহা আসুরিক ভাবের পতন সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

জননী ভারত !
শক্তি স্বরূপিণী তুমি, শক্তি-প্রসবিনী।
ব্যাসের অনন্ত জ্ঞান, ভুজ অর্জ্জুনের,
তোমার সেবায় মাতঃ! হলে নিয়োজিত
কোন্ কার্য্য নাহি পারে হইতে সাধিত।"

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার, তাই কবি তাঁহাকে মানবের অতীত জিঘাংসা-বর্জ্জিত ও মানবের আদর্শ স্বরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। যখন বাসুকী ভদ্রার হরণার্থ উদ্যোগ করিয়া ব্যর্থমনোরথে ফিরিয়া যান, সেই সময় কেশব তাহার এই অত্যাচার কাহিনী মানবাতীত ভাবে বলিতেছেন :—

চিনিয়াছি আমি দস্যুর নায়কে,
তার অপরাধ ক্ষমিব শত।

নিজ ভগ্নীকে অপহরণ করিতে আইসে, এমন দস্যুকেও যিনি সামর্থ্য ও শক্তিসত্বেও ক্ষমা করিতে পারেন, তিনি দেবতা নয় তবে দেবতা কে? শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

নহে পূর্ণ ধর্ম্ম, যদি না হয় নিষ্কাম,
যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, ধর্ম্ম জ্ঞানের সোপান।
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন,
অপূর্ণ-মানব মন,
অপূর্ণে পূর্ণের জ্ঞান, অন্তে অনন্তের,—
সুদুরূহ তপস্যা সাধ্য।

গীতায় ভগবান যে ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, কবি তাহাই কবিতাহারে গাঁথিয়া আমাদের উপহার দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব, শ্রীকৃষ্ণের দেবোপম নম্রতা কবি বহু স্থানেই সুন্দর ভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। কোন স্থানেই আমরা শ্রীকৃষ্ণের দেবত্বের অপলাপ দেখিতে পাই নাই। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের ভগবদ্গীতার প্রশংসায় যখন ব্যাস বলিলেন :—

আমি মাত্র মালাকর। জ্ঞানের উদ্যানে
ফুটিয়াছে গোবিন্দের যে ফুল নিচয়
গাঁথিয়াছি গীতাহার, তুলি সেই ফুল—
চির সুবাসিত, পুণ্য—পরিমলময়।

অমনি শ্রীকৃষ্ণের সেই দেবোপম উত্তর হইল :—

ব্যাসদেব মালাকর। জ্ঞানের উদ্যান
গোবিন্দের! এ রহস্য বড় হাস্যকর।
কার সৃষ্টি গোবিন্দের কুসুম কানন?
কার সৃষ্টি সে কানন কুসুম নিকর?
কার পদ তলে বসি সংহিতা বেদের
পড়িতাম, উচ্চ উপনিষৎ সকল?

* * *

শিষ্যের উদ্যান আর গুরু মালাকর—

* * *

জ্ঞানের অনন্তাকাশে তুমি প্রভাকর।
আমি মাত্র তবালোকে দীপ্ত শশধর!

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই স্থির, ধীর ও আনন্দময়, তাঁহার স্বহস্ত-পালিত নারায়ণী সেনার নিপাতে কবি কি বলাইতেছেন :—

সেনা নারায়ণী—
সাধিবারে নারায়ণ কার্য্য ধরাতলে
হইল সৃজিত, সাধি নারায়ণ কার্য্য
এই দীর্ঘ কাল, আজি জল-বিম্বরাশি
মিশাইল মহা জলে ইচ্ছায় তাঁহার।

প্রভাসে দেখিতে পাই যে, ভারতের আর্য্য অনার্য্য সকলেই কৃষ্ণ-প্রেমে মুগ্ধ। গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম তখন ভারতময় বিস্তৃত, ভদ্রা ও

শৈলেন্দ্র আদর্শে তখন আর্য্য অনার্য্য একই ধর্ম্মে একত্রীভূত। তাঁরত আর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন নহে। এক অদ্ভুত স্বর্গীয় প্রেমে সকলেই আত্মহারা। ভগবানের কৃষ্ণাবতারের কার্য্য শেষ। ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত। তচ্ছায়ায় ভারত এক ধর্ম্মে ও এক রাজ্যে অনুপ্রাণিত। তখন একমাত্র যাদবগণ সুরাপায়ী ও যথেচ্ছাচারী। সুতরাং তাহাদের কর্ম্মফল প্রদানই ভগবানের শেষ কার্য্য।

যখন দ্বারকায় নানা অমঙ্গল প্রভৃতি লক্ষিত হইতে লাগিল, তখন রুক্মিণী ও সত্যভামা সকাতরে ভগবানের নিকট তাহার প্রতিবিধানের প্রার্থনা করিলে, কবি ভগবানের মুখে যে উত্তর শুনাইয়াছেন, তাহা ভগবানেই সম্ভবে :—

শান্তি অমঙ্গল—
সকলই মানবের নিজ কর্ম্মফল।
সেই কর্ম্মফল রেখা, উহাই অদৃষ্ট লেখা—
মানব আপনি যদি না করে খণ্ডন,
কার সাধ্য সেই লেখা করিবে মোচন।

ভগবানের নিকট সকল মানবই সমান, তাঁহার আত্মীয় অনাত্মীয় সম্ভবে না। যে যেমন কর্ম্ম করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে। রাণীদের জ্ঞান-নেত্র স্পষ্টীকৃত করণার্থ কবি ভগবানের শ্রীমুখ হইতে কৌশলে বাহির করিলেন :—

অধর্ম্মের যে উত্থান, জ্বালাইল সে শ্মশান,
সে অধর্ম্ম যাদবের অস্থি মাংস গত,
বহিতেছে শোণিতের সঙ্গে অবিরত।
এ অশান্তি অমঙ্গল জানিও তাহার ফল ;
কেমনে নিবারি, কেন নিবারিব আমি?
নহি যাদবের, আমি মানবের স্বামী।

জরা যখন যোগ-মগ্ন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া প্রথমে মুগ্ধ হইলেন, পরে "প্রত্যাখ্যান" স্মরণ করিয়া একেবারে উন্মত্তবৎ ভগবানের প্রতি বিষম শরাঘাত করিলেন, তাহার পর আহত ভগবান সেই ভক্তের আশা পূর্ণ করিবার জন্য বলিলেন :—

পাইয়াছ বহু দুঃখ এস বক্ষে প্রেমময়ী,
উভয়ের লীলা শেষ, চল শান্তি ধাম।

এ কি মানব-চরিত্র! প্রাণঘাতী অস্ত্র প্রহারে এমন অমৃত প্রস্রবণের উৎপত্তি। মহাভারতে কিন্তু জরা ব্যাধ কর্ত্তৃক এইরূপ শর নিক্ষেপ করার কথা আছে। কবি যদিও একটু ইতর বিশেষ করিয়াছেন, কিন্তু চরিত্র চিত্রণে একই স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব। ভারতে জরার প্রতি যে অমানুষিক অনুগ্রহ, এখানে জরুর প্রতিও সেইরূপ আপার্থিব অনুগ্রহ,কাজেই রূপান্তর করিলেও কৃষ্ণ চরিত্রের কোন অংশে কালিমা প্রদান করেন নাই, বরং তাহা অপেক্ষা আরও ভাস্বর হইয়াছে। তার পর বাসুকী যখন জরুর এই অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন কবি সেই শ্রীমদ্ভাগবতের অমর শ্লোকের বিকাশ করিলেন :—

নাগরাজ! বৃথা শোক কর পরিহার!
যেজন যেভাবে চায়, সেভাবে আমাকে পায়,
স্বভাবে মানব করে মম অনুসার
ভ্রাতা ভগ্নী দুই জন, চাহিয়াছ শত্রু ভাবে,
পাইয়াছ শত্রু ভাবে আজি দুই জন।

যদিও এই স্থল মহাভারতের সহিত অভিন্ন নহে, তথাচ কবি কেমন কৌশলে শাস্ত্রের সহিত মিল রাখিয়াছেন :—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্ব্বশঃ॥

অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থেও যে ভাবে যে যে কারণ বশতঃ কৃষ্ণাবতার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কবি ঠিক সেই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র চিত্রণ

করিয়াছেন। শাস্ত্রের সহিত কবি কৃষ্ণ চরিত্রে কোথাও অসামঞ্জস্য ভাবে চিত্রিত করেন নাই। তিনি যেন শাস্ত্রের সহিত এক স্বরে বলিতেছেন :—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্,
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

মহাভারতে অর্জ্জুন-চরিত্র সর্ব্বত্র উজ্জ্বল, —উদার, ধার্ম্মিক, অদ্বিতীয় বীর। বীরত্বে ও চরিত্রে তিনি সর্ব্বত্রই অতুলনীয়। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ নবীন কবিও অর্জ্জুন চরিত্রের সর্ব্বত্রই অতি উদার ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন মনুষ্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার এই চিত্রে অতি দোষদর্শী সমালোচকও বোধ হয় কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। সেই অতুলনীয় বীরত্ব, সেই উদার বিশ্বপ্রেম, সেই মহান বৈরাগ্য, সেই অনুপম কৃষ্ণ প্রেম, সর্ব্বত্রই যেন জীবন্ত ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহার হৃদয়ের যেন প্রতি পরমাণু শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন তাঁহার যেন জগতে অস্তিত্বই নাই। তিনি কর্ত্তব্যানুরোধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত। কিন্তু তাঁহার বিশ্বপ্রেমে-প্রণত-হৃদয় কখন স্নেহশূন্য নহে। শত্রুর প্রতিও তাঁহার হৃদয় স্নেহান্বিত। এমন কাঠিন্যে কোমল ভাব, বজ্রাগ্নিতে রমণীয় কুসুমের মনোহর বাস, অগ্নিতে হিমানীর সুস্নিগ্ধকর মধুর ভাব, কবি যেমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা কাব্যে অতীব দুর্লভ।

মহাভারতের কবি, মহাবীর অর্জ্জুনের তীর্থ ভ্রমণের যে কারণ দর্শাইয়াছেন, সে কারণটী যথেষ্ট নহে। সেই স্থল বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয় যেন সেই মহাত্মার এই যৌবনে তীর্থ ভ্রমণের অন্য কোন মহত্তর কারণ প্রচ্ছন্ন আছে। আমাদের কবি সেই প্রচ্ছন্ন কারণটী এমন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহাতে অর্জ্জুনের সহানুভূতি ও বিশ্বপ্রেম যুগপৎ উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়া অর্জ্জুন-চরিত্র যেন আরও ভাস্বর ও উজ্জ্বলতর ভাব ধারণ করিয়াছে।

দস্যু চন্দ্রচূড় মুখে যখন তাহার নাবালিকা অনাথা বালিকার কথা শুনিলেন, তখন তাহার হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল এবং সেই কন্যার জন্য তিনি যৌবনে যোগীবেশে কত স্থান অনুসন্ধান করিলেন। এমন হৃদয় না পাইলে কি তিনি জগতে বীরাগ্রগণ্য হইতে পারিতেন। কবি অর্জ্জুন-চরিত্র সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে কেমন মহিমাময় করিয়া তুলিয়াছেন। সেই চন্দ্রচূড়-কন্যার অনুসন্ধান না পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে যে কি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল, তাহা তাহার নিজ বাক্যেই মহাকবি প্রকটিত করিয়াছেন :—

অষ্টম বর্ষীয়া সেই অনাথা বালিকা
ভাসিতে লাগিল, দেব, নয়নে আমার।
বহু অন্বেষণে তার না পাই সন্ধান,
কি যে তীব্র মনস্তাপ হৃদয়ে আমার
বসাইল বিষদন্ত, সুখ শান্তি মম
হইল বিষাক্ত সব। তীর্থ পর্য্যটনে
আসিলাম জুড়াইতে সেই মনস্তাপ।

মহাভারতকার মহর্ষি উর্ব্বশীরূপ নিকষ পাষাণে অর্জ্জুনের জিতেন্দ্রিয়তারূপ লোকললামভূত সুবর্ণপুঞ্জকে তুলিত করিয়া যেমন নরগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন, আমাদের নবীন কবি শৈলজারূপমাধুরিমাময়ী রমণীরত্ন দ্বারা অর্জ্জুন চরিত্র সেইরূপ কত মহান ও কত প্রতিভাময় করিয়া তুলিয়াছেন। মহাভারতেও যেমন কৃষ্ণ-পরিত্যক্ত অর্জ্জুন আর সে অর্জ্জুন নহেন, নবীন-বাবু-চিত্রিত কুরুক্ষেত্রাদির অর্জ্জুনও কৃষ্ণহারা হইয়া আর সে অর্জ্জুন নহেন। এইরূপ যেখানেই দেখি,

সেখানেই অর্জ্জুন-চরিত্র আমাদের কবি দ্বারা অধিকতর প্রতিভাময় ও উজ্জ্বল ভিন্ন কোথায়ও উহা হীনপ্রভ হয় নাই।

অভিমন্যু।—মহাভারতেও দেখি অভিমন্যু বীর, সরল ও সদা প্রসন্নময়, আবার আমাদের শ্রদ্ধেয় কবিও তাঁহাকে অদ্বিতীয় বীর, সংসারের কুটিলতা-বিবর্জ্জিত ও সদা প্রফুল্লিত ও সদানন্দময় করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে সংসারের কুটিলতা যেন একেবারেই প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। তাই যুদ্ধস্থলে তিনি দুর্য্যোধন-পুত্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন :—

বিপুল কৌরব রাজ্য ; কৌরব পাণ্ডব
দুই ভাই ; এ দুয়ের হয় নাকি স্থান
এ বিস্তীর্ণ পিতৃরাজ্যে দুদিনের তরে ?
নাহি হয়, হবে ভাই তোমার আমার—
তুমি ভানুমতী পুত্র আমি সুভদ্রার।
এক ক্ষুদ্র আস্তরণে গলাগলি করি
থাকিতে পরম সুখে পারিব আমরা।

মহাবীর পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি পদে বরিত। সাক্ষাৎ অস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্য্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। সিংহ শিশু হৃদয়ের একটী তন্ত্রীও যেন ইহাতে বিচলিত হয় নাই। বীর উত্তরার নিকট বলিতেছেন :—

উত্তরে ! কি ভাগ্য তোর ! কি ভাগ্য আমার !
ষোড়শ বৎসর মম, সেনাপতি পদে
করেছেন ধর্ম্মরাজ এ দাসে বরণ
আজি রণে। এই দেখ উষ্ণীষে আমার
আশীর্ব্বাদ, গলে বীর-বাহুনীর হার।
দ্রোণ প্রতিদ্বন্দ্বী আমি। ষোড়শ বৎসরে
ফলিয়াছে এ গৌরব, এ ইন্দ্রত্ব তাঁর,
কোন্ ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যে, কোন্ ক্ষত্রিয়ার ?

আবার মাতার নিকট বিদায় লইয়া যাঁহার কাণে সেই বীর-সিংহের মুখ হইতে অগ্নিবর্ষী আগ্নেয়গিরির ধাতু নিঃস্রবের ন্যায় কি নির্ভীক বাক্য উচ্চারিত হইতেছে শুনুনঃ—

দেও মা ! বিদায় রণে, কর আশীর্ব্বাদ
আজি যেন পরিচয় পায় ত্রিভুবন
অর্জ্জুনের পুত্র আমি সুভদ্রা-নন্দন,
গোবিন্দের প্রিয়-শিষ্য। স্বধর্ম্ম পালন
করি, ধর্ম্মরাজ্য আজি করিব স্থাপন।

মহাবীর বীরবাহুব অনুপম যুদ্ধ কাহিনী মধুসূদন দূতমুখে লঙ্কেশ্বর দশাননকে শুনাইয়াছিলেন, আর আমাদের অতুলনীয় মহাকবি নবীন বাবু অভিমন্যুর সেই অমানুষিক যুদ্ধকাহিনী বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে শুনাইতেছেন। এরূপ কবিত্ব-ছটা এই দুই স্থল ভিন্ন বাঙ্গালা কাব্যে আর অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। উহা যখনই পড়িবে, তখনই হৃদয়তন্ত্রীগুলি যেন কি এক শোকমিশ্রিত অনুপম আনন্দের উদ্দাম নৃত্য করিতে থাকিবে।

ব্যাস।—মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চরিত্র মহাভারতে যেমন ভাস্বর, নবীন বাবুর তুলিতেও সেইরূপ ভাস্বর। কোথাও তাহার চিত্র কোন পক্ষে হীনতর হয় নাই। তাঁহার সেই উদার জ্ঞান, অনন্ত বিশ্বপ্রেম, গভীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও ত্রিকালজ্ঞতা সর্ব্বত্রই প্রতিভাত হইতেছে। তাই তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

"মানুষের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অদৃষ্ট অনন্ত।"

তাহার আশ্রম যেরূপ ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, ঐরূপ চিত্র মর্ত্ত্যে সম্ভবে না। উহার সর্ব্বত্রই যেন স্বর্গীয় মনোহর সৌন্দর্য্য-পরিপূর্ণ। উহা দর্শনে পাঠক স্বতঃই ভারতচন্দ্রের সুরে বলিয়া উঠিবেন।

যে যার রক্ষক, সে তার ভক্ষক,
সার এই অসার সংসারে।

ভগবান ব্যাসদেব ভারতে একদিন গান্ধারীকে তাঁহার মৃত সন্তানাদির দর্শন দিয়া-

ছিলেন। তাই অদ্ভুতশিল্পী নবীন বাবুও শৈলকে দ্বৈপায়ন-কৃপায় ভবিষ্যৎ চিত্র দর্শন করাইয়াছেন। এই কাব্যত্রয় মধ্যে যেখানেই ব্যাসোক্তি পাঠ করিবে, সেখানেই তাঁহার গভীর জ্ঞান, বিশ্বপ্রেমিক উপদেশ পড়িয়া হৃদয় কি যেন এক অদ্ভুত রসে আপ্লুত হইয়া তালে তালে নৃত্য করিতে থাকিবে।

প্রতি পদার্থেরই দুইটী পৃষ্ঠা,—একটী উজ্জ্বল ও ভাস্বর, অন্যটী কুটিল ও আবিলতাময়। একটী উদার ও বিশ্বপ্রেমময়, অন্যটী সঙ্কীর্ণ ও জিঘাংসা পূর্ণ। তাহাই দেখিবার জন্য কবি একাধারে ব্যাস ও দুর্ব্বাসা চরিত্র স্থাপিত করিয়াছেন। অমার পার্শ্বে পূর্ণমাসী, আলোর পার্শ্বে ছায়া, অনুপম শরদিন্দু হৃদয়ে মৃগপদ-রেখা, মধুর বিশ্ব-প্রেম পার্শ্বে স্বার্থপরতা রূপ আশীবিষ-লহরী। ঈশ্বরের কি লীলা, একের অভাবে অন্যের সৌন্দর্য্য লোপ। এখানে আমাদের নবীন বাবুর শিল্প চাতুর্য্য। তাঁহার চিত্রিত দ্বৈপায়ন পার্শ্বে দুর্ব্বাসা। পাঠকের দক্ষিণে স্বর্গের অনুপম প্রভা ও বামে নারকীয় বীভৎস দৃশ্য। পাঠক দেখুন ও নিজ জীবনের উপকরণ সংগ্রহ করুন।

অনেকে দুর্ব্বাসার এই চিত্রণে দুঃখিত, আমরা বলি, কোথায় দুর্ব্বাসা চরিত্র উদার ও ভাস্বর? যেখানে ধ্বংস, সেখানেই দুর্ব্বাসার খেলা। ধ্বংস ও অভিশাপই তাহার নিত্য সঙ্গী। এজন্য তিনি কত স্থানে বিড়ম্বিত, কোথায়ও সুদর্শন-তাড়িত, কিন্তু স্বভাব অপরিবর্ত্তনীয়, লক্ষ্মী স্বর্গচ্যুত—দুর্ব্বাসার তপস্যার ফলে। একাত্মা ও অভিন্ন-হৃদয় রাম লক্ষ্মণের বিচ্ছেদ দুর্ব্বাসার সদাশয়তার নিদর্শন। বনবাসী পাণ্ডবদের ভস্মীভূত করিবার জন্য যদুগমনে তাঁহার ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইতেছে না? যদুবংশ ধ্বংসই কি তাঁহার সাত্ত্বিকতার লক্ষণ? পুরাণে যাঁহার এইরূপ কার্য্য আমরা ভূর ভূর দর্শন করিতেছি, তখন কবির এরূপ চিত্রণ কি করিয়া বলিব যে অসঙ্গত হইয়াছে? আমাদের মতে তাঁহার এইরূপ চিত্রণে কবিত্ব হিসাবে কবির অদ্ভুত লোকাভিজ্ঞতাই প্রকাশ পাইতেছে। দুর্ব্বাসা চরিত্র যদি ব্রাহ্মণের অনুকরণীয় হয়, বা সাত্ত্বিকতার পূর্ণ ভাতি হয়, তবে সেরূপ ব্রহ্মণ্য বা সেইরূপ সাত্ত্বিকতা সত্বই প্রশান্ত মহাসাগরের অতল জলে নিমজ্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে কি?

সাত্যকি।—সাত্যকিকে আমরা মহাভারতে দেখিয়াছি, তিনি বীর, জ্ঞানী ও অস্ত্র চালনে সুকৌশলী। সর্ব্বদায়ই উচিতবাদী, কিন্তু একটু উদ্ধত ভাব প্রচ্ছন্ন ভাবে যেন তাহার চরিত্রে অন্তর্নিহিত। সেই জন্য দ্রোণ পর্ব্বে ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত ভয়ানক আত্মবিচ্ছেদ। আবার যদুবংশ ধ্বংস সময় সুরাপানোন্মত্ত। কবিও ঠিক সেই ভাবেই সাত্যকি চরিত্র চিত্রণ করিয়াছেন।

কর্ণ।—কর্ণ মহাভারতে অদ্বিতীয় বীর ও অর্জ্জুনের প্রতিযোদ্ধা। কবিও তাঁহাকে ভারতোক্ত চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তুলিত করিয়াছেন। তিনি দুর্ব্বাসার অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যু বধের মন্ত্রণায় কি বলিতেছেন শুনুন:—

অনুমতি দেহ গুরো! ধনুর্ব্বাণ করে
ন্যায় যুদ্ধে বিমুখিব বনের কেশরী,
ততোধিক পরাক্রমী পার্থে দিব রণ,
আজীবন প্রতিদ্বন্দ্বী। আসুন আহবে
বজ্রপাণি, শূলপাণি, দেব সেনাপতি
পালিব তোমার আজ্ঞা, করিব সমর।
এক মাত্র চাহি ভিক্ষা বীরত্বে কর্ণের
করিও না এই ঘোর কলঙ্ক অর্পণ।

দেব পিতা, দেবী মাতা, দেবতা মাতুল ;
জগতের এ দেবত্ব করিব নির্ম্মল।
এ ধর্ম্মে নিপতিত করোনা দাসেরে।
দয়া কর, ক্ষমা কর, ধরি তব পায়।

ঠিক কর্ণের উপযুক্ত কথাই হইয়াছে। "গুণীর নিকট শত্রুর গুণও অবিদিত থাকে না।" কি অতুল চিত্র-কৌশল!

"ভীষ্ম চরিত্র কবি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, সেই গভীর জ্ঞান, সেই ভূয়োদর্শন, সেই ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা, সেই দেবোপম উপদেশ। তাঁহার নিকট কৃষ্ণের দেবত্ব অবিদিত নাই। ভবিষ্যতের ফল তাহার নিকট জাজ্বল্যমান, অথচ কর্ত্তব্যের অনুরোধে পাপ পক্ষ অবলম্বন ও তাহার ভীষণ পরিণাম জগৎকে প্রদর্শন করাইয়া নিজ কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন।

বলদেব।—ভাগবতে আমরা বলদেবকে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া সূতকে বিনাশ করিতে দেখিয়াছি। কবিও স্থানান্তরে হলধরকে সুরাপায়ীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি সুরাপায়ী হইলেও বহুগুণে ভূষিত ও উদার। গুণী না হইলে গুণের মর্ম্ম অন্যে বুঝে না। মহামতি বলদেব ও অর্জ্জুনের অস্ত্র চালনা কৌশল দেখিয়া একেবারে তিনি সমস্ত ভুলিয়া গেলেন ও একেবারে আত্মহারা হইলেন ও গুণীর গুণ কীর্ত্তনে অভিভূত :—

বীরত্বে বীরের প্রাণ
মোহিল, আনন্দে রাম
শান্তি আজ্ঞা করিল প্রচার।

*   *   *   *

"জয় ভদ্রার্জ্জুন জয়"
গাইতেছে ঘন ঘন,
উন্মত্ত রেবতী-রমণ।

ইহা অপেক্ষা বীর চরিত্রের উৎকৃষ্ট তুলি দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। এক কথায় বলদেব চরিত্রের মহিমা কেমন প্রকাশিত হইয়াছে।

নবীন বাবুর বাসুকী এক অদ্ভুত চিত্র। তিনি একান্ত কৃষ্ণভক্ত অথচ রাজ্যাকাঙ্ক্ষা ও ভদ্রার পাণিপ্রার্থী। তজ্জন্য তিনি দ্বারকা প্রচ্ছন্নভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। দুর্ব্বাসার সহিত ষড়যন্ত্রে মজিয়াছেন—কিন্তু ক্রূরতায় তাঁহার মন নাই, সদাই সরল পথের পথিক। ক্রমে কৃষ্ণ তাহার শত্রুর আসন হইতে উপাস্যরূপে পরিণত। তিনি ক্রমে জলে, স্থলে, শূন্যে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ দর্শন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ ভিন্ন জগতে আর কিছুরই অস্তিত্ব তাঁহার নিকট রহিল না। ভক্তের এমন চিত্র, পুরাণোক্ত প্রহ্লাদ চরিত্রে মাত্র দেখিয়াছি। তিনি দৃঢ়তা সহকারে তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে "প্রভু বিষ্ণু জগতের যাবতীয় পদার্থে বিদ্যমান। তিনি জলে স্থলে শূন্যে সর্ব্বত্রই সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান আছেন। ঐ স্তম্ভ মধ্যে তিনি অবশ্যই বিরাজিত আছেন।" আর কবি বাসুকী মুখে কি শুনাইয়াছেন, তাহাও একবার পাঠ করুন :—

কোথা কৃষ্ণ! দেখিছ না কৃষ্ণ কোথা ধনঞ্জয়!
বীরেন্দ্র চাহিয়া দেখ চরাচর কৃষ্ণময়!
কৃষ্ণ চন্দ্রে, কৃষ্ণ সূর্য্যে, কৃষ্ণ গ্রহে উপগ্রহে।
অনন্ত আকাশে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সমীরণে বহে।
মেঘে কৃষ্ণ, বজ্রে কৃষ্ণ, কৃষ্ণদীপ্ত চপলায় ;
কৃষ্ণ ভীম ভূকম্পনে, কৃষ্ণ ঘোর ঝটিকায়।
কৃষ্ণ অমা অন্ধকারে, কৃষ্ণ ফুল্ল জ্যোৎস্নায় ;
কৃষ্ণ সিন্ধু জলোচ্ছ্বাসে, কৃষ্ণ গৈরিক ধরায়।
কৃষ্ণ মহা শৈলাচলে, কৃষ্ণ ফুলে, কৃষ্ণ ফলে,
কৃষ্ণ জলে, কৃষ্ণ স্থলে, তুষারে, কৃষ্ণ অনলে।

ভক্তের শেষাবস্থায় আর তাঁহার নিজের অস্তিত্ব থাকে না। তখন সে ভগবানের সহিত ওতপ্রোত ভাবে সম্মিলন অনুভব করে, এবং তাহাতেই সে সর্ব্বসুখ অনুভব করে। ভগবান চৈতন্যদেবের জীবনে এই [illegible]-

রাত্রি, আর আমাদের কবি বাসুকী হৃদয়ে এই ভাব ফুটাইয়াছেন :—

আমি তার পিতা নন্দ, যশোদা জননী আমি।
শ্রীদাম সুদাম আমি, কত খেলা খেলি সঙ্গে।
ব্রজের কিশোরী আমি, কত ক্রীড়া করি রঙ্গে।

* * *

যাক মান যাক কুল! ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও,
জীবন যৌবন নাথ! নেও তুমি সব নেও!

ভক্তের এইরূপ জীবন্ত ভাব কি অন্য কোন বঙ্গকবির কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছেন? আমার বোধ হয় এই প্রথম। ইহার মূলমন্ত্র ভগবদ্গীতার সেই অমর শ্লোক। ইহা ঐ শ্লোকেরই সাকার মূর্ত্তি :—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্ব মাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগীময়ি বর্ত্ততে॥

ভদ্রা।—ভদ্রা-চরিত্র মহাভারতে দেখিয়াছি কিন্তু নবীন বাবু-কৃত ভদ্র অতুলনীয়া। মহাভারতে যে সকল ভাব প্রচ্ছন্ন, আমাদের কবি-তুলিকায় তাহা সুচিত্রিত। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব, এমন দোষশূন্য আদর্শ বঙ্গবাসীর সম্মুখে কোন বঙ্গীয় কবিই আজ পর্য্যন্ত ধরিতে সমর্থ হন নাই। ইহার সর্ব্বত্রই মধুর। তাহার সমস্ত কার্য্যই যেন এজগতের নহে। তাহার প্রতি কার্য্যই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে মাখা। গীতার প্রতি শ্লোক যেন তাঁহার প্রতি কার্য্যে সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজিত। পৃথিবীতে ভদ্রা চরিত্রের তুলনা কোথাও নাই। ভদ্রা যেন জগতের নহে। সুতরাং তাঁহার তুলনা দিতে আমরা অসমর্থ। কবি-চিত্রিত কোন কার্য্যই মানবোচিত নহে। যিনি পরদুঃখ হেতু নিজ একমাত্র পুত্রের বিরহ ভুলিতে পারেন, তিনি কি মানব?

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহাঃ।
বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

ভদ্রার সুখে দুঃখে শোকে শান্তিতে সফলে ও বিফলে সমভাব, কোথাও তাঁহার চরিত্রের বিকার লক্ষিত হয় না। যখন বলদেব অর্জ্জুনের বীরত্ব দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শান্তির আজ্ঞা দিলেন, তখন সর্ব্বত্র আনন্দলহরী দেখা দিল। সুভদ্রার তখন সর্ব্বাপেক্ষা হর্ষিতা হইবার কথা, কিন্তু কবি তাহাকে অনুপম ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন :—

সর্ব্বত্র আনন্দধ্বনি,
সর্ব্বত্র হাসির রাশি
সর্ব্বত্র আনন্দ ঢল ঢল।
কেবল চারিটি মুখ
গম্ভীর অবাত-ক্ষুব্ধ
মহিমা মণ্ডিত পারাবার।
রথে ভদ্র ধনঞ্জয়
সঙ্গে, কৃষ্ণ, দ্বৈপায়ন,
ঝড়-গর্ভ মহা মেঘাকার।

তাঁহার নিকট শত্রু মিত্রের ভেদ নাই, তাই তিনি সুলোচনাকে বলিতেছেন—

শত্রু! কি মানুষ নহে লো আমার মত?
রক্ত মাংস নাহি কি তাহার?
তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শত্রুর প্রাণ!
এক জল ভিন্ন জলাধার।

* * *

শত্রু! এক ভগবান সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান,
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয়।
কেবা তুমি কেবা আমি, কেবা শত্রু মিত্র কেবা?
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়?

এ কোন মানবের বাক্য না কোন দেবীর বাক্য? আবার :—

মিত্রকে যে ভালবাসে, সকাম সে ভালবাসা,
সেত ক্ষুদ্র ব্যবসায় হয়।

শত্রু মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ
সেই জন দেবতা আমার।

শুনিয়াছি, রোমের বালাগণ পুত্রকে যুদ্ধ-বেশে সাজাইয়া একখানা ঢাল অর্পণ করিয়া বলিতেন, হয় শত্রু নাশ করিয়া মহা গৌরবে এই ঢাল লইয়া আসিও, না হয় সম্মুখ সংগ্রামে দেহত্যাগ করিয়া ইহাতে আরূঢ় হইয়া আসিও। আমাদের কবিও অভিমন্যুর যুদ্ধ-যাত্রাকালে সুভদ্রামুখে কি বাক্য ফুটাইয়াছেন, শুন:—

নারীকুলে ভাগ্যবতী কে আছে এমন
তোর জননীর মত? ভ্রাতা নারায়ণ,
পতি ধনঞ্জয়, পুত্র ষোড়শ বৎসরে
মহারথী, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে
আজি পুত্র সেনাপতি! * * *
* * * * * *
আনন্দাশ্রু ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল
বীর জননীর বক্ষে!

আর কত দেখাইব? ভদ্রাচরিত্রের যেখানে দেখি, সেখানেই অভাবনীয় ও অপার্থিব। বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যের সর্ব্ব বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফুরণকেই মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন এবং তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্রে তাহাই প্রদর্শন করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোন স্ত্রী চরিত্রে মানবীয় সর্ব্ববৃত্তির সম্যক স্ফুরণ দেখি নাই। তিনি দেবী চৌধুরাণীর চরিত্রে এইভাব দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অত্যধিক পতিভক্তির জোয়ারে উহা গৃহমধ্যে পর্য্যবসিত। মহর্ষির সীতাচরিত্র, ভারতের দ্রৌপদী-চরিত্র দেখিয়াছি, তাহাতে মানবীয় মাধুর্য্য, সতীত্ব প্রভৃতি অনেক বৃত্তির স্ফুরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু কবি-চিত্রিত ভদ্রার ন্যায় সমস্ত বৃত্তির স্ফুরণ কোথাও লক্ষিত হয় নাই। তাই বলি, ভদ্রা-চরিত্র বাঙ্গালা কাব্যে অদ্বিতীয় ও অদৃষ্টপূর্ব্ব। ভদ্রা-চরিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্‌-গীতার জীবন্ত ও সাক্ষাৎ সাকার প্রতিমূর্ত্তি। যিনি গীতার গভীর ভাব অনুধাবন করিতে অসমর্থ, আমরা বলি, তিনি যেন গীতার নীরস ভাষ্য পড়িতে না যাইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক নবীনবাবু-চিত্রিত ভদ্রা-চরিত্র পাঠ করেন। তাহা হইলে স্বতঃই গীতার সেই গভীর ভাব তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে। ভগবান! এমন দিন কি হইবে যে, কবি কল্পনায় যে নন্দনের অমিয়ময় চিত্র তুলিয়াছেন, আমরা বঙ্গের ঘরে ঘরে সেই চিত্র দেখিতে পাইব?

স্পর্শমণির প্রভাবে স্বর্ণেতর ধাতু সকল স্বর্ণত্বে পরিণত হয়। তাই ভদ্রার কোলে, দুর্ব্বাসার বিকারে জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত, যে কৃষ্ণকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, এখন দেখিলেন, সেই কৃষ্ণই ব্রহ্মাণ্ডময়। তখন তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটিল, চির অনাস্বাদিত শান্তি লাভ করিয়া তিনি চরিতার্থ হইলেন। যে বাসুকী চিরকাল তাঁহাকে স্ত্রীরূপে প্রাপ্তির কামনায় জীবন কাটাইয়াছেন, শেষ কালে, সেই সুভদ্রার কোলে তাঁহার সে ভাব তিরোহিত। তখন তিনি তাঁহাকে মাতৃভাবে দর্শন করিলেন। মাতৃপ্রেমে তাঁহার হৃদয় নাচিল। বিশ্ব কৃষ্ণ-ময় দেখিতে দেখিতে তিনি প্রেমময় মাতৃ অঙ্কে শায়িত হইয়া অনন্তে বিলীন হইলেন। বাসুকীর বাসনা পূর্ণ হইল।

যেখানে আতুরের উচ্ছ্বাস, সেখানে সুভদ্রা; যেখানে আর্ত্তের হাহাকার-ধ্বনি, সেখানে সুভদ্রা; যেখানে বিরহিণীর নৈরাশ্য, সেখানে সুভদ্রা; যেখানে আহত সৈনিকের বিকট চীৎকার, সেখানেই সুভদ্রা তাঁহাদের শুশ্রূষায় রত। পিপাসিতের কণ্ঠে গঙ্গাজল

শিক্ষন, অন্নহীনের মুখে অন্ন দান, সুভদ্রার নিত্য কার্য্য :—

অয়ং নিজ পরবেত্তি গণনাং লঘু চেতসাম্।
উদারচরিতস্থৈব বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

ভদ্রা চরিত্রে ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। যে কবির তুলিতে এমন চিত্র প্রতিফলিত, সে কবি অমর না হইলে আর অমর কে? কবি, তুমি ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার ভদ্রা-চরিত্র যখনই লোকে পাঠ করিবে, তখনই তোমার অনুপম প্রতিভা পাঠকের মানস-মুকুরে প্রতিফলিত হইবে।

ভদ্রা আর মানবী নন, তাঁহার সুখ, দুঃখ, শোক, তাপ প্রভৃতি ভগবানে অর্পিত। তাহার অনন্ত প্রেম বিশ্বব্যাপী নরনারীর প্রতি সমানভ অভিমন্যুর স্থায় পুত্র-বিরহেও তাঁহার বিশ্বপ্রেম উদ্বোধিত। মহা কবি কালিদাসের কুমারসম্ভবে দেখিয়াছি, ভগবান আশুতোষ ধ্যানে নিমগ্ন। কিশোরী উমা তাঁহার পূজায় নিযুক্তা। অদূরে কামদেব সুসময় বিবেচনায় ভগবানের প্রতি ফুল-বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ভগবানের সমাধি চঞ্চল হইল, চক্ষু উন্মিলিত করিয়া সম্মুখে বিশ্ববিমোহিনী কিশোরী উমাকে দেখিতে পাইলেন, তখন অনঙ্গের সৌদামিনী কটাক্ষ্যই স্বাভাবিক, কিন্তু ফল কি হইল, কালের ধ্বংস, ভগবানের হৃদয়ে প্রেমের শান্তিময়ী উৎসের উৎপত্তি। আমাদের কবি কি দেখাইয়াছেন? সম্মুখে বীর-পুত্র অভিমন্যুর মৃতদেহ। মাতৃহৃদয়ে শোকের প্রবল উর্ম্মির আবির্ভাবই স্বাভাবিক। সেই স্থলে কি অতুল বিশ্বপ্রেমের কি বিমল উৎসের উৎপত্তি!—

সমগ্র মানব জাতি আজি অভিমন্যু মোর,
আজি অভিমন্যু মম বিশ্ব চরাচর।
এক বীর পুত্র মম হারাইয়া, লভিয়াছি
আজি কি মহান্ পুত্র অনন্ত অমর।

এই দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমাদের কালিদাসের সেই অমর-শ্লোক মনে পড়ে :—

অবৃষ্টিসংরম্ভ মিবাম্বুবাহম্
অপামিবাধার মনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥

উত্তরা।—উত্তরা-চরিত একটী আনন্দের ক্ষণবিকাশ, যেই আনন্দের লয়, অমনি পাণ্ডবের একমাত্র ভবিষ্যৎ আশা রাখিয়া তাঁহার অন্তর্দ্ধান। অহো! সুখের সৌদামিনী ক্ষণিক চমকাইল, জগত যেন সুখের তরঙ্গে তরঙ্গিত করিয়া তুলিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে হাসি কোথায় লুকাইল, জগত যেন গভীরতর দুঃখ-ঘনে আবৃত হইয়া অনন্ত দুঃখের উচ্ছ্বাস ছাড়িল। অথবা চন্দ্রমা যেন মধুর হাস্য হাসিতেছিল, চকোরিণী সুধাপানে উন্মত্ত হইয়া জগতের নিকট যেন সঙ্গীত-সুধা বিতরণ করিতেছিল। অকস্মাৎ কোথা হইতে করাল রাহু আসিয়া সুধাময় চন্দ্রমা-হৃদয় গ্রাস করিল, চকোরিণীর কপাল ভাঙ্গিল, জগৎ অন্ধকার হইল। মুহূর্ত্ত পরে জগত গভীরতম অন্ধকারে আবরিত হইল। চকোরিণীর সঙ্গীত চিরতরে অন্তর্হিত হইল।

উত্তরা কুরুক্ষেত্র রূপ মরুদ্যান। ২।১টী কবিতা তুলিয়া পাঠকের উপহার দিয়া আমরা উত্তরা-চরিত্র শেষ করিব। উত্তরার কোমল প্রাণে যুদ্ধের এই বিকট বিকাশ সহ্য করিতে পারিতেছে না :—

এই পোড়া যুদ্ধ নাথ। কত দিনে আর
ফুরাইবে, জুড়াইবে অখিল সংসার,
ইচ্ছা করে রাজ্য আশা দিয়া জলাঞ্জলি,
যাই কোন মনোহর অরণ্যেতে চলি।
মানুষে মানুষে যথা হিংসা নাহি করে,
কাঁদে রমণীর প্রাণ রমণীর তরে।

অন্যত্র কবি বর্ণনায় কেমন সুখের তরঙ্গ তুলিয়াছেন :—

মুখখানি ধরিয়া কহিলা কেশব—
"ক' বাপ তোমার ?"
উত্তরা। এবাপ, ওবাপ, ওই বাপ আর,—
কৃষ্ণ। শুনিলে বিরাট রাজ।
বিরাট। মা, কটি মা! তোর ?
উত্তরা। মা আমার পাঁচ
এক মা বিরাটে ওই মাতা আর,
দুই মাতা দ্বারকায়!
লুটিয়া বাপের পায়।
বিরাট। বেয়াই! কে জিতে আজ ?

পাঠক বলুন দেখি, উত্তরা কুরুক্ষেত্র রূপ মহা মরুভূমের শান্তিদায়িণী উদ্যান স্বরূপিণী কি না ?

রুক্মিণী ও সত্যভামা।—কালিদাসকৃত রঘু-বংশে গঙ্গা যমুনা বর্ণন পড়িয়াছি, কিন্তু সে অচেতন গঙ্গা যমুনা। আমাদের নবীন বাবু-চিত্রিত সজীব গঙ্গা যমুনা বর্ণন পড়িয়াছি আর চিন্তা করিয়াছি যে, বাস্তবিকই রুক্মিণী যমুনা, সত্যভামা গঙ্গা। এক স্থিরা, অন্য চঞ্চলা; একটী শান্তিপূর্ণ বেলফুল, অন্যটী সুগন্ধময়ী গোলাপ। একটী কমনীয় উষার শান্তিময়ী প্রভা, অন্যটী প্রদোষের আরামদায়িনী ঈষচ্চঞ্চল মনোহারিণী আভা। কিন্তু এই চঞ্চলা ও স্থিরা রমণী-রত্নের কি অপূর্ব্ব মিলন, একের বিহনে অন্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট বা একের বিহনে অন্যের অবস্থিতি অসম্ভব। একটী সকাম, অন্যটী নিষ্কাম। সকাম নিষ্কামের মিলনের কি মনোহর চিত্র! এ মিলন অপূর্ব্ব, ইহার ফলও অপূর্ব্ব। মহা-ভারতের অনেক স্থলে সত্যভামার কেবল গর্ব্বিত মূর্ত্তিই দেখিয়াছি, কিন্তু কবি এই কাব্য-গর্ব্বের সহিত যে সময়ের অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করাইয়াছেন, তাহা অনুপম। শ্রীকৃষ্ণ কিছুই প্রকাশ করেন নাই, অথচ দেবী সত্যা ভামা যেন স্বামীর মনোভাব বুঝিয়াছেন। সেই জন্য স্বামীর স্পষ্ট অনুমতি না পাইয়াও তিনি অর্জ্জুনে ভদ্রা অর্পণ করিতে অগ্রবর্ত্তী। তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাপূর্ণ, সর্ব্বদিক রক্ষিত।

রুক্মিণী দেবী, তিনি পতিসেবা ভিন্ন অন্য কোন সংবাদ রাখেন না। পতিই তাঁহার একমাত্র আরাধ্য। পতি যাহা করেন, তাহাই শিরোধার্য্য। নিজের মতামত কিছুই নাই, তাই ভদ্রার বিবাহ বিষয়ে তাহার মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিতেছেন;—

দাসীর কিবা মত—
তুমিই করিবে নাথ অর্জ্জুনের সুভদ্রার
এসঙ্কটে পূর্ণ-মনোরথ।

কবি যেমন সপত্নীদ্বয়ের চিত্র ফলাইয়াছেন, তাহা জগতে অতুল। ইহা পার্থিব কি অপার্থিব, পাঠকই বিচার করুন;—

সত্য। জ্ঞানের চূড়ান্ত ফল, গলায় সতীনী দুটি!
জ্ঞানের মহিমা বলিহারি!
এমন লক্ষ্মীর পায়ে আমি সতীনীর কাঁটা
ফুটালে যে তার জ্ঞান ভারি।
রুক্মিণী।—
দিদিরে! দুর্ব্বল প্রাণে কত ব্যথা দিবে আর,
তোর ত হৃদয় দয়াময়;
এমন প্রতিভাময়ী সপত্নী পতির যোগ্যা,
জন্ম জন্মান্তরে যেন হয়।
কি যে অভাগিনী আমি পতিসেবা নাহি জানি,
আপনি মরমে মরে রই।
পতি প্রসন্ন মুখ দেখি যবে পাই সুখ,
তোর কাছে কত ঋণী হই।
সত্য। এ কভু মানবী নয় কি হৃদয় প্রেমময়!
জগতের পুণ্য-প্রস্রবণ!
সপত্নী হইয়া আমি, নহে যোগ্য এ দেবীর
দাসী হয়ে সেবিতে চরণ।

"এ কি মানবী কথা, না দেবীর কথা? কবি প্রতি স্থানেই এই স্বর্গীয় অমিয় বিতরণ করিয়াছেন।

কবি শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখে রুক্মিণী ও সত্যভামা সম্বন্ধে যাহা ফুটাইয়াছেন, তাহাই পাঠককে উপহার দিয়া আমরা রুক্মিণী ও সত্যভামা চরিত্রের উপসংহার করিব :—

হাসিয়া স্বগত কৃষ্ণ কহেন—"কি পুণ্য মম
দুই চিত্র অতুল ধরায়,
রুক্মিণী ও সত্যভামা, নিষ্কাম সকাম প্রেম
প্রবাহিণী যুগল ধারায়,
পবিত্র যমুনা গঙ্গা বহে এক সিন্ধু মুখে,
আমি সেই পুণ্য-পারাবার।
সরল সকাম বেদ ভক্তিময়ী সত্যভামা
জ্ঞান উপনিষদ রুক্মিণী।
নির্জীব নিষ্কাম ভাব আছে তাহা লুকায়িত,
অন্তঃশীলা প্রীতি-প্রবাহিনী।

রুক্মিণী নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি। ভাল মন্দ, হিত অহিত, সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত। তাঁহার সন্তোষেই আত্মসন্তোষ, কাজেই যখন দ্বারকার নানা দুশ্চিত্র দর্শনে সকলে ভীত ও চকিত, তাঁহার সে দিকে দৃকপাত নাই। তিনি জানেন, সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা। তাঁহার রাজ্যে মঙ্গল অসম্ভব, কাজেই তাঁহার চিত্ত অক্ষুব্ধ ও অবিচলিত, সেই জন্যই তিনি সত্যভামাকে বলিতেছেন :—

কি ভীষণ চিত্র দিদি। আঁকিলি নয়নে!
এও তাঁর লীলা মম হইতেছে মনে।
কিন্তু তোর একি ভ্রান্তি! ভারতের যে অশান্তি
লুকাইল স্বপ্নবত লীলায় যাহার
তিনি যাদবের পতি, তিনি কর্ণধার।

সত্যভামা সকাম ধর্ম্মের উপাসক, সেই জন্যই তিনি দ্বারকার অমঙ্গল চিহ্ন দেখিয়া উদ্বিগ্না, কিছুতেই তাঁহার মনে শান্তি নাই। সতত যদুবংশীয়দের জন্য উদ্বিগ্না। রুক্মিণী ও সত্যভামা নিষ্কাম ও সকাম ধর্ম্মের দুই জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। কবি দেখাইয়াছেন, কি সুখে, কি দুঃখে, কি সম্পদে, কি বিপদে, সর্ব্বত্রই নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসক নির্ব্বিকার। তাহার সুখ দুঃখের বা সম্পদ বিপদের দিকে লক্ষ্য নাই। নিষ্কামীর হৃদয়ে কখনই কোন কালিমার ছায়া পড়িতে পারে না। বরং তিনি অনেক সময়েই সকামীর দুঃখ দূর করিতে চেষ্টিত। সেই জন্যই রুক্মিণী সত্যভামার উদ্বেগ দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়াছেন। অন্যপক্ষে সকাম ধর্ম্মের উপাসক সুখে যেমন প্রফুল্লিত, সম্পদে যেমন হর্ষিত, আবার দুঃখে তেমনি হতশ্রী, বিপদে তেমনি চঞ্চলা। সেই জন্যই যদুবংশের অমঙ্গল আশঙ্কায় সত্যভামা আর সে মানিনী নাই। সত্যভামার মনে মহা হাহাকার উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলিব, কবির এই সকাম ও নিষ্কাম উপাসকের চিত্র অতি জীবন্ত চিত্রিত হইয়াছে।

সুলোচনা।—সুলোচনা কবির একটী মধুর নূতন সৃষ্টি। এমন মধুময় চিত্র বাঙ্গালা কাব্যে অতি বিরল। যেখানে সুলোচনা, সেখানেই হাস্যের লহরী, আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত। তাহার জিহ্বার তীব্রত্বে কি যেন মধুমাখা। তিনি মুখরা; কৃষ্ণার্জ্জুনও তাঁহার নিকট অব্যাহতি পান নাই। কিন্তু সেই তরঙ্গ কি মধুরিমাময়। রৌদ্ররসের সহিত এমন শান্তির বা আনন্দের মিলন ত কোথায়ও লক্ষিত হয় না। কবি যেমন সুলোচনা-চরিত্রে আনন্দের লহরী তুলিয়াছেন, এমন আনন্দের সাকার মূর্ত্তি তুলিতে বাঙ্গালায় কয়জন কবি কৃতকার্য্য হইয়াছেন?

পাঠক যদি তুমি কখন কুটিল বেল মুখে শিশির বিন্দুর বর্ষিলন মনোযোগ পূর্ব্বক অব-

লোকন করিয়া থাক, কিম্বা নীল নভস্থলে নক্ষত্ররাজির অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া থাক, অথবা সুন্দর জননীকোলে সুন্দর শিশুর হাসি-ভরা বদনমণ্ডলের স্বর্গীয় ভাব প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাক বা জ্যোৎস্না-পুলোকিত স্বচ্ছ-সলিলা তটিনীহৃদয়ে কুমুদিনী নায়ক চন্দ্রমার বিলোল হাস্য প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাক এবং ঐ সকলের অনুপম মধুর সৌন্দর্য্য হৃদয়ে ধারণ করিতে কৃতকার্য্য হইয়া থাক, তবে সুলোচনা-চরিত্রের মধুরিমা অনুভব করিতে কিয়ৎপরিমাণে সমর্থ হইয়া থাকিবে।

সুলোচনা বুঝি ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির সাকারা প্রতিমূর্ত্তি। এমন সকামে নিষ্কামত্ব ত কোথায় দেখি নাই। তাহার নিজের বলিতে কিছুই নাই, কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুন তাহার পতিস্থানীয়। এমন অমৃতময় ভাব সুলোচনা চরিত্র ভিন্ন আর কোথাও সম্ভবে না। অভিমন্যু তাহার পুত্রস্থানীয়। অভিমন্যু তাহার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব। এমন পরার্থে সমস্ত নিয়োগ, এমন নিষ্কামে সকাম ক্রিয়া জগতে বিরল। তিনি নিষ্কাম কিন্তু তাঁহার নিষ্কামত্ব সীমাবদ্ধ, কিম্বা অভিমন্যু জন্য তাহার নিষ্কাম ভাব সকাম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সেইজন্যই স্বভদ্রানুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্মের প্রতি তিনি বিরাগ কটাক্ষ করিতে বিরত হন নাই।

তোর নারীধর্ম্ম নিয়া মর গিয়া মড়া ঘাটি,
আমার তাহাতে কাজ নাই।
আহত আমার প্রেমে স্বয়ং কৃষ্ণার্জ্জুন, অস্ত্র
আহত সেবিতে আমি যাই।

* * *

উত্তরা ও অভিমন্যু দুই পুত্র কন্যা মম
থাকিব লইয়া আমি বুকে।
এই মম নারীধর্ম্ম থাকে যদি ধর্ম্ম আর,
মারি শত ঝাঁটা তার মুখে।

সুলোচনার জীবন আনন্দ-লহরী সমবায়ে নির্ম্মিত। সেইজন্যই কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যুর প্রতিমূর্ত্তি অভিমন্যুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দময়ী সুলোচনারও অন্তর্দ্ধান সংযোজিত। বৈষ্ণব কবি যেমন বৃন্দাবন-লীলার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি রাধার বিলয় সংঘটন করিয়াছেন, নবীন বাবুও সেই প্রকার, আনন্দময় অভিমন্যু বিলয়ের সহিত আনন্দগত প্রাণা ভগবানের হ্লাদিনী-শক্তি স্বরূপিণী সুলোচনারও বিলয় সংযোজিত করিয়াছেন। ইহাতে কবির অন্তর্দৃষ্টির প্রভাব প্রকাশিত হইয়াছে। বৃন্দাবন-লীলার পর যেমন কৃষ্ণ-লীলায় হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ অন্তর্হিত, সুলোচনার মৃত্যুর পরও এই কাব্যত্রয়ের মধুর অমৃতময় আনন্দ-লহরী-লীলা অন্তর্হিত।

জরৎকারু।—জরৎকারু কবির এক অদ্ভুত চিত্র। যদিও মহাভারতে জরৎকারু নাগকন্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ কার্য্যের উল্লেখ নাই। কাজেই এই কাব্যত্রয়ে কবি কেবল নামটী মাত্র ভারত হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, আর সমস্তই কবির নূতন সৃষ্টি। জরৎকারু কিশোরী অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণে হৃদয় অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু সংসার-চক্রের কুটিল গতিতে শ্রীকৃষ্ণ এই অনাঘ্রাত ফুলের সৌরভ গ্রহণ করিবার অবকাশ পান নাই। কিন্তু কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। জীবন, যৌবন, আশা, ভরসা, সুখ ও বিলাস, সমস্ত তিনি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভালমন্দ বিচার ছিল না। শত্রুভাবে হউক, মিত্রভাবে হউক, শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণকেও ভ্রাতৃ করা চাই, আবার ভ্রাতার রাজ্য উদ্ধার করা চাই। সেই জন্য তিনি দুর্ব্বাসার কপট স্ত্রী। তিনি কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্য না করিয়াছেন, এমন কষ্টসাধ্য কার্য্য নাই। জীবণ প্রান্তরে সেই মহা ভীতিপূর্ণ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্থে তিনি ভ্রমণ

করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাপ্তি তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। শ্রীকৃষ্ণ অন্যের হয়, তাহা তাঁহার সহ্য হয় নাই। যখন সখ্যভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না, তখন তাঁহার হৃদয়ে প্রত্যাখ্যাত নারী জাতির প্রবল তাড়নায় তিনি শুশ্রূষাপরায়ণা সুভদ্রাকে বলিতেছেন :—

অভাগিনী সূর্য্যমুখী মরে চাহি রবিপানে,
অন্য দিকে তবু নাহি দেখে এক বার।
হায়! সূর্য্যমুখী মত চাহি সে রবি পানে
এরূপে জীবন বৃন্তে যাব শুকাইয়া।
আর নাগবালা আমি দংশিব তাহার বুকে
মারিব মরিব তারে এ-বুকে লইয়া।

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী তাহাই করিয়াছে। কৃষ্ণে একান্ত বিহ্বলা, অথচ তাঁহাকে পাইতেছে না। অন্য কৃষ্ণ প্রেমের লাভ করে, তাহা তাহার সহ্য হয় নাই। তাহার অভিমান নৈরাশ্যে অগ্নিগর্ভ ভূধরের ন্যায় শেষে ভয়ানক অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছে। তাহার সেই অভিমান-বিহ্বলা কৃষ্ণপ্রেম-উন্মত্ততায়, তাহার হস্ত হইতে সহসা শরক্ষেপণ। সেই শর ভগবানের পদে নিপতিত বা তাঁহার সাদরে গ্রহণ। তাহার পরই তাঁহার ভগবান প্রাপ্তি। সেই মারাত্মক শরে যেন ভগবানের প্রেম-উৎস উদ্বোধিত হইল। অমনি ভগবান কারুকে শ্রীঅঙ্গে ধারণ করিলেন :—

কণ্ঠ জড়াইয়া কারু অংসোপরে রাখি মুখ
কৌস্তভের মালা যেন বক্ষে সুশোভিত,
বাম করে ধরি তারে, রাখিয়া দক্ষিণ কর
নাগরাজ শিরে, প্রেম অশ্রু বিগলিত,
নাগরাজ বৃথা শোক কর পরিহার!
যেজন যে ভাবে চায়, সে ভাবে আমারে পায়
স্বভাবে মানব করে মম অনুসার।

ইহা কি গীতার সেই শ্লোকের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি নহে,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥

কারু নারায়ণ বুঝে নাই, স্বর্গ বুঝে নাই; কবি দেখাইয়াছেন, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। তিনি কৃষ্ণকে চাহেন। সেই ইচ্ছা কবি কারু মুখে কেমন ফুটাইয়াছেন :—

শুনিয়াছি আজীবন শুনিলাম ভ্রাতৃমুখে
তুমি নারায়ণ, তুমি পতিত পাবন।
না জানি কি নারায়ণ, পতিতপাবন কিবা,
এই জানি তুমি মম জীবন মরণ!
তুমি নয়নের আভা, তুমি রসনায় সুধা,
তুমি মম জীবনের সঙ্গীত কেবল!
তুমি মম চির সুখ, তুমি চির দুখ,
সুখ দুঃখ মন্থনের অমৃত শীতল।
ভাসে এই দেহে, ভাসে অঙ্গে অঙ্গে,
কৃষ্ণ শিরা স্রোতে বহে।
হৃদয়েতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নয়নেতে,
অধরেতে কৃষ্ণ নাম।
শ্রবণেতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ দরশনে,
নাসিকায় কৃষ্ণ ঘ্রাণ।

প্রেমের ইহা অপেক্ষা উচ্চাদর্শ রাধা ভিন্ন আর কোথাও দেখি নাই। যাহার এমন কৃষ্ণ-প্রেম, তাঁহার ত কৃষ্ণ প্রাপ্তি নিশ্চয়। তাই কবি শেষে কারুর ভগবান প্রাপ্তি দেখাইয়া কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে কবির হৃদয়ে চিন্ময়ের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। তাই তিনি বিহ্বল হৃদয়ে গাইয়াছেন :—

যুগে যুগে মানবের নিষ্ঠুরতা আর,
করিবে কি এইরূপে ক্ষত দেহ সুকোমল,
জড় ব্যাধ-ক্ষত মৃগ শিশু সুকুমার
যুগে যুগে এইরূপ না হইলে রক্তপাত,
হায়! নাথ মানবের রক্ত কলুষিত—
হবে নাকি পবিত্রিত? গলিবে না পাপ-শিলা।

কবি আমাদের সম্মুখে আর এক ছবি ধরিয়াছেন, খ্রীষ্টানেরা যে যিশু খ্রীষ্টের পাপীর জন্য রক্তপাতের গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাহা

নূতন নহে। দ্বাপরের শেষে ভগবান নিজ রক্ত মোক্ষণ করিয়া পাপীর পাপ বিধৌত করার সূত্রপাত করিয়াছেন। যিশুর রক্তপাত তাঁহার অনুকরণ মাত্র। ইহা কবির স্বকপোলকল্পিত নহে, মহাভারতেই আছে :—

"ইত্যবসারে জরা নামক কোন উগ্রমূর্ত্তি লুব্ধক মৃগয়াভিলাষী হইয়া সেই স্থানে আগমন করত শয়ান যোগযুক্ত মাধবকে মৃগ বোধে সত্বর শায়ক দ্বারা বিদ্ধ করিয়া গ্রহণাভিলাষে নিকট গমন করিল এবং নিকটস্থ হইয়া সেই যোগযুক্ত পীতাম্বরধারী চতুর্ভুজ পুরুষকে দর্শন করত আপনাকে কৃতাপরাধ বোধে সঙ্কিত মনে তদীয় চরণযুগল ধারণ করিল।" মহাভারত মৌষলপর্ব্ব চতুর্থ অধ্যায় বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

শৈল।—শৈল নবীন বাবুর একটী অদ্ভুত অভিনব চিত্র। সুভদ্রা ভিন্ন ইহার সহিত অন্য কোন চিত্রের তুলনা হয় না। আর্য্য কবি ভিন্ন অন্য কবির তুলিতে এরূপ চিত্র ফুটাও অসম্ভব। আমাদের বোধ হয়, শৈল-চিত্রে কবি সাকার উপাসনার জাজ্জ্বল্যমান প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠক মনোযোগ পূর্ব্বক শৈল-চরিত্র পাঠ করুন। তাহা হইলে সাকার পূজার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। সাকার-পূজক প্রথমতঃ নিজের কোন অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে ভগবানের কোন শক্তি বিশেষ বা কোন দেব বা দেবীর মূর্ত্তি বিশেষের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাহার পূজা করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি বশতঃ ঐ ব্যক্তিগত বুদ্ধি লোপ পাইয়া সেই মূর্ত্তিতে তিনি ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্য ভাব দর্শন করিতে থাকেন এবং তাহাতে তাঁহার ঈশ্বর দর্শনের ফল লাভ হয়। ক্রমে তাঁহার নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির ইচ্ছা লোপ পায় এবং ইহা সর্ব্ব আনন্দের নিদানভূত আনন্দময় মূর্ত্তিরূপে তাহার নিকট একভাবে প্রকাশ পায়। তিনি তাহার সেবাতেই নিজ সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা ও কামনা অর্পণ করেন। ক্রমে তাঁহার সকাম ভাব নিষ্কামে পরিণত হয়। তখন তাঁহার সাকার ভাব লোপ পায়। চরাচর সমস্তই এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহার নিকট জাগতিক সমস্ত ক্রিয়াই যেন সেই ভগবানের খেলা বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত পার্থিব ভাব তিনি ভগবানে অর্পণ করিয়া নিজে কি এক স্বর্গীয় ভাবে বিমোহিত থাকেন।

শৈলজা প্রথমে অর্জ্জুনকে পতিভাবে কামনা করিয়াছেন, এবং পতিভাবে তাহাকে পূজা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে অর্জ্জুনকে শত্রু জ্ঞান করিতেন কিন্তু তাঁহার মাহাত্ম্য দর্শনে সে ভাব দূর হয় :—

শুনিলাম কাণে
শোকপূর্ণ অনুতাপ জনকের তরে,
অনাথার অন্বেষণে দেশ দেশান্তরে,
উঠিল হৃদয় ক্ষুদ্র, করিনু অর্পণ
পিতৃহন্তা পদে এই অনাথ জীবন।

ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে অধিক দিন অর্জ্জুন আর পতিভাবে স্থান পাইলেন না, ক্রমে অর্জ্জুন তাহার হৃদয়ে একাধারে পিতা, মাতা, পতি, ভ্রাতা, পুত্র ও কন্যার স্থান অধিকার করিল। দেবতা জ্ঞানে তিনি অর্জ্জুনকে পূজা করিতে লাগিলেন :—

এই চরাচর
হইল অর্জ্জুনময়, হইনু তন্ময়।
কভু পার্থ পতি, আমি প্রেমে আত্মহারা
কভু পার্থ পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা।
কভু পার্থ ভ্রাতা, আমি স্নেহে নিমজ্জিতা,
কভু পুত্র পার্থ, আমি বাৎসল্যে পূজিতা।
কভু পার্থ সখা, আমি সখী বিনোদিনী,
কভু পার্থ প্রভু, আমি দাসী আজ্ঞাধিনী।

কভু আমি পার্থ, পার্থ শৈলজা আমার,
অভিন্ন অন্তর কভু—নদী পারাবার।

কি সুন্দর উপাসনা, কি গভীর প্রেম, উপাস্য উপাসকের কি অভিন্ন ভাব! যখন শৈলজার এইরূপ অবস্থা, সেই সময় তাঁহার সৌভাগ্যে মহর্ষি ব্যাস তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত। মহর্ষির উপদেশে অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার যে ভাব ছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইল। তিনি পূর্ণ-মনোরথা হইলেন, তাঁহার উপাসনা সফল হইল।:—

শৈল!
সিদ্ধ তব পার্থ পূজা, পূজ তুমি এবে
পার্থরূপে ভগবান, অনন্ত সুন্দর,
অনন্ত মহিমাময়, প্রেম পারাবার।
থাকে যদি কণামাত্র কামনা উত্তাপ,
হৃদয়ে নিবিবে, শান্তি পাইবে পরম।

কবি এই ছলে সৎগুরুর সেই মানব হৃদয়ের উপর অনন্ত প্রভাব প্রদর্শন করাইয়াছেন। এখন শৈলহৃদয়ে যে ভগবান প্রীতির প্রেম উথিত হইল,সেই প্রেম মানবের স্বর্গের সোপান সে প্রেমে আসক্তির কর্দম ভাব বা কামনার ছায়া মাত্র রহিল না। শৈলহৃদয়ে স্বর্গীয় কি এক প্রেমের হিল্লোল উঠিল। শৈল শান্তি পাইল ও তাহার হৃদয় পবিত্র হইল। সমস্ত কামনা ভগবানে অর্পিত হইল। সেই জন্যই প্রাণাধিক অভিমন্যুর মৃত্যুতেও তিনি বিচলিত নহেন। যাহার কামনা ভগবানে অর্পিত, তাহার সমস্তই ভগবানে মিলিত। তিনি প্রেমকণ্ঠে বলিয়াছেন:—

ওই সর্ব্ব শোক নিবারণ
দাঁড়াইয়া নারায়ণ শান্তি প্রস্রবণ,
শান্তির ত্রিদিব বুকে
পুত্রে সমর্পিয়া সুখে
কর আমাদের শোক চরণে অর্পণ;
প্রেম যোগে কর স্নান স্থাবর জীবন।

এই ভাবই মনুষ্যত্বের পূর্ণত্ব,এই ভাবই মানুষের শেষ কামনা, অথবা সিদ্ধাবস্থা। এ আদর্শের কি আর ব্যাখ্যা আছে? তাই বলিতেছিলাম, কবির শৈলজা চিত্র অতুল বা শৈলজায় কবির কবিত্ব। এরূপ কবিত্ব বঙ্গকাব্যোদ্যানে বড়ই বিরল। এখানেই কবির শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্পনা-চাতুর্য্যের পূর্ণ বিকাশ।

আবার বলি, শৈলজা চিত্র সাকার পূজার পূর্ণ বা অনন্ত আদর্শ। এমন সাকার পূজার আদর্শ আর কোথাও দেখি নাই। সান্ত কেমন অনন্তে মিলিত হয়, জড় কেমন চিন্ময়ে পরিণত হয়, কামনাস্রোত কেমন নিষ্কাম পারাবারে মিশিয়া যায়, তাহার এক অনন্ত আদর্শ কবির শৈলজা চিত্র।

শৈল ও কারু উভয়েই কামনার প্রস্রবণ। প্রথমে অর্জ্জুন ও কেশবহৃদয়ে কামনা-অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে দুইজন দুই পথে গমন করিয়াছেন। শৈল যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথ শান্তিময়, সেই কারণে শৈল যতই অগ্রসর হইয়াছেন, ততই তিনি শান্তিময়ী ও কারুর পথ কণ্টকময়, সেইজন্য কারু যতই অগ্রবর্ত্তিনী, ততই অশান্তি, ততই আবেগময়ী, ততই নিরাশা,ততই অশান্তির আগুন তাহার হৃদয়ে প্রবলতর হইয়াছে। স্রোতস্বতী তরঙ্গময়ীই হউক, আর শান্তিময়ীই হউক, সেই অনন্ত মহাসাগরেই তাহাদের পরিণতি। কবি দেখাইয়াছেন, বিপথের ফল অশান্তি ও সুপথের ফল চিরশান্তি। সেইজন্য কারুর হৃদয় বিরহ-বিষে জর্জ্জরিত,আর শৈলের হৃদয় ক্রমে শান্তিময়ী।

অনেকে বলিতে পারেন, নবীন বাবু এই যে অনার্য্য নাগ জাতির উত্থান চেষ্টা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কোথায় পাইলেন?

আমরা বলিব, ইহাও তাঁহার একেবারে স্বকপোল কল্পনা নহে? মহাভারতেই ইহার নির্ব্বাক ইঙ্গিত আছে :—

"কেশব পার্শ্বস্থিত বভ্রুর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত বলিলেন, আপনি সত্বর দ্বারকানগরে গমন করিয়া রমণীগণকে রক্ষা করুন। যেন দস্যুগণ ধনলোভে তাহাদিগকে হিংসা করিতে না পারে। জ্ঞাতিবধ সন্তপ্ত মদমত্ত বভ্রু নিতান্ত শ্রান্ত হইলেও কেশব কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া প্রস্থিত হইতেছেন, ইত্যবসারে ব্রহ্মশাপ বশতঃ কোন লুব্ধকের একটী কূট সংযুক্ত দুরন্ত মুষল সহসা আপতিত হইয়া বভ্রুর সন্নিধানেই তদীয় জীবন হরণ করিল।"

মহাভারত মৌষল পর্ব্ব—চতুর্থ অধ্যায়।
বঙ্গবাসীর বর্দ্ধমান অনুবাদ।

এইরূপ বধ কি কোন প্রচ্ছন্ন শত্রুকৃত নহে? আর এই ইঙ্গিত কি কবির পক্ষে যথেষ্ট নহে? আবার কৃষ্ণও এইরূপ কোন লুব্ধক কর্ত্তৃক বিদ্ধ। ইহাতে কি একটী ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাইতেছে না?

কবি কোনও সূত্র অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়া থাকেন, কিন্তু কোন কবিই ত সেই আদর্শের সহিত সর্ব্বতোভাবে এক পথে গমন করেন না। কবি নূতন নূতন ফুল তুলিয়া তাহার কাব্য গ্রন্থকে সাজাইয়া থাকেন। মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণের অনুকরণে অনেক রামায়ণ হইয়াছে। সকলেই কি মহর্ষির কৃত রামায়ণের সহিত একপথে গমন করিয়াছেন? মহাকবি কালিদাস মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন করিয়াই রঘুবংশ রচনা করিয়াছেন, তিনি কি তাহাতে নূতন নূতন ফুল সন্নিবেশ করেন নাই? মহাকবি-কালিদাস শকুন্তলা লিখিয়া মহাভারতের সেই অমরকাব্যে মহর্ষি-নির্দ্দেশিত পথ ভিন্ন অন্য পথে কি গমন করেন নাই? যদি তাঁহারা ভিন্ন পথে গমন করিয়া রচনা-নৈপুণ্যে কাব্যজগতে অমর হইয়াছেন, তবে আমাদের কল্পনা-কৌশলী নবীন বাবুই বা কেন তাঁহার এই অনুপম সৃষ্টি-চাতুর্য্যে অমর পদবীতে ভূষিত হইতে পারিবেন না?

কবিতা জীবনের পথ সরল করে। কল্পনা শক্তিকে অনন্ত বিরাট পথে প্রধাবিত করিয়া ইহজগতে ভগবানের কত লীলা প্রকটিত করে। কবিতা মনের বৃত্তিনিচয়কে স্ফূর্ত্তি বিশিষ্ট করে। অন্যে যে সুখ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না, কবির নিকট তাহা অতি সুলভ। সাধারণ লোক যাহাতে কোন রসের সত্তা অনুভব করিতে অসমর্থ, কবি তাহাতে নব রসের লীলা-ক্ষেত্র অবলোকন করিয়া নিজেও বিভোর হন ও অপর সাধারণকেও তাহার স্তরে স্তরে হাস্য, করুণ, বীভৎস, ও বীর রসের লহরী-লীলা অবলোকন করাইয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকেন। এক কথায় সাহিত্যে মানব হৃদয়কে কি এক স্বর্গীয় মদিরা পানে পবিত্র সুখ-তরঙ্গে উদ্ভ্রান্ত করিয়া রাখে। সে সুখ কবিতা-সেবী ভিন্ন অন্যের উপভোগ্য নহে এবং কবিতা-সেবী ভিন্ন অন্য কেহ সে বিমল সুখের অধিকারীও নহে।

কবি কোন নিয়মে আবদ্ধ নহে; কিম্বা কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রদর্শিত পথের পথিক নহে। ইহার পথ নিত্যই নূতন, কবি কখন পুরাতন পথে গমন করেন না। পরপদাঙ্কিত মার্গে গমন করা কবির অবমানকর। কল্পনায় কবি হৃদয়কে এক উন্নত পথে প্রধাবিত করে। সেই অদ্ভুত কল্পনা শক্তি বলে কবি যেন সদাই বলীয়ান, সেই প্রভু, কবি অন্যের প্রদর্শিত পথকে সদাই ঘৃণার চক্ষে অবলোকন

করেন, এবং কি এক অমৃত রসে অভিসিক্ত হইয়া তিনি যেন, কি এক স্বর্গীয় অমৃতময় পথে সদাই বিমুগ্ধ ভাবে প্রধাবিত। আমাদের নবীন বাবুর পক্ষে এ নিয়মের অন্যথা ভাব লক্ষিত হইবে কেন? তাঁহার কাব্য পড়ুন; কখন হাস্য কখন করুণ প্রভৃতি নানা রসে বিভোর হইয়া কবিকে ভক্তি পূর্ণ পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা স্বতঃই পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপসংহার।

বঙ্গের কোন কৃতি সন্তান বলিয়াছেন, "যে ভাষাতে ভাবের ছায়া স্পষ্টতঃ লক্ষিত হয়, তাহাকে উৎকৃষ্ট ভাষা বলা যাইতে পারে। এইরূপ ভাষাকে ইংরাজীতে ভাবের প্রতিধ্বনি কহে।" কবিবর নবীনচন্দ্রের কবিতায় বহু স্থলে এইরূপ কবিতার সন্নিবেশ লক্ষিত হয়। অনেক স্থলেই বোধ হয় যেন কবিতা গুলির ভাব স্বচক্ষে পরিদৃশ্যমান হইতেছে :—

ওই শুন বাজে বাঁশী, ওই ডাকে—"আয়! আয়।
"এই যাই, এই যাই" প্রেমে রোমাঞ্চিত কায়
ছুটিলা বাসুকী বেগে, নাচি কর তালি দিয়া,
ধরিলেন ধনঞ্জয় দুই বাহু প্রসারিয়া।
"যাক মান, যাক কুল, ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!
জীবন যৌবন নাথ! নেও তুমি সব নেও!"
কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবাবেশে মূরছিত
হইল পার্থের বক্ষে, দুই বক্ষ সম্মিলিত।
ঘোর গরজন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
ভৈরব বিক্রমে ঝটিকা ঘূর্ণিত;
রহিয়া রহিয়া, আসিছে যাইছে,
আঘাতে পৃথিবী করিয়া কম্পিত।

* * *

যাহাকে আবার বন হইত পূরিত
সুগভীর সুঙ্গনাদে, বেণুর ঝঙ্কারে।
শ্যামলী, ধবলী, লালী! বলি উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিত রাখালগণ আসিত ছুটিয়া
শ্যামলী, ধবলী, লালী, লইয়া।
অভুক্ত তৃণের গ্রাস, লালিত আদরে
আপন রাখাল দেহ।—

এইরূপ ভাষা বাস্তবিকই ভাবের প্রতিধ্বনি। নবীন বাবুর কাব্যে অনেক স্থলেই এরূপ প্রতিধ্বনি লক্ষিত হয়।

বাঙ্গালা সংস্কৃতের আদরের কন্যা। সংস্কৃতের ন্যায় বঙ্গভাষাও প্রথমে কবিতাকারে প্রকাশিত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই বাঙ্গালা গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথমে যে সকল বাঙ্গালা গদ্য পুস্তক বাহির হয়, তাহা পাঠ করিলে এখন পাঠকের সেই পুস্তক বাঙ্গালা কি অন্য কোন ভাষার বলিয়া সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিতের লিখন প্রণালীর সহিত বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর তুলনা করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। সেই প্রকার বাঙ্গালার বাল্য কবি ঘনরামের কবিতার সহিত মাইকেল কি নবীন বাবুর কবিতা তুলনা করিলে অদ্ভুত পার্থক্য অনুভূত হইবে। ইহারই নাম ভাষার বিবর্ত্তবাদ বা ক্রমোন্নতি।

প্রথমে যে সকল মহাত্মা মাতৃ ভাষাকে কবিতা-মালায় সজ্জিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কৃত্তিবাস, কাশীদাস ও মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রথমোক্ত কবিদ্বয় রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যাকারে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। কাশীদাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় সরল, প্রাঞ্জল ও মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট কবিতা শুধু বাঙ্গালায় কেন, অন্য কোন ভাষায়ও আছে কি না সন্দেহ? সারল্য ও মধুরতা গুণে কৃত্তিবাস ও কাশীদাস সর্ব্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। যত দিন বঙ্গভাষা থাকিবে, তত দিন, সাধারণ কণ্ঠে মধুর কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের

গাঁথা ঝঙ্কারিত হইতে থাকিবে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত যেমন বাঙ্গালীহৃদয় অধিকার করিয়াছে, এরূপ বুঝি আর কিছুতেই করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু কবিত্ব হিসাবে কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের প্রতিভা তত সদূরগামিনী নহে। চরিত্র চিত্রণে তাঁহারা উভয়েই কলঙ্কিত। মধুর সরল অনুবাদের প্রতিভা ভিন্ন বিশেষ কোন উদ্ভাবনী শক্তি তাঁহাদের কাব্যে লক্ষিত হয় না। যেখানে তাঁহারা মহর্ষিদের নির্দ্দেশিত পথ অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহাদের পদস্খলন হইয়াছে। এই পদস্খলন অনেক স্থলে বড়ই সাঙ্ঘাতিক। তাঁহারা অনেক চিত্রই যেন মহর্ষিদের বর্ণিত চিত্র অপেক্ষা খাটো করিয়া ফেলিয়াছেন। কৃত্তিবাস অপেক্ষা কাশীদাসই এ দোষে অধিকতর দোষী। তিনি কর্ণ প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর এমন উজ্জ্বল চরিত্রেও কালিমা প্রদান করিয়াছেন। দ্রোণ, ভীষ্ম প্রভৃতিকেও দ্রৌপদীর জন্য লক্ষ্যভেদ করিতে প্রয়াসী করিয়া ব্যর্থমনোরথ করিয়াছেন। কর্ণ প্রভৃতি অনেক চরিত্রই তাঁহার হাতে তেমন ভাস্বর হয় নাই। বিশেষ বিবেচনা করিতে গেলে, কৃত্তিবাস বা কাশীদাসকে অনুবাদক ভিন্ন কবি-শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না।

কবিত্ব হিসাবে ধরিতে গেলে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বা কবিকঙ্কন আমাদের প্রথম কবি। তাঁহার কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি অতি অদ্ভুত। তাঁহার চণ্ডী কাব্য বড়ই কবিত্বপূর্ণ, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার অবলম্বিত ঘটনা তত উচ্চতর নহে এবং তাহাতে তেমন বিচিত্রতা অঙ্কিত হয় না। বিশেষ উচ্চ অঙ্গের চরিত্র-চিত্রণে তিনি তত সিদ্ধহস্ত নহেন।

তাহার পরই আমরা ভারতচন্দ্রের সময়ে আসিয়া পড়ি। ভারতচন্দ্রের ভাষা অতুলনীয়, এমন মধুর-ঝঙ্কারী পিক বঙ্গকাব্যোদ্যানে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সেই মধুর প্রাঞ্জল ভাষা, তাঁহার সেই অমৃতবর্ষী কবিতা-তরঙ্গ যেন হৃদয়ের তন্ত্রীর উপর মধুর ঝঙ্কার করিয়া হৃদয়ের অতৃপ্ত লালসা আরও বর্দ্ধিত করিয়া যায়। তাঁহার কল্পনা শক্তি ও রচনা-বিচিত্রতা অতি উচ্চ অঙ্গের। কিন্তু বঙ্গবাসীর দুর্ভাগ্য এ হেন সরস্বতীর বরপুত্র বড়ই কুপথে গমন করিয়াছেন। সেই পবিত্র দোষে তাহার মনোহর গন্ধবিশিষ্ট পুষ্পাঞ্জলি দেব চরণে অর্পিত হওয়ার অযোগ্য। তাঁহার ভাষা কোকিলকূজনবৎ ঝঙ্কারিত এবং মন প্রাণহারিণী; এবং ভাষার লালিত্য ও মধুরতাগুণে তাঁহার কাব্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও কুরুচি-বাহুল্যে তাহা অতি নীচ স্থান অধিকার করিয়াছে। আহা! তাহার অবলম্বিত বিষয় যদি পবিত্র হইত, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে আজ বঙ্গকাব্যোদ্যানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।

তাহার পর আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময়ে আসিয়া উপস্থিত হই। ইহার পূর্ব্বে বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা মাতৃভাষা সুন্দর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সেই সকল একঘেয়ে ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ। তাহার কোনখানি কাব্য নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নহে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই আমাদের পূর্ব্ব ও আধুনিক কবিতা-যুগের সঙ্গম-স্থান বা মহান মধ্যঙ্গিন রেখা। তিনি কবিতাস্রোত বর্ত্তমান আকারে পরিণত করার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কবিতারাশি যেন কিছু তরল। তাহার কবিতা অতি হৃদয়গ্রাহিণী হইলেও তেমন গভীর নহে। তাঁহার অবলম্বিত বিষয়গুলিও অতি সামান্য।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তেমন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাজেই আমরা এই মহাকবির নিকট সাধারণ কবিতা ভিন্ন কোন কাব্য গ্রন্থ পাই নাই। কিন্তু তিনি যাহা দিয়াছেন, সেই অমৃতপূর্ণ কবিতা-গুলি চিরকাল বঙ্গ-সন্তান পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

ঈশ্বরচন্দ্রের পরই—আমরা কবিকুলচূড়া-মণি মধুসূদনের অমৃতময়ী ঝঙ্কার শুনিতে পাই। ইনিই প্রথমে বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক। বাস্তবিক পক্ষে ইনিই বাঙ্গালার প্রথম বিশুদ্ধ কাব্য প্রণয়ন করেন, তাঁহার মেঘনাদবধ, তঁহার ব্রজাঙ্গনা তিলোত্তমা প্রভৃতি কাব্য বঙ্গকাব্যোদ্যানের উজ্জল পুষ্পগুচ্ছ, যত দিন বঙ্গভাষা থাকিবে, তত দিন বঙ্গবাসী তাঁহার অমৃতময় মধুচক্র-নিঃসৃত অমিয়পানে বিভোর থাকিবে। মাই-কেল বঙ্গ-কবি-সমাজের বরণীয়, তাঁহার ভাষা অনেক কবির গুরুস্থানীয়। আধুনিক কবি-দের মধ্যে তাঁহার কবিতা লালিত্য কিম্বা মধুরতায় অন্য কাহারও কবিতা হইতে কোন অংশে হীনতর নহে। বরং অনেক স্থলেই গুরুস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁহার কাব্যগুলি ব্যাকরণ দোষে দূষিত। তাঁহার কাব্যের অধিকাংশ স্থলেই বিজাতীয় কবির ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার কবিতার উদ্ভাবনী শক্তিতে যদি এই দোষ না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা উদ্ভাবনী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতাম। তিনি পাশ্চাত্য ছাঁচে চিত্রিত করিতে গিয়া রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি মহর্ষি-চিত্রিত ভাস্বর চিত্র-গুলিতে বড়ই কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার অযথা রক্ষকুল-প্রীতি জন্য যে দেবো-পম চরিত্রাবলীতে কালিমা লেপন করিয়া-ছেন, তাহাতেই তাঁহার কাব্য যেন একটু হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কাব্যগুলি ভাষায়, গাম্ভীর্য্যে ও লালিত্যে অতুলনীয় হই-লেও চরিত্র-চিত্রণ দোষে তাঁহাকে আমরা বড় দূষিত মনে করি।

ইহার পরই আমরা রঙ্গলাল বাবুর প্রাভা-তিক পিক ঝঙ্কারবৎ মধুর কবিতাবলীর তানে মোহিত হই। তাঁহার কাব্য প্রধানতঃ বীর রসপূর্ণ, চরিত্র চিত্রণ বিষয়ে তিনিই প্রথমে অগ্রসর হইয়াছেন। এই চরিত্র-চিত্রণ হেম বাবু ও নবীন বাবু কর্তৃক শেষে পূর্ণত্বে পরি-ণত হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পিক বঙ্গ-কাব্যোদ্যানে আসিয়া মধুর গান গাইতেছিল, সহসা একখানা কালমেঘ দেখা দিল, অমৃতবর্ষী পাখী কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, আর ফিরিল না। তাহার সে ঝঙ্কারে আমরা বঞ্চিত হইলাম।

ইহার পরই আমরা হেম বাবুর কবিতা-ঝঙ্কার বঙ্গ কাব্যোদ্যানে শুনিতে পাই। তাঁহা-দের সঙ্গীত নানা পথগামিনী ও মনপ্রাণ-উন্মা-দিনী। উভয়েই চরিত্র-চিত্রণে সিদ্ধহস্ত। লালিত্যে অনেকস্থলে ইঁহারা মাইকেল অপেক্ষা কিছু হীন হইলেও চরিত্র চিত্রনে ইঁহাদের তুলনা নাই। কল্পনাশক্তিতে ইহাঁরা অদ্বিতীয়। কবিত্বে ইহাঁরা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। আমা-দের পুরাণোক্ত ইন্দ্র,পৌলমী প্রভৃতির চরিত্রের সহিত হেমবাবু-চিত্রিত উক্ত চরিত্রগুলি মিলা-ইয়া দেখ, আর মহাভারতীয় বা পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রা প্রভৃতির সহিত নবীন বাবু-চিত্রিত উক্ত চরিত্রগুলির তুলনা কর, আর দেখ, কেমন চিত্রকর ও কেমন চিত্র।

নবীন বাবু-চিত্রিত চরিত্রগুলি কত মহান ও ভাস্বর, তাহা আমরা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। কবিত্ব ও কবিতার সর্ব্ববিষয়ে

বিশেষ অনুধাবন করিয়া বিচার করিলে আমরা হেমবাবু ও নবীন বাবুকে বঙ্গ-কাব্যোদ্যানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনদ্বয় প্রদান করিতে পারি।

গাম্ভীর্য্য ও ভাবগ্রাহিতা গুণে নবীন বাবুর কবিতা অতুলনীয়। পূর্ব্বে যে সকল স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিলেই এ বিষয় পাঠক বুঝিতে পারিবেন। পলাশীর যুদ্ধকাব্যের প্রারম্ভ ভাগ যেমন গভীর, তেমনি বিস্ময়কর। এইরূপ গাম্ভীর্য্য মাইকেলের মেঘনাদবধের প্রারম্ভ ভাগ ভিন্ন বাঙ্গালার আর কোন কাব্যে লক্ষিত হয় না। ইহা সুখের নহে, দুঃখের বা শোকের পূর্ণচিত্র অথচ কেমন মনোহর। ইহা বুঝি কণ্টকময় বৃন্তস্থিত গোলাপ অথবা উগ্রতর বিষধরের মস্তকমণি।

উদ্ভাবিনী শক্তিতে নবীনচন্দ্র অদ্বিতীয়। কবির শৈলজা ও কারু প্রভৃতি চরিত্র তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। নবীন বাবুর কল্পনা শক্তি দূর প্রসারিণী,তাহা যথাস্থানে আমরা দেখাইয়াছি। নবীন বাবুর কবিতা অনুকরণ দোষে দুষ্ট নহে। এই দোষে বাঙ্গালার আধুনিক প্রায় সমস্ত কবিই দূষিত। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বপ্নে পরলোকগত দশরথের দর্শন পাশ্চাত্য ছায়ায় কলঙ্কিত। এইরূপ তাঁহার চিত্রিত অনেক চরিত্র ও বিষয়ে, পাশ্চাত্য কলঙ্করেখা স্পষ্ট বিরাজমান। হেমবাবুর বৃত্রসংহারের বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মস্থল বর্ণনাটী ও তাঁহার ছায়াময়ী কাব্য ইটালীয় কোন কোন কবির পূর্ণ অনুকরণ। ইহা ভিন্ন তাঁহার কৃত "বৃত্রাসুরবধ" কাব্যের আরও কয়েকস্থানে অনুকরণ-গন্ধ অনুভূত হয়।

নবীন বাবুর শেঠভবনের মন্ত্রণাগৃহ বর্ণন স্থলে Milton's Paradise Lost নামক মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গের ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া প্রথম দৃষ্টিতে অনুমিত হয়, কিন্তু মিল্টনের সে স্থল কাল্পনিক জীবে পূর্ণ, আমাদের শেঠভবনের মন্ত্রণাগৃহ ইতিহাস-বিশ্রুত বিখ্যাত ব্যক্তিদের সমবায়ে গঠিত। ইহা কাল্পনিক নহে, প্রকৃত ঘটনা। কাজেই কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও নিকৃষ্ট অনুকরণ নহে। পলাশীর যুদ্ধের দ্বিতীয় সর্গে 'আশার বর্ণনা' অংশটী অতি উপাদেয় হইয়াছে। অনেকে বলেন, উহাতে কবিবর ক্যাম্বেলের অনুকরণের ছায়া পড়িয়াছে। আমরা অনুকরণের কোন গন্ধ পাইতেছি না। উভয় কবিরই উদ্ভাবিনী শক্তি পৃথক পৃথক। পাঠক যদি ঐ বিভিন্ন দেশীয় কবির চিন্তাস্রোত একত্র করিয়া পাঠ করেন, তাহা হইলে উভয়ের পৃথক পৃথক কল্পনাশক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কবিদ্বয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকিবেন।

শ্রীরতিনাথ মজুমদার।

লাদক।*

(অপূর্ব্ব দেশের বিবরণ)

প্রখ্যাত পরিব্রাজকগণ জম্বু ও শ্রীনগর পরিভ্রমণ করিয়া কহিয়া থাকেন, "কাশ্মীর, ভারতে ভূস্বর্গ।" রাজপুতানা রাজ্যের আরাবল্লী গিরি-প্রান্তস্থিত উদয়পুর এবং কাশ্মীর রাজ্যান্তর্গত জম্বু ও শ্রীনগর, ভারতে ভূস্বর্গ বটে, কিন্তু ভ্রমণকারী মহাশয়েরা ভ্রম ক্রমেও লাদক প্রদেশের সর্ব্বজন-প্রিয়া রমণীয়তার দিকে কথন্ও কি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন? লাদক প্রদেশের চিত্তচমৎকারিণী শোভা, মানব মানবীর অপূর্ব্ব শারীরিক সৌন্দর্য্য, প্রসূনপুঞ্জের অনুপম সুগন্ধ, তরুলতাদির আশ্চর্য্য বিশেষত্ব, পর্ব্বত ও কানন সমূহের বিশিষ্টতা, অধিবাসীবর্গের অদ্ভুত আচার ও বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে, পথিকেরা বলিতে বাধ্য হইবেন, লাদকের সমতুল্য দেশ আসিয়া খণ্ডে দ্বিতীয় নাই। কিন্তু কয়জন বঙ্গবাসী পরিব্রাজক, লাদকাভিমুখে অগ্রপদ হইয়াছেন? অনেকে ইহার নামটী পর্য্যন্ত শ্রবণ বা পাঠ করিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। পঞ্চ-আপ-বিধৌত পঞ্জাব প্রদেশের ইসলাম কুল-পুঙ্গব পুরুষ আর সর্দ্দার নবাব হেয়াৎ খাঁ, সি-এস-আই, মহানুভবের ভ্রাতুষ্পুত্র (সর্দ্দার গোলাম মহম্মদের তনয়) মহাশয় একদা লাদকের গবর্ণর (শাসনকর্ত্তা) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি কহিয়াছেন "সমস্ত আসিয়া মহাদেশ মধ্যে লাদক এক অপূর্ব্ব স্থান। বিশেষত্বের প্রাধান্যে ইহা অতুল। এই প্রদেশ শোভার ভাণ্ডার, ইহা জম্বু, শ্রীনগর ও উদয়পুর হইতেও অধিকতর বরেণ্য। লাদক না দেখিয়া প্রত্যাগমন করিলে, প্রাচ্য দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম স্থান দেখিতে বাকী থাকিয়া যায়।"

বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই, লাদক প্রদেশ কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও পথিকেরা ইহা দর্শন করেন না। দুর্গমতা ইহার কারণ হইতে পারে, কিন্তু সে কারণ মার্জ্জনীয় নহে। কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া লাদকে না যাওয়া, আর কলিকাতা মহানগরীতে প্রবেশ ও অবস্থান পূর্ব্বক কালী-ঘাট দর্শন না করা একই কথা। লাদক, কাশ্মীরাধিপতি মহারাজার শাসন ও অধিকার ভুক্ত, কিন্তু এই অদ্ভুত প্রদেশ কাশ্মীর দেশের সীমান্তবর্ত্তী বা অন্তঃস্থিত নহে। অনতিপূর্ব্ব কালে কাশ্মীর এবং কাশ্মীর প্রান্তর হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত কাশ্মীরাধিপতির রাজ্য ছিল, চিত্রাল প্রভৃতি কয়েকটী রাজ্য ক্রমে ক্রমে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের করতলগত হইয়াছে, কিন্তু লাদক অদ্যাপি মহারাজার সম্পত্তি। প্রভাস তীর্থ, দ্বারিকাপুরী প্রভৃতি বরোদা

*মহাভারতীর এই প্রবন্ধই তদীয় জীবনের শেষ প্রবন্ধ। মৃত্যুশয্যায় শুইয়া করিয়াও বঙ্গভাষার সেবার কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবন রহস্যময় হইলেও একথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, তিনি বাঙ্গালাভাষার যেরূপ পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম সুদীর্ঘকাল স্মৃতিতে থাকিবে। ২৮শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩১৬, তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা যারপর নাই মনোকষ্ট পাইয়াছি। বিধাতা তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন। ন, স।

হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইলেও ইহারা যেমন বরোদাধিপতি মহারাজারই অধিকারভুক্ত, তেমনি লাদক, কাশ্মীর রাজ্যাধিপতি মহারাজা বাহাদুরের সম্পত্তি ও শাসনভুক্ত। কাশ্মীরের সীমান্ত হইতে লাদক অতিদূরে অবস্থিত।

পাঠকেরা কহিতে পারেন, অসংখ্য অতুল গোলাপপ্রসূন রাশি কাশ্মীরকে সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, লাদকে তাহা আছে কি? উত্তরে আমি কহিতে পারি, লাদক তো আপনি দেখেন নাই, সুতরাং এইরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার আপনার আছে কিনা সন্দেহ। লাদকের তরুলতা, কুঞ্জ, গুল্ম, ফুল, ফল,সংখ্যায় প্রচুরতর এবং তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। কাশ্মীরের রমণী সৌন্দর্য্যের খনি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস; কিন্তু গোলাপপ্রসূন পরিপূর্ণ কাশ্মীরের গোলাপী রংভরা রমণীর মুখমণ্ডলের সুগঠন কৈ? বর্ণটাই ভাল, কিন্তু চোখ, মুখ, ভ্রূ, নাসিকা ইত্যাদির সুগঠন কোথায়? তাহার পরে আর এক কথা এই, কাশ্মীরের রমণী কুড়ি হইলেই বুড়ী হইয়া যায়, আর লাদকের রমণী? দুইটী বা তিনটী ছেলে মেয়ের "মা" হইলেই কাশ্মীরের সুন্দরী একেবারে সৌন্দর্য্যের সীমা হইতে—অধিক কি মনুষ্যত্বের সীমা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রা হইয়া সুদূরে আসিয়া পৌছেন; তখন তিনি নারী কি বানরী, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। লাদকের নারীকুল চিরযৌবন ভরা, ইহাদের ঘরে,বাহিরে ও শরীরে চিরদিনই বসন্ত। বর্ণে ও গঠনে কাশ্মীররমণী ইহাদের পরিচারিকা; পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা হইলেও যৌবন, উৎসাহ, তেজ, বীরত্ব ও সাহসাদি নষ্ট হয় না। তখনও তরবারি হাতে লইয়া, আবশ্যক হইলে, এই প্রাচীন প্রদেশের বৌদ্ধ ও হিন্দুজাতি মহাবীরের ন্যায় সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইতে পারে। দুই চারিটা সন্তান বা সন্ততির প্রসূতি হইলেও, যৌবনের সৌন্দর্য্য, মানসিক তেজ, দৈহিক শক্তি প্রভৃতি নষ্ট হয় না। লাদকের প্রত্যেক রমণীই স্বাস্থ্য-সুখভোগিনী,ব্যায়ামে শিক্ষিতা, বীরগৃহে পালিতা,বলবতী, বুদ্ধিমতী ও স্বদেশপ্রিয়া। এখন বল দেখি, লাদকের কাননের ফুল ও গৃহের রমণীকুল, কাশ্মীর অপেক্ষা অতুল কিনা? অথচ লাদকের রমণী সতীশ্রেষ্ঠা।

লাদক-প্রদেশে গমন করিতে হইলে, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, পার্ব্বতীয় কুরঙ্গ, তির্ব্বতীয় "ইয়াক্" নামক যণ্ড অথবা বলদ-শকট আবশ্যক হয় না, কারণ এই সকল যান-যোগে লাদক যাইবার সুবিধা নাই। অশ্বপৃষ্ঠে অনেক পথ অতিক্রম করা যায়,কিন্তু সমুদয় পথ নহে, এই অশ্ব আমাদের দেশীয় ঘোড়া নহে, পার্ব্বতীয় বলবান ও অভ্যস্ত অশ্ব। কাশ্মীর ও লাদকের মধ্যস্থলে "যোজী লা" নামক ১১৩০০ ফিট উচ্চ গিরিরাজ দণ্ডায়মান আছে, এই পর্ব্বতমালা লাদককে কাশ্মীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কোতী লা, নামিকা লা প্রভৃতি পাহাড়ের শাখাসমূহ স্থানে স্থানে পথকে আরও দুর্গম করায় পরিব্রাজকগণকে অত্যন্ত ক্লান্তি ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কোনও পাহাড়ই দশহাজার ফিটের নিম্ন নয়। এই সকল পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারিলে লি নাম্নী মনোহারিণী নগরীতে পথিকেরা পৌছিতে পারেন। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে লি নগরী এক শত চল্লিশ ক্রোশ। অনেকে অষ্টাদশ দিবস মধ্যে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে পারেন। উক্ত

পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া লাদকে যাইবার সুবিধা সর্ব্বোত্তম। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে মরুভূমি আছে, উষ্ট্র না হইলে তাহা অতিক্রম করা যায় না। পথ কষ্টদায়ক ও অসুবিধাজনক বটে, কিন্তু এই দুর্গম ও দূরবর্ত্তী পথের বিচিত্রতা, বিশেষত্ব ও অপার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে পরিব্রাজকগণ বিমোহিত হইয়া অনেক সময়ে পথের কষ্ট ভুলিয়া যান। উপরি-উক্তা লি-নগরী লাদক-প্রদেশের রাজধানী। এই নগরীতে পৌছিলে আর কোন কষ্ট থাকে না। তির্ব্বত রাজ্যের পশ্চিম-সীমায় ইহা অবস্থিত। অতি অল্প সময়ে এখান হইতে তির্ব্বতে প্রবেশ করা যায়।

শ্রীনগর হইতে লি (Leh) পর্য্যন্ত যে সুবিস্তৃত পথ আছে, তাহা কোথাও অরণ্য, কোথাও সমতলভূমি, কোথাও উপত্যকা এবং কোথাও বা অত্যুচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। হিংস্র পশ্বাদি হইতে বিপদাশঙ্কা আছে বটে,কিন্তু তাহা হইলেও এই দুর্গম পথ নিরাপদ। স্থানে স্থানে তির্ব্বতীয় সাধুদিগের আশ্রম আছে, তথায় যাইলে ভোজ্য-দ্রব্য পাওয়া যায় এবং বিশ্রামেরও সুবিধা আছে। অনেক সময়ে সাধুদিগের আশ্রম অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া লইতে হয়। পথিমধ্যে দুগ্ধ, ফল, সুস্বাদু মূল প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেক স্থানে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ মরুভূমি দৃষ্ট হইয়া থাকে, উষ্ট্রেরা তাহা পার করিয়া দেয়। কোন কোন স্থানে হয়তঃ দুই দিবসের পথ পর্য্যন্ত পানীয় সলিল পাওয়া যায় না, আবার কোথাও বা পার্ব্বতীয় উৎসের জলে ভূমিসমূহ নীরপ্লাবিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এইরূপে কোমলতা ও কঠোরতা, সুবিধা ও অসুবিধা, ভীষণতা ও মনোহারীত্বের মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করিতে হয়। পথের অনেকস্থান অত্যন্ত শীতল এবং অনেক স্থান অত্যন্ত উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

লি-নগরীতে বিদেশী লোক প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইবেন, ছোট ছোট বালক বালিকারা আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক পয়সা ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিছু না দিলে সহজে তাহারা নবীন পথিককে ছাড়িয়া দেয় না, অত্যন্ত বিরক্ত করিতে থাকে। নাসিক বা পঞ্চবটী নগরীতে নবাগন্তুককে বালক বালিকারা বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া মারাঠী ভাষায় গান গাহিয়া পয়সা ভিক্ষা করে, সে গানের কিয়দংশ এই—

"নাসিক নগরী, গঙ্গাতীরি,
দেবাচা আহে স্থান।" * ইত্যাদি

বৃন্দাবনধামে বালক বালিকারা মুরলী বাজাইয়া গায়—;

রাধা কুণ্ড, শ্যামকুণ্ড,
গিরি গোবর্দ্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে
এই তো বৃন্দাবন॥

লি নগরীর বালক বালিকা তাহাদের দেশের ভাষায় যাহা গাহিয়া পয়সা চায়, তাহার মূল আমি দিতে পারিব না, কিন্তু তাহার অর্থ এই—

নবীন দেশে, নবীন বেশে,
হেসে হেসে আও।
আমাদের হস্তে, আস্তে আস্তে
কিঞ্চিৎ পয়সা দাও।
পয়সার বদলে ভোজন দিও,
ভোজন বদলে চিনি।

* পঞ্চবটী নগরী গোদবরী নদীর ধারে অবস্থিতা, গঙ্গার তটে নহে, কিন্তু সে দেশে গোদাবরীর সম্মান গঙ্গার মত। লেখক।

চিনির বদলে কল মুগ, কিম্বা
"গাখোরক্ষিপি।" *

বালক বালিকাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া নগরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিবেন, রাজধানীর সর্ব্বত্র জাপানী, তিব্বতী, চৈনিক, সাম্রামী, বোর্ণিওবাসী, আনামী, ইয়ারকন্দী বণিকেরা বিচরণ করিতেছে। সমস্ত সহর সওদাগরে পরিপূর্ণ। বোগদাদ, বসোরা, রসিয়া, তুর্কী, মধ্য আসিয়া, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যবসায়ীরা এখানে যাতায়াত করে। সোণার নিরেট গহনায় যেমন "টোল" থাকে না, সহরের কোথাও তেমনি খালি নাই, সর্ব্ব স্থান সওদাগরে ভরা। সমস্ত বৌদ্ধ রাজ্যের ইহা অন্যতম প্রধান বণিক-আড্ডা। নানাদেশীয় লোকের এখানে গতিবিধি আছে। বাজার, দোকান, হাট ইত্যাদি খুব বড়, জল বায়ু স্বাস্থ্যকর; দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস খুব সস্তা কিন্তু 'আটা' ও ডাউলের দাম অধিক। চাউল সস্তা নয়। আটা ও চাউল প্রধান খাদ্য।

অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৮৫ জন বৌদ্ধ, ৯ জন হিন্দু এবং বাকী বিদেশীয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের আচার ব্যবহার অনেক প্রকারে হিন্দুর মত। এক সময়ে সমুদয় দেশ হিন্দু ছিল, কালপ্রভাবে অনেকে বৌদ্ধমতাবলম্বী হইয়া গিয়াছে।

লাদকের রাজধানী লী নগরীতে প্রবেশ করিলেই পথিকেরা জম্বু ও শ্রীনগরের সহিত তুলনায় লাদক প্রদেশের উৎকৃষ্টতরতা ও পার্থক্য অনুভব করিতে সক্ষম হয়েন। লাদকের পুরুষ যেমন সুন্দর, রমণী তেমনি সুন্দরী। অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে একটা পরিচিত প্রবাদ আছে, "লাদকে মাথার চুল ভিন্ন কালো আর কিছু নাই।" কাশ্মীরে তাই কি? কাশ্মীরে সুন্দর পুরুষ আছে সত্য; কিশোর ও যৌবনাবস্থায় খুব সুন্দর পুরুষ দেখা যায়, কিন্তু কদাকার হইতে কদাকার পুরুষও কাশ্মীরে আছে; লাদকে তাহা দেখাও দেখি! এদেশে তাহা নাই। এখানে সকলই সুন্দর। মানুষ ও নিসর্গ উভয়ই সুন্দর। মালাবার উপকূলের রমণীপুঞ্জ যেন পরী, কিন্তু শতকরা ৯ জন পুরুষ যেন অঁত্যাদ্ভুত এবং অতি কদাকার কৃষ্ণকায়ভূত। কাশ্মীরের অনেক স্থানে ঠিক তাই, কিন্তু লাদকে সকলই সুন্দর এবং সকলই সুন্দরী।

তাহার পরে আর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা এই, লাদক প্রদেশে বৌদ্ধধনপতি ও সন্ন্যাসীদিগের এত অন্নছত্র আছে যে, অন্নের জন্য সে দেশে কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না। কিন্তু নিরামিষাশীর তত সুবিধা নাই; এদেশের সকলেই মাংসভোজী, সুতরাং পশু ও পক্ষী মাংস ভিন্ন পাকশালাই নাই। এখানে বৌদ্ধ যেমন, হিন্দুও তেমন।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে লাদক-পরিভ্রমণকারীরা জানিতে পারেন, এদেশে তিন জন রাজা রাজত্ব করিয়া থাকেন। রাজনৈতিক রাজা—কাশ্মীরাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর; ধর্ম্মনৈতিক রাজা—তিব্বতের প্রধান লামা মহাশয়; আর সমাজ ও গার্হস্থ্যাচারাদির রাজা—"ভোৎরংপু।"

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

* আমাদের দেশে মুড়িমুড়কির দোকানে বাতাসা বা "বাসাতা" বিক্রয় হয়। গাখোরক্ষিপি গুড়মাংসে প্রস্তুত মিষ্ট বাতাসা বিশেষ। ইহা খুব সস্তা, এক পয়সায় আট বা দশ খানি প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিনি দুর্ম্মূল্য। লেখক।

রায় রামানন্দ।

"রসজ্ঞ ভক্তের শ্রেষ্ঠ রামানন্দরায়।
কৃষ্ণনামে সদাসিক্ত নয়নধারায়॥
বিশুদ্ধ আনন্দভোগ রামরায় করে।
হরিনামে হয় তাঁর আনন্দ অন্তরে"॥"

গোবিন্দদাসের কড়চা।

ভবানন্দরায় উড়িষ্যার করণ বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইহাঁর পাঁচ পুত্র। গোপীনাথ, বাণীনাথ, রায় রামানন্দ, কলানিধি, সুধানিধি। ভবানন্দরায় গোপীনাথ প্রমুখ পুত্রচতুষ্টয়ের সঙ্গে চিরকাল উড়িষ্যার রাজসংসারে উচ্চরাজকর্ম্মচারী পদে অভিষিক্ত ছিলেন।

রামানন্দরায় গোদাবরী তীরস্থ বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল রাজা। যে সময়ে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে, সেই সময়ে এই সপুত্র ভবানন্দ শ্রীচৈতন্যের রূপে, গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহারই পরিকর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

পরমভাগবত রাধাকৃষ্ণের নিত্য উপাসক রায় রামানন্দ তদানীন্তন বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর জীবনে ত্রিবেণীর ন্যায় পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা একাধারে সমঞ্জসীভূত দেখিতে পাই। এক জগন্নাথবল্লভনাটকই ইহাঁর কবিত্বের জীবন্ত সাক্ষী। শ্রীক্ষেত্রের রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশানুসারে ইনি উক্ত নাটক রচনা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ ভক্তসমভিব্যাহারে যে পাঁচখানি গ্রন্থ আস্বাদন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেন, রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটক তাহার অন্যতম, যথা—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি;
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপরামানন্দসনে, মহাপ্রভুরাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

জগন্নাথবল্লভ নাটক ব্যতীত পদাবলী গ্রন্থে রামানন্দের কতকগুলি শ্লোক সংগৃহীত আছে। তদ্ভিন্ন পদকল্পতরুতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেকগুলি সুললিত সুমধুর পদ দেখিতে পাওয়া যায়।

রায় রামানন্দের ন্যায় এমন নির্লিপ্ত সংসারী, এমন আদর্শ ভক্ত, এমন নিষ্কাম ভগবৎপ্রেমিকের জলন্ত দৃষ্টান্ত জগতের সাহিত্যে-বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত, প্রিয় পার্ষদ ও নীলাচলীয় লীলার প্রধান সঙ্গী ছিলেন। এবং ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য রাঘবেন্দ্রপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য ও রায় রামানন্দ রূপ মণিকাঞ্চনের যে কোথায় কেমন করিয়া কোন সুযোগে সম্মিলন হইয়াছিল, এই মণিকাঞ্চনের সংঘর্ষণে হিন্দুধর্ম্ম যে কি এক অপর্ব্ব রত্ন, বৈষ্ণবসমাজ সাধনরাজ্যের যে কি এক নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকদের সমীপে যথাযথ বিবৃত করিতেছি।

যে সময়ে নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষে দক্ষিণাপথাভিমুখে গমন

করেন, সেই সময়ে সার্ব্বভৌম অনুরোধ করিয়া শ্রীচৈতন্যকে বলিয়াছিলেন, প্রভু, আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিও। গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে উৎকল-রাজ-প্রতিনিধি রামানন্দরায় নামে এক মহানুভব ব্যক্তি আছেন, তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিও। তিনি তোমার পবিত্র সঙ্গের উপযুক্ত পাত্র। শূদ্রবিষয়ী জ্ঞানে তাঁহাকে উপেক্ষা করিও না। তাঁহার ন্যায় সুরসিক ভক্ত আর দেখা যায় না।

যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"রায়রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্রবিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবা।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবা॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম॥"

ভক্তবৎসল শ্রীচৈতন্যদেব কোথাও কোন ভক্তের কথা শুনিলে তাহার সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য, তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দিবার জন্য ব্যাকুলিত চিত্তে সেই ভক্তের উদ্দেশে ধাবমান হইতেন। ইহা তাঁহার করুণ-হৃদয়ের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের সমীপে, রায়রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইয়া সেখান হইতে বিদায় হইয়া সমুদ্র কূলের পথ দিয়া দক্ষিণাপথ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। ক্রমে আলালনাথ, কূর্ম্মক্ষেত্র, জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র প্রভৃতি পুণ্যভূমি দর্শন করিয়া কতদিন পরে গোদাবরীতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই গোদাবরীর নীল নির্ম্মল জল ও তীরস্থ শ্যামল সুন্দর তরুরাজি দেখিয়া যমুনা বৃন্দাবন মনে করিয়া অনুরাগ-ভরে বনমধ্যে অনেকক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তনাদি করিলেন। এবং নদী পার হইয়া পরপারে আসিয়া স্নানাবগাহনাদি সাঙ্গ করিয়া ঘাটের সন্নিধানে নাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই ঘাটের অদূরেই একটী বর্দ্ধিষ্ণু নগর। এই নগরের নামই বিদ্যা-নগর বা রাজমহেন্দ্রী। এই বিদ্যা-নগরই উৎকল রাজ্যের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজধানী। শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বহুজন-পরিবেষ্টিত হইয়া দোলায় চড়িয়া গোদাবরী স্নান উপলক্ষে সেই ঘাটে পঁহুছিলেন। ঘাটে পঁহুছিয়াই সেই রাজপুরুষ যথাবিধি স্নান তর্পণ সমাধা করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব এই রাজপুরুষকে দেখিয়াই সার্ব্বভৌম-কথিত রায়রামানন্দ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন; এবং তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেলেন। ইতিমধ্যে সেই রাজপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের শত সূর্য্য সম-কান্তি, সুললিত সুদীর্ঘ দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, কমল লোচন, অরুণ বসন দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া তাঁহার সমীপে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীচৈতন্য উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া রাজপুরুষকে জিজ্ঞাসা কলিলেন;—তুমিই কি রাজা রায় রামানন্দ? রাজপুরুষ উত্তর করিলেন;—হাঁ আমিই সেই মন্দবুদ্ধি শূদ্রাধম। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বাহু প্রসারিয়া রামানন্দরায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। রামানন্দও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন। উভয়ে উভয়ের প্রেমে বিভোর হইয়া, স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্পাদিতে উভয়ে বিহ্বল হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন! কে জানে কে বলিতে পারে;—ভগবৎ-প্রেমিকের অন্তরে অন্তরে কি এক অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তি আছে; যাহা দ্বারা সামান্য দর্শন স্পর্শনে চির অপরিচিতও সুপরি-

চিত্ত হইয়া যায়। যাহা হউক, অনেকক্ষণ পরে উভয়ের প্রেম বিভোরতা ভাঙ্গিল; উভয়েই ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। পরে শ্রীচৈতন্য বলিলেন;—নীলাচল হইতে আসিবার সময় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আমার নিকটে তোমার গুণ গান করিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলিয়া দিয়াছিলেন। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। ভাল হইল; অনায়াসে তোমার দর্শন পাইলাম। রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের কথার উত্তরে বলিলেন;—সার্ব্বভৌমের কৃপায় আমি আজ আপনার শ্রীচরণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার মনুষ্য জন্ম সফল হইল। কোথায় আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আর কোথায় আমি বিষয়ী শূদ্রাধম। * তবে যে আমাকে স্পর্শ করিলেন; সে কেবল আপনার কৃপার গুণে। এইরূপে নানা কথাবার্ত্তার পর রায় রামানন্দ বলিলেন,—যদি দয়া করিয়া অধমকে তরিতে এখানে আসিয়াছেন, তবে আমার গৃহে কয়েকদিন থাকিয়া দুষ্ট চিত্তকে সংশোধন করিয়া দিন।

শ্রীচৈতন্য রায়ের সানুনয় নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া তাঁহার গৃহে গমন করিয়া মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিলেন। পরে রায় রামানন্দের সঙ্গে বিবিধ কথোপকথনান্তে শ্রীচৈতন্য বলিলেন, রায়! তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে বড় সাধ আছে। বল দেখি সাধ্য বস্তু কি? রায় রামানন্দ উত্তর করিলেন, স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি লাভ।

শ্রীচৈতন্য। ইহা বাহিরের কথা, ইহার পরে কি আছে বল?

রামানন্দ। শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণই সাধ্য শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের কথা, ইহার পরে কিছু থাকে তো বল।

রামানন্দ। তবে স্বধর্ম্মত্যাগই সাধ্য শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য! ইহাও বাহিরের ধর্ম্ম।

রামানন্দ। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই প্রকৃত সাধ্য-শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের কথা।

রামানন্দ। জ্ঞান-শূন্যা ভক্তিই সাধ্য শিরোমণি।

শ্রীচৈতন্য। ইহা এক রকম বটে, কিন্তু ইহার পরে কি আছে বল?

রামানন্দ। তবে প্রেম ভক্তিই সাধ্য-শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও এক রকম উত্তম; তারপর।

রামানন্দ। দাস্য প্রেমই সর্ব্বসাধ্য সার।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও উত্তম, তারপর কি?

রামানন্দ। সখ্য প্রেমই সাধ্য শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বেশ উত্তম; তার পর?

রামানন্দ। বাৎসল্য প্রেমই সর্ব্বসাধ্য শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও অতি উত্তম, ইহার পর আর কিছু থাকে তো বল।

রামানন্দ। সতী স্ত্রী যেমন প্রিয় পতিকে দেহ, আত্মা, প্রাণ, মন সমস্তই সমর্পণ করেন। তদ্রূপ পতিভাবে আপনা ভুলিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া, দেহ, আত্মা মন, প্রাণ সমস্তই শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে হয়। ইহার

---

* "কাঁহা তুমি ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম।"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

রাম কান্ত ভাব। এই কান্ত ভাবই সকল সাধ্যের শ্রেষ্ঠ সাধ্য।

শ্রীচৈতন্য, ইহাই সকল সাধ্যের সীমা বটে; কিন্তু ইহার পরেও যদি কিছু থাকে, তবে দয়া করিয়া তাহা বল।

রামানন্দ। ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে, এমন লোক জগতে আছে: পূর্ব্বে জানিতাম না। যাহা হউক, শ্রীরাধার প্রেমই সর্ব্বাপেক্ষা সাধ্য শিরোমণি।

শ্রীচৈতন্য। রামানন্দ, তোমার মুখ হইতে অমৃতনদী নিঃসৃত হইতেছে; বুঝাইয়া বল রাধাপ্রেম কিসে সাধ্যশিরোমণি?

রামানন্দ। রাসরসিক রাসবিহারী শ্রীভগবান শতকোটী গোপীকার সঙ্গে রাসবিলাসে প্রবৃত্ত থাকিয়াও শ্রীরাধিকাকে ভুলিতে পারেন নাই। কোটী গোপীকার সঙ্গে থাকিয়াও তাঁহার যে কামনার নির্ব্বাপন হয় নাই, একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই তাহা হইয়াছিল। ইহাতেই রাধাপ্রেমের গভীরতা বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীচৈতন্য। যে জন্য আমি তোমার সমীপে আসিয়াছিলাম, সেই "সাধ্যতত্ব" তোমার নিকটে শুনিয়া আমি সুখী হইলাম।

রামানন্দ। প্রভু, তুমি যাহা বলাইতেছ, আমি তাই বলিতেছি। তোমার মত কৃষ্ণপ্রেমিক জগতে আর কেহ নাই। দয়া করিয়া আরও কয়দিন থাকিয়া আমাকে আরও কিছু কৃষ্ণতত্ব শিখাইয়া দাও।

শ্রীচৈতন্য। রামানন্দ, আর কয়েক দিন কেন; আমি যত দিন ধরাধামে থাকিব, তত দিন তোমার সঙ্গ ছাড়িতে পারিব না। নীলাচলে তুমি আমি এক সঙ্গে থাকিব এবং উভয়ে একত্রে মধুর কৃষ্ণকথায় কাল কাটাইব।

এই বলিয়া সে দিন উভয়ে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্রতী হইলেন। পর দিন সন্ধ্যার সময় আবার নির্জ্জন স্থানে উভয়ে মিলিত হইলেন। এবং অন্যান্য প্রসঙ্গের পর শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—রামানন্দ, বিদ্যার মধ্যে কোন বিদ্যা সার?

রামানন্দ উত্তর করিলেন, কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যতিরেকে আর বিদ্যা নাই।

শ্রীচৈতন্য। কোন কীর্ত্তি শ্রেষ্ঠ?

রামানন্দ। সেই প্রকৃত কীর্ত্তিমান, যাঁহার কৃষ্ণভক্ত বলিয়া খ্যাতি আছে।

শ্রীচৈতন্য। শ্রেষ্ঠ ধন কি?

রামানন্দ। যার রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রেম আছে; সেই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী।

প্রশ্ন। দুঃখের মধ্যে কোন দুঃখ গুরুতর?

উত্তর। কৃষ্ণ-ভক্তি বিরহের ন্যায় আর দুঃখ নাই।

প্রশ্ন। মুক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর। কৃষ্ণ-প্রেমিকই মুক্ত শিরোমণি।

প্রশ্ন। কোন্ গীত শ্রেষ্ঠ।

উত্তর। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি গীত।

প্রশ্ন। শ্রেয়ঃ কি?

উত্তর। কৃষ্ণ-ভক্ত-সঙ্গ বিনা জীবের আর শ্রেয়ঃ নাই।

প্রশ্ন। স্মরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?

উত্তর। কৃষ্ণ লীলাই প্রধান স্মরণীয়।

প্রশ্ন। ধ্যেয়ের মধ্যে কোন্ ধ্যেয় শ্রেষ্ঠ?

উত্তর। শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মই জীবের শ্রেষ্ঠ ধ্যেয়।

প্রশ্ন। জীবের কোন্ স্থানে বাস করা কর্ত্তব্য?

উত্তর। ভগবানের নিত্যলীলানিকেতন শ্রীবৃন্দাবনধামে।

প্রশ্ন। কোন্ শ্রবণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?

উত্তর। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই প্রকৃত কর্ণরসায়ন।

প্রশ্ন। শ্রেষ্ঠ উপাস্য কি ?

উত্তর। রাধাকৃষ্ণ—যুগল নামই শ্রেষ্ঠ উপাস্য।

প্রশ্ন। মুক্তিবাঞ্ছাকারী ও ভক্তিবাঞ্ছাকারীর মধ্যে প্রভেদ কি ?

উত্তর। স্থাবর দেহে আর দেবদেহে যেমন প্রভেদ। জ্ঞানরূপ তিক্তনিম্বভোজী অরসিক কাক আর প্রেমরূপ আম্রমুকুলাস্বাদী সুরসিক কোকিলে যেমন প্রভেদ; তেমনই প্রভেদ। এইরূপ তত্ত্বকথার পর উভয়ে নৃত্যকীর্ত্তনে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সেই ভাব-বিভোরতার মধ্য দিয়া রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। কথিত আছে, এই স্থানেই এই সময়েই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য রায় রামানন্দের সমীপে স্বরূপতঃ ধরা পড়িয়াছিলেন। উপযুক্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত রায় রামানন্দের অনুরোধে রাধা-অঙ্গ-স্পর্শে স্বীয় অঙ্গ বৈবর্ণ্যের কথা, শ্রীরাধিকার ভাবে স্বীয় আত্ম'র পূর্ব্বতন কৃষ্ণাবতারীয় মধুর রসাস্বাদন করা প্রভৃতি যাবতীয় গুপ্ত তত্ত্ব কথা স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকটে অপূর্ব্ব রসরাজরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপ রসকথা, প্রেমালাপ, তত্ত্ববিচার, স্বরূপদর্শন, কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে উভয়ের দশদিন দশ রাত্রি অতিবাহিত হইল। দশরাত্রির পরে শ্রীগৌরচন্দ্র রামানন্দের নিকটে বিদায় চাহিয়া বলিলেন; তুমি শীঘ্র বিষয় বৈভব ছাড়িয়া নীলাচলে যাও। আমিও দাক্ষিণাত্য তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শীঘ্রই নীলাচলে তোমার সঙ্গে সম্মিলিত হইতেছি। সেখানে দুইজনে একত্রে কৃষ্ণকথায় কাল কাটাইব। এই বলিয়া রায় রামানন্দকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র বিদায় হইলেন।

এদিকে রামানন্দ প্রভুর বিরহে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং সেখানকার বিষয়-বৈভবের মায়া মমতা গুটাইয়া, নীলাচলে আসিয়া পূর্ব্বকথিত মত শ্রীগৌরচন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

অতঃপর আমরা প্রধান রসতত্ত্ববেত্তা গৌরচন্দ্রের প্রধান ভক্ত প্রিয় পার্ষদ পরম ভাগবত পণ্ডিতপ্রবর রামানন্দের সম্বন্ধে প্রাচীন ভাষায় দুই একটী কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

"রায় রামানন্দ বন্দ বড় অধিকারী।
প্রভু যাঁরে লভিলা দুর্লভ জ্ঞান করি॥"

ইতি—বৈষ্ণব বন্দনা।

"সহজে চৈতন্যচরিত্র ঘন দুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান যেই সেই করে আস্বাদন॥
রামানন্দ রায়ে মোর কোটী নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥"

ইতি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা।

শ্রীগৌরগোপাল সেন।

ঈশ্বর ও জগতের দুর্ঘটনা।*

বর্ষ শেষে, ৩১শে চৈত্র, ১৩১৫, সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দিরে পঠিত উপদেশ।

অনন্ত কাল-সাগরে আর একটী বৎসর বিলীন হইল। আমরা এই অনন্তকালকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। পৃথিবীর নিজকক্ষে ও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণনে দিবারাত্রি মাস ঋতু বৎসর এবং ঘটিকা যন্ত্রের দ্বারা ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ড দণ্ড পল অনুপল প্রভৃতি অংশ করিয়াছে। এই যে "এখন" "তখন" "পূর্ব্ব" "পর" আমরা সময় সম্বন্ধে বলিয়া থাকি, ইহা শূন্য বিষয় নহে, ইহারা ঘটনা-বাচক, ঘটনার বিশেষণ মাত্র, ঘটনা ছাড়িয়া ইহাদের কোন অর্থ নাই। সুতরাং ঘটনা ছাড়া কাল অর্থহীন, অসম্ভব। কাল আছে বলিলে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, কালের উপকরণীয় ঘটনা আছে। কাল বলিলেই পূর্ব্বাপর ঘটনা সমূহের সম্বন্ধ বুঝায়, অপরদিকে কাল-শূন্য ঘটনাও অর্থশূন্য অসম্ভব ব্যাপার। ঘটনামাত্রেই কাল ঘটে, ঘটনামাত্রেই এখনকার বা তখনকার ঘটনা।

এই যে বৎসর চলিয়া গেল, ইহার মধ্যে কত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সমুদয় আমাদের জ্ঞানের অতীত, অতি অল্পই আমরা দেখিয়াছি ও অনুভব করিয়াছি। দুর্ঘটনা সকলই আমাদের চক্ষের সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, কেননা তাহারা আমাদের হৃদয়কে ব্যথিত করে। আমরা যে শত শত সুখ পাই, তাহার বিষয় তত ভাবি না, তাহা তত স্মরণ রাখি না, কিন্তু কোথায় বিন্দুমাত্র দুঃখ পাইয়াছি, তাহা হৃদয়ে ভাল করিয়া আঁকিয়া রাখিয়াছি, তাহাই সকলের কাছে বলিয়া থাকি। সূর্য্য তিন শত পয়ষট্টি দিনের মধ্যে যদি ২১০ দিন মেঘাবৃত হইল, পৃথিবী বারিধারায় পূর্ণ হইল, অমনি অভিযোগ করিতে থাকি, কিন্তু ভাবি না যে, মেঘবৃষ্টি না হইলে পৃথিবী ফলশালী, শস্যশালী হইতে পারে না, আমাদের জীবন-ধারণের আহরীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় না।

অন্য বৎসরের ন্যায় কত অর্ণবপোত জলমগ্ন হইয়াছে, কত গৃহ অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইয়াছে, কত খনিতে বাষ্প প্রজ্বলিত হইয়াছে, কত রেলে রেলে সংঘর্ষণ হইয়াছে, কত যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্যবিপ্লব, স্থানে স্থানে বিসূচিকা, বসন্ত, প্লেগ, প্রভৃতি মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, জল প্লাবনে ও বন্যায় কত দেশ ভাসিয়া গিয়াছে, সর্ব্বোপরি মেসিনার ভয়ানক ভূকম্পের কথা সকলেই অবগত আছেন। এই সকল দুর্ঘটনায় কত লোক হত, আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন ও কত না দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। অপরদিকে সমুদ্রতল হইতে পর্ব্বত সকল শিরোত্তলন করিতেছে, কোথায় নূতন জীব ও উদ্ভিদের আবির্ভাব হইতেছে। এইরূপ জড়শক্তির পরস্পরের সংঘর্ষণে সৃষ্টি-

---

* ১৩১৬ সনের প্রথমে এই প্রবন্ধটী আমাদের হস্তগত হয়। বর্ষ শেষে প্রকাশ করিবার জন্য ইহা রাখিয়া দিয়াছিলাম। গভীর দুঃখের বিষয়, সাধক লেখক তৎপূর্ব্বেই স্বর্গত হইয়াছেন। স, স।

বীর পরিবর্ত্তন চিরকালই সংঘটিত হইতেছে। যেমন জড়রাজ্যে ও প্রাণিরাজ্যে বিবর্ত্তন চলিতেছে, সেইরূপ, মানবসমাজে নানা বিভাগে, রাজনীতি, সমাজনীতি, নৈতিক জীবনে, ধর্ম্মসমাজে স্ত্রী পুরুষের অধিকার ও স্বাধীনতা লইয়া ঘোর বিপ্লব চলিতেছে। দৃষ্টান্তস্থলে তুরস্কে স্বাধীন-তন্ত্র লাভ, পারস্যে তাহা লাভের জন্য ঘোর বিপ্লব। ইংলণ্ডে একদল সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহাদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য ঘোরতর আন্দোলন করিতেছেন, সম্প্রতি কোপেনহেগন নগরে স্ত্রীলোকেরা সে স্বাধীনতা পাইয়াছেন। বিজ্ঞান রাজ্যে কত আবিষ্কার হইয়াছে। মহা সমুদ্রমাঝে বিপদগ্রস্ত তরণী শূন্য আকাশে তাহাদের বিপদের কথা তারহীন টেলিগ্রাফে প্রচার করিয়া উদ্ধার পাইয়াছে, রিপবলিক নামক অর্ণবপোত এই উপায়ে দুর্দ্দশা হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। শূন্য আকাশে পক্ষীর ন্যায় মানুষ উড়িতেছে। সহজে যাহাতে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, ভূকম্পে যাহাতে গৃহ ভূমিসাৎ না হয়, সেরূপ গৃহ নির্ম্মাণের উপায় অবলম্বিত হইতেছে। আমেরিকার লোক মেসিনায় ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ৫১৬ কুঠরী-সমন্বিত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহারা কতক অর্থ সাহায্যের পরিবর্ত্তে এইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। এই সকল দুর্ঘটনায় সুসভ্য জগতে সকল স্থানেই মানব মনে জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে এক বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির উদ্রেক হইয়া থাকে, লোকে যথাসাধ্য অর্থ সামর্থ্য দিয়া বিপদগ্রস্ত লোকদিগের উপকার করিতে সত্যই প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সাধারণ লোকের মনে এক গুরুতর প্রশ্নের উদয় হয়। প্রশ্ন এই—যদি জগতের কোন ঈশ্বর থাকেন, আর তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান ও দয়ালু হয়েন, আর তিনি যদি আমাদের সকলের পিতা মাতা হয়েন, তাহা হইলে, এই সকল বিপদ সম্বন্ধে তাঁহার দায়িত্ব কি? তিনি কি এই সকল পাঠাইয়া থাকেন, অথবা তিনি কি এই সকল ঘটিতে দেন? তাঁহার নিবরণের শক্তি থাকিতেও নিবারণ করেন না কেন? এরূপ ঈশ্বরকে কেমন করিয়া সৎ ও দয়ালু বলিব? কেমন করিয়া বলিব, তিনি আমাদের জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত আছেন, আমাদিগকে ভালবাসিতেছেন। মেসিনার ভূকম্পে বা জনষ্টোন নগরে, বন্যায় অথবা চিকাগোর অগ্নিদাহে ধ্বংস নগরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শত শত লোকের মৃত্যু ও দুর্দ্দশা দেখিয়া সহজে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কঠিন হইলেও চিন্তাশীল ও অনুসন্ধিৎসু লোকের নিকট ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করা একেবারে অসম্ভব নহে। অবশ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে অপার অগম্য ঈশ্বরের কার্য্য সকল সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা কখনই সম্ভবপর নহে। তথাচ চিন্তা করিলে, অন্বেষণ করিলে এরূপ আলোক পাইতে পারি, যাহাতে অনেক অন্ধকার অপসারিত হয় এবং আমরা বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়াইতে পারি।

প্রকৃতি বা ঈশ্বরের দয়া নির্দ্দয়তা বুঝিতে হইলে অনেক বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, আমরা সামাজিক জীব, সমাজের উপর, অন্যান্য মনুষ্যের উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়, একজন অন্যের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ, একজন অন্যের অধীন। এই অধীনতা হইতে অনেক দুর্ঘটনা উৎপন্ন হইয়া থাকে, একজনের বুদ্ধির দোষে বা অসাবধানতায় কত গৃহ দগ্ধ হইয়াছে, কত পোত জলমগ্ন হইয়াছে, কত রেলে রেলে সংঘর্ষণ

ঘটিয়া কত লোক হত আহত হইয়াছে,এই শ্রেণীর বিপদে আমরা অভিযোগ করি ও বলি, ঈশ্বর এমন কেন করিলেন যে,একজনের দোষে অন্যে সহ্য করিবে? ইহাতে যদি ঈশ্বরকে নির্দ্দয় বলিতে হয়,তাহা হইলে বলিতে হয়, তিনি যে আমাদিগকে সামাজিক জীব করিয়াছেন, একজনকে অন্যের উপর নির্ভর করিতে দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নির্দ্দয়তা প্রকাশ পায়। যত দিন আমাদিগকে অজ্ঞান, নির্ব্বোধ, দুর্ব্বল, নৈতিক সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ মনুষ্যের প্রতি নির্ভর করিতে হইবে, তত দিন যে আমাদের নির্ভর-যষ্টি সময়ে সময়ে ভাঙ্গিয়া যাইবে, এবং আমরা পড়িয়া যাইব,হত আহত হইব,তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং যে সকল অমঙ্গল আমাদের সহকারীর উপর নির্ভর জন্য ঘটিয়া থাকে,তাহা মানবে মানবে সম্বন্ধের মূলে অবস্থিতি করিতেছে, সৃষ্টি-প্রকরণেই রহিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মানুষে মানুষে সম্বন্ধ ও নির্ভরশীলতা, ইহার সকল দিক দেখিলে ইহা কি অমঙ্গল বলিয়া মনে হয়। এরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে তাহারা সুখ ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান প্রেম পুণ্য কি অধিকতর বৃদ্ধি হইত, তাহার দুঃখের ভাগ কি অল্প হইত? কখনই নহে। সম্বন্ধ-বিহীন হইয়া মানব এজগতে এক নিমেষ থাকিতে পারিত না, তাহা হইলে জীবনই অসম্ভব হইত,কেন না তাহার প্রথম সম্বন্ধ জননীর রক্ত মাংসের সহিত, সুখ সম্পদ ত পরের কথা। আমরা যে আহার করি, বস্ত্র পরিধান করি, যে গৃহে বাস করি, আমাদের দৈনিক জীবনের শতকরা ৯৯ ভাগ সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য আমরা অন্যের উপর নির্ভর করি।

এই যে মানব শত শত বৎসর ধরিয়া ক্রমে ক্রমে পদক্ষেপ করিয়া, পশুত্ব ছাড়িয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছে, বর্ব্বর অবস্থা হইতে সুসভ্য অবস্থায় অগ্রসর হইতেছে, তাহা কি সম্ভব হইত, যদি না মানুষ সুখে দুঃখে,সম্পদে বিপদে, পরিশ্রমে বিশ্রামে, একত্র সংযুক্ত না হইত,পরস্পরকে সাহায্য না করিত? তবে কি আমরা বলিব, ঈশ্বর মানবকে এইরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া নির্দ্দয়তার পরিচয় দিয়াছেন? এইরূপে সম্বন্ধের ফলে মানবজাতি ও প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে যে অপর্য্যাপ্ত ও অপরিমেয় কল্যাণ লাভ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সহিত তুলনায় মানবের অসম্পূর্ণতা বশতঃ যে সামান্য দুঃখ কষ্ট পাই, তাহা কিছুই নহে।

পৃথিবীতে থাকিতে হইলে আমাদিগকে হয় পরস্পরের অধীনে বাস করিতে হইবে, নতুবা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে হইবে। যদি স্বতন্ত্র ভাবে থাকিয়া বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা মানব অধিক সুখ ও অল্প দুঃখ পায়, তাহা হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান ও বুদ্ধির হীনতা অথবা তাহার নির্দ্দয়তা বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে বর্ত্তমানে আমরা যে সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছি, তাহা যে কেবল শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে, কিন্তু ইহা জাতির স্থিতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন; তাহা হইলে আমাদিগকে ইহা বলিতেই হইবে যে, বিশ্বপতি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা জ্ঞান ও প্রেমে পূর্ণ, তাহা তাঁহার দয়ার নিদর্শন।

দ্বিতীয়ত, দুর্ঘটনা সকল ঈশ্বরের নির্দ্দয়তার পরিচয় কিনা, বিচার করিতে হইলে, মানবকে যে বিশেষ প্রকৃতি ও শক্তি দিয়াছেন, তাহার বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। দেখিতে পাওয়া যায়, মানব স্বাধীন জীব, স্বাধীন ইচ্ছা-সম্পন্ন, তাহার পছন্দ করিয়া লইবার শক্তি রহিয়াছে, সেই জন্য সে তাহার কার্য্যের জন্য দায়ী; তাই অসৎ কার্য্য করিয়া

লোক কারাগারে যায়। অন্ত কোন জীবে এরূপ দেখা যায় না। অধিকাংশ অমঙ্গল মানব নিজেই আনিয়া থাকে। তুমি আগুনে হাত দাও পুড়িয়া যাইবে, সাঁতার না জানিয়া গভীর জলে যাও, ডুবিয়া যাইবে; জল বৃষ্টি ঠাণ্ডায় রাহির হও, সর্দ্দি কাশি হইবে; অতি ভোজন কর বা অসময়ে ভোজন কর, অজীর্ণ হইবে; চুরি কর, জেলে যাইবে; হত্যা কর, প্রাণ দণ্ড হইবে; ইন্দ্রিয়াসক্ত হও, তুমি ও তোমার বংশাবলী তাহার কুফল ভোগ করিবে; ভগ্ন তরী আরোহণ কর, জলমগ্ন হইবে। এরূপে নানা প্রকারে মানব স্বাস্থ্য-রক্ষা ও আত্মরক্ষার নিয়ম সকল লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিফল পাইবে।

এইরূপে নিজে আমরা যে সকল অমঙ্গল আনয়ন করি, তাহার জন্ম কি ঈশ্বরের উপর দোষার্পণ করিব? তাহা হইলে বলিতে হয়, তিনি কেন আমাদিগকে এরূপ স্বাধীনতা ও শক্তি দিয়াছেন? কিন্তু ভাবিয়া দেখিনা যে,এই ন্যায় অন্যায়, সৎ ও অসৎ পথ স্বেচ্ছামত অবলম্বন করিবার শক্তি পাইয়াই মানব মানব হইয়াছে। এই স্বাধীনতা-বিহীন হইলে মানব কখনই মানব নামে বাচ্য হইত না। মানবকে এই স্বাধীনতা না দিয়া কেবল প্রস্তর বা যন্ত্রের ন্যায় করিলে কি ঈশ্বর অধিক দয়ালু হইতেন? প্রত্যেক মানুষ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, আমরা যে অসৎপথ পরিত্যাগ করিতে পারি, প্রলোভন হইতে উদ্ধার হইতে পারি; অসত্য ছাড়িয়া সত্য গ্রহণ করিতে পারি, ইহা আমাদের জীবনের উচ্চ অধিকার। স্বাধীন ইচ্ছা ব্যতীত চরিত্রের কোন অর্থ থাকে না, সদ্গুণও থাকে না; নৈতিকতা থাকে না। যদি বাধ্য হইয়া সৎ-কার্য্য করিতে হয়, সৎ হইতে হয়, তাহার কোন মূল্য থাকে না। সুতরাং যে সকল অমঙ্গল আমাদের নিজের বুদ্ধির দোষে বা অসাবধানতায় আমরা আনিয়া থাকি, তাহাতে যদি ঈশ্বরকে নির্দ্দয় বলিতে হয়, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে জড়পদার্থ না করিয়া, পশু না করিয়া,যন্ত্রবৎ না করিয়া মানুষ করিয়াছেন, নৈতিক জীব করিয়াছেন বলিয়াই তিনি নির্দ্দয়।

তৃতীয়ত, দেখা যাউক স্বাভাবিক শক্তি ও তাহার নিয়ম সকল ঈশ্বরের নির্দ্দয়তার পরিচায়ক কি না? আমরা নিয়ম কাহাকে বলি? যাহার দ্বারা সকল সময় একই রূপ কার্য্য হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কোন উচ্চ অট্টালিকা হইতে পতিত মনুষ্যের জন্য পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহাকে ভূমিসাৎ করে ও তাহাতে তাহার মৃত্যুও সম্ভব হয় বলিয়া কি আমরা উহাকে নির্দ্দয় বলিব? অগ্নি-দাহের অনুকূল অবস্থায় গৃহ, বন, উপবন দগ্ধ করে বলিয়া, অগ্নির দাহিকা শক্তি ও উহার নিয়মকে কি আমরা নির্দ্দয় বলিব? গভীর জলে জলমগ্ন হইলে বা বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেশ জল-প্লাবিত হইলে, গৃহ মনুষ্য পশু প্রভৃতি সকল ভাসিয়া যায় বলিয়া কি, যে নিয়মে জল স্রোত শাসিত হয়, তাহাকে নির্দ্দয় বলিব? ঝড় বৃষ্টির মধ্যে মানুষ পড়িয়া জীবন হারায় বলিয়া কি উহাকে নির্দ্দয় বলিব? নিয়ম সকলের অপরিবর্ত্তনীয়তা কি নির্দ্দয়তার পরিচয়? উহাদের পশ্চাতে যে শক্তি আছে, যে ঈশ্বর আছেন, তিনি কে অবিচারক অন্যায়কারী? ভূকম্প কি? উহা প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের কার্য্যের ফল। বাষ্প সকলের প্রসারণ ও সঙ্কোচনের নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া মনুষ্য নানা ষ্টিম এঞ্জিন করিয়া কল

কারখানা করিয়া সুসভ্য জগতে মানবের কত কাজ সাধন করিতেছে। এই নিয়মে অবস্থা বিশেষে ভূকম্প উৎপন্ন হইতেছে। পৃথিবীর উপরের ছিদ্র দিয়া জল উহার গভীর প্রদেশে করে, ভূমধ্যস্থিত উত্তাপ দ্বারা উহা বাস্পাকারে পরিণত হয়, তথায় আবদ্ধ বাস্পের প্রসারণ শক্তির দ্বারা পৃথিবী কম্পিত হইতে থাকে, তাহাকেই আমরা ভূকম্প বলি। ভূকম্পের অন্য কারণও আছে। পৃথিবীর উপরিভাগ ক্রমশঃ শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হয়, এই সঙ্কোচনের ফলে পর্ব্বত ও উপত্যকা উৎপন্ন হয় এবং উহাতে ভয়ানক আন্দোলন হয়, উপরিভাগ নানাস্থানে বিদীর্ণ হইয়া পৃথিবীর গর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়, ইহা ভূকম্পের অন্যতম ফল। এই ভূকম্প দ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগে যে নানা পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহার দ্বারা পৃথিবী মানবের বাসোপযোগী হইয়াছে। সুতরাং ভূত কালে যদি কোন ভূকম্প না হইত, অদ্য উহা আমাদের বাসোপযোগী হইত না। তবে কি আমরা বলিব, ভূকম্প ঈশ্বরের নির্দ্দয়তার নির্দ্দশন? মনে করুন, আমরা এমন জগতে বাস করি, যেখানে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা নাই। মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম, রাসায়নিক নিয়ম, শক্তির স্থিতি ও সঞ্চালনের নিয়ম, বৃষ্টি, তুষারপাত, অগ্নির দাহশক্তি, দিবা রাত্র প্রভৃতির নিয়ম সকল কখন কার্য্য করে, কখন কার্য্য করে না। এরূপ হইলে, আমাদের দশা কি হইত? যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কখন উপর দিকে কখন নিম্নে আকর্ষণ করিত, তাহা হইলে আমরা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিতাম না, পৃথিবীর উপরিভাগে কোন বস্তুই স্থিরভাবে থাকিতে পারিত না। অগ্নি আমাদের কার্য্যে আসিত না, অর্ণবপোতে বা রেলে আমরা গমনাগমন করিতে পারিতাম না। সুতরাং দেখিবে, নিয়মই পরম দয়ার নির্দ্দশন, নিয়মবিহীনতা আর অরাজকতা, নিষ্ঠুরতার চিহ্ন। এই নিয়ম আছে বলিয়া কৃষকেরা জানে, কখন ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে, কখন বীজ রোপণ করিতে হইবে, কখন শশ্য সংগ্রহ করিতে হইবে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকলই নিয়মে চলিতেছে।

যে রাজতন্ত্র এইরূপ সুনিয়ম দ্বারা শাসিত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ, যে গৃহ উচ্চ ও মহৎ নিয়ম দ্বারা শাসিত হয়, সেই পরিবারই শ্রেষ্ঠ। নিয়ম ভঙ্গ করিয়াই আমরা দুঃখ পাই, কষ্ট পাই, যতই আমরা জগতের গভীর তত্ত্ব সকল বুঝিতে পারি, ততই দেখিতে পাই যে, জগতের মধ্যে এক মহা শৃঙ্খলা রহিয়াছে, উহা ক্রমশ জগতকে ও আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে। উহা সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য।

চতুর্থত, আমরা দেখিতে পাই যে, সৃষ্টিক্রিয়া এখনও চলিতেছে, ইহার শেষ হয় নাই, কবে যে শেষ হইবে বা কখনও ইহার শেষ হইবে কিনা, তাহা কেহ বলিতে পারে না। পৃথিবীর স্তর সকল পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, ইহার বর্ত্তমান অবস্থা আসিতে কোটী কোটী বৎসর লাগিয়াছে। যদি কোন অসম্পূর্ণ গৃহের চারিদিকে ভারা বাঁধা থাকে, কোথায় চূণ, কোথায় সুরকি, কোথায় ইট, কাট প্রভৃতি চারিদিকে ছড়ান থাকে, তাহা হইলে আমরা বলি, গৃহটী অতি কদাকার, ইহার কোন সৌন্দর্য্য নাই, ইহা বাসোপযোগী নহে? জগত সম্বন্ধেও আমরা সেইরূপ সমালোচনা করিতে পারি না। ইহার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। ইহার সম্মুখে এখন আরো কত শ্রেষ্ঠ মহৎ বৃহৎ কার্য্য রহিয়াছে। মনুষ্য ও ঈশ্বর

একত্রে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত মনুষ্যের মস্তিষ্ক, জ্ঞান, হস্তপদ চক্ষু দ্বারা কার্য্য করিবে, ঈশ্বর তাঁহার প্রকৃতির শক্তি ও নিয়ম দ্বারা কার্য্য করিবেন। যেমন পৃথিবী অসম্পূর্ণ, তেমনি মানবও অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ জীবের অভাব থাকিবেই থাকিবে। অভাব থাকিলে দুঃখ থাকিবে। জীবন পথে যে দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতার মধ্য-দিয়া আমাদিগকে যাইতে হয়, তাহাতে ঈশ্বরকে নির্দ্দয় মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেই আমাদিগকে দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও বিকশিত করে, পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়। আদি কাল হইতে মনুষ্য অতি কষ্টে শ্রেষ্ঠে ঊর্দ্ধ দিকে যাইতে সক্ষম হইতেছে। বন্য পশুর সহিত অথবা পঞ্চভূত বা ৭০ ভূতের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, তাহাতেই তাহাকে বলিষ্ঠ করিয়াছে। জয়লাভ করিয়া বেগে উত্থিত হইয়াছে। যে দেশের প্রকৃতি অনুকূল, ভরণ পোষণের সামগ্রী সকল অনায়াসলব্ধ, অল্প পরিশ্রম ও প্রচুর বিশ্রামেই সকল অভাব পূর্ণ হয়, সে দেশের লোক কাহ্য সম্পদ সম্বন্ধে অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে এবং এরূপ অবস্থাপন্ন ভারতবর্ষের ন্যায় দুই একটী জাতি ভিন্ন মানসিক সম্পদও লাভ করিতে পারে নাই, সভ্যতার উন্নত শেখরে উঠিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে যে দেশের লোককে কষ্ট ও বিপদের সহিত অহরহ সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, তাহারাই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছে। প্রকৃতির যে সকল প্রতিকূল অবস্থাকে শত্রু বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহারাই তাহাদের প্রকৃত বন্ধু।

আমাদের কোন শক্তি নাই, অথচ আমাদের মনের মতন করিয়া পৃথিবীকে গড়িতে চাই। আমরা সকল বিষয়ই শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিতে চাই। একটী ভাল আতাফল হইতে যে যুগ যুগান্তর লাগিবে, তাহা আমাদের কখনই সহ্য হয় না। আমরা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, অনন্তগুণে বৃহৎ ও কার্য্যকরী ঈশ্বরের সৃষ্টি আমরা কি বুঝিব? আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইলে আমরা ঈশ্বরের অসীম মঙ্গল অভিপ্রায় কিয়ৎ-পরিমাণে বুঝিতে পারিব এবং আমাদের অভিযোগ যে অর্থশূন্য ও অসার, তাহা দেখিতে পাইব। এ জগৎ অন্ধশক্তির আগার নহে ও অর্থশূন্য নহে, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা ন্যায় ও প্রেমের দ্বারা শাসিত হইতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। ইহা সৌন্দর্য্য, শৃঙ্খলা ও আশ্চর্য্যে পরিপূর্ণ। ইহার আকাশ সময়ে সময়ে যে মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহা অবিলম্বে অপসারিত হয়। বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা, কোলাহলের মধ্যে স্বর-লহরী উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, সমগ্র মানব জাতির সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে, উন্নতি লাভ হইতেছে, স্বীকার করিলেও প্রত্যেক মানব সম্বন্ধে কি ঐ কথা বলা যায়? জাতি উঠিতেছে বটে, কিন্তু অনেক মানবকে পড়িতে দেখা যায়। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, বন্দুকে যেমন অনেকগুলি গুলি থাকে, দুই একটী গুলিতেই কার্য্যসিদ্ধি হয়, অপর গুলি সেই দুই একটী গুলিকে শক্তি প্রদান করে, সেইরূপ, ঈশ্বরের কার্য্য সিদ্ধির জন্য জগতের উন্নতিকল্পে যদি আমাদের কাহার কাহার জীবন যায়, তাহা হইলে তাহাকে ধন্য বলিতে হয়। অপরদিকে দেখিতে হইবে যে, প্রেমিক দয়াল পিতার হস্ত কি আমাদের প্রত্যেক জীবনের উপর নাই? পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর পরপারে অবিনশ্বর জীবন, অনন্তকাল ও অনন্তদেশে যে

ব্যাপ্ত আছে, তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। তিনি যে অনন্তকালের ও দেশের আস্বাদ আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা হইতে কখন বঞ্চিত করিবেন না। যে গুটীপোকা একদিন মৃত্তিকার উপরে মন্থরগতিতে গমন করিত, তাহাকে যিনি বিচিত্র পত্র ও ভূষণে ভূষিত করিয়া স্বচ্ছন্দে গগনবিহারী পক্ষীর ন্যায় সর্ব্বস্থানে গমনাগমন করিবার শক্তি দিতেছেন; যিনি সুসময়ে বৃক্ষগণকে হরিদ্বর্ণ পত্রে বিভূষিত করিতেছেন, যিনি হংসদিগকে সুকোমল অমল শ্বেত আবরণে আবৃত করিতেছেন, যিনি শুকদিগকে হরিদ্বর্ণ পত্রে মণ্ডিত করিতেছেন, যিনি ময়ূরদিগকে চিত্রিত পক্ষ দিয়াছেন; যিনি ঋতুর পর ঋতু পরিবর্ত্তন করিয়া ধরণীকে ধনধান্যশালিনী করিয়াছেন, ও ইহার সমুদয় প্রাণীকে আনন্দিত করিতেছেন, তিনি মানব আত্মার জন্যও নব বসন্ত রাখিয়াছেন। হে মৃত্যু ভয়ে কাতর মানব, তোমার চক্ষে জলধারা কেন? তোমার আনন বিষাদ ছায়ায় আবৃত কেন? তোমার নয়ন দীপ্তিহীন কেন? চাহিয়া দেখ, এ জগতে মৃত্যু কোথায়? দুঃখ কোথায়? এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি মৃত্যু নহে, তাহা বালারুণ স্পর্শে শতদলের উন্মীলনের ন্যায় আত্মার ক্রমবিকাশ, তাহা আত্মার অনন্ত উন্নতি পথে পদক্ষেপ, তাহা নব জীবনের অভিষেক। আজ যে দেহ ভস্মে পরিণত হইতেছে, তাহারই মধ্য হইতে চির শোভাময় নবদীপ্তিশালী জীবন প্রস্ফুটিত হইয়া অমর লোকে শোভা সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

মানবসমাজ। (৮)

সমাজের সে চতুর্ব্বিধ কর্ম্মের আলোচনা করিলাম, উহাই এতদ্দেশীয় জাতিভেদের মূল। সকল দেশেই এইরূপ কর্ম্মভেদ আছে, কিন্তু এতদ্দেশে তাহা নানা কারণে এক বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাতে সমাজের অশেষ মঙ্গল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়েও জাতিভেদ অনেক শুভ ফল উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহার প্রধান অপকারিতা দুইটী;—(১) বিবাহ-ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা; (২) পান ভোজনে স্পর্শ দোষ সৃজন করা। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আধ্যাত্মিক উন্নতি-পথের প্রকৃত পথিক, তাঁহার সম্বন্ধে ঐ দুইটী সঙ্কোচ প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজ যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ সঙ্কোচে দুইটী উন্নতি-পথের বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমটী অর্থাৎ বিবাহক্ষেত্রের সঙ্কোচ—অতীব গুরুতর বিষয়; ইহার সানুকূলে প্রতিকূলে অনেক বিবেচ্য বিষয় আছে। তাহা যথাসময়ে পশ্চাৎ আলোচিত হইবে।

এক্ষণে, কর্ম্মালোচনার পর, সমাজের উন্নতি-অবনতি আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; কারণ কর্ম্মই সমাজকে উন্নতি অথবা অবনতির পথে লইয়া যায়। উন্নতি কি? সমাজ কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে উন্নত বলা যায়? সমাজস্থ ব্যক্তিগণ ধনে বংশে বাড়িলেই যে উন্নত হইল, তাহা নহে। অধিক ধনবৃদ্ধি অবনতির পথেও

সমাজকে লইয়া যাইতে পারে। আর অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি দরিদ্র সমাজের পরিচায়ক। ইংলণ্ডাদি দেশ অপেক্ষা এতদ্দেশীয় বংশবৃদ্ধির পরিমাণ দ্বিগুণেরও অধিক। বংশবৃদ্ধির পরিমাণ দারিদ্র্যের লক্ষণ, কিন্তু সমাজস্থ জনগণের সংখ্যা অনুসারে আহার সংস্থানের কিছু অধিক হওয়া উন্নতির একটী প্রধান কারণ। যাহা হউক, প্রকৃত উন্নতি বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা এ সকল নহে। মহাত্মা ডারুইন্ বলেন,সামাজিক উন্নতি তিনটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে;—(১) মোট জন সংখ্যা; (২) মানসিক অবস্থা, অর্থাৎ জনগণের বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক ভাব; (৩) তাহাদিগের উৎকর্ষতা। * উৎকর্ষতা শব্দে আমি চরিত্র বল ও ধর্ম্মবল বুঝি। ডারুইন দৈহিক অবস্থা অপেক্ষা মানসিক অবস্থার উপরেই দৃষ্টি অধিকতররূপে আকর্ষণ করিয়াছেন। জাতীয় উন্নতি মনের উপরই অধিক নির্ভর করে। সমাজের সকলেই মানসিক উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না, সত্য। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির মন সমধিক উন্নত, অর্থাৎ সামাজিকভাবে জাগ্রত না হইলে, সামাজিক উন্নতি অসম্ভব। † বর্ত্তমান যুগে এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন সমাজের সংঘর্ষে কোন্ সমাজ জয়ী হইবে, তাহা মানসিক অবস্থার উপরই অধিক নির্ভর করে। ‡ চরিত্রবল, নীতিবল ও ধর্ম্মবল—এ সকলই মানসিক অবস্থা। ডারুইন নৈতিক ভাবকেই সামাজিক উন্নতির কারণ সকল মধ্যে প্রাধান্য দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু নৈতিক ভাব ‡ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? তাঁহার মতে উহা মূলতঃ সামাজিক বৃত্তি হইতেই উৎপন্ন হয়। † যাহা সমাজের মঙ্গলজনক, তাহা সুনীতি-সম্মত; আর যাহা অমঙ্গলজনক, তাহা দুর্নীতিমূলক। সামাজিক বৃত্তি, অর্থাৎ স্ব-সমাজের মঙ্গলেচ্ছা হইতে যে সকল কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, ও যেসকল কর্ম্ম সমাজের মঙ্গল সাধন করে, তাহা সুনীতি-সম্মত। এই মতেরই বিস্তৃতি সাধন করতঃ প্রাচীনকালে মনীষিগণ বলিয়াছিলেন "পুণ্যঞ্চ পরোপকারং পাপঞ্চ পরপীড়নে।" পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সকলেরই মূল এই স্থানে। সামাজিক বৃত্তি হইতেই নৈতিকভাব জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সামাজিক বৃত্তি, সমাজস্থ জনগণের মঙ্গল-সাধনেচ্ছা, কর্ম্মে পরিণত করিতে হইলে মনের বল থাকা চাই, স্বার্থত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি থাকা চাই, আর চাই সংযম। ডারুইন ইহা বিবর্ত্তনবাদের দিক হইতে যেরূপভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা এতদ্দেশীয় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পাঠ করা কর্ত্তব্য। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, "No man can practice the virtues necessary for the welfare of his tribe without self sacrifice, self command and the power of endurance.‡" সকল পীড়ন সহাস্যবদনে সহ্য করিবার ক্ষমতা না থাকিলে,সকল স্বার্থ স্ব-সমাজের মঙ্গল সাধনে তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে না পারিলে, এবং কায়ঃ, মন ও বাক্য—এই ত্রিবিধ

---

* We can only say that it (progress) depends on an increase in the actual number of the population, on the number of men endowed with high intellectual and moral faculties as well as on their standard of excellence. Corporial structure appears to have little influence except so far as vigour of body leads to vigour of mind. Descent of man p. 216

† The future struggles for supremacy will be contests between minds, and muscles will be at a discount.

Nature, 9th May, 1902, p. 36.

‡ Moral sense.

† The moral sense is aboriginally derived from the social instincts. Desent of Man, p 182

‡ Ibid 181

সংযমে বলীয়ান না হইলে, সমাজের মঙ্গল-সাধনের আশা করা যায় না। কিন্তু এ সকল কি সকলেরই হয়? না, তাহা নহে। যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি অগ্রণী, তাঁহারই হয়; অন্যে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।" বহু হট্টগোলে সামাজিক বিশেষ মঙ্গল হয় বলিয়া সকল স্থলে বিশ্বাস করি না। কিন্তু ডারুইনের প্রদর্শিত তিনটী ভাব কোন ভাগ্যবানের হৃদয়ে উদিত হইলেই যথেষ্ট হয় না; ঐ ভাব পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যক, যেন অন্য বিরোধী ভাবে ঐ সকলকে আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ না হয়। পরিপুষ্ট হইবার প্রধান উপায়, অভ্যাস। যে কর্ম্ম অতি কষ্টসাধ্য, চেষ্টা দ্বারা কোন মতে নিষ্পন্ন করিতে হয়, তাহাও পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে অবশেষে অনায়াসে করা যাইতে পারে। সুতরাং যেরূপেই হউক, সংযম ও সহিষ্ণুতার সহিত তাহা পুনঃ পুনঃ আচরণ করিতেই হইবে; তাহা না করিলে উহা অভ্যস্ত হইবে না, অনায়াস-সাধ্য হইবে না। আর অভ্যস্ত না হইলেও উহা কোন কালেই সহজাত বৃত্তির ন্যায় অবশ্য-কর্ত্তব্য হইয়া উঠে না। বাল্য হইতে অনুকূল ভাবে মনকে উত্তেজিত করিতে হয়, তাহা হইলে উহা সহজাত বৃত্তির ন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে পারে। আর তদ্রূপ হইবার পরে উহা বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীতই হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। * বুদ্ধির ইতস্ততঃ দোদুল্যমান শাসন হইতে মুক্ত হইয়া ভাব অথবা বৃত্তি জন্মগ্রহণ করিতে না পারিলে উহার অদম্য তেজ, উন্মাদিনী শক্তি, একাগ্র লক্ষ্য বিকাশ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। তাই দ্বৈধ চিন্তায় কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া পড়ে। অতি বুদ্ধের নিন্দাবাদ চির প্রচলিত। মন সংকল্প করিবে, বুদ্ধি সদুপায়ে তাহা নিষ্পন্ন করিবে। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধি মনের আজ্ঞাবহ হইবে। তবেই কর্ম্মের সফলতা। অত্যুচ্চ নৈতিক ভাব সামাজিক বৃত্তি হইতে জাত, আর সামাজিক বৃত্তি সহজাত বৃত্তির ন্যায় হওয়া নাই। সুতরাং সমাজের মঙ্গলজনক কর্ম্ম বাল্য হইতে অভ্যাস করা আবশ্যক। নতুবা অন্য পথ নাই। সাময়িক উত্তেজনায় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে যাহা অচিরকাল মধ্যেই মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। সমাজের চতুর্ব্বিধ কর্ম্মই আবাল্য অনুষ্ঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক। নতুবা সমাজের উন্নতি সুদূরপরাহত।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সামাজিক উন্নতির মূলে—

(১) আহার সংগ্রহ।

(২) জন সংখ্যা।

(৩) জনগণের স্বাস্থ্য।

(৪) এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা, জনগণের নীতি-বল ও ধর্ম্ম-বল।

এতদ্দেশীয় সমাজে, বিশেষতঃ হিন্দু সমাজে (১) আহার পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই; (২) জনসংখ্যা অল্প বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু জনন-হীনতা উপস্থিত হইয়াছে, কারণ জন্মের হার কমিয়াছে ও কমিতেছে। * জনসংখ্যা যে বৃদ্ধি হইতেছে, বলিলাম, তাহাও উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণের মধ্যে নহে, এবং প্রধানতঃ পূর্ব্ববঙ্গে। হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেই

* A belief constantly inculcated during the early years of life whilst the brain is impressible appears to acquire almost the nature of an instinct and the very essence of an instinct is that it is followed independently of reason.—ibid 187.

* The slower rate of growth seems to be due rather to a falling off in the birth rate.—Imperial Gazetteer of India, 1909 Vol p 38.

জনন-হীনতা উপস্থিত হইয়াছে, কারণ জন্মের হার হ্রাস হইয়াছে। মুসলমান সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে সত্য, এবং হিন্দু সমাজ অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাও সত্য; কিন্তু মুসলমান সমাজেও জনন-হীনতা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হওয়ায় জনসংখ্যা ফুরাইয়া যাইবার আশঙ্কা হইতেছে। যে সমাজেই জনন-হীনতা উপস্থিত হয়, তাহা নিবৃত্ত না হইলে সে সমাজ বিনষ্ট হইবেই। * ইহার কি কোন প্রতিরোধক নাই? আছে। আহার, স্বাস্থ্য ও (সর্ব্বোপরি) বিবাহ বন্ধনের উন্নতি না হইলে জনসংখ্যা সম্বন্ধে কোন আশাই করা যায় না; আর ঐ ত্রিবিধ বিষয়ের উন্নতি সাধিত করিতে পারিলেই সমাজ টিকিয়া গেল এবং উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল।

আহার ও স্বাস্থ্যের বিষয় পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। বিবাহ বন্ধন সম্বন্ধে প্রথম কথা বিবাহক্ষেত্রের বিস্তৃতি, নচেৎ যথাযোগ্য বর কন্যার অভাবে, রুগ্ন, দুর্ব্বল, বংশদোষগ্রস্ত বর কন্যা বিবাহিত হইয়া সমাজকে অধোগতির দিকে লইয়া যায়। এ সম্বন্ধে আর একটী গুরুতর কথা এই যে, অন্তর্ব্বিবাহ ও বহির্ব্বিবাহ; এই দ্বিবিধ বিবাহ পদ্ধতিই মধ্য সময় অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ সমাজের উন্নতির বিশেষ আশা করা যায় না। † অন্তর্ব্বিবাহ অর্থে এক জাতীয় জনগণমধ্যেই যৌন সম্বন্ধ স্থাপন; ইহাতে জাতীয় চরিত্রকে স্থায়ীত্ব প্রদান করে। আর বহির্ব্বিবাহ অর্থে বিভিন্ন জাতীয় জনগণের যৌন সম্বন্ধ স্থাপন; ইহাতে সমাজ মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করে। প্রাচীন সমাজ মাত্রেরই এই কথা মনোযোগ পূর্ব্বক স্মরণ রাখা উচিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির প্রধান উপকরণ মানসিক উন্নতি। † উচ্চমনা কর্ম্মী, প্রায়ই বংশানুক্রমে জন্মিয়া থাকেন। সুযোগ্য ব্যক্তির বংশে তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত সুযোগ্য ব্যক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা অধিক। জন সাধারণের মধ্য হইতে যোগ্য অযোগ্য বিচার না করিয়া কোন একজনকে বাছিয়া লইলে, এবং যোগ্য ব্যক্তিগণের পুত্র পৌত্র প্র-পৌত্রদিগের মধ্য হইতে কোন একজনকে লক্ষ্য করিলে;—এই শেষোক্ত ব্যক্তিই প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা যোগ্যতর হইবার অধিক সম্ভব। ‡ এ বিষয়ের প্রধান বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতবর গ্যাল্টন এই কথা বিস্তৃতরূপে বুঝাইয়াছেন। যোগ্য পিতা মাতা যদি একটী যোগ্য সন্তান লাভ করেন, তবে তাহা হইতে সমাজ যেরূপ লাভবান হইল, এরূপ আর কিছুতেই নহে। একজন উদ্যমশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি কোন সমাজে জন্মগ্রহণ করিলে সে সমাজ উন্নত হইবেই। ব্যক্তির গুণ জাতিতে প্রতিফলিত হয়। বংশানুক্রম অনুসারে অনন্যসাধারণ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া যে মহাপুরুষ তদনুরূপ মনের অধিকারী হন, তিনি একাই দশের অসাধ্য

---

* The most potent cause of extinction appears to be lessened fertility and ill-health . ...&c . ...the births have deen few and the deaths numerous Descent p 29.

† The establishment of a successful race or stock requires the alter-nation of period of inbreeding in which characters are fixed and periods of outbreeding in which, by the introduction of fresh blood, new varieties are produced—

Heredity, p 537

† The law of the whole animal kingdom is the same as for the individual. Success in this world depends upon brain—Gaskell

‡ Galton's Hereditary Genius.

সাধন করত: সমাজকে উন্নতি পথে অগ্রসর করাইয়া দেন। * সামাজিক আচার ব্যবহার, অনুষ্ঠান এবং বহুবিধ গুরুতর কর্ম্মও শারীর তত্বের নিয়মাবলীর সহিত সংসৃষ্ট। স্পেন্সার বলিয়াছেন,—

"Some of the most important human institutions are intimately connectd with those fundamental physiologcal laws, more especially the laws of reproduction, inheritance and variation."† উপযুক্ত দেহ বিধান ব্যতীতউপযুক্ত মনের উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে। ‡ তাই মনের উন্নতি বিচার করিতে হইলে, মনের উন্নতি সাধিত করিতে হইলে, জীব-তত্বের নিয়ম সকল অবগত হইয়া তদনুসারে বংশানুক্রম চালিত করিতে হয়। § তাহাতে যদি সমাজস্থ কোন বংশেও একটী অনন্যসাধারণ স্নায়ুমণ্ডলযুক্ত সন্তান লাভ হয়, তাহা হইলেই সমাজ ধন্য হয় এবং প্রচুর লাভবান হইয়া থাকে। উন্নতি পথে গুরুতর সামাজিক বিবর্ত্তন এইরূপেই অধিকতর সম্ভব, এবং চেষ্টা-সাধ্য, নচেৎ আকস্মিক ঘটনার ন্যায় হইয়া উঠে। যে সকল মানসিক গুণ থাকিলে সমাজ উন্নত হয়, তাহা উপযুক্ত দেহেরই ফল। দেহ যৌন সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং বংশানুক্রমের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহ বন্ধন অনুষ্ঠিত না হইলে সমাজকে উন্নতির পথে লওয়া সম্ভব হইবে না। প্রাচীন সমাজের জাতীয় স্বভাব একটা স্থায়ীত্ব লাভ করে, তাহাকে নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে বিবাহ প্রথার পরিবর্ত্তন অবশ্য-কর্ত্তব্য। আন্তর্জাতিক † বিবাহের সুফল সকল চির-স্থায়ী নহে; তাই বহির্জাতিক ‡ বিবাহ সময় সময় প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক। উহার ফলও চিরস্থায়ী নহে। এই নিমিত্তই পণ্ডিত-গণ উভয়বিধ বিবাহ প্রণালী প্রচলন করাই সঙ্গত বোধ করেন। কিন্তু যে সকল জাতি মধ্যে দেহ ও মনের গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহাদিগের বিবাহ বন্ধন অপেক্ষা, অল্প প্রভেদ-বিশিষ্ট অথচ বিভিন্ন জাতীয় জনগণের বিবাহই অধিক ফলপ্রদ। এই বিষয় মনো-যোগী না হইলে কোন সমাজই দীর্ঘকাল উন্নত থাকিতে পারে না। এ পথ অবলম্বন করিতেই হইবে।

এ স্থলে এতদ্দেশীয় একটা দৃষ্টান্ত দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারি না। বিষয়টী সর্ব্বসম্মত না হইতে পারে, তথাপি উল্লেখ-যোগ্য। বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান সমাজের কথা বিবেচনা করুন। বাঙ্গালী জাতি বিদ্যা বুদ্ধি এবং উদ্ভাবনী শক্তিতে ভারতের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়াছে কেন? ইহার অন্য যত প্রকার কারণই থাকুক, জীব-বিজ্ঞানানুমোদিত কারণই প্রধান। প্রবাদ আছে, বঙ্গের ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন। মোটেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচ জন কায়স্থ আসিয়াছিলেন। এ দেশ তখন জনশূন্য মরুভূমি ছিল না।

* "The community receives the advantage of the foresight possessed by any individual who happens to be endowed with a central nervous system which transcends that of his fellows in its powers of dealing with sense impressions and other symbols"

† Herbert Spencer Lecture, 1909.
University of Oxford.

‡ The mental condition is often caused by the physical conditions, and the sound body is still required upon which to build the sound mind.
Race culture, p 14.

§ Biological studies have a human interest and human application * * (They are) important in the elucidation of social questions &c......Ibid.

† Endogamous.

‡ Exogamous.

এখানেও ব্রাহ্মণাদি ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বেদপারগ ছিলেন না, এই মাত্র। বহু ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির সমাজে আসিয়া ঐ পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চজন মাত্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কতদিন স্ব স্ব বংশানুক্রম স্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন? তাঁহারা এতদ্দেশীয় নারীদিগের পাণিগ্রহণ করতঃ অসত্য উৎপাদন করিলে ক্রমে তাঁহাদিগের বংশধারা মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বতন বাঙ্গালী রক্তে নূতন রক্তের মিশ্রণ হইয়াছিল। তাহাতে মিশ্রিত বংশক্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির দেহ, বিশেষতঃ মস্তক পরীক্ষা করিলে এ বিষয় বিশেষ সন্দেহ থাকে না। কাণ্যকুব্জ দেশীয় কতিপয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং এতদ্দেশীয় কতিপয় কায়স্থের মস্তক পরিমাপ করিয়া যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, * তাহাতে মোটের উপর বলা যায় যে, কাণ্যকুব্জীয়গণের মাথা লম্বা, আর বঙ্গীয়গণের মাথা চওড়া। এই কথাই একটু বিস্তৃত ভাবে বলিলে এইরূপে বলিতে হয়, মাথার প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত এতদ্দেশীয়গণের অধিক। আর কান্যকুব্জীয়গণের তদপেক্ষা অল্প। মাথার খুলির পিছের দিকে যে একটী ঢিপি আছে, তথা হইতে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ধরিলাম; আর এক কর্ণের উপর হইতে অন্য কর্ণের উপর পর্য্যন্ত প্রস্থ ধরিলাম। এখন অনুপাত জানিতে হইলে, প্রস্থকে দৈর্ঘ দিয়া ভাগ করিতে হয়, এবং ঐ ভাগ-ফলকে একশত দিয়া গুণ করিতে হয়। যথা—

$$\frac{\text{প্রস্থ} + ১০০}{\text{দৈর্ঘ্য}} = \text{অনুপাত}$$

এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছি, কাণ্যকুব্জীয়গণের মস্তকের গড় অনুপাত ৭২, ৭৩; এবং বঙ্গীয়গণের গড় অনুপাত ৭৮, ৭৯ হইতে ৮০; এবং কোন কোন স্থলে তাহারও কিছু অধিক। এ বৈষম্য বংশগত, অর্থাৎ জাতিগত; ইহা এতদ্দেশীয় জলবায়ু নিবন্ধন নহে। তবেই কান্যকুব্জীয়গণ হইতে বঙ্গীয়গণ কত পৃথক! তাহা হইবই তো। পূর্ব্বতন পৃথক সমাজের সহিত কান্যকুব্জীয়গণের সংমিশ্রণের ফল এইরূপই হইবার আশা করা যায়। তার পর, আর একটী কথা;—ঐ পূর্ব্বতন বঙ্গীয় সমাজ কাহারা? উহারা কি কান্যকুব্জীয়গণের সহিত এক জাতীয়? উহাদিগের দেহবিধান এখন পর্য্যালোচনা করা সহজ নহে; তথাপি বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের মুখের আকৃতি ও অস্থি-সংস্থান, বর্ণ এবং মাথার খুলির নানা স্থানের মাপ ও অনুপাত ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে দ্রাবিড়ী ও মঙ্গোলীয় জাতির সহিত বিশেষ নৈকট্য দেখা যায়। এ বিষয় এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা হইতে পারে না। ইহাও জলবায়ুর ফল নহে। এতদ্দেশীয় ইতিহাস ও লোকতত্ত্বের মীমাংসা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পারে।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গীয়গণের দেহে দ্রাবিড়ী, মঙ্গোলীয় এবং আর্য্য শোণিত মিশ্রিত হইয়াছে। তাই বঙ্গীয়গণকে বহির্জ্জাতীয় যৌন সম্বন্ধের ফল মনে করা যায়। উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে বঙ্গীয়গণের প্রতিভা ও শক্তি মানসিক বলের অন্য কারণ অনুষ্ঠান করা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতেই প্রচুররূপে বুঝা যায় যে, এ জাতি ভারতবর্ষে সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবেই।

* কয়েক মাস হইল আমি ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় রাজসাহী জেলাতে অনেকের মাথা মাপিয়াছিলাম। তাহার ফল শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। উহা রিস্‌লি সাহেবের গবেষণার সহিত প্রায় মিল হইয়াছে।

এই মিশ্রিত অবস্থা বঙ্গীয়গণের গৌরবজনক ভিন্ন কোন মতেই গৌরবের ক্ষতিকর নহে।

এক্ষণে এতদ্দেশীয় মুসলমান সমাজের কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই মনে উদয় হয় যে, ইহাঁরা কে? ইহারা ত হিন্দুই। যে জাতি দ্রাবিড়ী, মঙ্গোলীয় ও আর্য্যরক্তসম্ভূত, ইহারা ত সেই জাতিই। তাহার উপরও কোন কোন স্থলে আরবীয়গণের রক্তমিশ্রিত হইয়াছে। ইহাদিগের প্রাধান্যও এই দিক হইতে দেখিলে দুর্ব্বোধ্য হয় না। ইংলণ্ডীয় জনগণের শিরায় শিরায় কত মিশ্ররক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন। মানবসমাজের ইতিহাস ও লোকতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে বহির্বিবাহ যে জাতীয় শক্তি সঞ্চয়ের একটী প্রধান উপায়, ইহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন হয় না।

যাহা হউক, সমাজের উন্নতির মূল কারণ যে সকল নির্দ্দেশ করিয়াছি, তন্মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতির স্থান সর্ব্বোচ্চ। ধর্ম্ম ও নীতি পৃথক নহে; ধর্ম্মই সমস্তের মূল। ধর্ম্ম বলিতেই কর্ম্মকে বুঝায়। ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা এতদ্দেশে পুরাকাল হইতেই পৃথকভাবে আলোচিত হইতেছে। পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা দুই স্বতন্ত্র শাস্ত্র। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা কর্ম্মকাণ্ড লইয়া ব্যাপৃত এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জ্ঞানকাণ্ড লইয়া ব্যাপৃত। কিন্তু কর্ম্মে জ্ঞান দৃঢ় হয় এবং জ্ঞানে কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়। তাই এতদুভয় প্রকৃতপক্ষে পৃথক নহে। শ্রুতি বলেন—

অন্য দেবাহুর্বিদ্যয়াহ অন্যদেবাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুমধীরানাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ংসহ। *
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥ *

জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের একত্র অনুশীলন আবশ্যক। নতুবা সফলতার আশা নাই। কর্ম্মক্ষেত্র বিশাল; কেবল ব্যক্তিগত কর্ম্ম সমাজের পক্ষে সর্ব্বদা সুফলপ্রদ হয় না; তাই সামাজিক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া চাই। যাহাতে সমাজস্থ জনগণের মঙ্গলজনক কর্ম্ম অবাধে সংসাধিত হইতে পারে, তাহাই প্রধান সামাজিক ধর্ম্ম। ইহাতে বিভিন্ন সমাজের সংঘর্ষ হইবে বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে সামাজিক জড়তা, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি তদ্রূপ সংঘর্ষ না হয়, সেত আরও মঙ্গলের কথা, কিন্তু হইলেও নিবৃত্ত হওয়া ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। ঐ সংঘর্ষে জয়ী হইতেই হইবে, সমাজের কর্ম্ম আপন আয়ত্বাধীনে আনিতেই হইবে; নচেৎ সামাজিক উন্নতির আশা করা বাতুলতার নামান্তর মাত্র; বরং সামাজিক অস্তিত্বও বিনষ্ট হইতে পারে। সামাজিক কর্ম্মের উপযোগী সামাজিক মন চাই। যেমন ব্যক্তির মন ও দেহ একই, দেহের অবস্থা অনুসারেই মন নিয়মিত হয়, তেমনই সমাজ দেহ ও সামাজিক মনও একই পদার্থ। সর্ব্ব প্রযত্নে দেহ ও মন গঠিত করিতে হয়। দেহ গঠিত করিতে বিবাহ প্রথার দিকে দৃষ্টি রাখা, এবং মন গড়িয়া আবাল্য সৎশিক্ষা ও সৎসঙ্গ অত্যাবশ্যক। এইরূপে উপযুক্ত ব্যক্তির আবির্ভাব হইলে সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেই, নচেৎ কাহারও সাধ্য নাই যে, উন্নতি-পথে স্থায়ী ফল লাভ করে, ইহা সুনিশ্চিত।

কিন্তু এইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তির আবির্ভাবের প্রত্যাশায় সমাজ কি নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিবে? না, তাহা নহে। উপরে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ইহাও সমাজের প্রযত্ন-সাধ্য। বিবাহ বন্ধনের দিকে দৃষ্টি

* ঈশোপনিষৎ ২০।২১।

রাখিতে হয়, আর রাখিতে হয় সমাজের সাধারণ উৎকর্ষতার দিকে। গাল্টন দেখাইয়াছেন যে, সমাজের সাধারণ যোগ্যতার গড় ধরিলে সমাজের অবস্থা যেরূপ দেখা যায়, বিশেষ ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ তাহা অপেক্ষা কিছু অধিকতর যোগ্যতা লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। গাধার সমাজে ঘোড়া হয় না, ঘোড়ার বিবর্ত্তনেও মানুষ হয় না। তাই সমাজস্থ জনসাধারণের উন্নতি বিধানই মহাপুরুষ আবির্ভাবের কারণ। জনসাধারণের উন্নতি হইলেই সে সমাজে অতীব যোগ্য ব্যক্তির শুভাবির্ভাব সম্ভবপর হয়। * ব্যক্তি সমাজ-বৃক্ষেরই ফল। তাই পূর্ব্ব-কথিত দুই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া যত্নবান হইলেই যথাযোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে। আর তখন হইতেই সমাজও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। এতত্ব বিস্মৃত হইলে কোন সমাজই আত্মরক্ষা অথবা উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হয় না।

শ্রীশশধর রায়।

গিরিজাপ্রসন্ন। (৭)

(৩৮৬ পৃষ্ঠার পর।)

জ্যোতিষানুশীলন।

গিরিজাপ্রসন্ন যে বৎসর বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, সেই বৎসর তাহার প্রথম পুত্রটীর মৃত্যু হয়। গিরিজাপ্রসন্ন প্রতিকূল ঘটনার নিষ্পেষণে এই সময় অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্রশোকে অধীর হইয়া তিনি অদৃষ্টের ফলাফল জ্ঞাত হইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই এ শাস্ত্রে তাহার প্রভূত অধিকার জন্মিয়াছিল। তাঁহার গৃহলক্ষ্মীর ২য় ভাগে এই জ্যোতিষ-বিষয়ক একটী প্রবন্ধ আছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের কিয়দংশ রমণীজাতিরও জানা কর্ত্তব্য। ঐ গ্রন্থে তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এমন সুশৃঙ্খলতার সহিত সরলভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, উহা পাঠ করিলেই তাঁহার জ্যোতিষাভিজ্ঞতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। আমরা ঐ প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া জানিলাম, হিন্দুশাস্ত্রকার মহামুনি মনুর মতের সঙ্গে, জ্যোতির্ব্বিদদের মতের অনেক সাদৃশ্য আছে। পাত্র ও পাত্রী নিরূপণ, সন্তানোৎপাদন, বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে, জ্যোতির্ব্বিদগণ, ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইতে পারেন নাই।

মাননীয়া রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জীবিতাবস্থায়, তাঁহার পুত্র মহামান্য সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড একবার সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হয়েন। তিনি যে ঐ সময় রোগাক্রান্ত হইবেন, তাহা দুই একজন জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ পীড়া যে তাহার সিংহাসনারোহণে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিবে না, তাহাও নাকি তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বারকা

* কোনও সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে দয়াময় ভগবান ধর্ম্মরক্ষার্থ অবতীর্ণ হন। এই প্রাচীন মতের সহিত, আলোচ্য বৈজ্ঞানিক মতের বিরোধ নাই। উভয়ের একীকরণ হইতে পারে।

নাথ সেন মহাশয়ের যোগ্য-তনয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম-এ মহাশয় গিরিজাপ্রসন্নের নিকট কিছুকাল জ্যোতিষ শিক্ষা করেন, তিনি বলিয়াছেন, "গিরিজা বাবুর জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। মহামান্য সপ্তম এডওয়ার্ডের পীড়ার সময় তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা আমাকে ঐ পীড়ার কারণ দেখাইয়াছিলেন।"

গিরিজাপ্রসন্ন কোষ্ঠী রচনা করিতে জানিতেন, তাঁহার গ্রামের অনেক লোক তাঁহা দ্বারা কোষ্ঠী প্রকাশ করাইয়া লইতে আগ্রহ প্রকাশ করিত। গিরিজাপ্রসন্নের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। যে বিষয়ই আয়ত্ত করার জন্য সচেষ্টিত হইতেন, অতি অল্পাভ্যাসেই তিনি তাহাতে আশাতীত জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেন।

মহানুভাবকর্তা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেও অনেক সময় মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভবানীপুরস্থ ঈশ্বরপরায়ণ স্বর্গীয় পঞ্চানন রায় কবি চিন্তামণির বাসায় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতেন। গিরিশচন্দ্রের জন্মভূমি গিরিজাপ্রসন্নের স্বদেশে। একদিন কোন কার্য্যোপলক্ষে ৺পঞ্চানন রায় মহাশয়ের নিকট গিরিজাপ্রসন্ন গমন করেন। সেখানে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে প্রথমই গিরিজাপ্রসন্নের সাক্ষাৎ হয়। গিরিশচন্দ্রের কলিকাতা বাসের ব্যয় তাঁহার অভিভাবক বহন করিতেন। কোন কারণবশতঃ গিরিশচন্দ্রের অভিভাবক এই সময় অর্থ পাঠাইতে বিলম্ব করায়, গিরিশচন্দ্র বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন কি, পরিধেয় বস্ত্র অব্যবহার্য্য হওয়ায় তিনি গৃহের বাহির হইতে পারিতেন না। গিরিশচন্দ্রকে মলিন বস্ত্র পরিহিত দেখিয়া ও তাহার মুখমণ্ডলে বিষাদ চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া গিরিজাপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরিশ, তোমাকে অত চিন্তাযুক্ত দেখাইতেছে কেন?" গিরিশচন্দ্র তখন অকপট চিত্তে তাহার বিষাদের কারণ গিরিজাপ্রসন্নের নিকট খুলিয়া বলিলেন। পরদুঃখকাতর গিরিজাপ্রসন্ন আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া গিরিশচন্দ্রের দুরবস্থা বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন "এস, এজন্য তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না।" গিরিশচন্দ্র তাঁহার অনুগমন করিলেন, গিরিজাপ্রসন্ন বাসায় পঁহুছিয়া আবশ্যকীয় অর্থ প্রদান করত গিরিশচন্দ্রের দুরবস্থা দূর করিলেন। গিরিশচন্দ্র মহাকৃতজ্ঞ, তিনি গিরিজাপ্রসন্নের এরূপ অনেক উদারতার বিষয় আমাদিগকে বলিয়া তাঁহার অকালমৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সাহিত্যানুরাগ।

গিরিজাপ্রসন্নের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গিরিজাপ্রসন্নের সাহিত্যানুরাগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "কলিকাতা শেষ বাসকালে তিনি একটী ছাপাখানা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ উহা প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এক যোগে আরম্ভ করেন এবং পরে পৃথক ভাবে চালাইয়াছিলেন। সাহিত্য বিষয়ক ভাল ভাল পুস্তক প্রকাশ করাই তাঁহার এই ছাপাখানা করার প্রধান উদ্দেশ্য। এই ছাপাখানার নাম দেন "বঙ্কিম চন্দ্র"। নামকরণেই তাঁহার অভিপ্রায় যথেষ্ট বুঝা যায়। তৎপরে চিরকালই সাহিত্যের যাহাতে উন্নতি ও উৎসাহ হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ছাপাখানার লাভ লোকসানের দিকে একেবারে না তাকাইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনেক বলা যায়।

আমার ন্যায় সামান্য লোকের কথা বলি, অনেক মাসিক পত্রিকায় আমার দুই একটা সামান্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। গিরিজাবাবু আমার প্রতি একান্ত অনুরাগ বশতঃই আমার কয়েকটা প্রবন্ধ নিজ ব্যয়ে নিজে চেষ্টা করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি চেষ্টা না করিলে বোধ হয় আমার লেখা প্রবন্ধ কখনই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত না। আর অনেক সাহিত্যানুরাগের দৃষ্টান্ত জানি। এক দিন তিনি ছাপাখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন গরিব ভদ্রলোক তাঁহাকে তাঁহার লিখিত কয়েকটী কবিতা দেখান। গিরিজা বাবু তাহাতে প্রকৃত কবিত্বের বিকাশ দেখিয়া কেবল মাত্র কাগজের মূল্য লইয়া পুস্তক ছাপাইয়া দেন। একি কম কথা?"

ধর্ম্মানুরাগ।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গিরিজাপ্রসন্নের ধর্ম্মানুরাগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"যে বৎসর কলিকাতায় প্রথম প্লেগের হাঙ্গামা হয়, লোকজন কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়া যায়, তিনিও কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এ সময় আমার সঙ্গে কথা হয়, আমি কবে সপরিবারে কলিকাতা ত্যাগ করিব। আমি তখন কলিকাতা থাকিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার পরামর্শে আমাকেও কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তিনি বলিলেন যে, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ভক্তি থাকা ভাল, তাঁহার উপর নির্ভর করা আরও ভাল, কিন্তু তাঁহাকে পরীক্ষা করা ভাল নহে। তাঁহার উপর নির্ভর করা চাই, কিন্তু তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করাও চাই। এই বলিয়া তিনি একটা গল্প করিয়াছিলেন। তাহা আমি কখনই ভুলিব না, গল্পটী এই—এক সহরে একটী হাতী ক্ষেপিয়া যথেচ্ছা যাইতেছে। হাতীর উপর হইতে মাহুত ক্রমাগত চীৎকার করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছে, কেহ সম্মুখে না পড়ে। সকলেই মাহুতের কথায় সতর্ক হইয়া পলাইতেছে, এমন সময় একজন সাধু ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, তিনি মাহুতের কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া ভগবানের চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন, ক্রমে হাতী তাহার কাজ করিয়া গেল, যেমন তাঁহাকে সম্মুখে পাইল, শুড় দিয়া ধরিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। সাধু তাহাতে বড় বেদনা পাইলেন, তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তাহাতে তিনি ভগবানের প্রতি অভিমান করিয়া করিয়া পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন এবং ভগবানকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহাকেই ডাকিতেছিলেন, তাহার কি এই ফল হইল? তাহাতে ভগবান বলিলেন, বাপু সাধু, তুমি আমাকে জান, কিন্তু আমার কথা মাননা কেন? মাহুতের মুখ দিয়া আমি যে আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম, তাহা তুমি মানিলে না কেন? তুমি মাহুত ভগবানের কথা শুনিলে না বলিয়া হাতী-ভগবান তোমাকে দণ্ড দিয়াছেন, তাহাতে দুঃখিত হইবে না। সকলই আমার কাজ। এই গল্প শুনার পর গিরিজাবাবুর কথা আমি না শুনিয়া আর থাকিতে পারিলাম না; তিনি কলিকাতা ত্যাগ করার পূর্ব্বেই আমি স্থানান্তরে চলিয়া গেলাম।"

গিরিশ বাবুর অনুরোধে এই ঘটনাটী আমরা তাঁহার জীবন-চরিতে গ্রহণ করিলাম।

কর্ত্তব্যপরায়ণতা।

একবার আমি ও আমার জ্যেষ্ঠভ্রাত গিরিজাপ্রসন্ন বাড়ী হইতে কলিকাতা গমন করি। আমাদের মধ্যমশ্রেণীর টিকিট ছিল।

গিরিজাপ্রসন্ন ষ্টীমারে কোন জিনিষই আহার করিতেন না, একে সমস্ত দিবস উপবাস, তাহাতে আবার পথ-কষ্ট, গিরিজাপ্রসন্ন ট্রেণে উঠিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি ট্রেণের এক বেঞ্চের উপর তাঁহার শয্যা রচনা করিয়া, তাঁহাকে বিশ্রামের জন্য শয়ন করিতে অনুরোধ করি, গিরিজাপ্রসন্ন সেই শয্যায় কিছুকাল শয়ন করিয়া বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতেছিলেন, কিছুকাল পরে ট্রেণ খানি কোন ষ্টেশনে পঁহুছায় ষ্টেশন হইতে একজন লোক আমাদের গাড়ীতে উঠিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ঐ লোকটী আমাদের গাড়ীতে আরোহণ করিলে আমার জ্যেষ্ঠতাতের বিশ্রামসুখ নষ্ট হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আমি আরোহী মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, আমাদের গাড়ীতে স্থান হইবে না। আপনি অন্য গাড়ীতে উঠিয়া পড়ুন। উক্ত লোকটী আমার কথাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অন্য গাড়ীতে যাইতেছিলেন, এমন সময়, আমার জ্যেষ্ঠতাত শয্যোত্থিত হইয়া গাড়ীর দ্বার মুক্ত করিয়া ঐ লোকটীকে তাঁহার কাছে আনিয়া বসাইলেন, ও সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া গাড়ীর এক কোণে উপবিষ্ট রহিলেন। বলা বাহুল্য যে, ঐ আরোহী মহাশয়ের নিকট আমি মিথ্যা বলার জন্য ভর্ৎসিত হইয়াছিলাম। কর্ত্তব্য পালনের জন্য আমি তাঁহাকে এরূপ দুরন্ত কাজ করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিলাম, ইনিত সাধারণ পুরুষ নহেন, পরের একটু উপকারের জন্য সমস্ত রাতটা ক্লান্ত শরীর লইয়া জাগিয়া থাকিতে সম্মত হইলেন, একটু সময়ও শয়নের জন্যও একটু লালায়িত হইলেন না! তাঁহার ন্যায় একজন চরিত্রবান লোক এ পর্য্যন্ত কোথায়ও আমার দৃষ্টিপথে পড়িল না।

মানুষের যেন দুইটী জীবন, একটী বাহিরের, আর একটী ভিতরের। বাহিরের জীবন কতকগুলি সুবিধাদি দ্বারা নিয়মিত, সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু ভিতরের জীবন প্রশান্ত, সুদূর বিস্তৃত ও গগন-সঞ্চারী বায়ুর ন্যায় স্বাধীন। এই জন্য প্রাচীন কালের ঋষিরা বাহিরের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভিতরের জীবনকেই অধিকতর সার জ্ঞান করিতেন।

গিরিজাপ্রসন্নের কলিকাতা অবস্থিতি কালে একবার একটী দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাঁহার পাকের জন্য নিযুক্ত হয়। কলিকাতার পাকের ব্রাহ্মণ প্রায়ই হীনোপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ঐ ব্রাহ্মণটীও এত ঘৃণ্য ছিল যে, বাসার জিনিষ পত্র অপহরণ করিয়া গৃহে লইয়া যাইত। সে দুই দিবস ঐরূপ নিন্দনীয় কার্য্যের জন্য গিরিজাপ্রসন্নের নিকট অভিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি প্রথম দুই দিবস উপদেশ ও ভয় প্রদর্শন করিয়া ঐ ব্রাহ্মণটীকে সতর্কিত করিয়া দেন। তৃতীয় দিবস ব্রাহ্মণের ঐরূপ একটী দুষ্কার্য্যের বিষয় জ্ঞাত হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই তাহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য মনস্থ করিলেন। তাঁহার ভৃত্য দেখিল, এখনও আহারের বন্দোবস্ত হয় নাই, অথচ বেলা অধিক হইয়াছে, ব্রাহ্মণকে অসময় বিদায় দিলে কেইবা আহারীয় দ্রব্য পাক করিয়া দিবে? গিরিজাপ্রসন্ন ভৃত্যের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিলেন "পাকের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইবে না, আমি ব্রাহ্মণের সামান্য উপকার প্রত্যাশায় এরূপ অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে পারিব না। গিরিজাপ্রসন্ন তখনই দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণের বেতন

পাওনা মিটাইয়া বিদায় করিয়া দিলেন ও নিজে পাক করিয়া সকলকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। স্থায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া গিরিজাপ্রসন্ন ঐন্দ্রিয়িক সুখটাকে বড়ই তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তাহার মন খানি যেন তেজের আধার ছিল।

সৌহার্দ্দ।

গিরিজাপ্রসন্ন বি-এ পাশ করিয়া বি-এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেও তৎসঙ্গে "নবজীবনে" বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসস্থিত নর নারী চরিত্রের সমালোচনা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নবজীবন-সম্পাদক বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সঙ্গে এই সময় তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মে। তিনিই নাকি সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। গিরিজাপ্রসন্ন বন্ধুবর্গের বড়ই শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, হাইকোর্টের কোন একজন খ্যাতনামা উকীল তাঁহা দ্বারা পাঠ্যজীবনে পরম উপকৃত হইয়া তাঁহার সৌহার্দ্দ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"গিরিজা বাবুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাসায় আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমি ও গিরিজা বাবু তখন নবজীবনে প্রবন্ধ লিখিতাম। পরস্পর পরস্পরের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে কাহারও সঙ্গে কাহারও মৌখিক আলাপ ছিল না, গিরিজা বাবু আমার পরিচয় অক্ষয় বাবুর বাটীতে পাইয়া, আমাকে বি-এল পড়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমি সে অনুরোধ প্রথম উপেক্ষা করিতে চেষ্টা করি। যখন বুঝিতে পারিলাম, গিরিজা বাবু আমার প্রকৃত হিতৈষী ও মঙ্গলাস্পদ, তখন আর তাঁহার সুপরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। আমার নিকট বি-এল পরীক্ষার পুস্তক ছিল না, গিরিজা বাবু তাহা শ্রুত হইয়া বলিলেন, "আমার যে পুস্তক আছে, উহাতেই আপনার পাঠের কাজ চলিবে, আপনার পুস্তক ক্রয় করিতে হইবে না।" বাস্তবিক পরীক্ষার শেষ দিন পর্য্যন্ত, তিনি আমায় পুস্তক দিয়া অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন। যখন পরীক্ষার দিন সন্নিকট হইল, গিরিজা বাবু আবশ্যকীয় পুস্তকগুলির মধ্যে যেগুলি উভয়ের একই সময় প্রয়োজনীয়, সেইগুলির মধ্যভাগ ছিন্ন করিয়া অর্দ্ধেক আমার নিকট রাখিয়া অপরার্দ্ধ স্বয়ং পাঠের জন্য রাখিয়া দিলেন। গিরিজা বাবুর সৌহার্দ্দ লাভ করিতে না পারিলে আইন পরীক্ষা আমার দেওয়া হইত কিনা সন্দেহ।"

উক্ত প্রসিদ্ধ উকীল মহাশয় কেবল উল্লিখিত ঘটনাটী বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, এই পুস্তকখানির যখন পাণ্ডুলিপি তাঁহার দৃষ্টার্থ প্রেরিত হয়, তখন এই ঘটনাটী বিস্তৃত ও ইহার সঙ্গে গিরিজাপ্রসন্ন সম্বন্ধীয় আরও কয়েকটী ঘটনা স্বয়ং সংযোজিত করিয়া আমাকে নিতান্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন। নিম্নে তাহার লিখিত অংশ অবিকল উদ্ধৃত হইল;—

"কেবল কি তাহাই, যখন পরীক্ষার ফল বাহির হইল, আমি গিরিজা বাবুর অপেক্ষা একটু উচ্চস্থান পাইয়াছিলাম, তাহাতে সাধারণ লোকের মনে কি হয় সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু অসাধারণ মহৎ গিরিজা বাবু তাহাতে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন এবং পরিহাসচ্ছলে আমাদের উভয়ের একান্ত হিতৈষী অক্ষয় বাবুর নিকট অভিযোগ করিলেন যে, তাঁহার পুস্তক পড়িয়া তাঁহার অপেক্ষা পরীক্ষার উচ্চস্থান লাভ করা আমার উচিত হয় নাই।

তাহার পর আর একটী কথা, উভয়ে একত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতিতে প্রবিষ্ট হইলাম, তাঁহার নানা কারণে ওকালতি ভাল লাগিল না। শেষে একরকম

ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার অপেক্ষাকৃত একটু সুবিধা হওয়ায় তিনি যে আনন্দোচ্ছ্বাস করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একদিন তিনি হাই-কোর্টে আমার একটী মোকর্দ্দমার সওয়াল জবাব শুনিয়া আমার প্রতি এত সন্তুষ্ট হন যে, বাসায় আসিয়া আমাকে একখণ্ড পুস্তক পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন, বলেন যে, আমারত ওকালতি করা হইল না, আপনার এ সকল পুস্তকে উপকার দেখিবে। যে কারণে সাধারণের ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতা হয়, তাঁহাব সেই স্থলে কি প্রকার স্নেহ ভালবাসার উচ্ছ্বাস! ইহাই ত বড়মনের পরিচয়,সৌহার্দ্দের লক্ষণ।”

সত্যরক্ষণে ঐকান্তিক যত্ন।

গিরিজাপ্রসন্ন বি-এল পাশ করিয়া প্রথম আলিপুর কোর্টে আইন ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, এই সময় তিনি ভবানীপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কয়েক বৎসর পরে হাইকোর্টে যোগদান করেন। আইন ব্যবসায়ে তাঁহার অনুরাগ ছিল না, এজন্য তিনি ঐ ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। গিরিজাপ্রসন্নের চরিত্রের আর একটা প্রধান উপাদান সত্যপ্রিয়তা; তিনি বিনা কারণে অপরের প্রতি অত্যাচার হইতে দেখিলে বা কাহাকেও অন্যায়রূপে কোন প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে দেখিলে তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি আশৈশব ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন। যে কার্য্যটী তাঁহার ন্যায্য বলিয়া ধারণা হইত, তিনি তাহা বজ্রমুষ্টিতে ধরিতেন, কোন প্রকার বাধা বিঘ্ন তাঁহার সংকল্প-পথ চ্যুত করিতে পারিত না। এই বিষয়ের সমর্থনকারী একটী ঘটনা নিম্নে দেওয়া গেল।

গিরিজাপ্রসন্নের কোন জ্ঞাতী ভ্রাতা অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। ঐ ভ্রাতার পিতা তৎকালে জীবিত ছিলেন। তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত অধীর হইয়া কিয়ৎকাল উৎকট রোগাক্রান্ত হয়েন। তাঁহার আর অন্য পুত্র ছিল না যে, তাঁহার মৃত্যুর পর বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া বিষয় ভোগ করিবে। ঐ ব্যক্তি ঘোর বিষয়ী ছিলেন, বিষয়-লালসা তাঁহাকে একটা পাপকার্য্যে উত্তেজিত করিল। তিনি প্রকাশ করিলেন, তাঁহার পুত্রের মৃত্যু সময় যে একটী দত্তকপুত্র রাখার অনুমতি আছে, তিনি জীবন ত্যাগ করিলে যেন ঐ পুত্রটী রক্ষিত হয়। এই সংকল্পের কিছুদিন পরে তিনিও মানবদেহ ত্যাগ করেন।

গিরিজাপ্রসন্নের ভ্রাতা হঠাৎ রোগে আক্রান্ত হইয়া, রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চেতনা-শূন্য হয়েন। তিনি মৃত্যুর ৭।৮ দিবস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেরূপ অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন, দত্তক পুত্র রাখার অনুমতি দান তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঐ দত্তক পুত্র রক্ষিত হইলে গিরিজাপ্রসন্ন বিত্তের ওয়ারাস হইয়াও প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন,গিরিজা প্রসন্ন দত্তক পুত্র রক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, কোন্ হিন্দুই বা জ্ঞাতাগণকে পূর্ব্বপুরুষের নরক গমনের ফাঁদ পাতিতে দেখিয়া অসহিষ্ণু না হয়েন? বিত্ত ইহ জীবনের সুখের জন্য, কিন্তু ধর্ম্ম ইহ জীবন ও পর জীবনের সহায়। কোন্ হিন্দু ইহ জীবনের সুখকেই সারভূত করিয়া ধর্ম্মটাকে জলাঞ্জলি দিতে সম্মত হয়েন? গিরিজা প্রসন্ন বুঝিলেন যে, তাহার ভ্রাতৃবধূ ধর্ম্ম-প্রণোদিত হইয়া স্বামীর বাক্য পাইয়া দত্তক রাখার অভিপ্রায় করিতেছেন না, তাহাকে প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করাই ভ্রাতৃ-বধূর মূল উদ্দেশ্য। গিরিজাপ্রসন্নের পিতৃদেব

তখন জীবিত ছিলেন, গিরিজাপ্রসন্ন এই অন্যায় কার্য্যের প্রতিবিধানের জন্য তাঁহার পিতৃদেবকে আদালতে বিচার-প্রার্থী হইতে অনুরোধ করিলেন। গিরিজাপ্রসন্ন ঐ সময়ে স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, "স্বামীর আদেশ ভিন্ন স্ত্রীর ঐরূপ অনুষ্ঠান ধর্ম্মানুমোদিত নহে, ঐ দত্তক পুত্র দ্বারা সম্পত্তি রক্ষা হইতে পারে বটে, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের পারলৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। আমরা কখনও জ্ঞাতসারে আমাদের জ্ঞাতীগণকে বিনা আপত্তিতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের গ্লানিজনক ও ধর্ম্মনাশক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দিব না। ঐরূপ কার্য্যে আমরা পাপ সঞ্চয় করিয়া নরকগামী হইব ও পূর্ব্বপুরুষগণকেও নিপাতিত করিব।" গিরিজাপ্রসন্ন সত্য সংরক্ষণের জন্য আদালতে মোকর্দ্দমা স্থাপন করিয়াছিলেন। যেরূপ অভ্রভেদী গিরিরাজের শিরোপরি প্রবল ঝটিকা বহিয়া যায়, গিরিরাজ আপনার দৃঢ়তাগুণে আপনি দণ্ডায়মান থাকে, গিরিজাপ্রসন্নও ভগবৎ-জ্ঞান-ফলে সর্ব্বদাই সকল প্রকার বিপদে অবিচলিত ও অটল রহিয়াছেন। এই মোকর্দ্দমাটী পরিচালনে গিরিজাপ্রসন্ন কিরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা আমাদিগকে লিখিয়া দিয়া বাধিত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"এই মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে আসিয়াছিল এবং তাহাতে সুবিখ্যাত কৌন্সলি উড্রফ্ নিযুক্ত হন। গিরিজাপ্রসন্ন তখন আইন পড়িতেছেন মাত্র, কিন্তু এমন করিয়া মোকর্দ্দমার বিষয়ীভূত বৃত্তান্ত ও আইন হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, তাহার লিখিত (Notes) টীকা টিপ্পনী পড়িয়া উড্রফ সাহেব বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অনেক সাহায্য হইয়াছে। অপরিপক্ক স্কুলের ছাত্রের বৃদ্ধ কৌন্সলি উড্রফকে সাহায্য করার কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এসকল অলৌকিক মেধা ও ধীশক্তির পরিচায়ক।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য।

তৃতীয় অধ্যায়—রাজা রামমোহন রায়ের বাল্যকাল। স্বকার্য্য সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের উক্তি—রামমোহন রায় সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের উক্তি—রামমোহনরায়ের জন্ম—তাঁহার বংশ পরিচয়—স্বলিখিত আত্মবিবরণে পিতৃপুরুষ কথা।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া আমরা যে বীরচতুষ্টয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই; একথা বলা যাইতে পারে না যে, ইঁহাকে ছাড়িয়া দিলে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। তবে সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত মহাপুরুষদিগের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে রামমোহন রায়ই

অগ্রণী ছিলেন। অপর তিন জন নানা প্রকার সাহায্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের জন্ত পাঁচজন লোকের কাছে যাতায়াত, অর্থ সংগ্রহ, পুস্তকাদি লিখিয়া অন্যমত খণ্ডন পূর্ব্বক স্বমত স্থাপন, এই সকলই রামমোহন স্বয়ং করিয়াছিলেন। এই কারণে ব্রাহ্মসমাজের উল্লেখ করিলেই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই নাম স্মৃতিপথে উদিত হয়।

রামমোহন রায় যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য বুঝিবার লোক তখন অতি অল্পই ছিলেন। তাই তিনি বেদান্তসারের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে; "তিনি সত্য ও সরলতার পথ অবলম্বন করাতে সকলের, এমন কি, আত্মীয় স্বজনেরও বিরাগভাজন হইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের কাছে তিনি নির্দ্দোষ।" ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্ত তিনি কত-না কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থসকল আপন ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া অকাতরে বিতরণ করিতে হইয়াছিল। একবার তিনি বেদান্তসূত্র ছাপাইতে সংকল্প করিয়া তাহার একখণ্ড এই কলিকাতাতে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি এবং তাঁহার সহোদ্যোগী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সমস্ত কলিকাতা খুঁজিয়া বহু অন্বেষণের পর একটী ব্রাহ্মণের গৃহে একখানি বেদান্তদর্শনের পুঁথি দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ পুঁথিটাকে নিত্য পূজা করিতেন, সুতরাং তিনি তাহা তাঁহাদের হস্তে কিছুদিনের জন্ত রাখিতে পারিলেন না। অবশেষে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সেই স্থানে বসিয়াই সেই চন্দনচর্চ্চিত পুঁথিখানির অনুলিপি করিয়া আনিলেন এবং রামমোহন রায় তাহা হইতে বেদান্তসূত্র প্রকাশ করিয়া মুদ্রিত করিলেন। তাঁহাদের সেই প্রথম উদ্যোগের ফলে আজ আমরা এত দূর উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি আলোচনা করিতে সক্ষম হইতেছি। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন "এখন ব্রাহ্মসমাজের কথা মনে হইলেই এই দেশের প্রথম বন্ধু রাজা রামমোহন রায়কেই স্মরণ হয়। তাঁহার শরীর যেমন বলিষ্ঠ ছিল, শ্রদ্ধা ভক্তি,হৃদয়ের বলও তাঁহার সেই প্রকার ছিল। এখন প্রথমেই তাঁহার মুখশ্রী আমার চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইতেছে। তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ণ উজ্জল মুখ; তাঁর সেই উদার ভাব, সমুদয় যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাঁর শরীরের বল, মনের বীর্য্য, হৃদয়ের ভাব সকলই অনুরূপ। ধর্ম্মের উন্নতির জন্তই তিনি এখানে উদিত হন।"* ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে (১৬৯৫ শকের শেষ ভাগে) হুগলী জেলার, অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন।"

রামমোহনের জন্মকালে শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ এতদূর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে "শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব" সকল প্রকার গুরুতর বিবাদ বিসম্বাদের উপমাস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। রামমোহনের পিতৃকুল বৈষ্ণব ছিলেন, মাতামহকুল শাক্ত ছিলেন। রামমোহন রায়ের সৌভাগ্য ক্রমে শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের মধ্যে তাঁহাকে বর্দ্ধিত হইতে হয় নাই। বন নির্ব্বাসনের গল্পটী এই—রামমোহন রায়ের পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় অন্তিমকালে গঙ্গাতীরস্থ হইলে, শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী চাতরা নিবাসী শ্যাম ভট্টাচার্য্য কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া ভিক্ষার্থীরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া

* শতবিংশতি সম্বৎসরের সাম্বৎসরিক বৃত্তান্ত।

লেন। শ্যাম ভট্টাচার্য্য সম্ভ্রান্ত বংশীয়— এতদ্বংশীয়গণ দেশগুরু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ব্রজবিনোদ রায় তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, শ্যাম ভট্টাচার্য্য তাঁহার যে কোন একটী পুত্রকে নিজকন্যা সম্প্রদান করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। ব্রজবিনোদ বড়ই বিপদে পড়িয়া আপনার সাত পুত্রের প্রত্যেককে এবিষয়ে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পঞ্চম পুত্র রামকান্ত ব্যতিরেকে আর কেহই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করেন নাই। এই রামকান্তের ঔরসে এবং শ্যাম ভট্টাচার্য্যের কন্যা তারিণী দেবীর গর্ভে রামমোহন রায়ের জন্ম। সর্ব্বকার্য্যবিধাতা ভগবান যেন রামমোহনের জন্মের পূর্ব্বাবধিই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের উপকরণ সমূহের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছিলেন। রামমোহন রায় উপযুক্ত বয়সে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতৃকুল বৈষ্ণব এবং মাতামহকুল শাক্ত, তখন অপর সাধারণ পাঁচ জনের ন্যায় নিজের পৈতৃক ধর্ম্মের গুণগান করিয়া অপরাপর ধর্ম্মের নিন্দারত ছিলেন না, কারণ সেরূপ নিন্দা প্রধানত তাঁহারই মাতৃকুলে লাগিবার সম্ভাবনা ছিল। সকল সম্প্রদায়ের নিন্দা হইতে বিরতির হয়ত ইহাই মূল সূত্রপাত হইয়াছিল।

রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় পিতৃবাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার নিজের অথবা তাঁহার বংশের ধর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু রামমোহনের মাতামহকুলের ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা বিশেষ রূপে শোনা যায়। রামমোহনের মাতা অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন। তিনি স্বামীগৃহে আসিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা হন। শেষ বয়সে তিনি জগন্নাথ দর্শনের জন্য যাত্রা করেন। দেবদর্শনে যাইতে হইলে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাইতে হয়, এই বিশ্বাস বশতঃ সাংসারিক অবস্থা ভাল সত্ত্বেও, তিনি সঙ্গে একজন দাসী পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, পথে তাঁহার সুবিধা ও সুখের জন্য কোন প্রকার উপায় করিতেও দেন নাই; দুঃখিনীর ন্যায় পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছিলেন। পরলোকগমনের পূর্ব্বে একবৎসর কাল দাসীর ন্যায় জগন্নাথ দেবের মন্দির সম্মার্জ্জনীর দ্বারা প্রত্যহ পরিষ্কার করিতেন। কথিত আছে, মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায়কে তিনি বলিয়াছিলেন, "রামমোহন! তোমার মতই ঠিক। আমি অবলা স্ত্রীলোক এবং অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়াছি; সুতরাং যে সকল পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে আমি সুখ পাইয়া থাকি, তাহা আর পরিত্যাগ করিতে পারি না।" রামমোহন-জননী ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী হইলেও বিষয় কর্ম্মে অমনোযোগিনী ছিলেন না এবং যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহার প্রকৃতি কিছু উগ্র ছিল। রামমোহনের শৈশবকালে একদিন তাঁহার মাতামহ ইষ্টদেবতার পূজার পর শিশু রামমোহনকে পূজোপকরণ বিল্বদল প্রদান করেন। রামমোহন-জননী আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার পুত্র বিল্বপত্র চর্ব্বণ করিতেছেন। বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিতার ইহাতে বড়ই ক্রোধ হইল। তিনি সন্তানের মুখ হইতে বিল্বপত্র ফেলিয়া দিয়া মুখপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং বিল্বপত্র দিবার কারণে পিতাকে তিরস্কার করিলেন। রামমোহন কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে নিজ গ্রামে যখন প্রকাশ্যে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন, তখন তাঁহার জননী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীদ্বয় ও নবপুত্রবধূ সহিত গৃহ হইতে দূর করিয়া দিবার

সংকল্প করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় তাঁহার মাতার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার পরিবর্ত্তে নিকটবর্ত্তী এক শ্মশানভূমির উপর বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার জননী ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য সুপ্রীমকোর্টে এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন, বোধ হয় আশা ছিল যে, যদি তাহাতেও তাঁহার মতিগতি ফিরিয়া যায়। আদালতে প্রমাণ হইল না যে তিনি বিধর্ম্মী, সুতরাং তিনি পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইলেন না। কিন্তু তিনি জননীর হাত হইতে বিষয়ভার কাড়িয়া লইলেন না। তাঁহার জননীও গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দ এবং শালগ্রামসমূহ সম্মুখে রাখিয়া জমিদারী কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রামমোহনের জননীর এক বিশেষ তেজ ছিল, যাহা দ্বারা তিনি সন্তানগণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সক্ষমা হইতেন।

রামমোহন রায় স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত আত্মবিবরণে লিখিয়াছেন যে, পিতার আদেশে বিষয়কর্ম্মের উপযোগী আরব্য ও পারস্যভাষা শিখিয়াছিলেন এবং মাতামহকুলের অনুরোধে সংস্কৃত ও শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতেও বুঝা যায় যে, তাঁহার পিতৃকুল রীতিমত বিষয়কর্ম্ম ব্যাপৃত পরিবার এবং তাঁহার মাতামহকুল শাস্ত্রব্যবসায়ী নিষ্ঠাবান পরিবার ছিলেন।

উপরে যাহা কিছু বলিয়া আসিলাম, তাহা হইতে এইটুকু বুঝা যাইবে যে, উভয় কুলের মিশ্রণোদ্ভূত চরিত্র সত্ত্বগুণাবৃত রজঃপ্রধান হওয়াই উচিত। আর বাস্তবিকই রজোগুণই তাঁহার প্রকৃতির মূলসূত্র ছিল, তবে সত্ত্বগুণের আবরণ থাকাতে সেই রজোগুণ অনেকটা নির্ম্মল-প্রকাশ-ভাবাপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহাকে মন্দপথের পরিবর্ত্তে ভাল পথেই পরিচালিত করিয়াছিল।

উপসংহারে পিতৃপুরুষ সম্বন্ধে রাজার নিজের কথা উদ্ধৃত করিয়া শেষ করি। "আমার পূর্ব্বপুরুষেরা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা কৌলীন্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে আমার ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ (অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ) ১৪০ বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন। রাজসভাসদ্দিগের ভাগ্যে সচরাচর যেরূপ ঘটিয়া থাকে, তাঁহাদিগেরও সেইরূপ অবস্থায় পতনোত্থান হইয়া আসিয়াছে; কখনও সম্মানিত হইয়া উন্নতিলাভ, কখনও বা পতন; কখনও ধনী, কখনও নির্ধন; কখনও সফলতায় উৎফুল্ল, কখনও বা নিরাশায় কাতর। কিন্তু আমার মাতামহ-বংশীয়েরা কৌলিক ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মযাজকতাই জীবনের অবলম্বন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে মাতামহবংশ অপেক্ষা উচ্চতর আর কোন পরিচয় ছিল না। তাঁহারা বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মচিন্তায় অনুরত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার উত্তেজনা অপেক্ষা তাঁহারা মানসিক শক্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন।"[*]

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

[*] Last days in England of Raja Rammohan Roy.

ছুটা তত্ত্ব কথা। (২)

(যোগ বা আত্মজ্ঞান)

কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, এই ত্রিবিধ যোগের কথা আমাদের শাস্ত্রাদিতে উল্লিখিত, * অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ফলে একটীর দ্বারা সমুন্নত হইলে অপর দুইটী আপনি আসিয়া হস্তগত হয়। কর্ম্মে মানুষ যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই দেখিতে পায়, জ্ঞান ও ভক্তি তাহার হৃদয় অধিকার করিতেছে। ফলাফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে আপনাকে ভুলিয়া সংসারের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল জ্ঞান ও ভক্তি লাভ। আবার জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি অসম্ভব, কারণ ভগবান সম্বন্ধীয় একটা পরিস্ফুট জ্ঞান ভক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব; নচেৎ ভক্তি কাহাকে করা যায়? এবং কিসের জন্য? "জ্ঞানই ভক্তির সাধন।" † ভক্তি বৃদ্ধি সহকারে জ্ঞানও উজ্জ্বলতর না হইয়া থাকিতে পারে না। তখন ক্রমশঃ ভক্তের অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া যায়, এবং তিনি সেবারূপ অবশ্যকর্ত্তব্যের দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হয়েন। আর জ্ঞানী যখন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মহাসত্যের দ্বারা আলোকিত হইলেন, তখন "সমস্ত তাঁহাতে, এবং তিনি সকলেতে" দেখিয়া ভগবদ্ভক্তি ও সেবাপরায়ণতা দ্বারা অধিকৃত হইতে বাধ্য। বিষয়টী যেরূপ বিশাল, অল্প কথায় প্রকাশ করা সুকঠিন, অনেক বাক্যব্যয়ের আবশ্যক, এবং পৌরাণিক দৃষ্টান্ত সমূহ দ্বারা ব্যাখ্যাত হইলে ভাল হয়, কিন্তু এখানে তাহার স্থানাভাব। সুতরাং সংক্ষেপে সারিতে হইবে। মূল কথা, জ্ঞান, ভক্তি, ও কর্ম্ম পরস্পর এবম্প্রকারে জড়িত যে, একটীর বিকাশ হইলে তাহা অপর দুইটীকে টানিয়া আনিতে বাধ্য, তবে প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত ভক্তি, প্রকৃত কর্ম্ম চাই, নিজের নিজের মনের মত একটা গড়িয়া লইলে চলিবে না।

প্রকৃত জ্ঞান আত্মজ্ঞান, তথা পরমাত্মজ্ঞান। আত্মানুসন্ধান ব্যতীত সেই জ্ঞান লাভের অন্য উপায় নাই। "আত্মাকেই দেখিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, নিরবচ্ছিন্ন অনুধ্যান করিতে হইবে।" (১) এই শ্রুতিবাক্যানুসারে দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাকে অনুসন্ধান করিলে যে জ্ঞান বা পরাবিদ্যা উপর্জ্জিত হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য, কারণ তাহারই দ্বারা ব্রহ্মবস্তু অধিগত হয়েন। (২) ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইলে জড়চৈতন্যময় সমস্ত জগৎ আত্মাতে অবলোকিত হয়, এবং জীবাত্মা, পরমাত্মা ও পরিদৃশ্যমান বিশ্বে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। (৩) এই জ্ঞানেতে নিখিল কর্ম্মের পরি-

---

* যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্মচ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ।"

† নারদসূত্র ৪।৮৫

(১) বৃহদারণ্যক।৪।৪।৫

(২) মুণ্ডক।১।১।৫

(৩) গীতা।৪।৩৫

সমাধিস্থ হইয়া থাকে। (৪) ঈশ্বরের সহিত জীব তন্ময় হইয়া যায়।—প্রকৃত ভক্তি ভগবানের প্রতি একান্ত প্রেম, (৫) ঈশ্বরে পরানুরক্তি। (৬) "যে ব্যক্তি এই ভক্তিধন লাভ করিয়াছে, তাহার কোন বিষয়েই বাসনা, শোক, দ্বেষ, রতি উৎসাহ থাকে না।" (৭) এরূপ অবস্থায় নিষ্কামকর্ম্মী ও ভক্তে প্রভেদ কি? যিনি সমুদায় কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ পূর্ব্বক তৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগে তাঁহার ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল ভক্তকে তিনি অচিরে মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। (৮) আবার শাস্ত্রকারেরা অনেক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন, বলবতী ভক্তিই পরম জ্ঞানের হেতু। বাস্তবিকই, জীব যে জ্ঞান দ্বারা ভগবানকে জানিতে পারে, ভক্তি সেই জ্ঞানের কারণ। (৯) ভক্তিপূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তা অর্থে অনুরাগবশতঃ সর্ব্বদা তাঁহার স্বরূপের স্মৃতি। (১০) মানুষ আপনাতে যেমন অনুরক্ত, তেমন আর কাহাতেও নহে, কৃপণের ধনচিন্তার মত ভগবানের গুণাবলীর আলোচনা সহকারে তাঁহার প্রতি একরূপ অনুরাগ জন্মিলে ভক্তিতে সেইগুলি আসিয়া বর্ত্তিবেই, ভাবনানুরূপ সিদ্ধি অনিবার্য্য, সুতরাং তখন উভয়ে এক হইয়া যাইবেনই। কৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধিকা বা শ্রীচৈতন্যের যে শ্রেণীর অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই শ্রেণীর অনুরাগ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অনুরাগকে ভক্তি বলা যায় না, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।—প্রকৃত কর্ম্ম কি, তাহা ভগবান গীতাতে সম্যকরূপে উপদেশ দিয়াছেন; আর কাহারও কিছু বলিবার ফাঁক রাখেন নাই।(১১) ঐহিক পারলৌকিক সকল প্রকার ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র প্রভুর ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আদেশ অনুযায়ী তাঁহার আরাধনার উদ্দেশে যাবতীয় কর্ম্ম কর্ত্তব্য, (১) অশন, যজন, দান, তপস্যা সমস্তই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। তাহা হইলে শুভাশুভ সর্ব্ববিধ কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভানন্তর সন্ন্যাসযোগযুক্ত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিবে। (২) অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ঈশ্বরকে লাভ করিয়া থাকে। (৩) ফলাভিসন্ধি বর্জ্জন ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিতে পারিলে তাঁহার আর বাকী রহিল কি? তিনি ত সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইলেন। এবম্প্রকার মহাকর্ম্মী যে পরাভক্তি ও পরমজ্ঞান লাভ দ্বারা কৃতার্থ হইয়া পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ কোথায়?

আমাদের কল্যাণার্থ যোগ সম্বন্ধে শাস্ত্র

(৪) গীতা।৪।৩৩
(৫) নারদসূত্র।১।২
(৬) শাণ্ডিল্যসূত্র।১।১।২
(৭) নারদসূত্র।১।৫—গীতা।১২।১৭
(৮) গীতা।১২।৬,৭
(৯) শাণ্ডিল্য সূত্র, ১।১ ৯
(১০) শাণ্ডিল্য, ১।২।৫
(১১) কর্ম্মযোগিনী মহামতি বেশান্ত একস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন:—

Perfect renunciation: No longer moved by personal desire to enjoy the fruit here; no longer by the personal desire to enjoy the fruit on the other side of death, no longer by the higher personal desire to reap the love and gratitude of his fellow-men, but the renunciation of all desires, the doing of action with no regard to the fruit. Let success come; what is it the doer? Let failure come, what matters it to him who has done his work?"—Annie Besant (The Three Paths)

(১) গীতা।৯।২৭
(২) গীতা।৯।২৭,২৮
(৩) গীতা।৩।১৯

যাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা মহাত্মা কেশবচন্দ্রের পুস্তিকায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। যে ভাবে তাঁহার দ্বারা তিন প্রকার যোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাতে যেন যোগ অর্থে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পূজা-ধ্যান-বন্দনা ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। তাঁহার মতে তিন যুগে ত্রিবিধ যোগ বিকাশ পাইয়াছিল;— বৈদিক কালে মানব সমাজের শৈশবাবস্থায় জড়প্রকৃতির শক্তি সমূহে ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া তাঁহার সহিত "প্রাকৃতিক" যোগ; মধ্য বা বৈদান্তিক সময়ে মানবাত্মাতে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতঃ তাঁহার সহিত "মানসিক" যোগ; আর্য্যসভ্যতার শেষাবস্থায় পৌরাণিক যুগে বিধাতার লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সহিত "ভক্তিযোগ।" (৪) গুরু কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য বহুশাস্ত্রবেত্তা মহামহোপাধ্যায় * গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় তৎপ্রণীত "শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রকাশ করিয়াছেন :— "সাধারণতঃ এ দেশের ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বৈদিক, বৈদান্তিক, ও পৌরাণিক, এই তিন ভাগে উহাঁকে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। এরূপ বিভাগ দেখিয়া সহজে মনে হয়, বৈদিক সময় নিঃশেষ হইয়া বৈদান্তিক সময়, বৈদান্তিক সময় নিঃশেষ হইয়া পৌরাণিক সময় উপস্থিত হইয়াছিল। এ তিন সময় যে যুগপৎ পার্শ্বাপার্শ্বিভাবে বিকাশ লাভ করিয়া চলিতেছিল, যাঁহারা বেদ বেদান্ত পুরাণ শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারেন।" এস্থলে গুরুশিষ্যের মতভেদ দেখিয়া আমাদিগকে গবেষক শিষ্যের সঙ্গেই চলিতে হয়, যে হেতুক কেশবচন্দ্র মহা মনীষী ভগবদ্ভক্ত হইলেও আর্য্য শাস্ত্রাদিতে তাঁহার সেরূপ দখল ছিল না, বাইবেল ও পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বে তাঁহার পারদর্শিতা প্রসিদ্ধ। (১) একারণ তাঁহার ইংরাজী যোগের পুস্তকে তিনি মুসা ও যিশুর ঈশ্বর দর্শনকে যোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈদিক যোগের বর্ণনাতে তখনকার লোকের পূজাবন্দনাদি (যাহাকে তিনি যোগ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন) উল্লেখকালে যেন মক্ষমুলরাদি (২) প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের সহিত সুর মিলাইয়া বলিতেছেন যে, বৈদিক-মন্ত্রাদি-প্রণেতা ঋষিগণ মানবসমাজের আদিমাবস্থার জীব ছিলেন; তাঁহাদের প্রচারিত বাক্যসমূহ "অর্দ্ধসভ্য কৃষকের

(৪) "We see in the earliest or Vedic period, communion with God in Nature, this is objective yoga. Then we have in the Vedantic period communion with God in the soul, this is subjective yoga. Third ly, in the Puranic period we have communion with [illegible] in History or with God of Provi[illegible] this is Bhakti or Bhakti yoga."

* বর্ত্তমান-গবর্ণমেণ্টের উপাধিধারী-খেতাব-ভূষিত নন, পরন্তু বাস্তবিক মহাপণ্ডিত।

(১) এইজন্য কেশব খ্রীষ্টানের "গড্ (God) ও "সোল" (soul) লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়া গিয়াছেন, বড়-জোর মানুষের "সোলের" অতিরিক্ত স্পিরিটের (spirit) কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, পরন্তু "গড" কি পদার্থ, "সোল্" কি জিনিস, "স্পিরিট" শব্দে কি বুঝায়, ইত্যাদির ব্যাখ্যা কোথাও করেন নাই। তিনি কেন? ব্রাহ্মসমাজের কেহ কখন কোথাও এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না। কেবল প্রকারান্তর ভাবে গীতাদির টীকাটিপ্পনিতে শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের ঐ দিকে যে কিছু চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর মতবিশ্বাস সংস্থাপন করিবার প্রয়াস প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ যে ভাবে করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিতে ব্রাহ্মসমাজ কি অপারক?

(২) "Babblings of an infant race." Max Muller.

উদ্ভাসনীতি মাত্র।" (২) তাঁহাদের চিন্তা ও ভাবগুলিকে কেবল "অমার্জিত" (৩) বলিতেও দ্বিধা করেন নাই। বৈদিক ঋষাদি যে আপ্তবাক্য—অমিততেজা, পরাবিদ্যাবিশারদ, ত্রিকালজ্ঞ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের দ্বারা উচ্চারিত—তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। আপ্তবাক্য সম্বন্ধে কোন মনীষী (৪) এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেনঃ—

"ঋষিদিগের অনুমোদিত সত্যনির্ণয়ের প্রণালী, দর্শনের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে প্রণালীর ক্রম—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। চরম সত্য সকল (যাহাদিগকে হার্বার্ট স্পেন্সার অজ্ঞেয়ের কোটাতে ফেলিয়াছেন) কখন প্রত্যক্ষ অথবা অনুমানের বিষয় হইতে পারে না। আমাদের এরূপ কোন ইন্দ্রিয় নাই, যাহার দ্বারা আমরা চরম সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। অনুমান প্রত্যক্ষমূলক। আমাদের সাধ্য কি যে আমরা তর্ক ও যুক্তি দ্বারা চরম সত্যের অবধারণ করিব? অতএব, চরমসত্যনির্ণয়ের একমাত্র উপায় আপ্তবাক্য। আপ্ত অর্থে ভ্রমপ্রমাদশূন্য পুরুষ,—যিনি তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা চরমসত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশই আপ্তবাক্য। ঋষিরা আপ্ত, সেইজন্য তাঁহাদের প্রণীত শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র চরম সত্য নির্ণয়ের একমাত্র প্রমাণ। সেই শাস্ত্রবাক্য 'শ্রবণ' করিতে হইবে, এবং সেই সকল বাক্যের পরস্পর সমন্বয় করিয়া 'মনন' করিতে হইবে, পরে তৎসম্বন্ধে একান্ত একাগ্রচিত্তে ধ্যান '(নিদিধ্যাসন)' করিতে হইবে। তবেই সত্য নির্ণয় হইবে। ইহাই ঋষিদিগের অনুমোদিত সত্য নির্ণয়ের প্রণালী।

'শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥'

'শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করিবে। যুক্তির দ্বারা মনন করিবে। পরে সতত ধ্যান করিবে। এইরূপে সত্যের দর্শনলাভ হয়।'

এস্থলে যুক্তি অর্থে কেবল তর্ক নহে। ভগবান মনু বলিয়াছেনঃ—

'আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥'

'যিনি শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা শাস্ত্রোপদেশ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তিনিই সত্যনির্ণয় করিতে পারেন; অপরে পারে না।'

প্রকৃত কথা এই যে, যেমন আমাদের শৈশবাবস্থায় আমরা অজ্ঞান অসহায় অবস্থায় থাকিয়া বহু-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন গুরুজনের আশ্রয়ে ও তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হইয়াছি, ঠিক তদ্রূপ জগতের শৈশবাবস্থাতে সাধারণ মানবসমূহ জ্ঞান সম্বন্ধে পশ্চাৎপদ থাকা হেতু তাহাদের অভিভাবকরূপে যে সকল পূর্ব্বপূর্ব্ব কল্পের কৃতভূরিভোগ, সর্ব্বফলনিধান, সত্যোপপন্ন, সিদ্ধ মহাপুরুষগণ সংসারের হিতসাধনার্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বৈদিক ঋষিগণ সেই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন পুণ্যাত্মাদিগের মধ্যে। ঐ সকল

---

(২) রমেশচন্দ্রের উক্তি।

(৩) "Crude thoughts.," "crude ideas." acting under the influence of emotions and impulses.,"The Rishis simple and child like." "The Rishi's eyes untutored" এইরূপ সমস্ত উক্তির পর আবার এ কথাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, "The Rishis had the gift of interpenetration."

(৪) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ বি,এল (গীতায় ঈশ্বরবাদ)

দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট; অতুলবিভূতিশালী, নিত্যানন্দ পুরুষেরা মানবসমাজকে যৌবনে উপনীত এবং স্বাবলম্বনে সক্ষম দেখিয়া এবারকার মত পৃথিবী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। পিপীলিকা যেমন হস্তির মর্য্যাদা বুঝিতে অক্ষম, আমরাও তেমনি উক্ত নরসিংহদিগের বিশালতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

"সর্ব্বকারণকারণং," যাঁহাকে আমরা পরব্রহ্ম বলিয়া থাকি, তাঁহার অব্যক্ত সত্তার সম্বন্ধে কিছু বুঝিবার জানিবার যোটেই যো নাই (১) সত্য, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তাবস্থার ভাব উপলব্ধি করিতে আমরা ততটা অক্ষম নহি। যিনি নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প পরব্রহ্ম, তাঁহাকে জড় বা জড়ের মত কোন পদার্থ বলা যেমন অসঙ্গত, চৈতন্য বা সম্বিতের (২) ন্যায় কিছু বলাও তেমনি যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ আমরা ঐ শব্দদ্বয়ে যাহা বুঝি, তাহা অদেহীতে সম্ভবে, ইহা কি ধারণাযোগ্য? অবশ্য আমাদের দেহাপেক্ষা সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতর নানা শ্রেণীর দেহধারী উচ্চাৎউচ্চতর দেবতাদিতে (৩) উহার স্থিতি, ও প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়; পরন্তু একেবারে সীমা রহিত নিরুপাধিক অবস্থায় (৪) উহা কি ভাবে তিষ্ঠিতে পারে, তাহা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর। যাহা বোধ শক্তির অতীত ব্যাপার, তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলাই অনুচিত। সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট সত্তা আমাদিগের অপেক্ষা লক্ষগুণে সমুন্নত হইলেও অব্যক্তের প্রসঙ্গে তাঁহাকেও নির্ব্বাক থাকিতে হইবে; এই নিমিত্ত প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা অনাদি আদিকারণকে কেবল মাত্র "তৎসৎ" বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। সেই কারণে বর্ত্তমান কল্পের একমাত্র বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত মহাত্যাগী শাক্যমুনি বিশ্বের মূলহীন মূল (৫) সম্বন্ধে বারম্বার জিজ্ঞাসিত হইয়াও সর্ব্বদা নিরুত্তর ছিলেন; তাই না বুঝিয়া সাধারণ লোকে তাঁহাকে নাস্তিক উপাধি দিয়াছে। চরাচরের যাবতীয় পদার্থ জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান, এই তিনের একটার মধ্যে আসিবেই, কিন্তু তাঁহাকে ইহার কোনটার ভিতর ফেলা যাইতে পারে না; অথচ এই তিনের মূল কারণ তিনিই। তাঁহা হইতে যে মহাশক্তি কেন্দ্র অভিব্যক্ত, তাঁহাকে প্রাচীন পাশ্চাত্য ধর্ম্ম-বিজ্ঞানবিদ্গণ (১) "লগস (২) বলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে "ঈশ্বর" "প্রত্যগাত্মা" "শব্দ-ব্রহ্ম" আখ্যা দিয়া থাকি। ইঁহাকেই খ্রীষ্টানগণ (৩) "ভর্ব্বম্" বা "ওয়ার্ড" (৪) বলেন, ইনিই তাঁহাদের "খ্রীষ্টস্"; (৫) বৌদ্ধেরা "অমিতাভ" "অবলোকিতেশ্বর" নাম দিয়াছেন; য়িহুদী জাতি "জহোবা" (৬) নামে

---

(১) 'No words can describe it, for words imply discrimination, and this is All. We murmur, Absolute, Infinite, Unconditioned—but the words mean naught. Sat, the wise speak of: Bee-Ness, not even Being nor Existence. Only as the Manifested becomes can language be used with meaning; but the appearance of the Manifested implies the Unmanifested, for the Manifested is transitory and mutable and there must be something that eternally endures. This Eternal must be postulated, else whence the existences around us? It must contain within Itself That which is the essence of the germ of all possibilities, all potencies: Space is the only conception that can even faintly mirror it without preposterous distortion, but silence least offends in these high regions, where the wings of thought beat faintly and lips can only falter not pronounce. Annie Besant.

(২) Consciousness.

(৩) Higher Spiritual Intelligences.

(৪) distinct individualized existence.

(৫) Rootless root.

(১) Theologians.

(২) Logos

(৩) Gnostics

(৪) Verbum-word

(৫) Christos.

(৬) Jehovah.

[illegible] মুসলমান ধর্ম্মে "আল্লা" "খোদা" বলিয়া সম্বোধিত ; প্রাচীন চীনগণ দ্বারা "তাও" নাম প্রদত্ত ; এবং জোরাষ্ট্রীয় গাথায় "আহুরা-মাজদা" বলা হইয়াছে। সুষুপ্তির অবস্থায় আমাদের ব্যক্তিত্ব (৭) যে ভাবে থাকে, ইনিও প্রলয়কালে সেই ভাবে সচ্চিদানন্দরূপে পরব্রহ্মে অবস্থিতি করেন। নূতন কল্পারম্ভে ইনিই প্রথম জ্ঞাতা। এস্থলে একথাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, পরব্রহ্মে এই শ্রেণীর মহাশক্তিকেন্দ্র অসংখ্য রহিয়াছেন।

প্রথম পরব্রহ্ম, দ্বিতীয় ঈশ্বর বা প্রত্যগাত্মা, তৃতীয় ঈশ্বরের ভিতর দিয়া পরব্রহ্মের যে জ্যোতি অভিব্যক্ত হয়, গীতায় যাহাকে দৈবীপ্রকৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে, চতুর্থ মূলপ্রকৃতি, যাহাকে স্থূলভাবে পরব্রহ্মের আবরণ বলিলে কোন প্রকারে চলে। ইহাদের মধ্যে দৈবীপ্রকৃতিকে জ্যোতি, সম্বিৎ অথবা পরাক্রম (৮) যে ভাবে দেখা যায়, মূলে সেই একই শক্তি। (৯) মূল প্রকৃতির উপর এই শক্তির ক্রিয়া দ্বারা প্রলয়ান্তে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নূতন বিশ্বের বিকাশ হইয়া থাকে। বিশ্বরূপ-বিরাট পুরুষের স্থূলশরীর যেন মূলপ্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা, দৈবীপ্রকৃতি তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর এবং স্বয়ং ঈশ্বরের যেন তাঁহার কারণ বা সমন্বয় শরীর, মানবাত্মা যেমন আমাদের কারণ-দেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিশ্বরূপ বিরাটপুরুষের ঈশ্বররূপ সমন্বয় শরীরে পরব্রহ্ম সেই ভাবে বিরাজিত।

বিষ্ণুপুরাণে এবং সাংখ্যমতেও "তৎসৎ" হইতে পুরুষ (১), প্রধান (২) ও মহত্তের (৩) উৎপত্তি উল্লিখিত [illegible] হইতে আমাদের মনঃ (৪) উদ্ভূত ; এ [illegible] যথোপযুক্ত সময়ে মানবের দেহযন্ত্রের [illegible] বাসোপযোগী হইলে "মানসপুত্রগণ" কর্ত্তৃক উনি নরশরীরে প্রবিষ্ট হন ; ইঁহার আর এক নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। এই মহাশক্তিশালী সত্তা সমূহ (৫) নানাস্থানে নানাপ্রকার আখ্যা প্রাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায় :—যথা, "ব্রহ্মার মানসপুত্র" "তেজোশিখাধিপতি"(৬) "জ্যোতিস্তম্ভ" (৭) "জ্যোতিপ্রভু" (৮) "জ্ঞানাধিপ।" (৯)। ইঁহারা কোন কালে আমাদেরই মত জীব ছিলেন। পরে যোগতপোবলে সিদ্ধিলাভ করতঃ অত্যুচ্চ পদবীতে সমারূঢ়। মনপ্রবেশের পূর্ব্বে কেবল মাত্র আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার পরে ইঁহার বাসোপযোগী কারণ শরীরের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। এইখান হইতে ভগবানের সঙ্গে মানুষের একটা বিশেষ নূতন রকমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। মন সেই সম্বন্ধ-বন্ধনের শৃঙ্খল স্বরূপ। এই মন কর্ত্তৃক আমরা আত্মচৈতন্য (১) পাইয়াছি, সুতরাং ইনি আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। মানবদেহে অধিষ্ঠিত হইবার পর কার্য্যসৌকর্য্যার্থে ইনি আপনার সত্তা হইতে কর (২) প্রসারণ করতঃ তাহাকে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন। ইহা তৎপূর্ব্বে বিকাশপ্রাপ্ত কামশক্তির (৩) সহিত

(৭) Ego
(৮) Light Consciousness or force
(৯) Energy
(১) Essence of spirit
(২) Essence of matter,

(৩) Universal Mind
(৪) The thinker-human soul—Image of the Universal Mind,
(৫) Spiritual Intelligences of a higher order,
(৬) Lords of the Flame,
(৭) Pillars of Light
(৮) Lords of Light
(৯) Lords of Wisdom
(১) Self-consciousness—"I am I"
(২) Ray
(৩) Kamic principle in man

মিলিত ভাবে কামনাসকুল, অশুদ্ধ বা ক্ষুদ্র মন (৪) নামে অভিহিত হইয়া জড়জগতের সহিত ব্যবহার দ্বারা অভিজ্ঞতা সংগ্রহে নিয়োজিত হইল। এই কামপ্রধান মনের দ্বারাই আমরা সাংসারিক বিদ্যা বুদ্ধি (৫) সহকারে যাবতীয় পার্থিব ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকি। উচ্চ বা বিশুদ্ধ মন (৬) আত্মার প্রতিনিধি স্বরূপ, সুতরাং ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বলিলে বলা যায়। অশুদ্ধ মনঃ নশ্বর, শুদ্ধ মন অবিনাশী, ইনিই কারণ শরীরে অভিষিক্ত থাকিয়া বারম্বার সংসারে যাতায়াত করিতেছেন। ইঁহার দ্বারাই আমরা ব্যক্তিত্ব (৭) লাভে সক্ষম হইয়াছি, যাহাতে জন্মজন্মান্তরের অসংখ্য অভিজ্ঞতা সংস্কাররূপে সংযুক্ত হইতেছে।

যেখানে সংযোগ, সেই খানেই বিয়োগ, সংমিশ্রিত পদার্থ (১) অবিনাশী হইতেই পারে না; বিশেষ আমাদের ব্যক্তিত্বের যখন একদিন আরম্ভ হইয়াছে, তখন আর এক দিন উহার শেষ অনিবার্য্য, যাহা সাদি, তাহা সান্ত না হইয়া যায় না; পরন্তু যদি উচ্চ মনের শাসনাধীনে উক্ত ব্যক্তিত্ব সেই একের সহিত মিলিত হইতে সক্ষম হয়, তবেই উহা অমরত্ব লাভ করতঃ চরিতার্থ হইতে পারে, নচেৎ নয়। (২) এই মিলন বা যোগের উপায় আত্মবিজ্ঞান (৩) দ্বারা প্রদর্শিত। এখন গীতার উপদেশানুসারে যদি আমরা আপনাদিগকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া ফেলিবার জন্য মোটামুটি চেষ্টা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতে শিখি, গুরু অবশ্য মিলিবে, যিনি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা আমাদের তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত করিয়া সরল পথ দেখাইয়া দিবেন।

বিষয়টী যেরূপ গুরুতর, আমাদের মত লোকের হাতে তাহা পরিস্ফুট হওয়া কখনই সম্ভব নহে। মোটা কথা ভিন্ন আমরা কি বলিতে পারি? এমন কি, যে ভাষাতে এবম্বিধ প্রসঙ্গ ব্যাখ্যাত হইলে শোভা পায়, সে ভাষাই আমরা জানি না। যাহা হউক, আর এক দিক দিয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

(৪) "Lower mind—the coarser energies of the higher expressed in denser matter by which the Thinker gathers experiences." A. Besant

"মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধমেব চ।
অশুদ্ধং কামসংকল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতম্।
—ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ ১।১

(৫) Brain or physical intellect
(৬) Higher Manas
(৭) Individuality
(১) Compound

(২) দাক্ষিণাত্যের দর্শনশাস্ত্রবিশারদ মহাযোগী সুব্বারাও বলিয়া গিয়াছেন:—

'Depend upon it that unless a man's individuality or ego can be transferred to the *Logos* immortalety is only a name"

(৩) Science of the Soul

স্বদেশ-প্রেম।

৩য় দৃশ্য।

স্থান—দেবভবন।

কাল—অপরাহ্ন।

বিজয়, রমানাথ ও হরগোবিন্দ আসীন।

বিজয়। বাবার মত হইয়াছে, ধীরেনের সঙ্গে মনোরমার বিয়ে দেবেন।

রমানাথ। খুব ভাল। ধীরেন কোথায়?

বিজয়। সে তার কন্যা-শোকোন্মত্ত পিতার অন্বেষণে গিয়াছে। হরগোবিন্দ তাদের খোঁজে গিয়েছে।

রমানাথ। আমিও যাই না কেন। শুভ কাজ যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।

বিজয়। না রমানাথ। "বিবাহে ব্যবসা" নিবারণ করার জন্য আমাদের এখন বিশেষ যত্নের ও উদ্যমের সঙ্গে প্রচার কার্য্য করা আবশ্যক। আমরা যে কাজ নিয়েছি, তা অতি কঠিন।

রমানাথ। হাঁ আমি দেখ্ছি। হিন্দু সমাজ এখন দুই দলে বিভক্ত। যাদের মেয়ে নাই, ছেলে আছে, তারা প্রায়ই লোভে অন্ধ। তারা বিবাহ-ব্যবসাতে লজ্জিত নয়। যারা কন্যাদায়ে পীড়িত, তারাই আমাদের দিকে। যাদের কেবল ছেলে আছে, অথচ বিবাহে পণ লওয়ার পক্ষপাতী, এমন লোক খুব কম।

বিজয়। সেইটাত মুস্কিল। ধর্ম্মজ্ঞান বা আত্মমর্য্যাদা বলে যে জিনিষ আছে, তা যেন সমাজ থেকে একবারে উঠে গেল?

রমানাথ। তা বই কি। সমাজে এখন কেবল লুট। যে যেমনি পাচ্ছে, সে তেমনি টাকা লুট্‌ছে। "তুমি পার আমার টাকা লোটো, আমি পারি তোমার টাকা লুটি"—এই হয়েছে সমাজের মূলমন্ত্র।

বিজয়। এই লোটালুটি ব্যাপার থেকে সমাজকে ফিরিয়ে আনতে হবে। লোভের উন্মত্ত বাজার হতে সমাজকে বিবেক ও ধর্ম্মের শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। রমানাথ, তুমি কবে প্রচার কার্য্যে বেরোবে?

রমানাথ। কা'ল।

বিজয়। বেশ কথা। এই প্রচার কার্য্যে দৃষ্টান্তই প্রধান উপদেষ্টা, তা তুমি জান। যেখানে যতগুলি দরিদ্র পরিবারে অর্থের অভাবে কন্যার বিবাহ হচ্ছে না, তার তালিকা ত তোমার কাছে আছে। সর্ব্বাগ্রে মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের বাটীতে যাওয়া আবশ্যক নয় কি?

রমানাথ। আমি ত তাই করি। নবদ্বীপে একটা বক্তৃতা কোরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী যাব।

৪র্থ দৃশ্য।

স্থান—প্রমাদপুর। ব্রাহ্মণবাটী। কাল, বেলা ৪টা।

রমানাথ ও মধুসূদন আসীন।

রমানাথ। আপনার একটী অবিবাহিতা কন্যা আছে?

মধুসূদন। (কুপিত ভাবে) আছে। তা হবে কি? টাকা নেই, এক্ষণও বিয়ে দিতে পারি নি, এতে আমার অপরাধ কি?

রমানাথ। বয়স কত?

মধুসূদন। বয়স হয়েছে, তা কর্ব্বো কি? বলি আমার যে টাকা নেই। টাকা না দিতে পার্লে যে আজ কাল মেয়ের বিয়ে হয় না, তা কি জাননা?

রমানাথ। বলি, মেয়েটী আমি কি একবার দেখতে পাইনে?

মধুসূদন। দেখে হবে কি?—মজা দেখতে এসেছ? মেয়ে আমার সুন্দরী, খুব সুন্দরী, হ'লে হবে কি? টাকা নাই।

রমানাথ। কেহ যদি টাকা না নিয়ে বিয়ে করে,—তা হ'লে আপত্তি কি?

মধুসূদন। তোমার রঙ্গ রহস্য রাখ

বাবু দেখে গিয়েছে, অনেক হমড়ো চুমড়ো বুড়ো দেখে গিয়েছে, দেখা হলো, মেয়ে পছন্দ হলো, আর সব ভাল,শেষে ওই টাকার কথা। আমি ত পূর্ব্বেই বলি, আমি নিঃস্ব বামন। তবে বেটারা মেয়ে দেখে, শেষে টাকার কথা বলিস্ কেন ?—তুই এক জনের সঙ্গে গালি গালাজ, লাঠালাঠি হব হব হোয়ে থেমে গিয়েছে।

রমানাথ। আমি পূর্ব্বেই বল্‌ছি, মেয়ে পছন্দ হ'লে বিয়েতে আপনার এক পয়সাও লাগবে না।

মধুসূদন। ওরে আমার সোণার চাঁদ! ঠিক কথা বল্‌ছো? কিন্তু এবার যদি টাকার কথা উঠে, তা হ'লে আমি মার্ব্বো, সাফ্ বলছি, মার্ব্বো।

রমানাথ। যে আজ্ঞা।

মধুসূদন। মেয়েটীর আবার মা নেই। কি কষ্টেই পড়েছি।

বিয়ে হয়নি বোলে পাড়ার লোকের গঞ্জনায় মা আমার, দুই বৎসর মুখ তুলে তাকান না—আমি মেয়ে নিয়ে আসছি।

(মধুসূদনের প্রস্থান এবং সরস্বতী সহ পুনঃপ্রবেশ)

মা—বসো। দেখ্‌ছো বাপু! আমার মেয়ে সুন্দরী নয় কি? ভাল কাপড় পরেনি, গায় গয়না নাই, তবু কি একটী পরির মত দেখাচ্ছে না? বলি, সত্য কথা বলো।

রমানাথ। হাঁ, পরির মতই বটে, যেন বিরলে পদ্মফুল ফুটে, আপনার এই কুটীর আলো করে রেখেছে। (কন্যার প্রতি) তোমার নাম কি?

মধুসূদন। বলো, তাতে দোষ নাই।

সরস্বতী। শ্রীমতী সরস্বতী দেবী।

রমানাথ। কি পড়েছো?

সরস্বতী। বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, কাদম্বরী, সীতার বনবাস।

রমানাথ। আপনার কন্যা এখন যেতে পারে।

(কন্যার প্রস্থান)

মধুসূদন। (উদ্বিগ্ন ভাবে) এখন বল কি? [illegible] কিছু টাকা [illegible] কি?

রমানাথ। [illegible]

মধুসূদন। অ্যাঁ:—বল কি! বিয়েতে টাকা লাগবে না?—অ্যাঁ! অ্যাঁ! বিয়েতে টাকা লাগবে না? (রমানাথকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে) একি স্বপ্ন না বাস্তবিক—তুমি আমোদ কচ্ছ না ত?

রমানাথ। না মহাশয়।

মধুসূদন। কার সঙ্গে বিয়ে?

রমানাথ। পাত্র জমীদারের ছেলে, এম-এ পাশ করেছে, দেখতে ও বয়স ঠিক আমার মত। বাসস্থান পাবনা জেলার প্রতাপপুর গ্রামে, কাশ্যপ গোত্র। কুলীন। এই প্রথম বিবাহ।

মধুসূদন। বলেন কি! মহাশয়,সত্য?

রমানাথ। নিতান্ত সত্য।

মধুসূদন। কবে বিয়ে হতে পারে?

রমানাথ। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এই মাসেই। আর পাত্রের বিষয় আর যদি কিছু জানতে চান—কলিকাতায় বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট জমিদার রামধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা তাহার পুত্র বিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট জানতে পারেন।

মধুসূদন। (উর্দ্ধে তাকাইয়া) ভগবান্, তুমি বুঝি এতদিন পরে আমার জাত ধর্ম্ম রক্ষা কর্লে!

৫ম দৃশ্য।

স্থান,—মেসের বাসা। কাল অপরাহ্ন।

ভূপেন্দ্র, গণেশ, হরি ইত্যাদি আসীন।

ভূপেন্দ্র। আমি পড়ি শুন। ভারি মজার বিজ্ঞাপন।

"Matrimonial Market" বিবাহের বাজার।

"১। পাত্র এক দরে বিক্রয়।

আজি কালি বিবাহে পাত্র বেচা কেনায় দর দস্তর করিতে লোকের অনেক সময় নষ্ট হয়, আর অনেক হয়রাণি হয়। এজন্য আমরা সাধারণের সুবিধার জন্য পাত্র বিক্রয়ের একটী দোকান খুলিয়াছি। আমাদের সমুদয় মাল এক দরে বিক্রয় হইবে। পাত্রের বোঝ্ নাম ধাম, পিতার নাম, কটা পাশ, আর কত বয়স কত ইত্যাদি বিষয়, তাহার "প্রো-প্রাইটর" নিকট নীচে [illegible]

আছে। দোকানে ঐ সব ফটো সাজান আছে।"

গণেশ। বা! বা!

ভূপেন্দ্র। শোন না। "আর দশ হাজার ক্যাটালগ ছাপান হইয়াছে, তাহাতে পাত্র সকলের ফটোগ্রাফের তলে গোত্র, আর কটা 'পাশ' ইত্যাদি বিবরণ, এবং দর লেখা আছে। পাত্র পছন্দ হইলে যে ষ্ট্যাম্প-মারা চুক্তি-পত্র লিখিতে হইবে, তাহার ফারম ক্যাটালগে ছাপান আছে। চুক্তি অনুসারে টাকা পেমেণ্ট হইলে মাল অর্থাৎ পাত্র বিবাহ রাত্রিতে কন্যার বাটীতে 'ডিলিভারি' দেওয়া হইবে। প্রতি রবিবারে বেলা দুইটা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত পণ্য পাত্রগুলি সশরীরে আমাদের দোকানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের "ক্যাটালগের" মূল্য প্রতি কাপি ২৲ মাত্র।"

হরি। Capital.

ভূপেন্দ্র। বিজয় বাবু আগেই বলেছিলেন যে, এইরূপ বেচা কেনা ক্রমশঃ হবে।

গণেশ। এত শীঘ্র হবে, অন্ততঃ তা আমরা ভাবিনি।

ভূপেন্দ্র। দেখ্‌ছো না, আজ্ কা'ল আমাদের দেশে ভাল মন্দ যা হচ্ছে, সব বিদ্যুতের বেগে হচ্ছে। দেখ্‌তে ভাব্‌তে সময় দিচ্ছে না।

হরি। তোমার হাতে ওটা কি?

ভূপেন্দ্র। ওটাও বিজ্ঞাপন। ধর্ম্মতলায় একটা ছোড়া ট্রামকারে ফেলে দিল। ওটা আরও মজার।

হরি। পড় না।

হরগোবিন্দ। পড়ি শোন, বিজ্ঞাপন নং ২।

বিজ্ঞাপন।

"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, Hart Brothers ঘোড়া বিক্রয় নীলামের দিনে এদেশীয় পাত্র নীলাম করার একটা কারবার খুলিবার মনস্থ করিয়াছেন। আমাদের দেশের পাত্রগুলি বিদেশী ব্যবসাদারের হাতে যাওয়া, বিশেষতঃ ঘোড়া এবং পাত্র এক স্থানে এক দিনে নীলাম হওয়া, আমাদের দেশের পক্ষে লজ্জার বিষয়। এইজন্য আমরা Hart Brothers দোকানের একটু দূরে পাত্র-নীলামের একটা কারবার খুলিয়াছি। প্রতি শুক্রবারে বেলা ১১ টায় পাত্র নীলাম আরম্ভ হয়। অন্যান্য বিষয় আমাদের আফিসে জ্ঞাতব্য।

পাত্র নীলাম কোং লিমিটেড,

ধর্ম্মতলা, কলিকাতা।"

রমানাথের প্রবেশ।

ভূপেন্দ্র। রমানাথ, তোমার বিয়েতে মোটে জাঁক জমক কর্লে না? এ কি রকম বিয়ে?

রমানাথ। এ খুব ভাল রকম বিয়ে। বিয়েতে জাঁক জমকে যে টাকাটা খরচ হ'ত, তার অর্দ্ধেক "বিশুদ্ধ বিবাহ-প্রচলন সভায়" ফণ্ডে (fund) দেওয়া, আর অর্দ্ধেক দরিদ্র-শিক্ষা সভার ফণ্ডে দেওয়াতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?

ভূপেন্দ্র। নিশ্চয়ই না।

রমানাথ। বিজয়ের সংবাদ পেয়েছ কি?

ভূপেন্দ্র। না।

রমানাথ। কেমন যেন একট tragedyর দিকে ঘটনাটা যাচ্ছে। ঘটনাটা টাকা নিয়ে তাপসীর বিয়ে। কৈলাস স্ত্রীর শোকে আত্ম-হত্যা করেছে শুনছি, কেদার বাবু পাগল হোয়ে কোন মতেই বাড়ী আস্‌তে চাচ্ছেন না। ধীরেন তাহার ক্ষিপ্ত পিতার সঙ্গে পথে পথে ফিরছে। বিজয় কেদার বাবুকে ও ধীরেনকে শেষে নিজে আন্‌তে গিয়েছে।

গণেশ। বিজয় গিয়েছে, তাত ভালই, ধীরেনের সঙ্গে মনোরমার বিয়ে হবে।

রমানাথ। তা ত ভাল। কিন্তু এদিকে বিজয়ের মা বিজয় সন্ন্যাসী হয়ে চলে গ্যাছে বলে দিবা রাত্রি কাদ্‌ছেন।

গণেশ। রামধন বাবু?

রমানাথ। বিজয়ের খোঁজে গিয়েছেন।

গণেশ। তাতে কি আশঙ্কা কর্ছো?

রমানাথ। তোমরা হয়ত, বল্বে, আমার superstition কিন্তু আমার মনে কেমন একটা আশঙ্কা হচ্ছে—যে টাকা নেওয়া-বিয়ের tragedy এখনও শেষ হয় নি।

৬ষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান, নৌকায় গঙ্গা বক্ষে।

কাল, গোধূলি।

নৌকায় কেদার বাবু, ধীরেন্দ্র, বিজয় ও তাঁহার পিতা রামধন বাবু।

কেদার। বাবা বিজয়! তোমরা বল্‌তে পার, আমার বাছা সুনীতি কোথায়?

বিজয়। সুনীতি স্বর্গে; তার জন্য আপনি আর শোক কর্ব্বেন না।

রামধন। জীবন অনিত্য।

কেদার। (কাঁদিতে কাঁদিতে) হো'হো! আমার সুনীতি, 'তুমি' কোথায় মা আজ? (দূরে গঙ্গা বক্ষে তাকাইয়া) ঐ আমার সুনীতি জলের হেঁটে যাচ্ছে। ধীরেন, দেখতে পাচ্ছসনে, ঐ তোর বুন, ওকে ডাক্, ডাক্—সুনীতি। সুনীতি! ঐ জলে ডুবিয়া গেল। কেদার জলে লাফ দিয়া পড়িলেন। অমনি ধীরেন, "বাবা কি কল্লেন" বলিয়া জলে লাফ দিয়া পড়িল। বিজয়ও তাহাদের তুলিতে জলে লাফ দিল। তিন জনই তলাইয়া গেল।

রামধন। (মাঝিদের প্রতি) বিজয়কে বাঁচা। এক হাজার টাকা দেব—যে তুলবে তাকে এক হাজার টাকা দেব।

(মাঝি দুই জন জলে লাফ দিল)

রামধন। বিজয়! বিজয়! কোথা গেলি? কি হ'ল? তোর মাকে আমি কি বল্‌বো? বক্সিস্—বক্সিস্, মাঝি, বক্সিস—হাজার—দুহাজার, যত টাকা চাস্ বক্সিস্ দেব। বাঁচা, বাঁচা।

মাঝি দুজন। (জলে সাঁতার দিতে দিতে—কর্ত্তা? ভাদ্দর মাসের গঙ্গা, বড় টান। কারও কোন বিশানা পাচ্ছিনে। (মাঝি আবার ডুব দিল)

রামধন। হাঁ ঐদিকে, ঐ দিকে নৌকা চালা। নৌকা সেই দিকে চালাইতে লাগিল।

মাঝি দু জন (জলের উপর ভাসিয়া সাঁতার দিতে দিতে) কর্ত্তা পালুম না, খন জল।

রামধন। বিজয়! বিজয়!

(যবনিকা পতন)

সমাপ্ত।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

অবগুণ্ঠিত ভারতবর্ষ। (২)

দেখা যাইতেছে, গুণ্ঠন-দুর্লক্ষ্য ভারতবর্ষ জগতে ক্ষীণ মৌর্ব্বীসূত্রে দোদুল্যমান নহে—তাহার চরম লক্ষ্য এবং কৌলীন্য, অনতিজ্ঞাত নিগূঢ় বর্ত্তমানের মর্ম্মপল্লবের মাঝেও চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির নিকট স্বপ্রকাশ হইতেছে।

বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করিয়া জীবনের পাথেয় সংগৃহীত হইলে তাহা প্রবৃত্তির উদ্দাম আকর্ষণে আপাততঃ তৃপ্তি দান করিতে পারে। কিন্তু হৃদয়ের বহুমুখী আকাঙ্ক্ষার বিবৃত্তি দ্বারা হইতে আশা [illegible] [illegible] এরূপ মানবের ঐশী আত্মার [illegible] হেলা করিলে বর্ত্তমান ও বহুকাল শান্তি দান করে না। সর্ব্বত্র তাহার দৃষ্টান্ত সুলভ।

এজন্য যাঁহারা সমাজের আদর্শ কল্পনা করেন, তাঁহাদের দায়িত্ব কম নহে।

মানবের চিত্তের মাঝে ভগবান যে আলোক-রেখা দান করিয়াছেন, তাহা দেশ কালের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া রহস্যময় পথে ছুটিবেই—তাহা "প্যাট্রিয়টিজম্" বা ব্যাঙ্কের হিসাব পত্রের মাঝে সরস্বতীর ন্যায় অন্তর্হিত হইতে পারে না। বর্ত্তমানের বিশ্লেষণ-বিমুখ যুগের আতিথ্যের মাঝে এ মহৎ কথাটী না বলিয়া উপায় নাই।

যে সমস্ত সামাজিক বিধানে এই ভাব অঙ্গীভূত হয় নাই, তাহা ব্যর্থতার দৌর্ব্বল্যে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে। সামরিক ঐশ্বর্য্যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ সম্ভব,—কারণ তাহা ইষ্টকের সংযোগে গ্রথিত হয়—কিন্তু মানব লইয়া যেখানে সমাজবিধি রচনা করিতে হয়—সেখানে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। উদাহরণ দ্বারা কিছু প্রস্ফুট করিতে চেষ্টা করিতেছি।

ইউরোপের রাষ্ট্রতন্ত্র গ্রীক এবং রোমীয় আদর্শে বহুপরিমাণে গঠিত হইয়াছে। বহুরাষ্ট্রবাদের (Theory of Universal dominion) আদর্শও রোমক সাম্রাজ্যই ইউরোপকে দান করে। রোমক সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর ফ্রাঙ্ক, ভিসিগথ অষ্ট্রগথ প্রভৃতি বারবেরিয়ান্ (Barborian) জাতি, (Obotribs, Wiltus, Sorabes, Bohemians প্রভৃতি জাতি এবং দক্ষিণ হইতে আরবগণ কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়া ইউরোপ নিতান্ত চঞ্চল ও অস্থির অবস্থায় ছিল। ফরাসী ভাবুক গিজো (Guizot) বলেন, এ সময়ে কোন জাতির স্থির নিবাসভূমি ছিল না—সকলেই ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকিত। দশম শতাব্দাতে ইউরোপের জীবন কতক পরিমাণে স্থৈর্য্য লাভ করে। কতকগুলি স্বাভাবিক সীমায় নিবদ্ধ হইয়া সকলেই অপেক্ষাকৃত শান্তির স্নিগ্ধরস ভোগ করিতে ইচ্ছা করিল। এ সময় এ যুগের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি Charlamgner কীর্ত্তিকথা বা স্পেনের কৌশল প্রভৃতির স্মৃতিও কতকটা চলিয়া গেল—কিন্তু তাহাতে কোন অনিষ্ট ঘটিল না। গিজো বলেন—"এই সময়ে ধীরে ধীরে স্থৈর্য্যবিহীন ভ্রমণ-কাতর জীবন সমগ্র ইউরোপের মাঝে শান্তির পথে চলিল; জনসাধারণ ধীরে ধীরে ভূমিখণ্ড সমূহ আশ্রয় করিল; ভূমি-সম্পদ স্থিরীকৃত হইল, এবং সর্ব্বকালের সংঘর্ষে অব্যবস্থিত সম্পর্ক ক্রমশঃ সুনির্দ্দিষ্ট হইল। সর্ব্বত্র ছোট খাট সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও বিশেষ ভাব কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া আবির্ভূত হইল। এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এবং রাজ্যগুলির মাঝে আচার ব্যবহার প্রভৃতি মূলক যে ঐক্য-বন্ধন ছিল, তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট সম্পর্কে পরিণত হইলেও পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রহিল। এক দিকে ক্ষমতান্বিত প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব ভূমিখণ্ডে পরিবার, পরিজন সহ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অন্যদিকে উচ্চ নীচের মাঝে কর্ত্তব্য পরম্পরা শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া যুদ্ধপ্রিয় সাধারণের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনের উপযোগী এক প্রকার বোঝা পড়া হইয়া গেল।"

ইহার পরেই ফিউডেলিজ্যামের যুগ। ফিউডেলিজ্যাম ব্যক্তির পক্ষে হিতকারী—কিন্তু সামাজিক শান্তির পক্ষে অপর্য্যাপ্ত, এজন্য তাহাও দীর্ঘায়ু হইতে পারে নাই।

এই সমস্ত গঠনে খ্রীষ্টধর্ম্ম মাত্র পরোক্ষ ভাবে ছায়াপাত করিয়াছে। পঞ্চম শতাব্দী হইতে আমরা, সুস্পষ্ট ভাবে ঠিক খ্রীষ্টধর্ম্মকে না হইলেও, সুগঠিত সুসম্বদ্ধ খ্রীষ্টীয় যাজক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাই। ইহাদের একটী স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল। এই ধর্ম্ম সমাজটীর আদর্শ যদিও ইহার নিজের কলেবরের মাঝেই আবদ্ধ ছিল, তবুও ধীরে ধীরে ইহার বিধান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

রোমক সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর যখন এই ধর্ম্ম-সমাজটী ক্ষুধিত শার্দ্দূল সমূহের ন্যায় বর্ব্বরজাতিদের বিজেতৃদের সম্মুখে অতি অরক্ষিত ভাবে দাঁড়াইল, তখন [illegible]

রীণার ও ভীতিপ্রদ হইল ; রোমক সাম্রাজ্যের সহিত তাহা নানা মন্ত্র, নানা ভাব ও স্মৃতির দ্বারা জড়িত ছিল, কিন্তু এই সমস্ত নব্য উগ্র জাতির আচার ব্যবহার, কর্ম্ম-প্রণালীর সহিত কোন সাম্য,কোন প্রকৃতিগত ঐক্য তাহার ছিল না।

এই ভীতির মেঘচ্ছায়াতলেও এই ধর্ম্ম-সমাজটী বর্ব্বরাভিধেয়গণের মাঝে. নবধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রেম আকর্ষণ করিবার জন্ম প্রলুব্ধ হইল। কিন্তু তাহা বহুপরিমাণে নিষ্ফল হইল। নব্যজাতিগুলির নৃশংসতা, ও হৃদয়হীনতার আবর্ত্তে খ্রীষ্টীয় চার্চ্চের মতামত ধূলিপটলের স্তায় উড়িয়া গেল। তারপর যাহা ঘটিল, তাহা মুখ্যতঃ বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ইউরোপীয় সমাজকে প্রচলিত করিয়াছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক নিজে বলেন :—*

"For her defence, she (Christian Church) proclaimed a principle, formerly laid down under the Empire although vaguely this was the separation of the spiritual from the temporal power and their reciprocal independence It was by the aid of this principle that the church lived freely in connection with the Barbarians ; she maintained that force could not act upon the system of creeds, hopes and religious promises ; that the spiritual world and the temporal woild were entirely distinct"

লৌকিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া ইউরোপায়গণ বলেন,"ষ্টেট" ধর্ম্ম হইতে বিযুক্ত হওয়াতেই তাহারা জগজ্জয়ী হইয়াছে,যেখানে ধর্ম্ম কিছু পরিমাণে "জড়িত"হইয়াছে, সেখানে রাষ্ট্র দুর্ব্বল হইয়াছে। এজন্ত ইউরোপীয় শাসনতন্ত্রবহির্ভূত সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনপদ্ধতি বর্ত্তমান ; তাহা সত্যই হউক কি তদ্বিপরীতই হউক, উভয়ের মূল প্রকৃতি অভিন্ন।

যাহা হউক, ইউরোপের ব্যক্তিবিশেষের মতের দ্বারা আমাদের সমাজের কিছু হানি নাই—কিন্তু ইউরোপেই এই প্রণালীর ফলাফল কি হইয়াছে, বিচার করা যাক।

পারিবারিক কিম্বা সামাজিক জীবনে একশ্রেণীর কর্ত্তব্য চার্চের মাঝে চিত্তের অন্ত প্রকোষ্ঠ হইতে ভিন্নশ্রেণীর কর্ত্তব্য কল্পনা চিরকাল চলে না। ইতিমধ্যেই এরিষ্টটলের ত্রিবিধ রাষ্ট্রপদ্ধতি 'মনার্কি, 'য়্যারিষ্ট্রোক্রেসী ও 'কমনওয়েলথ' এবং ইহাদের বিকার 'টিরাণী' 'অলিগ্যার্কি' এবং 'ডিমক্রেসী' প্রভৃতির নানা পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

ইহাদের ধাকাধাকি হইতে এংলো-সেক্সন জাতি পার্লিয়ামেন্ট এবং রাজা প্রভৃতির দ্বারা 'মনার্কি', 'য়্যারিষ্ট্রোক্রেসী' এবং 'ডিমক্রেসী' মিলাইয়া যে খিচুড়ি তৈয়ার করিয়াছে, তাহাও কি বর্ত্তমান সময়ে মুখরোচক হইতেছে ?

ইউরোপের শাসন ব্যবস্থার মাঝে মানবচিত্তের নানাপ্রশ্ন মীমাংসিত এবং স্বিবীকৃত হইতে পারে নাই। সমগ্র মানব সমাজের চরম লক্ষ্যকে অবহেলা করিয়া যে সমস্ত বিধি সৃষ্ট হহবে, তাহা অনবরত পরিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ হইয়াছে—এই জন্ত আইন স্রষ্টারা আইন রচনা শেষ করিতে অসমর্থ হইয়াছে। অহরহ নব নব আইন যন্ত্রশালা হইতে নির্ম্মিত হইতেছে!

কর্ম্মকে যেখানে মহত্তর লক্ষ্যের উপায় স্বরূপ মনে করা হয় না, সেখানে তাহার উৎকটত্ব এবং উপদ্রব পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। ভুলে অর্থ সঞ্চয় দ্বারা দুঃখ-নিবৃত্তি তাহার চরম লক্ষ্য হয়। অর্থ মানুষকে স্বাধীনতাই

* ফরাসীদেশের সভ্যতার ইতিহাস।

করিবে। ইউরোপে এই অর্থ-সমস্যা এতই গুরুতর হইয়াছে যে, ব্যক্তি, সমাজ বা শাসনতন্ত্র এই অহিরাবণকে কিরূপে ধ্বংস করিবে, স্থির করিতে পারিতেছে না।

ইউরোপের রাষ্ট্রতন্ত্রে ইতিমধ্যেই ষ্টেট্ সোশিয়ালিষ্টগণ এবং সোশিয়াল-ডিমক্রেট-গণ মাথা তুলিয়াছে। জর্ম্মণীর মার্কস্, লাসেস্ প্রভৃতির চেষ্টা ক্রমশঃ ফলপ্রসূ হইতেছে। মার্কস্ই সমগ্র ইউরোপের নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবীগণকে সংহত করিয়া মুক্তি-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের "আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সম্মিলনী" ইউরোপের রাজন্যবর্গের শনৈঃ শনৈঃ ভীতি উৎপাদন করে। জর্ম্মণরাজ শঙ্কিত হইয়া উঠে। ১৮৭৭ খ্রীঃ বৃদ্ধ সম্রাট উইলিয়মকে দুইবার হত্যা করার চেষ্টা হয়। প্রকৃতির পরিশোধ এই উপায়ে সূত্রপাত হয়।

এই সমস্ত ভাবপ্রবাহ নিরুদ্ধ করিতে "বিশেষ ক্ষমতাবিষয়ক আইন" * প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। সোশিয়ালিষ্টগণকে নানাভাবে নির্য্যাতন করা হইল। কিন্তু আন্দোলন ক্রমশই বহিঃপ্রকাশ ছাড়িয়া অন্তরালে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'ওয়াইডেন' নগরে সোশিয়াল-ডিমক্রেটগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিল:—"তাহাদের লক্ষ্য পূর্ব্বস্থিরীকৃত "প্রত্যেক আইন-সঙ্গত উপায়ের" পরিবর্ত্তে "প্রত্যেক উপায়" অনুসৃত হইবে।

ইহা দেখিয়া তীক্ষ্ণধী বিস্মার্ক, ১৮৮৩, ১৮৮৪, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি সোশিয়ালিষ্ট ভাবযুক্ত আইন প্রবর্ত্তন করেন।

তবেই দেখা যাইতেছে, স্বাধীনতাই শান্তির চরম ব্যাপার নহে। শুধু ঐটুকুতে মানব সন্তুষ্ট নহে—তাহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু সে না পাইলে তাহাকে দমন করা অসম্ভব।

উপরোক্ত সম্প্রদায়ের প্রসার হইতেছে। আমেরিকার "অয়েল ট্রাষ্ট" "ষ্টিল ট্রাষ্ট" প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিধি-সংহার-তন্ত্রীদের আরও কয়েকটী মতের উল্লেখ করিতেছি।

(১) ন্যাশানেলিজ্যাম—উদ্দেশ্য—"Nationalisation of the funtions of production and distribution"। ইহাদের মুখপত্র The Nationalist Magazine ১৮৮৯ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। এই বিধানমতে ব্যক্তিসম্পত্তি অসম্ভব।

(২) পপিউলিজ্যাম্। ইহার উদ্দেশ্য ব্যাঙ্ক-সমূহ দৃঢ়ীকরণ, শুধু রাজস্বের জন্য ট্যাক্স গ্রহণ, রেলওয়ে এবং ক্যানেল সমূহের কর্তৃত্ব এবং স্বামিত্ব গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গ্রহণ, বিনা মূল্যে রৌপ্য হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করা।

(৩) এনার্কিজম। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে Ghent নগরস্থ কংগ্রেসে Social Dimocratগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন:—(ক) Communists বা Social Democrats, (খ) Anarchists. এই সম্প্রদায় মতামতকে অগ্রাহ্য করিল। তাহাদের মতে শস্ত্র-সর্ব্বস্ব মিলিটারী শাসন যেরূপ অকল্যাণকর, শিল্পমৌলিক গভর্ণমেণ্টও তথৈবচ; কেন্দ্রগত বিশাল ক্ষমতা-মাত্রই স্বাধীনতার বিরোধী। কোন লেখক বলেন:—They desire the abolition of all great central Governments and the establishment in the place of the present system of things or groups of small communities, in which the individual man shall support himself according to his wants and capacities."

কাজেই দেখা যাইতেছে, দুই হাজার

* Exceptional Powers Act

বৎসর পরে আবার ইউরোপ প্রাচীন কালের পুনর্মৃষিক হইতে কামনা করিতেছে। আমাদের পঞ্চায়েত বা মণ্ডলি-গঠন প্রথার সহিত ইহার তেমন পার্থক্য কোথায়?।

এনার্কিষ্টগণকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) প্রথম শ্রেণী মনে করে, পোলিটিক্যাল শাসন মাত্রই অকল্যাণকর—এজন্য তাহারা গভর্ণমেণ্ট বিনাশে বদ্ধপরিকর। ইহাদিগকে Nihilist বলা হয়।

(২) একদল communist আছেন, যাঁহারা কেন্দ্রবদ্ধ রাজকীয় ক্ষমতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সাধারণ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে পছন্দ করেন।

(৩) Individualist বা স্বাতন্ত্র্যবাদী। ইঁহাদের মতে রাজকীয় ক্ষমতা যত কম হয়, ততই ভাল,ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার বৃদ্ধি কল্যাণকর।

হায়,এই কি ইউরোপীয় "আদর্শ" শাসনপদ্ধতির পরিণতি! বিষবৃক্ষের বীজ ধারণ করিয়া তাহা কি করিয়া দীর্ঘকাল আত্মবিরোধ সংহরণ করিয়া রাখিবে? ক্ষুদ্র আদর্শ দ্বারা আপাততঃ ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, কিন্তু তাহা সফলতার গৌরবের অধিকারী হইতে পারে না।

ইউরোপের "রিলিজ্যান" ষ্টেট হইতে পৃথক হইয়াও নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। ইংরাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন "Church and State" নামক গ্রন্থে, ষ্টেটের চার্চের উপর কর্ত্তৃত্ব করা প্রয়োজন, এই মত প্রকাশ করিয়া এক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। মেকলে এই পুস্তকের সুতীব্র সমালোচনা দ্বারা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন।*

* Critical and Historical Essays.

বলা প্রয়োজন "চার্চ" বলিতে "religion" অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ ব্যাপার বুঝায়। সাম্প্রদায়িক দলাদলির মুখমন্ত্র, আচার অর্চ্চনা প্রভৃতির দ্বারা খ্রীষ্টীয় "চার্চ" সহস্রধা বিচ্ছিন্ন। ইহারা প্রত্যেকেই পরস্পর বিরোধী, একটী প্রতিষ্ঠার জন্য সময়বিশেষে নরহত্যার প্রয়োজনও হইয়াছে—তাহাকে ঠিক "নরবলি" বলিলে ইউরোপ-ভক্তেরা চটিবেন—কারণ, এংলো-স্যাক্সনদের মতে "নরবলি" ভারতেরই ব্যাপার। এই বিরোধে উত্তরোত্তর ইন্ধন সংযুক্ত হইয়াছে। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে St. Bartholomewতে বিংশ সহস্র Huguenotsকে "বলি" দেওয়া হয়। ধর্ম্মগত বিরোধটী, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সহিত যুক্ত হইয়া, প্রবলতর বিরোধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আফ্রিকা, চীন প্রভৃতি স্থানে মিসনরীগণ এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

তবেই দেখা যাইতেছে,ইউরোপের শাসনতন্ত্র এবং তৎপশ্চাতে স্থিত রণতরী ও অগ্নিগোলক শ্রেণী দেখিয়া সহসা করতালি দেওয়ার তেমন বিশেষ কোন কারণ নাই। লৌকিক আদর্শের চরম কথা "All men are equal" প্রচার করিয়া ইউরোপ ঠিক বিপরীত তথ্যটী প্রমাণ করিতেছে। এই কাল্পনিক আদর্শও দুঃখের অবসান সূত্রপাত করিল না। কাজেই ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের দোহাই দিয়া বলা হইতেছে "তাহাও কি সম্ভব?" ইহা বলিলে কতকটা আপদ চুকিয়া যায়। কিন্তু মনে করা উচিত, সাম্যবাদীর উদ্দেশ্য, ঐ কাল্পনিক আদর্শে অত্যাচার, উৎপীড়ন, মানবের প্রতি মানবের নৃশংসতা অপনোদন করা বই আর কিছুই নহে। সাম্যবাদ পরিহারের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং

নৃশংসতা দূর হইল কি? ইউরোপের বিজ্ঞতমেরা পাঁজি পুঁথি খুলিয়া কোন ব্যবস্থা খুঁজিয়া পাইয়াছেন কি?

হায়, এই সমস্ত আদর্শই ভারতের উদার ধর্ম্মবিধানের মাঝে, বজ্রপাতের অপ্রত্যাশিতভাবে উৎপতিত হইয়া, চক্ষু অন্ধ এবং কর্ণ বধির করিয়া দিয়াছে।

বস্তুতঃ ঠিক সুসময়েই অধ্যাত্মনিষ্ঠ ভারতবর্ষে, ধর্ম্মানুবর্জ্জিত বর্ত্তমান উত্থানের সূচনা হইয়াছে। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে ভগবানের অঙ্গুলি সঙ্কেত অনুভূত হইতেছে। কেননা, ইউরোপের বর্ত্তমান সমস্যা কেবল ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শের আলোক-রেখার জন্যই যেন অপেক্ষা করিয়া আছে। লৌকিক এবং সাময়িক আদর্শের চূড়ান্ত পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহা অসন্তোষের এবং জিঘাংসার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র।

মহত্তর লক্ষ্য, মহত্তর মানবত্ব, ক্ষুদ্রতার আস্ফালনে আপাততঃ অবনত ও নিন্দিত হইতেছে। অবশ্য ইউরোপীয় দার্শনিকগণ সমাজের নানা রকম আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মাঝেও আবার শ্রমবিভাগ দেখা যায়। ধর্ম্ম এবং নীতি পৃথক ভাবে আলোচিত হয়। নীতিবেত্তাগণ ব্যক্তিগত জীবনের ভালমন্দ নির্ণয়ের জন্য নানা প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন।

Hobbe, Bentham প্রভৃতি মানবের নৈতিক ভিত্তি সুখান্বেষণের উপর ন্যস্ত, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। Bentham বলেন :—

"Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure It is for them to point out what we ought to do as well as we determine what we shall do" *

যাহা হউক, দার্শনিকদের পাণ্ডিত্য, এমন কি, উচ্চতর আদর্শও কেতাবে বদ্ধ হইয়া আছে—তাহার প্রয়োগ ইউরোপে সম্ভব হয় নাই। জীবনে প্রয়োগ ইউরোপে সর্ব্বতোভাবে উপরোক্ত কারণে ব্যর্থ হইয়াছে।

এইজন্য তাহাদের কল্যাণের জন্যই ভারতের উত্থান প্রয়োজন। ভারতে ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি, একই ধর্ম্মবিধানে গ্রথিত হওয়াতে, বিশেষতঃ এই বিধান কোন মানব চেষ্টাকে অস্বীকার না করাতে এবং ইহাদের মাঝে কর্ত্তব্যের সুনির্দ্দিষ্ট পরিধি থাকাতে ভারতে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য হইয়াছে। শঙ্করের ন্যায় দার্শনিকও কর্ম্মকাণ্ডের সহিত তাহার অপূর্ব্ব মায়াবাদের সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। ভারত কোন চেষ্টাকেই খণ্ডভাবে দেখিতে পারে নাই—কারণ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এইরূপ সামঞ্জস্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ অনুধাবনার যোগ্য, সন্দেহ নাই।

ইউরোপের চরম রাষ্ট্রীয় কল্পনা, "সাম্য" "মৈত্রী' এবং "স্বাধীনতা"—কিন্তু এই আদর্শ মানব আত্মার চরম লক্ষ্যের সহিত বিচ্ছিন্ন থাকাতে, ইহার নৈসর্গিক নগ্নতা ক্ষুধা, ভোগলালসা, প্রতিযোগিতার দৈন্য বাড়াইয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে রণতরী, ডিনেমাইট্, ম্যাক্সিম গান, টর্পিডো মাত্র সৃজন করিতেছে। এই সমস্ত ছাড়া। বর্ত্তমান সময়ে সাম্য রক্ষাও সম্ভব নহে, মৈত্রীও কথার কথায় পর্য্যবসিত হয়—কেননা "মৈত্রী" ক্ষুদ্র এবং মহতে, শার্দ্দূল এবং মেষশাবকে সুবিধাজনক নহে; স্বাধীনতাও "ড্রেডনট্" ছাড়া সম্ভব নহে।

* Principles of Morals and Legislation.

এই সমস্ত ইউরোপের চতুর ডিপ্লোমেট্‌গণ বিলক্ষণ অনুভব করেন।

ইউরোপের ভোগতৃষা লৌকিক কোন মন্ত্রে নিবৃত্তি হইতেছে না।

ইউরোপে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের মাঝেই একটা বোঝাপড়া সম্ভব হয় নাই—অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৃষ্টির মাঝে সামঞ্জস্য কি করিয়া প্রত্যাশা করিতে পারি?

এদিকে মানবের সহিত যেরূপ মানব রেষারেষি করিয়া ফিরিতেছে—মানবের সহিত প্রবৃত্তিরও সেখানে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কেননা সেক্ষপীয়রের প্রস্পিরোর ন্যায় ইউরোপ প্রকৃতিকে ভোগ্যবস্তুতে মাত্র পরিণত করিতে চেষ্টা পাইয়াছে—স্বীয় সত্বার সহিত অভিন্ন ভাবে তাহাকে উপলব্ধি করে নাই। (১) এজন্য ভারতের হৃদয় হইতে যে প্রেমের আহ্বান প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়াছে, ইউরোপে তাহা সম্ভব হয় নাই। কলেজ-পাঠ্য পুস্তকে এবং সমালোচনা গ্রন্থে ইউরোপীয় গ্রন্থকারেরা প্রত্যেক কবির "His ways of looking into nature"—অর্থাৎ প্রকৃতিকে উপলব্ধি করিবার প্রণালী বর্ণনার ফ্যাশন ত্যাগ করিতে পারে নাই। আধুনিক ভারতীয় অধ্যাপকগণ ইহার মৌলিক কারণ বিশ্লেষণ করিতে না পারিয়া ইউরোপের চর্ব্বিত চর্ব্বণ রোমন্থন পূর্ব্বক শিষ্যমণ্ডলীর কর্ণে উদ্গার করেন। কেহ ইহাকে লাভ্‌ বা প্রেম, কেহ বা জ্ঞান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ফ্যাক্টরীর চিম্‌নীর ধূম নির্গত হইয়া, কিম্বা মানব সমাজের উৎকট সংঘর্ষে পীড়িত হইয়া, শ্যামল বনরাজির মাঝে উপনীত হইলে যে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ঘটে, তাঁহাকে প্রেমও বলা যায় না, জ্ঞানও বলা যায় না।

(১) এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য।

তৎসম্বন্ধে উচ্চ কলরব ও যথার্থ প্রেম জীবের প্রতিষ্ঠার প্রমাণ নহে। প্রেমের নিদর্শন ও পরিণাম শুধু বহিপ্রচারে নহে, তাহা জীবনের মাঝে দেখিতে হইবে। যাহা আমার প্রেমের ব্যাপার, সে আমার হৃদয়ের সামাজিকতায় সিংহাসন গ্রহণ করে—তেমনি যথার্থ জ্ঞান ও কুটুম্বত্বও অভেদ দৃষ্টি জন্মায়!

ইউরোপীয় সাহিত্যে মানব ও প্রকৃতির মাঝে এই সহজ পারস্পরিক বিলীনত্ব, এই অভেদ জ্ঞান সম্ভব হইয়াছে কি? প্রকৃতির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন, কিম্বা তাহাকে বাহবা দেওয়া—যথার্থ প্রেম কিম্বা জ্ঞানের বিষয় নহে। তাহা সেই পথাভিমুখী ভ্রান্ত অনভিলব্ধ প্রয়াস মাত্র—তাহা হয়ত ইন্দ্রিয়জ ব্যাপার, লক্ষ্যহীন অলীক উচ্ছ্বাস কিম্বা ঐহিক ভোগপীড়িত মানবচিত্তের প্রতি প্রতিবাদ বা প্রতিক্ষেপ (re-action)। তাহা কোন ব্যাপক, সুস্পষ্ট, সুসম্বদ্ধ ধারণা হইতে জাত নহে। ওয়ার্ডসোয়ার্থের—"The world is too much with us" কবিতাটী ইহার একটী স্বীকারোক্তি।

আমার বক্তব্যটী একটী উদাহরণ দ্বারা সুস্পষ্ট করিব। শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার বিদায় দুঃখে কাশ্যপ বলিতেছেন :—

ভোঃ ভোঃ সন্নিহিতাস্তরবনোতরবঃ
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মস্বপীতেষুযা,
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতা স্নেহেনযাপল্লবম্।
আদ্যেবঃ কুসুম প্রসূতি সময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ংযাতি শকুন্তলা পতিগৃহঃ সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

ইউরোপীয় সমালোচক মাত্রই ইহা পড়িয়া বিস্মিত হইবে। কাশ্যপের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি একি বাসকত্ব করিতেছে। তপোবন-তরুর নিকট আবার বিদায় কি?

পরিবারের আত্মীয় স্বজন হইতেই ত বিদায় লওয়া সম্ভব। তবে কি ইহারাও আত্মীয়? ইহাদের সঙ্গে কি শোণিত-সম্পর্ক আছে? তারপর বনরাজির মাঝে কোকিল রব হইল! কাশ্যপ বলিতেছেন :—

অনুমতগমনা শকুন্তলা
তরুভির্বিয়ং বনবাসবন্ধুভিঃ।
পরভৃত বিরুতং কলং যথা
প্রতিবচনীকৃত মেভিরীদৃশম্॥

তরুগণ উপরোক্ত ভাবে কোকিলরবে শকুন্তলার পতিগৃহ-গমন অনুমোদিত করিল। তাহাদের অনুমতি ছাড়া গমন সম্ভব নহে—তাহারা যে পরিবার বর্গ। কবি এই ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ রাখেন নাই।

শুধু এই খানে ব্যাপার শেষ নহে। তপোবন তরুগণ আত্মীয়ের ন্যায় উপহারও দিতেছে। কিশ্চর্য্য ব্যাপার! কি সুন্দর দৃশ্য! ক্ষৌমং কেনচিদিন্দু পাণ্ডুতরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপরাগসুভগো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈর দত্তান্যাভরণানি তৎকিমলয়োদ্ভেদ প্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ।"

শকুন্তলার প্রস্থানকালে :—

উদ্গলিত দর্ভকবলাঃমৃগাঃ পরিত্যক্তনর্ত্তনাঃ ময়ূরাঃ অপসৃত পাণ্ডুপত্রাঃ মুঞ্চন্তি অশ্রূণিইব লতাঃ।

এই ত প্রেমের প্রমাণ! ইহাই ত লক্ষণ। ইহা ইউরোপীয় প্রেম নহে। ইহা অভেদ-জ্ঞানজাত মিলন! ইহা প্রেমের চরমোৎকর্ষ।

শকুন্তলা লতাপুঞ্জ হইতেও সখীবৎ আলিঙ্গন কামনা করিতেছে :—

"বনজ্যোৎস্নে, চুতসঙ্গতা অপিমাং
প্রত্যালিঙ্গ ইতোগতৈঃ শাখাবাহুভিঃ।"

এই শ্রেণীর ভাব ইউরোপীয় চিত্ত এই পর্য্যন্ত উপলব্ধি করে নাই। পাঠককে উত্তর-চরিতের তৃতীয় অঙ্কের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি।

ভারতবর্ষ বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্রহ্মোপলব্ধি করে বলিয়াই এইরূপ সামাজিকতা সম্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষে মানব ও অন্যান্যের মাঝে দেবত্ব অনুভব করে বলিয়াই তাহা জ্ঞাতসারেই হউক—বা সংস্কার দোষেই হউক, এখানে কোন অস্বাভাবিক রেষারেষি সম্ভব হয় নাই—সম্প্রদায়গত প্রকৃতিভেদ সহজেই নির্দ্দিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। ঠিক এই দেবত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হইলে শান্তি ও বিরোধবিহীনতা আশা করা বৃথা। "মানব মাত্রেই সমান" এই উক্তিটী ঐতিহাসিক সত্য হইলেও আদর্শরূপেও ব্যর্থ হইয়াছে। দেবত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইলেই কেবল পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরাম আশা করিতে পারি।

আমাদের গ্রহণীয় এবং বরণীয় পদার্থ মাত্রেই ব্রহ্মের বিকাশ কল্পিত হইয়াছে। জড়জগৎ একাকীত্বের মাঝে ব্যর্থ—তাহার পশ্চাতে বৃহত্তর ব্যাপকতার শক্তির রহস্যময় কার্য্য চলিতেছে—অগ্নির দাহিকাশক্তি, বায়ুর গ্রাহিকা শক্তির মাঝে ব্রহ্মেরই প্রকাশ দেখিয়া ভারতবর্ষ ধন্য হইয়াছে।

"বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।"

যেমন বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানা বস্তুভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, তেমনি অন্তরাত্মা নানা বস্তুভেদে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্মপশ্চাদ্
ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং
বরিষ্ঠম্॥

অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্মই পশ্চাতে,

ব্রহ্ম দক্ষিণে এবং উত্তরে। তিনি অধঃ এবং উর্দ্ধে বিস্তৃত হইয়া আছেন। এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই সমস্ত!

কিন্তু ভারতবর্ষে এই সর্ব্বভূতে দৈবীভাব উপলব্ধি আদর্শ মাত্র নহে, কিম্বা দার্শনিকের স্তায়সূত্র হইতে লব্ধ জ্ঞান মাত্র নহে। ইহা সমাজের সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে। ইহা কল্পনা নহে, উপলব্ধির বস্তু।

ইহা উপনিষদের ভাব মাত্র নহে—সমাজ-বদ্ধ ভারতবর্ষ এই ভাবের অঙ্কে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া ইহাকে উপলব্ধি করে।

ভারতে পিতা দেবতা, গুরু দেবতা, মাতা দেবতা—অর্থাৎ সন্তানের প্রতি পিতার ত্যাগমূলক পিতৃত্ব, মাতার বিস্ময়জনক সেবামূলক মাতৃত্ব, ভগবানের শক্তিরই আংশিক বিকাশ মাত্র—ব্রহ্মবর্জ্জিত মানবের রিক্ত চিত্তে কি আছে? ভগবানই ইহাদের মাঝে প্রকাশিত হইয়া এই অপূর্ব্ব সৃজন করিতেছে। তেমনি গো দেবতা। তাহা কর্ষণে,ধান্ত দানে, অজস্র প্রাণরূপী দুগ্ধ দানে ভারতীয় পরিবারের অন্তরতম পদার্থ। ভগবানই তাহার মাঝে প্রকাশিত হইয়া মঙ্গল সাধন করিতেছেন! কিন্তু দেবতা বলিয়া তাহাকে গো-শালা হইতে আহরণ করিয়া প্রাসাদের চূড়ায় রাখিতে হইবে, এমন কথা নহে। স্বয়ং ব্রহ্মবিকাশের উপলক্ষ্য মাত্র। যন্ত্রীগণের যন্ত্র পূজা, পাঠার্থীর গ্রন্থ পূজা, এই ভাব হইতেই উদ্ভূত। তেমনি জলে স্থলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের অনন্ত আনন্দ এবং শক্তি ভারত প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতেছে। *

এজন্ত ভারতের বক্ষে কিছুই হীন নহে—অবহেলা অধর্ম্ম।

* পিঞ্জরাপোলের স্তায় অনুষ্ঠান কেবল ভারতেই সম্ভব হইয়াছে।

ভারতের মর্ম্মে মর্ম্মে এই হিতোপদেশ আছে বলিয়া আজ সেই প্রাচীন সংস্কারবলে ক্ষুধার্ত্ত হইলেও ভারত মানবত্ব হারায় নাই। দুর্ভিক্ষে লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও এংলো-সাক্সনদের বা তাহাদের শিষ্যানুশিষ্য রাজনৈতিকগণের গৃহ লুণ্ঠন করেনা; নিঃশব্দে শরীর ত্যাগ করে। কোন দেশের ইতিহাসে এমন ঘটে কিনা, জানি না। এমন উচ্চ ধর্ম্ম-নীতি, প্রেম এবং ভগবদ্‌ভক্তি, এমন সংযম, আত্মশাসন, ত্যাগ আধুনিক সংগ্রাম-যুগে কাহারও কাহারও মতে বর্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু ধিকৃত নহে।

এই নিঃশব্দ,নিস্পন্দ আত্মত্যাগ "এজিটে-টরগণের" ত্যাগ অপেক্ষা মহত্তর, সন্দেহ নাই, —ইহার ভিত্তিও ভারতের সনাতন ধর্ম্ম! ধর্ম্মের জন্য, চিরপ্রবাহিত অধ্যাত্মনীতির জন্ত ভারত কোন্ ত্যাগ করে নাই?

আরও একটা কারণ আছে।

ইউরোপের সমাজতন্ত্র মুখ্যতঃ ব্যক্তিতন্ত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত—কেবল কয়েক বৎসরের মাঝে মাত্র সোশিয়ালিজম মাথা তুলিতেছে।

সেইখানে যাবতীয় কার্য্য চুক্তির উপর নিহিত। বর্ত্তমান যুগে চুক্তি-আইনের উত্তরোত্তর প্রসার হইতেছে। তত্রত্য সমাজের যাবতীয় কার্য্যই চুক্তির উপর দিবারাত্র চলিতেছে। রাজা প্রজার সম্বন্ধও চুক্তির উপর নির্ভর করে। নানা প্রকার চার্টার প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। রাজা প্রজার সঙ্ঘর্ষ এই চুক্তির সর্ত্তগুলি পরিস্ফুট করা মাত্র, ইহা তাহাদের চোখে কিছুতেই অস্বাভাবিক ঠেকে না। বিলাতের সামাজিক যাবতীয় বিধানে প্রত্যেকেই নিজের স্বত্বের প্রতি খরতর দৃষ্টি রাখিয়াছে।

প্রত্যেকেই সমাজের নিকট এবং অন্যো-

ন্তের নিকট তাহার ষোল আনা দাবী আদায় করিতে ছাড়ে না। এই দাবীর খাতিরেই তাহার ত্যাগ বা কর্ত্তব্য—ইহার বিনিময়েই তাহার কার্য্য, অন্যথা নহে। পরিবার, সভা, সমিতি, চার্চ্চ, রাষ্ট্র, ক্লাব, সর্ব্বত্র প্রত্যেকের স্বীকৃত স্বত্ব আছে, তাহার বিপর্য্যয় তাহার পক্ষে দুঃসহ ও অমার্জ্জনীয় এবং এই সমস্তের প্রতিদানে তাহার কর্ত্তব্যও নির্ভর করে। নীতি, দুর্নীতি এই দ্বিমুখী বন্ধন হইতেই স্বীকৃত হয়। বলা অনাবশ্যক, এই বিরোধমূলক চুক্তি উৎকটভাবে ইউরোপের মজ্জাগত। "চার্টার অভ রাইটস্" 'বিল অভ রাইটস্' "রাইটস অভ মেন" প্রভৃতি নানা হট্টগোলে ইউরোপকে গঠন করিয়াছে। এই স্বত্বজ্ঞানের উৎকট বিকারে পীড়িত ইউরোপ এসিয়ায় মিশনরী প্রেরণ, নৌসেনা স্থাপন, বাণিজ্য-প্রসার এবং রাজ্য-প্রসারও ন্যায়ানুমোদিত মনে করে। শান্তি স্থাপনের স্বত্বের চোটে ব্রহ্মনৃপতি রাজ্য হারাইল, নানা শ্রেণীর "ফিউডেটারী" এবং "বাফার" ষ্টেট সৃষ্ট হইল। জাপানও সম্প্রতি ইউরোপের এই নীতির সাহায্যে কোরিয়ায় শান্তিস্থাপনে জাপানের স্বত্ব আছে প্রচার করিয়াছে; ইউরোপ সহজেই ইহাতে সম্মত।

কাজেই এই স্বত্বজ্ঞান হইতে উদ্ভূত আন্দোলনের জন্য ইউরোপে রক্তারক্তির ফোয়ারা ছুটে! বিলাতে সেদিন কর্ম্মবিহীন লোকদের যে সমস্ত "ব্রেডরায়ট" বা অন্ন-সংগ্রাম হইল, তাহার ইতরতাও এই জ্ঞান হইতে জাত। গভর্ণমেণ্ট যখন প্রত্যেকের আহার যোগাইতে বাধ্য, অর্থাৎ সাধারণের যখন গভর্ণমেণ্টের উপর এই "অধিকার" আছে, তখন শাসনকর্ত্তার অসামর্থ্যে অপরপক্ষের শাসনবিধির উপর বিদ্রোহভাবাপন্ন হইবার অধিকার আছে। ইউরোপের আইন সাধারণের এই সমস্যা মীমাংসা না করিলে কেহই আইন মানিতে বাধ্য নহে। একপক্ষ চুক্তিভঙ্গ করিলে অপরপক্ষও চুক্তির অপরদিক ভাঙ্গিবে। অধিকার রক্ষিত না হইলে কর্ত্তব্য সুলভ হইবে না। ইউরোপের রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের মূলকারণও ইহাই; পাঠকগণ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার বিপ্লব-সাহিত্যে পন্থা দেখিবেন।

ভারতবর্ষে যে রাজকার্য্য চলিতেছে, তাহা সমগ্রভাবে দেশের ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন। এজন্য আমাদের সমাজদেহে বর্ত্তমান রাজার আসন মুসলমান বা হিন্দুনৃপতির আসনের ন্যায় নহে। উপরোক্ত অসামঞ্জস্য অনেক অনর্থ ঘটাইতেছে। বিলাতের ন্যায় ভারতের প্রজা যদি আন্দোলন না করে, তবে রাজা তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য, দুর্ব্বল বা সন্তুষ্ট মনে করে। ইউরোপের মস্তিষ্ক চুক্তির আদর্শ-মূলক তত্ত্বদ্বারা রচিত হইয়াছে।

এইজন্যই বর্ত্তমান সময়ে নেতি-ভাবক সংঘর্ষাদি (passive resistance) প্রয়োজন হইয়াছে।

কিন্তু ভারতের সমাজ সাধারণ আন্দোলন না করার কারণ ভারতের চিত্তে এই চুক্তিজ্ঞানের আত্যন্তিক অভাব। কথাটী বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ অনুধাবন যোগ্য, কেননা বর্ত্তমান যুগে জনসাধারণকে কতকটা এই জন্যই নিন্দা করিতে, ইউরোপের ভারতবর্ষীয় পোষ্যপুত্রগণ, অলীক উৎসাহ অনুভব করে।

ভারতবর্ষের সমাজের কোন অঙ্গ অপর অঙ্গের সহিত চুক্তি দ্বারা সংযুক্ত নহে। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে—প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিতে ধর্ম্মগুরুগণ কর্ত্তৃক অনুশাসিত হইয়াছে মাত্র। ব্রাহ্মণ স্বীয়

কর্ত্তব্য না করিলে ক্ষত্রিয় স্বীয় কর্ত্তব্য অবহেলা করিবে, কিম্বা কৃষি-জীবী তজ্জন্য কলরব তুলিবে—ভারতে এইরূপ বিসদৃশ ব্যাপার ঘটে নাই। ইহা সমাজের উচ্চতর অবস্থা সন্দেহ নাই। অন্য লোক কর্ত্তব্য করুক না করুক—আমার কর্ত্তব্য আমি করিব, আমার মঙ্গল আমি অর্জ্জন করিব—ইহাই যথার্থ ধর্ম্মভাব। ফলনিরপেক্ষ হওয়াও ইহার আর একটা দিক্ মাত্র। ইউরোপের সামাজিক ইতিহাস এখনও এই পথ অবলম্বন করিতে পারে নাই—একথা বলিলে আত্মপ্রশংসা হইল না, একটী সত্য অথচ অপ্রিয় কথা বলা হইল মাত্র।

ভারতের আদর্শ শুধু কর্ত্তব্যের জন্য কর্ত্তব্য করাও নহে। (১) সর্ব্ব প্রকার আত্মাভিমান নিরাকরণার্থে এবং স্বার্থমূলক সংঘর্ষ হইতে মুক্তির জন্য ধর্ম্মগুরুগণ একটী ঋণবাদ প্রচার করিতেছেন। আমরা প্রত্যেকেই ঋণী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। * অতীতের ভাবসমষ্টির অধিকারীরূপে, পিতৃকুলের নানা বিচিত্র সম্পদের প্রাপকরূপে, ভগবানের মঙ্গল আশীর্ব্বাদের শক্তির গ্রাহকরূপে আমরা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আপাদ-মস্তক ঋণবদ্ধ—আমাদের জৈবনিক কার্য্য এই ঋণ পরিশোধ করা মাত্র। এই মতবাদের দ্বারা অধিকারিত্বজ্ঞান চূর্ণীকৃত হইয়াছে।

"দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ তথানরঃ
ঋণবান্ জায়তে যস্মাত্তস্মোক্ষে প্রযাতৎ সদা॥"

উপরোক্ত ঋণের পরিশোধের উপায়ও উল্লিখিত হইয়াছে :—

"দেবানামনৃণো জন্তুর্যজ্ঞৈর্ভবতি মানবঃ।
অর্চ্চবিত্তশ্চ পূজাভিরুপবাসব্রতৈস্তথা॥
শ্রাদ্ধেন প্রজয়াচৈব পিতৃণামনৃণোভবেৎ।
ঋষাণাং ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন তপসাতথা॥"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

কাহারও মতে ঋণ চতুর্ব্বিধ—যথা :—

ঋণৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা জায়ন্তে মানবাভুবি।
পিতৃদেবর্ষি-মনুজৈ র্দেয়ং তেভ্যশ্চ ধর্ম্মতঃ॥
যজ্ঞৈশ্চ দেবান্ প্রীণাতি স্বাধ্যায়তপসামুনীন্।
পুত্রৈঃশ্রাদ্ধৈঃ পিতৃংশ্চাপি আনৃশংস্যেন মানবান্

উপরোক্ত উক্তি মতে সমগ্র মানবজাতির নিকট আমরা ঋণী—তাহা অহিংসা দ্বারা পরিশোধ করা প্রয়োজন।

যে ভক্তির অন্তর্লক্ষণ এইরূপ, তাহার পক্ষে "ব্রেড্ রায়ট" সম্ভব নহে। দুর্ভিক্ষে পতিত হইলেও প্রাক্তন কর্ম্ম এবং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সেই জাতি আশ্বস্ত হইবে।

ভারতীয় চিত্ত আত্মার ঐহিক এবং পারলৌকিক অভ্যুন্নতির জন্যই দাবীরূপী মাংসের টুক্রা লইয়া নৃশংসভাবে আরণ্য জন্তুর ন্যায় কোলাহল করে নাই। প্রাক্তনবাদী ভারতবর্ষ জীবনের স্বীয় নির্দ্দিষ্টমার্গকে বিধিকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট এবং ধর্ম্ম কর্ত্তৃক অনুমোদিত মনে করিয়া অন্য শ্রেণীর সহিত বিরোধ ত্যাগ করতঃ কর্ত্তব্য করাকেই সমীচীন এবং শাস্ত্রানুমোদিত মনে করিয়াছে। ইহাতে আত্মানুশীলনেরও তেমন বাধা নাই—"ব্যাধগীতা" তাহার প্রমাণ।

মানবের দেবত্ব প্রতিপাদিত হইলে ঠিক

(১) কোন গ্রন্থের লেখক এই মতের পোষক—"যাঁহার মত নির্দ্দিষ্ট" "Duty for duties sake"ও সমাজের চরম কথা নহে, যদিও ভারতবর্ষে তাহার স্থান আছে।

* বর্ত্তমানের Physiology এবং Psychology এবং বিবর্ত্তনবাদ মানবের দৈহিক ও মানসিক ঋণ স্পষ্ট করিতেছে।

সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না, ঐক্য মাত্র উপলব্ধি হইবে। ইউরোপ একবার এই আদর্শ গ্রহণ করিলে তাহার অনেক সমস্যার মীমাংসা হইবে, সন্দেহ নাই। এই বাণী কি কখনও 'হাইড পার্ক' এর মানব-প্রজাপতির কর্ণে উচ্চারিত হইবে না? ভারতের বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যযুগই তাহা প্রমাণিত করিবে।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষকে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, নচেৎ শ্রদ্ধার অভাববশতঃ ভারতবর্ষ হইতে জ্ঞানগ্রহণের পথ কণ্টকিত হইবে। ধিক্কৃত এবং অবনত ভূখণ্ড হইতে কে জ্ঞান সংহরণ করিবে? ইউরোপের এবং জগতের কল্যাণের জন্য অধ্যাত্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ ভারতবর্ষকে হয়ত মঙ্গল-পরশু হস্তে ধারণ করিতে হইবে। এইজন্যই আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন, কোন ক্ষুদ্র ঐহিক আদর্শের জন্য নহে। ইহা ব্যতিরেকেও যদি জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ সম্ভব হয়, নগ্ন ভারতের কমণ্ডলু হইতে জ্ঞানকণা লাভ করিতে ইউরোপ নত হয়, তবে সমধিক আনন্দের বিষয়। ইউরোপের ঐহিক এবং পারমার্থিক কল্যাণের দিক হইতে বিচার করিতে গেলেই শুধু মাঝে মাঝে মনে হয়, এইজন্যই বুঝি বা ভগবান প্রবৃত্তিক্ষুব্ধ স্থৈর্য্যবিহীন ইউরোপের মঙ্গলের জন্যই এই সংযোগ বিধান করিয়াছেন। এই হিসাবে ভারত ও ইংলণ্ডের সম্পর্ক "প্রভিডান্‌শিয়্যাল" হইলেও হইতে পারে।

ঠিক এই পথেই প্রশ্ন উঠে, আমাদের শক্তি, কোথায়? কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জাতি বা সম্প্রদায় যে বস্তুকে পরমার্থ বলিয়া মনে করিয়াছে—সেই জাতির ত্যাগ সেই পথেই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ ধর্ম্মকেই সত্যপদার্থ মনে করিয়াছে, এইজন্য, এই ক্ষেত্রে তাহার ত্যাগের সীমা বা তুলনা নাই। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, ত্যাগী সন্ন্যাসী, তাহাদের অসীম ত্যাগের দ্বারা বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা প্রমাণ করিতেছে। কোন্ দেশে এমন ব্যাপার আছে? গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, সংসার ত্যাগ বড় সহজ ব্যাপার নহে। শুধু কথার চোটে এমন বৃহৎ ব্যাপার হয় না—এখনও সংখ্যাহীন ধর্ম্মশালা ও অন্নছত্র জগতের ইতিহাসে বিস্ময়জনক ব্যাপার! জগৎ বক্ষে ইহার প্রতিলিপি পাইবে না।

কতকগুলি ত্যাগের ব্যাপার ইউরোপ স্বচক্ষে দেখিয়া প্রত্যয় করিতে পারে নাই। ভাল মন্দ বিচার করিবার প্রয়োজন বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাই—আমরা কেবল ত্যাগীর মনের দিকটা, চিত্তের দিকটা অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করিব। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালী মাতা নাকি তাহার প্রথম সন্তানকে গঙ্গাদেবীর ক্রোড়ে ভাসাইয়া দিত! আমরা এই ত্যাগে শিহরিয়া উঠি!—এমন মাকে দানবী বলা আমাদের মুখে আসে না—কেবল এই প্রবলা করালী গঙ্গার তটে দণ্ডায়মানা সম্বরিত-অশ্রু-মূর্ত্তিকে দেবী মাত্র বলিতে পারি। কেন?

ইউরোপ ইহাকে বর্ব্বরতা বলুক, আমরা কিন্তু জানি, ইতর জন্তুর মাঝেও মাতা শিশুকে প্রাণপণে রক্ষা করে। কাফ্রী, আন্দামানীয় প্রভৃতি জাতীয় মাতাও পুত্রস্নেহ বর্জ্জন করিতে পারে না, এমন কি, গরিলা বা মর্কটও শিশুকে বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাকে বিবাদ হইতে রক্ষা করে।

ভারতের অন্যান্য জাতির মাঝে বাঙ্গালীমাতার পুত্রস্নেহ দুর্ব্বলতা আখ্যাও প্রাপ্ত

হইয়াছে। এমন মাতার পক্ষে সন্তান ত্যাগ কি বিস্ময়জনক ব্যাপার!—তাহার হৃদয়ে এইজন্য কোন আঘাত অনুভবই করে না, এ কথা বালকও বিশ্বাস করিবে না। তবে এই দুঃসহ পীড়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জন্য (অন্ততঃ সত্যভাবে ও সবলভাবে উপলব্ধ) বাঙ্গালী জননী স্বীকার করিয়াছে। আজ অন্যক্ষেত্রে কে না ইচ্ছা করিতেছে, বাঙ্গালী মাতা এমন ত্যাগশীলা হউন, এমন ভাবে বর্ত্তমানের জটিল সংগ্রাম-গঙ্গাপ্রবাহে অক্ষুব্ধচিত্তে তাহার সরল সন্তানকে প্রেরণ করুন!

আরও কিছুকাল পরে এই শ্রেণীর ঘটনা ঐতিহাসিকগণ বিশ্বাস করিবে না। ইতি-মধ্যেই "সতীর" আত্মত্যাগ জোর-জবরদস্তীর ব্যাপার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নানা কারণে এই প্রথাটী ত্যাজ্য, ইহার পরিহার বিশেষ মঙ্গলজনক হইয়াছে—কিন্তু এইরূপ ত্যাগকে অসম্ভব মনে করিবার কি হেতু আছে? রাজপুত-রমণীরা কি দলে দলে অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দেয় নাই? ধর্ম্মের জন্য ভারতবর্ষে অসম্ভব কার্য্যও সম্ভব হইয়াছে। প্রতীচ্য রাজ্যবাসী-গণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেনা।

তারপর সাহিত্যে দাতাকর্ণ, দধীচি, শুনঃসেফ প্রভৃতির ত্যাগের তুলনা অন্য কোন সাহিত্যে অনুসন্ধান পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে। বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অশীতিবর্ষ বয়স্কা পুরমহিলাগণ পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রায় যেরূপ অচিন্তনীয় ক্লেশ এবং ত্যাগ সহ্য করেন যে মনে হয়, এই শ্রেণীর প্রবল অনুরাগে ভারতের বিপর্য্যস্ত সন্তানগণ ভারতের ভবিষ্যতের জন্য যদি এক দিনের জন্যও অনুপ্রাণিত হইত, তবে খবরের কাগজে কাঁদিবার দিন শেষ হইত!

ভারতের "ত্যাগ" আমাদের বর্ত্তমানযুগের "স্যাক্রিফাইস্" (Sacrifice) অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন পদার্থ! বুদ্ধদেবের প্রব্রজ্যা "স্যাক্রিফাইসের" দৃষ্টান্ত নহে—ত্যাগের ধর্ম্ম।

আমাদের যুগে বৈদ্যুতিক ফ্যানের হাওয়ায় অভিষিক্ত হইয়া চারবেলা খাদ্যসম্প্রদায় গলাধঃকরণ করিয়া, কুড়িটা চাকর হাঁকাইয়া, মোটরের চক্র আবর্ত্তন করিয়াও স্যাক্রিফাইস্ চলে, করতালিও সঙ্গে সঙ্গে কপালে জুটে, রেলওয়ে শকটের প্রথমশ্রেণীর মঞ্চ আশ্রয় করিলে, কিম্বা হিমনিবাস শৈলের মূর্দ্ধা হইতে একদিনের জন্য বক্তৃতার্থ অবরোহণ করিলে "স্যাক্রিফাইসের" উৎকটত্বে জয়ধ্বনি হয়।

কিন্তু ত্যাগ বড় কঠিন ব্যাপার—ইহা দীক্ষার একতম অংশ, ইহা হৃদয় বৈরাগ্যের, অনাসক্তির, এবং ফল-নিরপেক্ষতার ব্যাপার। এখানে দোকানদারী চলে না, এখানে ভেল দুঃসহ, এখানে দুকূল রাখা স্বতঃই ব্যর্থ, এখানে পারস্য গালিচা এবং কুশাসনের একই মূল্য, এখানে স্ফটিকের অসংখ্য দীপসলাকার আলো মৃৎপ্রদীপের স্থিরদীপ্তির মাঝে মূর্চ্ছিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে একটী মাত্র প্রশ্ন, কে কে ভারতের এই সহস্রবর্ষাগত ত্যাগের দীক্ষা লইবে? যে দীক্ষা, যে ত্যাগব্রত মনীষীগণ গ্রহণ করিয়াছেন, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি যাহার প্রবাহ-সূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, ক্ষুদ্র পরিধির মাঝে প্রতি ভারতের অমর আত্মা যাহার দ্বারা যুক্ত, কে তাহা আজ অনাদর এবং অবজ্ঞার ধূলির মাঝে লুণ্ঠিত হইতে দিবে?

ভারতবর্ষের সনাতন ভাব-প্রবাহ আমাদের চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছে—বৈদেশিকের নানা আবর্জ্জনায় আজ শরীর এবং মনকে প্রলিপ্ত করিয়াছি। এজন্য ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করিয়া

যদি আকর্ষণ করি, তবে তাহা ছিন্ন হইলেই প্রতিমুহূর্ত্তেই হাহাকার ধ্বনি তুলি।

কিন্তু ত্যাগের আর একটা দিক আছে।

বেদ, সূত্র, পুরাণ, মহাকাব্য, নাটক, সঙ্গীতশাস্ত্র তন্ত্র, প্রভৃতির মাঝে ভারতের চিত্তকথা যেমন অনুসন্ধেয়, তেমনি, বঙ্গদেশে রঘুনন্দন প্রভৃতি যেরূপ সামাজিক কর্ম্মক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, (ভারতের কোন অংশই স্মার্ত্তগণের তদ্রূপ অনুশাসন হইতে নির্লিপ্ত হইতে পারে নাই) তাহাও বিচার্য্য।

ভারতের এই সামাজিক ইতিহাসও অতি জটিল এবং প্রাচীন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব", বাঙ্গালাদেশের পক্ষে সামান্য ব্যাপার নহে। রঘুনন্দনের স্মৃতি তত্ত্বের কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করিলে আমাদের গুপ্ত কর্ম্মক্ষেত্রের আর একটী দ্বার উন্মোচিত হয়। উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে :*—(১) তিথিতত্ত্ব (২) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব (৩) আহ্নিকতত্ত্ব (৪) প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব (৫) জ্যোতিষ তত্ত্ব (৬) মলমাসতত্ত্ব (৭) সংস্কারতত্ত্ব (৮) একাদশীতত্ত্ব (৯) উদ্বাহতত্ত্ব (১০) ব্রততত্ত্ব (১১) দায়তত্ত্ব (১২) ব্যবহারতত্ত্ব (১৩) শুদ্ধিতত্ত্ব (১৪) বস্ত্রযাগতত্ত্ব (১৫) কৃত্যতত্ত্ব (১৬) যজুর্বেদিশ্রাদ্ধ তত্ত্ব (১৭) দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব (১৮) জলাশয়োৎসর্গ তত্ত্ব (১৯) ছন্দোগবৃষোৎসর্গতত্ত্ব (২০) শ্রীপুরুষোত্তমতত্ত্বম্ (২১) দিব্যতত্ত্ব (২২) মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব (২৩) শূদ্রকৃত্যবিচারণতত্ত্ব (২৪) যজুর্ব্বেদিবৃষোৎসর্গতত্ত্ব (২৫) দীক্ষাতত্ত্ব প্রভৃতি এবং ইংরাজরাজের গণ্ডীর বাহিরে—ইহার ভিতর তাহার প্রবেশ দুঃসাধ্য। সামাজিক দিকের বিস্তৃতি ও বিক্ষেপ প্রদর্শন করিবার জন্যই উল্লিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিলাম। বল্লাল সেনের ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের মাঝে কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন এবং এতদসম্পৃক্ত কুটিল আচারপদ্ধতিও কাহারও অজ্ঞাত নহে। অপরদিকে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম্মজাত সামাজিক ব্যবস্থা ও সাহিত্য, বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্যভাগবত", কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত" এবং অন্যান্য গ্রন্থ পাঠকের অজ্ঞাত নহে।

* জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

বর্ত্তমান সমাজের উৎসব গুলিকে শুধু একদিক্ হইতে দেখিলে তাহাদের প্রতি বিচার করা হয় না। দেশের স্বাস্থ্যহীন পূজা এবং ব্রতগুলির ধর্ম্মচর্চ্চার দিক্ বাদ দিলেও (এ ক্ষেত্রে যাহাদের ব্যক্তিগত আপত্তি আছে) উহার সামাজিক, সিভিল, আন্তগ্রামিক শাসনের দিক, যুগপ্রবাহিত ভাস্কর্য্য ও চিত্রজালের আদর্শমূলক প্রাচ্য সৌন্দর্য্যচর্চ্চার দিক্, নৈতিক দিক্, বিশেষতঃ গভীর অধ্যাত্মনিষ্ঠা ও সংযমের দিক্ হইতে বিচার করিবার অনেক কিছু আছে। ইতিমধ্যে মনীষী দুই একজন তাহার সূত্রপাতের চেষ্টা করিতেছেন। সমাজবিদ্ এবং অভিজ্ঞ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপকেরা বালকের ন্যায় সহজেই সব কিছুই ভাঙ্গিতে চাহেনা—কেননা দুনিয়ায় ভাঙ্গা যত সহজ, গড়া তত নহে। এজন্য শক্তির স্রোতকে যথাসম্ভব নিজের কার্য্যের অনুকূল করিতে তুষ্ট হন।

পল্লীবিধানের মাঝে নিজের কার্য্য এবং পরিবারের কার্য্য পৃথক করা যায় না—কেননা নিজের কার্য্যই পরিবারের জন্য—এই বিরোধবিহীনতায় ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য এবং পারিবারিক কর্ত্তব্যের মাঝে কোন শ্রেণীভেদ নাই। তেমনি, কয়েকটা পরিবার লইয়া যে সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত সুসঙ্গত সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে। সম্প্রতি প্রত্যেকের কার্য্য দ্বারা প্রতিমুহূর্ত্তে এই

জন্যই সমাজ সচকিত হয়—কেননা ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের মাঝে পূর্ণ প্রবাহে রক্তসঞ্চালন আছে।

এতদিন সমাজ এই সংহত শক্তির আনুকূল্যেই প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা দ্বারা আত্মশাসন কার্য্য চালাইয়া আসিয়াছে।

এমন সুনিপুণ জাতির মাঝে আজ এত বক্তৃতার কলরব, দৈনিকের ছড়াছড়িও "পোলিটিক্যাল" জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিতেছে না কেন? বিরাট এবং বিশাল সমুদ্রবৎ ভারতের জনসাধারণ নব্য পোলিটিক্যাল পাদ্রীদের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেছে না কেন? দুই একজন যুবক গ্রামের মাঝে প্রাণপণ বক্তৃতা এবং কার্য্য করিয়াও সমাজের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিতেছে না কেন? সভা, সমিতি, সমাজ-সংস্কার, নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতি কার্য্যের তালিকা হাতে লইয়া স্কুল-ছাত্রদের কেবল উত্তেজিত করিতেছে—কিন্তু ঐ অতলস্পর্শ সমাজের কাছে কেন সে প্রতিপদে ব্যর্থ?

ভারতের বর্ত্তমান শাসনকার্য্যটীর সহিত আমাদের সমাজবিধির কোন স্থানেই যোগ নাই। গ্রামের মাঝে নব্যস্থাপিত পুলিশ ষ্টেশন, কিম্বা দেওয়ানী অফিস প্রভৃতির সহিত গ্রামের সামাজিক কোন সম্পর্ক নাই। এই ব্যাপারগুলি সদ্য উপস্থিত হইয়া অহরহ নূতন বিরোধ সৃষ্টি করিয়া সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। ইহারাই সমাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, এংলো-স্যাক্সন জাতির বিজয় পতাকা। ইহাদের সংঘর্ষে সমাজ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের আনুকূল্যে একাকী একটী দুর্ব্বৃত্ত সমগ্র গ্রামকে উপেক্ষা করিতে পারে।

গ্রামের স্যানিটেশন সম্বন্ধে একটী উদাহরণ দেওয়া যাক্। পল্লীবাসী বিজ্ঞগণ পল্লীর স্বাস্থ্যের জন্য একটী পয়ঃপ্রণালী খনন সিদ্ধান্ত করিলেন। সকলেই স্ব স্ব ভূমিখণ্ড হইতে অন্যোন্যের মঙ্গলার্থ কিঞ্চিৎ ভূমি দান করিলেন। কিন্তু ঠিক মধ্যবর্ত্তী একটী লোক সূচ্যগ্রমেদিনী দান করিতে অসম্মত হইল, অমনি সমগ্র প্ল্যানটী ভূমিসাৎ হইল। সমাজের কোন ক্ষমতা নাই, যাহাতে ঐ ব্যক্তি হইতে ভূমিটুকু গ্রহণ করে।

সমাজ দণ্ড দিতেও অক্ষম—পুরস্কারও তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। সম্প্রতি নিতান্ত আচারমূলক সঙ্কীর্ণ পরিসরে কিঞ্চিৎ সামাজিক শাসনও বৈদেশিকের দুঃসহ হইয়া পড়িয়াছে।

নব্যপ্রতিষ্ঠিত পুলিশ, দেওয়ানী এবং ফৌজদারী কর্ম্মচারিগণের তাঁবুর জীবনের সহিত, শতাব্দী হইতে প্রতিষ্ঠিত কুটীরের কোন সামাজিক সম্পর্ক না থাকাতে এবং পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার সংশোধনের প্রণালী কিম্বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহিত জাতীয় আদর্শমুখী কর্ম্ম পরম্পরার সমান ধর্ম্মিত্বের অভাবে, কার্য্য ব্যর্থ হইতেছে।

এই সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই ব্যক্তিগত কার্য্য-ক্ষিপ্ত রক্ততরঙ্গ জাতির মর্ম্মে পৌঁছিতেছে না। এই জন্য ধর্ম্ম-ইথরের তরঙ্গ প্রেরণে যে জাতি শিহরিয়া উঠে, সারা বৎসর-ব্যাপী বায়ব-তরঙ্গের ধাক্কায় তাহা সাড়া দেয় না।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অম্লান-বদনে ঋণ-জর্জ্জরিত হইয়াও যে জাতি জন্মোৎসবে, পরিণয়-ব্যাপারে, শ্রাদ্ধাদি পিতৃকৃত্যে এবং প্রতি বাৎসরিক পূজা, ব্রত প্রভৃতির জন্য অর্থব্যয় করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করে, সামাজিক এবং ধর্ম্ম-সম্পৃক্ত কার্য্যের জন্য

এই শ্রেণীর চাঁদা দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও আনন্দ অনুভব করে;—তাহার নিকট একবার বই দুইবার পোলিটিক্যাল্ চাঁদার জন্য গেলে রিক্তহস্তে ফিরিতে হয়।

পল্লবগ্রাহীরা এই জাতির মাঝে "স্যাক্রিফাইস্" নাই বলিয়া এই জন্য নিন্দাও করে—অথচ এই জাতিটাই বাস্তবিক ভগবান কর্ত্তৃক যেন ত্যাগের জন্যই সৃষ্ট।

বস্তুতঃ ভারতের যেই অন্তররন্ধ্রপথে বেগবতী অনন্তস্রোতময়ী ভাববন্যা প্রবাহিত হইতেছে, সেই তরঙ্গ-প্রবাহে যাবতীয় কর্ম্ম-তটিনী-কূলের সংযোগবিধান করিতে হইবে, তবেই সিন্ধু-সঙ্গমাকুল মহানদের ন্যায় দুর্জ্জয় গৌরবে আধুনিক ভারত নবযুগের নবমুকুট জগতের দুর্ব্বল কম্পিত কর হইতে আহরণ করিতে সক্ষম হইবে। ভারত স্বকীয় পথে অজেয়, অধৃষ্য, অমর।

সাময়িক কোলাহলে উত্থিত ধূলি-পটলের মাঝে সেই পথের ছায়া যেন ক্ষণে ক্ষণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

খাঁটি পাশ্চাত্য ছাঁদে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ভারতে সম্ভব নহে—যদি তাহা হয়, তবেও তাহা বড় সুখের হইবে না। তাহাতে আমরা চরিত্রের যতটা মর্য্যাদা ও কৌলীন্য হারাইব, রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য তাহার বিনিময়ে কিছুই নহে। অনন্ত জীবনপথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা উপায় মাত্র, লক্ষ্য নহে। সে উপায় প্রধান বা শ্রেষ্ঠ উপায়ও নহে—তাহা একটা নিম্নস্তরের সোপান—কিন্তু তবুও তাহা কিছুতেই অবহেলার বিষয় নহে।

এক শ্রেণীর প্রচারকদের মতে স্বাধীনতা লাভ করিতে, সাধারণের ন্যায় এবং ধর্ম্মের অবতার হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু স্বাধীনতা যেখানে সম্প্রতি বিচরণ করিতেছে, যেখানে ন্যায় এবং ধর্ম্ম অনেক সময় খুঁজিয়া পাওয়াই দুষ্কর। মধুকরবৃত্তি সঞ্চয় ইহার প্রাপ্তির পক্ষে সর্ব্ব সহজ পথ, কিন্তু যে মানব-সম্প্রদায় সংস্কার এবং শিক্ষা দ্বারা ধর্ম্ম ও নীতির অমলিন পথে ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে, কিম্বা যাহার পরিবারপুঞ্জ সমাজ এবং রাষ্ট্র ধর্ম্মমূলক ব্যবস্থা দ্বারা সাময়িক এবং সনাতন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গ্রথিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে মধুকর-বৃত্তিতে সজ্জিত হওয়া সম্ভবও নহে, কিম্বা উচিতও নহে। সে জাতি সহজেই দুর্নীতির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে না। লৌকিক জীবনেও সার্ব্বভৌমিক এবং সার্ব্বজনীন মঙ্গল একদিকে এবং জাতীয়, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মঙ্গল অন্যদিকে—এই উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে।

এই সামঞ্জস্য উপলব্ধি কেবল ভারতের পক্ষে সম্ভব—কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিশ্বাসীরা মনে করে, এই সামঞ্জস্য বিধানের ন্যায়দণ্ড বিধাতা ভারতের হস্তেই দিয়াছেন। চতুর্সহস্র বৎসরের নানাধর্ম্ম ও নীতিবাদের পারস্পরিক সংঘর্ষে ভারতবর্ষই কেবল পরস্পর বিরোধীর কর্ম্মকথা উপলব্ধি করিয়াছে।

উপরোক্ত অনুমান যে অমূলক নহে, তাহা বর্ত্তমান যুগের ত্যাগী দেশ-প্রেমিকগণের নিবিড় ধর্ম্মপ্রাণতা, কর্ম্মে গীতোক্ত স্বার্থমুক্ত অনাসক্তি, চিত্তবৃত্তির অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য, দুঃখ-ক্লেশের প্রতি উদার ঔদাস্য প্রমাণ করিতেছে। ইহারা শ্বেতভৌমিক কালচারের ভারতে নব-রোপিত ফল নহে। ইহাদের মনের ইতিহাস খুঁজিতে গেলে যুগান্ত অতীতের অক্ষয় সূত্রের গ্রন্থি উপলব্ধি হইবে।

পোলিটিক্যাল ব্যাপার চর্চ্চা ইংরাজ-শাসিত ভারতেরও প্রধান ঘটনা নহে। ভারতের

স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ গত শত বৎসরেও আমরা উত্তরোত্তর বাঙ্গালাদেশে এবং অন্যত্র ধর্ম্ম-বিপ্লবই দেখিতে পাই। তাহা আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে নাই। তবে তাহা যে বিশেষভাবে বর্ত্তমান ভারতকে পারস্পরিক প্রতিঘাতে সচকিত করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যাইতে পারে, সিপাহী বিদ্রোহও ধর্ম্মবিপ্লব, কেননা, তাহা যুগাগত আচারে হস্তক্ষেপ-সম্পৃক্ত আশঙ্কা হইতে সূত্রপাত হইয়াছিল।

ভারতের বর্ত্তমান এবং প্রাচীন আন্দোলনের মাঝেও পার্থক্যটী অনুধাবনার বিষয়। কংগ্রেস-পলিটিক্সের কোন ধর্ম্মের দিক্ ঠিক ছিল না, তাহা হইতে দূরে থাকাই ইহার বিশেষত্ব—অবশ্য ইউরোপীয় আদর্শে। কিন্তু বর্ত্তমানের পলিটিক্সই সম্প্রতি ধর্ম্মের একটা দিক্ বলিয়া অনুভূত হইতেছে—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে বা সাময়িক ধর্ম্মও নহে—যে ধর্ম্ম সমগ্র কর্ম্মপরম্পরাকে সাযুজ্য দান করিয়াছে।

যাহারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা কর্ম্ম-ব্যূহের চরমলক্ষ্য মনে করে, তাহারা কার্য্যমাত্রই ঐ আলোকের আনুকূল্য হইতেই সম্পাদন করিবে। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা যাত্রা করিয়াছি; তাঁহাকে পাইতেই আমরা ছুটিয়াছি। উপনিষদ্‌কার বলিয়াছেন—

'তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্যবিদ্ধি।

তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে। তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে।

"ভারতবর্ষ মনে করে, এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় জগতের পত্রে পত্রে, পল্লবে পল্লবে মানুষ যাহা করিতেছে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতসারে সকলই তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার জন্য। আমাদের শিক্ষা দীক্ষা রাষ্ট্রধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিতকলা, সমগ্রের ভিতর দিয়া তাঁহার সত্যস্বরূপকে, মঙ্গলস্বরূপকে, সুন্দরস্বরূপকে দিনে দিনে পলে পলে মানুষের মনোময়ীশক্তি গঠন করিয়া তুলিতেছে। সমাজধর্ম্মে, রাষ্ট্রধর্ম্মে, পারিবারিকধর্ম্মে যাহা অসত্য, অসুন্দর, অমঙ্গল, তাহা পরিহার করিতে হইবে। তবেই ব্রহ্মের উপলব্ধি সম্ভব হইবে। ব্যক্তিতে, পরিবারে ও সমাজে—ব্রহ্মকে অর্থাৎ সত্য, সুন্দর, এবং মঙ্গলের অখণ্ড এবং অবিচ্ছিন্ন আদর্শকে খর্ব্ব করিব না। রাষ্ট্রতন্ত্রে যাহা দুর্ব্বল, অসত্য, অসুন্দর রহিয়াছে, যাহা ভগবানের দৈবীভাব খর্ব্ব করিয়াছে,তাহা আমাদিগকে আঘাত করে। তাহার মাঙ্গল্যবিধান প্রত্যেকের করতলগত। যতদিন তাহা হইতেছে না, ততদিন ধর্ম্মবিধান হইল না।

ভারতের যাবতীয় চেষ্টার ইহাই মর্ম্মকথা। বহুমুখী সামাজিক দৈন্য দূর করা এবং পরস্পরের মাঝে আলোচনায় এবং আন্দোলনে এই দৈন্যের বিচার করা—ইহাই মূল কথা। কি করিয়া সমাজশরীরের সুন্দর স্বরূপ গঠন করিয়া তুলিতে হইবে, কি করিয়া কর্ম্মযজ্ঞে মঙ্গলকে বরণ করিতে হইবে, কি করিয়া অন্নকষ্ট, দুর্ব্বলতা, ভীরুতা দূর করিয়া সমাজকে উহার সনাতন সিংহাসন অর্পিত হইবে, আজ সেই চিন্তাই উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। এই কার্য্যে দেশকর্ণে গীতাকারের সবল উৎসাহ-বাণী অপূর্ব্ব আলাপে ঝঙ্কৃত হইতেছে:—

"মাক্লৈব্যং গচ্ছকৌন্তেয় নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠপরন্তপ॥"

হে পার্থ, কাতরভাবাপন্ন হইও না, হে পরন্তপ, হৃদয়ের ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া উত্থান কর। এই পথে না গেলে:—

"ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যাম।" যদি না করা যায়, তবে স্বধর্ম্ম এবং স্বকীর্ত্তি পরিত্যাগের জন্য পাপের ভাগী হইতে হইবে। ভগবানের এই উপাসনায় "সুখে দুঃখে সমে-কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ" অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদের সম্বল কি? শক্তি কি? এই প্রশ্নের উত্তর ভারতবর্ষ যত সহজে এবং সরল-ভাবে দিয়াছে, এমন আর কেহ নহে। ভারত-বর্ষ মানবীয় আত্মার ক্ষমতার পরিধি স্বীকার করেন না। কেনোপনিষদুক্ত অগ্নি যাহা হইতে দাহিকা শক্তি লাভ করিয়াছিল, বায়ু গ্রাহিকা শক্তি লাভ করিয়াছিল, মানবও সেই শক্তির অধিকারী। অবিদ্যার আবরণে তাহাকে আমরা উপলব্ধি করিতেছি না। পুরাণোক্ত শিলাময়ী অহল্যার ন্যায় ভারতের মনোবৃত্তির উপর বিস্মৃতির যবনিকা স্খলিত হইয়াছে। সেই পাদস্পর্শ প্রয়োজন, যাহা পুনর্ব্বার মৃত উপলখণ্ডে উষ্ণ শোণিত ছুটাইবে—সেই অঙ্গুরিয়ক প্রয়োজন, যাহার দর্শনে অভিজ্ঞান জন্মিবে, সেই যাদুমন্ত্র প্রয়োজন, যাহার মৃদু প্রবেশে ডাকিনীর মায়াপাশ কাটিয়া যাইবে। কর্ম্মের ভিতর দিয়া যাঁহারা এই শক্তি উপ-লব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য,—জ্ঞানের ভিতর দিয়া যাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য; প্রেমের ভিতর দিয়া যাঁহারা হৃৎপিণ্ডে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাও ধন্য। এই শক্তির অধিকারীরা বিস্মৃত জগতের সম্মুখে বলিয়াছেন:—আত্মা অন্যকে হনন করে, যিনি এরূপ ভাবেন এবং অন্যের দ্বারা আত্মা হত হয়, ইহা যাহার বিশ্বাস, তাঁহারা:—

"উভৌ তৌ ন বিজানিতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।"

এতদিন পরে যেন আবার এই বাণী নূতন শরীর পরিগ্রহ করিয়া উঠিতেছে—ঈজিপ্তের সযত্নরক্ষিত সহস্রবর্ষের মসী শরীর আবার যেন রাজদণ্ড ধারণ করিতে জাগ্রত হইতেছে। গীতার রহস্যময় পুরুষ আজ যেন প্রতিছন্দে জাগ্রত দেবতার ন্যায় স্বপ্র-কাশ হইতেছে।*

বেদান্তোক্ত অদ্বৈতবাদ ধীরে ধীরে কয়েকটী মহাপুরুষের অপূর্ব্ব জীবন-চর্চ্চার বিস্ময়-জনক শক্তি লইয়া ভারতে আবার অগ্রসর হই-তেছে—ভারতের ভবিষ্যৎ ইহার সহিত নানাভাবে যুক্ত না হইয়া পারে না। ইহার ভবিষ্যৎ বিরাট। পশ্চিম দেশীয় ধর্ম্মযোগ-বিহীন, ইতর, নগ্ন, রাষ্ট্রীয় উত্থান যে ইহাকে আশ্রয় করিয়া উত্থিত হইবে না—বলা সাহ-সিকতা। এই ক্ষেত্রে গীতাগ্রন্থ ভারতের চিত্তকে অপূর্ব্ব আশ্রয় এবং শান্তি দিবে। শিখজাতি যেমন ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া গঠিত হইয়াছিল, ভারতের নৈসর্গিক প্রকৃতি অনুসারে ধর্ম্মপ্রবাহ লইয়াই ভারত আবার জাগ্রত হইবে। অবশ্য শিখজাতির বর্ব্বরতার দিকটা সর্ব্বথা ত্যাজ্য—তাহাদের অধঃপত-নের কারণও এই সংযমের অভাব বই আর কিছুই নহে—শুধু গঠন প্রণালীর দিকটার বিষয় বলিতেছি—তাহা ধর্ম্মমূলক—তাহা ঠিক ভারতবর্ষীয়। প্রাথমিক শিখগণের ত্যাগ এবং নৈতিভাবক সঙ্ঘর্ষ, মহম্মদ বা খ্রীষ্টের অনুচরগণের অনুভূত অত্যাচারের মাঝে স্থৈর্য্যের সহিত তুলনীয়। জগতের কল্যাণের জন্য—পূর্ব্বে ও পশ্চিমের সামঞ্জস্যের জন্য, সম্মিলনের জন্য, বলা যাইতে পারে, স্বাতন্ত্র্যের জন্য—এই ভাবে অনুপ্রাণিত

* বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম জেলা সমিতির অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে বিষয়োপযোগী বোধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

ভারতবর্ষ যাবতীয় বাধাকে তুচ্ছজ্ঞান করিবে। এই চরম মিলনের পূর্ব্বে সঙ্ঘর্ষ অপরিহার্য্য হইলে তাহা হইতে আত্মসংহরণের কোন প্রয়োজন নাই। পরস্পরের অভিমুখে ধাবমান তড়িত-পুষ্ট মেঘখণ্ডদ্বয়ের সান্নিধ্যে বজ্র-সঞ্চার অস্বাভাবিক নহে—কর্ম্মের দ্বারা এই আসক্তিও খর্ব্ব হওয়া প্রয়োজন। সমগ্রের দিক্ হইতে দ্রষ্টা কখনও অংশের বিচার করিয়া ক্রন্দন করিবে না। বরং চরম-লক্ষ্যের পথ সঙ্ঘাতের ভিতর দিয়া বিস্তৃত, মনে করিয়া আশ্বস্ত হইবে। তবে কার্য্য-পরম্পরাকে স্বার্থমুক্ত অনাসক্তির মর্য্যাদা দান করিতে হইবে,পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

তবে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলনকার্য্যে বর্ব্বর সংঘর্ষ কেহই কামনা করে না। তাহা অপরিহার্য্য নহে—ইহাই শান্তিবাদীদের আশার কথা। ভারতবর্ষ অনাসক্ত-বৈরাগ্যের দ্বারা প্রতিপক্ষের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইতে পারে। গ্রীক্ মোগল-দের মাঝে ইহা সম্ভব হইয়াছিল। আধুনিক নেতিভাবক সংঘর্ষ (Passive resistance) এই নৈতিক বলদ্বারা পুষ্ট হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এই পথই অবলম্বনীয়—ইহাতে সংযম ও শিক্ষার নানা উপাদান আছে। তদ্দ্বারা সঙ্ঘের প্রকৃতি গঠন প্রয়োজন—নচেৎ ব্যক্তিগত প্রলোভন এবং অসংযম ত্যাগ কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে।”

এই শেষোক্ত বিষয়টী সম্বন্ধে নানা আলোচনার বিষয় আছে—কিন্তু তাহা এই প্রবন্ধে বিচার্য্য নহে। শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

প্রাচীন ভারত ও আগ্নেয়াস্ত্র।

স্কুল কলেজে প্রচলিত ‘ভারত ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা সাধারণতঃ জানিতে পারি যে, ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট বাবর পাণি-পথের যুদ্ধে সর্ব্ব প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেন; কিন্তু প্রাচ্য-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, উহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় আর্য্যগণ বারুদ বা‘আগ্নেয়াস্ত্রে’র সাহায্যে যুদ্ধাদি করিতেন; ‘Sir Henry Eilliot’ বহু গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি পূর্ব্ব সময় হইতেই ভারতীয় আর্য্যগণ বারুদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এবং মহা-ভারত-রামায়ণ-বর্ণিত সময়ে এদেশে আগ্নেয়া-স্ত্রের বহুল ব্যবহার ছিল।

কোবিয়া ইজুসা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ১৪৯৮ খ্রীঃ অব্দে পর্টুগীজগণ এদেশে আসিবার পূর্ব্বে ভারতে বন্দুকের সাধারণ ব্যবহার ছিল, (Sriggs Vol. II, P 432)

সেই সময়কার পর্টুগীজ ভ্রমণকারীদের দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়, তাঁহারা বলেন, “ভারতবাসীরা বন্দুক ব্যবহারে অত্যন্ত সুপটু।”

প্রাচ্য-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ক্যানিংহাম বলেন, কাশ্মীরের মন্দির সম্রাট শিকন্দর কর্ত্তৃক বারুদের সাহায্যে ধ্বংস হইয়াছিল; এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, সুতরাং Sir Henry Elliot, ক্যানিংহাম প্রভৃতি প্রাচ্য তত্ত্ববিদ্‌দিগের সিদ্ধান্তে জানা যায়, মুসলমানগণ ভারতে আসিয়াছেন অবধি এদেশে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এদেশে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার

ছিল কি না, আমরা তৎসম্বন্ধেও সংক্ষেপে দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।—

বারুদের ইতিহাস বর্ণন সঙ্গে Major Wordell লিখিয়াছেন, (Encyclopedia Britanica) Helhad অনুবাদিত হিন্দুদিগের শাস্ত্র গ্রন্থে বারুদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়, তথায় দৃষ্ট হয়, শাসনকর্ত্তা প্রতারণাময় যন্ত্রের সাহায্যে বিষাক্ত অস্ত্র লইয়া, কিম্বা কামান, বন্দুক বা অন্য কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবে না। Helhad সাহেব ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন—"চীন দেশে ও হিন্দুস্থানে বহু পূর্ব্ব হইতেই বারুদের ব্যবহার ছিল।" তার পর তিনি হিন্দুর পুরাণ বর্ণিত শতাগ্নী অস্ত্রের গুণ বিবৃত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে বহু পুরাকাল হইতেই আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল।

গ্রীকদিগের লেখনী হইতেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের সহিত যে সকল গ্রীক এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে থেমিসটীয়াস্ নামক জনৈক পণ্ডিত বলেন, "ব্রাহ্মণগণ দূর হইতে বিদ্যুত ও বজ্রের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।" বোধ হয়, ইহা কাহাকে বুঝাইতে হইবে না যে, বিদ্যুৎ ও বজ্র আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ ও আলোকমালা। টীসিয়াস, ইলিয়ান, ফাইলষ্ট্রেটস্ প্রভৃতি এক প্রকার আশ্চর্য্য আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, এ অস্ত্র বারুদের সাহায্যে ব্যবহৃত হইত না; 'Wilson' প্রভৃতির মতে কুম্ভীরের তৈল হইতে কোন রাসায়নিক সংযোগে উক্ত লেখকগণ-বর্ণিত অগ্নির উৎপত্তি হইত। টিসিয়াস বলেন,—সিন্ধুতীরে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, ইহা মৃৎপাত্রে বাধিয়া কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করিলে ভয়ঙ্কর অনলের সৃষ্টি হয়। ভারতবাসীরা ইহা কেবল রাজাজ্ঞায় রাজার জন্যই প্রস্তুত করে। ইলিয়ট বলেন, এই তৈল পূরিত অস্ত্রের এত ক্ষমতা যে, ইহাতে পশু পক্ষী মানুষ সকলই ধ্বংস হয়, ভারতীয় নরপতিগণ ইহা দ্বারা নগর জয় করেন।

গ্রীকদিগের এই বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহারা হিন্দুদের সমরকৌশলে নিজেদের কোন অজ্ঞাত শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত প্রাচীন পারস্য ও আরব্য-গ্রন্থ বর্ণিত এতদ্বিষয়ক বর্ণনার সামঞ্জস্য দেখিলে তাহাদের (গ্রীকদের) লিখিত বৃত্তান্ত অসত্য বলিবার কোন্ কারণ থাকে না, ফাইলষ্ট্রেটস্ বলেন, সিকন্দর যদ্যপি হাইপাসিস্ (Hyphasis) উত্তীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে কোন মতেই এই সকল মহাবীরদের প্রাচীর-বেষ্টিত বাসস্থান জয় করিতে পারিতেন না। শত্রু আসিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলে তাহারা ঝড় ও বজ্রের সাহায্যে তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন।

'মাতোয়াম লিন' (Ma-Lwam-Lin) নামক চৈনিক গ্রন্থে ভারতের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়, 'কাষ্ঠবুর' ও "ঘূর্ণায়মান ঘটক" ভারতবাসীরা সমরকালে ব্যবহার করিতেন। এই ঘূর্ণায়মান ঘটকের কথা গ্রীক ও আরব্য লেখকগণও উল্লেখ করিয়াছেন। মজমলুৎ তাবিখী নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণেরা হালকা একটী হাতী নির্ম্মাণ করিয়া সৈন্য সমূহের পশ্চাতে রাখিতে পরামর্শ দিতেন এবং যখন কাশ্মীর-রাজসেনা নিকটবর্ত্তী হইত, তখন সেই হস্তী বিদীর্ণ হইয়া যাইত এবং তাহার শরীরাভ্যন্তর হইতে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া সৈন্য শ্রেণীর

ব্যবহার করিত। সুতরাং এই সকল বৈদেশিকদের বর্ণনাও প্রাচ্য তত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হিন্দুগণ বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ইচ্ছানুসারে আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুত ও তাহার ব্যবহার করিতে জানিতেন। এক্ষণে আমরা জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে এ সম্বন্ধে দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বেদে সূর্ম্মিনামক এক প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, অসুরগণ দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে ইহা ব্যবহার করিত; বর্ত্তমানকার অভিধানে সূর্ম্মি শব্দে লৌহ প্রতিমা বুঝায়; কিন্তু বৈদিক সময়ের অভিধানে উহা লৌহ 'স্থূণা' বা 'চোঙ্গা' অর্থে ব্যবহৃত। সায়ন ভাষ্যানুসারে এই সূর্ম্মী ছিদ্র-বিশিষ্ট লৌহময়ী 'স্থূণা'; ইহার ভিতরে জ্বলন্ত অনল, যাহা নির্গত হয়, তাহাও অগ্নিময়,—

"এষা বৈ সূর্ম্মী কর্ণকা চ্যেতয়াহস্মৈব দেবা অসুরানাং সতত র্হাং স্তৃং হন্তি যদেতয়া সমিধ মাদধাতি বজ্রমেবৈঃ তচ্ছতীক্ষ্ণং যজ্জমান ভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি।"

তৈত্তরীয় সংহিতা ১।৫।৭।৬

"জ্বলন্ত লৌহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী। সাচছিদ্রবতী। অতএব জ্বলন্তীত্যর্থঃ।" সায়ন।

অথর্ব্ব বেদেও সীসক দ্বারা শত্রু বিনাশের উল্লেখ পাওয়া যায়;—

"সীসয়া ধ্যাহ বরুণঃ সীসযাগ্নি রূপাবতী।
সীসং স ইন্দ্র প্রায়চ্ছৎ তদঙ্গ যাতুচাতনম্॥
যদি নোগাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পুরুষং।
ত্বং ত্বা সীসেন বিধ্যাম যথা নোসি অধিরহা॥

এতদ্বারা বুঝা গেল, শত শত্রু-বিনাশক ব্রজ ও অগ্নিসমন্বিত সূর্ম্মী বর্ত্তমানকার কামান ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৈদিককালে ছাড়িয়া দিলে পৌরাণিক কালেও আগ্নেয়াস্ত্রের বহুলতা দৃষ্ট হয়। রামায়ণ মহাভারতে উহার যথেষ্ট বর্ণনা আছে। শুক্রনীতির ৪র্থ অধ্যায়ে বৃহন্নালিক অস্ত্রের উল্লেখ আছে, তাহার আকৃতি এইরূপ,—

—যথাযথা তু ত্বক সারং যথাস্থূলবিলান্তরং
যথা দীর্ঘং বৃহদ্‌গোলং দূরভেদী তথা তথা।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুক্তং বিজয় প্রদং॥

অর্থাৎ নালীকার ত্বক যত কঠিন, আয়তন যত বৃহৎ, গর্ভ যত স্থূল, গোলা যতই বড় হইবে, উহা ততই দূরভেদী হইবে। উহা শকটাদি দ্বারা বাহিত হয় এবং উপযুক্তরূপ স্থাপিত হইলে যুদ্ধে বিজয়লাভ ঘটে।

অতঃপর শুক্রাচার্য্য গোলাগুলি প্রস্তুত সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন;—

গোলো লৌহময়গর্ভ গুটিকঃ কেবলোঽপিবা
সীসস্য লঘনালর্থে হ্যন্যধাতু ভবোপি বা।

এবম্বিধ গোলাগুলি-সমন্বিত বৃহন্নালিক অস্ত্রকে কামান ব্যতীত আমরা আর কি বলিতে পারি।

নানাবিধ প্রমাণ উত্থাপন করিয়া সার হেনরি ইলিয়ট স্থির করিয়াছেন, "বারুদের উপাদান যবক্ষারজান ভারতবর্ষে অত্যধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, সুতরাং অতি প্রাচীন সময়েও বারুদ হিন্দুগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।"

যাহা হউক, বোধ হয়, ইহা হইতেই প্রমাণিত হইল যে, অতি প্রাচীন সময় হইতেই ভারতীয় আর্য্যগণ ইচ্ছা মত আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুত ও তাহার ব্যবহার করিতে জানিতেন এবং করিতেন। প্রয়োজন হইলে এ সম্বন্ধে আমরা ভূরি ভূরি প্রমাণ দর্শাইতে পারিব।

শ্রীরমেশচন্দ্র সাহিত্য-সরস্বতী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বুঝিনা কেন?

চাহিনা কল্যাণ, নাথ, নাহি অধিকার
করুণার দাওয়া করি তোমার দুয়ারে
দাঁড়াইতে জীবিতেশ! ন্যায় করুণার
সমন্বয় করি পিতঃ, যে সূক্ষ্ম বিচারে
পাতকীর ভাগ্যফল হ'তেছে ফলিত,
প্রতি পদ-চ্যুতি হেতু এ পিচ্ছিল পথে
যে কর্দ্দমে পরিলিপ্ত হইতেছি পিতঃ,
যে কণ্টকে ছিন্ন তনু, ওহে বিশ্বপতে,
সে কণ্টক সে কর্দ্দম তোমারি বিধানে
আমার পথের মাঝে জানি পরমেশ;
কিন্তু কেন দয়াময় এ সামান্য জ্ঞানে,
পারি না বুঝিতে হায়? ইতর বিশেষ
সম্পদে বিপদে বল কেন করি নাথ?
পারি না তোমার দান নিতে পেতে হাত!

শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষ।

আহ্বান।

[শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের প্রতি]

মধুর প্রভাতে, মধুর আলোকে,
আশার কাননে, প্রেমের বাগানে,
মম এ কবিতাকুঞ্জে,
যদিও এসেছ
কথা কি কয়েছ?
প্রেমের মালিকা, স্নেহের লতিকা।
কুসুম চুম্বন
সবই কি পেয়েছ?
তোমারই মাটী, তোমারই জমি,
তোমারই বায়ু; তোমারই ফল,
পুণ্য লাগি, জননিয়া, প্রভু,
করেন আকুল আহ্বান।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস।

সমগ্র বলের সাথে বিচারের ভাণে,
দুর্দ্দম্য শক্তিরে তুমি করিলে তাড়না
কোন্ দূর দেশে; বিতাড়িত, ক্ষুদ্র জ্ঞানে
তখনো তোমারে তারা করিছে মার্জ্জনা।

কূটচক্রী শত ভাই শকুনির সাথে
মন্ত্রণা করিলে সবে, হলো নির্ব্বাসন,
বঞ্চিত পৈতৃক রাজ্য অধিকার হতে,
তবু কি করেছে শির কভু উত্তোলন?

ন্যায় ধর্ম্ম তবুও ত ছিল অবিচল,
নীরবে মরমতলে শুধু ধূমায়িত
হতেছিল ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহিংসানল,
কবোষ্ণ নয়নবারি হইয়া সিঞ্চিত।

কে জানিত সেই শিখা উগ্রমূর্ত্তি ধরি,
ব্যাপি' সারা রসাতল, অকস্মাৎ কবে
কুরুক্ষেত্রে মহারোষে উঠিবে বিস্ফুরি,'
সে আগুনে এ ভারত ভস্মসাৎ হবে।

রাজ্যলোভে মত্ত হ'য়ে দলি পদতলে
সবটুকু মনুষ্যত্ব, গেছিলে ভুলিয়া
বিবেকের দৈববাণী, ধন-জন বলে
বুঝেছিলে রাজলক্ষ্মী রাখিবে বাঁধিয়া।

করাইলে ছল করি হলাহল পান,
বন্ধ করি জতুগৃহে দিছিলে আগুন,
তবু তারা মরিল না, পেয়েছিল প্রাণ,
তখনো করেনি হাতে তীর-ধনুগুণ।

মিথ্যা ও ছলনা দিয়ে কত দিন পারে
করিবারে নিরীহের 'পরে অত্যাচার;
যাহার গোধূলিসন্ধ্যা ঘনাইছে দ্বারে
যাহার পাপের বোঝা রূপ অপাকার।

একদিন অবশেষে বলে দুর্য্যোধন—
"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী"
অমনি কোষেতে অসি করে ঝন্ ঝন্,
অমনি রথের চক্র কাঁপে রিনি ঝিনি।

অমনি ভীমের হৃদে হইল স্পন্দন,
শিব মন্দিরের মাঝে হইল আরতি!
আকাশে উড়িল বেগে ধবল স্যন্দন,
অমনি গাইয়া গীতা আসিল সারথি।

যত শক্তি নিল হরি' অধর্ম্ম আসিয়া,
তত শক্তি দিল ধর্ম্ম বাহু মাঝে তার,
বাধা বিঘ্ন-অন্ধকার টুটিয়া নাশিয়া,
পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজি' উঠিল আবার।

কত বর্ষ পার তুমি রাখিবারে তথা?
জানিমে তাইতে তার সাধনা ফুরায়,
এক দিন এক পল দিবে স্বাধীনতা,
তাই তারি দিগ্বিজয়ে হইবে সহায়।

কেবা কঙ্ক, কে বল্লভ, কেবা বৃহন্নলা
শমী বৃক্ষে বেঁধে গেছে অস্ত্র শস্ত্র যত,
পশিছে বিরাটপুরে নত করি গলা
খণ্ড খণ্ড ভস্মাবৃত অনলের মত।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

স্বাগত। *

এস, এস, এস, স্বাগত! স্বাগত!
ভারতীর প্রিয় তনয়গণ।
আহ্বানিছে ওই গৌরীপুর বাজ,
বিনয়ে করিছে সম্ভাষণ।
তৃণ গর্ভ দিয়া বন্য কুসুমে
রচেছি অর্ঘ্য অক্ষত যুত।
করহ গ্রহণ, সবে নিজগুণে,
আমাদের পূজা করহ পূত।
ভারত-প্রসিদ্ধ পুরাণ-প্রসিদ্ধ,
ভগদত্ত প্রাগ্-জ্যোতিষরাজ।
ভয়ে বিহ্বল, ক্ষত্রিয়গণ,
সম্মুখ রণে পাইত লাজ।
আজ সুধীগণ, কোন্ দেশে আসি,
মিলিত হয়েছে জান কি তারে?
সেই ভগদত্ত, রাজ্য-অধিকৃত,
সেই ভূমি পুণ্য নদের তীরে।
হুয়েঙ্ সাঙ্, এই দেশে আসি,
ফল ফুলে ভরা অসংখ্য তরু,
দেখিয়া বিস্মিত, হয়েছিল পুনঃ,
দেখেছিল কত প্রাসাদ গুরু।
ভাস্কর বর্ম্মা, আছিল নৃপতি,
হর্ষদেব যাঁর আছিল সখা।
রাজা নীলাম্বর, উলঙ্গ কৃপাণে,
দেখা'ল যবন কলঙ্ক রেখা।
বীর শুক্লধ্বজ, এই ভূমি হ'তে,
যে বিজয় উচ্চ পতাকা রেখা,
উচ্চ গগনেতে, উড়াইয়াছিল,
ভয়ে বীরগণ দিত না দেখা।
জান ইতিহাসে বাঙ্গালা-বিজয়ী,
বক্তিয়ার আসি এদেশ হ'তে,
জীবনের দায়ে, ব্রহ্মপুত্র নদ,
সাঁতারি' পলায় সৈনিক সাথে।
এখানে শঙ্কর, এখানে মাধব,
উচ্চ ধর্ম্মগীত গাহিয়াছিল;
কত রাশি রাশি, সংস্কৃত গ্রন্থ,
এখানে পণ্ডিতে রচিয়াছিল।
এখানে কামাখ্যা, উমানন্দেশ্বর,
রয়েছে মাধব কেদার দেব।
বশিষ্ঠাশ্রম, ব্রহ্মপুত্র নদ,
পুনশ্চ নেহার শিবসাগর।
উত্তর বঙ্গের সহিত মিলিত
রয়েছে, রয়েছে আসাম দেশ।
বাণীর চরণে দেও পুষ্পাঞ্জলি,
পরস্পরে মিশি ছাড়িয়া দ্বেষ।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

---

* গৌরীপুরে আহূত বিগত উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

সুপণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুতে।

১

কি শুনিনু আজি হায় পণ্ডিত প্রবর
চন্দ্রকান্ত মহাশয় নাহি এ জগতে,
ছুটিয়াছে দেশব্যাপী শোকের লহর,
ভাসিছে ভারত, বঙ্গ অশ্রু-বারি-স্রোতে।

২

চন্দ্র তুল্য দীপ্তি যাঁর ব্যাপ্ত চরাচরে,
চন্দ্রকান্ত মণি তুল্য যাঁর উজ্জ্বলতা,
তিনি আজ ডুবাইয়া শোকের সাগরে
স্বদেশ বিদেশ হায়, নাহি স্বরে কথা,

৩

চলিলেন মৃত্যুপুরে, যাঁহাব কাবণ
প্রধান পণ্ডিতগণ মিলিয়া কাশীতে
মহতী সমিতি এক করিয়া গঠন,
করিয়াছেন শোক ব্যাপ্ত করুণ ভাষাতে।

৪

স্মরণ হইত সৃষ্টি যাঁর বক্তৃতায়,
যাঁর সম সুপণ্ডিত নাহি বঙ্গ-ভূমে,
কোথায় গেলেন তিনি মরি হায় হায়,
আবরিয়া বঙ্গভূমি অন্ধকার-ধূমে!

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা।

স্বর্গারোহণ উপলক্ষে।

সর্ব্বজন-বিদিত কর্ম্মবীর মহাত্মা, আমার স্নেহময় পিতা, কুমারখালির বিখ্যাত ডাক্তার, নবদ্বীপচন্দ্র পাল মহাশয়ের অকালে স্বর্গারোহণ উপলক্ষে নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিত হইয়াছে। তিনি শুধু আমাদেরই পিতা ছিলেন না এবং আমরাই শুধু তাঁহার সন্তান ছিলাম না; তিনি দেশের পিতা ছিলেন। আজ দেশবাসী সন্তানগণ তাঁহার শোকে মুহ্যমান। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলকেই তিনি সমভাবে স্নেহ করিতেন। শত্রুও যদি বিপদে পড়িয়া আসিত, তিনি প্রাণপণে তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। বিনা অর্থে সহস্র সহস্র দরিদ্রের চিকিৎসা করিতেন এবং নিজ অর্থব্যয়ে পথ্যাদি প্রদান করিতেন। নদীয়ার প্রতি গৃহেই তাঁহার খ্যাতি; রাজদ্বারে তাঁহার সম্মান; তিনি ২০ বৎসর যাবৎ কুমারখালির চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেশের মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর অনারারী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার সুবিচারগুণে জেলার মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরও সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মাতৃভক্ত কর্ম্মচারী এ সংসারে আর কয়টী আছে, জানি না। তাঁহার অসীম ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতাগুণে এই স্বদেশী আন্দোলনেও এদেশে পুলীশের অত্যাচার হয় নাই। পুলীশ কি এবং দাঙ্গাহাঙ্গামাই বা কি, তাহা তাঁহার দেশবাসী সন্তানগণ জানেন নাই। তাঁহার সেই প্রস্ফুটিত শতদল-সম সদা প্রফুল্ল আনন শোকে, দুঃখেও কেহ কখনও মলিন দেখে নাই, তিলার্দ্ধের তরেও সে মুখে চিন্তা কিম্বা ভীতি-চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই। ভয় কাহাকে বলে, তাহা জানিতেন না। জীবনে কাহাকেও ভয় করেন নাই। তিনি সত্যবাদী, উচিতবক্তা মহাপুরুষ ছিলেন। তাই জীবনের সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া, বেরি-বেরি রোগে, কলিকাতা ধামে, ১৩১৬ সালের ৮ই মাঘ, শুক্রবার, রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় "মা আমায় নাও" এই কথা বলিয়া, মাতৃভক্ত সন্তান সহাস্যবদনে মায়ের শান্তি-মাখা কোলে উঠিয়া চির শান্তি লাভ করিয়াছেন!

এসেছিল দেখ, কর্ম্মবীর এক,
জগৎ জননী আদেশে;
মাতৃভক্ত সে যে, মর্ত্ত্যভূমি মাঝে,
বহু সেবা কৈল স্বদেশে।
নদীয়ার চন্দ্র, নবদ্বীপ চন্দ্র,
নাম তেঁই তাঁর জগতে।
হিন্দু মুসলমান, মূর্খ কি বিদ্বান,
সবে সম, তাঁর কাছেতে।

ধনী কি নির্ধনী, গুণী কি নির্গুণী,
তুষিত সবারে স্নেহেতে,
তাঁর সুধাধার, স্নেহ-পারাবার,
পেয়েছে সকলই দীনেতে।
সংসার প্রাঙ্গণে, যুঝি প্রাণপণে,
উদ্ধারিয়া দেশবাসীরে,
পরের লাগিয়ে, নিস্বার্থ হৃদয়ে,
খেটে গেছে সে যে সংসারে।
যেজন বিপদে, তাঁহারি শ্রীপদে,
স্মরণ লয়েছে কাতরে,
তুষি স্নেহ দানে, আশ্বাস প্রদানে,
বলিয়াছে "ভয় কাহারে?
নির্ভয় অন্তরে, যাও গৃহে ফিরে,
আমি এর মাঝেতে।"
সেই স্নেহধন, পেয়ে দীন জন,
হরিষে গিয়াছে গৃহেতে,
শীর্ণ রোগীজনা, রোগের যাতনা,
সহিতে না পেরে কাঁদিয়ে;
বলিছে যে আর সহেনা এ ভার,
আছ কি শমন ভুলিয়ে!

হেন রোগীপাশে, দেবতার বেশে
দাঁড়িয়েছে গিয়ে যখনি;
তখনি যাতনা, কমি ষোল আনা,
ফিরে পেত রোগী জীবনী।
হেন মতে সে যে, কর্ম্মভূমি মাঝে,
আত্মদান করি কর্ম্মেতে।
শেষ হল কাজ, পরি বীর-সাজ,
গুণ গান তাঁর ক'বাতে!
'মা নাও বলিয়া,' মরত ছাড়িয়া;
উঠিলে মায়ের কোলেতে!
প্রিয় পুত্র ধনে, কোটি চুম্বদানে,
বুকে রেখে বুক জুড়াতে।
লইলা জননী যথা মন্দাকিনী
কুল্ কুল্ কুলু বহিছে।
যথা দেবগণ হরিষ বদন
সদাই আনন্দে ভাসিছে;
সেই দেব দেশে সেই বীর বেশে
রতন আসনে বসায়ে।
সুরবালাগণ কুসুম চন্দন
সে অঙ্গে দিতেছে সাজায়ে।

শ্রীমতী মাধবীলতা দাসী।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৭২। রামদাস গ্রন্থাবলী।—দ্বিতীয় ভাগ, ভারত-রহস্য, রত্ন-রহস্য ও বুদ্ধদেব। প্রকাশক শ্রীমণিমোহন সেন, মূল্য ২৲। স্বদেশী কাগজে পরিষ্কার ছাপা। স্বদেশী কাগজ বলিয়া কেহ যে ভ্রূকুঞ্চিত করিতে পারিবেন, সে সম্ভাবনা নাই।

রামদাস বাঙ্গালা ভাষার এক সময়ে স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন,—তিনি ধনীর সন্তান হইয়াও দীনা বাঙ্গালা ভাষার জন্য যাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, চিরদিন তাহা তদীয় জীবনের স্মারক-চিহ্নস্বরূপ প্রদীপ্ত থাকিবে। তাঁহার জীবন, বঙ্গোদ্ধারের জন্য বিধাতার অযাচিত দান। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার জয়। এদেশে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বড় অধিক হয় নাই—দুই চারি জনের মধ্যে রামদাসের স্থান, আমাদের বিবেচনায়, রাজেন্দ্রলালের পরেই চিহ্নিত।

রামদাস এদেশের অমর সন্তান। তাঁহার সুযোগ্য সন্তান বহুব্যয়ে পিতৃকীর্ত্তি বজায় রাখিতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। পিতৃপার্শে মণিমোহনও অমর হউন।

এই গভীর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের আর বিশেষ কি পরিচয় দিব—আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালা ভাষাভাষী সকলেই ইহা পড়িয়াছেন। এই গ্রন্থ সকল পুস্তকালয়ে সুরক্ষিত হউক।

১৩। কাদম্বরী। পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত গ্রন্থ অবলম্বনে শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ও শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংস্কৃত মূলানুসারী করিয়া সম্পাদিত। মূল্য ।৵০। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা সহিত। সংস্কৃত কাদম্বরী বাণভট্ট বিরচিত, পণ্ডিত তারাশঙ্কর বাঙ্গালা কাদম্বরী রচনা করেন। তারাশঙ্করের কাদম্বরী বাঙ্গালা ভাষার অতুল সম্পত্তি। বর্ত্তমান কাদম্বরী পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্জ্জিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং তারাশঙ্করের কাদম্বরী প্রাচীন বাঙ্গালার চির আদর্শ হইয়াই রহিল। এরূপ পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জনের কাহারও অধিকার আছে কিনা, জানি না। এইরূপ করায় বঙ্কিমের ধর্ম্মতত্ত্ব মাটী হইয়াছে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাস মাটী হইয়াছেন। মৌলিক গ্রন্থের এরূপ পরিবর্ত্তন মার্জ্জনীয় নয়। ভাষার ক্রমিক উন্নতি দেখাইতে হইলে, প্রাচীন লেখার আদর্শ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এরূপ পরিবর্জ্জন করিলে তাহার কি, ক্ষতি হয় না? কোন্ গ্রন্থকার চসার প্রভৃতির ভাষা পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধন করিতে সাহসী হয়? বর্ত্তমান লেখকগণ, দেশের হিতকামী ব্যক্তি, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা এরূপ পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জনকে মার্জ্জনার চক্ষে দেখিতে পারি না।

গ্রন্থখানি স্বদেশী কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা যারপর নাই আহ্লাদিত হইলাম।

১৪। আদর্শ-জীবনী। শ্রীমতী সরোজিনী দেবী প্রণীত, মূল্য ॥০। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সহিত। কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনারায়ণ বসু পর্য্যন্ত ১৬ জন সাহিত্য-সেবীর জীবনের আলেখ্য। সরল ভাষায় এরূপ সংক্ষিপ্তভাবে সুলিখিত মহাজনকাহিনী এদেশে আর প্রকাশিত হয় নাই। পুস্তকখানি বিদ্যালয়ে অধীত হইবার যোগ্য। এই পুস্তকখানি ঘরে ঘরে আদৃত হইলে আমরা বড়ই সুখী হইব। স্বদেশী কাগজ।

১৫। বীর-বালক। শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত। রামায়ণ অবলম্বনে লবকুশের কাহিনী অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রচনা নৈপুণ্যে এবং ভাষার পারিপাট্যে পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে। কিন্তু বিদেশী কাগজ॥ একটু নমুনা তুলিয়া দিলাম—

"জননী গো! দ্বার প্রান্তে নিরথ আসিয়া,
তোমার চরণ পদ্মে আনিয়াছি আজি
অর্জ্জিত গৌরব চিহ্ন। বীরত্বের গাথা
শুনি নিত্য রামায়ণে; আজি দেখাইব,
তোমার দুঃখের ধন লব কুশ দোঁহে
মহর্ষির শিক্ষা বলে কি রত্নে আজিকে
ভূষিত হ'য়েছে দেবি! দেখ মা দুঃখিনি!
ম্লান মুখে হাসি রশ্মি ফুটাও মা আজি!
আমাদের চির কাম্য প্রিয় পুরস্কার।
সিংহ শিশু সম মাগো! তব আশীর্ব্বাদে
জগতেরে দেখায়েছি সতীর সন্তান।"

আনন্দ আবেশে ছুটি আসে লব কুশ
দ্বারে রাখি তৃণ রজ্জু আবদ্ধ করিয়া,
বীরশ্রেষ্ঠ হনুমানে। আনন্দে তাঁদের

গদ্‌গদ কণ্ঠস্বর, রাঘব-বনিতা
আসিলা আনন্দচিত্তে পুত্রের সম্মুখে
কহিলা হাসিত মুখে,
"দীর্ঘ সারা দিন,
নাহি কিরে এক বিন্দু ক্ষুদ্র অবসর
আসিতে কুটীরে বৎস! অপরাহ্ন কালে?
একাকিনী গৃহে আমি, শুষ্ক বনফল
কাঁদি খেদে," (প্রদীপের স্তিমিত আলোকে
হেরিলা কোমল কায়ে অস্ত্র ক্ষত শত)
"একি দেখি প্রাণাধিক, কি খেলা খেলিয়া
অস্ত্র ক্ষত সর্ব্ব অঙ্গে রক্তধারা বহে!
হা অভাগ্য! কম কায়ে কোন্ সে নিঠুর
আঘাতিল অস্ত্র, আহা! শিরীষ কুসুম
কে দিল কণ্টকাঘাতে বিদারিত করি?
অন্ধের নয়ন তোরা বার্দ্ধক্যে সম্বল,
কেন দ্বন্দ্ব কর' কত রাজপুত্র সনে
ক্রীড়াচ্ছলে, বয়োজ্যেষ্ঠ সবে তোমাদের।"
অস্ফুট কাতর কণ্ঠে কে চাহে সলিল
দ্বারদেশ হ'তে? মাতা ছুটিলা বাহিরে
আধ অন্ধকার, আধ গোধূলি আলোকে
হেরিলা অর্দ্ধ চেতন, বদ্ধ অবয়ব
সুদৃঢ় লতা বন্ধনে পবন কুমার
চির প্রিয় ভক্ত তাঁর পুত্রাধিক চির।"

৭৬। প্রথম ভাগ সংস্কৃত শিক্ষাকৌমুদী। শ্রীপঞ্চানন কবিরত্ন প্রণীত, মূল্য ॥০। এই পুস্তকের টাইটেল পেজ ইংরাজীতে লিখিত হইল কেন, আমরা বুঝিলাম না। এক পুস্তকে দুই রকম কাগজ। এই পুস্তকের দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

৭৭। সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী বিরচিত, মূল্য ॥০। সুন্দর হৃদয়ের সুন্দর অভিব্যক্তি। সঙ্গীতগুলি শুধু গানের হিসাবে নয়, কবিত্বের হিসাবেও তাহার উচ্চস্থান লাভে অধিকারী। এরূপ বিশুদ্ধ সাত্বিকভাবপূর্ণ লেখা যত বাহির হয়, ততই দেশের মঙ্গল। লেখকের লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। স্বদেশী কাগজ।

৭৮। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিবৃতি। তত্ত্বনিধি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৸০। ৩০১ পৃষ্ঠার পুস্তকের মূল্য ৸০ মাত্র। ভাল কাগজের ভাল ছাপার এত বড় পুস্তকের মূল্য ৸০, অতি সুলভ। আখ্যাপত্র, গ্রন্থকারের বংশপরিচয়, উৎসর্গ, ভূমিকা, অনুক্রমণিকা, অভয় প্রার্থনা, উদ্বোধন, ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ, সৃষ্টিতত্ত্ব, আমাদের আদর্শ, দ্যাবা পৃথিবী, যাগযজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকারভেদ, অদ্বৈতবাদ, ঈশাবাস্যং, ভূলোক ঈশ্বর, তপস্যা, হিরণ্ময় কোষ, অধ্যাত্মযোগ, অমৃতসেতু, ব্রহ্মতীর্থ, তমসো জ্যোতি গমন, প্রিয়তম পরমেশ্বর, ব্রহ্মচক্র, ব্রহ্মলোক, ধর্ম্মপথ, শান্তিনিকেতন, প্রার্থনা, ব্যাকুলতা, অধ্যাত্মধর্ম্ম, অনতোমাসদাময়, বিবেক ও বৈরাগ্য, প্রায়শ্চিত্ত, গৃহাবতার, অধ্যাত্মধর্ম্মের ভিত্তি, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার, উপধর্ম্ম, সংশয়াত্মা, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের অন্তরায়, ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য, কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, আনন্দাহ্বান ও জীবন সমর্পণ প্রভৃতি বিষয় আছে। পুস্তকখানির প্রতি পৃষ্ঠায় চিন্তাশীলতা স্বাধীনচিত্ততা এবং উদারভাব পরিচয় পাওয়া যায়। গভীর প্রবাহে নিমজ্জিত ব্যক্তির নিকট একরূপ স্বাধীনভাবাপন্ন-বিবৃতি কখনও প্রত্যাশা করা যায় না। এরূপ ধর্ম্মভাবপূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার গৌরব। এ গ্রন্থ চিন্তাশীল সুধীসমাজে বিশেষরূপ প্রাদৃত হইবে, আমরা আশা করি।

ভাগলপুর-সাহিত্য-সম্মিলন।

বিগতবর্ষে রাজসাহীতে একাকী গিয়াছিলাম। এবার তিনজন সহযাত্রী সমভিব্যাহারে ২৯শে মাঘ, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৬টার সময় গৌহাটি হইতে রওয়ানা হইলাম। পথে প্রায় দশবার ট্রেণ ও খেয়ার জাহাজে উঠানামা করিয়া ৩০শে মাঘ, শনিবার, রাত্রি প্রায় ৯টার সময় ভাগলপুর পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে আমাদের ক্ষুদ্র দলের অভ্যর্থনার্থ অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার মহোদয়-প্রমুখ অনেক বর্ষীয়ান পদস্থ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন—চন্দ্রশেখর বাবুর রাজপ্রাসাদোপম সুরম্য হর্ম্ম্যের দ্বিতলে আমরা উত্তর বঙ্গের আরও কতিপয় সাহিত্যিকগণের সঙ্গে স্থান লাভ করিলাম।

বঙ্গের বাহিরে যাঁহারা কৃতিত্বে ও চরিত্রে বাঙ্গালীর নাম সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, আমাদের আবাস-ভবনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। আমরা তাঁহার সবিনয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি—বাঙ্গালা ও বিহারী প্রভৃতির মুখে তাঁহার গুণাবলী পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলাম—ইদানীং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

পরদিন রবিবার প্রাতঃকালে পাটনার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, কলিকাতার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সমাগত অনেক প্রবীণ সাহিত্যিক মহাশয়দের সঙ্গে পরিচয় করিয়া ধন্য হইলাম। প্রায় ১০টার সময় চন্দ্রশেখর বাবুর বৈঠকখানায় সম্মিলন উপলক্ষে সমাগত সমস্ত সাহিত্যিক মহাত্মাদের সমাবেশ হইয়াছিল—সেই স্থানে অশেষ সম্মানস্পদ সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীমন্মহারাজ কাশিমবাজারাধিপতি বাহাদুর এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় প্রভৃতি যে সকল মহাত্মাগণের সঙ্গে রাজসাহীতে আলাপ হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে পুনশ্চ এই সম্মিলনোপলক্ষে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ফলতঃ সম্মিলনে যাওয়ার প্রধান ফলই সজ্জনগণ সহ আলাপ ও পরিচয়—এবার তাহার নিমিত্ত যতদূর সম্ভব প্রারম্ভ হইতেই প্রয়াস করিয়াছি। গতবার অপেক্ষা এইবার সাহিত্য সম্মিলনে অভ্যাগত সাহিত্যিক সংখ্যায় অনেক অধিক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বাসস্থান দূরে দূরে হওয়ায় আলাপ পরিচয়ে কিঞ্চিৎ অসুবিধা ঘটিয়াছিল। আবার সভামণ্ডপ প্রত্যেক স্থান হইতেই সুদূরবর্ত্তী হওয়াতে সাহিত্যিকগণের যাতায়াতেও অনেকটা অসুবিধা হইয়াছে।

এই প্রারম্ভিক সভায় এইবার একটী নূতন অনুষ্ঠান দেখিলাম। প্রত্যেক অভ্যাগত সাহিত্যিকের বুকে এক একটী কৃত্রিম পুষ্প পিন দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইটী বোধহয় কংগ্রেসের অনুকরণে "ডেলিগেট"-দের "বেজ"। অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণের এবং স্বেচ্ছাসেবক যুবকবৃন্দের বক্ষঃস্থলেও ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন শোভা পাইতেছিল। অভ্যাগতদিগকে এইরূপ চিহ্নিত করিবার রীতিটী ভালই; তবে একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশীয়

ধরণে "কাজটী করিলেই বড় সুন্দর হয়। একটী টেবিলের উপর পুষ্পমাল্য ও চন্দন থাকিবে, তৎসমীপে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দণ্ডায়মান থাকিবেন। প্রত্যেক অভ্যাগত সাহিত্যিককে টেবিলের নিকট আহ্বান করিয়া আনিয়া তিনি তাঁহার নাম ও স্বল্পাক্ষরে পরিচয় দিয়া তাঁহার ললাটে চন্দন ও গলদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করিবেন। গন্ধপুষ্প দ্বারা অভ্যাগতের অর্চ্চনা সনাতন রীতি, অথচ এই উপায়ে সাহিত্যিকগণ পরস্পরের নিকট অনায়াসে পরিচিত হইয়া যাইবেন। প্রারম্ভে এইরূপ সামান্য পরিচয়ে পশ্চাৎ গাঢ়তর ভাবে আলাপ পরিচয় হইবার পথ যে সুগম হইয়া পড়িবে, ইহা বলাই বাহুল্য। এই ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবকগণ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের সহায়তা করিবেন। ঘণ্টায় একশত জনের অভ্যর্থনা ও পরিচয় অনায়াসে হইতে পারে। এই পরিচয় প্রদান কার্য্য সম্বন্ধে একটু আপত্তি হইতে পারে যে, অনেক অভ্যাগত অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হইতে পারেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, অনিমন্ত্রিত হইয়া কেহই সম্মিলনে উপস্থিত হইবেন না। নিমন্ত্রণ করিবার কার্য্য অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিই করিয়া থাকেন। নিমন্ত্রিতের তালিকায় তাঁহাদের ঠিকানা প্রভৃতি পূর্ব্বাবধিই নোট করিয়া রাখিতে পারেন। যে সকল সাহিত্যিক সভা-সমিতি * প্রতিনিধি পাঠাইবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হন, তাঁহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের পরিচয় ত তাঁহারাই পত্র দ্বারা জানাইয়া দিবেন।

অপিচ, পরিচয় প্রদান ব্যাপার যে একটা বড় গুরুতর বিষয়, তাহাও বোধ হয় না। প্রথিতনামা ব্যক্তিগণের নাম গ্রহণেই পরিচয় হইয়া যাইবে—আবার অনেকেরই "ইনি অমুক সাহিত্য সমিতির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি—নাম অমুক" এই রূপেই পরিচয় হইয়া যাইবে। বাসস্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিবির নির্দ্দিষ্ট থাকিলে কে কোন্ স্থানে আছেন, তাহাও এই সঙ্গে বিজ্ঞাপিত হইতে পারে।

এই পরিচয়ের পর অভ্যাগত সাহিত্যিকবর্গের মধ্যে যদি কাহারও কাহারও ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ পরিচয়ের আবশ্যক হয়, তবে তাঁহারা অনায়াসে তাহা করিতে পারেন। কিন্তু অভ্যাগতগণ যাহাতে সকলে একত্র অবস্থান করিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করিতে পারিলে বড় ভাল হয়। গৌরীপুরের রাজা বাহাদুর তাদৃশ ব্যবস্থা করিয়া উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্যিকবর্গের অনেক উপকার সাধন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ভাগলপুরে বোধহয় সেইরূপ স্থানের অভাব বশতঃ একত্র স্থান ঘটিতে পারে নাই—ইহাতে অভ্যর্থনাকারক ভদ্রলোকদেরও অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছে।

রবিবার অপরাহ্ণে তিনটার সময় ভাগলপুরস্থ সাধারণ পুস্তকালয়ের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপে সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হইল। মাঙ্গল্য সঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক সম্ভাষণ পত্র পঠিত হইল। তৎপর যথারীতি প্রস্তাবের পর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া দেশ-গৌরব শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র

* সাহিত্যসম্মিলনে কেবল সাহিত্যিক সভা-সমিতিরই প্রতিনিধি আহূত হইবেন, এমন নহে—বাঙ্গালা সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকা সমূহের প্রতিনিধিগণেরও আমন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। ইহা নাকি যথেষ্ট ভাবে হইতেছে না বলিয়া একজন অতি প্রবীণ পত্রিকা-সম্পাদক আমাকে আক্ষেপ সহকারে বলিয়াছেন।

মহোদয় তদীয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। শ্রদ্ধাসহকারে সভাস্থ ব্যক্তিবৃন্দ তাহা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। অতঃপর বিগত বর্ষের রাজসাহী সম্মিলনের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহোদয় গতবর্ষের সম্মিলনের প্রস্তাব অনুসারে যে যে কাজ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটী বিবরণী প্রকাশ করিলেন। বড়ই সুখের বিষয় যে, বিগত সম্মিলনের অনুরোধে রাজসাহীর শিক্ষিত মহোদয়গণ যে সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের সম্পাদনকল্পে তাঁহারা যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সম্মিলনের নিয়মাবলীর মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি সভামধ্যে উপস্থাপিত করিলেন এবং সন্ধ্যার পর বিষয় নির্ব্বাচন কমিটিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইহারও আলোচনা হইবে, ইহা বিজ্ঞাপিত করিলেন। প্রথম দিনের অধিবেশন এইরূপ সমাপ্ত হইলে আমরা সভাস্থলের পশ্চাদ্ভাগে, সাধারণ পুস্তকালয়ের একটী প্রকোষ্ঠে সুসজ্জিত প্রদর্শনীর দ্রব্যগুলি দেখিবার জন্য গমন করিলাম। সাহিত্যিকবর্গের কৌতূহলোদ্দীপক অনেক জিনিস এই স্থানে সংগৃহীত হইয়াছিল। ফলতঃ এই সংগ্রহের জন্য ভাগলপুর সম্মিলনের উদ্যোক্তৃবর্গ যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, সময়াভাবে এই প্রদর্শনীর বস্তুজাত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। আমার ন্যায় অনেকেরই মনে এই ক্ষোভ উপজাত হইয়াছিল। যদি একদিন এই সকল জিনিস সভামণ্ডপের উন্মুক্ত স্থানে সজ্জীকৃত হইয়া সমগ্র সভামণ্ডলীর নিকট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক একে একে প্রদর্শিত হইতে পারিত, তবে কি সুখের বিষয় হইত। গৌরীপুরে, উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে ঐরূপ করিতে পারা গিয়াছিল। বক্তৃতা রচনা-পাঠ ইত্যাদি ব্যাপার কিছু কমাইতে পারিলে বোধ হয় ইহা সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে।

রবিবার সন্ধ্যার পর শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের আবাস-বাটিকায় বিষয়-নির্ব্বাচন-কমিটি উপলক্ষে প্রায় সমস্ত সাহিত্যিকবর্গ সমবেত হইলে, মহারাজা বাহাদুর ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকলের সহিত আলাপাদি করিয়া স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতার পরিচয় প্রদান করিলেন।

সকলে মিলিত হইবার পূর্ব্বে কথা প্রসঙ্গে জানা গেল যে, মহাকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় সেই স্থলেই সমাসীন রহিয়াছেন। আশ্চর্য্য! যে রবীন্দ্রনাথের রসগর্ভ কবিতার এবং গল্পের আস্বাদে বঙ্গীয় পাঠকসাধারণ বিহ্বল প্রায় হইয়া থাকে, তিনি চুপটি করিয়া বসিয়া আছেন! আমি ইতঃপূর্ব্বে তাঁহাকে কুত্রাপি দেখি নাই, কিন্তু কল্পনার তুলিকায় তাঁহার মহাজন-সুলভ স্মেরমুখযুক্ত এবং সুরসিক কবিজন-সুলভ প্রীতি-প্রফুল্ল-অধার সঞ্চার-নেত্র বিশিষ্ট যে এক মূর্ত্তি মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা মুহূর্ত্তে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ফলতঃ তাঁহাকে এরূপ গুরু-গম্ভীর দেখিব, ভাবি নাই, শুনিলাম তিনি অসুস্থ; বোধ হয়, ইহাই এই বিরস-গাম্ভীর্য্যের হেতু।

সভায় উপস্থিত করিবার জন্য যে কয়েকটী মন্তব্য নির্দ্ধারিত হইল, তাহার অধিকাংশই সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হইবে, জানিয়া সুখী হইলাম; কেন না ইহাতে বক্তৃতা-পর্ব্ব একটু হ্রস্ব হইবার

কথা। বিষয় বিশেষের আলোচনা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণে বোধ হইল যে, "সাহিত্য" ও "বসুমতীর" তেজস্বী সম্পাদক যে কেবল লেখনী বলে বলীয়ান্, তাহা নহে, তিনি ওজস্বী বক্তা রূপেও পরিগণিত হইবার অধিকারী। সম্মিলনের নিয়মাবলী পেশ হইলে, অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পরিচালনের ভার সাহিত্য-পরিষদের উপরই ন্যস্ত করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ সম্মিলনের এতদিন একটা স্থায়ী ভিত্তি ছিল না, "সম্মিলন" বলিলেই ব্যক্তিবিশেষের উপর দৃষ্টি পতিত হইত। এইরূপ ভাবে একটা সম্মিলন বহুকাল চলিতে পারে না। অতএব সাহিত্য-পরিষদ যে এই ভার গ্রহণ করিতেছেন, ইহা অতিশয় আনন্দের কথা। অনুধাবন করিয়া দেখিতে গেলে সম্মিলন যে সকল ব্যক্তির চেষ্টা ও যত্নে এতাবৎকাল পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, তাহারা সকলেই সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে দৃঢ়সম্বদ্ধ, এমন কি, সমবেত সাহিত্যিকবর্গের প্রায় সকলেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বা তদীয় শাখা প্রশাখার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত। এখন আশা হয়, এই সম্মিলন বর্ষে বর্ষে অব্যাহতভাবে থাকিবে—যদি দৈবাৎ কোনও বর্ষে মফঃস্বলে আহূত না হয়, তাহা হইলে সাহিত্যপরিষদ অনায়াসে কেন্দ্র-ভূমি কলিকাতায় সম্মিলনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

পরদিন সরস্বতী পূজা—ঐ দিন হিন্দু সাধারণ বিশেষতঃ যাঁহারা "লেখনী-পুস্তক" সঙ্গে সম্পর্কিত, লেখাপড়ার কাজ হইতে বিরত থাকেন; অন্ততঃ মধ্যাহ্নে পুষ্পাঞ্জলি দিবার পূর্ব্বে অপরাহ্নে পঠন বা লিখনের কার্য্য কদাপি করেন না। সম্মিলনে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু হইলেও, এই সনাতন রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় নাই। ফলতঃ, ঐ দিন অন্ততঃ অপরাহ্নে প্রবন্ধ পাঠাদি সভার কার্য্য বন্ধ রাখিয়া প্রদর্শনীর দ্রব্যজাত সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই শোভন হইত।

সোমবার দিবস পূর্ব্বাহ্নে ৮॥ টায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত কয়েকটী প্রস্তাব দ্বারা ভাগলপুরবাসিগণের উপর সাহিত্য-বিষয়ক উপকরণ সংগ্রহ-কল্পে ভারার্পণ করা হইল। তৎপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা ৺রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতিরক্ষার্থ সারস্বত-ভবন নির্ম্মাণের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় স্বীয় স্বভাবসুলভ সরসভাষায় উহার সমর্থন করিলেন; প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল। অতঃপর আরও কয়েকটী প্রস্তাব উপস্থাপিত, সমর্থিত ও গৃহীত হইলে পর বিজ্ঞানবিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ পাঠান্তে মধ্যাহ্ন কৃত্য নিমিত্ত সভাধিবেশন কিয়ৎসময়ের জন্য স্থগিত হইল।

অপরাহ্নে তিনটার পর আবার সম্মিলনের কার্য্য চলিতে লাগিল। এইবার ইতিহাস-বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ পাঠ হইল। প্রসিদ্ধ তিব্বত-পর্য্যটক রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি-আই-ই মহোদয় তাঁহার ভ্রমণ বিবরণ বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করেন এবং লাসানগরীর যে প্রকাণ্ড বাড়ীতে তিনি অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহার মানচিত্র এবং কতিপয় বৌদ্ধগ্রন্থ সভাস্থলে প্রদর্শন করেন।* সভা

* আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে 'বেঙ্গলি' প্রভৃতি পত্রে কিম্বা 'বসুমতী'তে সম্মিলনের যে কার্য্যবিবরণী প্রকা-

ভঙ্গের পর সাহিত্যিকবর্গের ফটো তোলা হইয়াছিল; কিন্তু তাড়াতাড়ি করাতে এবিষয়ে তেমন সুশৃঙ্খলাসতে কাজ হইতে পারে নাই।

পরদিন সম্মিলনের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নে ৮টা হইতে প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত হইয়া পরিসমাপ্ত হয়। সর্ব্বপ্রথম কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষার্থ সহায়তা করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৎপর সাহিত্য বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধের সারাংশ সভাস্থলে পঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বর্ণমালার অভিযোগ" এস্থলে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য; এই প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত সরস বাক্যবিন্যাসে সমুজ্জ্বল ছিল, শ্রোতৃবর্গ অনবরত হাস্যকোলাহলে সভাস্থল মুখরিত করিয়া ইহার রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় শিক্ষা বিষয়ে একটী সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে হিন্দুর নিকট যাহা পরম পুরুষার্থ, তাহাই উপেক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া একটু ব্যথিত হইলাম। অতঃপর অনুরুদ্ধ হইয়া সাহিত্য-সম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটী নাতিহ্রস্ব বক্তৃতা করেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা সভাস্থ ব্যক্তিসমূহ বৈলাতিরেকহেতুক অধৈর্য্য-চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া নীরব নিস্পন্দ ভাবে শ্রবণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক স্বর-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই যেন শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত তাঁহার দীর্ঘজটিল-বাক্যলহরীর সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতরঙ্গে নীয়মান তৃণরাজির ন্যায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বক্তৃতার কি প্রবল বেগ! এই খরস্রোতাঃ সরস্বতীর অন্তস্তল হইতে ভাব-রত্ন উদ্ধার করা খুব শক্তিধর শ্রোতার কাজ; কর্ণরূপ ফনোগ্রাফে যিনি সমগ্র বক্তৃতা ধরিয়া রাখিয়া আদ্যোপান্ত বারংবার স্মরণ করিতে পারেন, তিনিই ঈদৃশ বক্তৃতার সম্পূর্ণ মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ বটেন—মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে বিহ্বলচিত্তে স্বর-সুধা পান ভিন্ন বিশেষ কিছু লভ্য হইবার কথা নহে।

সর্ব্বশেষ ধন্যবাদ পর্ব্ব অভিনয়ের পর সম্মিলনের রঙ্গমঞ্চে যবনিকা পতন হইল।

এখন প্রস্তাব প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা আবশ্যক মনে করিতেছি। গত বর্ষে রাজসাহী সম্মিলনের কার্য্য-প্রণালী এইবারকার অপেক্ষা যেন অধিকতর সুশৃঙ্খল ছিল। গতবারে সভাস্থলে যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বিষয়নির্ব্বাহক কমিটিতে আলোচিত হইয়া প্রস্তাবক, সমর্থক, অনুমোদকাদির নাম সহ নির্দ্দিষ্ট হয় এবং পরদিন ঐ গুলি মুদ্রিত হইয়া সভাস্থলে প্রচারিত হয়; সভায় উপস্থিত মত কোনও নূতন প্রস্তাব আদৌ করা হয় নাই। এইবার বিষয় নির্ব্বাচন-কমিটিতে যে সকল প্রস্তাব বিবেচিত হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি সভাপতি মহাশয় কর্তৃক উপস্থাপিত হইবে, স্থির হয়। অন্যগুলি কে প্রস্তাব করিবেন, কে সমর্থন করিবেন, ইহার কোন কথাই হয় নাই। তারপর সম্মিলনের নিয়মাবলী ঐ কমিটিতে পঠিত হইয়া অনেক তর্ক বিতর্কের পর সংশোধিত হইয়াছিল; কিন্তু সভাস্থলে উহা প্রস্তা-

---

শিত হইয়াছে, তাহাতে ঘুণাক্ষরেও রায় বাহাদুর শরৎ বাবুর নামটী উল্লেখ করা হয় নাই। অথচ তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির সম্মিলনে যোগদান যে একটা উল্লেখযোগ্য কথা, তাহা বোধ হয় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিয়দ্দিন পরে 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় ভাগলপুর হইতে একখানি প্রেরিত পত্রে শরৎ বাবুর কথা লিখিত হইয়াছে।

বিত হইল না—কেবল সাহিত্য-পরিষদের উপর একবৎসরের জন্য ইহার পরিচালন ভার অর্পিত হইল, এবং নিয়মাবলী সম্বন্ধে তিন মাস মধ্যে মতামত প্রেরণ করিতে সভ্যদিগকে অনুরোধ করা হয়। অপিচ সভাস্থলে অনেকটা নূতন প্রস্তাবও সৃষ্ট হইয়াছিল। কে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন, কে সমর্থন করিবেন, ইহা তৎক্ষণাৎ যাঁহাকে নিকটে পাওয়া গেল, ধরিয়া বাঁধিয়া স্থির করা হইল। ফলে এই হইল যে, কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ৩।৪টী প্রস্তাব উপলক্ষে সভাস্থলে বারংবার দণ্ডায়মান হইতে হইল—অথচ এতদুপলক্ষে যে অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির সভাস্থ সাহিত্যিকগণের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া একটু পরিচিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা হইল না।

সভাস্থলে সৃষ্ট প্রস্তাবাবলীর মধ্যে খুব একটা গুরুতর প্রস্তাবও ছিল—যাহাতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানকেও সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। অর্থাৎ ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভা এখন সাহিত্যপরিষদের শাখাভুক্ত হইতে পারিবে—বেঙ্গল ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস্ও কালে বোধ হয় ইহার অধিকারে আসিবে। এখন সাহিত্যপরিষদে বৈজ্ঞানিকেরই প্রাধান্য, বৈজ্ঞানিকের স্পিরিট লেম্প অনেক জিনিষেরই সম্প্রসারণ ঘটাইয়া থাকে, সাহিত্যেরও প্রসারণ হইতেছে; তবে স্পিরিট লেম্প এইভাবে ক্রিয়া করিতে থাকিলে সম্প্রসারণের পরে আরও কিছু ঘটিতে পারে—জগদম্বা সাহিত্যকে যেন তাহা হইতে রক্ষা করেন।

এতদ্বিষয় গতবর্ষের রাজসাহী সম্মিলন বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম—অতএব এবার বেশী কিছু বলা বাহুল্য। আমাদের দেশে বোধহয় কর্ম্মীর সংখ্যা কম হওয়াতেই কর্ম্ম বিভাগ নাই। যিনি বিজ্ঞান চর্চ্চা করেন, তিনি সমাজ ধর্ম্ম সম্বন্ধেও কথা কহেন; যিনি কবিতা লেখেন, তিনি রাজনীতিরও ধার ধারেন। সাহিত্যেরও তাই, শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি অবান্তর বিষয়ের খবর রাখিতে হইতেছে। যদি এই সমস্ত লইয়া সাহিত্যপরিষদ ও সম্মিলন প্রকৃত কার্য্য করিতে পারেন, তবে ভালই—তখন বরং "সাহিত্য" শব্দটীর নূতন অর্থ অবনত মস্তকে মানিয়া লইব। কিন্তু কার্য্যের গণ্ডী বাড়াইয়া কার্য্য দেখাইতে পারা যাইবে কি? গ্রন্থ সংগ্রহ, গ্রন্থ প্রকাশ, পরিভাষা সঙ্কলন প্রভৃতি বিষয় যে পরিষদ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা ত বোধ হয় না। যাউক অলমতি বিস্তরেন।

ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলন বেশ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। এত অধিক সংখ্যক সাহিত্যিক পূর্ব্বে দুই অধিবেশনে সমবেত হন নাই। বঙ্গের বহির্ভূত স্থানে হইলেও ভাগলপুরে বাঙ্গালীর সংখ্যা মন্দ নহে—আবার বড়ই সুখের বিষয়, বিহারবাসী ভদ্রলোকগণও এই বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এমন কি, যে সকল যুবক স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিয়া সাহিত্যিকবর্গের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক বিহারী ছিলেন। ইহা বাস্তবিক বড়ই শ্লাঘার কথা—সম্মিলন যথার্থই বাঙ্গালী ও বিহারীর সম্মিলনে সার্থক-নাম * হইয়াছে।

এইরূপ সাহিত্য সম্মিলনে যাহাতে আরও অধিক পরিমাণে সাহিত্যিকবর্গের অধিষ্ঠান হয়, তজ্জন্য উপায় বিধান আবশ্যক।

---

* নব্যভারত ২৬শ খণ্ড ১২শ সংখ্যা চৈত্র ১৩১৫ দ্রষ্টব্য।

রাজনীতিক সম্মিলনের যেমন তিনটী স্তর আছে,—নেশনেল কংগ্রেস, প্রভিনশিয়েল কন্‌ফারেন্‌স্ ও ডিষ্ট্রীকট্ এসোসিয়েশন ; সাহিত্য বিভাগেও সেইরূপ আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনকে কংগ্রেস্ স্থানীয় করিলে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন কন্‌ফারেন্‌স স্থলবর্ত্তী হইতে পারে। শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জিলার সাহিত্যকগণেরও বৈঠক হইয়াছিল। কিন্তু "উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন" এতদ্বিষয়ে একাকী। আমার বোধ হয়, রাজসাহী বিভাগ, কোচবিহার ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা (আসাম) লইয়া যেমন "উত্তর-সাহিত্য সম্মিলন" গঠিত হইয়াছে, সেইরূপ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সুর্ম্মা উপত্যকা (শ্রীহট্ট-কাছাড়) লইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন" গঠিত হইতে পারে। এবং প্রেসেডিন্স ও বর্দ্ধমান বিভাগ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর লইয়া "পশ্চিম বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলন" গঠন করা যাইতে পারে। * উত্তর বঙ্গে যেমন সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুর শাখা নেতৃপদ গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে পরিষদের শাখা এবং পশ্চিম বঙ্গে বহরমপুর শাখা নেতা হইতে পারেন। মূল পরিষদ অবশ্যই স্বাধা রূপে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ভার গ্রহণ করিবেন। এবং উঁহারই তত্ত্বাবধানে উপরি-উল্লিখিত তিন সম্মিলনের কার্য্য হইবে। অপিচ প্রতি জেলায় যাহাতে সাহিত্যপরিষদের শাখা স্থাপিত হইয়া মধ্যে মধ্যে উহার উদ্যোগে জেলার সাহিত্যকগণ একত্র মিলিত হন, তাহারও বিধান করা আবশ্যক।

এইরূপ হইলে যে একটা সাহিত্যের বিশাল তরঙ্গ সমগ্র যুক্ত বঙ্গকে আলোড়িত করিবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভাগলপুর সম্মিলনে সমাগত সাহিত্যিক বর্গ হইতে, কলিকাতা হইতে আগত ব্যক্তিদিগকে বাদ দিলে, উত্তর বঙ্গীয়গণের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল ; রাজসাহী বিভাগ ও বর্দ্ধমান বিভাগ উভয়ই ভাগলপুরের সংলগ্ন, কিন্তু রাজসাহী বিভাগ হইতে অভ্যাগত সংখ্যা বোধহয় বর্দ্ধমান বিভাগ হইতে সমাগত সাহিত্যিকের সংখ্যার দশগুণ অধিক হইবে। "উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে"র ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছে। ফলতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইলে প্রস্তাবিত পদ্ধতিই বোধ হয় সমীচীন হইবে। আশা করি, এই বিষয়টী বঙ্গের সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণ প্রণিধান করিয়া দেখিবেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেব শর্ম্মা।

* বিহারকে উত্তর বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে বোধ হয় তিনটী বিভাগই প্রায় সমান পরিমাণের হইবে।

ভ্রান্তধারণা । (২)

এইক্ষণে দাসাখ্যা গ্রহণের বিবরণ বিবৃত করিতেছি।

সংপ্রবৃত্তে কলৌঘোরে বৌদ্ধধর্ম্মঃসুরদ্বিষাম্।
অধিকৃত্যাখিলান্ দেশান্ কান্যকুব্জং বিনাহিতঃ।
বঙ্গজকারিকা।

অর্থাৎ তৎকালে দেবতাবিদ্বেষী বৌদ্ধধর্ম্ম, কান্যকুব্জ ব্যতীত, সমগ্র ভারত অধিকার করিয়াছিল।

সেই কারণে

যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ তথা কায়স্থা পঞ্চকাঃ।
ভূপালেন সমানীতা দেশাৎ কোলঞ্চসংজ্ঞকাৎ॥
বঙ্গজকারিকা।

অর্থাৎ আদিশূর কোলঞ্চ দেশ হইতে যজ্ঞার্থে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ আনয়ন করিয়াছিলেন। আদিশূর কান্যকুব্জে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গজকারিকাতে এই ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

সুকৃতসুকৃতসংহাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থদক্ষা।
নৃপিত হত বিপক্ষাঃ স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ॥
মুদ্রিত সুগত বৃন্দে গৌড় রাজ্যে মদীয়ে।
দ্বিজকুলবরজাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রয়াস্ত॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রার্থে দক্ষ, বিপক্ষ পরাজয়ে সমর্থ, শ্রুতিজ্ঞ দ্বিজকুল-সম্ভূত দ্বিজ পাঠাইবেন। ক্ষবিভট্ট শালিবাহন ধৃত বচনে প্রকাশ আছে,

গৌড়েশ্বরো মহারাজো রাজসূয়মনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজাদশ॥

শেষোক্ত শ্লোকদ্বয়ে "নৃপিতহতাবিপক্ষাঃ" ও "উপযুক্তা দ্বিজাদশ" বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ৫ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ও শস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় যজ্ঞে প্রয়োজন হওয়াতে তাঁহারা বঙ্গে আসিয়াছিলেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, আদিশূর যে অশ্বমেধ অথবা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়ের কি প্রয়োজন ছিল, কারণ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। অশ্বমেধাদি যজ্ঞ তিন ভাগে বিভক্ত যথা, প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন, ও তৃতীয়সবন। এই সবনে অর্থাৎ যজ্ঞে ৮টী বরণ হইয়া থাকে যথা, ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধার, ও সদস্য এবং অতিরিক্ত একজন শ্রুতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, এই ৪ জনের সাহায্যার্থে মোট ৫ জন ব্রাহ্মণের আবশ্যক। ভূস্বামী, স্বস্তি, ঋদ্ধি, ও পুণ্যাহ, এই ৪টী বরণের জন্য ৪ জন, সুদক্ষ ক্ষত্রিয়, ও যজ্ঞ রক্ষার্থ আর একজন ক্ষত্রিয় এই ৫ জন ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন হয়, তজ্জন্য আদিশূর দশ জন দ্বিজ কান্যকুব্জ হইতে আনিয়াছিলেন।* কানোজ হইতে মালদার নিকট পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিতে হইলে তৎকালে নানা উপদ্রব পূর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইত, তজ্জন্য তাঁহারা সামরিক বেশে একটী "পত্তিব্যূহ" রচনা করিয়া আসিয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দ বলেন—

গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভি সংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃপত্তিবেশ সমন্বিতাঃ॥

তৎকালে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সমালোচনার বিষয় ছিল না, কারণ তাঁহারা সকলেই সোপবীত ছিলেন, তথাপি এই সকল পুরাতন কারিকা পাঠ করিলে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব যেন স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে। উপরোক্ত শ্লোকে "প্রধানা" ও "পত্তি" শব্দের দ্বারা সমাগত ৫ জন কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে। পত্তি শব্দটী সকল অবস্থায় ক্ষত্রিয় ব্যঞ্জক পুংলিঙ্গে বীর পদাতিক, ও স্ত্রীলিঙ্গে সেনা বিশেষ। "একেভৈকরথাত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিক।" ইত্যমরঃ। ৫টী পদাতিক, একজন গজারোহী, একজন রথী ও ৩ জন অশ্বারোহী দ্বারা "পত্তিব্যূহের সমাবেশ হইত। এই পত্তিতে প্রধানা (officers of the regiment) ছিলেন, পঞ্চ কায়স্থ। তাঁহারা গজে অশ্বে ও নরযানে ও ৫ জন ব্রাহ্মণ পদাতিক বেশে গোযানে আসিয়াছিলেন। দ্বিজ বাচস্পতি মিশ্রের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বেঘোষাদিকস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্ত কুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃসুধীঃ॥

* ইংরেজ জাতির অভ্যুদয় কালে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে ক্ষিতীশবংশাবলীতে লিখিত আছে—

অগ্নিহোত্র মহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে।
বব্রার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপাধিপসুধীঃ॥

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

বসিতে আসন দিলা গৌড়ের ঈশ্বর।
ক্ষত্রোচিত নতি কৈলা সৎ কায়স্থবর॥
পঞ্চের প্রভায় সভা হইল উজ্জল।
তেজঃপুঞ্জ দ্বিজ পঞ্চ বিপ্রের সম্বল॥

কুলপঞ্জিকা হইতে আর অধিক উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যায়। কুলাচার্য্যগণ মধ্যে দেবীবর পঞ্চ কায়স্থকে শূদ্র বলিয়াছেন। ইহা কেবল বিদ্বেষ বশতঃ। যে দেবীবর স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, তিনি স্মার্ত্ত শিরোমণির ডিক্রীর বিরুদ্ধে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিবেন, তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না।

এই দেবীবর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মেল স্থাপক। তিনি ব্রাহ্মণদিগের কুলপঞ্জিকায় বিবৃত করিবার সময়ে আনুষঙ্গিকরূপে কায়স্থদিগের বিবরণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি প্রভাকরের বংশকে নিষ্কুল বলিয়া বর্ণন করেন—

ডেকে বলে দেবীবর,
নিষ্কুল প্রভাকর।

নিন্দাবণে অপদস্থ হইয়া প্রভাকর ও দেবীবরকে অভিসম্পাত করিলেন—

ডেকে বলে প্রভাকর,
নির্ব্বংশ দেবীবর।

ব্রাহ্মণগণের পরিচয় অন্তে ভট্টনারায়ণ, যিনি আদিশূরের যজ্ঞে হোতা হন, কায়স্থ পঞ্চের পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই সমস্ত পরিচয় এখানে কীর্ত্তন করিলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হয়। মকরন্দ ঘোষ ভট্টনারায়ণের, দশরথ বসু দক্ষের, বিরাট গুহ শ্রীহর্ষের; ও কালিদাস মিত্র ছান্দড়ের শিষ্য ও সেবক বলিয়া নিজ নিজ পরিচয় দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষোত্তম দত্তের গুরুদেব কান্যকুব্জ হইতে আসেন নাই, তজ্জন্য তিনি বলিয়াছিলেন—

"এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মিত্বালয়ে।"

অর্থাৎ সকলকে রক্ষা করিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। দেবীবর বলেন, কালিদাস মিত্র বেদগর্ভের দাস, তিনি "শিষ্য" শব্দ আদৌ ব্যবহার করেন নাই, এবং পুরুষোত্তম দত্ত ছান্দড়ের দাস হইয়াও তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—

বাৎস্য গোত্রেষু সম্ভূতশ্ছান্দড়শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ।
মৌদ্গল্য গোত্রজোদত্ত পুরুষোত্তম সংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মিত্বালয়েঃ।
দেবীবর।

অর্থাৎ বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়মুনি, মৌদ্গল্য গোত্রীয় আমি পুরুষোত্তম দত্ত ইহাদিগকে রক্ষা করিতে আপনার (আদিশূরের) গৃহে আসিয়াছি। যদি দেবীবরের এই কথা সত্য হয়, তবে অবস্থানুসারে ও তাৎকালিক ব্যবস্থানুসারে পুরুষোত্তম দত্ত মহাশয় নিজের গুরুদেবের প্রতি অসম্মানজনিত গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন। আদিশূর, বহু অর্থ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অতি দূরদেশ হইতে ৫ জন সাগ্নিক শ্রুতিজ্ঞ যোগী মহাপুরুষদিগকে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিতে নিজ সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি কোনও প্রকার অসম্মান রাজার নিকট, সভাস্থ সকলের নিকট অসহ্য হইবে, আশ্চর্য্য কি? এবং পুরুষোত্তম দত্তের এই কার্য্য কি প্রশংসার্হ হইয়াছিল? কথিত আছে, এই ৫ জন ব্রাহ্মণ আদিশূরের প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য শুষ্ক মল্ল কাষ্ঠোপরি রাখিলে ঐ কাষ্ঠ সজীব হইয়া ফল ও পুষ্প সংযুক্ত হইয়াছিল। এতদ্দর্শনে রাজার শরীর কাঁপিতে লাগিল।

তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎফলপল্লবসংযুতম্।
ইতিদৃষ্ট্বা নৃপস্তস্মিন্ কম্পান্বিত কলেবরঃ॥

পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় শিক্ষিত ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদল এই সমস্ত কথা অতিরঞ্জিত মনে করিয়া হাস্যসুখানুভব করিতে পারেন। ফলতঃ যাঁহাদিগের যোগবল নাই, তাঁহারা যোগপ্রসূত অদ্ভুত কার্য্যবিবরণ পাঠে সংশয়চিত্ত হইবেন, আশ্চর্য্য কি?

বঙ্গীয় কায়স্থবীজ পুরুষগণের যে পরিচয় বৃত্তান্ত আমরা বিবৃত করিলাম, তাহা হইতে পাঠকবৃন্দ দেখিবেন যে, তাঁহারা যে অবস্থায় ব্রাহ্মণগণের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যরূপ ব্যবহার করিলে তাঁহাদিগের মন্ত্রদাতা, বেদোপদেষ্টা ও আচার্য্যগণের প্রতি অবমাননা করা হইত। পুরুষোত্তম দত্ত মহাশয় সভার যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে আমরা প্রশংসা করিতে পারি না, কারণ তিনি সভামধ্যে মহর্ষি ভট্টনারায়ণকে উপেক্ষা করিয়া নিজেই তাঁহার পরিচয় দিয়াছিলেন। সে পরিচয়ে ব্রাহ্মণের প্রতি অবমাননা প্রদর্শিত হয়। সেই প্রাচীন কালে মকরন্দ ঘোষ, কালিদাস মিত্র, দশরথ বসু ও বিরাট গুহ তাঁহাদিগের মন্ত্রদাতাদিগের প্রতি যে অনুপম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার শতাংশের একাংশও ব্রাহ্মণের অবনতির বর্ত্তমান যুগে আমরা অনুভব করিতে পারি না। পুরুষোত্তম দত্ত সত্য কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিচয়ে বিনয়-গুণের অভাব ছিল। পক্ষান্তরে তাঁহার সহযোগিগণ বিনয়-গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সকলের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিস্পৃহ-চিত্তে কোনও প্রকার প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইয়া কেবল সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্যই ব্রাহ্মণের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। যদি পুরুষোত্তম দত্ত অন্যরূপ ব্যবহার না করিতেন ও তাঁহার বংশধরেরা এই ধৃষ্টতা জন্য পরবর্ত্তী কালে দণ্ডিত না হইতেন, তবে এই সামান্য ঘটনাটী ইতিহাস মধ্যে স্থান পাইত না। ধীরেন্দ্র বাবুর "দাসাখ্যা গ্রহণ করতঃ শূদ্রত্ব বরণ" উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা, কারণ তৎকালে কায়স্থবীজপুরুষগণ সকলেই সোপবীত ক্ষত্রিয় ছিলেন, শূদ্রত্ব বরণ তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। যে সময়ের কথা আমরা কীর্ত্তন করিতেছি, তৎকালে সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজ ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ফলতঃ ব্রাহ্মণের শাস্ত্রানুমোদিত দাসই ক্ষত্রিয়, কারণ শূদ্র অস্পৃষ্ট, ব্রাহ্মণের গাত্র স্পর্শাদি দ্বারা সেবা করিতে পারিত না। আমরা পুরাণে পাঠ করি—

"বিপ্রস্য কিঙ্করোভূপোবৈশ্যভূপস্য কিঙ্কর।"
ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণ, গণেশখণ্ড।

পুরাকালে ভৃত্যত্ব অথবা দাসোপাধি, ব্রাহ্মণভক্তি ও রাজকীয় পদের পরিচায়ক ছিল। গরুড় পুরাণে পূর্ব্বখণ্ড ১১২ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাইব, সৈন্যাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, লেখক, এমন কি রাজপুরোহিত পর্য্যন্ত দাস বা ভৃত্যপদ বাচী ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের পদসেবায় নিযুক্ত হন।

"সতাং শুশ্রূষণে জিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে।"
ভাগবত ১০ম স্কন্ধে ৭৫ অঃ ৫ম শ্লোক।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সাধুদিগের শুশ্রূষায় অর্জ্জুন ও পদসেবায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিযুক্ত হইলেন।

ধীরেন্দ্র বাবুর উক্তি "যাহা কর্ম্মদোষে গিয়াছে, তাহা গুণকর্ম্মে লাভ করিতে হইবে" ইহা সত্য, কারণ বৌদ্ধবিপ্লবে ব্রাহ্মণদিগের

সম্মান রক্ষা করিতে কায়স্থগণ অশোক সম্রাটের সময় হইতে লক্ষ্মণসেনের সময় পর্য্যন্ত শনৈঃ শনৈঃ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, মস্তকের শিখার ন্যায় সূত্র একদিনে কায়স্থদিগের স্কন্ধদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই, সূত্র তিরোধানের সময় আনুমানিক ১৪০০ বৎসর। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে অত্যাচার, বিড়ম্বনা ও বিদ্রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় কায়স্থগণ সূত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বৈদিকী দীক্ষার স্থলে তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অনেক কায়স্থসন্তান তাঁহাদিগের দ্বিজত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু যজ্ঞোপবীত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রাচার তাঁহাদিগের অঙ্গের ভূষণ হইয়াছিল। ধ্রুবানন্দ তাৎকালিক অবস্থা এই প্রকারে চিত্রিত করিয়াছেন—

ততঃকালেগতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতাভবন্।
আগমোক্তবিধানেন পূতা কায়স্থসম্ভবাঃ॥
তান্ত্রিকান্তে সমাখ্যাতস্তন্ত্রাণামপি পারগাঃ।
তথাহিশূদ্র ধর্ম্মাস্তেখ্যাতাশ্চশ্রুতিশাসনাৎ॥

অর্থাৎ—অনেক দিবস সূত্রত্যাগের পর গত হইলে কায়স্থগণ তন্ত্রশাস্ত্রের বিধানানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি বৈদিকী আচার পরিত্যাগ করায় শূদ্রাপবাদ তাহাদিগকে কলঙ্কিত করিয়াছিল।

বঙ্গীয় কায়স্থ জাতি নিঃসন্দেহে শূদ্র নহে, তবে যে শূদ্রাপবাদ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার এক মাত্র কারণ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ। তান্ত্রিকাচার গ্রহণ করিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ দ্বিজত্বের এক মাত্র চিহ্ন যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই শূদ্রাপবাদ অর্থাৎ ব্রাত্যত্ব প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পরিহার করিয়া কায়স্থগণ বর্ত্তমান সময় যথা শাস্ত্র উপনীত হইতেছেন।

কৌলীন্য মর্য্যাদা সম্বন্ধে কথঞ্চিত আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বল্লালের সময় গুণ কর্ম্মানুসারে কুল বন্ধন হয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ বল্লাল সেন সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তিনি বৈদ্য ছিলেন। দেখা যাইতেছে, দুই জন বল্লাল ছিলেন। কায়স্থ—ক্ষত্রিয় সেন বংশ-সম্ভূত বল্লাল, যিনি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কুল বন্ধন করেন, তাঁহার শেষ জীবনে দান সাগর নামক একখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতে লিখিত আছে

নিখিল চক্র তিলক শ্রীমদ্ বল্লাল সেনেন পূর্ণে।
নবশশী দশমিতে শকাব্দে দানসাগোর রচিতঃ॥

অর্থাৎ ১০৯১ শকে বা ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে "দানসাগর" গ্রন্থ রচিত হয়। বৈদ্য বল্লালের শিক্ষক গোপাল ভট্ট "বল্লাল চরিত" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে লিখিত আছে—

বৈদ্যবংশাবতংসোঽহম্ বল্লাল নৃপ পুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লাল চরিতং শুভম্॥
গোপাল ভট্ট নাম্না চ তদ্রাজ শিক্ষকেন চ।
অব্দব্রাজনমানে বসুর্ভিবঃনৈরধিক শাকেযু॥

"বল্লাল চরিত" ১৩০০ শকে অর্থাৎ ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, কায়স্থ বল্লাল বৈদ্য বল্লালের আনুমানিক ২১০ বৎসর পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কুল বন্ধন সম্বন্ধে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গৌড় বংশাবলি হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি উদ্ধৃত করিলাম—

"শিষ্টাচার পরিভ্রষ্টা বাঙ্গেন্দ্রা বঙ্গরাঢ়কাঃ।
আর্য্যাচার্য্যৌ তথা দৃষ্টৌ নৈব তেভ্যাস্তি কল্পনুঃ॥

তথা কুল ভেদং নাস্তি সর্ব্বে তুল্যাইবা তবন্।
চকার নৃপ যত্নেন কুল শাস্ত্রং নিরূপনম্॥

* * * *

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণম্॥

* * *

নবগুণৈস্তু সংযুক্তাঃ কুলীনো দেবতা স্বয়ম্।
মকরন্দ দশরথৌ কালিদাসো বিরাটকঃ।
এতেষাঞ্চ সুতা সর্ব্বে অভবন্ কুলীনা বরাঃ॥
দত্ত বংশ সমুদ্ভূতো নারায়ণো মহা কৃতীঃ।
চকার সনৃপতিস্তং নিষ্কুলং বিনয়াদ্দীনম্” ॥

অর্থাৎ—বল্লাল নৃপতি বারেন্দ্র, বঙ্গজ, ও রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শন করিয়া যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের কুল-বন্ধন করিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে কে আর্য্য, কেই বা অনার্য্য, তাহার পার্থক্য ছিল না। আচারাদি নবগুণ সংযুক্ত ব্যক্তি কুলীন হইলেন। তাহারা স্বয়ং দেবতা স্বরূপ। মকরন্দ ঘোষাদি কুলীন হইলেন, পুরুষোত্তমের বংশধর নারায়ণ দত্ত তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের বিনয় গুণের অভাব বশতঃ কুলীন হইলেন না।

নবধা গুণ সংপ্রাপ্তাঃ সর্ব্বে আর্য্য বিসঙ্গকাঃ।
কিঞ্চিত গুণ বিহীনা যে মধ্যল্য মধ্যমা স্মৃতাঃ।
এতেভ্যং গুণহীনা যে মহাপাত্রা প্রকীর্ত্তিতাঃ।
অচলাশ্চবরা যস্মাৎ কুলকর্ম্ম বিবর্জ্জিতাঃ॥
ব্রাত্যায়াং কায়স্থাজ্জাতাঃকরণাশ্চ প্রকীর্ত্তিতা
কায়স্থাৎ শূদ্র ভার্য্যায়াং জাতো ডেঙ্গর সংজ্ঞকঃ॥

কায়স্থস্য শুশ্রূষতো দাসা ডেঙ্গর সংজ্ঞকাঃ।
তেহপি শূদ্রা সমখ্যাতঃ সেবাবৃত্তি সমন্বিতাঃ॥

অর্থাৎ যাঁহারা নবগুণ যুক্ত,তাঁহারা আর্য্য, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গুণ হীন যাঁহারা মধ্যল্য, তাহা হইতে আরো গুণ হীন যাঁহারা,তাঁহারা মহাপাত্র হইলেন। যাঁহাদিগের কুলকর্ম্ম ছিল না, তাঁহারা অচলা হইলেন। ব্রাত্যা অর্থাৎ যজ্ঞোপবীত হীন বংশে কায়স্থ কন্যার গর্ভজাত সন্তান করণ উপাধি পাইলেন, শূদ্র স্ত্রীর গর্ভে কায়স্থের ঔরসে যে সন্তান হইল, তাহার উপাধি ডেঙ্গর হইল। ইহারই সেবাধর্ম্ম সমন্বিত শূদ্র জাতি।

এই বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, তৎকালে কুলীন, মধ্যল্য ও মহাপাত্রের যজ্ঞোপবীত ছিল। যাহাদিগের যজ্ঞোপবীত ছিল না, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রাত্য, তাঁহাদের সম্বন্ধে বল্লাল অন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এইক্ষণ ধীরেন্দ্র বাবু দেখিলেন যে, শূদ্র কোন্ জাতি। কায়স্থ কখনই শূদ্র ছিলেন না ও শূদ্রত্ব বরণ করেন নাই। যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম, বোধ হয় তাহাতে ধীরেন্দ্র বাবুর এবং তৎসদৃশ ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণা অপনীত হইবেক। যে জাতির মধ্যে অপ্রিয় সত্য কথা পর্য্যন্ত নিষেধ, তাহার অন্তর্ভুক্ত একজন শিক্ষাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে অপ্রিয় অসত্য কথা ঘোষণা কতদূর অন্যায়,তাহা নব্যভারতের পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

ধীরেন্দ্র বাবু পবিত্র যজ্ঞোপবীতকে এক গাছি দড়ী বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে এই দড়ীর মাহাত্ম্য স্বয়ং বিধাতাও কীর্ত্তন করিতে পারেন নাই। ইহার সুদৃঢ় বন্ধনে চারি সহস্র বৎসরের ধর্ম্ম-বিপ্লব মধ্যে হিন্দু জাতি তিষ্ঠিয়া রহিয়াছে, নচেৎ এই জাতির পরিণাম কি হইত; কে জানে। ইহার শক্তি প্রভাবে মানুষ আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিয়া যে সমস্ত চরমতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহাতেই দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে, আমরা অন্ধকারের মধ্যে দৈবী

সম্পদের আলোক দেখা গিয়াছে। হিন্দুর ব্রহ্মচর্য্যের ইহাই একমাত্র সম্বল ও নিদর্শন। সেই ব্রহ্মচর্য্য হইতে খলিত হইয়া আমাদের এত দুর্গতি। আমি জানিনা কবে আমরা এই যজ্ঞোপবীতের প্রকৃত মাহাত্ম্য সম্যক্ রূপে বুঝিতে পারিব।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা।

সাংখ্য সূত্র।

(৪৫৪ পৃষ্ঠার পর)

৫৫। অবিবেক হেতুই এই যোগ হয়। এজন্য ইহা সমান রূপে হয় না।

পূর্ব্বে ১৮ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রকৃতির সহিত নিত্য শুদ্ধ মুক্তস্বভাব আত্মার যোগই বন্ধনকারণ। ৫০ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মাদি চিত্তের—তাহা অন্যকে অর্থাৎ আত্মাকে বদ্ধ করিতে পারে না। এ উভয় স্থলে বিরোধ নাই। কেন না, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই চিত্তের ধর্ম্ম দ্বারা আত্মার বন্ধন—পারমার্থিক নহে; তাহা ঔপাধিক—অভিমানজ। তাহার মূল অবিবেক। অবিবেক হইতেই পুরুষপ্রকৃতি সংযোগ হয়।

সুতরাং যে পুরুষ অবিবেকী, কেবল তাহারই সহিত প্রকৃতির যোগ হয়। মুক্ত পুরুষ অবিবেকী নহে। তাহার সহিত প্রকৃতির যোগ হয় না। সুতরাং মুক্ত ও বদ্ধ সম্বন্ধে নিয়ম সমান নহে।

প্রকৃতি পুরুষের অভেদজ্ঞান অবিবেক নহে। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের পূর্ব্বে তাহা সম্ভব নহে।

বিবেকের প্রাগভাব বা বাসনাই অবিবেক। তাহারা বুদ্ধির ধর্ম্ম নহে বটে, কিন্তু অবিবেক পুরুষের বিষয় হইয়া, তাহার ধর্ম্ম রূপে উক্ত হয়। বুদ্ধিরূপা প্রকৃতি স্বস্বামী পুরুষে, তাহার বুদ্ধিরূপ হইয়া যুক্ত হয়। সাংখ্য কারিকায়, অন্ধ পঙ্গুর ন্যায়, পরস্পরের জন্য পুরুষ প্রকৃতির সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে। অবিবেক তত্ত্ব নহে। কেবল সংযোগ দ্বারাই উহা বন্ধন কারণ হয়। উহা সাক্ষাৎ বন্ধন কারণ হয় না। এইজন্য প্রলয়কালে অবিবেকীর দুঃখ থাকে না। আর জীবন্মুক্ত বিবেকীরও জীবিতকালে দুঃখ থাকে না।

ভোগ্য ভোক্তৃত্বের নিয়ামক অনাদি স্বস্বামীভাব কর্ম্মাদি সংযোগের কারণ হইলেও, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ কারণ নহে। গীতায় আছে—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসৎ যোনিজন্মসু॥"

অতএব সাংখ্য অভিমানই সংযোগের হেতু।

অন্যথা জ্ঞান হইতে মুক্তি হইত না।

অবিবেকই মুখ্য সংযোগ হেতু। সোপাধিক কর্ম্ম গৌণ হেতু। তাহার সহিত পরম্পরা সম্বন্ধ।

প্রকৃতি পুরুষের অভেদ জ্ঞানই অবিদ্যা—অবিবেক। "বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ" "বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ"। এই সূত্র ও যোগসূত্র হইতে অবিদ্যাই বন্ধহেতু বলা যায়। সেই অবিদ্যা অভাবস্বরূপ নহে, তাহা বিদ্যার বিরোধী অন্য জ্ঞান। ইহা পাতঞ্জলে স্বীকৃত। অবিদ্যা অভাবাত্মক হইলে তাহা বন্ধন কারণ হইত না।

সাংখ্যমতে "বাসনারূপ অবিবেকই প্রকৃতি

পুরুষের সংযোগ হেতু। অথবা অভিমানাখ্য সংযোগকেই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ বলা হয়।

এই অবিবেক তিন প্রকারে সংযোগহেতু হয়। (১) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, (২) ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তিদ্বারা, (৩) বিষয়ানুরাগ দ্বারা। অবিদ্যা সাক্ষাৎ সংযোগের কারণ। অবিদ্যা ধর্ম্মা-ধর্ম্মাদির দ্বারা ও বিষয়ানুরাগ দ্বারা সংযোগের হেতু হয়। তৃষ্ণাত্মক রাগরূপ বীজ হইতে তাহার জন্ম হয়। রাগ বা বিষয়ানুরাগও অবিবেকের কার্য্য।

'ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ঃ' ও 'সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগঃ'—ইত্যাদি পাতঞ্জল সূত্র দ্রষ্টব্য ঈশ্বর গীতায় আছে—

অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং তস্মাৎ দুঃখং তথেতরং।
রাগদ্বেষাদয়ো দোষাঃ সর্ব্বেভ্রান্তি নিবন্ধনাঃ॥
কার্য্যোহ্যস্য ভবেদ্দোষঃ পুণ্যাপুণ্য মিতিশ্রুতিঃ।
তদ্বশাদেব সর্ব্বেষাং সমদেহ সমুদ্ভবঃ॥"

ন্যায় সূত্রে আছে, "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষ মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরা পায়াৎ অপবর্গঃ।"

অতএব সংযোগার্থ জন্মবারা বন্ধাখ্য দুঃখের মূল কারণ অবিবেক।

মুক্ত পুরুষে এই সংযোগ সম্ভাবনা নাই।

৫৬। অন্ধকারের ন্যায় তাহারও (অবিবেকের) নিয়তকারণ হইতে উচ্ছেদ হয়।

অন্ধকার যেমন কেবল আলোকের দ্বারা নষ্ট হয়, সেইরূপ নিয়ত কারণ অবিবেকেরও উচ্ছেদ হয়।

অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা যাহা যাহার কারণ, তাহা স্থির হয়। তাহাই নিয়ত কারণ। যেমন আলোক অন্ধকারনাশের নিয়তকারণ, সেইরূপ বিবেকও অবিবেকনাশের নিয়ত কারণ।

এই অন্ধকার অভাবরূপ তমঃ নহে। এই অন্ধকার প্রাগভাবাদি চারি প্রকার অভাবের কোন প্রকার নহে। সেইরূপ অবিবেকও অভাব নহে।

এই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় কি? শুক্তিতে রজত ভ্রম যথার্থ জ্ঞান দ্বারাই নিরাকৃত হয়। বিবেকই অবিবেক নাশের নিয়তকারণ। কর্ম্মাদি সে কারণ নহে। তাহা জ্ঞানের প্রধান সাধন। কেন না, তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। তাহা যোগা-ঙ্গের অন্তর্গত। প্রাচীন বৈদান্তিকেরাও স্বীকার করেন যে, মোক্ষ বিষয়ে কর্ম্ম জ্ঞানের অঙ্গ বিশেষ।

"সহকারিত্বেন চ"—ইতি বেদান্ত সূত্র।
"জ্ঞানিনাজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণং।
তাবদ্বর্ণাশ্রম প্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্মমুক্তয়ে।

"উপমর্দ্দং চেতি"—বেদান্ত সূত্র। ইহা-দ্বারা যোগীর কর্ম্মত্যাগ উক্ত হইয়াছে।

কর্ম্ম চিত্তবিক্ষেপ করে—এজন্য তাহা জ্ঞানাভ্যাসের বিরোধী—এরূপ আপত্তি হইতে পারে। তাহা ভ্রম।

অন্ধকার আলোকাভাব নহে। তাহা দ্রব্য। এজন্য তাহা নীলবর্ণ প্রতীতি হয়।

"তমঃ খলু চলং নলং পরাপর বিভাগবৎ।
প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম বৈধর্ম্ম্যাং নভভ্যো ভেত্তু মর্হতি॥"

৫৭। প্রধান বিষয়ে অবিবেক থাকিলে, অপ্রধান বিষয়েও অবিবেক থাকে। প্রধান সম্বন্ধে অবিবেক দূর হইলে অন্য অবিবেকও দূর হয়।

সকলের মূল প্রধান বা প্রকৃতি। তাহার অবিবেকই অন্য অবিবেক। প্রধানে অবিবেক দূর হইলে আর "বুদ্ধিতত্বে, অহংতত্বে বা ভৌতিক দেহে অবিবেক থাকে না।

যেমন শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য-

জ্ঞানে আর দেহাভিমান থাকে না, দেহের ধর্ম্মকে আর আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া ভ্রম হয় না। সেইরূপ প্রকৃতি হইতে পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান হইলে আর কোন অবিবেক থাকে না। কারণ নাশে কার্য্য নাশ হয়। চিত্তাধার নাশে চিত্ত নষ্ট হয়। প্রকৃতির বিবেকেই মোক্ষ। বুদ্ধির বিবেকেও প্রকৃতি অভিমান থাকে। ক্ষেত্র আমার এ অভিমান থাকিলে তাহার শস্যও আমার এই প্রতীতি হয়। (বিঃ ভিঃ)

৫৮। পুরুষের বন্ধন ইহা বাক্য মাত্র; তত্ত্ব নহে। এই বন্ধন চিত্তে অবস্থিত।

চিত্ত সন্নিধান জন্য আত্মার এই অভিমান। নিত্য সঙ্গযুক্ত আত্মার বন্ধন তাত্ত্বিক নহে।

"বন্ধ মোক্ষৌ সুখং দুঃখং মোহাপত্তিশ্চ মায়য়া। স্বপ্নে যথাত্মনো খ্যাতিঃ সংসৃতিনতু বাস্তবী"।

স সমান সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব.........ইত্যাদি শ্রুতি।

পুরুষে চিত্তের দুঃখ প্রতিবিম্ব গ্রহণই দুঃখ ভোগ বাসনার উচ্ছেদে বিবেকও মুক্তি হয়।

৫৯। দিক্‌ভ্রম হইলে যেমন প্রত্যক্ষ ব্যতীত তাহা দূর হয় না, তেমনি অপরোক্ষ ব্যতীত কেবল যুক্তি দ্বারা অবিবেক দূর হয় না।

আত্ম সাক্ষাৎকার ব্যতীত কেবল শ্রবণ মননের বা যুক্তির দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় না।

শ্রবণ হইতে বিবেক জ্ঞান হইলেও অনেক জন্ম আয়াস দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়।

দিক্‌ভ্রম যাহাদের কখন হয় নাই, তাহারা দিক্‌ভ্রমের আশ্চর্য্য প্রভাব বুঝিতে পারে না। দিক্ ভ্রম আসিলে, আর লোকের কথায় বিশ্বাস হয় না, সূর্য্যের উদয় দেখিয়াও সে ভ্রম যাইতে চাহে না।

পুরুষের বন্ধন কথা মাত্র হইলেও, কেবল শ্রবণ মননাদির দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার ব্যতীত, তাহা বোধ হয় না। বিবেক ব্যতীত বন্ধবোধ হয় না। এই অপরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত, উৎপন্ন বিবেক হয় না। কেবল যুক্তি ও শ্রবণ দ্বারা অবিবেক দূর হয় না। (বিঃ ভিঃ)

(এস্থলে মূল সূত্রে যুক্তি অর্থে মনন, আর অপি অর্থে শ্রবণ বুঝিতে হইবে।)

৬০। যেমন ধূমের দ্বারা অদৃশ্য বহ্নির বোধ হয়, সেইরূপ অনুমান দ্বারা চক্ষুর অগোচর পদার্থের বোধ হয়।

প্রকৃতি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হয় না; তাহারা ইন্দ্রিয়গোচর নহে। তবে কিরূপে তাহাদের অপরোক্ষ হইবে, কিরূপে তাহাদের সাক্ষাৎকার হইবে? সে অপরোক্ষের উপায় অনুমান। ধূম দেখিয়া পর্ব্বতে বহ্নি আছে, ইহা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হইলে, তাহার সম্বন্ধে অপরোক্ষ সামান্য জ্ঞান হয়। যতক্ষণ অন্তরে তাহার অস্তিত্ব অনুভব না করা যায়, ততক্ষণ তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না।

প্রকৃতি পুরুষ প্রত্যক্ষ নহে। এস্থলে উক্ত হইল যে অনুমান প্রমাণ দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়। যাহা অনুমান সিদ্ধও নহে, তাহা আগম প্রমাণে সিদ্ধ হয়। সাংখ্য শাস্ত্র অনুমান প্রধান, এজন্য এস্থলে অনুমানেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে আগমের যে একেবারে অপেক্ষা নাই, তাহা নহে; ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, সাংখ্যশাস্ত্র মনন শাস্ত্র। কারিকায় আছে। (বিঃ ভিঃ)

সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্॥

৬১। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—ইহাদের

সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে মহান্, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও উভয়ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র হইতে স্থূলভূত, আর পুরুষ।—এই পঞ্চবিংশতি-গণ।

যদিও এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, তথাপি ইহাদের প্রত্যেককেই সাংকেতিক রূপে প্রকৃতি বলে। মহান=বুদ্ধিতত্ব। অহঙ্কার=অভিমান। শব্দস্পর্শ রূপ রস গন্ধ,—এই পাঁচ তন্মাত্রা। অন্তর ইন্দ্রিয়=মন। বাহ্য ইন্দ্রিয় দশ; যথা পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়,—চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়,—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। পাঁচ স্থূলভূত,—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ভূমি।

স্থূল ইহা উপলক্ষণ, ইহার মধ্যে সূক্ষ্মভূতও গ্রহণ করিতে হইবে। সর্ব্বশুদ্ধ এই পঞ্চবিংশতি তত্ব।

সত্বাদি দ্রব্য, গুণ নহে। উহাদের সংযোগ বিভাগাদি ও লঘুত্ব, চলত্ব, গুরুত্বাদি ধর্ম্ম আছে। উহারা রজ্জুর ন্যায় পুরুষকে বদ্ধ করে ও উহারা পুরুষের উপকরণ, এইজন্য উহাদিগকে গুণ বলে। উহাদের মধ্যে যখন কোনটী ন্যূন বা অতিরিক্ত থাকে না, তখনই উহাদের সাম্যাবস্থা। অর্থাৎ অকার্য্যাবস্থা। বৈষম্য অবস্থায় আর যে তাহাদিগকে প্রকৃতি বলা যায় না, তাহা নহে। (বিঃ ভিঃ)

সত্ব রজস্তম ইতি এবৈব প্রকৃতিঃ সদা।
এবৈব সংসৃতির্জন্তোরস্যাঃ পারে পরম্ পদম্॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, গুণমাত্রই প্রকৃতি। মহত্তত্বাদি কার্য্যস্বরূপ হইলেও পুরুষের উপকরণ বলিয়া তাহাদের প্রকৃতি বলে।

সাংখ্যমতে মূলতত্বকে প্রথমতঃ তিন বিভাগ করা হয়. যথা জ্ঞ, অব্যক্ত ও ব্যক্ত। (কারিকা দ্রষ্টব্য।) পুরুষে=জ্ঞ। মূল প্রকৃতি=অব্যক্ত। মহত্তত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যক্ত। ব্যক্ত ২৩। সর্ব্বসমেত ২৫ তত্ব।

সাংখ্য মতে এই পঞ্চবিংশতি পদার্থ ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই। তবে সত্বাদি প্রত্যেক পদার্থ অনন্ত। এই জন্য 'পঞ্চবিংশতিগণ' বলা হইয়াছে। ইহার সমুদায়ই দ্রব্য। গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমুদায়ই ইহাদের অন্তর্গত।

সাংখ্য মতে প্রাণ বা দিক্ কাল—স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পদার্থ সকল পরস্পরে প্রবেশ ও অপ্রবেশ দ্বারা কোন মতে এক, কোন মতে ছয়, কোন মতে ষোড়শ, আবার কোন মতে অনন্ত। সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য দ্বারা পদার্থের স্বরূপ বিজ্ঞান হয়।

একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ॥
ইতি নানা প্রসংখ্যানাং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্।
সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্বাদ্বিদুষাং কিমশোভনম্॥
ইতি ভাগবত।

শ্রুতিতেও এইরূপ পদার্থ গণনা আছে।
"অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ"—
গর্ভোপনিষৎ।
"পৃথিবী চ পৃথিবী মাত্রা—..."প্রশ্নোপনিষৎ।
"অষ্টৌ চ প্রকৃতয়ঃ"—মৈত্রায়ণি উপনিষৎ।
"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতি, মহদাদ্যা প্রকৃতিঃ
বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শস্তু বিকারো ন প্রকৃতি ন বিকৃতিঃ
পুরুষঃ॥" ইতি কারিকা।

শ্রুতিতে আছে "একমেবাদ্বিতীয়ং"। ইহার অর্থ সকল তত্ব পুরুষে লয় হয়। শক্তি

শক্তিমানে অভেদ নাই। লয়ে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান মাত্র। লয়—নাশ নহে। শ্রুতিতে আরও আছে, "আসীজ্জ্ঞানমথো......ক মেবাধিকল্পিতং।" এইরূপে সাংখ্যের সহিত বেদান্তের অদ্বৈতবাদের বিরোধ থাকে না। যাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর চৈতন্য একমাত্র তত্ত্ব। যাঁহারা নিরীশ্বরবাদী, তাঁহাদের মতে ত্রিবেণীর ন্যায় সকল তত্ত্ব কূটস্থ পুরুষে অবিভক্ত রূপে থাকে। যেমন আদিত্য মণ্ডলে তেজোরাশি থাকে। সেইরূপ পুরুষে সূক্ষ্ম প্রকৃতির সহিত মহত্তত্ত্বাদি অবিভক্তরূপে থাকে। এই জন্য আত্মা একমাত্র তত্ত্ব।

৬২। স্থূল ভূত হইতে পঞ্চতন্মাত্রের সিদ্ধান্ত হয়। স্থূলভূত প্রত্যক্ষ, অন্যতত্ত্ব অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ।

সত্ত্ব, রজঃ তমোভেদে শান্ত ঘোর মূঢ় রূপ স্থূল পঞ্চভূত হইতে তাহার কারণ রূপ পঞ্চতন্মাত্রের অনুমান হয়। (অনিঃ)

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলভূত—কার্য্য। কার্য্য বলিয়া তাহার কারণের অনুমান হয়। আমরা যে সকল স্থূল পদার্থ দেখি, ইহাদের কারণকেই তন্মাত্র বলে। (সৎকার্য্যবাদ)। (বিঃ ভিঃ)

যাঁহাদের গুণসকল বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহারা স্থূল। এইজন্য আকাশও স্থূল। কেন না তাহার গুণ (শব্দ) কর্ণগ্রাহ্য। স্থূলের শান্তাদি বিশেষ গুণ আছে। যে জাতীয় শব্দ, স্পর্শাদিতে শান্তাদি বিশেষ গুণ নাই, সেই শব্দাদির আধারভূত যে সূক্ষ্ম দ্রব্য, তাহাই তন্মাত্র। শান্ত—সুখাত্মক, ঘোর দুঃখাত্মক, আর মূঢ়—মোহাত্মক। বিষ্ণু পুরাণে আছে—"তস্মিং স্তস্মিংস্তু তন্মাত্রাস্তেন তন্মাত্রতাস্মৃতা। ন শান্তা নাহপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষিণঃ॥

বিশেষ গুণ নাই বলিয়া তন্মাত্র অবিশেষ। তন্মাত্র দেবগণের ভোগ্য—এ জন্য তাহারা শান্ত বা সুখাত্মক। তাহারা সমস্ত ভূতের উপাদান।

কারণ-গুণ অনুসারে কার্য্য-গুণ হয়। মূল প্রকৃতি শব্দাদি বিহীন—রূপাদি বর্জ্জিত। বুদ্ধি অহঙ্কার ইহারা ভূতের কারণ, এজন্য ইহারা উক্ত গুণাদি বর্জ্জিত।

স্বীয় কারণ দ্রব্যের ন্যূনাধিক ভাবে যে সংযোগ, তাহাই তন্মাত্রের রূপাদির কারণ, ইহা বলা যায় না।

শব্দ দ্বারা আকাশের দর্শনাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অনুমান হয়। যোগসূত্র মতে—অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র, সেই অহঙ্কার সহকৃত শব্দ তন্মাত্র হইতে শব্দ ও স্পর্শ গুণাত্মক স্পর্শ তন্মাত্র জন্মে। ইত্যাদি আকাশই স্পর্শ তন্মাত্র সৃষ্টি করে, তাহা হইতে বায়ু—ইহা বিষ্ণু পুরাণে আছে। স্থূল ভূত হইতে এই যে তন্মাত্র সৃষ্টির কথা আছে, তাহা ভূত রূপে পরিণাম মাত্র।...

৬৩। বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয় হইতে ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে (তাহাদের কারণ) অহঙ্কারের অনুমান হয়।

অভিমান অহঙ্কারের বৃত্তিমাত্র। অভিমানবৃত্তিক অন্তঃকরণই অহঙ্কার। তিনি (হিরণ্যগর্ভ) কল্পনা করিলেন, "আমি বহু হইয়া উৎপন্ন হইব।" ইহাই শ্রুতি, ইহা হইতে জানা যায় যে, অহঙ্কারই সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। সমষ্টিরূপ বুদ্ধি সৃষ্টির উপাদান কারণ ইহা পুরাণাদির মত। হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কার হইতে সৃষ্টি হয়, বিজ্ঞানভিক্ষু বুঝাইয়াছেন। কুম্ভকারের ঘট সৃষ্টির মূল যে অহঙ্কার, তাহা কুম্ভকারের নহে, হিরণ্যগর্ভের। ইহাও বলা যায় যে,

মুক্ত পুরুষের অন্তঃকরণের সে পুরুষের ভোগ হেতু পরিণাম নাই সত্য, কিন্তু পরিণাম-সামান্যরূপ অন্তঃকরণ মাত্রের উচ্ছেদ হয় না। মুক্ত পুরুষের উপকরণ অন্য পুরুষের পুরুষার্থ সাধন করে। (কুম্ভকার কল্পিত ঘট, সেইরূপ অন্য পুরুষের প্রয়োজন সাধন করে।)

৬৪। সেই অহঙ্কার হইতে অন্তঃকরণের অনুমান হয়।

(মুখ্য অন্তঃকরণই বুদ্ধিতত্ত্ব। নিশ্চয় বৃত্তিমৎ দ্রব্যাত্মক বুদ্ধিই অহঙ্কারের উপাদান। কারণের বৃত্তিজ্ঞানে কার্য্যের বৃত্তিজ্ঞান হয়।)

(প্রত্যেক ব্যক্তি 'আমি এই কার্য্য করিব'—এইরূপ স্বরূপতঃ পদার্থ নিশ্চয় করিয়া পরে সেই বিষয়ে অভিমানী হয়, বা সেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।—"অয়মহং ময়েদং কর্ত্তব্যম্।"

শ্রুতিতে আছে—"স ঈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি। এই ঈক্ষণই সৃষ্টির মূলে বুদ্ধিতত্ত্ব। তাহা হইতে নিখিল সৃষ্টি হইয়াছে। 'বহুস্যাম্'—ইহা অহঙ্কার।

অন্তঃকরণ এক হইলেও বৃত্তিভেদে তাহা ত্রিবিধ—বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন।

মনই মহান্, তাহা এক বৃত্তিভেদে ভিন্ন। প্রাণও মনের ক্রিয়া।

অহং অর্থোদয়ো যোঽয়ং চিত্তাত্মা বেদনাত্মকঃ
এতচ্চিত্তদ্রুমস্যাস্য বীজং বিদ্ধি মহামতে।
এতস্মাৎ প্রথমোদ্ভিন্নাৎ অঙ্কুরোঽভিনবাকৃতিঃ
নিশ্চয়াত্মা নিরাকারো বুদ্ধিরিত্যভিধীয়তে।
অস্য বুদ্ধ্যভিধানস্য যাঙ্কুরস্য প্রলীনতা
সংকল্পরূপিণী তস্যা শ্চিত্তচেতো মনোঽভিধা ॥"

ইতি যোগবাশিষ্ঠ।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ।

হিন্দু জাতির ভবিষ্যৎ ভাবনায় কোন কোন চিন্তাশীল সমাজহিতৈষী ব্যক্তি অতি মাত্র চিন্তিত হইয়াছেন। নানাকারণে হিন্দু জাতির দিন দিন বলক্ষয় ঘটিতেছে। হিন্দু যেমন শরীরে দুর্ব্বল, মনে দুর্ব্বল হইতেছে, হিন্দুসংখ্যাও ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে হিন্দুকে সেইরূপ বা তদতাধিক দুর্ব্বল করিতেছে। গত ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের লোক-গণনায় সমগ্র ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ২০, ৭৭, ৩১,১২১ জন ছিল; পরবর্ত্তী ১৯০১ অব্দের গণনায় ঐ সংখ্যা ২০,৭১,৪৭,০২৬ জন নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং দশ বৎসর কাল মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, জানা গিয়াছে; কিন্তু ঐ সময়েই অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ভারতে যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া ক্রমে হ্রাস পাইতেছে কেন, গড়ে প্রতি বৎসর ৬০ হাজারের উপর হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ হিন্দুর জাতীয় জীবন মরণের, জাতীয় অস্তিত্বানস্তিত্বের গুরু প্রশ্ন ইহাতে বিজড়িত, অন্যান্য কথায় কি কাজে ঔদাস্য আলস্য ততটা আশু সাংঘাতিক না হইতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে আজও আমরা অবহেলা করিলে আমাদের জাতীয় বিলোপ অতি সত্বর সংঘটিত হইবার আশঙ্কা।

সমস্ত ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা প্রায়

ছয় কোটী। কিন্তু এক বঙ্গদেশেই তাহার সংখ্যা প্রায় তিন কোটী। ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তভাগে, মুসলমানের, ভারতবর্ষের প্রথম প্রবেশ-দ্বার পঞ্চনদ প্রদেশ হইতে বহু শত মাইল দূরে, এই বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যা সমগ্র ভারতের মুসলমান সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ কেন, তাহা কি আমাদের একবারও ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে ?

গত লোক-গণনায় ভারতবর্ষের কয়েকটী প্রধান প্রধান প্রদেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যার অনুপাত কত, তাহার একটা মোটা-মুটী হিসাব আমরা নিম্নে দিলাম।

প্রদেশ—	মুসলমানের অনুপাত—
মধ্যপ্রদেশ (C.P)	১/২০ অংশের ন্যূন
মান্দ্রাজ	১/১৬ অংশ
উঃ প্রদেশ (N.W.P)	১/৪ অংশ
পশ্চিম বঙ্গ	১/৬ অংশের উপর
বোম্বাই	১/৫ অংশ
পূর্ব্ববঙ্গ	৪/৫ অংশ

পাঠক ! এই হিসাবে দেখুন, পূর্ব্ববঙ্গের শত করা প্রায় ৮০ জন অধিবাসী মুসলমান, অবশিষ্ট ২০ জন মাত্র হিন্দু; কোন কোন জেলায়, কোন কোন উপবিভাগে, কোন কোন থানায় মুসলমানের সংখ্যা এ অনুপাতও অতিক্রম করিয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর উপবিভাগে গত ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে হিন্দুর সংখ্যা ১২৭৩৭৩ জন এবং মুসলমানের সংখ্যা ৫৪২৬৯৩ জন নির্দ্ধারিত হয়; নিজ জামালপুর থানায় হিন্দুর সংখ্যা ৪৪৩৯৫, অপরদিকে মুসলমানের সংখ্যা ২৪৭৯৪০ জন পরিগণিত হয়। আবার দেওয়ানগঞ্জ থানায় হিন্দুর সংখ্যা ১৬১৯৮ জন মাত্র, আর মুসলমানের সংখ্যা ১২৮৭২৪ এক লক্ষ আটাইশ হাজার সাত শত চব্বিশ জন অর্থাৎ দেওয়ানগঞ্জে প্রতি নয় জন অধিবাসীর মধ্যে আট জনই মুসলমান।

পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতও অত্যন্ত অধিক। আমরা এখানে কেবল একটী জেলারই হিন্দু এবং মুসলমান, উভয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত প্রদর্শন করিব। বুদ্ধিমান পাঠক তাহাতেই উভয় সমাজের অন্যান্য জেলার অবস্থাও অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। গত ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সসে ময়মনসিংহে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০,৪১,৫২৩, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ২৩, ৯৬,৪৭৬তে পরিণত হয়। পরবর্ত্তী দশবৎসরে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের গণনায় তাহা ২৭,৯৫,৫৪৮ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ সামান্য বিশবৎসর কাল মধ্যে একমাত্র ময়মনসিংহ জেলাতেই মুসলমানের বৃদ্ধির পরিমাণ সাড়ে সাত লক্ষেরও অনেক বেশী। গত ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই জেলার হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৯,৮৭,৬০৮ জন, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ১০৪৫৫৬৩ জন এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সংখ্যা ১০৮৮৮৫৭ হইয়াছে, সুতরাং বিশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা মোট বৃদ্ধির পরিমাণ ১০১২৪৯ জন মাত্র। কোথায় সাড়ে সাত লক্ষ, আর কোথায় এক লক্ষ ! হিন্দুর বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ১০জন। অপর দিকে মুসলমানের বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৩৭ জন, প্রায় চতুর্গুণ। মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমরা দুঃখিত কিম্বা ঈর্ষান্বিত হইতেছি, এরূপ কেহ মনে ভাবিবেন না। একই স্থানের অধিবাসী, উভয় সম্প্রদায়ের লোক বহু বিষয়ে তুল্যাবস্থ, কেবল ধর্ম্ম সমাজ সম্পর্কে উভয়ের পার্থক্য আছে বলিয়া তুলনায় সমালোচনার সুবিধার জন্যই এ সকল সংখ্যার এখানে উল্লেখ করিলাম।

এখানে আর একটী কথা উল্লেখ করা

আমরা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত জেলার একটী মুসলমান মস্তকও দৃষ্ট হয় নাই। ১৪৯১ খ্রীঃ অব্দেই এ জেলায় মুসলমান প্রথম প্রবেশ লাভ করেন। * চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগে একটীও মুসলমান অধিবাসী ছিল না, আজ সেখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বোধ হয় ৩৩ তেত্রিশ লক্ষের ন্যূন হইবে না। †

পূর্ব্ব বঙ্গে সুদূর তুরস্ক, পারস্য, আরব, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশাগত সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর মুসল মানের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সুতরাং ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ মুসলমান, এ দেশের পূর্ব্বতন আদিম অধিবাসী কিম্বা নিম্ন স্তরের হিন্দুদিগের বংশধর, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। এ দেশের এত অধিক সংখ্যক লোকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল কেন? কেহ তাহার কারণ অনুসন্ধান জন্য কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি?

বাঙ্গালার বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার, জীবনযাত্রা পদ্ধতি, বিবাহ বিধি, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের ব্যবহার, এ প্রদেশের হিন্দু সমাজের উন্নতির সহায়ক না হইয়া বরং কিরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছে এবং আজও করিতেছে, তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান সমাজহিতৈষী হিন্দুর এখনও ভাবিয়া দেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। দিন দিন সংখ্যা হ্রাস, অন্নকষ্ট, অর্থাভাব, বৃত্তিলোপ, সামাজিক নিগ্রহ, বিবাহের পণ, পাকস্পর্শ প্রভৃতির ব্যয়াধিক্য, বিবাহ যোগ্যা বয়স্কা পাত্রীর সংখ্যাল্পতা, নিম্নশ্রেণীর লোকের প্রতি উচ্চ-স্তরের লোকের ঘৃণা বিদ্বেষ, নির্য্যাতন প্রভৃতি নানা প্রকারের অশান্তি ও অসুখের কারণ সম্মিলিত হইয়া সমাজের নানা স্তরে অসন্তোষের আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। তদুপরি, মুসলমান জাতি প্রভৃতি কয়েকটী নূতন কারণে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুগণ শীত-সঙ্কুচিত ভুজঙ্গমের ন্যায়, বিতাড়ন-ভীতি-বিহ্বল কূর্ম্মের ন্যায় সদা সশঙ্কিত অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে। অনেকে ভবিষ্যতের ভাবনায় যেমন চিন্তিত, কেহ কেহ বর্ত্তমানের ভাবনায়ও তেমনি উদ্বিগ্ন। বাস্তবিক পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু জনসাধারণের অবস্থা অতি শোচনীয়; ভবিষ্যৎ যেন একবারে অন্ধতমসাচ্ছন্ন। বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে শান্তপ্রকৃতিক ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু দীর্ঘকাল পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতে পারিবে কিনা, তাহাই অনেকের চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, লোক গণনার হিসাব (সেন্সস রিপোর্ট) আমাদিগকে আজও সতর্ক করিতে পারিল না, আমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে জাগরিত করিতে পারিল না। জামালপুর, বক্সীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের পৈশাচিক কাণ্ডেও আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে পারিল না—সমাজ-নেতাগণের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারিল না। সামাজিক যে সমস্ত দুঃখ দুর্গতির কারণ আমরা সামান্য চেষ্টা দ্বারা অপনোদন করিতে পারি, যে অপমানক্লিষ্ট স্নেহ লিপ্ত করিয়া যাতনার বহুপরিমাণে লাঘবতা করিতে পারি, প্রেম ও সহানুভূতির ধারা বর্ষণ দ্বারা সমাজের

* ময়মনসিংহের ইতিহাস ৩০।৩১ পৃষ্ঠা দেখুন, (শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত)।

† ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান সংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষ ছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আর ৫ পাঁচলক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে, অনুমান অসঙ্গত নহে।

যে যে শুষ্ক প্রত্যঙ্গকে সঞ্জীবিত এবং সরস করিতে পারি, আলস্য, অনুদারতা এবং অজ্ঞানতার নিমিত্ত আমরা তাহাতে নিরস্ত রহিয়াছি। ভূস্বামিবর্গের অমনোযোগে, ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের ঔদাস্যে এবং বিদ্বেষে, দেশাচারের কঠিন নির্ম্মম নিষ্পেষণে সমাজের অস্থি-মর্ম্ম চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া শাস্ত্র; ন্যায়, ধর্ম্ম, বিচার-বুদ্ধি, জাতীয় মঙ্গল, সমস্তকে পদদলিত করিয়া বাঙ্গালায় হিন্দু জাতির কি সর্ব্বনাশের সূচনা করিয়াছে, আজও কি আমরা তাহার প্রতিকার জন্য সচেষ্ট হইব না? অতীত যুগের অনুষ্ঠানে কিম্বা অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অনুতাপ কিম্বা অশ্রুপাত করা নিরর্থক। কিন্তু অতীতের শিক্ষাকে অবহেলা না করিয়া--বিস্মৃতির অতল জলধিতে বিসর্জ্জন না করিয়া, অনাগত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য স্থির করাই বুদ্ধিমানের কাজ। নিম্নস্তরের হিন্দুগণের কথাই আজ আমরা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি; উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের বর্ত্তমান অবস্থা আমরা সময়ান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। নিম্নস্তরের হিন্দুগণের অসুখ অশান্তির যেন অন্ত নাই। তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্য-পূর্ণ সংসারে আনন্দের অমিয় প্রস্রবণের উৎস যেন চিরদিনের তরে রুদ্ধ। রোগে, শোকে, অনাহারে, অল্পাহারে, শত অপমান নির্য্যাতনে জর্জ্জরিত হইয়া তাহাদের অনেকেই বিড়ম্বনাবহুল জীবনভার যেন দুর্ব্বহ মনে করিতেছে! আশা আশ্বাস উল্লাসে উল্লসিত করিবার আলোক-রেখা যেমন অল্পসংখ্যক, তেমনি অস্পষ্ট, ক্ষীণ জ্যোতি-বিশিষ্ট। পূর্ব্বতন কালের সেই স্বর্গীয় স্ফূর্ত্তি, আজকাল আর কোথাও যেন দেখিতে পাওয়া যায় না। সুখশান্তি, সৌভাগ্যের বিমল হাস্য বহু পরিবারে অধুনা দুর্লভ-দৃশ্য। সংশয়, শঙ্কা, অভাব, ঔদাস্য, অবহেলা এবং নির্য্যাতনের নিরাশ-সমুদ্রে অনেকে অহর্নিশি হাবুডুবু খাইতেছে। আশ্বিনে মা আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দের মঞ্জুমন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া সুখশান্তিতে পরিতৃপ্ত হইবার বাসনা এখন আর অনেকের মনে জাগে না। চির-বিষাদের দুর্ব্বিসহ বিষতরঙ্গিণীতে আশৈশব নিমজ্জিত থাকিয়া তাহাদের অনেকেই জীবন্মৃতের ন্যায় দিন যাপন করিতেছে।

চির-শ্যামল পূর্ব্ববঙ্গ প্রকৃতই স্বর্ণভূমি। পৃথিবীর অপর কোন ভূখণ্ডের সহিত এই সু-বর্ষণ-পরিষিক্ত নদীমাতৃক দেশের তুলনা হইতে পারে, মনে করি না। বঙ্গমাতার অপরিমেয় কৃপা-সুধা বার মাসের তের ফসলে যেন বস্তুতই উথলিয়া পড়িতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ ভূম্যধিকারীই হিন্দু। কিন্তু প্রায় ভূমিই মুসলমান কৃষকের হাতে। মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যানুপাত অপেক্ষা অনেক বেশী জমী মুসলমানদের হাতে রহিয়াছে। মাহিষ্য-দাস, নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতীয় অল্পসংখ্যক লোকে পূর্ব্বে কৃষিকর্ম্মে লিপ্ত ছিল। বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ব্যয়-বাহুল্যে তাহাদের অনেকের অবস্থা আজ কাল শোচনীয়। অনেকে ঋণদায়ে চাষের জমী বিক্রয় করিয়াছে; কেহ দীর্ঘকাল জন্য উত্তমর্ণের করে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু অধিবাসী, তালুকের উপসত্ব, টাকার সুদ, ব্যবসায়ের লাভ, এবং কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, তেলী, সূত্রধর প্রভৃতি কোন কোন শ্রেণীর লোকে এতদিন, স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসা দ্বারা দিনপাত করিত। তাহাদের অধিকাংশের ব্যবসা এখন হস্ত-

চ্যুত হইতেছে। অনেক ব্যবসা বিদেশীয়ের সহিত অসম প্রতিযোগীতায় বিনষ্ট হইয়াছে। কোন কোন ব্যবসায়ে মুসলমান হস্তক্ষেপ করায় হিন্দুগণ পরাস্ত হইয়াছে। তাই আজ কাল বহু হিন্দু বৃত্তিবিহীন হইয়া প্রমাদ গণিতেছে। প্রাকৃতিক কারণে, বিশেষতঃ ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে এ প্রদেশের বহু খাল বিল নদী নালা বন্ধ হওয়ায় এবং পাটের চাষ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায়, পাটপচা জলের দুর্গন্ধে মৎস্য সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। পূর্ববঙ্গে হিন্দুর অন্যতম প্রধান খাদ্য মৎস্যের দিন দিন অপ্রাচুর্য্য এবং দুর্ম্মূল্যতা বৃদ্ধি হইতেছে। জলপথ বন্ধ হওয়ায় এবং মৎস্য সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় মাল, কৈবর্ত্ত ও পাটুনী প্রভৃতির বৃত্তিলোপ হইবার আশঙ্কা হইয়াছে। দেশে গোচারণের ভূমি ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, এ কারণ অনেক গ্রামে গোপালনের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। একদিকে অধিকাংশ ভূমিতে ধান্য না দিয়া পাট উৎপন্ন করায় গবাদি পশুর খাদ্যাভাব হইয়াছে, তাহাতে ভূমির দুষ্প্রাপ্যতা বশতঃ গোচারণ ভূমি পর্য্যন্ত কর্ষিত হওয়ায় দেশে দুগ্ধ ঘৃতাদির অত্যন্ত অভাব হইয়াছে।

পাটের চাষ এবং মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে বটে এবং কৃষক শ্রেণীর হাতে টাকার কিছু প্রাচুর্য্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ভূমি মুসলমান কৃষকের হাতে আছে। পাট-চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দ্রব্যেরই মহার্ঘতা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার ফলে কৃষিশূন্য হিন্দুগণের অন্নবস্ত্রাদির সর্ব্ব বিষয়ে কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। উপযুক্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যজনক আহার্য্য এবং পরিচ্ছদ অভাবে ভদ্রেতর বহু হিন্দু কি ভাবে দিন যাপন করিতেছে, তাহা স্থানীয় অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বলিতে পারেন।

নিম্নশ্রেণীর বহু হিন্দুর বিবাহে কন্যার পিতাকে পণ দিতে হয়। ফলে, উপযুক্ত বয়সে অনেক যুবক বিবাহ করিতে পারে না। এই সকল শ্রেণীতে বালিকা বিবাহ, শিশু বিবাহ বহু পরিমাণে লক্ষিত হয়। বয়োবৃদ্ধ বরের সহিত শিশু কন্যার বিবাহের বিষময় ফল—বাল বিধবার সংখ্যাধিক্য। যে সকল শ্রেণী মধ্যে অতি অল্প কাল পূর্ব্বেও বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহারাও ব্রাহ্মণ, কায়স্থের অনুকরণে বিধবা বিবাহ প্রথা রহিত করিয়াছে। এ কারণেও সমাজের সংখ্যাল্পতা ও দুঃখ আশস্তি বৃদ্ধি করিতেছে। শাস্ত্রানুসারে স্বসমাজ-প্রীতি এবং স্বদেশ-প্রীতি আর্য্য ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের সনাতন ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত, অবশ্য-কর্ত্তব্য বিষয়। সুতরাং স্বসমাজের স্থিতি এবং উন্নতির জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা কথা হিন্দু সন্তান মাত্রেরই পরম পবিত্র "ধর্ম্ম"। ব্যষ্টিকে বাদ দিয়া আমরা যেমন সমষ্টিকে পাইতে পারি না, সেইরূপ, সমাজের এক একটী ক্ষুদ্র শ্রেণীকে উপেক্ষা করিয়াও আমরা "সমাজকে" পাইতে পারি না। যাহার হৃদয়ে মাতৃভক্তি নাই, তাহার স্বদেশ-প্রীতি যেমন অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব, যাহার স্বসমাজ ও স্বধর্ম্মীর প্রতি প্রীতি অনুরাগ নাই, তাহার স্বদেশ-প্রীতিও কথার কথা মাত্র। সমাজবৎসলতা না হইলে স্বদেশবৎসলতা জন্মিতে পারে, ধারণা করিতে পারি না। সমাজের উন্নতিতে আমার উন্নতি এবং সমাজের অবনতিতে আমারও অবনতি দৃঢ়-সম্পৃক্ত। এজন্য স্বসমাজের হিতকামনা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত সুখ সমাজস্থ বহুলোকের সুখের বিরোধী বা ব্যাঘাতক হইলে ঐরূপ স্থলে সমাজস্থ বহুলোকের সুখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যক্তিগত

সুখ, ক্ষুদ্র স্বার্থ, ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। হিন্দু শাস্ত্রের ইহাই মর্ম্মা-দেশ। সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" সম্প্রদায় প্রভৃতি বহু বিজ্ঞ সমাজেরও ইহাই অভিমত। এই জন্যই সর্ব্বাগ্রে স্ব-সমাজের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এবং এইজন্যই আত্মরক্ষা অপেক্ষাও সমাজ রক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এজন্য আমাদের হিন্দুসমাজ আমাদের প্রত্যেকেরই, হিন্দুমাত্রেরই অতি সম্ভ্রমের, অতি সমাদরের, অতি প্রীতির, অতি গৌরবের আস্পদ। বৌদ্ধেরাও এই সমাজকে "সংঘ" বলিয়া পরম শ্রদ্ধা ভক্তির চক্ষে অবলোকন করেন। বিশেষতঃ আমাদের ন্যায় অতি প্রাচীন মহা-মহিমান্বিত পূজ্য সমাজ এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

হিন্দুসমাজ সর্ব্বাংশেই আমাদের মাতৃ-স্থানীয়। ব্রাহ্মণ এই সমাজ-দেবতার মস্তক, বৈদ্য কায়স্থ এ সমাজ দেহের চক্ষু কর্ণ, নব-শাখ এ বিরাট দেহের কাণ্ড, কৈবর্ত্ত, মাহিষ্য, সাহা, নমঃশূদ্র, রজক, পাটুনী, ডোম, বাগ্দী, প্রভৃতি কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ হস্তাঙ্গুলী, কেহ পদাঙ্গুলী, ক্ষুদ্র বৃহৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। মায়ের বিরাট দেহে সকলের এবং প্রত্যে-কেরই যেমন প্রয়োজনীয়তা, তেমনি শোভ-নীয়তাও আছে। কোন একটীকে বাদ দিলে মায়ের অঙ্গ শোভার নিশ্চয়ই হানি হইবার আশঙ্কা। যদি হস্ত পদ বা একটী পদাঙ্গুলী রুগ্ন, বিকৃত, কার্য্যাক্ষম কিম্বা দেহ-বিচ্যুত হয়, তবে মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের গর্ব্ব করা দূরে থাকুক, তাহার জীবনেরই কত আশা করিতে পারি? দূষিত ক্ষত (cancer) সামান্য হইলেও কালে দুশ্চিকিৎস্য প্রাণান্তকর ব্যাধিতে পরিণত হইয়া থাকে।

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের ব্যবহারেও অনেক নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মনোকষ্ট প্রাপ্ত হইতেছেন। এ জগতে প্রায় সকলেই আত্মসুখান্বেষী। কিন্তু আত্মসুখলালসায় অন্ধ হইয়া অপরকে তাহার স্বীয় প্রাপ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অবৈধ চেষ্টা করিলে, অপরের প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি বিনষ্ট করিলে, কোন্ ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার অনুমোদন করিবেন? মানব-ভোগ্য সর্ব্ববিধ সামাজিক সুখ-সম্মান-সম্ভোগ সম্ভবপর হইলে, কোন দারুণ প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সেগুলি নিজের এবং আপনার আত্মীয় প্রিয়জনগণের উপভোগের আয়ত্তা-ধীন করিবার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়াস মনুষ্য মাত্রেরই স্বাভাবিক এবং তাহা নিন্দনীয়ও নহে। আমাদের হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের বহু শ্রেণীর লোকে আজকাল হিন্দুসমাজে কথঞ্চিত আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। শিক্ষার আলোক-রেখার ঈষৎ সম্পাতেই অনেকের আত্মজ্ঞান জাগরূক হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের বিদ্যা-লয়, বিচারালয়, রেলপথ, ষ্টীমার, সংবাদপত্র, মিউনিসিপালিটী, লোকাল বোর্ড,—সর্ব্বত্র সাম্যের সম্মোহন-মন্ত্র তারস্বরে প্রচারিত হইতেছে। তাহার গতিরোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এমন যে প্রবল প্রতাপান্বিত 'কলির ব্রাহ্মণ' ইংরাজ, তিনিও তাহা সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছেন এবং এতদ্দেশীয় জন সাধারণের স্বায়ত্ত-শাসন-লাভ-প্রচেষ্টার দুর্দ্দ-মনীয় স্পৃহা এবং নিত্য-প্রবর্দ্ধমান শক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করা অসম্ভব জানিয়া শান্ত-সংযমিত করিবারই বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, ইতিহাসের উপদেশ আমরা উপেক্ষা করিয়া আমাদের স্বসমাজের নিম্ন-স্তরের ভ্রাতৃগণের আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠায় সর্ব্ব-

বিধ চেষ্টাকে আজও কেবল ঘৃণা বিদ্বেষ এবং উপহাসের চক্ষেই অবলোকন করিতেছি। ব্রাহ্মশক্তি আমাদের করায়ত্ত নহে। পূর্ব্বের সেই ব্রাহ্মণ্যতেজ, ক্ষাত্রতেজ কিছুই আর নাই। আজকাল "গুণ এবং কর্ম্ম" মানদণ্ডের সাহায্যে পরিমাপিত করিলে বর্ত্তমান সময়ে আমরা—ব্রাহ্মণ কায়স্থ সাহা নমঃশূদ্র সকলেই প্রায় তুল্যাবস্থ"শূদ্র"পর্য্যায়ে পরিগণিত হইব। ভয় এবং সম্রমের কোন কারণই আর বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সন্তান মধ্যেও বিদ্যমান নাই। আমাদের তর্জ্জন-গর্জ্জন নিরর্থক, বরং অনেকের নিকট উপহাসের বিষয়। তবে কেন আজও আমরা হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের অসংখ্য নরনারীর হৃদয়-বেদনা দূর করিতে চেষ্টা না করিব? আজও কি আমরা আমাদের জাতীয় বিনাশকে আমাদের কর্ম্ম দোষে নিকটবর্ত্তী করিতেই রত থাকিব?

সাহা, শৌণ্ডিক, নমঃশূদ্র, পাটুনী প্রভৃতি কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, হিন্দু নাপিত এবং কেহ কেহ হিন্দু রজক দ্বারা কোন কাজ করাইতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ সকল শ্রেণীর কোন হিন্দু যদি মুসলমান কিম্বা খ্রীষ্টানের ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে চাহে, তবে সে তদ্দণ্ডেই হিন্দু নাপিত ধোপার দ্বারা কাজ করাইবার অধিকার লাভ করে। যতক্ষণ তাহারা হিন্দুসমাজ ভুক্ত থাকিয়া হিন্দুর দেবতা এবং ব্রাহ্মণকে প্রীতি ভক্তির চক্ষে অবলোকন করে, ততক্ষণই তাহারা হিন্দু ক্ষৌরকার এবং রজকের নিকট অবজ্ঞাত ও অস্পৃশ্য থাকিবে। কিন্তু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবা মাত্র, তাহারা হিন্দুর অখাদ্য ভোজনে অকুণ্ঠা প্রকাশ করিবা মাত্র, হিন্দুর দেবদেবী বিদ্বেষ্টা হইবা মাত্র, তাহারা হিন্দুর নিকট অধিকতর সম্মান, সমাদরের পাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এমন আত্মঘাতী নীতি, এমন অনুদার ক্ষুদ্র বুদ্ধি জগতে আর কোন দেশে, কোন ধর্ম্মসমাজে কখনও দেখিতে পাইবেন কি?

স্বধর্ম্মীর প্রতি প্রেমানুরাগ প্রকাশ হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইলেও, আমাদের মনে হয়, এ সম্পর্কে বর্ত্তমান যুগের অধঃপতিত বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ অপেক্ষা খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি সমাজের লোকেরা বহু উন্নত। মুসলমানের চরিত্রে অপর বহু দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু মুসলমানের স্বধর্ম্মী-প্রীতির তুলনা বোধ হয় জগতে অন্যত্র নাই। ইউরোপীয়দের এবং নব্য জাপানের স্বদেশ-প্রীতি প্রশংসনীয়,সন্দেহ নাই, বৃটনীয়ের সাম্রাজ্য-প্রীতিও অতুলনীয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু মুসলমানের স্বধর্ম্মী-প্রীতি যেমন কোন দেশের কিম্বা কোন্ সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, ইসলামের বৃহত্তম ধর্ম্মপতাকার আশ্রয়-স্থিত শ্বেত,পীত, কৃষ্ণ নির্ব্বিশেষে এসিয়া, ইউরোপ,আফ্রিকা,এমেরিকার মৃত্তিকার জন্মভেদ বিচার না করিয়া, পৃথিবীর সকল দেশের নরনারীর মধ্যে অবাধে অজস্রধারে পরিব্যাপ্ত হয়, বর্ত্তমান কালে অপর কোন সম্প্রদায়ে সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। ডেমোক্রেটিক ইংরাজ, এমন কি, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জয়-পতাকাধারী ফরাসী, উচ্চতর কণ্ঠে সাম্যবাদ ঘোষণা করিতে পারেন, কিন্তু মুসলমানের মত বুকে হাত দিয়া ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, এখন সাম্যবাদের আর কেহ সম্মাননা করিতে পারিবেন না। বিজাতীয় অজ্ঞাত কুলশীল বিধর্ম্মী ক্রীতদাসকে স্বধর্ম্মে দীক্ষা দান করিয়া একমাত্র মুসলমান নৃপতিই তাহার করে কন্যা সম্প্রদান করিয়া এবং তাহাকে স্বীয় সাম্রাজ্যের ভাবী-উত্তরাধি-

কারী করিয়া স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের এবং সাম্যবাদের অতুল বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন। * অজ্ঞাত-কুলশীল ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তির নিকট কন্যা সম্প্রদান রূপ—শঙ্করবিবাহের অপর শত দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা মুসলমানের সাম্যবাদের এবং মত বিশ্বাসের যে অসাধারণ উদাহরণ, তাহার আর সন্দেহ কি?

সে যাহা হউক, হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের বহু লোক, উর্দ্ধস্তরের স্বধর্ম্মীদের দ্বারা অন্যায় রূপে বিড়ম্বিত ও নিগৃহীত হইতেছে, মনে নিদারুণ কষ্ট পাইতেছে, অসন্তোষের তুষানল হৃদয়ে ধরিয়া সর্ব্বদা তপ্তশ্বাস ফেলিয়া সমাজের বায়ুকে দিন দিন অধিকতর বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কত শত সহস্র লোক আজও এই দুঃস্থ পতিত সমাজকে ধিক্কার দিতে দিতে, কেহ খ্রীষ্টান সমাজ, কেহবা মুসলমান সমাজের ক্রোড়ে শান্তি লাভের আশায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। আমরা দিন দিন বলক্ষয় জন্য দুর্ব্বল হইতেছি, অপরদিকে বিধর্ম্মীরা অধিকতর দলপুষ্ট হওয়ায় বলশালী হইতেছে। হিন্দুসমাজের এ ক্ষয়-রোগের প্রতিকারক্ষম উচ্চ স্তরের সামাজিকগণের এ ব্যাধির মূলোৎপাটন করিতে আর বিলম্ব করা সঙ্গত হইতেছে কি? কোন গোষ্ঠীপতি কেবল স্বকীয় সুখ দুঃখের ভাবনায় সর্ব্বদা তন্ময় থাকিয়া পরিবারস্থ অপর কাহারও অসুখ অসুবিধার প্রতিবিধান জন্য একবারও দৃষ্টিপাত না করিলে সে পরিবারের কখনও মঙ্গল হইতে পারে কি? নিম্নস্তরের হিন্দুগণও যে আমাদের এক পরিবারের ছোট ভাই, তাহা বুঝিবার ও সকলকে বুঝাইবার এখন নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। একটুকু আদর প্রীতি, একটুকু ভালবাসা দেখাইয়া, সুদয় ব্যবহারে আপনার জনকে অধীনে সন্তুষ্ট রাখার অপমান কিম্বা ক্ষতি কি?

বঙ্গদেশে আমরা অধিকাংশ হিন্দুর জল অনাচরণীয় করিয়া রাখিয়াছি। পশ্চিম ভারতে বঙ্গদেশের মত জল এত সহজ প্রাপ্য নহে। অনেক স্থলে জল ৪০।৫০।৬০ হাত মৃত্তিকার নিম্নস্থ কূপ হইতে উত্তোলিত করিতে হয়। সে সকল দেশের মৃত্তিকাও বঙ্গদেশের ন্যায় এত নরম নয়। সুতরাং মৃণ্ময় কলসে কিম্বা ধাতব পাত্রে সে দেশে কূপ হইতে জলতোলন সম্ভবপর নহে, কঠিন মৃত্তিকায় লাগিবা মাত্র ধাতব পাত্রও সহজে এবং সত্বর ভগ্ন হইবার কথা। সুতরাং সে সকল প্রদেশে বহু নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, এমন কি, কোন কোন স্থানে মুসলমানেও, চর্ম্ম-নির্ম্মিত কলসে—মশকে কূয়া হইতে জল তুলিয়া ব্রাহ্মণাদি জাতির দেবপূজা সন্ধ্যার্চ্চনা স্নানাহারের সরবরাহ করে। তাহাতে সে সকল দেশের ব্রাহ্মণাদির ধর্ম্মাচার অব্যাহত থাকে। বঙ্গদেশে জলের প্রাচুর্য্য বলিয়া আমাদের এত আঁটাআটি সঙ্গত হইতেছে কি?

এমন কি, পশ্চিমবঙ্গে যে সকল শ্রেণীর হিন্দু কোন ঘরে উপস্থিত থাকিলে অন্য একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দু তাহার সহিত অবশ্য-সংস্পর্শ-বিরহিত হইয়া জলপান করিতে কোন আপত্তি প্রকাশ করেন না, পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গে তাহাদের অনেকের গায়ের বাতাস লাগিলেও গৃহের সুদূরস্থিত জলভাণ্ড দূষিত হইয়া যায়। সমাজের কত উচ্চশ্রেণীর হিন্দু-সন্তান কত সাহেবের হোটেলে কত অভক্ষ্য ভক্ষণ, কত অপেয় পান করিয়াও নির্দ্দোষ

* ভারতবর্ষের পাঠান রাজগণের মধ্যেও এ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

রহিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। লেমনেড্, সোডা ওয়াটার এবং সহরের কলের জল না খাইতেছেন, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহে এরূপ পতিত ব্রাহ্মণের বোধ হয় আজ কাল একেবারে অভাব না হইলেও অত্যন্ত সংখ্যাল্পতা। ইউরোপীয় কোন খ্রীষ্টান ভদ্রলোক স্পর্শ করিলে পান খাইতে, এমন কি জলভরা হুকায় তামাক খাইতেও, অনেকের আপত্তি নাই। কিন্তু একজন নমঃশূদ্রের বেলায় যত দোষ! গো শূকরভোজী ইউরোপীয় খ্রীষ্টান শ্বেতচর্ম্মী এবং রাজার জাতি বলিয়া তাহার কি এই গৌরব?

বৈদ্য এবং কায়স্থদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। যদি তাঁহাদের "পৈতা" গ্রহণে হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ সমাজের কোন গুরুতর ক্ষতি কিম্বা অপমান না হইয়া থাকে, যদি মহাভারত অশুদ্ধ না হইয়া থাকে, তবে সাহা, নমঃশূদ্র, নাথ যুগী প্রভৃতির যজ্ঞোপবীত গ্রহণে ব্রাহ্মণাদির এত গাত্রদাহ হইতেছে কেন? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহের এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ সন্তান এক যুগী জাতীয় ব্যক্তির পৈতা ছিঁড়িয়া এক ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি হাবড়াতেও ঐরূপ আর একটা মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, শুনিয়াছি। দ্বিজত্বের চিহ্ন উপবীত গ্রহণে হিন্দু সমাজের এমন কি সর্ব্বনাশ হইতে পারে, বুঝি না। বরং অধিক সংখ্যক লোকে এ কারণে অধিকতর শুদ্ধ এবং সংযত। পাপভীরু হইলে হিন্দুর জাতীয় চরিত্র তদ্দ্বারা উন্নততর হইবারই কথা।

ভালবাসায় হৃদয় জয় করিতে না পারিলে শুধু রক্তচক্ষু দেখাইয়া, শাসনের লৌহদণ্ড উত্তোলিত করিয়া কেহ কোন দেশে দীর্ঘকাল শাসন করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ এই নবযুগে পারিবার আশা করা নিতান্ত বাতুলতা মাত্র। ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের নমঃশূদ্রগণ কার্য্যতঃ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে বয়কট ঘোষণা করিয়াছে। "নমঃশূদ্র", "নমঃশূদ্র সুহৃদ" "যোগী-সখা" "ঝালমাল-বান্ধব" প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মুখপত্র পত্রিকায় "বৈশ্যতত্ত্ব" "সদ্গোপ-সমাজতত্ত্ব" "মাহিষ্য-প্রসঙ্গ" প্রভৃতি পুস্তক পুস্তিকায়, বৈশ্যসাহা-সমিতি প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক সভাসমিতির কার্য্য-বিবরণীতে, নিম্নস্তরের হিন্দুগণের মনের ভাব এবং আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে। শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মসম্মান-জ্ঞান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। নিম্নস্তরের সমস্ত হিন্দুগণের সত্বর সম্মিলিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। দেশে আত্যাভিমানী উচ্চস্তরের হিন্দুর সংখ্যা অধিক নহে, অপরদিকে জল-অনাচরণীয়ের সংখ্যা কোটী কোটী। নিম্নস্তরের সকলে সম্মিলিত হইয়া, সাহা-শৌণ্ডিক, যুগী-নাথ, মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত, স্বর্ণবণিক স্যাকরা প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরের মধ্যে আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বিফল-প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া, সকলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণকে সাধারণ শত্রু জ্ঞান করিয়া বিদ্বেষ কিম্বা উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলে তখন উচ্চস্তরের হিন্দুগণের সুখ সম্মান বন্যার জলে কোথায় ভাসিয়া যাইবে, তাহাও এখন ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পরে অনুতাপ বিফল হইবে। ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব এক দিনে কিম্বা একের পাপে সংঘটিত হয় নাই। রুসো রুবেস্পেয়ার এবং মেরাবোর কথায় প্রথমে কর্ণপাত করিলে জগতের ইতিহাসের একটা সুবৃহৎ রক্ত-রঞ্জিত ইতিহাস বোধ হয় অন্তবর্ণে অন্যরূপে চিত্রিত হইত। মেরাবো প্যারিসের প্রধানতম রাজনৈতিক সভায় মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া যেন

সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধিরূপে অতি গম্ভীর-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে"—রাজা, রাজপদ ও রাজদণ্ড মর্য্যাদা অচিরেই অবনীর পৃষ্ঠ হইতে প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে, কিন্তু জনসাধারণের কোন কালেও বিলয় নাই।" ফ্রান্সের তদানীন্তন জাতীয় হৃদয় প্রতপ্ত বারুদ-গৃহের উপমাস্থল ছিল। উহা সাত শতাব্দীর সঞ্চিত দুঃখে দগ্ধ হইয়া একটা ভয়ঙ্কর অবস্থায় পঁহুছিয়াছিল। এই কথা উহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় নিপতিত হইল।* আমাদের এই বঙ্গদেশের বারুদখানার "নমঃশূদ্র সুহৃদ্" প্রভৃতি কি প্রকার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছেন, এখানে তাহার কিছু পরিচয় প্রদান করিতেছি। ফরিদপুরের "নমঃশূদ্র সুহৃদ্" লিখিতেছেন:—"ক্ষত্রিয় তেজ সম্পন্ন নমঃশূদ্র জাতিও হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন। ঈশ্বরের রাজ্যে সকল মনুষ্যই সমান। তাঁহার রাজ্যে উচ্চশ্রেণী বা নিম্নশ্রেণী নাই, অর্থাৎ সকলেই এক। ব্রাহ্মণাদি জাতি যেমন ঈশ্বরের সৃষ্ট, আমরাও তদ্রূপ ঈশ্বরের সৃষ্ট। সুতরাং একজনকে অন্যের ঘৃণিত বা অস্পৃশ্য জ্ঞান করিবার অধিকার নাই এবং আমরা সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি হিন্দুগণ যখন সেই নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া আমাদিগকে ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য জ্ঞান করিতেছেন, তখন আত্মসম্মান রক্ষার্থে কেন আমরাই তাঁহাদিগকে সম্মানের চক্ষে দর্শন করিব? নমঃশূদ্রগণ বহুদিন এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের ধৈর্য্যের মাত্রা এত কমিয়া গিয়াছে যে, আর তাঁহারা তদ্রূপ অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেছেন না। এ বিষয়ে যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি কতিপয় জেলার লোক বিশেষ অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণাদির জল অস্পৃশ্য জ্ঞানে আর গ্রহণ করিতেছেন না।" বুদ্ধিমান পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখুন, প্রতিক্রিয়া কত দূরে উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও কি না হইতে পারে? নমঃশূদ্র-সুহৃদ আর এক স্থানে লিখিতেছেন—"উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ চিরদিনই নমঃশূদ্র জাতির উন্নতির একান্ত বিরোধী। চিরকালই আমাদের প্রতি তাঁহারা হিংসা বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। নমঃশূদ্র প্রভৃতিগণ কি তাঁহাদের স্বদেশবাসী নহেন? স্বদেশবাসী এবং প্রতিবেশীর প্রতি যাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারা আবার কি প্রকার স্বদেশী আন্দোলনের নেতা সাজিয়া স্বদেশ-হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দেন?" এ কথার কি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা ত খুঁজিয়া পাই না। বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট সভা, লিবারেল দল, সাধু জন মর্লী প্রভৃতির উপর এদেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির শ্রদ্ধা বিশ্বাস আজ কাল পূর্ব্ববৎ অটল নাই। প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজরাজও এজন্য ভাবিয়া আকুল। নমঃশূদ্র, সাহা, মাহিষ্য প্রভৃতি স্তরের লোক নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, কোটালিপাড়া, বিক্রমপুরের পণ্ডিত-সমাজের উপর আজও একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয় নাই। আজও তাহাদের লক্ষ লক্ষ লোক আশার সহিত আমাদের 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' সমাজের পানে চাহিয়া রহিয়াছে এবং পুরাণ স্মৃতি হইতে শ্লোক অনুসন্ধান করিয়া উদ্ধৃত করিয়া স্ব স্ব জাতীয় শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে

* শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয়ের "নিভৃত চিন্তা" দ্বিতীয় সংস্করণ ৯৭।৯৮ পৃষ্ঠা।

চাহিতেছে। কিন্তু যেদিন তাঁহারা আমাদের উপর নিরাশ হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, সেদিন আমাদের যে কি শোচনীয় দশা হইবে, তাহা একবার এখনই ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

আমরা মুখে মুখে বিশ্বোদার ভ্রাতৃভাবেব প্রশংসাবাদ করি এবং হিন্দু পার্শী জৈন খ্রীষ্টান মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোক মিলিয়া আন্তর্জাতিক-ভোজন-প্রথা International dinner প্রবর্ত্তিত করিতেও চেষ্টা করি। কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের, অশিক্ষিতের প্রতি শিক্ষিতের, শিষ্যের প্রতি গুরুর, সেবকের প্রতি প্রভুব আদর্শ প্রেমপ্রচার জন্য আমরা কত বক্তৃতা করি, কত প্রবন্ধ পুস্তিকা লিখি, দুঃখেব বিষয়, আমাদের আত্মজীবনে তাহার আদর্শ দেখাইতে হইলেই পশ্চাদপদ হই। লর্ড-মর্লির শাসন-সংস্কার-বিধি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বিদেশে তার পাঠাইয়া এ দেশে হিন্দু মুসলমান মধ্যে কিরূপ প্রীতি সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা জানাইবার জন্য কত কৌশল করি! অভিপ্রায়, কৌশলে কার্য্যোদ্ধার। কিন্তু আমাদের বিরাট হিন্দু জাতির মেরুদণ্ড যে স্নেহ ভালবাসা-সহানুভূতির প্রেমবারি সিঞ্চন অভাবে দিন দিন শুষ্ক বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে, মৃতবৎ অসার হইয়া কার্য্যাক্ষম হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাব একবাবও তত্ত্বানুসন্ধান করি না। পক্ব, ছিন্নোত্থিত কেশ দামের সৌষ্ঠব সম্পাদন আশায় অযথা তৈল বিন্যাসে ব্যাপৃত থাকিয়া দেহের স্বাস্থ্য-সম্পর্কের গৌরব করিবাব জন্য বৃথা শক্তি ক্ষয় করিতেছি; রক্ত-দুষ্ট ব্যক্তির সুরঞ্জিত মনোরম পট্টবস্ত্রে সর্বাঙ্গের দূষিত ক্ষত গুলি আচ্ছাদিত করিয়া জনসমাজে সুস্থ সুপুরুষ বলিয়া প্রশংসা লাভ করিবার প্রয়াসের ন্যায় আমাদের এই মিলন ভোজের ব্যাপার* উপহাসাস্পদ এবং ধিক্কৃত হইবারই যোগ্য। হায় বিশ্বকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে আমরা কতই বুদ্ধি-কৌশল খাটাইতেছি। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাহাতে নিজেরাই দিন দিন যেন বঞ্চনার সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতেছি। ইণ্টার-নেশনেল ডিনার প্রচলিত করিবার পূর্ব্বে যে সকল সম্প্রদায় হিন্দুসমাজের বিরাট দেহের অঙ্গীভূত থাকাই পরম গৌরবজনক মনে করিতেছে, তাহাদের প্রতিবিধান-যোগ্য অনায়াস-সাধ্য অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য কথঞ্চিত উদারতা সহ চেষ্টা করাই অধিকতব প্রয়োজনীয় এবং সঙ্গত। মাহিষ্য, কৈবর্ত্ত, সাহা, সুবর্ণবণিক, নমঃশূদ্র, যুগী, মাল, পাটনী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অপমান-ক্ষতে স্নেহ সিঞ্চিত করিয়া স্বকীয় সমাজ-দেহকে সর্ব্বাগ্রে সুস্থ করা আবশ্যক। এজন্য আমাদিগকে তাহাদের কাহারও হাতের ভাত খাইতে হইবে না, কিম্বা কাহারও বাড়ীতে কন্যা গ্রহণও করিতে হইবে না। International dinner কিম্বা শঙ্কর বিবাহের তাহারা আকাঙ্ক্ষা কিম্বা সমর্থকও নহে। তাহারা কেবল একটুকু সকরুণ ব্যবহার পাইবার কৃপাভিখারী মাত্র।

মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকে জগতের সর্ব্বত্র স্ব স্ব ধর্ম্ম মত প্রচারিত করিবাব জন্য, অপরকে স্বীয় ধর্ম্ম মতে দীক্ষিত করিয়া স্বকীয় মণ্ডলীভুক্ত করিবার নিমিত্ত অজস্র অর্থব্যয়, এমন কি, অকাতরে শোণিত দান করিতেছেন। এজন্য মুসলমানের অসংখ্য জীবনদান—খ্রীষ্টানের অজস্র অর্থব্যয়ের কাহিনীতে পৃথিবীর ইতিহাস নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। মহামহিমান্বিত

* এলবার্ট হলের ইণ্টারনেশনেল ডিনার।

আর্য্য-ধর্ম্ম এবং আর্য্য-সভ্যতার—আর্য্যদর্শন-নীতির স্নিগ্ধ শান্তোজ্জ্বল, সুরম্য সুরভিপূর্ণ আশ্রয়তলে—সার্ব্বজনীন মুক্তি মণ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়া জ্বালা দগ্ধ জীবন ভার জুড়াইবার জন্য, আর্য্যের দেবোপম "ধর্ম্ম", জীবনে সাধন করিয়া, পূর্ণাঙ্গমনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য, সভ্য জগতের বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি আজও সোৎসুকে চাহিয়া রহিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মুখার-বিন্দ-বিনিঃসৃত বেদান্ত মহিমা-পূর্ণ সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিজয়-মদ-গর্ব্বিত ইউরোপ ও বিস্ময়-বিনোদনকারী মার্কিন ভূমির অনেক সুশিক্ষিত মহাশয় ব্যক্তি বস্তুতঃ মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমাদের এই আর্য্য সমাজের অঙ্গীভূত করিবার প্রয়াস ত বহু দূরের কথা; কিন্তু যে প্রণালী, যে উদারতা-বিমিশ্রিত বিষয়-বুদ্ধি ভারতের এবং পারিপার্শ্বিক নানা দেশের অসভ্য অনার্য্য জাতিগণকে ক্রমে ক্রমে সুবৃহৎ এই আর্য্য জাতির বিভিন্ন শাখা-ভুক্ত করিতেছিল, যে সুযোগ, সহায়তা ও সহৃদয়তার বলে শক, হূন প্রভৃতি বলদৃপ্ত বীর্য্যবান জাতীয় লোক আর্য্য ক্ষত্রিয় বলিয়া ভারতীয় সমাজে প্রবেশ লাভ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহা বহুদিন যাবৎ বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের আর্য্য মহাপুরুষগণ আমাদের ন্যায় কূপমণ্ডূক ছিলেন না। মহারাজ ইক্ষাকু হইতে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সময় পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে ভারতীয় আর্য্যগণের অবাধ গতায়াত এবং বহু দেশে আর্য্যাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পাতাল পুরী মার্কিনের রাজ-কন্যা উলোপীর সহিত আর্য্যবীর অর্জ্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। * অর্জ্জুনের অপর স্ত্রী চিত্রাঙ্গদা মণিপুরের পার্ব্বত্য রাজকন্যা ছিলেন। তদবধি মণিপুরের রাজবংশ হিন্দু "ক্ষত্রিয়" রাজা বলিয়া ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত এবং সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। এ সব ঐতিহাসিক কথা কাহারও অস্বীকার করিবার শক্তি নাই। বঙ্গদেশের পূর্ব্বভাগে যে প্রবল প্রতাপান্বিত বীরধর্ম্মী ত্রিপুর জাতির নিবাস, সেই ত্রিপুর জাতির শূর-শিরোমণি বর্ম্ম-মাণিক্য রাজগণ মণিপুর রাজবংশের সহিত এবং নেপাল, ঢোলপুর প্রভৃতি পৃথিবিখ্যাত রাজেন্দ্রগণের সহিত পুরুষ পরম্পরাক্রমে পবিত্র বীর-শোণিত-সম্পর্কে সম্পৃক্ত। বঙ্গদেশের পূর্ব্ব, পূর্ব্বোত্তর এবং উত্তর ভাগে ত্রিপুরা, মণিপুর এবং নেপালের শক্তিশালী নরনাথত্রয়ের নিবাস। • অর্জ্জুন-গোত্রাপত্য মণিপুর রাজবংশের সহিত চির-সম্পর্কিত ত্রিপুরার মহিমান্বিত রাজবংশ নানা কারণে বঙ্গদেশীয় আর্য্য মাত্রেরই পরম সমাদর এবং সম্মাননার পাত্র। দুঃখের বিষয়, বঙ্গের আর্য্যসমাজ-শিরোমণি, বিক্রমপুরের বরেণ্য বিদ্যা-বিভবান্বিত ব্রাহ্মণ-সমাজ, পরলোকগত বঙ্গগৌরব ত্রিপুরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ বীরচন্দ্র বর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুরের সহিত আর্য্যোচিত সহৃদয়তাপূর্ণ সপ্রেম ব্যবহার—বিজ্ঞ বিচক্ষণের ব্যবহার করিতে পারেন নাই। ইহা আমাদের হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা এবং অপরিনামদর্শীতার যেরূপ প্রকৃষ্ট পরিচায়ক, সেইরূপ গভীর পরিতাপ ও লজ্জার বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

* আর্য্যগণের উপনিবেশ, দিগ্বিজয়, বাণিজ্য এবং আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রাজপুতানান্তর্গত আজমীর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হর বিলাস সড়া প্রণীত "Hindu Superiority" নামক সুলিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থে পাঠক দেখিতে পাইবেন। মহাভারতের নানা স্থলেও এ সম্পর্কে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

শুনিয়াছি, জয়ন্তিয়া পাহাড়ের রাজা এবং রাজবংশীয় লোকেরা হিন্দু আচার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া "সৎশূদ্র" মধ্যে পরিগণিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। * একথা শুনিয়া কোথায় আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইব, না শত প্রকারে তাহাদিগকে নিরুৎসাহিত করিতে ও তাহাদিগের কার্য্যে বাধা দিতেই অগ্রসর হইয়া থাকি! হায় দুর্ব্বুদ্ধি!! সাঁওতাল, কোল, গারো প্রভৃতি বন্য জাতীয় বহু লোক হিন্দু সমাজে আশ্রয় লাভ করিয়া সুখী ও সম্মানিত হইবার জন্য আজও লালায়িত রহিয়াছে। কিন্তু আমরা উপেক্ষা এবং উপহাসের বাণ বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে কোন প্রকারে নিকটে আসিতে দিতেছি না। সামাজিক সুখ সম্মান লাভ করা দূরের কথা, বরং অধিকতর নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা ভোগের আশঙ্কা থাকিলে এমন কার্য্যে কে সাধ করিয়া অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হয়? তাই আজ কাল তাহারা দলে দলে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, শুনা যাইতেছে। কিন্তু আমার এবং অন্যান্য বহু অবস্থাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, খ্রীষ্টান সমাজ ভুক্ত হইয়া তাহারা এখন যে সকল সম্মান ও সুখ সুবিধা সম্ভোগ করিতেছে, তাহা হিন্দু সমাজেও লাভ করিতে পারিলে তাহাদের অনেকে এই মুহূর্ত্তেই দলে দলে হিন্দু নাম ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে। † সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক লোকহিত-ব্রতধারী, করুণ-হৃদয়, কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে ভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, সে ভাবে আরও কতক গুলি বঙ্গীয় যুবক অনুপ্রাণিত হইলে আজ বস্তুতই এ দেশে এক যুগান্তর উপস্থিত হইত।

পঞ্জাবের "আর্য্য-সমাজ" স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর উপদেশ অনুসরণ করিয়া "শুদ্ধি প্রক্রিয়া" দ্বারা ভিন্ন ধর্ম্মাশ্রিত বহু নরনারীকে আপন ক্রোড়ে স্থান দিতেছেন। অত্যাচারী মুসলমান রাজপুরুষগণের শাসন কালে যে সকল আর্য্য সন্তান অনিচ্ছায়, পীড়ন ভয়ে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, বহুযুগ শতাব্দী পরে আজ, এত দিনে, তাহারা আবার হাসিমুখে আপন মায়ের ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে। আমাদের দুর্ব্বলতা কিম্বা ত্রুটি জন্য বিতাড়িত অথবা অপহৃত শত শত ভাই ভগ্নীকে আজ আবার আমাদের সুখ দুঃখের সাথী করিতে পারিয়াছি। কিন্তু বঙ্গদেশে ওরূপ কল্পনা করিবার আজও সময় হয় নাই।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে শাস্ত্রাদেশ অপেক্ষা দেশাচারই প্রবলতর। এ সম্বন্ধে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"Bengal is governed not by Sastras but by castom. It is true, that very often custom follows the Sastras; but as after again custom conflicts with the

---

* "প্রবাসী" ৮ম বর্ষ, আষাঢ় সংখ্যা দেখুন।

† ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলায় খ্রীষ্টানের সংখ্যা ছিল ২১১ জন মাত্র। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের লোক-গণনায় দেশীয় খ্রীষ্টানের সংখ্যা ঐ জেলায় ১২৯১জনে পরিণত হইয়াছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রী মহোদয়েরা যে প্রকারে কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, তাহাতে বর্ত্তমান সময়ে এই জেলায় খ্রীষ্টানের সংখ্যা ১২হাজার হইয়াছে, শুনিলে কিছুমাত্র বিস্মিত হইব না। এ সকলের প্রায় সকলেই গারো অথবা হদী প্রভৃতি নিম্নতম শ্রেণীর হিন্দু ছিল। মুসলমান বোধ হয় ১ জনও ছিল না। ময়মনসিংহের উত্তর সীমায় "গারো পাহাড়" এখন পৃথক জেলা। সে খানে আজকাল খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বোধ হয় সহস্র সহস্র। অদূর ভবিষ্যতে বোধ হয় সমস্ত গারোগণ, হয় খ্রীষ্টান কিম্বা মুসলমান হইয়া পড়িবে।

Sastras. When there is such a conflict, custom carries the day"(হিন্দু সন্তানের সমুদ্রপথে বিদেশ যাত্রা সম্বন্ধে রাজা বিনয়কৃষ্ণের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের পত্র।) বঙ্গদেশকে দেশাচারের এই কঠিন নিগড় হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই দারুণ ক্ষোভভরে মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন :—"ধন্যরে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, হিতাহিত বোধের গতিরোধ করিয়াছিস্, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথরুদ্ধ করিয়াছিস্! তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে!"

কিন্তু যে দিন যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় এই দেশাচার অসুরকে অভিসম্পাৎ করিয়াছিলেন, কালের প্রবাহে বঙ্গদেশ আজ আর সেই স্থানে স্থাণুবৎ স্থির থাকিতে পারে নাই। বিদেশ-প্রত্যাগত শিক্ষিত চরিত্রবান্ যুবকগণকে হিন্দুসমাজের বঙ্গজননীর প্রেমক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া পূর্ব্ববৎ সুখস্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য আজ এদেশের বহু সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীপতি, বহু সমাজ নেতা প্রস্তুত হইয়াছেন, অনেকে সাদরে স্থান দিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্রের স্থানান্তরে লিখিয়াছেন :—"My own conviction is that it is impossible to carry out social roformation regarding any particular practice merely on the strength of the Sastras without religious and moral regeneration along the whole line......... Reforms in custom can be achieved only when there is an advance in religion and morals along the whole line" এ কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, বর্ত্তমান সময়ের বিদেশ-প্রত্যাগত যুবকদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

দেশে এখন এদিকে যেন একটুস্ বাতাস বহিতেছে, মনে হইতেছে। চারিদিকে নানা উপজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা-প্রয়াসের সহিত, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পদস্থ হিন্দুগণও যেন বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী তাঁহাদেরও কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, মনে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির পাবনার অধিবেশন কালে, এই কারণেই, হিন্দু নিম্নস্তরের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি-সহৃদয়তা-প্রকাশক মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্গের সুসন্তান সমাজহিতৈষী চিন্তাশীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সময় বুঝিয়া "Dying race" শীর্ষক প্রবন্ধ রাজি বেঙ্গলিপত্রে প্রকাশিত করিয়া হিন্দুসমাজের তীব্রদৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। মাতৃভক্ত কর্ম্মবীর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের ন্যায় শক্তিশালী জননায়কও আজ বঙ্গদেশের উপজাতি-সঙ্কটসমস্যার সমাধান জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। বঙ্গদেশের কোন কোন পত্র পত্রিকা-সম্পাদকও এ বিষয়ে সময় সময় সদালোচনা করিয়া দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কোন শুভ প্রস্তাবকে বাস্তব ব্যাপারে পরিণত করিতে হইলে সমগ্র দেশের বহুসংখ্যক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সহৃদয় ব্যক্তির সম্মিলিত সহানুভূতি এবং শুভেচ্ছা-পূর্ণ সাধনার প্রয়োজন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাঁহারা আমা-

দের নেতৃত্ব করিতেছেন, শুধু তাঁহাদের স্কন্ধে সকল ভার ন্যস্ত করিলে আমরা দায়-মুক্ত হইতে পারিব না। বিশেষতঃ কলিকাতার নেতাগণ অপেক্ষা এ সকল সামাজিক ব্যাপারে আমাদের মত সাধারণ জনমণ্ডলীরই স্বস্ব রূপে কর্ম্ম করিবার শক্তি ও সুযোগ যে অধিক, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার সাফল্য জন্য নব্যশিক্ষিত যুবকগণের দায়ীত্বও সামান্য নহে। দেশচর্য্যা, সমাজ-সেবার ব্যাপকতা কিম্বা সারবত্তা উভয়ই অত্যন্ত বৃহৎ। কর্ম্ম বিশেষেও কোনটী সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সুযোগে ও সাহচর্য্যে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে স্বদেশ ও স্বসমাজের সেবা করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করিতে পারিলেই আমরা জীবন সার্থক মনে করিতে পারি। সমাজের যেখানে যে অভাব আছে, তাহার পূরণ জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে প্রকারে যে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে সমাজ শক্তিশালী, দেশ সুখী ও সমৃদ্ধ হইতে পারে, তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে। কর্ত্তব্য কর্ম্মের ছোট বড় নাই।

যে দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের সুমধুর বংশীধ্বনি আজ শত মুখে নিত্য প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যে দেশ রাজর্ষি রামমোহন ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে কোলে নিয়া ধন্য হইয়াছে, যে দেশ পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান ও কর্ম্মস্থান, যেখানে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মুখারবিন্দ বিনিঃসৃত অমৃতোপম বচনাবলী মলয় মারুতের ন্যায় সুরভি প্রদান করিয়া সমগ্র দেশ, সমাজ ও সাহিত্যকে সুশীতল করিয়া রাখিয়াছে, বিশ্ব-প্রেমের বিজয়-পতাকা স্কন্ধে নিয়া এক দিন যে পুণ্য ভূমিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু "আচণ্ডালে কোল দিয়া" প্রেমের বন্যায় সমগ্র দেশকে পরিপ্লাবিত করিয়াছিলেন, যে দেশে তাঁহাদের শত শত পুণ্য কাহিনী আমাদের মত অকিঞ্চন দীন দুর্ব্বলকেও ভবিষ্যতের আশায় সর্ব্বদা সঞ্জীবিত, আনন্দে উৎফুল্ল করিয়া রাখিতেছে, সে দেশে নিরাশ হইবার কাহারও কোন কারণ নাই। 'আরো আলোক' 'আরো জ্ঞান', 'আরো প্রেম' পাইবার নিমিত্ত আমরা সকলে আশা ও বিশ্বাসের সহিত ভগবানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে স্ব স্ব ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়া যেন কৃতার্থতা লাভ করিতে পারি, এই প্রার্থনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার কার্য্য।

পঞ্চম অধ্যায়—রামমোহন রায়, কলিকাতা বাসের পূর্ব্বে। *

"হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী"—গৃহত্যাগ—হিন্দুস্থানের বহিঃপ্রদেশে গমন—রামমোহন রায়ের "কিন্তু"—তুহফতুল মওহীন—দেওয়ানী লাভ—রংপুরে তত্ত্বালোচনা সভা—ভ্রাতৃবধূর মৃতস্বামীর সহগমন—পৈতৃক বিষয় লাভে নিশ্চেষ্টা—তাঁহার উপর অত্যাচার।

রামমোহন রায়ের সম্পূর্ণ জীবনী আমরা লিখিতে বিরত রহিলাম। তাঁহার জীবনের যে সকল ঘটনা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা সূচিত করিয়া দিয়াছিল, সেই সকল ঘটনাই আলোচিত হইবে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে তাঁহার কলিকাতায় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবার পূর্ব্বকালীন কার্য্যকলাপ আলোচনা করিব।

এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানে যতদূর জানা

* ইহার পূর্ব্বের অংশ এবার গেল না, আগামী বারে যাইবে।

গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, রামমোহন রায়ের প্রথম প্রকাশ্য কার্য্য একখানি পুস্তক লিখন। পুস্তকখানির নাম "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী।" এই সময়ে তাঁহার বয়স ছিল ন্যূনাধিক ষোল বৎসর। পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতার রশ্মিপ্রবেশের সম্পূর্ণ প্রয়োজন এবং "পৌত্তলিকতার নিবিড় অন্ধকারে সমগ্র দেশ নিমজ্জিত" না থাকিলেও মূর্ত্তিপূজা প্রধানত বঙ্গদেশের জনসাধারণে্য যখন বিশেষ প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে মূর্ত্তিপূজার প্রতিরোধক এরূপ একখানি পুস্তক লেখা হৃদয়ের স্বাধীনতার পরিচয় দিয়াছিল, নিশ্চয়ই বলিতে হইবে। অরুণদেব যেমন সূর্য্যের অগ্রবর্ত্তী দূত, সেইরূপ স্বাধীনতাই প্রতিভার আলোকধারী দূত। তখন পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তথাপি বোধ হয় যে রামমোহন রায় স্বীয় নবীন যৌবনের প্রথম উদ্যমের কথা পিতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের নিকট ব্যক্ত করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই সম্ভবত তাঁহার মনোভাব সকল প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি যে, তিনি নবম বৎসর বয়সে পাটনায় আরবী ও পারশী শিখিবার জন্য প্রেরিত হয়েন। তথায় কয়েক বৎসর থাকিয়া আরবী ভাষায় কোরাণ, ইউক্লিড ও এরিষ্টটল আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ, বিশেষতঃ মুসলমান্ ধর্ম্ম তাঁহার উপর আজীবন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গ্রন্থের নামেও এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। এই নামের মধ্য দিয়া মুসলমানদিগের "বুৎপরস্তি" গোছের একটা ভাব উঁকিঝুঁকি করিতেছে।

চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার একবার সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু পিতামাতার বিশেষ অনুরোধে তাঁহার সন্ন্যাসী হওয়া ঘটিল না। এই সন্ন্যাসী হইবার ভাবটী বোধ হয় রামমোহন তাঁহার মাতামহকুলের সংসর্গে লাভ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের উপরোক্ত মূর্ত্তিপূজা-বিরোধী পুস্তক লিখনের ফলে তাঁহার পিতা ও আত্মীয় স্বজন বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই অনুমান হয়। পুস্তকে বোধহয় মুসলমানদিগের ন্যায় মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে কিছু বেশী রকমের তীব্র আক্রমণ ছিল। রামমোহন রায়ও ভাবিলেন যে, তাঁহার চিরপোষিত দেশভ্রমণের আশা সফল করিবার ইহাই উত্তম সুযোগ এবং হয়তো কিছুকাল পিতার চক্ষের আড়ালে থাকিলে তাঁহার বিরক্তির তীব্রতা কমিয়া যাইবে। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। রামমোহন রায় অনেক বয়স পর্য্যন্ত গাছের শাখায় জাল টাঙ্গাইয়া ঝুলনশয্যায় শয়ন করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার আহার ব্যবহারের বিষয় আলোচনা করিলে বোধ হয় যে তিনি বাল্যকালে একটী ডানপিঠে পাড়াগেঁয়ে বালক ছিলেন। তখনকার কালে এরূপ দেশভ্রমণে বহির্গত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে, বিশেষতঃ রামমোহন রায়ের ন্যায় ডানপিঠে পাড়াগেঁয়ে বালকের পক্ষে। তীর্থপর্য্যটন তখন নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইত। এখন বরঞ্চ যতই তীর্থপর্য্যটনের সুবিধা বাড়িতেছে, তীর্থমাহাত্ম্যও লোকদিগের হৃদয় হইতে ততই বিদায় গ্রহণ করিতেছে। সেকালে দেশভ্রমণের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় ছিল, ঠগীদের হস্তে প্রাণনাশের আশঙ্কা। রামমোহন রায় সম্ভবতঃ সন্ন্যাসীবেশে এবং অর্থ-

হীন ভিক্ষুক অবস্থায় বহির্গত হইয়াছিলেন, তাই ঠগীদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই দেশভ্রমণকালে কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভ করিয়াই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, হিন্দুস্থানের পরপারে যাইয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের এবং সম্ভবত পুরাদেশীয় শাসনেরও বিষয় জানিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়াতে, রামমোহন তদভিমুখেই চলিয়াছিলেন। কেহ বা বলেন যে, তিনি তিব্বতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কেহবা তাহা স্বীকার করেন না। তিব্বতে তাঁহার উপস্থিতি স্বীকার করিলেও তাহাতে কেবল তাঁহার ইচ্ছার দৃঢ়তারই পরিপরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার তিব্বতে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধেই আমাদের সন্দেহ আছে। কুমারী কার্পেণ্টার রামমোহন রায়ের শেষ জীবন বিষয়ক পুস্তকে তাঁহার যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে "ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ আমি হিন্দুস্থানের সীমানার বাহিরে কয়েকটী দেশেও গিয়াছিলাম।"

এই সময়ে নেপাল ভুটান সিকিম প্রভৃতি দেশ ইংরাজদিগের আয়ত্ত হয় নাই। সুতরাং তখন হিন্দুস্থানের সীমার বহিঃস্থিত দেশ বলিলে তিব্বতের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত প্রদেশ সকল বুঝানই সম্ভব। তিব্বতে গিয়া যে বৌদ্ধ অথবা অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার কোন পরিচয় তাঁহার পত্রে প্রকাশ পায় না। আমাদের অনুমান হয় যে, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া তথায় লামাপন্থী তিব্বতীয়দিগের ধর্ম্ম আলোচনা করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। নেপাল সিকিম প্রভৃতি তখন বিশেষভাবে তিব্বতের অধীন ছিল, সুতরাং এই সকল প্রদেশে গিয়াও রামমোহন রায়ের বলা কিছু অসম্ভব ছিল না যে, তিনি তিব্বতরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। আর তিব্বতে গমন করাও সেকালে বিশেষ অসম্ভব কার্য্য ছিল না। তখন বৌদ্ধ ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের ভারতে ও তিব্বতে সর্ব্বদাই অবাধ গতিবিধি ছিল। এখনকার ন্যায় তখন প্রতি পদে আদেশপত্র লইয়া যাতায়াতের বিধি ছিল না। হিন্দু সন্ন্যাসীগণ তখন মানসসরোবর, কৈলাস প্রভৃতি তীর্থদর্শনের জন্য তিব্বতে যাইতেন এবং বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীগণ সারনাথ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি তীর্থদর্শনের জন্য ভারতে আগমন করিতেন। উভয় দেশের জনসাধারণ এই সকল সন্ন্যাসীদিগকে অতিমাত্র ভক্তিপ্রদর্শন করিত। সন্ন্যাসীদের সুবিধার জন্য নেপালরাজ রক্ষক প্রভৃতির নিয়মিত ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। চীন জাপান প্রভৃতি সমগ্র বৌদ্ধরাজ্যে আবহমান কাল বঙ্গবাসীদের প্রতি বিশেষ সমাদর ছিল দেখা যায়, কারণ "অনেক বঙ্গাচার্য্য" এই সকল দেশে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। লেখকের পিতামহদেব যখন চীনদেশে ক্যাণ্টন নগরে গিয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বিশেষ আন্তরিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় গৃহ হইতে চলিয়া গেলে তাঁহার পিতা ভগ্নহৃদয় হইয়া অবশেষে তাঁহার অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। চারি বৎসর ভ্রমণের পর পিতৃপ্রেরিত লোকের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাদেরই সঙ্গে রামমোহন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এখন পুত্রের বয়স কুড়ি বৎসর। সুতরাং পিতার সহিত তাঁহার অনেক সময়েই বন্ধুভাবে তর্কবিতর্ক চলিত। রামকান্ত রায় যাহা কিছু বলিতেন, তাঁহার প্রত্যেক উক্তির উত্তরে রামমোহনের একটী

করিয়া "কিন্তু" থাকিত। সময়ে সময়ে রামকান্ত রায় নিতান্ত দুঃখিতস্বরে বলিয়া ফেলিতেন, আমি যাহা কিছু বলিব, তোমার তাহার প্রত্যুত্তরে একটা কিন্তু থাকিবেই। পিতার সহিত প্রতিপদে উত্তর প্রত্যুত্তর করা সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতাপ্রিয় হইলেও বালক রামমোহন রায়ের ভাল লাগিত না। এবারে পিতার সম্মতি লাভ করিয়া রামমোহন রায় শাস্ত্রাধ্যয়নের নিমিত্ত পুনরায় কাশীধামে যাত্রা করিলেন। রামকান্ত এবারে তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। বৎসর দশ কাশীধামে থাকিয়া উপনিষদাদি ভালরূপ আয়ত্ত করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

রামকান্ত রায় ক্রমে কর্ম্মে অশক্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, কাজেই রামমোহন রায়কে উপার্জ্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। কর্ম্মের আশায় তিনি মুর্শিদাবাদে গেলেন। তথায় থাকিবার কালে "তুহফতুল মহদীন" অথবা "একেশ্বরবাদীদিগের প্রতি দান"নামক একখানি পুস্তক এবং তাহার কিছু পূর্ব্বে "নানাধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা"নামক আর এক খানি পুস্তক আরবী ভাষায় লিখেন। শেষোক্ত পুস্তকে মহম্মদীয় ধর্ম্মের উপর বোধ হয় কিছু তীব্র কটাক্ষপাত ছিল। এই কারণে সম্ভবত তাঁহাকে মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। এদিকে তাঁহার পিতাও মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। রামমোহন রায়ের সম্মুখেই রামকান্ত রায়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে জন ডিগবি সাহেবের সহিত রামমোহন রায়ের কোন সূত্রে আলাপ ঘটিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি ডিগবির অধীনে কেরাণীগিরি স্বীকার করিলেন। পিতার উত্তরাধিকারী হইলেন জ্যেষ্ঠপুত্র জগন্মোহন, সুতরাং কর্ম্ম স্বীকার করা তখন রামমোহনের নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিগবির অধীনে প্রথম কেরাণীগিরি পাইয়া ক্রমে ক্রমে তিনি দেওয়ানী-পদ লাভ করিয়াছিলেন। কলেক্টরের সেরেস্তাদারকে তখন লোকে দেওয়ান বলিত এবং এই পদই সেকালে দেশীয়দিগের প্রাপ্য সর্ব্বোচ্চ পদ বলিয়া পরিগণিত হইত। ক্রমে রামমোহন রায় এবং ডিগবি সাহেব উভয়ের পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই বন্ধুতা স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ইংরাজী ও দেশীয় সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন এবং তদ্বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করিতেন। ডিগবি সাহেব ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দপর্য্যন্ত রংপুরে কলেক্টরী করেন। এই রংপুরে অবস্থিতিকালেই রামমোহন রায়ের কার্য্যগুণে ডিগবি সাহেব তাঁহার জমাবন্দোবস্তী কার্য্যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

রংপুরে রামমোহন রায় সন্ধ্যার পর আপনার বাসাবাটীতে তত্ত্বালোচনার জন্য সভা আহ্বান করিতেন। মাড়োয়ারী বণিকদিগের অনেকে এই সভার সভ্য ছিলেন। রামমোহন রায় রংপুরে থাকিতেই পারসী ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা এবং বেদান্তের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের মৃত্যু হয়। বিধবা ভ্রাতৃবধূ রামমোহনের নিষেধ সত্ত্বেও পতির সহগমন করিলেন। কিন্তু যখন চিতাগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি একবার পলায়নের চেষ্টা করেন, সেই সময়ে আত্মীয় স্বজনগণ বলপূর্ব্বক বৃহৎ বৃহৎ বংশদণ্ডের সাহায্যে তাঁহাকে চিতাগ্নি হইতে উঠিতে না দিয়া দগ্ধীভূত করিলেন। রামমোহন রায়

নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই অবধি তিনি এই কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হইলেন।

রামমোহন রায় পিতার মৃত্যুর পর অবধি একটু বেশী প্রকাশ্য ভাবে নিজ মত প্রকাশ করিতেছিলেন, দেখা যায়। ইহার ফলে তাঁহার মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত তাঁহার আন্তরিক সদ্ভাব থাকিতে পারে নাই। রংপুরে থাকিতে যখন রামমোহন রায় তত্ত্বালোচনার সভা স্থাপন করিলেন, তখন তত্রস্থ জজকোর্টের দেওয়ান গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কয়েকটী নিন্দাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ দিকে রামমোহন গৃহের মধ্যে মাতাকে প্রধানত প্রতিকূল দেখিয়া বিষয়ের অংশ লাভের জন্য কোনই চেষ্টা করেন নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তিনিই বিষয় ভার গ্রহণ করিলেন, রামমোহনও নিশ্চিন্ত হইলেন। পৈতৃক বিষয়ের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করিবার আরও একটী কারণ এই যে, বর্দ্ধমান রাজার সহিত এই বিষয় লইয়া বহুকাল যাবৎ বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল—লাভের গুড় পিপড়ায় খাইতেছিল। যাই হউক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর দেনার দায়েই হউক বা ভ্রাতুষ্পুত্রের পৈতৃক বিষয় রক্ষা করিবার অক্ষমতা বশতই হউক, যখন তাহা রামমোহন রায়ের হস্তে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি তাহা রক্ষা করিতেও বাধ্য হইলেন। তাঁহার মাতা কিন্তু আপত্তি করিলেন যে বিধর্ম্মী পুত্র বিষয় পাইতে পারে না। রামমোহনের মত সকল হিন্দুধর্ম্মের বিপরীত নহে, ইহা প্রমাণিত হওয়ায় মাতার উত্থাপিত আপত্তি আদালতে অগ্রাহ্য হইল। রামমোহন রায় যথাপূর্ব্ব মাতাকেই বিষয় পর্য্যবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়া স্বয়ং তাঁহার জমিদারীর সংলগ্ন এক প্রান্ত ভূমিতে একটী ক্ষুদ্র বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিলেন—কর্ম্মস্থান হইতে আগমন করিলে তথায়ই অবস্থিত করিতেন। সেই বাসা গৃহে "ওঁতৎসৎ" এবং "একমেবাদ্বিতীয়ং" খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মাতা ব্যতীত রামমোহনের জ্ঞাতি রামজয় বটব্যাল তাঁহার উপর যথেষ্ট অত্যাচার ও উপদ্রব করিতেন। রামমোহন উক্ত জ্ঞাতির সহিত বিবাদ করিবার স্বীয় অক্ষমতা বুঝিয়াই সম্ভবত ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলেন। সেই গুণে ক্রমে সেই সকল অত্যাচার আপনাপনিই থামিয়া গেল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুটা তত্ত্ব কথা। (১)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যোগশাস্ত্রের আর এক নাম আত্মবিজ্ঞান। এস্থলে পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার সহিত আত্মজ্ঞান-চর্চ্চা বা যোগানুশীলনের সম্বন্ধ বিষয়ে কিছু বলিলে দোষের হইবে না।

মোটামুটি পৃথিবীতে দ্বিবিধ সভ্যতা দেখিতে পাওয়া যায়; প্রাচীন প্রাচ্যসভ্যতা ও আধুনিক প্রতীচ্য সভ্যতা। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সুখান্বেষণের চেষ্টার উৎকর্ষতা ও সাফল্যের নামই সভ্যতা। সুতরাং উভয় সভ্যতারই মূলে সুখান্বেষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পরন্তু দুই স্থলে দুই প্রকার সুখ

অম্বেষিত এবং উভয়ের মধ্যে এত প্রভেদ যে, আধুনিক সভ্যতার সুখান্বেষণকে দুঃখান্বেষণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য সভ্যতা যেন ক্রমাগত চীৎকার করিয়া বলিতেছে:—"হে মানুষ! যদি সভ্য নামে আখ্যাত ও গৌরবান্বিত হইতে চাও, যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব অধিক মাত্রায় সুখ খুঁজিয়া লও। তোমার সুখের উপাদান সমস্ত তোমার বাহিরে বিদ্যমান। চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহায়তায়, বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও কল-কারখানার সাহায্যে বহির্জগৎ বা জড় প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীনে আনয়ন কর, বড় সুবিধা, বড় আরাম, বড় সুখ পাইবে। ঐ জড় প্রকৃতিকে করায়ত্ত করিতে তোমার ভিতরবাহিরের সমগ্র শক্তি ব্যয়িত হউক; তাহার ফলে তুমি সুখ ত পাইবেই, অধিকন্তু যে সকল জাতি উহাকে স্বীয় দাসত্বে নিযুক্ত করিবার চেষ্টায় পরাঙ্মুখ থাকিবে বা তৎসম্বন্ধে অক্ষম সাব্যস্ত হইবে, তাহাদিগের উপর তোমার অসীম প্রভুত্ব ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সংস্থাপিত হইবার কথা, এবম্বিধ রাজত্বে তোমার আরও কত সুখ কত প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে।"—সমস্ত ইউরোপ আমেরিকা আজ এই উদ্দেশে গোলা, বারুদ, গ্যাস, বাষ্প, তড়িৎ, ইথার প্রভৃতির ভিতর সুখের প্রস্রবণ খুঁজিতে গিয়া সমস্ত মানসিক শক্তি বহির্জগতে ব্যয় করিতেছে। ইহাতে সুখের পরিবর্ত্তে কিরূপ দুঃখ পাইতেছে, তাহা উহাদের মনীষীগণের "মানব জীবনের কোনই মূল্য বা অর্থ নাই"!!!—* ইত্যাকার হাহা-রবে সম্যক রূপে প্রমাণিত। দেহাত্ম-বুদ্ধি, জড়োপাসক, ইহসর্ব্বস্ববাদী ঘোর স্বার্থপর জীবগণের যাহা পরিণাম, তাহাই পাশ্চাত্য জগতে প্রকটিত হইতেছে। আত্মহত্যার সুবিধার জন্য গুপ্ত সমিতি † স্থাপিত, যাহার সভ্যবৃন্দ পরস্পরে পরস্পরের প্রাণনাশের সাহায্য করিতে পারে—নিয়মিত রূপে করিতেছে, আর কি চাই! প্রেমময় পরমেশ্বরের রাজ্যে কি অভিনব দৃশ্য পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন—এক দিকে কোটী কোটী নরনারী ক্রীতদাস দাসীর ন্যায় দিবা রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদন লাভে কৃতার্থ বোধ করিতেছে, অপরদিকে কতকগুলি লোক বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াও অতৃপ্ত অবস্থায় "আরও ধন চাই"! "আরও ধন চাই"! বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বন্য পশুর ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটাছুটি করিতেছে। ‡

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ উপদেশ। আমাদের ঋষিগণ বহুযুগ পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন "সর্ব্বমাত্মগতং সুখং", সুখ আত্মা ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অপেক্ষা করে না, সুখ যাহা কিছু সব ভিতরে, বহির্জগৎ বা জড়প্রকৃতির মধ্যে সুখ থাকিতেই পারে না। বাহিরে যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা দুঃখের কারণ, অসন্তোষের

* Life is not worth living.

† "Suicide Club" in New York. U. S A

‡ We see on the one hand millions of men and women chained to a ceaseless slavery, interminably toiling in order to obtain a poor and scanty meal and a garment to cover their nakedness, and on the other hand we see thousands, who already have more than they require and can well manage, depriving themselves of all the blessings of a true life and of the vast opportunities which their possesions place within their reach, in order to accumulate more of those material things for which they have no legitimate use. Surely men and women have no more wisdom than the beasts which fight over the possession of that which is more than they can well dispose of, and which they could all enjoy in peace.

"All these things added"—James Allen.

পূর্ব্বপর্ত্তী ভাব মাত্র; ভিতরের সুখের নাম শান্তি; শান্তি সন্তোষের দাসী, সুতরাং আগে সন্তোষ শিক্ষা আবশ্যক, যদি শান্তিলাভের প্রয়াস থাকে। তাই আর্য্য উপদেষ্টা বলিয়া গিয়াছেন :—

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং
যৎ সুখং শান্ত চেতসাম্।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানাং
ইতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥

দেহটাকে রক্ষা করিবার জন্য যতটুকু দরকার, বহির্জ্জগতের প্রতি ততটুকু মনোযোগই দেয়; শারীরিক স্বাস্থ্য ও প্রাণ রক্ষার জন্য অতি সামান্য মাত্র শক্তি জড়ের প্রতি ব্যয় করিয়া মনের বাকী সমস্ত বল ভিতরের দিকে প্রযুজ্য। প্রকৃত সুখ, শান্তি, প্রভৃতি যদি কেহ চায়, কেবলমাত্র যথাপ্রয়োজন জড়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আত্মার প্রতি সম্যক মনঃসংযোগ তাহার একান্ত কর্ত্তব্য। মন স্থির হইয়া আত্মার প্রতি সংযুক্ত হইলে জীব যে কি অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, তাহা ত বর্ণনাতীত, অধিকন্তু এমন এক অদ্ভুত শক্তি তাহাতে সমুদ্ভূত হয়, যাহার বলে সৃষ্টির যাবতীয় রহস্য তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হয় এবং তৎসঙ্গে জড়চৈতন্যময় সমগ্র জগৎ তাহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাহার আজ্ঞার প্রতীক্ষা করে। সংসারের সমস্ত ধনরত্ন ও লৌকিক আধিপত্য তখন তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া সাব্যস্ত হয়, সে তখন অনন্তকে গ্রাস করিবার জন্য প্রস্তুত, অনন্তে মিশিয়া সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ তখন তাহার লক্ষ্য।

এখন দেখা গেল, উল্লিখিত দ্বিবিধ সভ্যতার কিরূপ আকাশপাতাল প্রভেদ। একের গতি জড়ের ঠিক বিপরীত দিকে, যেহেতু একটী সত্যযুগের, অপরটী ঘোর কলিকালের। একটী জড়ের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া জড়ের সঙ্গে তাদাত্ম্য ভাব বশতঃ পরাধীন, জড় বুদ্ধিগ্রস্ত, গুরুভারাক্রান্ত, অধোগতিপ্রাপ্ত, অপরটী আত্মসংসর্গে উন্নত হইয়া চৈতন্যের মুক্ত আকাশে স্বাধীন ভাবে পক্ষ বিস্তার করতঃ উচ্চাৎউচ্চতর লোকে উড্ডীন।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যাঁহারা অশেষ ধীসম্পন্ন বিদ্যাধুরন্ধর বলিয়া পৃথিবীতে আজ সম্পূজিত, তাঁহারা মানব মনের অদ্ভুত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পরাঙ্মুখ, পঞ্চেন্দ্রিয়জাত বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না।* আমাদের পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরিদর্শন, প্রক্রিয়া ও সাধারণীকরণ ‡ ভিন্ন জ্ঞানোপার্জ্জনের যে অন্য কোন উপায় আছে, এ কথা তাঁহাদের নিকট নিতান্ত অলীক ও অবিজ্ঞান-সম্মত। হায়! পণ্ডিতোপাধিক জড়বাদিগণ বস্তুতঃ কত মূর্খ! প্রকৃতজ্ঞানে তাঁহারা শিশুবৎ।

পরিতাপের বিষয়, আজকাল পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের চাকচিক্যে আর্য্যসন্তানগণ এতাদৃশ মুগ্ধ ও তড়িচ্ছক্তি-প্রভায় তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি এ পরিমাণে অভিভূত যে, চৈতন্যরাজ্যের অনন্ত সত্য সমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

---

* ইংলণ্ডের বিজ্ঞান সভার সভাপতি জড়বিজ্ঞান বিশারদ মহাত্মা টিণ্ডাল এক সময়ে উক্ত সভায় প্রচার করিয়াছিলেন,—

"In matter I see the promise and potency of every form of life" Prof Tyndall—President, Royal Society

পরন্তু সে দিন সেই আসন হইতে বিচক্ষণ ক্রুক্‌স্ সাহেব বলিয়াছেন—

"In life I see the promise and potency of all forms of matter"—Sir William Crookes.

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ক্রমে বাতাস উল্টা বহিতে আরম্ভ হইয়াছে।

‡ Observation, experiment and induction.

প্রমাণাভাবে তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় বিষয় হইয়াছে; মানুষ মনের অসাধারণ শক্তিতত্ব চক্ষু কর্ণাদি দ্বারা উপলব্ধি হইবার নয় বলিয়া তাঁহারা উহাকে বিজ্ঞান-বিরোধী সুতরাং অগ্রাহ্য বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহাদের মতে এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-রহিত অনিশ্চিত ব্যাপারের আলোচনায় সময়ক্ষেপ দ্বারা অসার নিষ্ফলপ্রদ উদ্যমে বৃথা শক্তি প্রয়োগ বুদ্ধিজীবী মানুষের পক্ষে অসঙ্গত ও বিগর্হিত।

যোগশাস্ত্র কি, বা কিরূপে আমরা যোগমার্গে আরোহণ করিতে পারি, এ সকল কথার আলোচনাই আমাদের ন্যায় বাসনা-বিমূঢ় বিষয়বুদ্ধি পামরের পক্ষে ঘোর ধৃষ্টতা, সন্দেহ নাই। সুতরাং এই গভীর দর্শন সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান বিস্তার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে উল্লিখিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে লব্ধশিক্ষ উপাধিকগণকে জড়ৈক-সর্বজ্ঞান ও জড়োপাসনা-প্রবৃত্তি হইতে বিরত করিবার জন্য দুটা কথা বলা মাত্র উদ্দেশ্য। আমার এই স্বল্পায়াসে যদি কাহারও যোগশক্তির অদ্ভুত ক্ষমতা পরিজ্ঞান ও পরীক্ষা করিবার বাসনা উদ্রিক্ত হয়, তিনি এ বিষয়ে সদ্গুরু অন্বেষণ করতঃ উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক সকল জ্ঞানের লাভে প্রয়াস পাইবেন। কেবল এই কঠোরতম বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য; কাঠিন্য, অলৌকিক শক্তিমত্তা ও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুই চারিটা মোটা কথা মাত্র বলিব।

বিশ্বেশ্বরের সৃষ্টি-রহস্য কিঞ্চিন্মাত্র পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, জড়-চৈতন্যময় সমগ্র জগৎ অলঙ্ঘ্য অখণ্ডনীয় নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। একটী সামান্য চিন্তাকণিকাও অনিয়মে বা মনোরাজ্যের কোন একটা নিয়ম অতিক্রম করিয়া মানব মস্তিষ্কে উদয় হইতে পারে না। ভৌতিক রাজ্যেও যেমন, মানসিক রাজ্যেও তেমনি ২ + ২ = ৪ এর মত কঠোর বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী বিদ্যমান থাকিয়া সপ্রভাবে কার্য্য করিতেছে, কোথাও তিলমাত্র ভুলভ্রান্তি হইবার যো নাই। যে প্রকার জড়জগতের নিয়মগুলি সম্যক অবগতির পর আমরা নানাবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া থাকি, তদ্রূপ মনস্তত্ত্বের সম্যক জ্ঞান লাভান্তর সুসম্পন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সমূহ দ্বারা জ্ঞানে গরীয়ান্ ও বলে মহীয়ান হইতে পারি; তখন জড়শক্তি সকলকে স্বায়ত্ত করা ত নিতান্ত সহজসাধ্য কাজ। কিন্তু হায়! মনের বলকে সংযত করিয়া আপন অধীনে আনিতে হইলে যে কিরূপ প্রবল ইচ্ছাশক্তি, কিরূপ দুরূহ সংযমাভ্যাস ও কিরূপ কঠিনতম ত্যাগ-স্বীকার প্রয়োজন, তাহা ভাবিলে মন প্রাণ নৈরাশ্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যেমন কঠোর বিজ্ঞান, তেমনি কঠোর অভ্যাসব্রত চাই। এই মহাবিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ বিপুল অধ্যবসায় ও সুদীর্ঘ কাল সাপেক্ষ। যোগিজন কত যুগযুগান্তর ধ্যানস্থ থাকিয়াও চরমফল লাভ করিতে পারেন না; পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস মোহময় শরীর-নিগড়ে বদ্ধ ক্ষুদ্র জীব আমরা কি প্রকারে বুঝিব, এই যোগধ্যানে কি জ্ঞান-মধু পাওয়া যায়, যাহা পান করিয়া একাসনস্থ যোগিবর জ্ঞানানন্দে সুদীর্ঘকাল বিভোর থাকিতে পারেন?

জড় পরমাণুর যেমন ধ্বংস নাই, সেইরূপ প্রতি মুহূর্ত্তের চিন্তারও কিছুই বিফলে নষ্ট হয় না। মানব মনের প্রত্যেক চিন্তা কালের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে

বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ ছোট বড় সকল চিন্তাই আমাদের মনোময় কোষে এক একটী ছাপ বসাইয়া যাইতেছে। আমার এখনকার মন পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের অনুভূত চিন্তা সমষ্টির ফল মাত্র।* আমাদের চিন্তার প্রতি আমরা আদৌ খেয়াল করি না, মনে করি উহা ত কেহ দেখিতে পাইতেছে না, পরন্তু ঐ চিন্তাগুলিই আমাদের চরিত্র গঠন করিতেছে। এক একটী সচ্চিন্তা দ্বারা যেমন আমাদের সাধুভাব বৃদ্ধি পাইতেছে, ঠিক কুচিন্তা সমূহ দ্বারা তেমনি অসাধু ভাব বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে কুঅভ্যাসে-পরিণত অবস্থায় লোক চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। চিন্তাই কর্ম্মের প্রসূতি, কোনরূপ অনুষ্ঠান আগে চিন্তার দ্বারা কল্পিত না হইলে কিপ্রকারে কার্য্যে পর্য্যবসিত হইবে? মানুষ কর্ম্মাধীন জীব, সে ক্ষেত্রে আপনাপন চিন্তারাশির প্রতি যাঁহাদের দৃষ্টি নাই, তাঁহাদের জীবনতরী দিঙ্‌নির্ণয় চন্দ্রদর্শনে অসমর্থ অন্ধ কর্ণধার পরিচালিত জলযানের ন্যায় উদ্দেশ্যবিহীন মার্গাবলম্বনে অচিরে বিপন্ন হইবে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। হইতে পারে, প্রাক্তন সুকৃতি ফলে কেহ কেহ স্বীয় চিন্তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়াও সাধুভাবে চলিয়া যাইতেছেন, উত্তরোত্তর উন্নত হইতে গেলে তাঁহাদিগকেও সর্ব্বদা সযত্নে পুঁজি বাড়াইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

অনুষ্ঠানবিহীন সাধুচিন্তা দ্বারা সম্যক ফল লাভের আশা দেখা যায় না; গুরূপদিষ্ট পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক চেষ্টাকৃত চিত্ত সংযম এবং প্রণালাগত সচ্চিন্তা ও সৎকর্ম্ম মানুষকে যোগ মার্গে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়া থাকে। আমাদের চিত্ত পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ—সুতরাং স্বভাবতঃ—বড়ই চঞ্চল। মন সর্ব্বদা স্বতঃই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিতে প্রবৃত্ত এবং তত্তদ্বিষয়ানুগত সুখ ও দুঃখের অনুভূতিবশাৎ মনের স্থিরতা কোথায়? সাধারণ জীবের মন নিয়তই বিকারদশাপন্ন। এবম্বিধ বিকার হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা আরম্ভ না করিলে যোগমার্গে প্রবেশ করা যায় না। যেমন বাত্যা-প্রকম্পিত ঊর্ম্মিচঞ্চল সরসীবক্ষে গগনবিহারী চন্দ্রের ছবি সুচারুরূপে প্রতিফলিত হইতে পারে না, কেবল সুস্থির জলরাশিতেই শশধরের অখণ্ড শুভ্রোজ্জ্বল কান্তি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, সেইরূপ, যে ধন্য পুরুষের মানস-সরোবরে বিষয়প্রভঞ্জনের বিক্ষেপ ক্রিয়া আদৌ পঁহুছে না, যাঁহার চিত্ত মোহবিকারের হাত এড়াইতে সক্ষম হইয়াছে, প্রত্যুত সমভাবাপন্ন হইয়া আত্মমুখী, কেবল তিনিই বিশ্বরহস্যভেদী ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সক্ষম।

অনেকের ধারণা গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ না করিলে যোগাভ্যাস অসম্ভব, ইহা ভ্রমাত্মক। প্রত্যেক গৃহী সংসারধর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিয়াও উপযুক্ত গুরুর অধীনে যোগসাধন আরম্ভ করিতে পারেন। এস্থলে যোগসাধন অর্থে

---

* As you think, you create thought forms, every thought of your intellect creates a corresponding form in the matter of the mental plane, those thoughts of the intelligence, thoughts of the passional nature, are objectivated and take substantial form, those thoughts make your mental atmosphere, cluster round you, remain with you, modifying your whole development. They mould your body [illegible] some extent. * * When you die these thought images remain, making the character that you have built by your thought, by your intellectual activity during life—that character endures, and when the time comes for re-incarnation the thought-image is thrown downwards to the astral plane, and there becomes densified by building into it astral matter, and this astral form the outcome of your thought and life today, is the mould into which the physical body is cast, so moulding the form of the physical apparatus by the form that has been made by you in a previous life.—Annie Besant.

কতকগুলি অস্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া বুঝিতে হইবে না। শুদ্ধ মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান, উভয়ের বিহিত অনুশীলন দ্বারা চিত্তের সাধারণ অভ্যাস সমূহ আমূল পরিবর্তিত না হইলেও বিশেষরূপে সংশোধিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নচেৎ যোগরাজ্যের প্রথম প্রদেশে প্রবেশাধিকার জন্মে না। গৃহী বা সন্ন্যাসীর বিচার নাই, হিন্দু মুসলমানে তারতম্য নাই; যে কোন নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তি বিষয়বিমুখ হইয়া চেষ্টা করিবেন, তিনিই যোগবিজ্ঞানের প্রক্রিয়া দ্বারা সংসারের সকল প্রকার রহস্য ভেদ করতঃ কৃতার্থ হইবেন।

স্বার্থসেবী ভণ্ডগণ কতকগুলি শারীরিক অভ্যাস ও উদ্যমের দ্বারা সময়ে সময়ে যে দুই একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া জনসমাজে দেখাইয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞানের উন্নত সোপানে না উঠাইয়া অধঃপতনের দিকে লইয়া যায় এবং অচিরাৎ বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সেই সামান্য শক্তিটুকুও তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হয়। পরন্তু যথার্থ যোগী কখন স্বার্থবশে স্বকীয় অলোকসামান্য বিভূতি সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন না, কারণ নীতিবিজ্ঞান তাঁহাদিগকে প্রথমেই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছে যে যশঃ মান, খ্যাতি প্রভৃতির জন্য বা অন্য কোন প্রকার স্বার্থসাধনার্থ তপস্যালব্ধ শক্তি ব্যবহার করিলে আত্মার অশেষ অকল্যাণ হইয়া থাকে।

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র চিত্তসংযম ও মনোমল দূরীকরণের পর আর কোন উপদেশ দেন না; কিন্তু পরমার্থজ্ঞানী ত্রিগুণাতীত আর্য্য ঋষিদিগের শিক্ষা দীক্ষা এই যে, চিত্তশুদ্ধির পর ধ্যানধারণাদি যৌগিক পন্থাবলম্বনে জ্ঞানমার্গে উন্নীত হইয়া ঈশ্বরত্বে পঁহুছিতে হইবে; ইহার পূর্ব্বে কমকমাত্রস্বরূপী কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা মরীচিকায় জলের আশা। বিনা যোগে জড়চৈতন্য সম্বন্ধে যে জ্ঞানলব্ধ হয়, তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, জ্ঞানের খোসা মাত্র। স্তিমিতনয়ন যোগীসত্তম এককালে সমস্ত বিশ্বরহস্যের অন্তস্তলে বিরাজ করিতে থাকেন।

কেবল যোগশাস্ত্রই আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম যে, বহির্জগতে যত কিছু শক্তি বিদ্যমান, সমস্তই আমাদের ভিতরে অবস্থিত, কারণ মানুষ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। যে আত্মা আমাদের মধ্যে প্রাণরূপে বিরাজিত, ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোমেও একমাত্র তাঁহারই শক্তি কার্য্য করিতেছে; ঐ সুদূর জলধরে আত্মার যে শক্তি বিজলীরূপে খেলিতেছে, আমাদের মনোমধ্যে সেই শক্তি পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীল;—বিদ্যুচ্ছক্তি যদি এক মিনিটে এখান হইতে ইংলণ্ড যাইতে পারে, আমাদের মন যোগবলে মুহূর্ত্তমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া না আসিবে কেন? পরিদৃশ্যমান জড়শক্তি ঐশী শক্তির বহির্বিকাশ ব্যতীত আর ত কিছুই নয়, সুতরাং উহা আত্মপ্রতিভার অনুগত দাসীমাত্র। আত্মশক্তির ইচ্ছাক্রমেই জড়শক্তির উৎপত্তি, গঠন, স্থিতি ও নাশ বা রূপান্তরপ্রাপ্তি; একথা আজ আমরা বিস্মৃত, তাই দেখিতেছি, সমস্ত পৃথিবী জড়ের সেবক জড়ের উপাসক। হায়! আমাদের ভিতরে অনন্ত শক্তি চির-বিদ্যমান থাকিতেও অতি সামান্য শক্তির জন্য আমরা বৃথা জড়ের পশ্চাতে ছুটাছুটি করিতেছি; মনুষ্য হইয়াও মনুষ্যত্বকে ব্যবহারে আনিতে শিখিলাম না। হায়! হায়! কবে আমরা যথার্থ মানুষ হইব, বিশ্বেশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতা লাভ করিব! কবে আবার সেই পুণ্যশ্লোক

প্রাচীন আর্য্য মহাপুরুষদিগের প্রচারিত আত্ম-বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানকে পদদলিত করিয়া জগতীতলে প্রকৃত সুখ ও শান্তির পতাকা উড়াইবে, মানব মনে স্বর্গের রাজত্ব সংস্থাপিত হইবে।

অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে গর্ব্ব করিতে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে আর্য্যগণ জড়-বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে এমন সকল আবিষ্কার করিয়া যান, যাহার মধ্যে বর্ত্তমান ব্যাপার সমূহ ত ছিলই, তদ্ব্যতীত এ প্রকার বহুতর বিষয় তাঁহারা জানিতেন,যাহা আধুনিক বিজ্ঞানাদির এখনও অগোচর রহিয়াছে। তাঁহারা বলিতে চান যে, ইউরোপীয় প্রণালীতে আর্য্য মনীষীরা প্রক্রিয়া-বিজ্ঞান সমূহ* আয়ত্ত করিয়াছিলেন; তাই রসায়নশাস্ত্র,† পদার্থবিজ্ঞান, ‡ জ্যোতি-বিজ্ঞান, § শরীরতত্ত্ব ‖ প্রভৃতি সম্বন্ধেও অদ্ভুত বিচক্ষণতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা কি তাহাই? তাঁহারা কদাপি কোন শ্রেণীর জড়বিজ্ঞানের পশ্চাতে একবিন্দুও শ্রম ব্যয় করেন নাই; জড়তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য তাঁহাদিগকে কারখানায় ¶ প্রক্রিয়া দ্বারা মাথা ঘামাইতে হয় নাই, তাঁহাদের চিন্তা আদৌ ওদিকে যায় নাই। মানুষের স্বচ্ছন্দজীবনযাপন ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সকল জড়তত্ত্ব জানা আবশ্যক, সূক্ষ্ম-দর্শী ঋষিগণ আত্মবিজ্ঞান প্রভাবে তাহা যথা-যথভাবে অবগত হইয়া শাস্ত্রের অনুশাসনরূপে আপামরসাধারণের নিকট প্রচার করিয়া যাইতে ত্রুটী করেন নাই, এখানে যথাযথভাবে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহাদের জ্ঞানের মূলে যুক্তিযুক্ত অনুমান * ছিল না, সমস্তই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি † দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া-ছিল। তাঁহারা আমাদের চর্ম্মচক্ষে দেখার মত অন্তশ্চক্ষু দ্বারা ঠিক তদ্রূপ দেখিয়া পুঙ্খা-নুপুঙ্খরূপে জড়পদার্থ সমূহের শক্তি, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ও সংযোগ বিয়োগ প্রণালী অনু-ধাবন করিতেন। তদভাবে পাশ্চাত্য উপায়ে লব্ধ তথ্যাদি নিতান্ত একদেশী, সুতরাং অস-ম্পূর্ণ, কাজেই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঋষিগণ যদি যোগ-বলে ভৌতিক জগতের সমস্ত তত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত ছিলেন, তবে তদানীন্তন ও পরবর্ত্তী লোক সাধারণের গোচরার্থ তাহা কেন প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিয়া গেলেন না? জড়রাজ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা মানব জ্ঞানের উন্নতি সাধন না করা কি তাঁহা-দের উচিত হইয়াছে? এবম্বিধ অচিন্তা-প্রসূত প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, জড়বিজ্ঞানের অনুশীলন জন্য ভৌতিক জগ-তের পশ্চাতে ছুটাছুটি করা মানব জীবনের উদ্দেশ্য নহে। সাধুকার্য্যের দ্বারা প্রাক্তন-অকর্ম্ম-বিকর্ম্ম-ক্ষয়, বাসনা বিনাশ সহকারে সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়, সর্ব্বকর্ম্মক্ষয় দ্বারা মায়ামোহময় সুদৃঢ় সংসার শৃঙ্খল ছেদনান্তর মুক্তিলাভ করত সুখ দুঃখ ব্যাধিজরা মরণের অতীত হইয়া সচ্চিদানন্দে অবস্থানজনিত পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণানন্দ উপভোগ—কর্ম্মবাদী আর্য্যের নিকট ইহা অপেক্ষা জীবের মহত্তর উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে? এ নিমিত্ত একমাত্র

* Experimental sciences.
† Chemistry.
‡ Physics.
§ Optics.
‖ Anatomy aud physiology,
¶ Laboratory.

* Rational hypothesis,
† Direct perception.

বিষ্ণুর পরমপদ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল; বিষয় সুখে জলাঞ্জলি দেওয়াই ঋষিদিগের প্রধান উপদেশ। পঞ্চেন্দ্রিয়ানুভূত, মায়া-প্রসূত ‡ ভ্রমজালাবৃত, ক্ষণবিধ্বংসী প্রপঞ্চ মানবের দিব্যজ্ঞান-প্রণোদিত উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা ও চেষ্টাতে প্রতিনিয়ত লক্ষ প্রকার বাধা প্রদান করিতেছে। জড় তমোগুণ প্রসাধক, তাই আজ জড়ের সেবা করিতে করিতে সমগ্র পৃথিবী ঘোর স্বার্থান্ধ তমসাচ্ছন্ন হইয়া ভ্রাতৃদ্বেষে জর্জ্জরিত। জড় চৈতন্যের বিরোধী, তন্নিমিত্ত ঋষিগণ গোময় হইতে গ্রহতারা পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূতের তত্ত্ব আত্মবিজ্ঞান দ্বারা অবগত হইয়াও পাছে জড়বিজ্ঞান কর্ম্মযোগের বিঘ্নকারক হয়, এই আশঙ্কায় তাহা সাধারণ্যে প্রচার দ্বারা জীবের অকল্যাণ সাধন করিয়া যান নাই।

পরিশেষে বক্তব্য, ইউরোপীয় মনস্তত্ত্ব (?)* পাঠ করিয়া, আত্মজ্ঞানী ত্রিকালদর্শী ঋষিদিগের বাক্য অবহেলা করা বা তাহাতে সন্দিহান হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নয়। জড়ের আলোচনায় নিয়ত রত থাকিয়া এবং চতুর্দ্দিকে জড়ের মাহাত্ম্য দেখিতে দেখিতে আমাদের মস্তিষ্কও জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই এই সহজ কথাটা বুদ্ধিগত হয় না যে, ঋষি নামে আখ্যাত বেদবেত্তাগণ কখন মিথ্যা বা অহিত কথা প্রচার করিয়া যাইতে পারেন না, বা জ্ঞান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গুরুতর ব্যাপার সমূহে গলিভরের † ন্যায় অদ্ভুতকল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়া বাহাদুরী লাভার্থে শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করেন নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

বঙ্গের পণ্ডিতকুল-চূড়া মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় আর ইহজগতে নাই। গত ২০শে মাঘ, বুধবার, পুণ্যতীর্থ বারাণসী বক্ষে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের দেহত্যাগ ঘটিয়াছে! মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল।

বঙ্গের সংস্কৃত শাস্ত্রের ইতিহাসে চন্দ্রকান্তের নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার যোগ্য। আজ তাঁহার অভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রের যে গৌরব-মুকুট খসিয়া পড়িল, তাহা কত কালে পূর্ণ হইবে, কে বলিতে পারে?

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর নামক স্থান সেরী নদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সেরপুর এক দিকে যেমন কলমর্দ্দিনী স্রোতস্বিনীর মৃদুমন্দ প্রবাহে উর্ব্বর, নিবিড় পত্র বিটপী-শ্রেণীর ঘন সন্নিবেশে প্রকৃতির কান্তি যেমন মনোহর, শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার আলোকে ময়মনসিংহের মধ্যে তেমনই শ্রেষ্ঠ। সেরপুরের সুবিখ্যাত চৌধুরী বংশ শুধু জমিদার নহেন; তাঁহারা মাতা প্রকৃতি দেবীর যোগ্য সন্তান—তাঁহারা একান্ত মনে মাতৃপূজায় নিরত। সেরপুরের চৌধুরী বংশ ভাবুক এবং কবি। ইঁহারা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সাধক বলিয়া বিখ্যাত। সেই সেরীনদীর কূলে সেরপুরের মণিরাজির মধ্যে ভগবান "চন্দ্রকান্ত" মণির সৃষ্টি করিয়াছেন।

চন্দ্রকান্তের পিতামহ মানকোর হইতে

‡ Illusory.

* Western psychology যাহাতে মোটা কথা ছাড়া সূক্ষ্ম কথা আদৌ নাই।

† Gullivar

সেরপুরে আসিয়া বাটী নির্ম্মাণ করেন। ইঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় উর্দ্ধ বংশজ ব্রাহ্মণ। চন্দ্রকান্তের পিতার নাম রাধাকান্ত সিদ্ধান্ত-বাগীশ। পিতার নাম রাধাকান্ত বলিয়াই আচার্য্য ম্যাক্সমূলর চন্দ্রকান্তকে শোভাবাজারের বিখ্যাত পণ্ডিত শব্দকল্পদ্রুম-প্রণেতা রাধাকান্ত দেবের পুত্র বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

চন্দ্রকান্ত বাল্য ও কৈশোরে লেখা পড়ায় ভাবী কালের কোনও শুভ চিহ্ন প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন নাই। প্রত্যুত তাঁহার উত্তর কালে গভীর তমসাচ্ছন্ন ভাবিয়া রাধাকান্ত বিমনা হইতেন। প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে চন্দ্রকান্তের প্রতিভার উৎস খুলিয়া যায়।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি বিক্রমপুর ও নবদ্বীপে স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ ২৩ বৎসর বয়সে তর্কালঙ্কার উপাধি গ্রহণ করেন।

সেরপুরে নিজ বাটীতে টোল বা চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া চন্দ্রকান্ত অধ্যাপনা করিতেন। এই সময়ে তিনি গোভিল গৃহ্য সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্য পাঠ করিয়া কলিকাতার পণ্ডিত-সমাজ চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়েন। এ ক্ষেত্রে চন্দ্রকান্ত মল্লিনাথ অপেক্ষা অল্প যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কতিপয় প্রধান বঙ্গসন্তানের ঐকান্তিক আগ্রহে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জুবিলী উপলক্ষে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন ও ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের কার্য্য ত্যাগ করেন। সংস্কৃত কলেজে অবস্থান কালে তিনি ছাত্রের মত দিবারাত্র জ্ঞানান্বেষণ করিতেন। তাঁহার কালে তিনি সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, দর্শন, বেদ, বেদান্ত, দর্শন প্রভৃতিতে অসামান্য পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এই সময়েই তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহ রচনা করেন। তিনি অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করিতেন এবং অনবরত গ্রন্থ রচনা করিতেন। তাঁহার গ্রন্থ সমূহ তুলনায় কোন্ স্থান অধিকার করিবে, তাহা যোগ্য ব্যক্তি আলোচনা করিবেন।

চন্দ্রকান্ত বালকের ন্যায় সরল ছিলেন। তিনি কখনও কাহাকেও রুক্ষ ভাষা প্রয়োগ করিতেন না। তাঁহার মত নির্ম্মল চরিত্র সাধু পুরুষ প্রায় দেখা যায় না।

শেষ অবস্থায় কলেজ ছাড়িয়া তিনি শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের প্রদত্ত বেদান্তদর্শনের প্রবন্ধ রচনার জন্য বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা হাবে পঁচিশ হাজার টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ঐ সকল প্রবন্ধ "ফেলোশিপের লেক্‌চার" নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে করিতে তাঁহার রাজ-যক্ষ্মা রোগ জন্মে। এই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বিখ্যাত জনৈক মাড়োয়ারীর নিকট যে চিঠি লিখেন, তাহা হিতবাদীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

চন্দ্রকান্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অপ্রকাশিত গ্রন্থও আছে। ভরসা করি, তদীয় পুত্রগণ তাহা প্রকাশ করিবেন।

১। ব্যাকরণ—শিক্ষা (বাঙ্গালা) সত্যবতী চম্পূ (বাঙ্গালা) কাতন্ত্রঃছন্দ প্রক্রিয়া (কলাপ-ব্যাকরণের অ-পূর্ব্ব প্রকাশিত বৈদিক অংশ)।

২। নাটক—সতীপরিণয়, কৌমুদী-সুধাকর।

৩। খণ্ডকাব্য—প্রবোধঘটক, যুবরাজ-প্রশস্তি, আনন্দ-তরঙ্গিণী, ভাব-পুষ্পাঞ্জলি।

৪। মহাকাব্য—চন্দ্রবংশ।

৫। অলঙ্কার—অলঙ্কারসূত্র।

৬। স্মৃতি—গোভিল গৃহ্যসূত্র-ভাষ্য, শ্রাদ্ধকল্প-ভাষ্য, গৃহ্য সংগ্রহ-ভাষ্য, উদ্বাহচন্দ্রালোক, শুদ্ধচন্দ্রালোক।

৭। দর্শন—মহর্ষি কনাদ প্রণীত বৈশেষিক সূত্রের-ভাষ্য, কুসুমাঞ্জলির টীকা, তত্বাবলী, ফেলোসিপের লেক্‌চার, ৫ খণ্ড।

যে কয়েক জন শিক্ষিত ব্যক্তির জন্মগ্রহণে ময়মনসিংহ জগতের সমক্ষে সুপরিচিত, তন্মধ্যে চন্দ্রকান্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ কথা বলিলে অবিচার হয় না। তৎপরে মিঃ আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নাম। হায়, আজ দুই মহাপুরুষই ময়মনসিংহ অন্ধকার করিয়া, কে জানে কোন্ অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন!

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পাণ্ডব বংশ।

প্রতীপ
|
শান্তনু + সত্যবতী = চিত্রাঙ্গদ ও
| বিচিত্র বীর্য্য + অম্বিকা ও অম্বালিকা = ০
ভীষ্ম

সত্যবতী + পরাশর = দ্বৈপায়ন + }
বিধবা অম্বিকা ও অম্বালিকা + } = ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু

দাসী + বেদব্যাস = বিদুর

কুন্তী + (সূর্য্য ও পাণ্ডু)

কুন্তী + সূর্য্য = কর্ণ

কুন্তী ও মাদ্রী } + পাণ্ডু = ০

কুন্তী + (ধর্ম্ম, বায়ু ও বাসব)
= যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন

মাদ্রী + অশ্বিনীকুমারদ্বয় = নকুল ও সহদেব

দ্রপদী + পঞ্চপাণ্ডব

পরাশর + সত্যবতী = দ্বৈপায়ন]

দাস রাজ কন্যা।

"গুণবতী সত্যবতী পিতৃ শুশ্রূষায়।
করিত নাবিক কার্য্য নদী যমুনায়॥"

এই সময় রূপবতী সত্যবতী যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, যথা—

"এক দিন আমি মম প্রথম যৌবনে
গমন করিয়াছিনু যে তরী বাহনে॥"

তখন পরাশর মুনি নদী পার হইতে আসিয়া সেই সুন্দরীকে দর্শন মাত্র

"হে কল্যাণি তুমি মম, কাম কর উপশম।"

এবং "পরে মুনি নিজবসে লইয়া আমায়।"

ক্রীড়িল অনঙ্গ ক্রীড়া, উপজিল তায়—দ্বৈপায়ন।

শান্তনু + সত্যবতী = চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্র বীর্য্য]

মহারাজ শান্তনু মৃগয়ায় যমুনা তীরস্থ অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অতীব মনোহর সৌরভে উন্মত্ত হইয়া সৌরভানুসন্ধানে প্রবৃত্ত। এ হেন সময়ে বনকুসুম সত্যবতীর দর্শন পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন—

"শান্তনু প্রশ্ন শুনি কন্যা [illegible] কয়।
আপনার মঙ্গল হউক মহাশয়॥
মহারাজ আমি হই দাসের দুহিতা।
দাসগণ অধিপতি আমার যে পিতা॥
পিতার নিয়োগে ধর্ম্ম সাধন কারণ।
যমুনায় করি আমি তরণী বাহন॥

ও সত্যবতীর পরিচয় পাইয়া "বিবাহ কামনা রাজা করি মনে মনে।" দাস রাজের

নিকট প্রস্তাব করিলেন—

"দাস রাজ ! তোমার কন্যার মোর সনে।
বিভা দিতে ইচ্ছা তুমি কর কিনা মনে॥"

এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া দাস রাজ সত্যবতীকে সম্প্রদান করেন। এই সংযোগের ফল চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য।

বিধবা অম্বিকা ও অম্বালিকা + ব্যাসদেব = ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু]

চিত্রাঙ্গদ যৌবনের পূর্ব্বাহ্নে গন্ধর্ব্ব হস্তে নিহত ও বিচিত্রবীর্য্যের সন্তানাদি হইবার অগ্রেই মৃত্যু মুখে পতিত হইলে ভারত বংশ রক্ষা হেতু সত্যবতী বড়ই কাতরা হইয়া ব্যাসদেবকে বলিলেন "তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র" অতএব—

"অভিমত পাত্র তুমি ইথে বাছাধন।
সে দোঁহার গর্ভে কর পুত্র উৎপাদন॥"

মাতৃ আজ্ঞায় বিলুপ্ত প্রায় ভারত বংশের রক্ষা মানসে ব্যাসদেব অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং দাসী গর্ভে বিদুরের জন্ম দিলেন।

কুন্তী + (ধর্ম্ম, বায়ু ও বাসব) = যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন

মাদ্রী + অশ্বিনীকুমারদ্বয় = নকুল ও সহদেব]

মহারাজ পাণ্ডুর উৎপাদিকা শক্তি থাকিতেও মৃত্যু ভয়ে কোন জায়াতে উপগত হইতেন না; যথা—

"তদবধি এক দিনো আপন জায়াতে।
উপগত না হ'তেন পাণ্ডু কোন মতে॥"

সুতরাং পাণ্ডু পত্নিদিগকে আজ্ঞা দিলেন—

"কুন্তি ! তুমি মম উদ্ধারের তরে।
পুত্র উৎপাদন কর আপন উদরে॥"

পতির আদেশে কুন্তী ধর্ম্ম দ্বারা যুধিষ্ঠির, বায়ু দ্বারা ভীম, বাসব দ্বারা অর্জ্জুন ও মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারা নকুল ও সহদেব নামক পুত্রগণের উৎপাদন করাইয়াছিলেন।

কুন্তী + সূর্য্য = কর্ণ]

কুন্তীর অবিবাহিত অবস্থায় পুত্র কর্ণ।

দ্রপদী + পঞ্চ পাণ্ডব।

পাণ্ডব বংশ তখনকার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বংশ ছিল। সেই শ্রেষ্ঠ বংশে (১) যৌবন বিবাহ, (২) বিবাহের পূর্ব্বে সন্তান প্রসব, (৩) কেবট কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পুত্র উৎপাদন, (৪) অবিবাহিত অবস্থায় সন্তান হইলে পর বিবাহ, (৫) বিধবার গর্ভে ভাশুর কর্ত্তৃক পুত্র উৎপাদন, (৬) স্বামী বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ সংযোগে পুত্র উৎপাদন, (৭) স্ত্রীর বহু পতি প্রভৃতির অভিনয় হইয়াছিল। যখন সেই শ্রেষ্ঠ বংশে অত উদার নীতির আদর ছিল, তখন আমরা অবশ্যই ভাবিতে পারি যে, ঐ রূপ রীতি তখনকার সকল সম্প্রদায়স্থ বংশেই ছিল। যদি তাহ হয়, তবে তখনকার শোণিতাংশ আমাদের সমাজ শরীরে বর্ত্তমান। যদি সেই শোণিতে আমরা হইয়া থাকি, তবে আমাদের এত বাঁধাবাঁধি কেন ? সেই মহান উদার ভূমি হইতে বর্ত্তমান অনুদার ভূমে আসিয়াছি বলিয়া আমরা বীর্য্যহীন। বীর্য্যহীন জাতি পদদলিত।

শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ।

বৃন্দাবন।

"কি দেখিব, সর্ব্বপরিবর্ত্তনকারী কাল, কোন্ কীর্ত্তি অক্ষয় রাখিয়াছে? যাহা ছিল, তাহাও অবোধ মানব কেহ না বুঝিতে পারিয়া, কেহ বা তামসিক ভাবে আত্মতৃপ্তির জন্য, কেহবা আপন ভাবে প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার জন্য এবং নরাধম ব্যবসাদারগণ স্বার্থ সাধনের জন্য সব বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছে। বৃন্দাবন আর সে সাধন-কানন নাই;—সেই অশিক্ষিত মনোহর স্বাভাবিক স্বর-লহরীতে, কৃষক বালকের বা গোষ্ঠের রাখালের বন্যগানে উদ্ভাসিত বা মনোহর বেণু-বাদনকারী কদম্ব বৃক্ষারোহী রাখাল বালকের বিহার-ভূমি নাই! কি দেখিব?

বৃন্দাবনে সে বন নাই,—স্থান-সুলভ মৃৎ প্রস্তরে, কঠোর প্রস্তররাশিতে, শ্বেতমর্ম্মর-প্রস্তুত মানব-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যমালা দেখিবার জন্য কেহ বৃন্দাবনে আইসে না। তজ্জন্য বৃহৎ সহর সকল রহিয়াছে। যে সকল নিকুঞ্জ বন বলিয়া বিখ্যাত, হায় কোথায় সে সকল নিকুঞ্জবন? তথায় কলিকাতা কি বড় সহরের অট্টালিকা-বাসীদিগের টবে রক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষলতার ন্যায় বন সকল বিরাজ করিতেছে; সেত বৃন্দাবন নহে, সে বিলাতের Hot-house পূর্ণ কৃত্রিম বাগিচা। তথায় সরল রাখাল বালকের পরিবর্ত্তে কতকগুলি প্রতারক গায়ে ভক্তচিহ্ন ধারণ করিয়া নানাভাবে সরল দর্শকগণকে মোহিত করিয়া নিজের মাধুকরীর যোগাড় করিতেছে এবং সঙ্কীর্ণ ব্রজবাসী অর্থ-নিক্রমণের অনন্ত কৌশলে লোককে প্রতারণা করিতেছে। হায়, এই কি সেই বৃন্দাবন?

সর্ব্বাপেক্ষা পুতুল খেলাই এদেশে প্রবল হইয়া সকল উচ্চ অঙ্গের সাধন-রাজ্য বিনাশ করিয়াছে। বালক পুতুল খেলে, কিন্তু বই ধরিলেই পুতুল ছাড়িয়া দেয়। বালিকা পুতুল খেলে, কিন্তু সংসার ধরিয়াই পুতুল ছাড়ে। কিন্তু এই সকল সাধন-রাজ্যের বালক বালিকাগণ কতকগুলি আকারিত মূর্ত্তিদ্বারা নিজের তৃপ্তিলাভ করিতেছে। এই পুতুল খেলায় ভারত মাটী হইয়াছে। ইষ্টদেবের নামে পুতুল, ঈশ্বরের নামে পুতুল, মহাপুরুষের নামে পুতুল, বঙ্কুবান্ধবের নামে পুতুল, ভক্তের নামে পুতুল, হায়, এই পুতুলই ভারতকে মাটী করিয়াছে! সে কি পুতুল? বালিকার হাতে গড়া শিব যেমন শিবও নহে, বানরও নহে, এ তাহাই। ভক্তগণ ধন্য যে, এই পুতুল খেলায়ই মনকে ভুলাইয়া রাখে। তাই বলিতেছি, কি ভাবিয়াছিলাম, আর কি দেখিলাম! ভাবিয়াছিলাম, সযত্ন-রক্ষিত-বৃহৎকুঞ্জবন সকল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে শোভিত হইয়া, প্রাচীন স্থান সকলে বেদী কি অন্য চিহ্ন রক্ষিত হইয়া দর্শকগণকে বলিবে, এই স্থানে আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ রাখাল সঙ্গীগণের সহিত গো-রক্ষণ করিয়াছিলেন, এখানে ক্রিয়াবিহার করিয়াছিলেন; এখানে সমবয়স্ক বালিকাগণের সহিত নানাপ্রকার হাসি তামাসা রঙ্গ করিয়াছিলেন, এখানে ব্যাঘ্র-ভীতিগ্রস্ত সঙ্গীগণকে ব্যাঘ্র বধ করিয়া নির্ভয় করিয়াছিলেন, ইহা সেই স্থান, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বাল্য-বীরত্বে বালকগণ ও গোপ গোপিকাগণকে মোহিত করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি নিজের মধুর স্বভাবে সকল ব্রজবাসী

নরনারীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলাম সেই সকল স্থান, মানবহস্তের কৃত্রিম-গঠনে বিনষ্ট না হইয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে রক্ষিত হইতেছে। তথায় দর্শকগণের কৌতূহল বাড়াইবার জন্য লিখিত কিম্বা জ্ঞানী লোক কর্ত্তৃক বর্ণিত বিষয়ের সকল পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহার কিছুই নহে। যদি গঠিতমূর্ত্তির দ্বারা বিচার করিতে হয়, তবে বোধ হয়, কৃষ্ণের ন্যায় কুৎসিৎ পুরুষ ও রাধার ন্যায় কুৎসিতা স্ত্রী জগতে নাই। এই সকল মূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিলিপট-নিবাসী মানবের ন্যায় বিকৃত চক্ষু, দেহ, মুখ বিশিষ্ট মানবগণ কি প্রকারে ভক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে? সুতরাং পুত্তলই বৃন্দাবন মাটী করিয়াছে।

অথচ পুত্তল লইয়াই হিন্দুর সব। মথুরায় গিয়া ভাবিলাম, সেই প্রকাণ্ড উচ্চ মল্লভূমি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে, দেখিব, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ মল্লযুদ্ধে কংসকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কি দেখিলাম? প্রকাণ্ড দৈত্যাকার কংস, আর পঞ্চবর্ষবয়স্ক অতি কোমল, অতি মৃদু দুইটী শিশু যেন দর্শকগণের দয়া আকর্ষণ করিতেছে, সিংহের নিকট ক্ষুদ্র ইন্দুরের ন্যায়, সেই প্রকাণ্ড দৈত্য সহজেই শিশু দুইটীকে পাঁচ অঙ্গুলীতে বিনাশ করিতে পারে। এইরূপ অযোগ্য কবিতাহীন মূর্ত্তিতে সকল তীর্থস্থান পরিপূর্ণ! আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে গিয়াছিলাম, অন্ধভক্তি আমার নাই, দেখিয়া একটুও সন্তুষ্ট হইলাম না, বরং হৃদয়ের পোষিত পূর্ব্বের ভাব সব বিনষ্ট হইয়াছে। ভক্তির মূর্ত্তি এ দেশে এরূপ কেন? দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক প্রাংশু বালকদ্বয়কে কংসের সমান রূপে গঠিত করিলে কি দোষ হইত? শারীরিক বলে এই দুই বালক কোন মতেই এই কংসের কিছু করিতে পারে না; এবং মশকের ন্যায় সিংহের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার জীবনান্তের ন্যায় কৌশলের কথা শাস্ত্রে লিখিত নাই। কি দিয়া যে আমাদের ভক্ত হিন্দুগণ তীর্থ দর্শনে পবিত্রীকৃত হয়েন, বুঝি না। চিত্রাংশে, কল্পনাংশে, ভাস্কর কার্য্যে যে জাতি এইরূপ স্মৃতিরক্ষা করিতেছে, তাহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর, সন্দেহ নাই। ভক্তের মনের ভক্তি এ সকলের অনধীন থাকিলে উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু ইহা কর্ত্তৃক চালিত হইলে তাহাদের পরজন্মে নিগ্রো বেশে জন্মগ্রহণ করাই স্বাভাবিক। কেবল এখানে নহে, যেখানে যেখানে এই মূর্ত্তি রক্ষিত হয়, সেখানেই এইরূপ অবস্থ শিল্প বিভ্রাট। জগন্নাথ দেবের যে ছবি উড়িষ্যায় বিক্রীত হয়, সে যদি জগন্নাথের মূর্ত্তি হয়, তবে জগন্নাথ, বলরাম শুভদ্রাকে পূজা করিব না। শাস্ত্রে কি এমন কথা আছে যে, জগন্নাথ, বলরাম, শুভদ্রার ন্যায় কুৎসিৎ ভ্রাতা ভগ্নী জগতে কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই? যদি তাহা হইত, কোন মতে ভাবিয়া লইতাম, সে পুরুষ ও নারীকে দেখিতেছি। কিন্তু যদি আদর্শ সৌন্দর্য্যের এই মূর্ত্তি ও এই চিত্র হয়, তবে ভক্ত যে কোট নরকের উপযুক্ত হইতে পারেন, আমি বুঝি না।

তাই বলিতেছি, পুত্তলের ন্যায় নির্জীব, পুত্তলের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও পুত্তল পূজায় মুগ্ধ হিন্দুর যে বর্ত্তমান অধোগতি হইয়াছে, ইহা যে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এই পুত্তল পরিপূর্ণ তীর্থে আসিয়া অনুভব করিতে পারেন।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত।

প্রাচীন মূর্ত্তি শিল্প।

পূর্ব্বে ভারতে মূর্ত্তিশিল্পের কিরূপ উৎকৃষ্ট আদর্শ ছিল, তাহা সম্যকরূপে অবগত হইবার এখন আর কোনও উপায় নাই, কারণ মুসলমানগণের প্রাদুর্ভাবে শিল্প বিস্তার এই প্রধান অঙ্গটী একেবারে বিলুপ্ত হইয়া-গিয়াছে।

মুসলমান নরপতিগণ বস্ত্রশিল্প, চিত্রশিল্প ও তাঁহাদের অভিমতানুযায়ী স্থাপত্য শিল্পাদি কার্য্যে, শিল্পিগণকে যেরূপ নানা প্রকারে পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করিতেন, প্রাচীন স্থাপত্য কিম্বা মূর্ত্তিশিল্পের প্রতি তদ্রূপ কিছুই করেন নাই। বরং প্রাচীন দেবমন্দির ও দেব প্রতিমা সকল ধ্বংস করা, তাঁহাদের অনেকেরই একটা নিত্য কর্ম্মের মধ্যে ছিল। এইরূপ বহুবার নির্ম্মম ও কঠোর অত্যাচারের ফলে প্রাচীন দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি সমূহের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন স্থপত্য ও মূর্ত্তিশিল্প বহুদিন হয় অতীতের অন্ধকার-গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

মুসলমানগণের ভয়ে লুক্কায়িত, প্রাচীন দেব প্রতিমার দুই একটী অক্ষত অবস্থায়, এখন যাহা জলাশয় কিম্বা ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে, তাহার কোন কোনটীর শিল্পচাতুর্য্য দেখিলে একেবারে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তখন সত্য সত্যই মনে হয়—এ সোণার ভারতে কিছুরই অভাব ছিল না। সে কালে যাহা ছিল, এখন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বুঝি তাহার শতাংশের একাংশও করা যায় না।

বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী রামপালের ভূগর্ভ হইতে সম্প্রতি এই শ্রেণীর এক রজতময় বাসুদেব প্রতিমা উত্তোলিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, প্রসঙ্গতঃ রাজধানী রামপালের একটুকু বিবরণ এখানে প্রকাশ করা আবশ্যক।

রামপাল পূর্ব্ব বাঙ্গালায় বিক্রমপুর মধ্যে অবস্থিত। পালবংশীয় বৌদ্ধরাজাদিগকে পরাভব করিয়া, মহারাজ আদিশূর এস্থানে রাজধানী সংস্থাপন করেন। পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন উপলক্ষে তিনি এই রামপালের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী সময়ে এস্থান উত্তরাধিকারিক্রমে সেনবংশীয় রাজগণের হস্তগত হয়। তাঁহারাও এখন সুদীর্ঘকাল রাজপাট সংস্থাপন করতঃ স্বাধীন রাজত্বের সুবিস্তার করিয়াছিলেন।

অখণ্ডনীয় কাল প্রভাবে রাজধানী রামপালের পূর্ব্ব গৌরবের এখন কিছুই নাই। মাত্র,—রাজা বল্লালসেনের বাড়ীর বৃহৎ পরিখা ও রামপাল দিঘীর সুবিস্তৃত খাত অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে পুনর্জ্জীবিত সেই গজারি বৃক্ষ এখনও বহু সংখ্যক নরনারী দ্বারা প্রত্যহ অর্চ্চিত হইতেছে।

রামপাল বলিয়া এখন যে স্থানটুকু প্রদর্শিত হয়, তাহা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র। পুরাতন রামপালের বহু অংশ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া বহু কাল হইতে বিভিন্ন নামে বর্ত্তমান রামপালের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম রূপে পরিচিত। এই সমস্ত গ্রামের কোন কোন স্থান খনন করিলে স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান নানা প্রকার প্রস্তর, প্রাচীন সময়ের ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীর, গৃহভিত্তি, পাষাণময় দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি বাহির হয়। এই ভাবে বাসুদেব, কাত্যায়নী সূর্য্যদেব প্রভৃতির ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রায় তিন শত প্রাচীন মূর্ত্তি উত্তোলিত হইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য এই মূর্ত্তি খানিও মৃত্তিকা খনন উপলক্ষে উত্থিত হইয়াছে। মূর্ত্তিটী চাঁদি রূপায় নির্ম্মিত। নিম্নে বেদী, বেদীর সম্মুখে গরুড় করযোড়ে উপবিষ্ট, পশ্চাদ্ভাগে চালী। বেদীর উপরে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী চতুর্ভুজ বাসুদেব দণ্ডায়মান। বাসুদেবের মস্তকে কিরীট, দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। চালী সমেত মূর্ত্তিটী দৈর্ঘ্যে ১১ ইঞ্চি, প্রস্থে ৪ ইঞ্চি, ওজনে ৭১৬ তোলা। এই প্রকার ক্ষুদ্রাবয়বের মধ্যে যেরূপ গঠন-নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঢাকার বিখ্যাত প্রধান প্রধান শিল্পিগণ ইহা দেখিয়া প্রাচীন এই মূর্ত্তি শিল্পের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন। আর এরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও গঠন-নৈপুণ্য দেখাইতে

তাঁহারা সম্পূর্ণ অক্ষম বলিয়া, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এই মূর্ত্তি পাঁচ সহস্র মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করিতেও কেহ কেহ উৎসুক ছিলেন। মূর্ত্তিটা এখন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। *

এই সমস্ত দেব বিগ্রহ যে প্রাচীন সময়ের শিল্পিগণ কৃত এবং মহারাজ আদিশূর কিম্বা সেনবংশীয় নরপতিগণের প্রতিষ্ঠিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সময়ান্তরে রাজধানী রামপালের ইতিহাস একটু বিস্তৃতাকারে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী সরস্বতী।

* এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে গত ১৩১৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "বিক্রমপুরে প্রাপ্ত রজত নির্ম্মিত বিষ্ণু মূর্ত্তির বিবরণ" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। উহার এক স্থলে—

"এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট ইহা প্রথমে প্রেরিত হইয়াছিল, তাঁহারা ইহাকে মহারাষ্ট্রীয় শিল্প বলিয়া এবং ৮০০। ৯০০শত বৎসরের পূর্ব্বে নির্ম্মিত, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।"

এইরূপ লিখিয়া লেখক নিজেই আবার ইহার একটুকু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় কিন্তু তাঁহাদের এ উক্তি যথার্থ বলিয়া অনুমিত হয় না। কারণ ইহার সহিত মহারাষ্ট্র শিল্প অপেক্ষা মান্দ্রাজ অঞ্চলের দেবমূর্ত্তি সমূহেরই অধিকতর সৌসাদৃশ্য অনুভূত হয়। যাঁহারা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাও বোধ হয় চিত্রদৃষ্টে আমাদের এ মন্তব্য অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।"

এই প্রকার লেখার কিম্বা মন্তব্য প্রকাশের তাৎপর্য্য কি, আর কি সূত্রেই বা লেখক মহাশয় এই বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কারণ মূর্ত্তিটী এসিয়াটিক্ সোসাইটীতে প্রেরিত হইলে, সোসাইটীর সুকুমার শ্রমশিল্প বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত I. Henry Burkill, M. A. মহোদয় যে অভিমত প্রদান করেন, তাহাতে "ইহা মহারাষ্ট্রীয় শিল্প" কিম্বা ইহা "মান্দ্রাজ শিল্প নয়" এমত কোন কথারই উল্লেখ নাই, মাত্র দাক্ষিণাত্য শিল্প বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সকলের অবগতির জন্য তাঁহার অভিমতের অংশটুকু আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—"The Statue appears to be about 100 150 years old and looks as of Southern India workmanship."

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই—বার্কিল মহোদয় যে ইহা ১০০ হইতে ১৫০ বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত বলিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ মূর্ত্তিটী যে ইহা অপেক্ষা আরও পুরাতন সময়ের, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সময়ান্তরে রাজধানী রামপালের ইতিহাসের সঙ্গে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

প্রবন্ধ লেখক।

ক্ষুদ্র কবিতা।

কি চাই।

(১)

বিমর্ষ বদন, জীবের যখন চক্ষে পড়ে ভাই!
হৃদয় ফুটে রক্ত ছুটে, অধীর হ'য়ে যাই!
হাসি মুখে, মনের সুখে, যদি কেহ যায়,
দেখি তা'রে পরাণ ভ'রে প্রফুল্ল হিয়ায়॥

(২)

এ সংসারে, ঘু'রে ফি'রে, দেখি' বুড়োর জ্বালা
কেঁ'দে মরি হরি! হরি! দু'সন্ধ্যা দু'বেলা।
আবার যেথা, শিশুর কথা, মধুরতাময়।
আ'সে কাণে পোড়া প্রাণে, কত সুখ হয়॥

(৩)

অনাহারে, সকাতরে, যখন কেহ কাঁদে,
যমের শিকল, ক'রে বিকল আমায় যেন বাঁধে।
ক্ষীর শর, বহুতর, নানা মাখন খায়,
এমন লোকে দে'খে চোখে, হৃদয় জুড়ায়॥

(৪)

অতি দীন, বস্ত্রহীন, শীতেতে কাতর
দেখি যদা, হই তদা, বিহ্বল অন্তর।
আবার যদি, তুলোর গদি, শাল্-দোশালা দেখি,
সেই গরমে, মন-মরমে, কত বা হই সুখী॥

(৫)

অতি ক্লান্ত, পথশ্রান্ত, পথিকের ক্লেশ
দেখি যথন চিতে তখন, দুখ পাই অশেষ।
আরামেতে, বিরামেতে, দেখিলে সুজন
হয় মম, দূর শ্রম, হৃষ্ট দেহ মন॥

(৬)

মোহাপন্ন, মতিচ্ছন্ন, অদাতা কৃপণ
দরশনে, পরশনে, হারাই চেতন।
দানশীল, অনাবিল, কৃপার গোঁসাই
নর নারী, যদি হেরি, প্রেমে গ'লে যাই॥

(৭)

অনাচারে, পাপ ভারে, হেঁটমুণ্ড হেরি'
নারকে যাতনাতে সারা হ'য়ে মরি।
পুণ্যবান, ধর্ম্মপ্রাণ, সমুন্নত মনা
দেখিতে দেখিতে হই আহ্লাদে আটখানা॥

(৮)

প্রভু পিতঃ করুণা-সিন্ধু! পতিত-পাবন!
অধমেরে, এই ভিক্ষা দাও নারায়ণ,
জীবের সুখেতে দুঃখে সুখী দুঃখী হ'য়ে
তব পদে স্থান পাই সত্য লোকে গিয়ে॥

(৯)

একা নাহি যে'তে চাই সবে মি'লে যা'ব,
বরঞ্চ সবার শেষে আনন্দে পৌঁছিব।
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম "অপেক্ষা-সাধন";—
ক্রমে তু'লে দিয়ে সবে শেষেতে গমন॥

(১০)

যত ভাই পারে যা'বে, দেখিয়া হাসিব,
বাহু তু'লে হরি ব'লে প্রেমেতে নাচিব।
যখন আর কেহ বাকী না রহিবে যে'তে
তখন নিশ্চিন্ত মনে উঠিব নায়েতে॥

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

যুগলমূর্ত্তি।

শুনি দূর জলদের গম্ভীর আহ্বান,
ছুটে আসি সৌদামিনী মিশে যায় বুকে,
ক্ষুদ্র তটিনীর শুভ্র স্রোতঃ বেগবান
সিন্ধুবক্ষে লুঠি যায় গা'য় শত মুখে।
কোটী ভুজ প্রসারিয়া দীপ্ত সৌরকর
কমঠ পৃষ্ঠক নীল দর্পণ উরসে
একস্থানে কেন্দ্রীভূত হয় সুন্দরতর,
উদ্বেল বাসনা যথা তৃপ্তির পরশে।
দূর বনে হয়েছিল মুরলীর ধ্বনি,
পশেছিল কম্প্র বক্ষে গোপ বালিকার,
তাই নীপ-তরুমূলে প্রেম উন্মাদিনী,
শোভিছে নীলাব্ধিবুকে ফুল্ল জ্যোৎস্নাহার।
সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষাময় বিরহাবসানে,
অনন্ত মিলন আজ ভক্ত-ভগবানে।

শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষ।

করুণা।

জীবনের প্রান্তে এসে একি দেখি হায়!
অবশ অক্ষম যত ইন্দ্রিয়-নিচয়;
বুঝিনাক কোন্ পথে যায় দিবা-রাত;
মনে যেন হয় বিশ্ব পাইয়াছে লয়।
বাহিরে আঁধার ঘোর, নীরব ভুবনী;
কিন্তু হেরি অন্তরের অন্তরালে ধীরে
প্রকাশিছে শুভ্র উষা-বিমল বরণী,
কনক-কিরণ ঢালি আত্মা-গৃহ-শিরে।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল।

সোণার ভারত।

চরণ চুমিয়া চঞ্চলে চলে
চির চঞ্চল সিন্ধু,
সোণার এদেশে সোণার জ্যোছনা
বিতরেন সদা ইন্দু।
শৈল বিরাজে মস্তকোপরি
মাথার মুকুট হেন,
বিধাতা ইহারে স্বরগ সম্পদে
ভূষিত করেছে যেন।
চারণ গাইছে বীরত্ব গীতি,
অতুল মহিমাময়,
এ সোণার দেশে বেদসঙ্গীত
এখনও গীত হয়।
এরি দর্শন—মোহিয়া জগত
স্তব্ধ করেছে সবে,—
আমার দেশের মতন দেশটী
নাই আর এই ভবে।
যদিও মোদের কীর্ত্তি লুপ্ত
যদিও সুপ্ত মোরা,
তবুও মোদের জ্ঞানের আলোক
সারাটা পৃথিবীজোড়া।
আমাদেরি জ্ঞানে এ বিশ্বে জ্ঞান,
আমাদেরি ধ্যানে এ বিশ্বে ধ্যান,
আমাদেরি গীত দুনিয়ায় গীত,
কিসে বা আমরা হীন,
আজ নয় মোরা পরপদানত
আজ নয় পরাধীন।
মনে থাকে যেন জননী মোদের
শ্রেষ্ঠ স্বর্গ হতে,
তাহলে আমরা পড়িব না আর
পাপ-পঙ্কিল-স্রোতে।
মনে থাকে যেন এদেশ মোদের
সোণার তৈরি করা।
আমাদের সোণা ছড়ান রয়েছে
সারাটা ভুবন যোড়া।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

শীত ও বসন্ত।

"শুন সবে," শীত কহে বসন্তেরে ডাকি—
"মর্দ্দের মতন করি" সাজাও ধরায়!
যেথা তুমি যাও আমি সেথা নাহি থাকি।
আবার আসিতে হ'বে, এখন বিদায়!
এক ব্রত দোঁহাকার তোমার আমার!

মূঢ় যাহারা এ রহস্য বুঝিবারে নারে;
আমি ভাঙ্গি, তাই তুমি আস গড়িবারে।
'ভাঙ্গা' গেলে 'চন্দ্রে' 'গড়া' রবে নাক আর,
ভাঙ্গা গড়াতেই গড়ে নিখিল-সংসার।"

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৭৯। নকুড় বাবু। নূতন নক্সা। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই সামাজিক নক্সাখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। ইহাতে এক শ্রেণীর লোকের বিশেষ শিক্ষা হইবে। স্বদেশী কাগজ।

৮০। অমর। শ্রীজগচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত বি-এ, প্রণীত। কালিদাস, ভবভূতি হইতে আরম্ভ করিয়া কাশীদাস পর্য্যন্ত ১১ জন অমর ভারত-সন্তানের কথা পদ্যে লিখিত। লেখা সরস এবং সুমার্জ্জিত। পড়িয়া তৃপ্তি হইলাম। স্বদেশী কাগজ।

৮১। চাঁদের চালাকি। ঐ গ্রন্থকার। মূল্য এক পয়সা। গদ্যে পদ্যের উপযোগী ভাবলহরী নিবদ্ধ। লেখার বেশ পারিপাট্য আছে। স্বদেশী কাগজ।

৮২। শিখ। দৃশ্যকাব্য। শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ।০। বাঙ্গালা ভাষা জাগিতেছে, ইহা স্মরণে যাঁহাদের হৃদয় উৎফুল্ল হয়, তাঁহারা এইক্ষুদ্র পুস্তকখানি একবার পাঠ করুন। শোণিতাক্ষরে এ পুস্তক লেখা—পড়িতে ২ প্রাণ উষ্ণ হয়—দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হয়—কি জানি কেন, এক অজানা স্বপ্রেশ প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়।

৮৩। চারুবালা। গার্হস্থ্য উপন্যাস। শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র প্রণীত। মূল্য ৮০। নূতন হাতের নূতন লেখা হইলেও গ্রন্থকারের ভবিষ্যতের আশা উজ্জ্বল। এ পুস্তকের লিপি-চাতুর্য্যে প্রশংসনীয়।

৮৪। খোকার বই। শ্রীমোহিনীমোহন বসু প্রণীত, মূল্য ৵০। ছেলেদের জন্য রচিত এই পুস্তকখানি বেশ সুন্দর হইয়াছে। বিলাতী কাগজ।

৮৫। কুমারী। (উপন্যাস) শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল প্রণীত, মূল্য ২৲। পাকা হাতের লেখা—ভিত্তি বহুবিস্তৃত, পাঠে তৃপ্তি হয়। পরিমার্জ্জিত বাঙ্গলা ভাষা যাঁহারা ভালবাসেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদের চিত্ত বিনোদন করিবে। স্বদেশী কাগজ।

৮৬। সাবিত্রী-চরিত। শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম-এ প্রণীত, মূল্য ।০। বাহিরের চাকচিক্য নাই,—কিন্তু সুমিষ্ট কবিতায় সাবিত্রী চরিত বিবৃত। সাধু লোকের হৃদয় সাবিত্রী-পূত-চরিত্রে অতি সুন্দর ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন।

৮৭। সিন্ধু-গৌরব। শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত। জোবেদী, কাশেম এবং মর্জ্জিনার চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে, চক্ষের জল সম্বরণ করা যায় না। নীরব গভীর ভালবাসার অপূর্ব্ব কাহিনী। পুস্তকখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। কিন্তু হায়—বিলাতী কাগজে মুদ্রিত। ইহা সিন্ধু-গৌরবের অমার্জ্জনীয় কলঙ্ক।

৮৮। মস্তকের মূল্য প্রভৃতি। শ্রীসরোজনাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ১।০। ১০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প। লেখকের লিপি-চাতুর্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়, অল্প অল্প কথায় অনেক চিত্র বেশ ফুটিয়াছে। গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল।

৮৯। The Mission of the Brahmo Samaj, by Pandit Sivanath Sastri, Price As. 12 only.

রুগ্ন সাধু ব্যক্তির হৃদয়ের এই অভিব্যক্তি, অথবা সরল উক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিকষ-পরীক্ষায় অটুট না থাকিবার হইলে পাঠ করিয়া আমরা বড়ই উপকৃত হইলাম। সংক্ষিপ্ত, অথচ ধারাবাহিক ইতিহাস, শব্দাড়ম্বর নাই, ভাব কুহেলিকা নাই, অমার্জ্জিতের কুচিত্র নাই;—কিন্তু উদারতা এবং নিরপেক্ষতার কিছু কিছু অভাব আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল ভিত্তি কি?—তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন নাই। এ সকল দোষ সত্ত্বেও আমরা লিখিতে বাধ্য—এরূপ সরল বিবৃতি দীর্ঘকাল পড়ি নাই। স্বদেশী কাগজ।